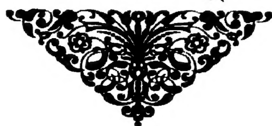


উপন্যাস সমগ্র



উপন্যাস সমগ্র

রমাপদ চৌধুরী



৪



সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩

স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক সপ্তর্ষি প্রকাশন , ৪৪এ চক্রবর্তী লেন , শ্রীরামপুর হুগলী থেকে
প্রকাশিত এবং কালি প্রেস, ৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ।

সূচী



বনপলাশির পদাবলী



এমন হবে আগে ভাবিনি। ধারণা ছিল, উপন্যাস লিখব। সেই উপন্যাস—চিরকাল যা জেনে এসেছি, যা লিখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বনপলাশিতে পা দেওয়ামাত্র জানা গেল, তা অসম্ভব। ছেঁটেকেটে বনপলাশিকে বৃত্তের পরিধিতে হয়তো ধরা যায়, কিন্তু তখন আর সেই মানুষ ও মৃত্তিকার উদ্বেলিত নিসর্গ থাকে না, তা সাজানো বাগানে পরিণত হয় মাত্র। অথচ আমার স্থির বিশ্বাস, বনপলাশি তা নয়,—জীবনের মতই যতি আছে হয়তো সেখানে, কিন্তু বিরতি—সে কখনও নয়।

বনপলাশি তাই শাস্ত্রীয় উপন্যাস না হয়ে শেষ পর্যন্ত লৌকিক জীবনের অনন্ত রহস্য নিয়ে—বনপলাশির পদাবলীই রয়ে গেল।

বনপলাশির নতুন দিঘির জলের মতই শান্ত জীবন ছিল বনপলাশি গাঁয়ের। মাঝে মাঝে দু'-একটা মামলা-মোকদ্দমা, কিংবা সামাজিক অঘটন ঘটেছে বটে, কিন্তু এমন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি কখনও। এমনকি চাটুজ্যেদের অবনীমোহন, যে বর্মায় গিয়ে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল, সেই অবনীমোহন যেবার কলকাতায় বাড়ি করছে খবর এল, সেবারও এমন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। আর মল্লিকদের বাড়ির মেজবৌ উমাশশী সেই যে ন্যাংটেশ্বরের মেলায় গিয়ে হারিয়ে গেল, দু'বছর বাদে হৃদয় মোড়ল কাটোয়া থেকে মামলার তদ্বির করে ফিরে এসে সেই-যে বললে, মল্লিকদের মেজবৌকে দেখেছে তার বাপের বাড়ির গাঁ থেকে যে ছেলেটি দু'-দু'বার তত্ত্বতালাস করতে এসেছিল তার সঙ্গে, সেবারও এত চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি।

বনপলাশির জীবনে ঠিক এমন একটা ঘটনা বুঝি কখনও ঘটেনি।

সারা গাঁয়ে এক আলোচনা। মাঠের মুনিশ কাজ ফেলে ছুটে আসে আলপথে রায়বাড়ির কাউকে যেতে দেখলে। খুশি-খুশি মুখে প্রশ্ন করে, কখন আসবেন গো ওনারা ?

মল্লিকদের বৈঠকখানায় টিমটিমে হারিকেনের আলোয় বসে চটাস চটাস করে মশা মারতে মারতে নিত্য মল্লিক ফুর্তিতে ডগমগ হয়ে নিজের মনেই যেন বলে ওঠে, এইবার ! হুঁ হুঁ বাবা, এইবার !

আর আশি বছরের বুড়ি অট্টামা লাঠির ডগায় কাঠির মত চেহারাটা ভর দিয়ে খুট খুট করে রায় বাড়িতে এসে হাজির হয়, চেঁচিয়ে বলে, কই লো, মোহনপুরের বউ, কোতায় গেলি লো।

মোহনপুরের বউ লম্প হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, এঁটো হাতের কব্জিতে করে ঘোমটাটা টেনে দেয় দক্ষিণদুয়োরি ঘরখানার অন্ধকার বারান্দায় টিকের আগুন দেখে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলে, অট্টামা তুমি ? এত রাতে নিজে এলে কেন গো, সাবিত্তিদের কাউকে বলে দিলেই পারতে, চিঁড়ে পাঠিয়ে দিতাম।

অট্টামার ফোকলা মুখখানা অন্ধকারে হেসে উঠল, মোহনপুরের বউ দেখতে পেল না। কিন্তু শব্দে বুঝতে পারল।

তাই বললে, বুড়ো মানুষ, এমনি রাতে-বিরেতে ঘর থেকে বেরোও কোন আক্কেলে!

অট্টামা আবার হাসল। বললে, থাকতে পাল্লাম কই লো, শুনে থেয়ে কেবুলি আকুলিবিকুলি করছে। বলি, যাই একবার মোহনপুরের বউকে শুধিয়ে আসি গে।

তারপর ফিসফিস করে অট্টামা জিগ্যেস করে, হ্যাঁ লো, যা শুনছি, সত্যি?

—কি শুনছ? মোহনপুরের বউয়ের গলার স্বরে এবার যেন একটু বিরক্তি দেখা দেয়।

অট্টামা হেসে বলে, পেসাদের কথা!

মোহনপুরের বউ এবার দক্ষিণদুয়োরির অন্ধকার দাওয়ার দিকে তাকাল। দেখলে, টিকের আগুনটা ঘন ঘন জ্বলে উঠছে। অর্থাৎ ওদের কথাবার্তা ঠিক পৌঁছে গেছে উঠোনের ওপারে, অন্ধকারে বসে বসে যে তামাক টানছে, তার কানে।

পরক্ষণেই অন্ধকার থেকে কর্কশ ক্রুদ্ধ গলার স্বর এল, ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতেই জবাব এল, তাতে কি হয়েছে কি? গাঁয়ের লোক যেন পাগল হয়ে গেছে। আমার ইদিকে...

কথা আর শেষ হল না। আর অট্টামা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না, তাই বলছিলাম।

বলে ঠুক ঠুক করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল অট্টামা। আর সেই রুক্ষ গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে বললে, দাঁড়াও গো অট্টামা, দাঁড়াও, অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে, লোকে আমায় দুষবে। চলো পৌঁছুয়ে দিয়ে আসি।

অট্টামা থেমে পড়ল, তারপর বললে, সত্যি কথা বাপু, এত অন্ধকার আগে ছিল না।

পেসাদের কথায় পুরনো দিনের জীবনটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে অট্টামার। অন্ধকারে বসে বসে অঝোরে কাঁদতে শুরু করে সে। এত সম্পত্তি, এত বড় বাড়ি, ভাশুরের তিন বউয়ের এত ছেলেমেয়ে-নাতিনাতনি থেকেও অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গ জীবন অট্টামার। সারাদিনে সকাল বিকেল দু'বার শুধু তার ঘরখানা নিকিয়ে দিয়ে যায় কোটালদের কৌশল্যা, আর রাতে শুতে আসে। দু'-চারবার 'পোড়ারমুখি' বলে তাকে ডাকল অট্টামা, জবাব না পেয়ে চুপ করে বসে রইল। পেসাদ—পেসাদের কথাই আজ সবকিছু মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

বনপলাশি ছোট্ট গাঁ। এককালে কাছাকাছি সব ক'টা গাঁ নিয়ে এই অঞ্চলটারই নাম ছিল বনপলাশি। লাল পলাশের বন্যায় নাকি ভেসে যেত সারা তল্লাট। তার থেকেই নাম হয়েছিল বনপলাশি। তারপর ধীরে ধীরে সব গ্রামেরই পৃথক পৃথক নাম হয়ে বনপলাশি নামটুকু রয়ে গেছে শুধু এই ছোট্ট গাঁয়ের অঙ্গে।

অট্টামা ভাবে দিনে দিনে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল এদিকটার। কিন্তু তার চেয়েও যেন বেশি বদলে গেছে মানুষগুলো। একটা পাকা সড়কও তখন ছিল না বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি।

এই গাঁয়েই জন্ম হয়েছে অট্টামার, বিয়ে হয়েছে এই গাঁয়েই। আর মৃত্যুও হবে এই গাঁয়েই। সেই কবে, সাত বছর বয়সে কাঁটোয়ায় গঙ্গা নাইতে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে; উটের গাড়িতে। এখন আর উটের গাড়িও নেই, কাঁটোয়াও বলে না কেউ। কাঁটার বন ছিল নাকি ওদিকটা সব, তা থেকে কন্টকবন, লোকের মুখে মুখে নাম ছিল কাঁটোয়া। কোর্ট-কাছারি করতে যেতে হত এদিকের লোকদের, কখনও কাটোয়ায়, কখনও বর্ধমানে। মামলার তদ্বির করতে, অষ্টমের খাজনা মেটাতে যেতে হত বর্ধমান। তখন না ছিল রেল, না মোটরগাড়ি। উঁচু-নিচু জল-কাদার রাস্তা ছিল একটা বর্ধমান থেকে কাটোয়া। তার

উপর দিয়ে হটর হটর করে চলত ছই-দেয়া গরুর গাড়ি, ছইয়ের গায়ে কত রংবেরঙের কারুকার্য। মেয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শ্বশুরবাড়ি যেত, বউরা হাসতে হাসতে ফিরত বাপের বাড়ি। হলুদ-রঙা পালকি ছিল গ্রামে গ্রামে, আর ছিল টাট্টু ঘোড়া। হাতুড়ে ডাক্তার বৃন্দাবনের তখন কী পসার, টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে এ-গাঁ ও-গাঁ। আরেকটা টাট্টু ঘোড়া ছিল মশায়দের। তাই কত সমীহ করে চলত তাদের অট্টামা। তারপর সেই কাটোয়ায় গঙ্গা নাইতে গিয়ে একটা গোরা সৈন্যকে দেখেছিল ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। সে যে কত মস্ত ঘোড়া, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। গাঁয়ের সইরা কেউ বিশ্বাস করেওনি।

অট্টামা বলেছিল, দেখিস লো দেখিস, বিয়ের পর ভাতারকে বলিস কাঁটোয়ায় গঙ্গা নাইতে নিয়ে যেতে, তালেই দেখতে পাবি, মশায়দের ঘোড়াটা তার কাছে গাধা বই কিছু না। বলে ছড়া কেটেছিল, 'কান থাকতে কালা হলেম চোখ থাকতে অন্ধ, ঘুরঘুরে ভেবেই সারা পদ্মের নাকি গন্ধ।'

সইরা চটে গিয়েছিল ওর কথায়। বিশ্বাস করতেই চায়নি যে উটের গাড়িতে চড়ে পিঠের ব্যথায় দু'দিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল অট্টামাকে।

সে কি আজকের কথা। বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি তখন দুটো উটের গাড়ি চলত। দুটো সিন্ধি গাড়োয়ান ছিল গাড়ি দুটোর। কেউ বলত সিন্ধি, কেউ বলত পাঞ্জাবি। কাদের সিন্ধি বলে, আর কাদের পাঞ্জাবি বলে তা গাঁয়ের লোকরা জানত না। জোয়ান দস্যির মত চেহারা ছিল গাড়োয়ান দুটোর, রোদে পোড়া ফর্সা রং। যাতায়াতের আর কোন উপায় ছিল না বলেই উটের গাড়িতে চড়ত সবাই, কিন্তু বদনামও ছিল গাড়োয়ান দুটোর। বলত, ডাকাতে দলের সঙ্গে নাকি জোট ছিল ওদের।

খুন রাহাজানি তখন লেগেই থাকত। বিশেষ করে কর্জনার কাছটিতে। মুখে মুখে ছড়া কাটত ; 'যদি পেরুলি কর্জা, নেয়ে ধুয়ে ঘর যা।' অর্থাৎ কর্জার দিঘি পার হলে আর কোন ভয় নেই। কিন্তু সঙ্গে টাকা নয়তো সোনায় মোড়া বউ নিয়ে ওটুকু পথ পার হয়ে আসার ভাগ্য বড় একটা কারও হত না।

কর্জনার ঝোপ-জঙ্গলে দিঘিতে পুকুরে প্রায়ই পড়ে থাকত তখন, পাঁকের নীচে দামে পানায় ঢাকা থাকত, অনেক কঙ্কাল। তাই বর্গির হাঙ্গামার মত কর্জনার ডাকাতিও ছিল চারপাশের আতঙ্ক।

বিকেলে কাছারি ছুটি হওয়ার পর ওই উটের গাড়িতে ফিরত সকলে। কেউ ধানবেচা টাকা নিয়ে, কেউ বা বউয়ের গয়না বন্ধক দিয়ে মেয়ের বিয়ের টাকা কর্জ নিয়ে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাত্রীরা নেমে যেত যে-যার গাঁয়ের পথে। আর যাত্রীর সংখ্যা কমে গেলেই কিংবা কেউ একা পড়ে গেলেই গলায় তার দড়ির ফাঁস পড়ত আচমকা। কর্জনার কাছটাই ছিল সবচেয়ে বেশি ঝোপ-জঙ্গল, তাই ওখানেই পাঁকের তলায় পুঁতে ফেলত লাশ। তারপর ভালমানুষটির মত ফিরে আসত গাড়োয়ানরা। কেউ খোঁজ করলে বলত, রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়েছি, হয়তো ডাকাতের হাতে পড়েছে।

কেউ কেউ বলত, গাড়োয়ানগুলোর দোষ নেই। আসলে কাছাকাছি এলাকার কোন কোন জমিদার তালুকদার নাকি ডাকাতের দল পুষত, নিজেরাও ডাকাতি করত। তা না হলে এই কাঁটার ঝোপ আর পলাশ বনের রুক্ষ মাটিতে চাষ করে যখন পেট চালানোই দায় ছিল, তখন কি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল দু'-চারজন।

পথে বিপদ ছিল, তবু লোকজনের আসা-যাওয়ার কমতি ছিল না। ভিড় বাড়ল পাকা রাস্তা হওয়ার পর। আরো বাড়ল ম্যাকলিওড কোম্পানি যখন রেল খুললে। বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি ছোট লাইনের গাড়ি চলাচল শুরু হল। সে কি আনন্দ তখন দু'পাশের গাঁয়ে। ট্রেনে যাত্রী হয় না তেমন, কেবলই গুজব ওঠে কোম্পানির খরচ

পোসাচ্ছে না, ট্রেন তুলে দেবে। তাই অকারণেই টিকিট কেটে যাতায়াত শুরু করলে পয়সাওলা বাবুরা।

কিন্তু রেল টিকে গেল শেষ পর্যন্ত। কারণ সারা বছর রেল চালাবার মত যাত্রী না থাকলে কি হবে, তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগেই রইল। ক্ষীরগাঁয়ের তীর্থযাত্রী, ন্যাংটেশ্বরের।

ক্ষীরগাঁয়ে দেবী যোগাদ্যা। বাহান্নপীঠের এক পীঠ, সতীর ছিন্নদেহ পড়েছিল যেখানে। ক্ষীরগাঁ থেকে মোহনপুর দু' ক্রোশ পথও নয়। তাই মোহনপুরের বউ ভেবেছিল এবার ক্ষীরগাঁয়ের মেলার সময় বাপের বাড়ি যাবে।

কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল একটা খবরে।

মনে মনে সেই জন্যে একটা অভিযোগ যে না ছিল তা নয়। কিন্তু অভিযোগটা ভাশুরের বিরুদ্ধে নয়—গিরিজাপ্রসাদের বিরুদ্ধে নয়। বোধ হয় নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে।

গরুর গাড়ির রাস্তায় পাঁচ ক্রোশ পথও পার হতে হয় কিনা সন্দেহ, পাঁচখানা গ্রামও পার হতে হয় না—মোহনপুর, মোহনপুরের বউয়ের বাপের বাড়ি। প্রত্যেক বছরই পুজোর আগে আগে বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা মনে পড়ে তার, স্বামীর সঙ্গে আলোচনাও হয়, সম্মতি আদায় করতেও দেরি হয় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোট ছেলেটার অসুখ, নয় তো মেজ মেয়েটা কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে ; আর মোহনপুরের বউয়ের ইচ্ছের পাখি পাখা গুটিয়ে ফেলে।

এবারও তেমনি বাধা পড়ল। ছেলের জ্বর নয়, মেয়ে হাত পুড়িয়ে বসেনি। এমনকি স্বামী মামলা-মকদ্দমা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত নয়, চাষ শেষ হতে দেরি হয়ে যায়নি, সেটেলমেন্টের বছর নয়। মোহনপুরের বউ ভেবেছিল এবার যাওয়া হবেই।

কিন্তু হল না।

হঠাৎ ভাশুর গিরিজাপ্রসাদ চিঠি লিখে জানাল, গাঁয়ে ফিরছি, দক্ষিণদুয়োরি ঘর দু'খানা পরিষ্কার করিয়ে রেখো। আর দাদার এই চিঠি পড়ে গিরীনের মেজাজ বিগড়ে গেল।

খবরটা সে নিজেই গাঁয়ের পাঁচজনকে জানিয়েছিল। জানিয়েছিল বোধ হয় একটু গর্ব করেই। কারণ নিজে সারাটা জীবন চাষবাস নিয়ে কাটালেও দাদার সম্পর্কে তার মনে একটু গর্বই ছিল। গাঁয়ের লোকদের একটু সুযোগ হলেই শুনিয়ে দিত, দেওঘরে খুব বড় ইস্কুল হে, সেখানে হেডমাস্টার, পাঁচশো টাকা মাইনে। পকেট ছিঁড়ে যাবে বলে দু'প্রস্ত কাপড় দিয়ে পকেট বানাতে হয় ওদের, ঐ যেমন বদ্দমানের বীরু পেশকারের।

গিরীনের নিজেরও তাই ধারণা, দাদা তার লাখোপতি। সারাজীবন পাঁচশো টাকা মাইনের হেডমাস্টারি করেছে, টাকা জমায়নি আবার ! মাসে খরচ আর কত, একশো টাকাই হোক্।

কল্পনায় দাদার টাকার অঙ্কটা একটু বেশি করেই দেখত বলে গিরিজাপ্রসাদ মাঝে মাঝে যখনই বনপলাশিতে এসেছেন, থেকেছেন দু'-দশ দিন কি দু'-এক মাস তখনই গিরীন খুশি হয়েছে।

কিন্তু এবার আর তেমন খুশি হতে পারছে না। পারছে না তার কারণ গিরিজাপ্রসাদ এবার আর দু'-দশ দিনের জন্যে আসছেন না, আসছেন স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে।

গিরীনের বিরক্তির প্রধান কারণটা সেখানেই। কিন্তু গাঁয়ের লোক অতশত বোঝে না। তারা যেমনকার তেমনি পড়ে রইল গাঁয়ে, সব স্বপ্ন তাদের ব্যর্থ হয়ে গেলেও একটা মানুষ তো বনপলাশির স্বপ্নকে সার্থক করেছে। শিক্ষিত হয়েছে, দারিদ্র্যকে জয় করেছে, বনপলাশির নরক থেকে মুক্তি পেয়ে বড় হয়েছে, চাকরি করে টাকা জমিয়েছে। বনপলাশি থেকে চলে গেছে অনেকেই। কিন্তু একা গিরিজাপ্রসাদই ফিরে আসছেন

গাঁয়ে। যেন এর চেয়ে আনন্দের খবর আর নেই। যেন সবাই মনে মনে স্বপ্ন দেখছে, গিরিজাপ্রসাদ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের চেহারা বদলে যাবে। আর কোনও ভাবনা থাকবে না।

শুধু কি তাই ? গিরিজাপ্রসাদের সমবয়সীরা, এই গাঁয়েই যারা তাঁর সঙ্গে পড়াশুনো করেছে, বড় হয়েছে, তাদের মনে হয়েছে, গিরিজাপ্রসাদ ফিরে এলেই বুঝি সেই অতীতের হাসি-আনন্দের দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া যাবে।

নিত্য মল্লিক, গোপেন মোড়ল, যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই প্রশ্ন করে গিরীনকে।—গাড়ি-টাড়ির ব্যবস্থা করেছ তো। ছই লাগে তো বলো।

শুনেছে আর মনে মনে জ্বলেছে গিরীন। কিন্তু বুড়ি অট্টামাও যে এই রাতের বেলায় ঠুক ঠুক করে এসে হাজির হবে ঐ কথাটা ঝালিয়ে নিতে তা ভাবতে পারেনি।

বুড়িকে পৌঁছে দিয়ে এসে মরাইতলা থেকে রান্নাঘরের দাওয়া অবধি অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে গিরীন বলে উঠল, যত শালার গাঁয়ের লোকের হয়েছে ফুর্তি।

রান্নাঘরের আবছা আলোয় বসা মোহনপুরের বউয়ের উদ্দেশে বললে কথাটা। মোহনপুরের বউ একবার ফিরে তাকাল, তারপর জ্বালানি কাঠের ধোঁয়া লাগা চোখে আঁচল ঘসতে ঘসতে বললে, হুঁ।

গিরীন চটে উঠল।—তুমি তো হুঁ বলেই খালাস। আমার ইদিকে...

রুচিহীন রসিকতাটা শোনা অভ্যাস হয়ে গেছে মোহনপুরের বউয়ের, তাই মুখের ভাব তার বদলাল না।

শুধু বললে, আসছেই যখন, ভেবেচিন্তে কি হবে, ব্যবস্থাগুলো তো করো।

ব্যবস্থা করার অবশ্য ত্রুটি ঘটেনি। ওদিকের ঘরখানা মেরামত করিয়েছে গিরীন, পড়ে যাওয়া বৈঠকখানার চালাটাকে ঠেকা দিয়ে তুলে দাঁড় করিয়েছে, নতুন খড় দিয়ে ঘরামি ডেকে চাল ছাইয়েছে, সারকুড়ের সামনে একটা দেয়াল দেবার চেষ্টা করছে। শুধু অপ্রয়োজনীয় ঢেঁকিঘরের আশপাশের আগাছা জঙ্গল সাফ করতে বাকি।

গিরীন ভেবেছিল সময়মত সবই হয়ে যাবে। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন ভাবতে পারেনি। আর তাড়াহুড়োর মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই যখন যে যেচে এসে সাহায্য করতে চেয়েছে তখনই চটে গেছে। ছোট লাইনের স্টেশনে দু'খানা গরুর গাড়ি পাঠাতে লিখেছেন গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু গরুর গাড়ি দু'খানা থাকলেও ছই একটাই। তাই প্রথমটা যদিও চটে গিয়েছিল গিরীন, তবু শেষ অবধি নিত্য মল্লিকদের বাড়ি থেকেই আরেকখানা ছই চেয়ে আনতে হয়েছে।

কোটালদের খগু আর যতেকে ডেকে বার বার বলে দিয়েছে, সকাল সকাল এসে গাড়ি জুতে বেরিয়ে পড়বি, ট্রেনের টাইমের আগে আগে পৌঁছুতে হবে ইস্টিশানে।

তবু সকাল সকাল ওরা এসে হাজির হবে কিনা গিরীনের নিজেরও সন্দেহ ছিল। তাই রাতটা ভাল করে ঘুম হল না তার। ঘুমটা এসেছিল ভোরের দিকেই। কিন্তু সেই সাত সকালেই ঘুমটা ভেঙে গেল অট্টামার ডাকে।

অট্টামা তখনও ডাকছে, ও গিরেন, ও মোহনপুরের বউ, ও গিরেন !

ডাক শুনে গিরীন উঠে এল, গাড়ুর জলে চোখ ধুতে ধুতে বললে, কি হল কি ? এত ভোরে এসে ডাকাডাকি করছ কেম ?

অট্টামার ফোকলা-দাঁত মুখখানা হেসে উঠল। পাটকরুনি ঝিটা তখনই খিড়কির পুকুর থেকে একরাশ বাসন ধুয়ে নিয়ে ঢুকল।

তার দিকে তাকিয়ে অট্টামা বললে, মোহনপুরের বউ কোতায় লো ?

পাটকরুনি ঝিটা ঘোমটার আড়াল থেকে চোখের ইশারায় খিড়কির দরজাটা দেখিয়ে

দিলে—অর্থাৎ ঘাটে।

—যাক, উঠেছে বিছানা ছেড়ে? বলে গিরীনের দিকে তাকিয়ে হাসল অট্টামা। হাসিটার মধ্যে লুকোনো রসিকতাটুকু উপভোগ করার মত তখন মনের অবস্থা নয় গিরীনের। বললে, কি, ব্যাপারখানা কি বলো দিকি, ভোর রাত থেকে এসে চেঁচাচ্ছ কেন?

অট্টামা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল, এই দেখ ভাল করলে মন্দ হয়। কথায় বলে, 'ভাবুনি লো ভাবুনি, তোর ঘর পুড়ে যায়; যাক্ গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবুন বয়ে যায়।' সেই কথা। আমি কোতায় এলাম, গিরেনকে তুলে দিই গা, গাড়ি পাঠাতে হবে ইস্টিশানে, বেলা হল...

গিরীন বললে, সে তোমায় ভাবতে হবে না, খগু আর যতেকে বলে দিইছি, ও ঠিক টাইমে চলে যাবে ওরা গাড়ি নিয়ে।

অট্টামা তবু নড়ে না। বলে, এই বাবা! তা বললে কি চলে গিরেন? বিদেশ-বিভুঁই থেকে আসছে মানুষটা, সঙ্গে বউ-বেটা আছে, শেষে যে আতান্তরে পড়বে। নোকদের বলে দিয়ে কোন বিশ্বেস আছে রা।

বলেই লাঠি ঠুক ঠুক করে বৈঠকখানার দিকে চলে গেল অট্টামা, বিড় বিড় করতে করতে গেল, দেখি গা আবার, নোকরা এল কি না।

গিরীন শুনতে পেল বাইরে গিয়েও অট্টামা চিৎকার করছে, ওরে ও যতে, তোদের কি কোন কাণ্ডিজ্ঞান নাই রে? পেসাদ আসছে, তিন যুগ পরে আসছে সে, তাকে শেষকালে আতান্তরে ফেলবি?

খানিক পরেই আবার ফিরে এল অট্টামা। নিজের মনেই যেন বললে, যতে ছোঁড়ার কথা শোন গিরেন, শুধোচ্ছে আমার এত ছটফটানি কেন। বলি পেসাদ আসছে, অ্যাদ্দিন বাদে, তাই। তা নইলে আমার আবার কি। কথায় বলে, 'আসতেও একা যেতেও একা, কার সঙ্গে কার দেখা,' আমার হল সেই অবস্থা।

তারপর বললে, গিরেন বাবা, তুইও গেলে পারতিস।

গিরীন হেসে বললে, যাব গো যাব, ও গাড়ি যাবে ঘুর পথে, আমি মাঠে মাঠে চলে যাব অনেক আগে।

ওদিকে ততক্ষণে গাড়ি জুতেছে, হেট হেট করছে। তা শুনে অট্টামা আবার বেরিয়ে গেল। গাড়ির পিছনে পিছনে চলল লাঠি ঠুক ঠুক করে। নতুন গোড়ে, তালপুকুরকে পাশ কাটিয়ে গাড়ির পিছনে পিছনে গাঁয়ের শেষ সীমানা পর্যন্ত এসে দাঁড়াল অট্টামা। তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করলে, আসুক পেসাদ। গিরীন তো বলে, পেসাদ নাকি হিল্লিদিল্লি কতসব জায়গা ঘুরেছে। পেসাদের সঙ্গে কি পদ্মর আমাদের দেখা হয়নি কোথাও? নিজের মনেই মাথা নাড়লে অট্টামা, তারপর আবার বিড়বিড় করলে, সোমত্ত জোয়ান মেয়ে একটা। গাঁ ছেড়ে চলে গেল দপদপ করে পা ফেলে, কেউ একটা রা কাড়লে না গো।

দুই

গিরিজাপ্রসাদ নামলেন ট্রেন থেকে। গিরীনও এসে পৌঁছেছিল গাড়ি দুটোর পিছনে পিছনে। ট্রেন এসে থামতেই মুনিশ দুটোকে ডেকে মালপত্র নামাল গিরীন। নামল গিরিজাপ্রসাদের ছেলে আর মেয়ে দুটিও, গিরিজাপ্রসাদের স্ত্রীও।

ছোট লাইন, ছোট ছোট ট্রেনের কামরা, আরও ছোট স্টেশন। ফ্ল্যাগ স্টেশন। না আছে স্টেশন-মাস্টার টিকিট-চেকার, না কুলি-খালাসি। শুধু একখানা দরজাবিহীন এক-ইটের দেয়াল-ঘেরা ঘর পড়ে আছে নির্জন তেপান্তরে। আগে এ-টুকুও নাকি ছিল না, চারপাশের গাঁয়ের লোক অনেক লেখালেখি করে, আপিল দরখাস্ত করে তবে এই ব্যবস্থাটুকু করতে পেরেছিল। অর্থাৎ যাত্রী থাকলে তবেই ট্রেন থামবে, নচেৎ বাঁশি বাজিয়ে চলে যাবে। বাঁশি নয়, যেন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি। তার জন্যে গাঁয়ের লোকেদের সম্মানে যেন ঘা লাগে, একটা আক্রোশও তাই লুকিয়ে আছে তাদের মনে।

গিরিজাপ্রসাদের ছোট মেয়ে কমলা এই প্রথম এল নিজেদের দেশ-গাঁয়ে। বিমলাও প্রায় তাই। পাঁচ বছর আগে দিন কয়েকের জন্যে সে একবার এসেছিল বটে, কিন্তু কোন কথাই তার স্পষ্ট মনে নেই।

ট্রেন থেকে নেমেই চারপাশে তাকিয়ে কোথাও কোন জনমনিষ্যি না দেখে কমলা খিলখিল করে হেসে উঠল। —একি স্টেশন রে দিদি ?

বিমলাও হাসল, কিন্তু ওর মত খিলখিল করে সশব্দে নয়। কমলার মত ছেলেমানুষ নয় ও আর। হাঁটা-চলায় একটা ছন্দ এসেছে, কথায় হাসিতে সংযত ভাব। তাকাল সে একবার দাদার দিকে—অমরেশের মুখের দিকে, তারপর ঠোঁট টিপে হাসল। অমরেশকে দেখে কিন্তু মনে হল এর মধ্যে কৌতুক খুঁজে পাচ্ছে না ও। বরং বিরক্তই হয়েছে।

ইতিমধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে আবার হুইসল বাজিয়ে, গরুর গাড়ির মতই ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে, পিছনের কামরা থেকে ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে ফ্ল্যাগসুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে গার্ড বললে, টিকিটগুলো দিন, টিকিটগুলো।

টিকিটগুলো হাতেই ছিল, হাত বাড়িয়ে দিয়ে দিলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে কমলা বিমলা দু'বোনই সশব্দে হেসে উঠল।

গিরীন ততক্ষণে দাদা-বৌদিকে প্রণাম করে কুশল শুরু করেছে।

কমলাদের হাসি দেখে গিরীন বললে, অজ পাড়াগাঁয়ে থাকি আমরা, হাওড়া স্টেশন পাবি কি করে এখানে ?

প্রশ্ন শুনে কমলা আর বিমলা হাসি থামিয়ে প্রণাম করল গিরীনকে। অমরেশও করল, তবে অনিচ্ছার সঙ্গে।

কাকা বটে, তবু গিরীনকে দেখে তার ঠিক যেন কাকা বলে সম্মান করতেও বাধছে। এই কাঁচাপাকা চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, কাছার চেয়ে কোঁচাটা খাটো, রোগা রুক্ষ চেহারা—এই মানুষটাকে কাকা বলে পরিচয় দিতে যেন তার আপত্তি।

গিরিজাপ্রসাদ নিজেও অবশ্য গিরীনকে লক্ষ করেছেন। লক্ষ করেই বললেন, তুই যে আমার চেয়েও বুড়িয়ে গেছিস !

গিরীন হাসল। কিছু বললে না। হয়তো মনে মনে ভাবলে বুড়িয়ে যাওয়াই তো নিয়ম এখানে। মাটিকে সরস করতে গিয়ে শরীরের রস যে নিঙড়ে ঢেলে দিতে হয়—তাই অকাল বার্ধক্য এখানকার চিরন্তন রীতি।

কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ আর কোন কথা বললেন না। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন

দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া সরু রেল লাইনজোড়ার দিকে তাকিয়ে, নির্জন স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে, দূরের সেই বাজে পোড়া বটগাছটার দিকে তাকিয়ে, সাঁওতাল পাড়ার এক কোণের সেই পলাশ গাছটার দিকে তাকিয়ে।

কয়েকটা মুহূর্তমাত্র, তারপরই গিরিজাপ্রসাদের মনে হল যেন তাঁর জীবনের ঘড়ি হঠাৎ থেমে গেল। সময়ের পা থেমে গেল চিরদিনের জন্যে। সারা জীবন ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে হয়েছে, চঞ্চল ব্যস্ততার মধ্যে যে জীবন কাটিয়ে এসেছেন, এই দু'দণ্ড আগেও যিনি তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরেছেন, তাড়াহুড়ো করে ট্রেন থেকে মালপত্র নামিয়েছেন—স্ত্রীকে, ছেলেমেয়েদের, তাঁর যেন হঠাৎ মনে হল সময়ের আর কোন দাম নেই। রয়ে বসে, ধীরেসুস্থে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন উপভোগ করতে পারবেন, জিরিয়ে জুড়িয়ে চুমুক দিতে পারবেন এবার জীবনের পেয়ালায়, বিলম্বিত লয়ে।

কর্মজীবনে একটা মুহূর্ত অবসর পাননি। ঘড়ি ধরে চলতে হয়েছে সারাটা পথ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা বেঁধে। ঘড়ি ধরে ঘুম থেকে উঠেছেন, ট্যুইশনিতে বেরিয়েছেন, ইস্কুলে গেছেন, আবার ক্লান্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেই ছাত্রদের নিয়ে নিজের ঘরেই পড়াতে বসতে হয়েছে। শিক্ষকের মহান আদর্শে লক্ষ রেখে জীবন শুরু করেছিলেন, শিক্ষকতাকে ভেবেছিলেন সাধনা। কিন্তু সংসারের আর পাঁচজনের সাধ মেটাবার দায়ে অবসর সময়টুকুকেও খরচ করে দিতে হয়েছে। গ্রীষ্মদিনের মরা পুকুরের শেষ জলবিন্দুকে যেমন ভাবে ভবিষ্যতের আশায় চাষীরা খরচ করে বসে জমিতে সেচ দিয়ে।

সব রস নিঃশেষ করে ফেলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু মাঠ ভরেনি ধানে ধানে। ব্যর্থ নিঃস্ব জীবন নিয়ে তাই আজ আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে যেখান থেকে একদিন অনেক আশা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই। এর চেয়ে দুঃখের কি থাকতে পারে তাঁর জীবনে! এই বনপলাশি গ্রাম—শৈশব আর প্রথম যৌবনোন্মেষের দিনগুলির রঙিন স্মৃতিতে ঘেরা গ্রাম, কতদিন কর্মক্লান্ত অবসন্ন শরীরে স্বপ্ন দেখেছেন এখানে ফিরে আসার। ভেবেছেন, এখানে ফিরে এলেই বুঝি ফেলে-আসা জীবনের সেই রসমধুর দিনগুলিতেও ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু এমনভাবে আসতে হবে কোনদিন মনে হয়নি।

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে—অবসর কি তিনি নিতে চেয়েছিলেন? না, গিরিজাপ্রসাদের ধারণা চাকরি থেকে কেউ অবসর নিতে চায় না। প্রথম জীবনে একবার বেকার হয়েছিলেন, আজ আবার বেকার হয়ে গেছেন। উপার্জন নেই, কিন্তু দায়দায়িত্ব কমেনি। যে-কটা টাকা পেয়েছিলেন আয়-ব্যয়ের চড়াই-উতরাই পার হতে গিয়ে দেখেছেন সে সামান্য সঞ্চয় কখন চড়ুই পাখির মত চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গেছে।

আর মাত্র সামান্যই বাকি। তাই শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন গিরিজাপ্রসাদ, ফিরে এসেছেন শেষ ক'টা দিন এখানেই শেষ করে যেতে। বিঘে কয়েক জমি আছে বটে, কিন্তু এতদিন তার খোঁজ রাখেননি। এমনকি স্ত্রী যখন বার বার খোঁজ রাখতে বলেছেন, তখনও হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, গিরীনের অত বড় সংসারটার কথাও তো ভাবতে হবে।

স্ত্রী বেঁকে দাঁড়িয়েছে কখনও-কখনও, তোমার সংসারটা বড় নয়? নাকি পাঁচশো হাজার মাইনে পাও তুমি? সারা জীবন পাবে?

গিরিজাপ্রসাদ স্ত্রীর রুষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছেন। বলেছেন, মুশকিল কি জানো, গিরীন যে তাই ভাবে!

এক-একবার নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু পরক্ষণেই অবনীমোহনকে মনে পড়ে গেছে।

বর্মায় গিয়ে বড়লোক হয়েছিল অবনীমোহন, তারপর কলকাতায় ফিরে বাড়ি করেছে।

তার বাড়িতে একবার গিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু লোকটাকে পছন্দ করতেন না, গাঁয়ের কেউই পছন্দ করত না। প্রতি বছর ধানের সময় এসে ধানবেচা টাকা নিয়ে চলে যেত অবনীমোহন।

লোকে হাসাহাসি করে বলত, ও আমাদের ইংরেজ গরমেন্ট গো, গাঁয়ের টাকা গাঁয়ে রাখবে না, কলকাতায় চালান দিয়ে দেয়।

সত্যি কথাই। গাঁয়ের পুজোপার্বণ, যাত্রা, অষ্টপ্রহর কোন কিছুতেই থাকত না অবনীমোহন, এমনকি মেলা-তলার বারোয়ারি চাঁদাটুকুও দিত না খড় ছাওয়ার জন্যে। বলত, জমির খাজনা দিই, জলকর দিই, আবার কিসের চাঁদা। গাঁয়ে থাকি ক'দিন যে চাঁদা দেব।

মনে মনে তাই সকলেরই একটা আক্রোশ ছিল তার ওপর। এমন কি গিরিজাপ্রসাদেরও। তাই তিনি কোনদিন নিজের প্রাপ্য আদায়ের কথা ভাবতে পারেননি। গাঁয়েই যদি না থাকি তো চাষের ধান আদায় করব কোন আইনে!

সেই গিরিজাপ্রসাদকেও কিনা শেষ অবধি ফিরে আসতে হল। কিন্তু ফিরে আসতে হচ্ছে বলেই মনে তাঁর একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ থেকে গিয়েছিল। সেটা মুহূর্তে মুছে গেল গিরীনের আপ্যায়নে।

গিরীনের মন থেকেও বিরক্তিটুকু সরে গিয়েছিল। এতগুলি আত্মীয়জনকে কাছে পেয়ে সেও যেন খুশি হয়ে উঠেছে হঠাৎ।

পরম উৎসাহে মুনিশ দুটোকে ডেকে জিনিসপত্র গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করলে।

কমলা আর বিমলা গরুর শিঙ নাড়া দেখে ভয় পাচ্ছিল, কৌতুকের চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে গরুটাকে সরিয়ে দিল সে হেট হেট করে, তারপর ওদের দু'জনকে তুলে দিল গাড়িতে।

নিভাননীকে বললে, তুমিও উঠে পড়ো বউঠান।

গাড়িতে তুলে ওদের রওনা করে দিল গিরীন। বললে, তোমরা চল, আমি আলে আলে চলে যাব সরান পার হয়ে।

—তুইও তো উঠলে পারতিস। গিরিজাপ্রসাদ বললেন।

গিরীন ঘাড় নাড়লে।—আমি তোমাদের আগে পৌঁছে যাব। বলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পথটুকু পার হয়ে সাঁওতাল পল্লীটার পাশ দিয়ে বাঁক নিল।

গিরিজাপ্রসাদ মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন গিরীনের ব্যবহারে। মনের মেঘ কেটে গেল, সঙ্কোচ।

এদিকে গাড়ি দুটো ধীরে ধীরে বাজপড়া বটগাছটার পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

রুক্ষ ধুলোমাটির রাস্তা, রুক্ষ সাদা মাটির ফাটা মাঠ, মাঝে মাঝে আকন্দর ঝোপ, বৈঁচি, বুনোকুলের ঝোপ। কাটা ধানের মাঠে মাঠে নির্জন দ্বীপের মত দু'-এক টুকরো সবুজ সব্জির ক্ষেত, কোথাও বা আখের, আর সাদা কাশ আর সরের ঢেউ।

শৈশবের সেই দিনগুলো যেন বার বার উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু পরিবর্তনও চোখে পড়েছে গিরিজাপ্রসাদের। অপ্রশস্ত ট্রেনের কামরায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে বসেও অনেক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছেন। ডি. ভি. সি.-র ইলেকট্রিক তারের সারি ঘাড়ে নিয়ে আকাশ-ছোঁয়া লোহার থামগুলো যেন রণপা ফেলে ফেলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গেছে—এক সারি অতিকায় দৈত্যের মত।

তাই খুশি মনেই গিরিজাপ্রসাদ জিগ্যেস করেছেন, গাঁয়ের চেহারা একেবারে বদলে গেছে, না রে যতে?

যতে কোটাল গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে বলেছে, আজ্ঞে ? অর্থাৎ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

গিরিজাপ্রসাদ বলেছেন, ঐ সব মাঠের পর মাঠ পার হয়ে ইলেকট্রিকের তার গেছে...

যতে হেসে উঠেছে। —ও আজ্ঞে, বেল পাকলে কাকের কি বলে না, সেই বিত্তান্ত। আজ্ঞে, ইলেকট্রি নিয়ে হবে কি বলেন, খোড়োচালে বিজলি বাতি জ্বলবে ? উ সব আপনাদের শহর বাজারের নেগে।

কথাটা মিথ্যে নয়। গিরিজাপ্রসাদের উৎসাহ নিবে গেছে যতে কোটালের কথায়। তবু নিজের কথার খেই ধরে বলেছেন, কিন্তু ক্যানেল তো হয়েছে, জলের জন্যে তো আর চাষ বন্ধ থাকে না।

যতে কোটাল হেসেছে আবার, তারপর বাঁ হাতে পাঁচনটা নিয়ে গরুর পিঠে ঠাস ঠাস করে দু'বার বসিয়ে দিয়ে ল্যাজ মুড়ে হেট হেট করতে করতে বলেছে, ক্যানেল বলছেন ? হাঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু জলকষ্ট যায় নাই গো।

—কেন ? বিস্মিত হয়ে নিভাননীও প্রশ্ন করেছেন।

যতে কোটাল সুর দিয়ে গেয়ে উঠেছে, লদী কাটল সরকারে, তার খাজনা জোগাও দরবারে।

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বলেছেন, তা জল নিবি খাজনা দিবি না ?

যতে কোটাল এবার আর হাসেনি। যেন অভিযোগের স্বরেই বলেছে, ক্যানে দোষ আজ্ঞে, বিচারটা কেমন হল আপনার। হোই যে আপনার মাঠের পুকুর রয়েছে, সেচের পুকুর রয়েছে, খাজনা লেয় না ওর ? জলকর লেয় না ? তা পুকুরগুলোন বুজে গেল কার দোষে, সরকারের লয় ?

গিরিজাপ্রসাদ যুক্তি খুঁজে পান না এ-কথার। তাই কথা ঘুরিয়ে বলেন, কিন্তু জল তো পাচ্ছে গাঁয়ের লোক, খাজনা দিয়েও তো মিলছে।

আবার হেসে উঠেছে যতে কোটাল। সুর টেনে টেনে গেয়েছে :

লদী কাটল সরকারে
তার খাজনা জোগাও দরবারে।
বলি রাজা, তুমি শুখোর বছর জল দাও না কেনে,
রাজা বলেন, মোর টিবির বাঁধে জল জমে নে,
জল জমে নে, গজের কাঠি মেনে।

বলেই যতে কোটাল অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে। বলেছে, টিবির বাঁধ আজ্ঞে বুঝলেন তো ?

কমলা আর বিমলা অতসব গূঢ় অর্থ বুঝতে চায় না। তারা হেসেই কুটিকুটি।

গিরিজাপ্রসাদ অবশ্য বুঝতে পেরেছেন, টিবির বাঁধ মানে ডি. ভি. সি.-র বাঁধ। তবু গান শুনে তিনিও হেসেছেন। উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, বাঃ, গানের গলা তো বেশ তোর।

যতে কোটাল বাধা দিয়ে বলেছে, ই আজ্ঞে গান না, ই হল কান্না, চাষীর কান্না। এই দেখেন না, শুখোর বছর হলে ভাদর পার হবে তবু জল ছাড়বে না, আর যদি মেঘ হল, বিষ্টি হল ঝামুরঝুমুর, তখন ক্যানেলের জল দিয়ে দেশ ভাসিয়ে দেবে, বান ডাকিয়ে দেবে।

গিরিজাপ্রসাদ এতক্ষণ যে স্বপ্ন দেখেছেন, যে আশায় পুলকিত হয়েছিলেন, যতে কোটালের কথায় যেন মুহূর্তে তা নিবে গেল। হতাশ সুরে বললেন, তবে আর কি লাভ হলো রে ?

—তা হয়েছে আজ্ঞে। গরুর ল্যাজ মুড়তে মুড়তে বলে যতে কোটাল। বলে, ক্যানেল কেটে সাপ এয়েছে, ইয়া মস্ত মস্ত পাহাড়ি সাপ, ইদিকপানে ছিল না আগে, এখন

আসছে জলে জলে।

—সাপ ? কমলা বিমলা দু'জনেই একসঙ্গে আঁতকে ওঠে।

যতে কোটাল হাসে।—হ্যাঁ দিদি, সাপ। সাপের দংশনে আজকাল নোক মরছে তো মরছেই। ইয়া মস্ত সাপ, বাপের কালে দেখিনি আজ্ঞে।

বলেই আবার গলা ছেড়ে গান জুড়ে দেয়—

বলি রাজা, কলির রাজা
জল দিবে না কেনে দিব ট্যাক্সো,
রাজা বলেন, প্রেজার বেটা,
জল দিইনি, সাপ দিয়েছি একশো।

এবার সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। এমন কি অমরেশও। গাঁয়ে ফিরতে হচ্ছে বলে মন-মেজাজ তার প্রথম থেকেই বিগড়ে আছে, একটাও কথা বলেনি। বিশেষ করে বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে।

কিন্তু সুরটা বড় ভাল লেগে গেছে গিরিজাপ্রসাদের। ঠিক যেন বংশীর মত গলা। সেই কোন ছোটবেলায় শুনেছেন, এখনো যেন কানে লেগে রয়েছে।

নিজের মনেই যেন বললেন, আহা বড় মিষ্টি গলা রে তোর, যতে। এ গান কে বেঁধেছে, তুই ?

যতে হেসে বললে, সি কে বেঁধেছে জানি না আজ্ঞে। ই গান সবাই জানে, গাঁয়ের সবাই।

কিন্তু গানের কথাগুলিই নয়, গলার সুরটা তখনো গিরিজাপ্রসাদের কানে লেগে আছে। এমনি আরেকটা গানের কলি মনে পড়ছে গিরিজাপ্রসাদের, কি মিষ্টি সে গলা, কি সুন্দর ভঙ্গি গায়কের—

সেই পুরনো দিনের স্মৃতিতে ঘেরা গ্রাম, আঁকাবাঁকা পথ, দূরে সাঁওতালপাড়া, একটা টিউবওয়েল হয়েছে নতুন, নতুন দিঘির পারের সেই আমবাগান—স্বপ্নের ঘোরে যেন পিছন পানে হেঁটে চলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, ফেলে আসা শৈশবের দিনগুলিতে। কত মুখ ভেসে উঠছে চোখের সামনে, কত কথা, গান, কণ্ঠস্বর।

জীবন কি তেমনি মধুর হয়ে উঠবে আবার ? বংশী, বংশীকে মনে পড়ছে তাঁর। যতে কোটালের গান বংশীর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে তাঁকে। রুপোর কথা, বংশীর শালাবউ সেই ছিমছাম শ্যামলা রঙের সুন্দর মেয়েটি, নিত্যদিন যে ক্ষার দিয়ে কাচা সাদা কাপড়টি পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসত। বংশী আর রুপো আর শালাবউ।

স্বপ্নের ঘোরে যে কতক্ষণ কেটে গেছে গিরিজাপ্রসাদ নিজেও টের পাননি। তন্ময়তা ভাঙতেই দেখতে পেলেন, অনেকখানি পথ চলে এসেছে গাড়ি দুটো, আর যতের পিছনে ছইয়ে ঠেসান দিয়ে বসে উদাস চোখ মেলে যে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, চোখের সামনে দিয়ে যে কত কি ভেসে গেছে, সেই তালগাছের সারি, মল্লিকদের পোড়ো দালান, আরো কত কি, কিছুই যেন লক্ষ করেননি এতক্ষণ।

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। ধীরে ধীরেই যতেকে প্রশ্ন করলেন, বংশী বেঁচে আছে রে ?

—কে বংশী ?

—তোদের বংশী, বংশী কোটাল। গান গাইত...

—তাই বলেন। কেত্তনে-বংশীর কথা বলছেন গো ?

গিরিজাপ্রসাদ সায় দিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেত্তনে-বংশী।

যতে হাসল।—বংশী কোটাল লয় গো, উনি হলেন কেত্তনে-বংশীদাস। কিন্তুক সে

গলা আর নাই গো, নোকে গান শুনে উঠে পালাবে আজ্ঞে এখন।

কথাটা শুনে আহত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। বিস্মিতও। অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলেন, বংশীর গান শুনতে চায় না কেউ ?

—না আজ্ঞে, গলা নাই তো শুনবে ক্যানে বলুন ? নোকে হাসিতামাশা করে। ব্যঙ্গ করে ওনার গানকে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ। কেত্তনে-বংশী, বংশীদাসের কীর্তন কেউ শোনে না ?

তিন

একে একে অনেকেই এল দেখা করতে—হৃদয় মোড়লের ছেলে গোপেন মোড়ল, নিত্য মল্লিক, চাটুজ্যেদের দু'ভাই হংস আর পঞ্চে, এবং গাঁয়ের আরও পাঁচজন।

এল না শুধু একজন। অট্টামা।

সকলেই বিস্মিত হল। গিরীন বললে, বুড়ির বোধহয় অভিমান হয়েছে, নিজে দেখা করতে আসবে না।

যতে কোটাল গরু দুটো গোয়ালে বাঁধতে নিয়ে যাচ্ছিল, থেমে দাঁড়িয়ে বললে, তাই বটে। ভোর রাত থেকে খ্যাঁচর খ্যাঁচর করছে, টেশনে যা যতে, দেরি হলে লোকটা আতান্তরে পড়বে...বুড়ির মনটা ভারী লরম গো।

শুনে মনটা খুশি হল গিরিজাপ্রসাদের। বললেন, যাব যাব, নিজেই গিয়ে দেখা করে আসব।

গিরীন বললে, তেতেপুড়ে এলে, এখন একটু থে-থাম হও, যাবে এখন বৈকালের দিকে।

নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে মোহনপুরের বউ এক ঘটি জল হাতে এসে দাঁড়িয়েছিল, ফিসফিস করে নিভাননী আর ছেলেমেয়েদের ভিতর-বাড়িতে যেতে বললে।

তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিভাননী পায়ে জল ঢেলে হাতে গামছা দিয়ে একটা মাদুর বিছিয়ে দিলে বসতে। তারপর হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে কুশল-অকুশল নিতে শুরু করলে।

গিরিজাপ্রসাদও সকলকে বিদায় দিয়ে ভিতর-বাড়িতে এলেন। ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ বুজে আসছিল তাঁর।

ভিতরে আসতেই ছোট মেয়ে কমলা জিগ্যেস করল, অট্টামা কে বাবা ?

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন। —দেখিসনি তাকে ? যাব যখন বিকেলে নিয়ে যাব তোকে।

বিকেলে নিজে থেকেই দেখা করতে যাবেন ভেবে রেখেছিলেন, কিন্তু তার আগেই এসে হাজির হল অট্টামা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। একটানা এতখানি ট্রেনে এসেছেন, ওঠানামা করতে হয়েছে, ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অট্টামার গলার স্বরে। —কই রে, পেসাদ এয়েছে ? অ মোনপুরের বউ, পেসাদ আমাদের এয়েছে লো ?...অ্যাঁ, এয়েছে পেসাদ, আর আমায় একটা খপর দিলি না বউ ?

গলার স্বর শুনেই চিনতে পারলেন গিরিজাপ্রসাদ। ধড়মড় করে উঠে বসলেন তক্তপোশের ওপর, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন।

মোহনপুরের বউ ঘোমটা টেনে আড়ালে সরে গেল।

গিরিজাপ্রসাদ বেরিয়ে এসে দেখলেন লাঠি ঠুক ঠুক করে বুড়ি এগিয়ে আসছে। এর আগের বার এসে দেখেছিলেন অট্টামার শরীরটা দড়ির মতন পাকিয়ে গেছে। এবার যেন আরও রোগা লাগল, আরও শুকনো। কাঠির মত কয়েকটা সরু সরু হাড়, চামড়ার তলায় মাংস নেই, শুধু ফোলা ফোলা কয়েকটা শিরা উঠে আছে সর্ব শরীরে। ফর্সা আর সুন্দর সেই ছোটমার মুখখানায় শত সহস্র ভাঁজ পড়েছে। একটুকরো রাংতাকে মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ভাঁজ খুলে যেমন দেখায়। আর দেখে মনে হল চোখে ছানিও একটু পুরু হয়েছে এ-ক'বছরে।

গিরিজাপ্রসাদ বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে ছোটমা, তোমার কাছেই যাব যাব ভাবছিলাম।

অট্টামার দন্তহীন মুখখানা মুহূর্তের জন্যে হাসিতে ভরে উঠল। তাঁর স্থির চোখজোড়া কিছুক্ষণ ঠায় তাকিয়ে রইল গিরিজাপ্রসাদের মুখের দিকে।

তারপর বললে, তোমাদের ও ভাবাই সার, বাবা। সেই যে বলে না, 'হাসতে গিয়ে কান্না এল, কাঁদতে গিয়ে হাসি, দূর থেকে তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি,' তোমাদের সবারই ওই বিত্তান্ত।

বলেই হেসে উঠল অট্টামা।—না রে না, পেসাদ আমায় সত্যি ভালবাসে। আমি যে ওর ছোটমা। তা, ইটি কে রে, বিটি নাকি?

কমলা আর বিমলার চিবুকে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলে অট্টামা।—রাঙা টুকটুকে বর হোক, দিগ্যজীবী হও।

অমরেশও গিয়ে প্রণাম করলে, অনিচ্ছার সঙ্গেই। আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টামা তাকে হেসে জড়িয়ে ধরল। তার চিবুকে হাত দিয়ে সে-হাত নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে চুকুক করে চুমু খাওয়ার মত একটা শব্দ করল অট্টামা।—বড় বেটা নাকি?

—না গো, সে রেলে কাজ করে, ছুটি পায়নি। এটি ছোট।

অট্টামা হাসল।—ও বাবা, এত বড়টি হয়েছে? চোখে ছাই আজকাল পষ্ট দেখতেও পাই না। বলে হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরল অমরেশকে। খুশিতে ডগমগ ফোকলা মুখে ছড়া কাটল, 'সেজেগুজে রইলেন রাই, তা এ লগ্নে বিয়ে নাই।' জানো ভাই, তোমার জন্যই সেই সকাল থেকে নতুন গোড়ের পাড়ে ডাঁড়িয়ে ডাঁড়িয়ে কোমরে দরজ হয়ে গেল, ফিরে এসে শুলাম একটু, কোটালবউকে বললাম, বউ, পেসাদের গাড়ি এলে আমায় উঠিয়ে দিস। তা 'মাগির সকল দিন হাটেবাটে, রাত হলে ঘোমটা আঁটে,' সারা দিন টুঁ শব্দ পেলাম না গো। হংসর মা ভাত পাঠিয়ে দিয়েছিল, খেয়ে ক্যাঁথা মুড়ি দিয়ে একটুন শুয়েছি, তন্দা মতন এয়েছে, তা হঠাৎ এসে বাপু দিলে আমার ঘুমের নেতার মেরে। বললাম, বুড়ো মানুষ, রেতে ঘুম হয় না, ওঠালি ক্যানে? তা বললে, তোমার পেসাদ এয়েছে।—বলে একমুখ হেসে উঠল।

অনর্গল কথা বলতে বলতে এবার থামল বুড়ি।

মোহনপুরের বউ ততক্ষণে একটা আসন পেতে দিয়েছে। অট্টামা ধীরে ধীরে মাটিতেই বসল আসনটা সরিয়ে দিয়ে।

তারপর বলল, তা নাতি আমার জন্যে কি এনেছে বল্। মিঠাই মণ্ডা এনেছিস?

কমলা আর বিমলা এতক্ষণ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল বুড়ির কথায়। হাসি থামিয়ে বিমলা বললে, আপনার জন্যে প্যাড়া এনেছে ঠাকুমা, বসুন দিচ্ছি।

অট্টামা হাসলে।—নাতনীর আমার ঠাট্টা হচ্ছে। ও সব প্যায়রা ট্যায়রা খাবার কি আর দাঁত আছে রে ভাই। বলি, 'সে দিন আর নাই রে নাতি, মিঠাই খাওয়া পাত পাতি।'

অট্টামার কথা শুনে এবার সবাই হেসে উঠল।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, পেয়ারা নয় ছোটমা, প্যাড়া, প্যাড়া। দেওঘরের প্যাড়া এনেছি তোমার জন্যে।

নিভাননী ততক্ষণে একটা রেকাবিতে করে দুটো প্যাড়া আর এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিয়েছেন। আর বিমলা বলেছে, এই দ্যাখো, এর নাম প্যাড়া।

অট্টামা প্যাড়াটা ভাঙবার চেষ্টা করল, তারপর ছোট্ট একটা টুকরো মুখে পুরে চুষতে চুষতে বললে, এই তোমার মিঠাই? হায় রে—'হাভাতের বাপের দেশ, বীচেকলাও সন্দেশ।' নাতি, আমরা হলাম বদ্দমানের নোক। রাজা ছিলেন সীতেনাথ রায়, নিকুঞ্জ ময়রাকে ডেকে বললেন, সব মিঠাই খেয়েছি, নতুন কিছু খাওয়াও। তা নিকুঞ্জ ময়রা এনে দিলে মিঠাই, বললে, আপনার নামে নাম দিয়েছি সীতেভোগ। রাজা বললে, ভোগ কোথায়, এ তো আলো চালের ভাত! এ দেশের নোক রাজাকে বোকা বানায় বুঝলে নাতি? এ তোমাদের কাশীর চিনিব কদমা কি আমাদের মুখে রোচে!

গিরিজাপ্রসাদ হেসে সায় দিলেন। বললেন, তারপর তোমার শাঁকটিগড়ের ল্যাংচা?

অট্টামা খুশিতে মাথা নাড়লে।—যা বলেছিস। কালনার ভঞ্জ, খোঁড়া ছিল মানুষটা, লোকে বলত ল্যাংচা, তা এমন জিনিস বানালে, তার নামেই নাম হয়ে গেল ল্যাংচা। মিঠাই মণ্ডা আমাদের শেখাস না রে। যাস আমার ঘরে, সিঁড়ির নাড়ু আছে দোব, তোদের এই বিলিতি মণ্ডার চেয়ে ভাল। মুখে দিতে না দিতে মোয়ার মত মিলিয়ে যাবে।

বলেই লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠতে গেল অট্টামা।

কমলা-বিমলা বুড়িকে টেনে বসাল।—উঠছ কেন ঠাকুমা, বোসো, একটু গল্প করি...

বুড়ি হাসল।—ঠাক্‌মা নয় লো, ঠাক্‌মা নয়, বল অট্টামা। তোদের খুড়োও বলে অট্টামা, তোদের বেটাবেটি হলেও বলবে অট্টামা। শুধু তোর বাপের কাছে আমি 'ছোটমা'। কি বলো পেসাদ!

বলে আবার বসে পড়ল। বললে, অষ্টমঙ্গলার দিন এয়েছিলাম এ পিথিমেতে, তাই নাম হয়েছিল অষ্টভুজা। মা ডাকত অষ্টা বলে। তা শ্বশুরবাড়ি তখন ভরভরাট, গণ্ডা গণ্ডা বউ ভাইভায়াদদের নিয়ে, তিন বউ ভাশুরের, এক হাঁড়িতে রান্না। তা ভাশুরপোকে কোলে-পিঠে মানুষ করছি তখন, সবার দেখাদেখি সেও ডাকত অষ্টামা বলে, অষ্টা তো বেরুত না, তিন বছর বয়েস তখন কৈলেসের, তাই ডাকত অট্টামা বলে। সেই থেকে গাঁসুদ্ধ ডাকতে শুরু করলে অট্টামা। বলে ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে হি হি করে হাসল বুড়ি।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল অট্টামা। চোখ ছলছল করে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, সেই কৈলেসরা এখন দুটি ভাত দেয় না। সব সম্পত্তি নেকাপড়া করে দিলাম ওদের, কত যত্নআত্তি করত তখন বউরা, এখন কেউ খোঁজখবরও নেয় না দিদি। হংসর মা দুটি ভাত পাঠিয়ে দেয় তবে দু'বেলা অন্নাহার হয়।

এমনি অনর্গল সব কথা বলে যায়। কখনও খেদ, কখনও অভিযোগ, কখনও বা নিজের কপালকেই দোষ দেয়।

তারপর যাবার সময় বলে, পেসাদ, সাঁঝবেলায় একবার যাবে বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটু পরামশ্য আছে।

গিরিজাপ্রসাদ সায় দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব বৈকি।

—এসো ছেলে, আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব মানিক। বলে ঠুক ঠুক করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে অট্টামা বেরিয়ে গেল।

আর কমলা-বিমলা, নিভাননী সবাই হেসে উঠল। মোহনপুরের বউও কপাটের

আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় গুঁজে হাসল। ভাশুর রয়েছেন উঠোনে, হাসির শব্দ শুনতে পাবে যে।

অট্টামার বাড়ি যাবার অনুরোধটা গিরিজাপ্রসাদ ভেবেছিলেন নেহাতই কথার কথা। কি আর পরামর্শ থাকতে পারে বুড়ির। সমস্ত সম্পত্তি ভাশুরের ছেলেদের নামে লেখাপড়া করে দিয়েছে, তারা এখন খোঁজখবর নেয় না, ইস্টিশনে ধানচালের ব্যবসা করে আর বছরে দু'বার ভাগে দেওয়া জমির ধান বেচে টাকা ক'টা নিয়ে যায়...এইসব অভিযোগ শোনাবার জন্যেই হয়তো তাঁকে এত ডাকাডাকি। গিরিজাপ্রসাদ তাই ভেবেছিলেন।

কিন্তু একবারও ভাবতে পারেননি অট্টামা এমন একটা অদ্ভুত অনুরোধ জানাবে। হাতে ধরে এমন একটা প্রতিশ্রুতি চেয়ে বসবে।

অনুরোধটা শুনে চমকে উঠেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। সারা শরীর তাঁর শিউরে উঠেছিল। এতদিন বাদে, এত বছর পরে এমনভাবে যে অকস্মাৎ অট্টামার জীবনের সব রহস্য তাঁর চোখের সামনে উদঘাটিত হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি।

ব্যথায় দুঃখে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসেছিল তাঁর। অট্টামার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা দেখেও এত দুঃখ হয়নি।

তবে মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। চৌকাঠ পার হয়েই সারা শরীর রি-রি করে উঠেছিল একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে। ঘরের চালা ভেঙে পড়েছে, গরুতে গলা উঁচিয়ে চালার খড় টেনে নামিয়েছে। উঠোনের এক কোণে নর্দমা বন্ধ হয়ে গেছে শ্যাওলা জমে, আর সেই পচা জলে বিশ্রী দুর্গন্ধ।

—ছোটমা। চৌকাঠ পার হয়েই ডাকলেন গিরিজাপ্রসাদ।

বার কয়েক ডাকার পরই গায়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে বেরিয়ে এল অট্টামা। প্রথমটা ভাল করে দেখতে না পেয়ে বললে, কে?

—আমি পেসাদ, আসতে বলেছিলে...

—কে পেসাদ? আয় বাবা আয়। ঘরে আয়। বলে গিরিজাপ্রসাদকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর বসাল অট্টামা।

ঘরের মধ্যেও একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। শতচ্ছিন্ন নোংরা বিছানা, একটা তেলচিটে নোংরা বালিশ থেকে তুলো আর তুলোর বীজ বেরিয়ে পড়েছে, আর ছেঁড়া তোশকটা তেলে-জলে শুকিয়ে শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছে। এককালে তার ওপর অনেক বাচ্চা ছেলে শোয়ানো হয়েছে, তার চিহ্ন সর্বাঙ্গে।

চারপাশে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল গিরিজাপ্রসাদের। এই পরিবেশে, এই অন্ধকার দুর্গন্ধময় দারিদ্র্যের আর অবহেলার মধ্যে এক মুহূর্ত বসতেও যেন অসহ্য লাগে। কষ্ট হয়।

তবু বিছানাটার একপাশে গিয়ে বসলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টামা যেন তাঁর আপ্যায়নের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। গিরিজাপ্রসাদকে কি ভাবে খুশি করবে খুঁজে পাচ্ছে না যেন।

বারকয়েক কৌশল্যার উদ্দেশে ডাক দিল অট্টামা। —ওলো অ বউ, বউ!

কেউ সাড়া দিল না। সাড়া না পেয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করল অট্টামা। তারপর কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো নামিয়ে তা থেকে চারটে সিঁড়ির নাড়ু বের করে একটা এনামেলের ডিসে রাখল, কি ভেবে দুটো আবার তুলে নিয়ে কৌটোয় রেখে দুটো নাড়ু এনে রাখল গিরিজাপ্রসাদের সামনে।

তারপর আবার হাঁক দিলে, বউ, অ বউ। কোতায় গেলি লো। জল দিয়ে যা না মা এক গেলাস।

গিরিজাপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, থাক্ থাক্, তুমি এত ব্যস্ত হয়ো না।

—তা বললে কি চলে পেসাদ! একযুগ পরে এলে তুমি, দুটো নাড়ু আর এক গেলাস জল বৈ তো কিছু দেবার মতন অবস্থা নাই বাবা, সেটুকুও দোব না!

বলে নিজেই জল গড়িয়ে আনলে অনেক কষ্টে।

সিঁড়ির নাড়ুতে কামড় দিতে দিতে গিরিজাপ্রসাদ ঘরখানার চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন। আপনা থেকেই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক নিঙড়ে। শৈশবে দেখা অট্টামার সেই রূপ আর ঐশ্বর্যের পাশে এ চেহারা, এ ছন্নছাড়া অবস্থা যেন কিছুই মিলিয়ে দেখতে পারছেন না। কিন্তু, কি আশ্চর্য, অট্টামার চরিত্রটাও যেন বদলে গেছে বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে। সেই বিষণ্ণ করুণ থমথমে মুখখানা আজ কৌতুকে চপলতায় বুঝি হৃদয়ের রিক্ততাকেই লুকিয়ে রাখতে চাইছে!

সেদিনের সেই ছোটমা আর আজকের অট্টামার মধ্যে যেন কোনও মিল নেই। সেই ব্যথাম্লান মুখখানা কোথায় হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে? নাকি তাকে লুকিয়ে রেখেছে অট্টামা!

গিরিজাপ্রসাদের মনে হল—অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া বুঝি পথ নেই। শৈশবের সেই দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে মুহূর্তের জন্যে বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। তন্ময়তা ভাঙল অট্টামার কথায়।

অট্টামা হঠাৎ বললে, আর দুটো নাড়ু দোব বাবা!

গিরিজাপ্রসাদ মাথা নাড়লেন। আর অট্টামা ছটফট করল। যেন কি ভাবে খুশি করবে গিরিজাপ্রসাদকে, কি ভাবে আপ্যায়ন করবে, খুঁজে পাচ্ছে না।

অট্টামা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কি যেন ভাবল মনে মনে। বললে, ওই মোড়কটা নামাতে পারবি পেসাদ!

গিরিজাপ্রসাদ তাকিয়ে দেখলেন। এক পাশে একটা মাচার মত, তার ওপর শাড়ির পাড় দিয়ে বাঁধা একটা মোড়ক।

গিরিজাপ্রসাদ নামিয়ে দিলেন মোড়কটা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ আরশোলা ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

ধুলো ঝেড়ে সেটা খুলতে চেষ্টা করল অট্টামা। পারল না। গিরিজাপ্রসাদ নিজেই খুলে দিলেন। বললেন, এ তো বই দেখছি, সব উইয়ে খেয়ে দিয়েছে। কি হবে এ-সব?

নেড়েচেড়ে বইগুলো দেখতে শুরু করলেন গিরিজাপ্রসাদ। কাগজগুলো লাল হয়ে গেছে, নাড়তে চাড়তে গেলেই ছিঁড়ে যায়। আর সবই উইয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে।

গিরিজাপ্রসাদ উল্টেপাল্টে দেখলেন। তাঁদের ছোটবেলাকার ইস্কুলের বই খানকয়েক।

বিস্মিত হয়ে অট্টামার মুখের দিকে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। দেখলেন, বইগুলোর ওপর পরম স্নেহে হাত বুলোচ্ছে অট্টামা, আর তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অট্টামা বলে উঠল, বইগুলো তোর জন্যেই রেখেছি পেসাদ; তুই নে। সেই কবে চেয়েছিলি বাবা, পেরান ধরে দিতে পারিনি তখন, তুই নে বাবা, ওগুলো তুই নে।

বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল অট্টামা।

গিরিজাপ্রসাদ কবে বইগুলো চেয়েছিলেন স্পষ্ট মনে পড়ল না তাঁর। শুধু মনে পড়ল জনপুরের ইস্কুলে পড়বার সময় সব বই কিনতে পারেননি। এর ওর বই দেখে খাতায় নকল করে নিতে হত তাঁকে।

পুরনো বইগুলোর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ হাত থেমে গেল গিরিজাপ্রসাদের। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে সেই নাম।

স্পষ্ট অক্ষরে বইয়ের পাতায় লেখা একটা নাম—শ্রীব্রজমোহন ভট্টাচার্য।

অট্টামার স্বামীর নাম।

অট্টামা চোখ মুছে বললে, তুই নে বাবা, তোর জন্যেই রেখেছি এতদিন।

অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল গিরিজাপ্রসাদের। বললেন, ও বই নিয়ে কি হবে আর অট্টামা। আর দরকার নেই ও-সবের।

বিস্ময়ের চোখে গিরিজাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাল অট্টামা। —নিবি না বাবা, কাজ হবে না তোর ?

হতাশায় দুঃখে অনুশোচনায় যেন ভেঙে পড়ল অট্টামা।

তারপর হঠাৎ গিরিজাপ্রসাদের হাত দু'খানা দুটি শীর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, তা হোক, তবু তোমার কাছে একটা পাতথনা আছে বাবা আমার, আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে পেসাদ।

—বলো। একটু রূঢ় স্বরেই বললেন গিরিজাপ্রসাদ। ভাবলেন, অট্টামা তার স্বামীর যে বই ক'খানা সারা জীবন ধরে যখের মত আগলে আগলে রেখেছে, সেগুলোই বুঝি নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করবে।

কেমন যেন উসখুস করল অট্টামা, আতঙ্কের চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। উঠে গিয়ে বাইরের বারান্দা থেকে ঘুরে এল একবার। নিজের মনেই বললে, দেখি বউ আবার কান পেতে শুনছে কিনা। বলে বেরিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়েই ফিরে এল আবার, তারপর খানিক 'কিন্তু-কিন্তু' করে হঠাৎ বললে, আমার মৃত্যুর আগে এ কথাটা কাউকে বলিস না বাবা, আমার মাথা খাস, একটা পেতিশ্যুতি তোকে দিতে হবে পেসাদ। বলতে বলতে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আর অট্টামার কথা শুনে গিরিজাপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জীবনে কোনদিন কল্পনাও করেননি, অট্টামা তাঁকে এমন একটা অনুরোধ করে বসবে। এমন একটা অবিশ্বাস্য অনুরোধ।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দু'চোখ জলে ভাসিয়ে অট্টামা গিরিজাপ্রসাদের হাত দু'খানা ধরে বললে, তুই আমায় কথা দে, পেসাদ। আমি ম'লে আমায় গোর দিবি তোরা, কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে গোর দিবি আমায়।

চমকে উঠলেন গিরিজাপ্রসাদ, সারা শরীরে তাঁর শিহরন খেলে গেল।

চার

পেসাদ নয়, গিরি।

—তুমি আমাকে পেসাদ বলো কেন গো ?

—তোর নাম ওই-বালা যে শাশুড়ির নাম ছিল, বলতে নেই।

—গিরিবালা ? হি হি করে হেসে উঠল গিরি। —বাঃ রে, তা বলে আমার নামটা বদলে দেবে ? বেশ, আমিও তোমাকে অট্টামা বলব না।

—কি বলবি তা হলে ?

—ছোটমা।

ছোটমা কবে থেকে যে অন্য সকলের কাছে অট্টামা হয়ে গেছে মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে লক্ষ্মীঠাকরুনের মত সেই সুন্দর মুখখানা। নাকে মুক্তোর নাকচাবি। ডিমের মত মুখ, সোনায় মাজা রং, যেমন দীঘাঙ্গী তেমনি নিটোল আঁটসাঁট শরীর। একরাশ

কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে সারা পিঠ ঢেকে থাকে। কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। ফর্সা সুডোল হাতে মোটা মোটা কয়েকগাছা চুড়িরুলির পাশে সাদা শাঁখা। কিন্তু এত রূপ আর ঐশ্বর্যের ভিতর থেকেও আসল রূপটা উঁকি দিত, চোখে পড়ত : একখানা থমথমে বিষাদক্লিষ্ট মুখ। বড় বড় সুন্দর দুটি চোখ, চোখের পাতা, কিন্তু মনে হত, পদ্মের পাপড়ি থেকে যেমন শিশির ঝরে পড়ে, তেমনি একটু নাড়া দিলেই যেন ও-চোখ দুটি থেকেও জল ঝরে পড়বে।

ওই চোখেও একদিন তৃপ্তির হাসি দেখেছিল গিরিজা।

নতুন রেল খুলেছে তখন ছোট লাইনের। সন্ধের সময় ট্রেন যেত বাঁশি বাজিয়ে, আর সেই বাঁশির আওয়াজ শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকত সবাই। দিনের বেলায় বাঁশি শোনা যেত না, কিন্তু চক্রাকারে চারপাশের পাঁচখানা গাঁ-কে বেড় দিয়ে ধিকি ধিকি করে যখন ট্রেন চলে যেত, দূর থেকে সেই কালো রেখাটা দেখে মনে হত যেন একটা নুয়ে পড়া ডালের ওপর দিয়ে একটা শুঁয়োপোকা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। শুঁয়োপোকার মতই ধীর মন্থর গতি ছিল ট্রেনটার। ট্রেন নয়, যেন পর পর কয়েকটি দেশলাইয়ের বাক্স জুড়ে খেলাঘরের রেলগাড়ি বানিয়েছে কেউ।

ওই রেললাইন ধরেই স্কুলে যেত গিরিজা, আরো পাঁচটা গাঁয়ের ছেলে। সব মিলে গুটি দশ বারো। দু ক্রোশ দূরে জনপুরের ইস্কুল। ও তল্লাটে তখন ওই একটাই ইস্কুল। ডাকঘরও ওই জনপুরে। প্রতিদিন ইস্কুলে যাবার আগে কেউ না কেউ একটা কিছু ফরমাস করত। একটা তামার পয়সা দিয়ে বলত, আমাকে একখানা পোস্টকার্ট এনে দিবি বাবা। কেউবা বলত, জামাই আসবে, আধপো পটল এনে দিস না গিরি, ফেরার পথে।

গাঁয়ে টিউবওয়েল হয়নি তখনও। খাবার জলের পুকুর ছিল অমিত্তি। পুকুরের নাম অমৃত, লোকের মুখে মুখে হয়েছিল অমিত্তি। কাচের মত স্বচ্ছ জল, কাদা নেই একরত্তি। বালি চিকচিক করে জলের তলায়। আর পুকুরভর্তি পানিফল, লোকে বলত পাঁইফল, পানিফলের লতার চারপাশে জোঁক আর জোঁক।

অমিত্তির ডাঙা পার হয়ে আল ধরে ধরে আধ ক্রোশ পথ পার হয়ে রেললাইন অবধি যেত গিরিজা। আশপাশের গাঁ থেকে জন দশ বারো ছেলে এসে জুটত। বই খাতা হাতে নিয়ে রেললাইনের ছোট ছোট কাঠের স্লিপারগুলোর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে যেত সব দল বেঁধে।

কাঁচি সিগারেটের টিনে হাতল লাগানো একটা 'বাসকো' ছিল গিরিজার। তার ভেতর থাকত বই খাতা।

বাসকোটা হাতে নিয়ে অমিত্তির ডাঙায় এসে বংশীকে খুঁজত সে। কোন-কোনদিন খুঁজতে হত না। আগে থেকেই তৈরি থাকত বংশী।

সাঁতরে গিয়ে অমিত্তি থেকে পাঁইফল তুলে আনত, হাত পায়ের জোঁক ছাড়াতে ছাড়াতে পানিফলগুলো গিরিজাকে দিয়ে বলত, টিপিন খাবে, নিয়ে যাও গিরিদাদা। কোন-কোনদিন পদ্মবীজ এনে দিত। বলত, তোমায় রোজ রোজ পদ্মের টাটি এনে দিচ্ছি গিরিদাদা, পদ্যর বই কিন্তু দিতে হবে আমায়।

গাঁয়ের পাঠশালায় পড়েছিল বংশী, লিখতে পড়তে শিখেছিল, তারপর আর পড়াশুনো হয়নি। ভটচাযদের গরু চরাত। কিন্তু পদ্যর বইয়ের ওপর ভারী লোভ ছিল তার।

গিরিজার সমবয়েসী ছিল বংশী, কিন্তু নিজে কোটালদের ছেলে বলে রায়বাড়ির ছেলেকে সম্মান করে বলত 'গিরিদাদা'।

গাঁয়ের উত্তরে ছিল কোটালপাড়া। এককালে হয়তো চৌকিদারের কাজ করত ওরা, অর্থাৎ গ্রামরক্ষীর। তাই জাতেও ছিল কোটাল। চাকরান জমি ছিল সবারই, চাষবাস

করত, আবার মুনিশ মাহিন্দারের কাজও করত। কিন্তু অন্য সব 'ছোটজাতের' নয়, বামুন কায়েতদের তুলনাতেও অনেক বেশি ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত কোটালরা, আর স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মত। যেমন পুরুষগুলো, তেমনি মেয়েরা। ক্ষার দিয়ে কাচা কাপড় পরত, ঘরের আশেপাশে এতটুকু নোংরা জমতে দিত না। পুরুষগুলোর ছিল দুর্জয় সাহস। কিন্তু এমনিতে কত অমায়িক আর বিনয়ী।

ব্যতিক্রম ছিল শুধু বংশীর বাবা। সন্ধে হতে না হতে মদের হাঁড়ি নয়তো তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বসত। আর মাতাল হয়ে কি মার মারত বংশীর মাকে। বংশীকেও হয়তো মারত হাতের কাছে পেলে, কিন্তু বাপ যতক্ষণ জেগে থাকত, বংশীর টিকি দেখা যেত না। বাপ হাত তুললেই খিলখিল করে হেসে উঠে ছুটে পালাত, কোনদিন গোঁসাইদিদির আখড়ায়, কোনদিন বা গিরিজাদের বাড়িতে এসে ডাকত, গিরিদাদা, ও গিরিদাদা।

—কি রে ? পড়তে পড়তে উঠে আসত গিরিজা।

—বাবাটা খেপেছে আবার। ধূর্ত চোখজোড়া তার হেসে উঠত।

—তোর মাকে মারছে আবার ? বিষণ্ণ করুণ চোখ তুলে তাকাত গিরিজা।

খিলখিল করে হেসে উঠত বংশী।—মা-টা আমার খেপি গো, খেপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে তবু পালাবে না।

বলেই উঠোনের একপাশে বসে পড়ত, গিরিজার মাদুর থেকে একটু দূরে। বলত, একটা পদ্য শোনাও না গিরিদাদা !

গিরিজা হাসত।—তুই কি কবি হবি নাকি ?

—উঁহু, আমি একানে হবো।

—সে আবার কি ?

—একানে জানো না গিরিদাদা ? ইস্কুলে পড়ছ, এত নেকাপড়া করছ, একানে জানো না ? যাত্রাদলের একানে। সখী সাজব, নিয়ুতি হবো, ভৈরবী হবো, রাজার উদ্যেনে ফুলের গন্ধ শুঁকব আর একা একা গান গেয়ে বেড়াব।

যাত্রা দেখার ভারী শখ ছিল গিরিজার। চারপাশের যে গাঁয়েই যাত্রা হোক তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বিকেল বেলাতেই বেরিয়ে পড়ত।

মা বলত, এখন থেকে গিয়ে কি হবে গিরি, সন্দের পর যাবি, বাগালরা কেউ হেরিকেন নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কাটোয়া থেকে দুটো নতুন হারিকেন লণ্ঠন কিনে এনেছে তখন বাবা।

দুপুর থেকে বসে পলতে পাকানো চলত শুধু। দুটো হারিকেনই জ্বলত গিরিজার পড়ার সময়টুকু, তারপর একটা নিবিয়ে দেওয়া হত।

দুটো হারিকেনই যখন জ্বলত, আলোয় আলো হয়ে যেত সারা বাড়ি। ইস্কুলের ছেলেদের সকলের বাড়িতে তখনও হারিকেন লণ্ঠন আসেনি। তাই মা'র কথা শুনে এক এক সময় লোভ হত, হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে যাত্রা দেখতে যেতে।

কিন্তু অত দেরিতে গেলে কি সামনের সারিতে বসতে পাবে ! না, দরকার নেই যাত্রার আসরে লণ্ঠন দেখিয়ে।

বিকেল বেলাতেই এক ফাঁকে পালাত বংশী আর গিরিজা।

আসরের চারপাশে কারবাইডের আলো, আর বাঁশের খুঁটিতে দু'-চারটে লণ্ঠন। চারদিকে লোক গিসগিস করছে। 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা, 'সতীর জয়' পালা, আরও কত পালা হত।

'নিমাই সন্ন্যাস' পালা দেখতে গিয়েছে একদিন, মুগ্ধ হয়ে শুনছে গিরিজা আর বংশী। বসেছে একেবারে আসরের বাঁশ ছুঁয়ে। দু'জনের চোখই ঝাপসা হয়ে গেছে শচীমাতার

দুঃখে। নিমাই, নিমাই করে চিৎকার করে ডাকছে শচীমা। মেয়েরা সব চোখে আঁচল ঘসছে. পুরুষের দল চোখের জল মুছছে কোঁচার খুঁটে। একটু আগে যে খিদেয় পেট চিনচিন করছিল, গিরিজা বলেছিল, 'চল বংশী এক পয়সার বোমা নিয়ে আসি,' আর বংশী বলেছিল, 'দাঁড়াও না গিরিদাদা, নিমাইয়ের গানটা শুনেই যাবোখন,' সে-সব কথা ভুলে গিয়েছিল দু'জনেই। যাত্রা দেখতে দেখতে যেন অন্য এক রাজত্বে চলে গিয়েছিল।

হঠাৎ কাঁধে হাত রেখে কে যেন ডাকল পিছন থেকে। চমকে ফিরে তাকাল গিরিজা।

লোকটা বললে, তোমাদের ডাকছেন গো হোই বষ্টুমি। বলে আঙুল দেখালে মেয়েদের দিকে।

গিরিজা দেখলে গোঁসাইদিদি ডাকছে। গোঁসাইদিদিকে হঠাৎ এই ভিন গাঁয়ের অচেনা লোকের ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেয়ে কি যে ভাল লাগল গিরিজার! মাকে দেখলেও বুঝি এত আশ্বস্ত হত না।

দু'জনে উঠে গেল পাশের লোককে জায়গা রাখতে বলে। গিরিজা গিয়ে হাসি হাসিমুখে বললে, গোঁসাইদিদি তুমি?

গোঁসাইদিদি হাসলে।—তোমরা আসবে মানিক, বলোনি ক্যানে। নিয়ে আসতাম সঙ্গে করে!

গিরিজা হাসল লাজুক লাজুক মুখ করে।

গোঁসাইদিদি বললে, রাত দুপহর হল, খিদে নাগেনি গোপাল?

বংশী হাসল।—পায় নাই আবার, পেট জ্বলে যাচ্ছে গো।

গোঁসাইদিদি বললে, কি করি বল তো তোমাদের নিয়ে। তিন কোশ পথ ভেঙে এয়েছো, মা খাবার দিয়ে দেয় নাই, গোপাল? বলে বংশীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বংশীকে খুব ভালবাসত গোঁসাইদিদি।

বংশী হেসে বললে, তুমি এয়েছো যখন, খিদের আবার ভাবনা। তোমার বুনের আখড়ায় নিয়ে চলো ক্যানে!

—ও মাগো, কি কথা ছেলের। শুনলে যে তোমার বাবা আমাকে গাঁ-ছাড়া করবে গোপাল। না বাবা, সে আমি পারব না।

গোঁসাইদিদি খুঁট থেকে পয়সা বের করে মুড়ি আর বোমা ভাজা কিনে দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, কাল ভোরবেলাকে একসঙ্গে ফিরব, কেমন?

গিরিজা আর বংশী ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। তারপর গিয়ে বসেছিল যাত্রার আসরে।

বনপলাশির এক প্রান্তে ছিল নিকুঞ্জ দাসের আখড়া। গোঁসাইদিদি থাকত সেখানেই। মাঝে মাঝে গাঁয়ের ভেতর আসত ভিক্ষে নিতে, পাঁচ গাঁয়ের খবরাখবর দিতে। কার ছেলের বিয়েতে কে বারো বিঘে জমি আর নগদ সাতশো টাকা পণ পেয়েছে, কার মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে।

কালো ঢলো-ঢলো মায়ের মত স্নিগ্ধ মুখ ছিল গোঁসাইদিদির, আর নিকুঞ্জ দাসের আখড়াও ছিল তেমনি স্নিগ্ধ। গিরিমাটি দিয়ে রাঙানো উঠোন, তকতকে ঝকঝকে। চূড়া করে চুল বাঁধত গোঁসাইদিদি, রসকলি আঁকত। চোখ দুটি ছিল মিষ্টি, আর মুখের কথা আরও মিষ্টি।

গোঁসাইদিদির কাছে কি আকর্ষণ ছিল বংশীর, গিরিজা বুঝত না। দেখত, সুযোগ পেলেই 'খড়ি' নদীর ধার ঘেঁসে-ঘেঁসে চলেছে সে, নিকুঞ্জ দাসের আখড়ার দিকে। গাঁ থেকে আধ ক্রোশ দূরে একটা নদী ছিল, নদী না বলে নালা বললেও বড় বলা হয়। বর্ষার

সময় খরস্রোতা হত বলেই 'খড়ি' নাম ছিল, না কি সাদা মাটি ধুয়ে খড়ি-গোলার মত রং হত জলের, তাই 'খড়ি' নাম হয়েছিল, কে জানে।

গোঁসাইদিদির আখড়ায় যেতে সাহস পেত না গিরিজা। গাঁয়ের অনেকেই ভয় পেত। বাপ-মায়ের কাছে বকুনির ভয়। বষ্টুমিদের আখড়া যেন এক নিষিদ্ধ জগৎ।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অদম্য এক কৌতূহল ছিল। প্রায়ই ইচ্ছে হত যাবার।

গোঁসাইদিদি যখন গাঁয়ে আসত, বাড়ি বাড়ি খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে যেত, ভারী ভাল লাগত গিরিজার।

গিরিজাদের বাড়িতে এসেও ডাক দিত গোঁসাইদিদি। —কই গো আমার গিরি-গোবর্ধন কই!

ঘরের পৈঠেতে বসে গোঁসাইদিদি খঞ্জনি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইত, কাঁধ থেকে ঝোলানো নক্সা-কাটা কাঁথার ঝুলিটার মুখ ফাঁক করে চাল নিত, তারপর বসে বসে গল্প করত মা'র সঙ্গে।

রান্না করতে করতেই পাঁচ গাঁয়ের খবরাখবর নিত গিরিজার মা; জিগ্যেস করত, গিরির মামাবাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিলে নাকি গোঁসাইদিদি? ওদের খবর সব ভাল তো!

কোনদিন গল্প হত, কোন গাঁয়ে ডাকাতি হয়েছে, খুন হয়েছে কে। আবার কোন-কোনদিন দেখত গিরিজাকে ছল-ছুতোয় সরিয়ে দিয়ে গোঁসাইদিদি আর মা কানে কানে কি কথা বলাবলি করছে আর হেসে লুটিয়ে পড়ছে। সেদিন যেন কথা আর হাসি শেষ হতে চাইত না।

তারপর এক সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরে আখড়ার পথ ধরত গোঁসাইদিদি।

পিছনে পিছনে এসে অমিত্তির পাড়ে দাঁড়াত গিরিজা। তাকিয়ে থাকত গোঁসাইদিদির দিকে।

খঞ্জনি বাজিয়ে 'জয় নিতাই' বলে নিজের মনে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আল পথ ধরে এঁকেবেঁকে চলে যেত গোঁসাইদিদি। আখড়ার পথ ধরত। আর রহস্যের চোখে দূরের রোমাঞ্চময় কুঞ্জটির দিকে, নয়নতারা ফুলে-ঘেরা, বাবুরি বনতুলসীর গন্ধে-ভরা আখড়ার দিকে তাকিয়ে থাকত গিরিজা।

সেদিন তাই যাত্রা দেখে ফেরার পথে বংশী যখন বললে, গোঁসাইদিদির বাড়ি যাব, গিরিজা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। ভাবলে, মা যদি বকুনি দেয় তো বললেই হবে ফিরতি পথে এক সঙ্গে এলাম, তাই বসেছিলাম একবার আখড়ায়।

গোঁসাইদিদিও বললে বংশীকে, চলো গোপাল, চলো। তোমার জন্যে সেই জিনিসটি এনেছি।

—কি জিনিস? বিস্মিত হয়ে গিরিজা প্রশ্ন করল।

বংশী চোখের ইশারায় বলতে বারণ করল গোঁসাইদিদিকে, আর গোঁসাইদিদি হাসল মুখ টিপে।

আখড়ায় পৌঁছে তবে কৌতূহল মিটল।

দূর থেকে আখড়াটা এর আগেও দেখেছে বটে গিরিজা, কিন্তু এত স্নিগ্ধ সুন্দর রমণীয় জায়গা যে বনপলাশির মধ্যেও আছে, জানত না। থোকা থোকা লাল সাদা নয়নতারা ফুলে সাজানো, সামনেই গিরিমাটি দিয়ে নিকোনো রাঙা উঠোন আর তুলসী বেদি।

মোহান্ত ছিল না। প্রায়ই থাকত না মোহান্ত। ঝোলা নিয়ে সেও বেরিয়ে পড়ত কোন-না-কোনদিকে।

কুঞ্জের পাশেই একটা পেয়ারা গাছ। কয়েকটা পেয়ারা ছিঁড়ল গোঁসাইদিদি ডাল থেকে, এমন ভাবে ছিঁড়ল যেন ফুল তুলছে।

তারপর গিরিজা আর বংশীকে দিতে গেল। গিরিজা খুব খুশি হয়ে সবে হাত বাড়িয়েছে পেয়ারা নেবার জন্যে, হঠাৎ বংশী বলে উঠল, ধুৎ, যা দেবে বললে সেই দব্যটাই দাও ক্যানে।

গোঁসাইদিদি হেসে ঘরে ঢুকল, তারপর একটা কৌটো থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে দিল বংশীকে।

বংশী বললে, একটা ?

গোঁসাইদিদি বললে, দেশে বড়নোক কোথায় গোপাল যে নিত্যিদিন এনে দোব তোমায়।

গিরিজা বিস্মিত হয়ে বললে, কি রে বংশী ?

—ও কিছু না, বিয়ের পদ্য। দেকাব একদিন, কত্তো জমিয়েছি গিরিদাদা।

সত্যিই একদিন দেখিয়েছিল বংশী। বর্ধমানে একটা ছাপাখানা হয়েছে তখন। বিয়ের পদ্য ছাপানোর রেওয়াজ হয়েছে খুব। তেল-তেলে রঙিন কাগজে ফুল লতাপাতা আঁকা পদ্য। কোনটায় আশীর্বাদ, কোনটায় রসিকতা, কোনটায় ছোটদের হুল্লোড়। গোলাপি নীল সবুজ কাগজে পদ্য ছাপিয়ে বিলি করা হত বিয়ের বাসরে। শুধু অবস্থাপন্ন ঘরের বিয়েতেই এ-ব্যবস্থা ছিল, সাধারণ চাষাভুশোরা পারবে কেন এত খরচ করতে। বর্ধমানে বিয়ের বাজার করতে গিয়ে বারো ঘণ্টার কড়ারে একটা ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে আনত অনেকে।

বংশীর সেগুলো জোগাড় করার নেশা ছিল। জোগাড় করে সেগুলো পাট করে গুছিয়ে একটা কাপড়ে মুড়ে রাখত।

সেগুলো খুলে একদিন দেখাল সে গিরিজাকে। দেখাতে দেখাতে হঠাৎ বললে, একটা পদ্য দেখাব গিরিদাদা, কাউকে বলে দেবে না বলো।

তারপর গিরিজার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সযত্নে ভাঁজ খুলে একখানা হলদে কাগজ দিয়েছিল পড়তে।

পড়ে কিছুই বুঝতে পারেনি গিরিজা। হলুদ-রঙা কাগজটায় বড় বড় হরফে একটা পদ্য, তার শিরোনামায় দুটি নাম, দুটোই অপরিচিত। একটা নাম অষ্টভুজা, আরেকটা ব্রজমোহন ভট্টাচার্য। কিন্তু নীচে বিবাহ-বাসরের ঠিকানা : বনপলাশি।

গিরিজা বুঝতে পারেনি। বলেছে, আমাদের গাঁয়ের ? কে রে বংশী ?

বংশী হেসেছে। —সে পেশ্ন শুধিয়ো না গিরিদাদা, বলতে নারব।

বংশী রীতিমত একটা হেঁয়ালি করে তুলছিল ব্যাপারটাকে, আর গিরিজা বার বার প্রশ্ন করেছিল। কপাল কুঁচকে ভেবে হয়রান হয়ে গিয়েছিল সে। অষ্টভুজা নামের কোন মেয়ে আছে নাকি গাঁয়ে। —কি নামের ছিরি। নিজের মনেই বলেছে গিরিজা।

আর বংশী বলে উঠেছে, সে-কথা বোলো না গিরিদাদা, ক্যানে, অষ্টভুজা নামটা মন্দ কিসের। অষ্টমীর দিন জন্ম হলে অষ্টভুজা নাম তো হবেই গো। বলেই গান জুড়েছে : অষ্টভুজা মা আমার সিংহেতে হয় আসীন...সিংহবাহিনী মায়ের রূপটা কেমন বলো ? আমাদের গাঁয়ের অষ্টভুজাও এমনি ধারা অস্‌পরী।

অর্থাৎ অপ্সরী।

গিরিজা রেগে গিয়ে বলেছে, তোর ওই গুচ্ছের জামাই-ঠকানো হেঁয়ালি রাখ দিকিনি, বল মেয়েটা কে ?

বংশীর চোখ ছলছল করে উঠেছে হঠাৎ। বলেছে, তেনার কথা বলতেও পেরানে বেথা নাগে গিরিদাদা। তিনি হলেন আমাদের অট্টামা গো, আমাদের অট্টামা।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে গিরিজার। অট্টামা, অর্থাৎ

ছোটমা।

ছোটমার বিয়ে হয়েছিল, পদ্য ছাপানো হয়েছিল সে বিয়েতে? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্য মনে হয় গিরিজার। ছোটমার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা আছে বটে। কিন্তু তবু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই যাদের সিঁথিতে সিঁদুর দেখছে গিরিজা, তাদেরও যে একদিন বিয়ে হয়েছিল, শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে, বর এসেছিল পালকি চেপে, সে-কথা যেন ভাবতেই পারে না সে। ছোটমাকেও তেমনি ভাবত জন্ম থেকেই সধবা।

বংশী হেসেছে।—তুমি বড্ড বোকা বটে গিরিদাদা, বিয়ে না হলে এয়োর চিহ্ন ধরে কেউ?

তা বটে। গিরিজার সত্যিই নিজেকে বড় বোকা মনে হয়েছিল সেদিন। এই সহজ সত্যটুকু ধরতে পারেনি সে।

বংশী বলেছে, সে কি ধুম হয়েছিল গিরিদাদা, তিন দিন ধরে ভোজ দিয়েছিল মুকুজ্যেবাবুরা।

—তিন দিন? বিস্মিত হয়েছে গিরিজা।

আর বংশী বলেছে, দেবেন না ক্যানে গো, বাপের বাড়ির কতো সম্পত্তি ওনার, সব জেবনস্বত্ব তো ছোটমাই পেয়েছেন।

—কেন? বিস্ময়ের পর বিস্ময় গিরিজার চোখে।

বংশী বিষণ্ণ মুখ করে বলেছে, ছোটমা যে ওনার বাপের একমাত্তর সন্তান ছিল গো গিরিদাদা, আর বেটাও না, বিটিও না, ওই একমাত্তর সন্তান ছিল বামুনদাদুর। কিন্তু কপালে নেকন থাকলে কি হয় দেখ। জামাই নেয় না।

কথাটা ভুলতে পারেনি গিরিজা। 'জামাই নেয় না।' কেন নেয় না ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায়নি। এমন রূপ, এত ধন-সম্পত্তি, টাকা গয়না কিছুরই তো অভাব নেই ছোটমার। তবু কেন জামাই নেয় না।

জামাই নেয় না, জামাই নেয় না। কতবার যে শুনেছে কথাটা। মোড়লদের এক মেয়ে—কালীদিদি—তাকেও জামাই নেয়নি, বিয়ের সময় সোনার বোতাম দেবে কথা ছিল, দেয়নি বলে। দত্তদের হেমদিদিকেও জামাই নেয়নি কি রোগ আছে বলে। কিন্তু ছোটমা? তাকে কেন জামাই নেয়নি।

অত বিদ্বান বুদ্ধিমান জামাই, জনপুরের ইস্কুল থেকে 'বিত্তি' পেয়েছিল, জলপানি পেয়ে পাশ করেছিল, তারপর কলকাতায় গিয়েছিল পড়তে। এমন জামাই কেন নেয় না তার বউকে? আর গাঁয়েই বা আসে না কেন সে? কতদিন সে কথা ভেবেছে গিরিজা, কত কি কল্পনা করেছে, তবু মনের মত উত্তর খুঁজে পায়নি।

অমৃতের পাশ দিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে সেদিন গিরিজা। বংশী গরু চরাচ্ছে পাশের ডাঙায়।

প্রতিদিনের মত পাঁইফল ক'টা বংশীর কাছ থেকে নিয়ে চলে যাবে রেললাইনের দিকে, তাই বংশীকে ডাকতে যাচ্ছিল গিরিজা, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকলে, পেসাদ, ও পেসাদ।

চমকে ফিরে তাকাল গিরিজা।

—ছোটমা? বিস্ময়ের শেষ ছিল না সেদিন। ছোটমাকে কোনদিন ও কলসী কাঁখে নিয়ে এমন একা একা দেখেনি অমিত্তের পাড়ে।

ছোটমা ঠোঁটের ওপর আড়াআড়ি করে একটা আঙুল রেখে চুপ করতে বললে। তারপর ইশারায় কাছে ডাকলে। বললে, আমার একটা কাজ করে দিবি পেসাদ।

সম্মোহিত মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে ঘাড় কাত করলে গিরিজা।

ছোটমা বললে, বলে দিবি না তো বাবা ? দেখিস কেউ যেন জানতে না পারে।

গিরিজা সজোরে মাথা নাড়ল, বললে, না, না, কক্ষনো না।

এবার ধীরে ধীরে বুকে লুকোনো একখানা নীল খাম বের করলে ছোটমা। বললে, এই চিঠিখানা জনপুরের ডাকবাসকোয় ফেলে দিবি বাবা ? কেউ যেন জানতে না পারে।

হাত বাড়িয়ে খামটা নিল গিরিজা। বললে, না, না, কেউ জানবে না।

—কোথায় ফেলতে হয় তুই জানিস তো ?

গিরিজা হাসল। —তা আবার জানি না ছোটমা ? ডাকঘরের বারাণ্ডায় একটা গোলমত লাল রঙের বাসকো আছে...কত পোস্টোকার্ট খাম ফেলেছি...ঠিক চলে যাবে দেখো।

ছোটমা আবার সাবধান করে দিয়েছে।—লুকিয়ে রাখ বাবা, দেখিস, কেউ যেন জানতে না পারে।

বলেই দ্রুত পায়ে সেখান থেকে সরে গিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে ছোটমা, আর মাঝে মাঝে ফিরে তাকিয়ে দেখেছে।

ছুট ছুট, গিরিজা তখন ছুটে চলেছে আল ধরে, রেললাইনের দিকে।

রেললাইনের ধারে পৌঁছে তবে হাঁপাতে হাঁপাতে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখেছে। তারপর চুপি চুপি বের করেছে নীল রঙের খামখানা।

খামের নীল রংটা লালচে হয়ে গেছে কোথাও কোথাও। যেন অনেক কাল ধরে তোরঙের নীচে পড়ে ছিল।

কিন্তু নাম ঠিকানা দেখেই চমকে উঠেছে গিরিজা। ব্রজমোহন ভট্টাচার্য। নামটা মনে পড়তেই সারা শরীর শিউরে উঠেছে। স্পষ্ট সুন্দর অক্ষরে নাম ঠিকানা লেখা। শুধু নামের পরে 'শ্রীচরণকমলেষু' পাঠটুকু আঁকাবাঁকা অক্ষরে। আর নামের আগে 'শ্রীযুক্ত বাবু' পাঠটুকুও দেখে গিরিজা বুঝতে পেরেছে এ দুটো ছোটমার হাতে লেখা।

গাঁয়ের সকলেই ওকে চিঠি ফেলতে দিত, জনপুর ছাড়া কাছাকাছি আর কোথাও তখন ডাকঘর ছিল না। তাই ওর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, ছোটমার স্বামী নাম-ঠিকানা লেখা খামগুলো দিয়ে গিয়েছিল হয়তো কখনও, চিঠি লেখবার জন্যে।

কিন্তু বিস্ময় সে জন্যে নয়। বিস্ময়—ছোটমা তার স্বামীকে চিঠি লিখছে বলে। এর চেয়ে আশ্চর্য হবার মত ঘটনা যেন তার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

শাড়ি-গয়না-সিঁদুরে সধবার মতই থাকত বটে ছোটমা, কিন্তু স্বামী যখন তাকে নেয় না, তখন তাকে কেন চিঠি লিখছে ছোটমা সে রহস্যের কোন চাবি খুঁজে পায়নি গিরিজা।

খুঁজে পায়নি, স্বামীকে চিঠি লিখতেও এত ভয় কেন ছোটমার। চিঠিটা দেবার সময় চোখেমুখে তার এমন আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল কেন।

মনে মনে তাই একটা প্রার্থনা জানিয়েছিল শুধু, চিঠি পেয়ে যেন ছোটমাকে নিয়ে যায় তার স্বামী ; জামাই নেয় না, এ অপবাদ যেন ঘুচে যায় ছোটমার !

পাঁচ

কয়েকটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। কিন্তু মনের দ্বিধা আর সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। চেষ্টা করেও যেন মিশে যেতে পারছেন না গ্রামের মানুষগুলির সঙ্গে। এমনকি গিরীন আর তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও এক হতে পারছেন না। মাঝখানে অদৃশ্য কি যেন এক বাধা, একটা কাচের দেয়াল। অথচ তারা সকলেই

আসে, হাসে, গল্প করে। ফাইফরমাশ খেটে দেয়, খুশি করার চেষ্টা করে। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদের মনে হয় এ সবই যেন কৃত্রিম, আন্তরিকতা নেই কোথাও।

সত্যিই কি তাই ? না গিরিজাপ্রসাদের মনের ভুল ? বুঝতে পারেন না তিনি।

অথচ প্রতিদিন বিকালে সন্ধ্যায় গোপেন মোড়ল আসে, নিত্য মল্লিক, চাটুজ্জেদের হংস আর পদ্মে, আর—হ্যাঁ, বংশীও আসে।

সেদিন অট্টামার বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে কখন যেন তন্ময় হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন শৈশবের দিনগুলিতে। সে-সব দিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবেই বাড়ি ফিরছিলেন।

তাই আচমকা ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েছিলেন বংশীর দিকে।

—কোথায় গিয়েছিলেন গো গিরিদাদা।

কয়েকটা মুহূর্ত শুধু, তারপরই চিনতে পেরেছিলেন। কালো তেল-চুকচুকে সবল স্বাস্থ্যবান চেহারা, খাড়া নাক, গলায় তুলসী কাঠের মালা। আর মাথার সব চুল শনের মত সাদা। হাতে একটা কড়ি বাঁধা হুঁকো, তাতে টান দিতে দিতে মুচকি মুচকি হেসে বংশী প্রশ্ন করলে, কোথায় গিয়েছিলেন গো গিরিদাদা।

'গিরিদাদা' ডাক শুনেই হয়তো চিনতে পারলেন। কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল।

তবু মুখে হাসি টেনে বললেন, বেঁচে আছিস তা হলে ?

বংশীও হাসল—ওই আপনার বেঁচেই আছি গো, পেরানটুকুই ধুকধুক করছে।

না, বংশীও যেন দূরে চলে গেছে। নাকি দূরে সরিয়ে দিতে চায় গিরীনের মতই।

বললেন, আমি আবার 'আপনি' হলাম কবে থেকে রে !

—ওরে বাপ রে। বংশী আর হাসল না। যেন গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করেই বললে, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সেই কোটালদের বংশী। আর তুমি কত নেকাপড়া করে বড় হয়েছ, বড় ইস্কুলে মাস্টারি করেছ, টাকা করেছ কতো, তোমায় 'আপনি' বলে ময্যাদা দোব না তো কাকে দোব গো। মান্যি করবার মত নোক এ গাঁয়ে আছে ? বিদ্বেনও হয়েছ, টাকাও হয়েছে—এমন আর কে আছে বলো।

গিরিজাপ্রসাদ খুশি হলেন। ভাবলেন, অশিক্ষিত বংশী শিক্ষার মূল্য দিতে চায় বুঝি—যে মূল্য চাকরি-জীবনে কোনদিন পাননি। তবু সত্যি কথাটা ভাঙতে পারলেন না। বলতে পারলেন না, টাকা তিনি করেননি। ধনী হওয়া দূরে থাক, এ গাঁয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে বাধ্য হয়ে। টাকা এখন আর সামান্যই আছে, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর যা কিছু পেয়েছিলেন তা ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

কিন্তু গিরীনের কাছেও সে কথাটা বলতে সাহস পান না। সব সময় একটা আশঙ্কা, আজ আর টাকা পয়সা বিশেষ কিছু নেই জানলে সেও হয়তো ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলবে।

বিকেলের দিকে প্রতিদিন বৈঠকখানায় রীতিমত ভিড় হয়। গল্প-গুজব করতে আসে অনেকেই। কিন্তু সকলের কথাবার্তার পিছনেই যেন এক উদ্দেশ্য। সকলেরই এক ধারণা। প্রচুর টাকা নিয়ে এসেছেন গিরিজাপ্রসাদ।

চাটুজ্যেদের পদ্মে বলে, গাঁয়ে একটা লাইবেরি নেই, কিছু বইটই কিনে একটা লাইবেরি করে দিন কাকা।

গোপেন মোড়ল বলে, তার আগে বরং ধুমধাম করে এবার পুজোটা লাগিয়ে দাও।

নিত্য মল্লিক বলে, কাঁদরের ওপর পুল একটা বানিয়ে না দিলে বর্ষাকালে যাতায়াতের বড় অসুবিধে !

গিরিজাপ্রসাদ সকলকেই সান্ত্বনা দেন। —একটু বসি আগে ভাল করে, গোছগাছ করি,

তারপর দেখা যাবে।

বংশীও সায় দেয়। বলে, আগে একটা দালান বানাও দিকি গিরিদাদা। শহর বাজারের মানুষ তোমরা, এ মাটির বাড়িতে থাকতে নারবে, সে আমি বলে দিচ্ছি, হুঁ।

কখনও বলে, একটা হ্যাজাক কেনো গো, ও লণ্ঠনের টিমটিম আলোয় পড়তে পারবে ক্যানে ছেলেমেয়েরা।

গিরিজাপ্রসাদ হাসেন।—হ্যাজাকেই কি অন্ধকার কাটবে বংশী। তখন মনে হবে ইলেকট্রিক না হলে চলবে না। মনে আছে তোমার, লম্প জ্বলত, প্রদীপ জ্বলত তখন, তারপর সেই হেরিকেন এল...

বংশী হুকোয় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সায় দেয়, তা যা বলেছ গিরিদাদা, সে এক দিন ছিল গো, সারা দুকুর ধরে সলতে পাকাত সব পিদিমের জন্যে, তারপর সেই কেরাচিন এল, হেরিকেন এল। আলো দিয়ে কি আঁধার কাটে গো গিরিদাদা, চোখে দিষ্টি নেই, তার পিদিম উস্কে দিয়ে কি হবে, আমাদের হয়েছে সেই অবস্তা।

বাঃ, বেশ কথাটা বলেছে বংশী। চোখে দৃষ্টি নেই তার প্রদীপ উস্কে দিয়ে কি হবে! চোখ তুলে বংশীর দিকে তাকান গিরিজাপ্রসাদ। একবার ইচ্ছে হয় জিগ্যেস করেন, এখনও ও কীর্তন গায় কিনা, আখর বোনে কিনা। কিন্তু যতে কোটালের কথাটা মনে পড়ে যায়। 'গলা নাই তো শুনবে ক্যানে বলুন? লোকে হাসি-তামাশা করে, ব্যঙ্গ করে ওনার গানকে।'

কিন্তু হ্যাজাকের কথাটা মন্দ বলেনি বংশী। বৈঠকখানায় একটা হ্যাজাক জ্বলবে, জমিয়ে বসে গল্পগুজব করবেন। অভাবটা যে কিসের বুঝতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। এক এক সময় এক একটা জিনিসকে মনে হয় সবচেয়ে দরকারি। যেন সেটুকুর অভাবেই গ্রামে মন টিকছে না তাঁর। মন টিকছে না, টিকছে না সত্যিই। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন বেশ কেটে গেছে, গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে, গাঁসুদ্ধ লোকের সঙ্গে গল্পগুজব করে।

কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, যেন বড় বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন আবার। সময় কাটতে চায় না, সময় যেন ছোট লাইনের ট্রেনের চেয়েও ধীরে ধীরে চলছে। সারাটা দিন কোন কাজ নেই, সন্ধে হলেই অসহ্য লাগে। মনে হয় এত দীর্ঘ রাত্রি—যেন কাটবে না।

দুপুরে কিংবা বিকেলে তবু কিছুক্ষণ হোমিওপ্যাথির ওষুধের বই ক'খানা নাড়াচাড়া করেন, বিস্কুটের টিনে সাজানো ছোট ছোট ওষুধের শিশিগুলো ঠিক আছে কিনা দেখেন। তারপর সন্ধে হলেই অন্ধকার। তাঁর জীবনের মতই।

সেদিনও বৈঠকখানা-বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে অন্ধকার নেমে এল। সন্ধে হল।

গিরীনের মেজ মেয়ে একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে গেল বৈঠকখানার বারান্দায়। মেয়েটি তর তর করে এল, নিঃশব্দে লণ্ঠনটা রেখে আবার চলে যাচ্ছিল।

গিরিজাপ্রসাদ পিছন থেকে ডাকলেন, টিয়া!

টিয়া ফিরে দাঁড়াল।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, গিরীন আছে রে?

শান্ত ধীর গলায় উত্তর এল, আছে।

—একবার ডেকে দে তো।

আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করল টিয়া, তারপর নিঃশব্দেই চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই গিরীন বেরিয়ে এল ভিতর-বাড়ি থেকে। এসে বসল মাদুরের ধারে। গোপেন মোড়লের পাশে।

গিরিজাপ্রসাদ প্রথমটা লক্ষ করেননি। তাকিয়ে ছিলেন লণ্ঠনের দিকে। জং-ধরা পুরনো একটা লণ্ঠন, কতকাল আগে কেনা কে জানে। কাঁচটা ফাটা, আর কালি পড়ে

পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে। বিকেলে এই ভাঙা লণ্ঠনটাকে টিয়া যখন পরিষ্কার করছিল, ভিজে পাটের গুছিতে ছাই মাখিয়ে যখন কাচটা ঘসছিল তখন এত ভাল করে লক্ষ করেননি।

কিন্তু ওটা সামনে রেখে টিয়া চলে যেতেই চোখ পড়ল গিরিজাপ্রসাদের। আর সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হয়ে উঠলেন গিরীনের ওপর। কিংবা নিজের ওপর। হঠাৎ যেন তাঁর আত্মসম্মানে একটা ঘা লাগল। মরচে-পড়া পুরনো লণ্ঠনটা যেন এ বাড়ির প্রতীক। চিমনির ঘসা কাচটা যেন তাঁর চোখের দৃষ্টির মতন ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু, না, এ-সব কথা ভাবলেন না গিরিজাপ্রসাদ। তিনি শুধু অস্বস্তি বোধ করলেন, কেমন একটা লজ্জা। গোপেন মোড়ল, নিত্য মল্লিক, বংশী—এদের সকলের চোখের সামনে তাঁর সব সম্মান যেন হঠাৎ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল লণ্ঠনটা।

আয় এবং উপায় নেই বলেই গ্রামে ফিরে এসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু সে শুধু ভবিষ্যৎ ভেবে। একটা ছেলের পড়াশুনো বাকি এখনও, দুটো মেয়ে, বিয়ে দিতে হবে। কলসীর জল গড়িয়ে খেলে ক'দিন আর থাকবে। কিন্তু ঠিক এমনিধারা একটা দারিদ্র্যের চেহারা কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছেন না। নাকি গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে তাঁকে অপদস্থ করার জন্যেই এই ভাঙা পুরনো লণ্ঠনটা পাঠিয়ে দিয়েছে গিরীন?

আলোটার চারপাশে কয়েকটা পোকা এসে জুটেছে। অসীম বিরক্তির সঙ্গে সেদিকে তাকিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

গিরীন এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। দাদাকে কোন কিছু বলতে না দেখে বললে, ডেকেছিলে আমায়?

চমকে উঠলেন গিরিজাপ্রসাদ।—ও, এসেছিস! হ্যাঁ বলছিলাম কি, একটা লোক বলে দে, কাল টাকা দেবো, হ্যাজাক বাতি কিনে আনবে একটা।

গিরীন প্রথমটা চমকে উঠেছিল। তারপর কি যেন ভাবলে নিজের মনেই। ধীরে ধীরে বললে, আচ্ছা।

আর বংশী বলে উঠল, সে তুমি টাকা দিয়ে দিয়ো গিরিদাদা, উদাসকে বলে দোব, বাইকে করে চলে যাবে এখন...

—উদাস কে?

—আমার ছেলে গো। হাসল বংশী।—বাইক কিনে দিইছি একটা, রোজ কাটোয়ায় যায় বাস-ডাইভারি শিখতে। ফেরার পথে নিয়ে আসবে এখন।

গিরিজাপ্রসাদ সায় দিলেন, তাই হবে।

বংশীর কথামত পরের দিন এসে হাজিরও হল উদাস।

চেক শার্ট পরনে, কলারটা তুলে দিয়েছে কামানো ঘাড় পর্যন্ত, সাইকেলের প্যাডালে পা দিয়ে ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টি বাজাচ্ছিল।

গিরিজাপ্রসাদ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই অবিরাম ঘণ্টি বাজাতে দেখে বেরিয়ে এলেন।

উদাস তার লম্বা লম্বা চুলগুলো কপাল থেকে ঝাঁকানি দিয়ে পিছনে ঠেলে দিয়ে বললে, বাবা বলছিল, কাটোয়া থিকে হ্যাজাক বাতি একটা এনে দিতে হবে নাকি!

চাল-চলন চেহারা দেখে গিরিজাপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, বংশীর ছেলে বলে বিশ্বাস করতেও বেধেছিল।

তবু বিস্ময় চেপে রেখে টাকাকড়ি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন।

আর উদাস টাকা ক'টা পকেটে রেখে একটা শিস দিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ল।

সমস্ত ব্যাপারটা দূর থেকে লক্ষ করলে গিরীন। সঙ্গে সঙ্গে তার মন যেন

গিরিজাপ্রসাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

ফিরে এসে মোহনপুরের বউকে বললে, দাদার লবাবির পাল্লায় পড়ে আমাদের জীবনও ওষ্ঠাগত হবে দেখছি।

—কেন, কি হল ? মোহনপুরের বউ উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলে।

গিরীন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললে। গত রাত্রেই বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, সময়মত মনে পড়েনি হয়তো। কিংবা ভাবতে পারেনি গিরীন, সত্যি সত্যি ভোর না হতে উদাসকে টাকা দিয়ে কাটোয়া থেকে বাতি কিনে আনার ফরমাশ দিয়ে বসবেন গিরিজাপ্রসাদ।

সব শুনে মোহনপুরের বউ কিন্তু উল্লসিত হয়ে উঠল। —সে তো ভালোই, লম্প হাতে করে টিমটিমে আলোয় যেতে আসতে ভয় হয় বাপু, ঘাটে যাই বাসন ধুতে, কেবলই মনে হয় সাপখোপ আছে...

গিরীন খেঁকিয়ে ওঠে, তোমার আর কি, ওদের দেখে তোমারও বাবুয়ানির শখ উথলে উঠেছে !

গিরীনের খেঁকানি শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মোহনপুরের বউ। তাই স্বামীর কথা শুনে হেসে ফেলল। বললে, পায়ে আলতা তো সেই একবারই পরেছিলাম, পেথম যেদিন এয়েছিলাম এ বাড়িতে, তারপর তো হাঁড়ি ঠেলে আর হেঁসেল ধুয়ে ধুয়ে পায়ে হাজা হয়ে গেল...বিবি সাজার কি উপায় রেখেছ !

গিরীন কথাটা কানেও তুললে না, নিজের মনেই বললে, গাঁয়ে বাস করব আবার হ্যাজাক চাই, ইস্টোভ চাই, আরও কত কি শুনবে !

মোহনপুরের বউ তবু বললে, যাই বলো, উঠনে একটা ওই বাতি জ্বললে দেখবে চারদিক আলো হয়ে যাবে। সে তো ওদেরও লাভ, আমাদেরও লাভ।

গিরীন স্তম্ভিত হয়ে তাকাল স্ত্রীর মুখের দিকে। যেন ভাবতেই পারছে না, এমন অসাংসারিক কথাটা কি করে বলছে মোহনপুরের বউ।

খানিক চুপ করে থেকে বললে, হাতি তো কিনছে, কিন্তু হাতির খোরাকটা কে দেবে শুনি ?

মোহনপুরের বউ হেসে বললে, সে তুমি ভেবো না, ভাশুর ঠাকুর নিজেই দেবেন। তোমার মত টানাটানির সংসার তো ওঁর নয়, আর গণ্ডা গণ্ডা ছেলেমেয়েও নেই...

বলল এমনভাবে যেন গণ্ডা গণ্ডা ছেলেমেয়ের জন্যে গিরীন একাই দায়ী। তবু কথাটা গায়ে না মেখে গিরীন বললে, এই যে এক পহর রাত অবধি বাংলাবাড়িতে হারিকেন জ্বেলে রোজ গল্পগুজব করছে, আধ বোতল করে কেরাচিন কোত্থেকে আসছে শুনি ? দিচ্ছে টাকা ?

মোহনপুরের বউ সান্ত্বনা দিয়ে বললে, দেবেন গো দেবেন, দুটো দিন যেতে দাও, এই তো ক'দিন হল এয়েচেন।

বলে রান্নাঘরের দিকে চলে এল মোহনপুরের বউ। কিন্তু মনের মধ্যে তখন একটা খটকা লেগে রয়েছে। একটা আতঙ্ক। সত্যিই কি সংসারের খরচ-খরচা কিছু দেবে না নাকি ওরা ? নিজের সংসার টানতেই গলদঘর্ম হয়ে উঠছে মোহনপুরের বউ, তা কি গিরিজাপ্রসাদ জানেন না, নিভাননী বোঝেন না ! মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে যে গিরীনের সন্দেহ মিথ্যে। তাই কখনো হয় !

রান্নাঘরে এসে দেখলে টিয়া পাটকাটি জ্বেলে ডেকচিতে জল গরম করছে।

দেখে ও জিজ্ঞেস করলে, কি চাপিয়েছিস রে টিয়া ?

—চায়ের জল।

—কে বললে।

—জেঠিমা।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরখানার দিকে তাকাল মোহনপুরের বউ। আর চোখে পড়ল ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে কমলা আর বিমলা বইখাতা নিয়ে পড়তে বসেছে।

ওরা আসার পর থেকেই বড় জায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছে মোহনপুরের বউ। স্বামী যখনই খরচ-খরচার কথা তুলেছে, বিরক্ত হয়ে তখনও তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কমলা-বিমলা বই নিয়ে পড়তে বসেছে দেখেই হঠাৎ যেন সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

টিয়া ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে সরে বসল। আর উনোনের সামনে বসে পাটকাঠিগুলো ভেঙে দুমড়ে ভিতরে ঠেলে দিতে লাগল মোহনপুরের বউ।

টিয়া ভয়ে ভয়ে বললে, কাপ-ডিসগুলো ধুয়ে আনব?

—না, না। যা করবার আমি করব। চিৎকার করে উঠল মোহনপুরের বউ। চেঁচিয়ে বলে উঠল, বইটইগুলো কি গোড়ের জলে ডুবিয়ে দিয়েছ? গিয়ে একটু পড়তে বসলেও তো পারো!

বলে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল টিয়ার মুখের দিকে।

অপ্রতিভ মুখে টিয়া উঠে এল মা'র সামনে থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই যেন বুঝতে পারল না বেচারী। মা হঠাৎ আজ ওকে পড়তে বসার কথা কেন যে বললে! কই এতদিন তো বলেনি।

সারাদিন তো ওকে কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকতে হয়, বই পড়ার সময় কোথায়! গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুল থেকে পাশ করে বের হওয়ার পর খানকয়েক বই অবশ্য কিনে দিয়েছিল টিয়ার বাবা, কিন্তু পড়তে বসার কথা কোনদিনই বলেনি। কখনও-কখনও হয়তো টিয়ার নিজেরই ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু বই-খাতা খুলে বসতে না বসতেই ডাক এসেছে মা'র কাছ থেকে। —থালাগুলো ঘাট থেকে ধুয়ে এনে দে, বিছানা পেতে দে বিশুকে, খোকাকে দুধ খাইয়ে দে, ডাল সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে আয়। দু' একবার যদি বা টিয়া অনুযোগ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখঝামটা দিয়ে উঠেছে মোহনপুরের বউ। —পড়েশুনে হবে কি শুনি, সেই তো গলায় গেঁথে আছো, এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে পার করতে হবে। আর সংসারের কাজগুলোই বা করবে কে, ভূতে এসে করে দিয়ে যাবে?

শুনে দুঃখও হয়েছে, হাসিও পেয়েছে টিয়ার। কিন্তু আজ হঠাৎ কেন যে মা তাকে পড়তে বসতে বলল খুঁজে পেল না টিয়া। রাগটা যে আসলে কার ওপর তাও বুঝতে পারল না। ও ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এসে নিজেদের ঘরখানার দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বুকের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা, মা'র বিরুদ্ধে একটা নির্বাক অভিযোগ। দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে টিয়া, মা নোংরা একটা কাপড়ে চা ছাঁকছে আর গজগজ করছে। ইচ্ছে হল বলে আসে, চা ছেঁকে ছেঁকে কালো হয়ে যাওয়া কাপড়টা জেঠিমা বদলাতে বলেছে। একটা ছাঁকনি কিনে আনতে বলেছে কাটোয়া থেকে। কিন্তু সাহস হল না। শুধু টপ টপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল টিয়ার চোখ থেকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টামার গলা শুনতে পেল টিয়া।

তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করলে ও।

কিন্তু অট্টামার চোখ এড়াল না। অট্টামা বললে, কানছিস কেনে রে টিয়া? মা বকেছে বুঝি? অবুঝে বোঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে। তোর মায়ের হয়েছে সেই দশা, দু'দিন বাদে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে, এখন বরং একটু

আদরযত্ন কর মেয়েকে, তা নয়...

ব'লে টিয়ার কাঁধে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় অট্টামা। তারপর ফিসফিস করে প্রশ্ন করে, তোর জ্যাঠা কোতায় গেল রে টিয়া?

উত্তর শুনে লাঠি ঠুক ঠুক করে গোয়াল ঘরের দিকে বেরিয়ে যায় অট্টামা।

আর টিয়া এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে দেখে, কেউ কোথাও তাকে লক্ষ করছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে খিড়কির দিকে এগিয়ে যায় এমন ভাবে যেন কোন কাজে যাচ্ছে। কোন রকমে খিড়কির দরজা পার হওয়া। তারপরই ছুট, ছুট, পুকুরের পাড় দিয়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি পার হয়ে একেবারে এসে উঠল রেণুদিদের বাড়ি।

রাঙাবৌদি দেখতে পেয়ে বললে, কি রে টিয়া, হাঁপাচ্ছিস কেন?

টিয়া হাসল। —পালিয়ে এলাম যে! যা রেগেছে না আজ?

রাঙাবৌদি আর টিয়া দু'জনেই হেসে উঠল, যেন কত বড় একটা কৌতুক। কে রেগেছে সে-কথাটা আর বলতে হল না।

কথা শুনে রেণুদিও বেরিয়ে এল। আর টিয়াকে দেখতে পেয়েই বললে, টিয়া! শিগগির, শিগগির শুনে যা একটা কথা।

বলে ডেকে নিয়ে গেল ওকে বাড়ির পিছন দিকে, যেখান থেকে আঁকাবাঁকা মেটে রাস্তাটা চলে গেছে পাকা রাস্তার দিকে।

বললে, ওই দেখ!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল টিয়া, বললে ধ্যেত!

কিন্তু চোখ ফেরাতে পারল না সেদিক থেকে। দেখলে, একখানা জিপ ধুলো উড়িয়ে সেই মেটে রাস্তা ধরে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছে।

ছয়

ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরছিল টিয়া। ও জানে, কপালে আজ বকুনি আছে। এমনকি রাগের মাথায় একটা চড়চাপড়ও বসিয়ে দিতে পারে মা।

মাকে বড় ভয় ওর, মার খেয়ে কান্নাকাটিও করে, আবার মাঝে মাঝে পালিয়ে না এসেও পারে না। বাড়ির মধ্যে যেন হাঁপিয়ে ওঠে ও, মেটে দেয়ালের ওই জেলখানা থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে এসে তবেই মুক্তির নিশ্বাস নেয়। কখনও রেণুদি আর রাঙাবৌদির হাসিঠাট্টা গল্পগুজবে মনের ভারটুকু হাল্কা করে, কখনও ছুটে যায় অট্টামার কাছে।

বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে। বার বার মা ওকে এই একটা কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বিয়ে না হওয়ার জন্যে যেন টিয়া নিজেই দায়ী। এক হাঁড়ি টাকা ঢেলে তবে বিয়ে দিতে হবে, বিয়ে দিতে হয়, সে-কথা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তো শুনছে। গ্রামের যত মেয়ের বিয়ে হল একে একে সকলের বিয়েতেই তো টাকা ঢালতে হয়েছে, পণ দিতে হয়েছে। অথচ মা ওকে এমনভাবে শোনায় কথাটা, যেন ওর বিয়ের জন্যেই মা-বাপকে প্রথম ভাবতে হচ্ছে, টাকা খরচ যেন আর কোন মা-বাপকে করতে হয়নি।

আবার কোন কোনদিন বড় বেশি ভাল ব্যবহার করে মা। কাছে ডাকে, আদর করে, হেসে কথা বলে টিয়ার সঙ্গে। বুঝতে বাকি থাকে না, মা ওর মনের দুঃখটুকু মুছে নিতে চাইছে। টিয়াকে কোন-কোনদিন সামনে বসিয়ে টিয়ার চুল বেঁধে দেয়, ভিজে গামছা দিয়ে ঘাড়-গলা-মুখ মুছিয়ে দিয়ে নিজেরই একখানা রঙিন শাড়ি বের করে পরতে বলে টিয়াকে।

পরতে রাজি হয় না টিয়া। বলে, এত ভাল কাপড়খানা, এখনি ছিঁড়ে আসব কোথায়।

মা হাসে।—ছিঁড়লেও তোর, থাকলেও তোর, আমি কি এই বয়সে ওই সব রঙিন কাপড় পরব নাকি?

শেষ পর্যন্ত পরতে রাজি হয় টিয়া। আর নীল শাড়িতে বড় সুন্দর মানায় ওকে। মুগ্ধচোখে ওর দিকে তাকিয়ে মা তৃপ্তির হাসি হাসে। মেয়ের রূপে মা'র মনও গর্বে ভরে যায়।

অথচ এই মা হঠাৎ এক-একদিন মানুষ বদলে যায়, কেন তা বুঝতে পারে না টিয়া। দু' একবার দু' একটা সম্বন্ধ এসেছে, কত আদর যত্ন করে সাজিয়ে দিয়েছে মা, তাদের মধ্যে দু' একজন যখন জানিয়েছে, মেয়ে তাদের পছন্দ হয়েছে মোটামুটি, তখন আরও খুশি হয়েছে মা, নিজের হাতে দুধের বাটি তুলে দিয়েছে টিয়ার মুখের কাছে, পাতে দু' টুকরো মাছ দিয়েছে, তারপর দেনা-পাওনার কথায় যখন পিছিয়ে আসতে হয়েছে তখন থেকে চেহারা বদলে গেছে মা'র। রাতারাতি ব্যবহারটা বদলে গেছে। যেন সব দোষ টিয়ার।

এক একদিন হয়তো রেগে গিয়ে মা ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে। মায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদ করেনি। শুধু মুখ বুজে কাজ করে গেছে, ফাইফরমাশ খেটে গেছে।

হঠাৎ কোনদিন হয়তো রেগে গিয়ে মা ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে, পাড়াপড়শি কেউ দেখতে পেয়ে বলেছে, ছি ছি, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলে, মোহনপুরের বউ? কিন্তু টিয়া কাঁদেনি, মুখ নিচু করে বকুনি শুনেছে। আবার একটু পরেই সব ভুলে গিয়ে হেসে হেসে গল্প করেছে মা'র সঙ্গে।

তাই সব সহ্য হয়ে গেছে টিয়ার। সহ্য হয়ে গেছে বলেই এক এক সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ছুটে পালায় রেণুদির বাড়ি, অট্টামার কাছে, কিংবা কালীতলায়।

ভয়ে ভয়েই ফিরছিল টিয়া। কিন্তু বাংলাবাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুকটা কেঁপে উঠল ওর, লজ্জায় অস্বস্তিতে।

জিপ গাড়িখানা তখনও বাংলাবাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল টিয়া। ফিরে গিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকবে কিনা ভাবলে। আর সেই মুহূর্তেই কমলা-বিমলার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

সাহস পেয়ে এগিয়ে গেল টিয়া। দেখলে, বৈঠকখানার উঠোনে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে প্রভাকর। আর গাঁয়ের আরও পাঁচজন তাকে ঘিরে আছে।

এমন অনেকবার দেখেছে টিয়া। ক'বছর ধরেই গাঁয়ের মধ্যে জিপগাড়ি আনাগোনা হচ্ছে থেকে থেকে। সারা বর্ষাকালটা শুধু ওদের কোন পাত্তা থাকে না। রাস্তাঘাটের কাদা শুকিয়ে গেলেই মাঝে মাঝে আসে। কেন আসে তা ভাল বুঝতে পারে না টিয়া। শুধু দেখে গাঁয়ের লোক ওদের ঘিরে দাঁড়ায়, তোষামোদ করে, তারপর এক সময় এর বাড়ি ওর বাড়ি জল খাবার খেয়ে ধুলো উড়িয়ে আবার চলে যায়।

কি কথা হয় ওদের, কেন আসে, জানবার আগ্রহ ওর কম নয়। কিন্তু সাহস করে কোনদিন কাছে যেতে পারেনি। ভয় হয়েছে, গাঁয়ের লোক কি বলবে, মা হয়তো বকুনি দেবে।

ও যে বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে, এ-কথাটা কোন সময়েই যেন ভুলে থাকতে পারে না। তা ছাড়া এই একজনের কাছে এগিয়ে আসতে ওর বড় লজ্জা।

প্রভাকরবাবু। নামটা শুনেছে টিয়া। বেশ চটপটে ছিমছাম চেহারা, বয়সও অল্প। মনে হয়, সবে চাকরিতে ঢুকেছে। তবু একে নিয়ে রাঙাবৌদি আর রেণুদি এমন হাসিঠাট্টা না করলে টিয়া হয়তো এত লজ্জা পেত না।

লজ্জা পায় বলেই এতদিন দূর থেকে দেখেছে ও, কাছাকাছি এসে পড়লেও ছুটে পালিয়েছে। আজ কিন্তু কমলা আর বিমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর সাহস বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, বিমলা মাঝে মাঝে দু' একটা কথাও বলছে, প্রশ্ন করছে প্রভাকরকে।

বিমলা তো টিয়ার চেয়েও বড়। তবে ওর একারই এত লজ্জা হবে কেন। অন্যায় হবে কেন।

দু' বোনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল টিয়া। কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

তন্ময় হয়েই প্রভাকরের কথা শুনছিল ও, গিরিজাপ্রসাদের কথা শুনছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ছোট ভাই বিশু এসে ডাকল। —দিদি, মা ডাকছে।

ধীরে ধীরে যে ভয়টা মন থেকে মুছে গিয়েছিল, যে অস্বস্তি সরে গিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা ফিরে এল আবার।

ভয়ে আতঙ্কে ছুটে পালাল টিয়া। আর ভিতর-বাড়িতে ঢুকতেই দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সেদিকে তাকিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল টিয়া, ওদিক থেকে গম্ভীর গলায় ডাক এল, এদিকে আয়।

অপ্রতিভ মুখে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়াল টিয়া।

আর রাগে ফেটে পড়ল মোহনপুরের বউ। চিৎকার করে বললে, হায়ালজ্জা বলে কিছু নেই তোমার ? ওই ইনেস্পেক্টার ছোকরার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে লজ্জা করে না তোর ? বয়স কমছে না বাড়ছে !

টিয়া মাথা নিচু করে কাঁদো-কাঁদো গলায় শুধু বললে, গল্প করেছি নাকি আমি !

—ওখানে গিয়েছিলি কেন তবে ?

টিয়া কি উত্তর দেবে খুঁজে পেল না, বললে, বিমলাদিও তো রয়েছে ওখানে, কমলাও রয়েছে। বিমলাদি...

কথা শেষ হল না। মোহনপুরের বউ চিৎকার করে উঠল, ওঁরা সব শহুরে মেয়ে, লেখাপড়া করে ওই সব সভ্যতা ভব্যতা শিখেছে, জানা নেই, পরিচয় নেই, তাদের সঙ্গে হাসিতামাশা না করলে যে লোকে পাড়াগেঁয়ে বলবে ওদের।

বলে মুখ বিকৃত করে মনের ঘৃণাটুকু প্রকাশ করলে মোহনপুরের বউ।

তারপর বললে, ওদের বাপের হাঁড়ি হাঁড়ি টাকা আছে, বিয়ের সময় সব পাপ ধুয়ে দেবে টাকা দিয়ে। তোর বাপের তো সেই টাকা নেই, এমনিতেই জমি বেচতে হবে যে...।

বলেই রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

আর টিয়া মুখ তুলে তাকাল দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরখানার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিতে চোখ নামাল।

জেঠিমা দক্ষিণ-দুয়োরির খুঁটি ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রান্নাঘরের দিকে, চোখে তাঁর এক রাশ আগুন ঝরছে।

ভিতর-বাড়িতে কোথায় কি চলছে না চলছে তার কোনও হিসেবই রাখেন না গিরিজাপ্রসাদ। তাঁর মনে তখন একটা নতুন স্বপ্ন জেগেছে। বনপলাশির মাটিতে একটা ইস্কুল গড়ে তুলতে হবে। স্বপ্নটা জাগিয়ে দিয়ে গেছে বি. ডি. ও. প্রভাকর।

ছেলেটিকে বেশ লেগেছে গিরিজাপ্রসাদের। কতই বা বয়েস হবে, বাইশ তেইশ বছরের তারুণ্য তার চোখে-মুখে। সবে চাকরিতে ঢুকেছে হয়তো। তাই মনে প্রাণে তার অনেক কল্পনা, অনেক আদর্শ। একদিকে যেমন সপ্রতিভ, তেমনি বিনয়ী আর ভদ্র।

গিরিজাপ্রসাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছে।

তারপর বলেছে, আপনার মত অভিজ্ঞ শিক্ষিত মানুষ থাকতে একটা ইস্কুল হবে না এ গ্রামে ?

শুনে খুশি হয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। বলেছিলেন, তা মন্দ বলেননি প্রভাকরবাবু,

প্রভাকর সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে মৃদু হেসে বলেছিল, না না, আমাকে শুধু প্রভাকর বলবেন, আপনি বয়স্ক গুরুজন।

শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। বিশ্বাস করতেও বেধেছিল। তাঁরই হাতে-গড়া ছাত্ররা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন দেখা করতে এসেছে—বা ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে যখন, তখনও কত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়েছে তাঁকে। ইস্কুল-জীবনের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছে তাদের সঙ্গে। বেশ বুঝতে পেরেছেন, তাদের অনেকেই তাঁকে এড়িয়ে যেতে চায়। আর পাঁচজনের সামনে লজ্জা পায় মাথা নোয়াতে। অথচ এই অচেনা অজানা ছেলেটির বিনয় দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেননি।

তবু বলেছেন, ইস্কুল একটা গড়ে তোলা কি এত সহজ প্রভাকর !

প্রভাকর হেসে বলেছে, টাকার কথা ভাববেন না আপনি, সে আমি গবর্নমেন্ট থেকে ব্যবস্থা করে দেব।

শুনে গাঁয়ের সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠেছে। মনে মনে খুশি হয়েছে গিরিজাপ্রসাদের ওপর। এমন মানুষটা গাঁয়ে এসেছে বলেই না এত সহজে একটা ইস্কুল গড়ে উঠছে।

কিন্তু প্রভাকরের প্রস্তাবটা শুনেই দমে গিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর বলেছিল, আইনমত পাঁচ হাজার টাকা যদি তুলতে পারেন আপনারা, গবর্নমেন্ট থেকে দশ হাজার টাকা আমি পাইয়ে দেব, ইস্কুল বাড়ি তোলবার জন্যে।

পাঁচ হাজার টাকা ! এই ছোট্ট গাঁ থেকে কি এত টাকা তোলা সম্ভব ? কে দেবে এত টাকা !

গিরিজাপ্রসাদ তাই কথা পাল্টে বলেছেন, এত টাকার দরকার তো নেই প্রভাকর। শুধু কয়েকজন মাস্টারের মাইনের ব্যবস্থা যদি হয় তা হলে তো আমার এই বাংলাবাড়িতেই দিব্যি ইস্কুল বসতে পারবে।

গোপেন মোড়ল তা শুনে হেসেছে। বলেছে, তেমন ইস্কুল তো রয়েছে গো, ওই যে নিত্য দাস মনি-অর্ডারে মাসে মাসে মাইনে পায় আর দু'বেলা স্টেশনে গিয়ে চায়ের দোকান খোলে।

প্রভাকরও সায় দিয়ে বলেছে, হ্যাঁ, সরকারি খাতায় এদিকে হিসেব রয়েছে—প্রাইমারি স্কুল।

গিরিজাপ্রসাদ তাজ্জব বনে গেছেন। প্রশ্ন করেছেন, সত্যি ? গাঁয়ের লোক কিছু বলে না ?

চাটুজ্যেদের হংস বলেছে, কি বলবে আর, এই বাজারে চাকরি পেয়েছে একটা লোক, খেয়ে দোব আমরা ?

প্রভাকরও হেসে বলেছে, সেইজন্যেই তো বলছি, এর বাড়ির উঠোনে ওর বাড়ির বৈঠকখানায় হলে কিছুই হবে না মাস্টারমশাই। আগে চাই ইস্কুলের নিজস্ব একখানা বাড়ি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল বংশী। ও এবার টিপ্পনী কেটে বলে, চাষের জমি আর রইবে না গো গিরিদাদা, সব দালান হয়ে যাবে, শুধু দালান হবে।

বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকায় প্রভাকর।

আর বংশী বলে ওঠে, চটছেন ক্যানে গো বাবু, নিজ্জলা সত্যিটুকু বলছি। ওই দেখেন না, আপনাদের কৃষি অপিস, হেলথ্ অপিস, আরো কত কি। গাঁয়ের মানুষের কি উবকারটা হয়েছে বলুন। আপনারা চাকরি পেয়েছেন ক'টা লোক, এই তো!

গিরিজাপ্রসাদ বাধা দিয়েছেন, আঃ বংশী!

বংশী হেসেছে, ডাক্তারখানা হবে গো গিরিদাদা, ডাক্তার হবে না, সে দেখে নিয়ো তোমরা। ইস্কুলের বাড়িই হবে, মাস্টার আর আসবে না গো, মাস্টার আর আসবে না।

গিরিজাপ্রসাদ মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন বংশীর ওপর। কই, কোনও অন্যায় কথা তো বলেনি প্রভাকর। বরং সাহায্যই করতে চায় ও। বনপলাশিতে একটা ইস্কুল হোক্ আর না হোক্, কি যায় আসে প্রভাকরের। মাস গেলে মাইনেটা তো আর কেউ বন্ধ করবে না তার। মনে হয়েছে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রামগুলোর তাই কোন উন্নতি হচ্ছে না। কারও কোনও উৎসাহ নেই, কারও কোনও চেষ্টা নেই।

গিরিজাপ্রসাদ তাই প্রতিবাদ করেছেন।

আর বংশী হেসে বলেছে, চটছ ক্যানে গো গিরিদাদা, দু'দিন রয়ে বসে দেখো, তখন তুমিও ওই কথা কইবে।

গিরিজাপ্রসাদের কেন জানি জেদ বেড়ে গেছে। বলেছেন, ইস্কুল একটা হবেই এ গাঁয়ে, দেখে নিয়ো।

প্রভাকর খুশি হয়েছে। বলেছে, পাঁচ হাজার টাকা শুধু আপনারা তুলুন। বাদবাকি সব আমি ব্যবস্থা করে দেবো।

বংশী তবু হেসেছে। বলেছে, টাকা ঢাললেই যদি ইস্কুল হত গো মশাই, ওষুধ কিনলেই যদি রুগি সারত...

বংশীর কথায় কিন্তু কেউই কান দেয়নি।

আর গিরিজাপ্রসাদ দিনকয়েক উঠে পড়ে লেগেছেন চাঁদা আদায় করার জন্যে। ঘুরেছেন বাড়ি বাড়ি। দশ বিশ টাকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দু'চারজন, কিন্তু তার বেশি উৎসাহ কেউ দেখায়নি।

শুধু দু'চারজন বলেছে, বরং আপনিই দিয়ে দিন না গিরিজাখুড়ো। ইস্কুলটা নয় আপনার নামেই করা যাবে।

শুনে চটে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। সবাই স্বার্থপর, সবাই স্বার্থপর। কিন্তু ছাই স্বার্থটুকুই কি ভাল করে বোঝে সকলে!

মনে মনে বলেছেন, তেমন টাকা থাকলে কি আর পরের দরজায় ঘুরতাম। নিজেই দিয়ে দিতাম টাকাটা।

না, এসব আদর্শের কথা ভেবে লাভ নেই। দরকার কি বনের মোষ তাড়ানোর।

গাঁয়ের লোকের ওপর চটে গিয়ে ইস্কুলের স্বপ্ন প্রায় ছেড়ে দিতে বসেছিলেন। হয়তো ছেড়েই দিতেন, যদি না অবিনাশ ডাক্তার এসে হাজির হত।

বি. ডি. ও. প্রভাকরকে গিরিজাপ্রসাদের খবরটা প্রথমে অবিনাশ ডাক্তারই দিয়েছিল। জিপটা সেদিন এসে থেমেছিল তারই বাড়ির সামনে।

বনপলাশির লোক নয় অবিনাশ ডাক্তার, গাঁয়ের লোকের মুখে যার নাম, লড়ুয়ে ডাক্তার। লড়ুয়ে ডাক্তার নামকরণের পিছনে অবশ্য একটা ইতিহাস আছে। কোন্ গ্রামের লোক অবিনাশ ডাক্তার, কেন হঠাৎ এ-গ্রামে এসে জমিজমা কিনে বাড়িঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেছে তা কেউই জানে না। শুধু জানে, অবিনাশ ডাক্তার যুদ্ধে গিয়েছিল। আর যুদ্ধে গিয়েই নাকি বাঁ পা-টা তাকে রেখে আসতে হয়েছে। গুলি লেগে ঘা হয়ে পচে

গিয়েছিল বাঁ পায়ের হাঁটু পর্যন্ত, সেটুকু কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

তাই বোধহয় লোকটির ওপর প্রভাকরের এত মায়া। যখনই এ-পথ দিয়ে কোথাও যায়, একবার দেখা না করে ফেরে না।

গ্রামের চৌহদ্দি যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর খানিকটা ডাঙা জমি। আগে একটা আমবাগান ছিল, কয়েকটা জাম কাঁঠালের গাছও। দরজা-জানলা, কড়ি-বরগার জন্যে একে একে গাছগুলো কেটে নিয়েছে চাটুজ্যেরা, নিগনে নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়েছে। সারা গ্রামে এখন আর আম-জাম-কাঁঠালের বাগান নেই একটাও, যা আছে তা হল ছড়ানো ছিটনো কয়েকটা গাছ। এর বাড়ির উঠোনে, ওর বাড়ির ঘাটে।

এই মরা ডাঙার এক প্রান্তে কিছুটা জমি কিনে এক ইঁটের দু'খানা ঘর বানিয়ে নিয়েছে অবিনাশ ডাক্তার।

আর দিনরাত নিজের ঘরখানার সামনেই বসে থাকে ধুতির ওপর খাঁকির বুশ সার্ট পরে। যুদ্ধের পোশাকটার মধ্যেই যেন পুরনো দিনের স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

কেউ কিছু ঠাট্টা করলে বলে, অতগুলো খাঁকি বুশ সার্ট, প্যান্ট, সব ফেলে দেব!

প্রথম প্রথম ঠাট্টা করত অনেকে। কিন্তু ইদানীং আর কেউ কিছু বলে না। বলার সুযোগও হয়তো পায় না কেউ। কারণ এমনিতেই অবিনাশ ডাক্তারের বাড়িটা গ্রামের এক প্রান্তে, তার ওপর গ্রামের লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশতেও চায় না সে।

যত বন্ধুত্ব বিশ-বাইশ বছরের বি. ডি. ও. প্রভাকরের সঙ্গে।

তাই জিপখানা এসে থামতেই ক্রাচ দুটো দু' বগলে জুড়ে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল অবিনাশ ডাক্তার। চিৎকার করে উঠল, এই যে ব্লকহেড যে! কি খবর, এতদিন যে টিকিটাও দেখতে পাইনি। নট্ ইভন্ দি সেক্রেড হেয়ার।

ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বলেই অবিনাশ ডাক্তার তাকে ঠাট্টা করে ব্লকহেড বলে। কিন্তু রসিকতাটা প্রভাকর নিজেও উপভোগ করে।

প্রভাকর নেমে এল জিপ থেকে। হেসে বললে, যা কাদা আপনাদের গাঁয়ে, বর্ষাকালে কি আসবার উপায় আছে।

—তাই? না মাছটাছ পাওয়া যাচ্ছে না ওদিকে?

প্রভাকর লজ্জিত হয়ে বলে, আজ্ঞে না, একটু কাজ ছিল কুলডাঙায়...

অবিনাশ ডাক্তার হেসে উঠল।—কাজ? মানে ডেভেলপমেন্ট? কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, দুধ ঘি মুর্গি খেয়ে শরীরের উন্নতি? অ্যাঁ? না কি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের?

বলেই ডাক দিলে, পার্বতী! পার্বতী! বি. ডি. ও. সাহেব এসেছেন রে, চা বানা, চা বানা।

প্রভাকর ততক্ষণে টিনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে।

তারপর প্রশ্ন করে, খবর-টবর আছে কিছু?

অবিনাশ ডাক্তার কপাল কুঁচকে কি যেন ভাববার চেষ্টা করে, বোধ হয় খবর খুঁজে বের করার জন্য। তারপর হঠাৎ বলে, আছে। এ গ্রেট নিউজ।

—কি ব্যাপার?

অবিনাশ ডাক্তার দু' বগলের ক্রাচ দুটো এক হাতে নিয়ে আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ে বলে, গ্রামে একজন এডুকেটেড ম্যান এসেছে, এ রিয়েল এডুকেটেড ম্যান। গিয়ে একবার দেখা করে আসুন।

দেখা করেছিল প্রভাকর, আর তার কাছ থেকে ইস্কুলের খবরটা শুনেছিল অবিনাশ ডাক্তার।

তাই ছুটে এল সেদিন ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে। এসে গিরিজাপ্রসাদকে বললে,

আপনি তো পায়ের ধুলো দিলেন না মাস্টারমশাই, তা আমার এই কাঠের পায়ের ধুলোই দিতে এলাম। বলে কৌতুকে হেসে উঠল অবিনাশ ডাক্তার।

গিরিজাপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করলেন। লোকটির কথা শুনেছেন, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসবেন মনেও হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

অবিনাশ ডাক্তারকে দেখে তাই গিরিজাপ্রসাদের মনটা যেন আপনা থেকেই সহানুভূতিতে নরম হয়ে গেল। আহা বেচারি! একটা পা নেই, কাঠের হাতলে ভর দিয়ে দিয়ে চলাফেরা করতে হয়।

নিজে গিয়ে দেখা না করার জন্যে অপরাধী মনে হচ্ছিল গিরিজাপ্রসাদের। কিন্তু মানুষটা নিজের শারীরিক দৈন্য নিয়ে এমন ভাবে ঠাট্টা করবে, ভাবতেই পারেননি।

গিরিজাপ্রসাদ বাধা দিয়ে তাই বলে উঠলেন, না না, যাব যাব ভাবছিলাম...

অবিনাশ ডাক্তার হেসে উঠল।—উঁহু, নিজের স্বার্থেই এলাম, ফর সেল্‌ফ্ ইন্টারেস্ট। শেষে ফাঁকি পড়ে যাব?

গিরিজাপ্রসাদ কথাটা বুঝতে পারলেন না, বিস্ময়ের চোখে তাকালেন অবিনাশ ডাক্তারের মুখের দিকে।—ফাঁকি?

অবিনাশ ডাক্তার হেসে উঠল আবার।—সব খবর পাই মাস্টারমশাই, সব খবর। ইস্কুলের জন্যে ইউ আর কালেকটিং সাবস্‌ক্রিপশন্‌স্। অথচ আমি হয়ে গেলাম আউটকাস্ট?

গিরিজাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, চাঁদা তো কেউ দেয়নি, এ গাঁয়ে দশ-বিশ টাকার বেশি কেউ দেবে না, কেউ দেবে না।

অবিনাশ ডাক্তার হেসে বললে, দেবে না নয়, দিতে পারবে না বলুন। উই আর অল লিভিং হিয়ার ইন কন্‌স্ট্যান্ট ওয়ান্ট, নয় কি? তবে হ্যাঁ, আমি দেব, পাঁচশো টাকা দেব আমি, ইন টু ইনস্টলমেন্টস্।

পাঁচশো টাকা! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ, যেন বিশ্বাস করতেও বাধছে। এ গ্রামের মানুষই নয় যে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নেই যে মানুষটার, সে এক কথায় পাঁচশো টাকা দিতে চাইছে!

মুগ্ধ বিস্ময়ে অবিনাশ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর সে চলে যাবার পর যাকে দেখেন তাকেই বলেন, গাঁয়ে একটা মানুষের মত মানুষ আছে হে, ওই অবিনাশ ডাক্তার, পাঁচশো টাকা দেবে বলেছে।

কথাটা শুনে কিন্তু কেউই সায় দিল না তাঁর কথায়। কেউ কেউ শুধু মুখ টিপে হাসল।

শুধু গোপেন মোড়ল বললে, ইস্কুল ইস্কুল তো করছ, শেষ অবধি ঝক্কি সামলাবে কে? চাষবাস দেখাশোনা করবে সবাই, না ইঁট সিমেন্টের হিসেব রাখবে!

আর গিরীন বললে, চাঁদা তোলার দরকারটাই বা কি। ঘরের টাকা বের করে আজকাল কেউ ইস্কুল-টিস্কুল করে নাকি?

তারপর একটু থেমে হেসে বললে, ওসব ফাঁকফিকির তো জানো না তোমরা। ঘর থেকে টাকা বের না করেও হয়। বলে গোপেন মোড়ল আর গিরীন চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল।

গিরিজাপ্রসাদ তখনও যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। বললেন, তা কি করে হবে, প্রভাকর যে বললে...

গিরীন হেসে বললে, খাতায় কলমে পাঁচ হাজার টাকা দেখিয়ে দিলেই হবে, ইঁটের দাম,

রাজমিস্ত্রির রোজ এই সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে...

গোপেন মোড়লও হাসল। —তা ঠিক, আর গরমেন্টের দু' চারজনকে শ-পাঁচেক টাকা খাইয়ে দিলেই...

গিরিজাপ্রসাদ শুনছিলেন কথাগুলো, ক্রমশ যেন অসহ্য ঠেকছিল তাঁর।

হঠাৎ রেগে ফেটে পড়লেন এবার। —চাই না ইস্কুল, এ গাঁয়ে ইস্কুল না হওয়াই ভাল।

বলে রেগে চলে গেলেন। ছি ছি ছি। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেল গিরিজাপ্রসাদের। দেশের মানুষগুলো দিনে দিনে এমন অমানুষ হয়ে গেছে! ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই কোন?

কিন্তু গোপেন মোড়ল আর গিরীন দু'জনেই নির্বিকার।

গিরিজাপ্রসাদ রেগে দপ দপ করে পা ফেলে চলে যেতেই দুজনে হেসে উঠল।

আর গোপেন মোড়ল বললে, ইস্কুলটা হলে মন্দ হয় না, কালীতলার সামনের উঠোনটা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে নেওয়া যেত, পুজোর সময় যা কাদা হয়...

সাত

শব্দটা ভেসে আসছিল অনেক দূর থেকে। ক্রমে ক্রমে কাছে আসতে শুরু করল কাহারদের গলার সুর। আটজন কাহার পালকিবাহীর আট জোড়া পায়ের দপ দপ তালে তালে 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' সুরটানা চিৎকার। কিন্তু এই গানের কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ। গাঁয়ের মেয়ে-বউরা যে যেখানেই থাকুক ছুটে আসে। খিড়কির দরজায় কিংবা পুকুর-ঘাটে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির চোখে তাকিয়ে দেখে পালকির ভিতরের মুখ দুটি।

পড়তে বসেছিল গিরি। আর উঠোনের এক প্রান্তে বসে সারকুড়ের পাশের ছোট্ট শাকসব্জি বেগুনচারা বসানো বাগানে বাঁশের বাতা দিয়ে বেড়া বাঁধছিল বংশী।

অর্থাৎ গিরিদাদার পড়া শেষ হলেই ছিপ নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়বে মাছ ধরতে।

কিন্তু পালকির শব্দে দু'জনেই কান খাড়া করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে গিরির মা, ঠাকুমা, দিদি সবাই পড়ি কি মরি করে ছুটল যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল সেদিকে। হ্যাঁ, মুঞ্জলা থেকে ইস্টিশনের দিকে চলেছে যেন পালকিটা।

হাতের ঘটিটা ফেলে দিয়ে দিদি ছুটতে ছুটতে বললে, মুঞ্জলার কোঁয়ারদের মেয়ে-জামাই চলল বোধ হয়।

শুনে গিরির মাও ছুটে গেল হাসি-হাসি মুখে।

গিরি আর বংশী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বললে, চ' দেখে আসি।

দু'জনেই বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রায়পুকুরের পাড়ে। দেখলে, মুঞ্জলার দিক থেকেই আসছে পালকিটা, মাঠ পার হয়ে, স্টেশন যাবার রাস্তা ধরে।

গাঁয়ের গা বেয়ে চলে গেছে মেটে রাস্তাটা, আর তার দু'ধারে অপেক্ষা করে আছে বউ-ঝিয়ের দল। সবার মুখেই হাসি, সবার মুখেই পরম তৃপ্তি!

গিরি দেখলে, গুপ্তবাড়ির শাশুড়ি ও বউ—যারা দিনরাত ঝগড়াঝাটি করে চিৎকার করে আকাশ ফাটায়, তারাও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে, পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করে কি যেন বলাবলি করছে।

ওদিকে চাটুজ্যেদের মেজবউ আর ধীরেন সাঁইয়ের মেয়ে নুটু তখন শাঁখ বাজাচ্ছে থেকে থেকে।

পালকিটা কাছাকাছি এসে পড়তেই সবাই উলু দিয়ে উঠল।

বেহারাদের বলতে হল না কিছু। মিনিটখানেকের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

গিরির মা আর আরও ক'জন এগিয়ে গিয়ে পালকির কপাট খুলে মেয়ে-জামাই দেখল। কনের সিঁথিতে শাঁখায় সিঁদুর ঠেকাল কেউ।

গাঁয়ের সবাই প্রায় অচেনা, তবু মেয়েটার লাল বেনারসী আর রক্তবস্ত্রের চেলির ঘোমটায় ঢাকা চন্দনে আঁকা মুখখানা লজ্জায় কোলের কাছে নুয়ে পড়ল। জামাইয়ের কচি মুখখানাও।

চাটুজ্যেদের মেজবউ কাকে চেঁচিয়ে ডাকল, একটু নবাত নিয়ে আয় লো।

নবাত, অর্থাৎ পাটালি গুড় নিয়ে এসে হাজির হল কে। গিরির দিদি ছুটে গিয়ে নিয়ে এল নারকোল-নাড়ু আর এক গ্লাস জল।

মেয়ে-জামাইয়ের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ধরল গিরির মা।

কি লজ্জা জামাইটার। গিরির চেয়ে দু'চার বছরের বড় হবে হয়তো। লজ্জা হবে না! তাই কিছুতেই মিষ্টিমুখ করতে চায় না সে। আর গিরির মা ততই হাসতে হাসতে তার মুখের কাছে গুঁজে দিতে যায় নাড়ুটা। বলে, খাও লক্ষ্মী বাবা আমার, একটু মিষ্টিমুখ করতে হয় বাবা, নইলে গাঁয়ের অমঙ্গল হয়।

পালকির পিছনে বরপক্ষের লোক ছিল দু'জন। তারা জামাইকে বললে মিষ্টি খেতে।

মিষ্টিমুখ করিয়ে জল খাইয়ে পালকি ছেড়ে দিল সবাই। শাঁখ বাজাল, উলু দিল। আর পালকি চলে গেল দপ-দপ দপ-দপ শব্দ করে।

গিরির মা আর ঠাকুমা বলাবলি করলে, চমৎকার মানিয়েছে দুটিতে, ঠিক যেন হরগৌরী, না মা?

ঠাকুমা হেসে সায় দিল। বললে, গিরির আমার ঠিক অমনি বিয়ে দেব, বুঝলে বড়বউ। আহা, কি সুন্দর চোখ দুটো দেখলে কনের—যেন পদ্মপলাশ। আর জামাইয়ের রংটাও বেশ মাজা-মাজা।

গিরির মা বললে, জামাইয়ের মুখটাও খুব মিষ্টি মা, অমনি জামাই যদি করতে পারি, তবে তো? আমার চাঁপারানী কি সে ভাগ্য করেছে!

নিজের বিয়ের কথা শুনে যেমন লজ্জা পেয়েছিল গিরি, তেমনি মজা লেগেছিল দিদির বিয়ের কথায়।

বাড়ি ফিরেই বলেছিল, তোমার ঠিক অমনি বর হবে দিদি, মা বলেছে।

অতশত কিছু না বুঝেই বলেছিল ও, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল চাঁপা।

কিন্তু গিরির মন বলত দিদির ঠিক অমনি বিয়ে হবে, অমনি বর, আর ঠিক ঐরকম পালকিতে চড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে দিদি।

সেদিন অবশ্য মার খেয়েও কিছু বলেনি ও, শুধু দিদির ওপর অভিমান হয়েছিল। কেন মারল দিদি, তাও ভাল করে বুঝতে পারেনি। তবে কি ওই রকম বর পছন্দ নয় দিদির? না কি বিয়েই করতে চায় না?

মনের মধ্যে প্রশ্নটা চেপে রেখেই বেরিয়ে গিয়েছিল বংশীর সঙ্গে। আর ওকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গিয়েছিল বংশী। বলেছিল, দাঁড়াও গিরিদাদা, ডাঁরটা নিয়ে আসি। ভাল চার করে রেখেছি বোলতার ডিম দিয়ে, দেখবে কেমন টপাটপ মাছ উঠবে আজ।

তারপর এক সময় দু'খানা ছিপ নিয়ে এসেছিল বংশী। গিয়ে বসেছিল চাটুজ্যেদের পুকুরে।—খুব মাছ পুকুরটায়, গিরিদা। ঘাই দেখে মনে হয়, পাঁচ-সাত সের হবে এক-একটা।

পাঁচ-সাত সের। আনন্দে ডগমগ করে উঠেছিল গিরি, যেন পুকুরের মাছ ওর হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

দুপুরের ফুটিফাটা রোদ্দুরে দু'জনে দু'খানা ছিপ নিয়ে বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার দিকে চোখ রেখে। চার ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু ফাতনা নড়েনি।

এদিকে মনে মনে স্বপ্ন দেখছে গিরি, বিরাট একটা রুই মাছ উঠেছে ওর ডাঁরে। যেন বাড়ি নিয়ে গিয়ে মা-বাবা-দিদি সবাইকে তাজ্জব করে দিয়েছে। সবাই বাহবা দিচ্ছে, সে কি রে গিরি? এত বড় রুই মাছ তুই ধরেছিস? হুইল না নিয়ে, শুধু ডাঁরে ধরেছিস এত বড় মাছটা?

ফাতনার দিকে চোখ রেখে রোদ্দুরে ঘামতে ঘামতে নানা উদ্ভট সব কথা কল্পনা করেছে গিরি। তারপর ফাতনাটা যেই নড়ে উঠেছে অমনি জোর টান দিয়েছে। তারপরই হতাশ হয়েছে ও। না, কেঁচোর টোপটা খেয়ে পালিয়েছে মাছটা। আবার বঁড়শিতে নতুন করে টোপ গেঁথে জলে ফেলেছে। এক সময় মাথায় হাত দিয়ে দেখেছে রোদ্দুরে মাথা পুড়ে যাচ্ছে। তবু নড়েনি।

এদিকে বংশী বিরক্ত হয়ে উঠেছে থেকে থেকে। তারপর বলেছে, জায়গা বদলাও গো গিরিদাদা, চাটুজ্যেদের কেউ হয়তো এখানে চার ফেলেছিল আগে।

বলে, উঠে গিয়ে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় বসে ছিপ ফেলেছে বংশী। গিরি তবু সেখানেই বসে থেকেছে। একটা মাছ না নিয়ে উঠবে না ও কিছুতেই।

বার বার ফাতনা নড়েছে, বার বার হেঁচকা টান দিয়েছে গিরি, কিন্তু মাছ ওঠেনি। প্রতিবারেই টোপ খেয়ে পালিয়েছে মাছগুলো।

কিন্তু মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে গিরি, মাছ নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও বাড়িতে, মা'র সামনে, আর সকলেই প্রশংসার চোখে তাকিয়েছে ওর মুখের দিকে। ভাবতে ভাবতে কেমন একটা ঝিমুনির মত এসেছে গিরির।

হঠাৎ একবার চমকে উঠে ঝিমুনিটা কেটে গেছে, দেখেছে, না—ফাতনা যেমনকার তেমনি, নড়ছে না।

নিজের মনেই হতাশ হয়ে পড়েছে গিরি। তবু বলেছে, মাছ যদি পাই বংশী, মাকে গিয়ে বলব, যেন দিদিকে খেতে না দেয়। যেমন মিছিমিছি মারল আমাকে, বুঝবে তখন। বলে হেসে উঠেছে ও।

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়েছে বংশী।—আঃ গিরিদাদা! কথা বোলো না।

তাই তো, শব্দ শুনলেই যে মাছ পালাবে। চুপ করে গিয়েছে গিরি।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। উঠি উঠি করছে ও, আর সেই সময় বংশী ছুটে এসে সজোরে টান দিয়ে তুলেছে গিরির ছিপটা।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে লাফিয়ে উঠেছে গিরি। ছুটে গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে মাছটা। না, পাঁচ-সাত সের না হলেও বেশ বড়, সের দেড়েকের কাতলা একটা।

গিরি একমুখ হেসে বলেছে, কি সুন্দর রুপুলি রং দেখ বংশী!

বংশী হেসেছে।—গেঁজো গোড়ের মাছ তো নয় গো গিরিদাদা, চাটুজ্যেদের পুকুরের মাছ জানবে গাঁয়ের সেরা। তোমার বরাতটা বড় ভাল গো!

গিরি হেসে বলেছে, তোর বরাতও ভাল রে বংশী, আরেকটু বসে দেখ না।

বংশী হেসেছে।—বরাত থাকলে কি কোটালের ঘরে জন্ম হয় গো!

কথাটা হঠাৎ যেন বুকে গিয়ে লেগেছে গিরির। মনে হয়েছে, সত্যি, বড় দুঃখ বংশীর। বাপটা মাতাল, মা খেতে পায় না তবু মুখ বুজে শুধু মার খায়। আর বংশী! এত পড়াশুনোর নেশা বেচারির, ইস্কুলে পড়ার এত শখ, তবু পড়তে পায় না।

কপালে নেই বলেই বুঝি এমন হয়েছে। তা না হলে...

গিরি হঠাৎ বলে উঠেছে, এটা তো তোরই মাছ বংশী, তুই তো ধরেছিস।

বংশী হেসে বলে, তা কখনও হয় গো, ডাঁর হল তোমার, আর মাছ হবে আমার ?

না, মাছটা কিছুতেই নিতে চায়নি বংশী। শেষে গিরি বলেছে, বেশ, তবে রেতের বেলায় কিন্তু আমাদের বাড়ি খাবে তুমি, হ্যাঁ।

বংশী হেসে বলেছে, তা খাব।

মাছটা হাতে ঝুলিয়ে বাঁ কাঁধে ছিপ নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে গিরির। আর পিছনে পিছনে যেতে যেতে বংশী হঠাৎ এক সময় ডেকেছে, গিরিদাদা!

—কি রে ? ফিরে দাঁড়িয়েছে গিরি।

বংশী মুখ কাচুমাচু করে বলেছে, দুটো খান আমাকে দিয়ো গিরিদাদা।

গিরি বিস্মিত হয়ে বলেছে, ক্যানে রে ?

—মায়ের নেগে নিয়ে যাব।

গিরির মনটাও ভিজে গেছে বংশীর কথায়। বলেছে, দোব দোব, দুটো ক্যানে, চারটে দোব তোকে, মাছটা কাটা হোক্ তো...

বলেই ছুটতে ছুটতে বাড়ি ঢুকেছে গিরি। চিৎকার করে বলেছে, ও মা, মা! দেখো কত বড় মাছ ধরেছি!...

মা দিদি সবাই এসেছে, খুশির চোখে মাছটার দিকে তাকিয়ে বলেছে, তাই তো রে, কোথায় পেলি ?

—আমি ধরেছি, আমি নিজে! সগর্বে হাসতে হাসতে বলেছে গিরি। বংশীর সামনেই মিছে কথাটা বলতে আটকায়নি ওর।

আর মা শুধিয়েছে, কোন্ পুকুরে ধরলি রে ?

—চাটুজ্যে-পুকুরে।

সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখচোখের হাসি উবে গেছে, আর থমথমে সে-মুখের দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে উঠেছে গিরির।

ক্রুদ্ধ গম্ভীর গলায় মা বলেছে, চাটুজ্যেদের পুকুরে অংশ আছে আমাদের ? ছি ছি ছি, রায়বাড়ির ছেলে হয়ে মাছ চুরি করেছিস তুই ?

বলেই এক হাতে গিরির চুলের মুঠি আর অন্য হাতে মাছটা নিয়ে ওকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে চাটুজ্যেদের বাড়িতে নিয়ে গেছে।

সব শুনে চাটুজ্যেদের বড়বউ, মেজবউ ছুটে এসে গিরিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, তোমার কি কাণ্ড দিদি, ওইটুকু এক ফোঁটা ছেলে, ও কি জেনেশুনে করেছে! ও মাছ তুমি নিয়ে যাও, গিরি আমার ধরেছে, ওই খাবে।

কিন্তু গিরির মা রাজি হয়নি কিছুতেই।

উত্তর দিয়েছে, না ভাই, কর্তা শুনলে রাগ করবে, ও মাছ আমি নিতে পারব না।

বলে বেরিয়ে এসেছে চাটুজ্যেদের বাড়ি থেকে, কারও ডাকে ফিরে তাকায়নি। আর পিছনে পিছনে এসেছে গিরি, লজ্জায় হতাশায় মুখ নিচু করে, ছল্ছল্ চোখে।

বেরিয়ে এসে দেখেছে, দূরে উৎসুক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বংশী। চোখোচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে গিরি। সমস্ত বুক ঠেলে কান্না এসেছে ওর, তবু একটা কথাও বলতে পারেনি মাকে।

লজ্জায় আর অস্বস্তিতে ক'দিন মুখ তুলে বংশীর দিকে তাকাতে পারেনি গিরি। কেবল মনে হয়েছে, আহা, বেচারি মাছটা ধরল, কত আশা করে দু'টুকরো মাছ চেয়েছিল ওর

মায়ের জন্যে, তাও দিতে পারলাম না।

মাকে বলতে পারেনি কথাটা, কিন্তু মনের মধ্যে ভীষণ রাগ হয়েছিল গিরির। শুধু রাগ ? না, অভিমানও। মনে হয়েছে, মা ওকে একটুও ভালোবাসে না। ভালবাসলে ওর মনের কথাটা কি আর বুঝতে পারত না, ওর দুঃখটা কোথায় টের পেত না।

গোঁসাইদিদিকে ওর তাই খুব ভাল লাগত। একেবারেই মা'র মত নয়। মুখে রাগ নেই, বিরক্তি নেই, কোন দুশ্চিন্তাও নেই যেন। সদাই হাসিখুশি, মুখের কথাগুলোও কি মিষ্টি।

মা হেসে বলত, ঝোলাগুড়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে কথা বলে ওরা।

বাবা বলত, তুমিও একটু শিখে নাও না বাপু, চিনির রসে ডুবিয়েই নয় বলো কথাগুলো।

গিরির মনে আছে, এ-কথা শুনে মা চটে যেত। আর মনে আছে, গাঁয়ের মধ্যে শুধু চাটুজ্যেদের ছোটকাকা চা খেত, কাশীর চিনি দিয়ে।

সাদা চিনি কেউ খেত না, ঘরে ঢুকত না কোন বাড়িতে। সবাই ভাবত হাড়ের গুঁড়ো থাকে সাদা চিনিতে, হাড় দিয়েই নাকি সাদা করে। তাই পুজোর জন্যে শুধু হলদে রঙের ধুলোর মত সেই কাশীর চিনি কেনা হত।

বড়-বড় দানা সাদা চিনি কেনা হল প্রথম, যেবার গিরির দিদিকে দেখতে এল বরপক্ষ।

খবরটা দিয়েছিল গোঁসাইদিদি। নাকে কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটাতিলকে গোঁসাইদিদির তেলচিকন গোলগাল ভরাট মুখখানা বড় সুন্দর লাগত। চোখ দুটো বড় বড় আর কেমন একটা ঠাণ্ডা নরম চাউনি সে-চোখের। মুখে সব সময় তৃপ্তির হাসি।

দিব্যি মোটাসোটা, ঈষৎ শ্যামলা গায়ের রং, কালোপাড় সাদা শাড়িখানা আঁটসাঁট করে জড়ানো, গলায় তুলসীকাঠির মালা। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত গিরির।

সেদিনও খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল গোঁসাইদিদি। গান থামেনি তখনও। কি মিষ্টি গলা, আর কি মধুর সুর !

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে গোঁসাইদিদি তখনও গাইছে—'গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা, রাধাকান্ত একান্ত তুমি ভরসা।' গানের তালে তালে বাজছে খঞ্জনি।

তারপর হঠাৎ গান বন্ধ করে ডাক ছাড়লে গোঁসাইদিদি, কই গো, আমার গিরিগোবর্ধন কই ?

হাসি-হাসি মুখে গিরি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, এই যে আমার নিতাই, শচীনন্দন, শচী-মা আমার কোথায় গো ?

গোঁসাইদিদির কথাগুলোয় খুব মজা লাগত।

গিরি হেসে বললে, এই বলছ গিরিগোবর্ধন, আবার এই বলছ নিতাই, তুমি কি গো গোঁসাইদিদি।

গোঁসাইদিদি সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হেসে খঞ্জনি বাজিয়ে গেয়ে উঠল, যে গিরি সেই গিরিধারী, যে নিতাই তিনি নিত্যানন্দ, আমি কমলে ভ্রমরে চাঁদে চন্দনে দেখি যে একই আনন্দ। বুঝলে গোপাল, সবই তিনি, যেদিকে তাকাও সেই পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ। বলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে বসল রান্নাঘরের সিঁড়ির ধাপে।

সঙ্গে সঙ্গে বেতের কোঠায় করে চাল এনে দাঁড়াল মা, আর গোঁসাইদিদি কাঁধে ঝোলানো কাঁথার থলেটা ফাঁক করে ভিক্ষে নিল। তারপর হেসে বললে, খপর আছে গো বুন। আমার চাঁপাদিদির সম্বন্ধ এনেছি। ...

গিরি দেখলে, কথাটা শুনেই মা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বললে।

এমন অনেকবার দেখেছে গিরি। বুঝেছে। কিন্তু দিদির বিয়ের কোন সম্বন্ধ এলে কেন যে মা-জেঠিমাকে, পাড়ার কাউকে শুনতে দেয় না, কেন যে সবকিছু গোপন করে রেখে তলে তলে বাবাকে চেষ্টা করতে বলে বুঝতে পারত না।

বংশীকে বলেছিল একদিন সে-কথা।

বংশী হেসে বলেছিল, তাও বুঝলে না, গিরিদাদা, আর কেউ শুনলে যে ভাঙানি দেবে, নয়তো নিজের মেয়ের নেগে চেষ্টা করবে। মোড়লদের রানীর বিয়ে সব ঠিকঠাক, দেখলে না নিরু শুঁই তিনশত টাকা বেশি দিয়ে ওনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল।

শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল গিরি। এমনও হয়? হাটে গিয়ে দেখেছে, একজন দর করলে আর কেউ বেশি দর দেয় না, কাপাসগাঁয়ের জমিদারবাবুরাও না। অথচ মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে...

কথাটা বংশীকে বলে ফেলে গিরির তাই ভয় হয়েছিল। ও আবার কাউকে বলে ফেলবে না তো!

পরমুহূর্তেই নিজের বোকামিতে নিজেই হেসেছে গিরি। কি আর বলবে বংশী? চাঁপাদিদির বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে, এই কথা? কার সঙ্গে কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে কিছুই তো বলেনি। আর বলবেই বা কি করে, গিরি নিজেই কি জানে নাকি। গোঁসাইদিদিকে ঠাকুরবাড়িতে আড়ালে নিয়ে গিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে মা ফিসফিস করে কি বলা-কওয়া করেছে তা কি গিরিই জানে নাকি।

কিন্তু দিদির বিয়ের কথা হচ্ছে শুনে খুব ফূর্তি হয়েছিল ওর। তা হলে মা বোধহয় আর রাগবে না, মুখ গোমড়া করবে না, কথায় কথায় বকবে না দিদিকে।

মাসখানেক পরেই যে সত্যি সত্যি মেয়ে দেখতে আসবে পাত্রপক্ষের লোক, ভাবতেই পারেনি।

জেলেদের খবর দেওয়া ছিল, ভোরবেলাতেই তারা জাল নিয়ে এসে রায়পুকুরে দু' দুটো শোলা নামাল।

ছুটির পর জনপুরের ইস্কুল খুলে গেছে তখন। প্রতিদিন খেয়েদেয়ে কৌটোয় দুপুরের রুটি তরকারি আর বই-খাতায় ভর্তি টিনের বাক্সটা নিয়ে ছোট লাইনের রেল ধরে ধরে ইস্কুলে যায় গিরি।

কিন্তু সেদিন একেবারেই ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ওর।

মা নিজেই এক সময় বললে, আজ তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না গিরি, চাঁপাকে দেখতে আসবে আজ, তুইও থাকিস। কখন কি দরকার পড়ে।

শুনে ফূর্তি আর ধরে না গিরির। ছুটতে ছুটতে চলে গেল রায়পুকুরে মাছ ধরা দেখতে। খুব বড় বড় মাছ ছিল রায়পুকুরে। সব পরিবারেরই কোন না কোন পুকুরে মাছ রাখা থাকত। বিয়ে অন্নপ্রাশন পৈতের সময় ছাড়া ধরা হত না। তাই মাছগুলো বড় হত খুব—দশ পনেরো সের—বিশ সের।

বাবা বলত, রায়পুকুরেও নাকি পাঁচ ছ'টা আধ-মণি মাছ আছে।

জেলেদের ডেকে বাবা বললে, একটা ধরলেই হবে, বড় দেখে ধরিস। কিন্তু দেখিস বাবা, বেশি দেরি না হয় যেন, ওঁরা আসার আগেই যেন হয়।

জেলেরা বললে, সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন গো বাবুমশাই।

বলে শোলা নিয়ে নেমে পড়ল জলে। অসংখ্য শোলা আড়াআড়ি করে বেঁধে একটা পাটার মত করে জলে ভাসিয়ে দিত জেলেরা। জলের ওপর ভেসে থাকত সেটা। আর তার ওপর এক হাতে জাল, অন্য হাতে লগি নিয়ে সারা পুকুর ঘুরে বেড়াত তারা জাল ফেলতে ফেলতে।

সেদিনও লগি ঠেলে ঠেলে মাঝ-জলে এগিয়ে গেল জেলেরা, তারপর এক এক জায়গায় লগিটা পাঁকে গেঁথে সেটায় পিঠ দিয়ে জাল ফেলে, জাল টানে, কিন্তু মাছ আর ওঠে না। যা-ও বা দু' একটা ছোট পোনা, ফলুই, নয় তো কালবউস। জাল ঝেড়ে-ঝেড়ে সেগুলো আবার জলে ফেলে দেয় তারা।

শেষে অনেক বেলায় একটা বড় মাছ ধরা পড়ল।

আর গিরি দেখলে, বাবা এতক্ষণ পাগলের মত একবার করে আসছিল আর খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল, মুখে-চোখে কি দুশ্চিন্তা, কিন্তু মাছটা ধরা পড়তেই মুখের ভাব সঙ্গে সঙ্গে যেন পাল্টে গেল। যেন দিদির বিয়েটা ঠিক হয়ে গেছে।

একটা বড় মাছ ধরা পড়ার সঙ্গে দিদির বিয়ের কি সম্বন্ধ কিছুতেই বুঝতে পারল না গিরি।

এদিকে তখন মোড়লরা এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবা জিগ্যেস করলে, কি গো, ভাগ নেবে নাকি ?

রায়পুকুরে মোড়লের চার আনা অংশ—সেই প্রথম শুনল গিরি।

মোড়লরা বললে, ভাগ নিয়ে কি হবে, হিসেবে ধরে রাখো, মেয়ের তত্ত্ব পাঠাবার সময় ধরিয়ে নেব।

মাত্র তিন চারজন লোক আসবে দিদিকে দেখতে, এত মাছ কি হবে ভেবে পেল না গিরি। তাই মাকে মাছটা কুটতে দেখে প্রশ্ন করলে।

মা হেসে বললে, প্যাকা মাছ না খেতে দিলে কি ভাববে জানিস ? ভাববে মাছ নেই আমাদের পুকুরে, এখানে বিয়ে দিলে তত্ত্ব পাবে না ভাল।

শুনে বিস্মিত হয়েছিল গিরি। আশ্চর্য, বিয়ের সঙ্গে মাছের কি সম্পর্ক। মেয়ে দেখতে আসে যারা, তাদের কারো মেয়ে পছন্দ হয়, কারো মেয়ে পছন্দ হয় না।

সেই প্রথম জানল। মেয়ে পছন্দ-অপছন্দ আসল নয়। দেনাপাওনা, বংশ, বাড়ির অবস্থা এগুলোই নাকি আসল।

তবু মনে মনে গিরি চেয়েছিল দিদির বিয়েটা যেন হয়ে যায়। কিন্তু বরপক্ষের জন চারেক লোক যখন বাণেশ্বর থেকে এসে পৌঁছল গাঁয়ে, বাংলাবাড়ির সামনে এসে থামল গরুর গাড়িটা, আর গাড়ি থেকে লোকগুলো নামল, তখন একটুও ভাল লাগেনি গিরির।

শুনেছিল বাণেশ্বর গাঁয়ে বরের বাবার নাকি অনেক জমিজমা, ছ' আনা জমিদারির অংশ, আরও কত কি। কিন্তু বরের বাপকে দেখে বিরক্ত হয়েছিল ও, মনে মনে বলেছিল, বিয়েটা যেন না হয়। এই নাকি জমিদার ? কালো কুচকুচে রং, মাথার মাঝখানে টাক, একটা গলাবন্ধ কোটের ওপর চাদর জড়িয়ে সে-চেহারাটা আরো বিশ্রী দেখাচ্ছিল। হাতে একটা রুপো-বাঁধানো ছড়ি নিয়ে নেমেছিল লোকটা, হলদে মোজা আর চকচকে কালো জুতো পায়ে মচমচ করে বাবার পিছনে পিছনে হেঁটে গিয়ে বাংলাবাড়িতে বসেছিল তারা।

বাংলাবাড়িতে একটা গালিচা পাতা ছিল, আর ভটচাজ-বাড়ি থেকে চেয়ে আনা গড়গড়াটা।

লোকটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে গড়গড়া টানছিল, আর তার সঙ্গের বুড়ো বুড়ো লোকগুলোও এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন তারাও এক-একজন জমিদার।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল বাবাকে। বরের বাপ আর তার সঙ্গের লোকগুলোর সঙ্গে গিরির বাবা হাতজোড় করে কথা বলছিল। এমন ভাবে কথা বলছিল যেন বাবাও তাদের বাড়ির মুনিশ। বাবার ওপর মনে মনে রেগে গিয়েছিল গিরি, বাবা যখন গাড়ু হাতে জল ঢেলে দিল আর বরের বাপ মোজা খুলে পা বাড়িয়ে দিল গাড়ুর তলায়।

খাওয়ার সময়েও কি তোয়াজটাই করল তাদের। জ্যাঠামশাই, বাবা, চাটুজ্যেখুড়ো,

মোড়লমশাই—সবাই এসেছিল। সবাই এমন ব্যবহার করল যেন কলকাতার ছোটলাট এসেছেন। আর কত রকম যে রান্না হয়েছিল। থালার চারপাশে একরাশ বাটি সাজানো।

খাওয়ার পর বাংলাবাড়িতে গিয়ে বসল ওরা। আর চুপিচুপি দিদির কাছে এসে গিরি বললে, বরের বাপটা লবাব রে দিদি, বরটা দেখিস নিঘ্যাত লবাবপুত্তুর।

দিদি হেসে উঠেই বলেছিল, চুপ, শুনতে পাবে।

আর তখনই ভটচাজদের ছোটমা এসে হাজির হল। অট্টামা। টুনুদের দেখাদেখি গিরি বলতে শুরু করেছিল : ছোটমা।

মেয়ে সাজানোর খুব নাম ছিল ছোটমার। সবাই বলত, অট্টামা মেয়ে সাজিয়ে দিলে সে মেয়ে চোখে লাগবেই।

যার বাড়িতেই যখন মেয়ে দেখতে আসত ছোটমা গিয়ে সাজিয়ে দিত। চুল বেঁধে দিত পাতা কেটে। পাতা কেটে চুল বাঁধতে জানত না কেউ তখন। আর শাড়ি পরিয়ে দিত নতুন ঢঙে।

ছোটমা এসে বললে, ভাবিসনি লো ভাবুনি, বিয়ের ফুল তোব ফুটল বলে। নে ওঠ, কাপড়চোপড় নিয়ে আয় চাঁপা।

তারপর বললে, দাঁড়া, আগে সাবান আন দিকি, মুখটা ধুয়ে দিই আগে।

দিদি হাঁ করে রইল। —সাবান ?

—হ্যাঁ লো, জলে-ভাসা সাবান আনাসনি একটা ? তোর বাবা কি ভেবেছে বল দিকিনি, মেয়ে পার করা এত সহজ, মিনিমাগনায় বিয়ে দেবে নাকি ?

গিরি বললে, সাবান তো নেই ছোটমা।

ছোটমা হাসলে। —দেখো কাণ্ড। দাঁড়া, আমার কাছে আছে একটা, নিয়ে আসি গে।

বলে চলে গেল ছোটমা দ্রুত পায়ে।

গিরি বসে রইল দিদির কাছে। দিদি ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, শ্বশুরটা খুব রাগী নাকি রে গিরি ?

গিরি হেসে বললে, খুব। দেখিস তোকে পিটিয়ে পিটিয়ে শেষ করে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে দিদির মুখচোখে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠল, আর তা দেখে হেসে ফেলল গিরি। বললে, দূর, তুই কি রে, দেখিস দিদি, তোকে ওদের পছন্দই হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে দিদি গিরির মুখ চাপা দিল, চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, ছিঃ বলিস না ভাই, বলতে নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেল গিরি। কি আশ্চর্য, ওই কালো ধুমসো লোকটার ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হলে দুঃখ কিসের। দিদি তবে কি ওখানেই বিয়ে করতে চায়। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন দুর্বোধ্য ঠেকল তার।

আর সেই মুহূর্তেই গিরি দেখলে, শাড়ি সেমিজ নিয়ে মা এসে দাঁড়িয়েছে।

মা বললে, ওঠ রে চাঁপা, সাজতে হবে না ?

গিরি বাধা দিয়ে বললে, বাঃ রে, ছোটমা এসেছিল তো, সাবান আনতে গেছে। বলেছে, এসে সাজিয়ে দেবে দিদিকে।

ছোটমার সঙ্গে সারা দুপুর বসে কত গল্প বলতে দেখেছে সে মাকে। ঢেঁকিতে একসঙ্গে পাড় দিতে দেখেছে, মুলোর বড়ি দিয়ে দিয়েছে ছোটমা, রোদে শুকতে দিয়েছে, মা যখন জ্বরে পড়ে থাকত। তাই এমন একটা কথা যে মা বলে বসবে গিরি কল্পনাও করতে পারেনি।

গিরি বললে, ছোটমা এখনি এসে সাজিয়ে দেবে বলেছে।

তা শুনে মা বললে, না বাপু, সে আমি সাজাতে দোব না। ও বুড় অলক্ষুনে বউ, সোয়ামি নেয় না যাকে, তাকে দিই আমি মেয়ে সাজাতে! তারপর মেয়ের ভালমন্দ কিছু একটা...

কথা শেষ করতে হল না। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল গিরি, গিরির মা, চাঁপা—সকলেই।

দেখলে, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ছোটমা, কাপড়টা এক হাতে ধরে কোনমতে যেন নিজেকে সামলে নিচ্ছে। অন্য হাতে সাবান।

সাবানটা দিদির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়েই বেরিয়ে গেল ছোটমা।

কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল গিরি। সমস্ত বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল যেন।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মা, ছোটমা একটু আগে যে-পথ দিয়ে চলে গেছে সেদিকে উদাস বিষণ্ণ চোখ মেলে।

কিন্তু বিয়েটা শেষ অবধি হয়ে গেল।

বংশী বলেছিল, চাঁপাদিদির বিয়েতে আমি একটা পদ্য নিকব গিরিদাদা, ছাপিয়ে আনবে বদ্দমান থেকে?

গিরি হেসে প্রশ্ন করেছিল, কি পদ্য রে?

—সে খুব ভাল পদ্য। তোমার খুব ভাল নাগবে। বলেই নেচে নেচে গেয়ে উঠেছিল বাউলদের মত :

হরগৌরীর মিলন হবে
হরগৌরীর মিলন হবে
বনপলাশি গাঁয়ে।
কাঁদবে বাবা, গিরিদাদা,
কাঁদবে ওগো চাঁপাদিদির মায়ে।

শুনে হেসে ফেলেছিল গিরি।

বলেছিল, দূর, কাঁদবে কেন। দিদির বিয়ের জন্য কি কম দুশ্চিন্তে ছিল মায়ের।

বংশী তা শুনে হেসেছে।—কি যে বলো গো গিরিদাদা, কাঁদবে না! কন্যে হল সন্তান, বুকের রক্ত থেকে জম্ম, ছিরকালের জন্যে চলে যাবে সে বেথা কি কম বাজে গো মায়ের বুকে। সে তোমার বজ্জরশেল।

সত্যিই বুঝি তাই। সে-ব্যথা যে এত গভীর, এমনভাবে বুকের পাঁজর ছিঁড়ে নিয়ে যায় ভাবতে পারেনি গিরি।

এমনকি বিয়ের পর দিদি যখন জামাইবাবুর সঙ্গে পালকি চেপে শ্বশুরবাড়ি গেল তখনও বুঝতে পারেনি। তখন যে ও সঙ্গে গিয়েছিল, তাই।

কিন্তু দ্বিরাগমনের পর দিদি যখন আবার চলে গেল তখন সমস্ত বুকটা যেন খাঁ খাঁ করে উঠল। বাড়িতে এত লোকজন, বাবা, মা, ভাই বোন, তবু মনে হল যেন নির্জন নিঃশব্দ, সারা বাড়িটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। মানুষ নেই একজনও।

কি বিশ্রী যে লাগত গিরির। সদা সর্বদাই যেন মনে হত দিদি নেই, দিদি নেই।

বাঁশবনের ছায়ায়, আখের ক্ষেতে কিংবা দূরের রেললাইনের ধারে গিয়ে একা বসে থাকে। কেমন যেন নিঃস্বতা, নিস্তব্ধতা। বুকের মধ্যে সব সময়েই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেবলই মনে হয় দিদির শ্বশুরবাড়িতে ছুটে যাই।

কোনদিন বা একটা কঞ্চি কেটে নেয় পকেট থেকে পেন্সিলকাটা ছুরি বের করে,

তারপর পুকুরপাড়ে বসে জলের ওপর ছপাং ছপাং করে কঞ্চিটা ফেলে। জলের ওপর ওর মুখের ছায়াটা যেমন ভাবে ভেঙে ভেঙে যায়, হারিয়ে যায়, তেমনিভাবে বুকের মধ্যে থেকে দিদির ছবিটাও মুছে ফেলার চেষ্টা করে।

কোনদিন বা নির্জলা খড়ি নদীর পাড় ঘেঁসে চলতে চলতে কাশবনের সাদা সাদা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অন্যমনা হয়ে যায়। সব সময়ে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা যেন।

কখনও বা বই পড়তে পড়তে মন চলে যায় বাণেশ্বর গ্রামের সেই রহস্যময় দালানবাড়িটার অন্ধকার ঘরখানায়, যেখান থেকে চলে আসার দিন চুপিচুপি এসে দিদি ওর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলেছিল, মাকে দিস।

ছেড়ে আসতে মন চায়নি। দিদির শ্বশুরবাড়িটা একেবারেই ভাল লাগেনি গিরির। এত আদর যত্ন করেছিল সবাই, তবু কাউকেই ভাল লাগেনি। ইচ্ছে হয়নি দিদিকে রেখে চলে আসতে। রোগা আর কালো, মুখে বসন্তের দাগ জামাইবাবুটাকে আরো খারাপ লেগেছিল।

তাই মাকে লেখা দিদির চিঠিটা খুলে পড়ার ইচ্ছে হয়নি। জানতে ইচ্ছে হয়নি, কি লিখেছে। ফিরে এসে গম্ভীর মুখে মাকে চিঠিটা দিয়েই চলে গিয়েছিল।

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সেই চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। দিদির লেখা আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেও ভাল লাগল। যেন চোখের সামনে দিদিকেই দেখতে পাচ্ছে।

ধীরে ধীরে চিঠিটা পড়ল গিরি। পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে চোখ ঠেকতেই চমকে উঠল। দিদি লিখেছে : মা, ঠাকুরের কাছে মানসিক করিয়াছিলাম, বিবাহ যখন হইয়াছে তখন পাঁচ সিকা পয়সার বাতাসা ও মণ্ডা আনাইয়া সিংহবাহিনীর পূজা দিয়ো।

পড়ে চমকে উঠল গিরি। কি নির্লজ্জ দিদি, নিজের বিয়ের জন্যে মানত করেছিল ঠাকুরের কাছে ? অমনি বিচ্ছিরি জামাইবাবুটার সঙ্গে বিয়ে না হলেই কি চলত না !

কিন্তু যত দোষই করে থাক দিদি, তাকে ও ছেড়ে থাকবে কি করে। অস্ফুটে নিজের মনেই গিরি বলে ওঠে, ভগবান, দিদিকে তুমি ফিরিয়ে দাও, দিদিকে তুমি ফিরিয়ে এনে দাও।

বলে চোখ মুছে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই দূর থেকে ভেসে-আসা কাহারদের 'হেঁইও হঁইও' ডাক শুনতে পায়। দূরে কোথা থেকে যেন পালকি আসছে।

দিদি নাকি ?

গিরির মাও শুনতে পেয়ে ছুটে যায়। পিছনে পিছনে গিরি। ওদিক থেকে কোটালদের বউ-ঝিরাও ছুটে আসে। গাঁয়ের গা বেয়ে গেছে আঁকাবাঁকা মেটে রাস্তাটা, ইস্টিশন থেকে মুঞ্জলা হয়ে আরো কতদূর কে জানে।

কাহারদের সুরটানা গলার স্বর কাছে আসছে ক্রমশ, পালকিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

একে একে গাঁয়ের সবাই ছুটে এল। গুপ্তবাড়ির শাশুড়ি-বউ, চাটুজ্যেদের মেজবউ, ধীরেন সাঁইয়ের মেয়ে। ভিড় করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল তারা। উদ্‌গ্রীব আগ্রহে।

একটু একটু করে এগিয়ে এল পালকিটা। কাছে এল।

গিরির মা জিগ্যেস করলে, কোথায় চলেছিস গো তোরা, কে আছে ?

পালকি থামল না, কাহারদের একজন শুধু বললে, মুঞ্জলায় চললাম গো। কৌয়ারবাবুদের মেয়ে আছেন।

মুঞ্জলার কৌয়ারদের মেয়ে ? মনে পড়ে গেল, একদিন এই পথ দিয়েই কৌয়ারদের

মেয়ে-জামাই গিয়েছিল ইস্টিশনের দিকে। শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল মেয়েটা, সারা গায়ে গয়না, গালে-কপালে চন্দনের ফোঁটা, লাল বেনারসীর ঘোমটায় ঢাকা ছোট্ট সুন্দর মুখখানি।

গিরির মা ছুটে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে পালকির কপাট খুললে, কাহারদের বললে, থামরে বাপু, এত তাড়া কিসের।

সবাই হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল দুটো গ্রাম্য রসিকতা করার নেশায়।

কিন্তু পালকির কপাট সরাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল গিরির মা।

সকলের মুখের হাসি যেন দপ্ করে নিভে গেল।

হাতে চুড়ি নেই, শাঁখা নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, নেই সেদিনের বেনারসীর উজ্জ্বল আগুন।

নিরাভরণ দেহে শুধু একখানা থান, আর থমথমে একখানা মুখ।

গিরির মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ডুক্‌রে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

আট

পরের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরার মত তুচ্ছ একটা অন্যায়ের জন্যে সেদিন অনুশোচনার অন্ত ছিল না। বাবা-মা'র কাছে বকুনি খাওয়ার চেয়েও বেশি লেগেছিল আত্মসম্মানে। কি ভাবল চাটুজ্যেরা? আর বংশী? বংশীর কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হয়েছিল।

সেই বংশের ছেলে হয়ে গিরীন কিনা এত সহজে এত বড় একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে চায়? ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল করবে? জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে রীতিমত জোচ্চুরি করবে?

মনের দুঃখে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে, গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও বাধেনি গিরিজাপ্রসাদের। আর তা শুনে হেসেছিল অবিনাশ ডাক্তার।

বলেছিল, এত সহজে হাল ছাড়লে কি চলে মশাই? ফাইট করতে হবে।

গিরিজাপ্রসাদ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, না, না, সব শখ আমার মিটে গেছে। সবাই যখন নিজের স্বার্থটুকু দেখছে, তখন আমিই বা কেন...

কথা শেষ করতে হয়নি, সশব্দে হো হো করে হেসে উঠেছিল অবিনাশ ডাক্তার। বলেছিল, তবেই বুঝুন, একটা ঘা খেয়েই এ-কথা বলছেন, এরা কত ঘা খেয়ে খেয়ে আজ এখানে এসেছে। একটার পর একটা যুদ্ধ জিতলে হয় হিরো, একটার পর একটা হারলে—কাওয়ার্ড। তফাত নেই মশাই, তফাত নেই।

কিন্তু প্রভাকরকে বলেছে উল্টো কথা। বলেছে, দেশের উন্নতি যদি করতে হয় বি. ডি. ও. সাহেব, একটাই রাস্তা।

প্রভাকর উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়েছে।

আর গম্ভীর স্বরে অবিনাশ ডাক্তার বলেছে, ইউ নিড এ মেশিনগান।

—মানে? সকৌতুকে প্রভাকর প্রশ্ন করেছে।

—অর্থাৎ ফট-ফট-ফট-ফট চতুর্দিকে মেশিনগান চালিয়ে সব শেষ করে দিয়ে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট অ্যাফ্রেশ।

শুনে অট্টহাসে হেসে উঠেছে প্রভাকর।

আর অবিনাশ ডাক্তার বলেছে, একটা বোমা, স্রেফ একটা বোমা ফেলে দিয়ে, তারপর আবার নতুন করে করতে হবে। অল রটন, এভরিথিং রটন, বুঝলেন? এরা—আপনারা,

সবাই, সকলেই।

প্রভাকর বুঝেছে, কথাটা নিছক পরিহাস নয়।

ডাক্তারের মনের মধ্যে কোথাও একটা বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে। একটা নিস্ফল আক্রোশ। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে তা বুঝতে পারেনি।

অবিনাশ ডাক্তার নিজেও বোঝে না। গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে, না নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ?

দু'খানা ছোট ছোট কুঠরি নিয়ে ডাক্তারের সংসার। কিন্তু দু'খানা ঘরের বুঝি প্রয়োজন ছিল না।

দশ এগারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে পার্বতী, দুলেদের বাড়ির মেয়ে। সে-ই দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। মাস গেলে তার বাপ এসে ক'টা টাকা মাইনে নিয়ে যায়।

আর ভিতর-বারান্দায় বসে বসে পার্বতী যতক্ষণ রান্না করে, সামনে একটা টিনের চেয়ার নিয়ে বসে গল্প করে অবিনাশ ডাক্তার :

সেদিনও এমনি বসে বসে গাঁয়ের পাঁচজনের খবরাখবর নিচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, হ্যাঁ গা ডাক্তার, বাড়ি আছ নিকি গো !

গলাটা চেনা। দু'বগলে ক্রাচ দুটো তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল অবিনাশ ডাক্তার। বললে, অট্টামা। কি সৌভাগ্য আমার।

ফোকলা মুখে হাসল অট্টামা, লাঠিটা নামিয়ে রেখে দাওয়ার ওপর বসলে পা ঝুলিয়ে। তারপর কাপড়ের আড়াল থেকে একটা কয়েত বেল বের করে সামনে নামিয়ে রেখে বললে, তোমার জন্যে আনলাম গো ছেলে। ঘোষের উঠনে পড়েছিল, বললে, অট্টামা নিয়ে যাও, খাবে। তা বললাম, 'অবাক করলি রাধা, অম্বলে দিলি আদা।' টক খাবার কি জো আছে লো। তা ভাবলাম, নিয়েই আসি, আমি না খাই, আমার ছেলে খাবে।

বলেই ডাকল, ও পাব্বুতি, ও কেলে পাব্বুতি।

পার্বতী এসে দাঁড়াল হাসি-হাসি মুখে। অভিযোগের সুরে বললে, আবার কেলে পাব্বুতি বলছ অট্টামা।

অট্টামা ফোকলা মুখে হেসে বললে, কালো তো কালো বলব না রে ছুঁড়ি ? বাপকে তোর কেউ পাঁচটা টাকাও দেবে না এ মেয়ের জন্যে, তা জানিস লো ? কি ছিরি হচ্ছে দিনে দিনে। বলে 'একে আউশ, তাতে আলো, যার বউ কালো তার মরণ ভালো,' বুঝলি ? এত কালো বউ বাছা কেউ করবে না।

অবিনাশ ডাক্তার দেখলে পার্বতীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। হেসে উঠে পার্বতীকে কাছে টেনে নিল ডাক্তার, বললে, দূর বোকা, অট্টামা ঠাট্টা করছে, তুই আবার কালো নাকি ?

অট্টামা হেসে বললে, ওঃ, মেয়ের আবার অবিমান হয়েছে। পরের ঘরে যাবি যখন মান-অবিমান কোতায় থাকে দেখব। বরের ঘর তো জানো না বাছা, 'মানি তো মানি, নয় দু'পা দিয়ে ছানি।' তা নে, কয়েতটা নিয়ে যা, গুড় দিয়ে নঙ্কা দিয়ে মেখে দিবি আমার ছেলেকে।

বলতেই মেঝে থেকে কয়েত বেলটা তুলে নিয়ে পালাল পার্বতী।

আর অট্টামা চাপা গলায় বললে, একটা কথা বলব ডাক্তার। তুমি পদ্মর একটা খপর করলে না বাবা ? সোমত্ত জোয়ান মেয়ে একটা, দপদপ করে পা ফেলে চলে গেল গাঁ থেকে...

অবিনাশ ডাক্তার চুপ করে রইল। অস্বস্তিতে, লজ্জায়। অট্টামা যে এ-কথাটা তুলতে পারে, কোনদিন কল্পনাও করেনি।

কিন্তু মনের মধ্যে থেকে অপরাধবোধটুকু মুছে ফেলতে পারে না অবিনাশ ডাক্তার। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে সে-ই দায়ী, একমাত্র সে-ই দায়ী।

অবিনাশ ডাক্তারকে প্রথমে এ গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন অবনীমোহন। বলেছিলেন, আমি মশাই বিদেশে-বিভুঁয়ে পড়ে থাকি, একখানা ঘর নিয়ে থাকুন আপনি, কাছেপিঠে ডাক্তার নেই, প্র্যাকটিস জমবে এখানে।

শুনে রাজি হয়েছিল অবিনাশ ডাক্তার, এসে বসবাস শুরু করেছিল। জমিজমা কিনে ক্রমে দু'খানা ঘর বানিয়ে নিয়েছিল। স্থায়ী হতে চেয়েছিল এই ছোট্ট গ্রামটিতে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ডাক্তারি করতেই কি এসেছিল অবিনাশ ডাক্তার? ও নিজেও তা জানে না। এক এক সময় মনে হয়, হারিয়ে যেতে চেয়েছিল অবিনাশ ডাক্তার, শহরের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল।

কিংবা শান্তি খুঁজেছিল। শান্তি খুঁজছিল।

তারপর হঠাৎ সেই রাত্রে এসে হাজির হয়েছিল কোটালপাড়ার মেয়েটি।

দরজার বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দে উঠে এল অবিনাশ ডাক্তার। কপাট খুললে। কপাট খুলতেই চোখে পড়ল লণ্ঠন হাতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অবিনাশ ডাক্তারকে দেখতে পেয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে। বললে, আমার বাপটা মরে যাচ্ছে গো ডাক্তারবাবু, একটা ওষুধ দাউসে গো।

অবিনাশ ডাক্তার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, কোথায়?

—ওই হোথা কোটালপাড়াকে। একবার চলেন গো ডাক্তারবাবু, তোমার পায়ে পড়ি একবার চলেন। বলে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

একটুক্ষণ কি ভাবল অবিনাশ ডাক্তার, তারপর ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বললে, চল।

মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বললে, বাসকোটা আমায় দিন গো। বলে ব্যাগটা নিয়ে নিল হাতে।

তারপর ধীরে ধীরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

উঁচু-নিচু গ্রাম্য পথ। তার ওপর ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে। কোথাও কোনও আলো নেই। অনেক দূরে দূরে দু'একজনের বৈঠকখানায় কিংবা ভিতর-বাড়ির দাওয়ায় ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। আর দূরে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ধানের বস্তা নিয়ে চলেছে একটা গরুর গাড়ি।

সাধারণত বাড়ি থেকে বের হয় না অবিনাশ ডাক্তার। নেহাত মরণাপন্ন রুগি না হলে বলে, এখানে নিয়ে আয়, খোঁড়া পা নিয়ে এই অন্ধকারে কি যেতে পারব!

তাই অনেকেই রুগি এনে দেখিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু কোটালপাড়ার এই অচেনা অজানা মেয়েটির কথাবার্তায়, তার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন এক করুণ অনুরোধ ছিল। অবহেলা করতে পারল না অবিনাশ ডাক্তার।

কাঠের ক্রাচ দুটোয় ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করলে। বললে, আলো দেখিয়ে চল সামনে সামনে।

এক হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে ব্যাগটা বুকে চেপে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটা।

যেতে যেতে বার বার ফিরে দাঁড়াচ্ছিল সে, অপেক্ষা করছিল। কাঠের পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে সমান তালে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল অবিনাশ ডাক্তারের।

বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে পুকুরের পাড় ঘেঁসে অনেকখানি গিয়ে আখের খেতের এক পাশে কোটালপাড়া। যেতে যেতে কেমন যেন গা ছমছম করছিল অবিনাশ ডাক্তারের।

দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল, তারপর লেজ গুটিয়ে পালাল আবার।

সমস্ত পরিবেশটার মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক থমকে আছে। দুটো মাতাল স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে থেকে থেকে।

ক্রমশ কাছে এগিয়ে যেতে যেতে একটা গোঙানি শুনতে পেল অবিনাশ ডাক্তার।

ধীরে ধীরে মেয়েটির পিছনে পিছনে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। আর লণ্ঠন হাতে মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে কে বললে, পদ্ম এলি মা ?

পদ্ম। সেই প্রথম নামটা শুনল অবিনাশ ডাক্তার, আর তার ইশারায় ঘরে ঢুকল।

তারপর ক্রাচ দুটো এক হাতে নিয়ে মেঝের মাদুরের ওপর বসল, ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখল পাশে। আর লণ্ঠনটা রুগির কাছে তুলে ধরতেই চমকে উঠল অবিনাশ ডাক্তার।

বুড়োটার দিকে একবার তাকাল অবিনাশ ডাক্তার, তারপর কঠিন রূঢ় দৃষ্টিতে পদ্মর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে ?

আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের একটা পা-ই জড়িয়ে ধরল পদ্ম।—বাঁচান গো বুড়ো বাপটাকে, আগে বাপটাকে বাঁচান।

অবিনাশ ডাক্তার দেখলে বুড়োর কাঁধের কাছ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

ক্ষতস্থানটার ওপর চুন-হলুদের প্রলেপ দিয়েও রক্ত থামেনি। তবে ক্ষতটা খুব গভীর মনে হল না।

ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার যখন বেরিয়ে এল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

আগের মতই আবার লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল পদ্ম। তারপর আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা দিতে গেল ডাক্তারের হাতে।

অবিনাশ ডাক্তার প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, থাক। টাকা দিতে হবে না।

করুণ বিষণ্ন চোখ তুলে তাকাল পদ্ম ডাক্তারের মুখের দিকে। তারপর লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল।

আর কোনও কথা বলল না কেউ।

লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে আগে আগে চলল পদ্ম, ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

বেশ খানিকটা এসে ডাক্তার প্রশ্ন করলে, কি হয়েছিল বল, থানায় খবর দিতে হবে।

—থানা-পুলিশ করবেন গো ? ভয়ে বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল সে ডাক্তারের মুখের দিকে।

অবিনাশ ডাক্তার রূঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ।

পদ্ম একটুক্ষণ থেমে বললে, অপরাধটা আমার বটে গো।

—তুই ? চমকে উঠল অবিনাশ ডাক্তার।

পদ্ম ধীরে ধীরে বলে, খেপে গেলাম গো বুড়ো বাপটার কথায়, কাটারি দিয়ে মারতে গেলাম...

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অবিনাশ ডাক্তার। আর এতক্ষণে যেন স্পষ্ট করে দেখল পদ্মকে।

কুড়ি-বাইশ বছরের নিটোল শরীরটা লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় যেন রহস্যের মত মনে হল। চোখে মুখে এমন ঠাণ্ডা আমেজ যার, সে কি বাপকে খুন করতে যায় রাগের মাথায়!

আর কোনও কথা বললে না অবিনাশ ডাক্তার। ডাক্তারকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে একটুক্ষণ লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে রইল পদ্ম, তারপর ধীরে ধীরে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরেই ফিরে গেল।

অবিনাশ ডাক্তার তখনও দূরের অন্ধকারের দিকে, অন্ধকারের মধ্যে অপস্রিয়মান

লণ্ঠনের আলোয় মাখা সেই অস্পষ্ট ছায়া-শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভেবে পেল না কোন্ রূপটা তার সত্য। বাপকে বাঁচাবার জন্যে যার এত কাকুতিমিনতি, রাগের মাথায় সেই কিনা দা বসিয়ে দিতে গেছে বুড়ো বাপের কাঁধে ?

আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়, দু'দশ দিনেই সেরে উঠবে, বুঝতে পেরেছিল অবিনাশ ডাক্তার। ভেবেছিল থানা-পুলিশের নাম শুনে মেয়েটা আর হয়তো আসবে না।

কিন্তু পরের দিন সকালেই আবার এসে হাজির হল সে।

—ও যন্তরটা কি বটে গো ডাক্তারবাবু !

টেবিলের ওপর বসানো কুকারের নীচে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কাঠকয়লার আগুন ধরাচ্ছিল অবিনাশ ডাক্তার।

কথা শুনে চমকে ফিরে তাকাল।

কৌতূহলের চোখে কুকারটার দিকে তাকাল পদ্ম, তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে এপাশ ওপাশ থেকে খুঁটিয়ে দেখে আবার প্রশ্ন করলে, এটা কি বটে বলেন ক্যানে !

অবিনাশ ডাক্তার হেসে বললে, রান্না হয় ওটায়, ভাত রান্না হয়।

—হেই মা গো, যন্তর দিয়ে ভাত ফুটোবে কি গো ডাক্তারবাবু ! খিলখিল করে হেসে উঠল পদ্ম। শহর পানে ধানকলে নাকি ধান সিজোয় যন্তরে, তেমনিধারা যন্তর ?

অবিনাশ ডাক্তার সে-কথার কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু জবাব না দিলে কি হবে, অবিনাশ ডাক্তার সম্পর্কে পদ্মর যেন কৌতূহলের সীমা নেই। কখনও বাপের জন্যে ওষুধ নেবার নাম করে, কখনও একাই ছুটকো-ছাটকা দু'একটা কাজ করে দেবার জন্যে মাঝে মাঝেই আসা যাওয়া শুরু হয়। ডাক্তারকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যেন তার চেষ্টার অন্ত নেই। কখনও এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, কখনও টুকিটাকি ফরমাশ খেটে দেয়।

আর বলে, আপনার নেগে বড় কষ্ট লাগে গো, ক্যানে যে বাউণ্ডুলেপারা থাকেন গো বাবু। চাট্টি ভাত ফুটোবার নোক নাই গো।

ডাক্তারের মেজাজটা বোধহয় সেদিন ভাল ছিল না। বললে, তা কি করব বল পদ্ম, তোদের গাঁয়ে যে লোক মেলে না।

—নোক নাই ? গালে হাত দিয়ে আকাশ থেকে পড়ার ভান করলে পদ্ম, বললে, নোক রাখবে তো বলেন ক্যানে।

—আছে কেউ ? প্রশ্ন করলে অবিনাশ ডাক্তার।

পদ্ম হেসে বললে, আমি তো আছি গো।

—থাকবি তুই ?

পদ্মর চোখের হাসি থমকে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বললে, সে বরাত করে কি পিথিমিতে জন্ম হয়েছে গো। ভদ্দর নোক মানুষ তুমি, আমার হাতের রান্না খাবে ক্যানে, বলো।

অবিনাশ ডাক্তার বললে, খাব না কেন ? বল কত মাইনে নিবি ?

পদ্ম হেসে বললে, সে দিবেন গো, আপনার গিয়ে যা মন চায়।

অবিনাশ ডাক্তার কিন্তু তারপর আর কোনও কথা বলেনি। মনের মধ্যে একটা দ্বিধা উঁকি দিয়েছে পদ্মর বিশ-বাইশ বছরের উচ্ছল যৌবনের দিকে তাকিয়ে। দ্বিধা দেখা দিয়েছে প্রথম পরিচয়ের সেই ঘটনাটির কথা স্মরণ করে।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই পদ্মর বাপ এসেছে দেখা করতে। বলেছে, পেন্নাম গো ডাক্তারবাবু, আমার পরানটা আপনি জিইয়ে রাখলেন গো। ভাবলাম, ডাক্তারবাবু সারিয়ে দিলেন তো যাই পেন্নাম করে আসি। বলেই শুকিয়ে যাওয়া কাঁধের ঘা-টা খুলে দেখালে।

অবিনাশ ডাক্তার তখন বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে বসে একখানা বইয়ের পাতা

ওল্টাচ্ছিল, বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলেছে, হ্যাঁ, সেরে গেছে।

পদ্মর বাপ তবু যেতে চায়নি।

বলেছে, পদ্মরে আপনি ঘরের কাজে রাখবেন গো ডাক্তারবাবু ?

অবিনাশ ডাক্তার এবার বই বন্ধ করে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে বলেছে, না।

—ক্যানে বাবু ? তবে যে পদ্ম বললে, ডাক্তারবাবু মাইনে দিবে ?

অবিনাশ ডাক্তার হেসে বলেছে, ও খুনি মেয়েকে রাখব আমি ? বাপকে যে দা দিয়ে কোপাতে যায়...

—হেই বাবা, এ কি কথা বলছেন গো ? আমার পদ্ম বেটির নামে ও কথা কি বলছেন গো ?

একে একে কথা খুলে বলেছে পদ্মর বাপ। আর তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে ডাক্তার।

পরের দিনই আবার পদ্ম এসে হাজির হয়েছে সের পাঁচেক চালের বস্তা নিয়ে। বলেছে, বোড়াটা দিন গো খালি করে। রায় মশাইরা ধান ভাচা দিয়েছিল। সনঝেমণি চাল মজুরি পেলাম তো বলি যাই ডাক্তারবাবুরে দিয়ে আসি। বলে পরম তৃপ্তিতে হেসেছে পদ্ম।

আর সেই দিন থেকেই ডাক্তারের অনাত্মীয় সংসারের সব ভার তুলে নিয়েছে পদ্ম।

বাড়ি বাড়ি পাটকরুনি ঝিয়ের কাজ করেই তো তাদের অন্নসংস্থান হয়, ডাক্তারের বাড়িতে কাজ নিলে আপত্তি উঠবে কেন। ভোরবেলাতেই ঘুম থেকে উঠে ডাক্তারের বাড়িতে চলে আসে পদ্ম, সারাটা দিন কাজকর্ম সেরে রাতের রান্না ভাত ঢাকা দিয়ে চলে যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা যে এতখানি জটিল হয়ে উঠবে ভাবতে পারেনি অবিনাশ ডাক্তার।

ক্রমে ক্রমে তার বিরুদ্ধে গ্রামের লোক কানাঘুসো শুরু করেছে, আড়ালে অপবাদ রটিয়েছে। কিন্তু সে-সব কানে পৌঁছয়নি অবিনাশ ডাক্তারের। এমনকি গ্রামের ছেলেছোকরারা যখন তাকে দেখে হাসাহাসি করেছে তখনও বুঝতে পারেনি, অস্বস্তিতে লজ্জায় মুখ ফিরিয়েছে গ্রামের পথেঘাটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে যেতে। ভেবেছে, তার কাটা পা আর কাঠের পায়ে ভর দিয়ে চলার জন্যেই বুঝি বা হাসাহাসি করে ওরা।

আবার বাড়ি ফিরেই মনের অস্বস্তিটুকু ঝেড়ে ফেলেছে, পদ্মকে ডেকে হো হো করে হেসে উঠে বলেছে, গাঁয়ের ছেলেগুলো আমাকে দেখে হাসে রে পদ্ম, নেংচে নেংচে হাঁটি তো, তাই হাসে আমাকে দেখে।

এমনভাবে বলেছে কথাটা যেন কত বড় রসিকতা। বলেছে, হাসতে তো জানত না, তবু দেখ, আমি এসে তো হাসাতে পেরেছি ওদের ! কি বল অ্যাঁ ?

বলে নিজেই হেসে উঠেছে।

কিন্তু হাসি থেমে গেছে পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারের কথা শুনে দপ করে জ্বলে উঠেছে পদ্মর চোখজোড়া। সে চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার অপ্রতিভ হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর চোখ দুটোয় বিষণ্ণতা নেমেছে।

ধীরে ধীরে বলেছে, ও কথাটা কইবেন না গো আপনি, হাসবে ক্যানে, হাসবে ক্যানে নোকরা ? ভগমান এট্টা অঙ্গ লিয়ে লিলে মানুষ হাসে কখনও !

পদ্মর কথা শুনে চুপ করে গেছে ডাক্তার। কিন্তু খুঁজে পায়নি গ্রামের লোক ওকে দেখলে ঠোঁট টিপে হাসে কেন। কিন্তু তারপর দেখেছে দিনে দিনে তার রুগির সংখ্যাও কমেছে, কেউ আর আগের মত ছুটে আসে না তার কাছে।

বুঝতে পারেনি ডাক্তার।

বুঝেছে হঠাৎ একদিন ইস্টিশনের ডাক্তারকে গ্রামের পথে যেতে দেখে। সাইকেলের

ক্যারিয়ারে ব্যাগ বাঁধা পকেটে স্টেথিসকোপের উঁকি দেখেই সন্দেহ হয়েছে ডাক্তারের।

চিৎকার করে ডেকেছে তাকে। ভদ্রলোক এগিয়ে আসতেই বলেছে, মনে হচ্ছে আপনিও আমার মত শতমারী—এ হাণ্ড্রেড-কিলার না কি?

ভদ্রলোক চিনতে পেরে হেসে বলেছেন, ও আপনিই অবিনাশবাবু? শুনেছি আপনার কথা, আলাপ হয়নি। তা যুদ্ধ-ফেরত হয়ে শেষে এই গাঁয়ে এসে বসলেন? কিচ্ছু হবে না মশাই, কিচ্ছু হবে না।

—কেন? আগেই সব মরে আছে বলে? অল ডেড? মারার স্কোপ নেই আর? হেসেছে অবিনাশ ডাক্তার। জিগ্যেস করেছে, চললেন কোথায় এখন?

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে বলেছেন, এই আপনার গাঁয়েই একটা কল্ আছে, গুপ্তদের বাড়ি।

গুপ্তদের বাড়ি? ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পরও কথাটা ভুলতে পারেনি অবিনাশ ডাক্তার। আহত বোধ করেছে, মনে মনে রেগে গেছে গুপ্তদের ওপর। এ গ্রামে প্রথম যখন এসেছিল অবিনাশ ডাক্তার, তখন সাহায্য করেছিল ওরা। তাই গুপ্তদের কাছ থেকে কোনও দিন কোনও টাকা নিতে চায়নি। নেয়নি।

আর সেই বাড়িতে কিনা পাঁচ মাইল দূরের স্টেশন থেকে অন্য ডাক্তার ডেকে আনে, তবু অবিনাশ ডাক্তারকে কল্ দেয় না?

না দেয় না দেবে, কিছু যায় আসে না অবিনাশ ডাক্তারের। এ গ্রামে তো ডাক্তারি করতে আসেনি সে, এসেছে জমিজমা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে।

তবু আত্মসম্মানে লেগেছে তার।

দুপুরে চেয়ার-টেবিলে বসে ভাত খেতে খেতে হঠাৎ তাই প্রশ্ন করেছে, আজকাল আর গাঁয়ের লোক আমাকে ডাকে না কেন রে পদ্ম?

পদ্ম চমকে চোখ তুলে তাকিয়েছে ডাক্তারের মুখের দিকে। কিন্তু কোনও উত্তর দেয়নি, চুপ করে থেকেছে।

বলেছে, ভাত দিব গো আর চাট্টি?

ডাক্তার কি যেন সন্দেহ করেছে, হঠাৎ রূঢ় স্বরে বলে উঠেছে, উত্তর দে তুই? কেন আসে না কেউ আমার কাছে? রোগ সারাতে পারি না আমি?

শুনে সমস্ত মুখখানা থমথম করে উঠেছে পদ্মর। চোখ ছলছল করেছে। কান্নার স্বরে বলেছে, আমাকে বিদায় দেন গো বাবু, আমার নেগেই তোমায় দুষছে নোকে। পাপী মন উদের, আমায় বিদায় দেন...

অবিনাশ ডাক্তার চমকে উঠেছে। বিহ্বলের মত তাকিয়ে থেকেছে পদ্মর মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছে, না না, কিছুতেই না।

ক্রুদ্ধ আবেগে ভাতের থালা ফেলেই উঠে দাঁড়াতে গেছে অবিনাশ ডাক্তার, পারেনি, এক পায়ে ভর দিয়েই অসহায়ের মত বসে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তার, ধীরে ধীরে অনুশোচনার স্বরে বলেছে, না রে পদ্ম, এ-কাজ তুই ছেড়ে দে। ছি ছি ছি, নিজের কথাই ভাবছি শুধু, তোর দিকটাও তো ভাবতে হয়।

বিদায় দিতেই চেয়েছে অবিনাশ-ডাক্তার, কিন্তু শোনেনি পদ্ম।

কৌতুকের হাসি হেসে বলেছে, গাঁয়ের নোকের বিচারটাই বড় হল গো, ভগমানের বিচার নাই?

আশ্চর্য, সেই পদ্ম কিনা হঠাৎ একদিন গাঁ ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে একটা

কথাও জানিয়ে গেল না। কেন গেল, কোথায় গেল, কিছুই জানল না অবিনাশ ডাক্তার।

অট্টমার কথা শুনে তাই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক নিঙড়ে।

—তুমি পদ্মর একটা খপর করলে না বাবা? সোমত্ত জোয়ান মেয়ে একটা, দপদপ করে পা ফেলে চলে গেল গাঁ থেকে...

কিন্তু কেন গেল পদ্ম! কই, একটা দিনও তো কোনও রূঢ় কথা বলেনি ডাক্তার। আর গেলই যদি তো একবার বলে গেল না কেন তাকে। এমন একটা রহস্যের মধ্যে তাকে ফেলে রেখে গেল কেন পদ্ম!

নয়

দিনে দিনে বড়-জা নিভাননীর ওপর মোহনপুরের বউয়ের আক্রোশ আর বিরক্তি বাড়তে থাকে। তবে মুখ বুজে দৈনন্দিন কাজগুলো করে যায়। এক এক সময় নিজের মনকেই প্রবোধ দেয়। ভাবে, শহুরে মানুষ ওরা, গ্রামে কি আর থাকতে পারবে। শেষ অবধি দু'চার দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে চলে যাবে। কি দরকার তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার।

অথচ গিরিজাপ্রসাদের দিক থেকে তেমন কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। দেখা যায় না বলেই অধৈর্য হয়ে ওঠে।

একে টানাটানির সংসার, জমির আয় থেকে একটা পরিবারই এতকাল ভালভাবে চালাতে পারেনি, যাও বা আয় হয়েছে নিজেরা না-খেয়ে না-পরে মেয়ের বিয়ের পণ জমাবার চেষ্টা করেছে। এখন সেই আয়ের ওপরই ভর করেছে কিনা দুটো সংসার।

সারাদিন রোদে তেতে মাঠে মাঠে ঘুরে এসেছে গিরীন, কখনও ক্যানেল-ট্যাক্সের হিসেব মেটাতে ছুটতে হয়েছে ক্যানেল আপিসে, কখনও সারের আর অ্যামোনিয়ার দাম মেটাবার নোটিশ পেয়ে। দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে বাবুদের দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছে, এসেই মনিহারি দোকানের বাকি-খাতার ফর্দ দেখেই মাথায় রক্ত উঠে গেছে তার। মোহনপুরের বউকে বলেছে, বলে দাও, নিজের ব্যবস্থা নিজে দেখতে, পায়ের উপর পা দিয়ে দু'বেলা ভাত মারা চলবে না।

মোহনপুরের বউয়ের মন-মেজাজ ভাল থাকলে হেসে ফেলেছে ও, সাবধান করেছে, আঃ শুনতে পাবে যে!

কখনও বলেছে, এতকাল ভোগ করলে ওদের জমিজমা, তখন মনে ছিল না!

গিরীন তা শুনে আরও চটে গেছে!—ভোগ করেছি? দেড় টাকা দু'টাকা তো ধানের দর ছিল, খরচ পোসাত না, জমির খাজনা বাকি পড়ত...আমি ছিলাম তাই জমিগুলো নিলামে ওঠেনি, বুঝলে!

গিরীনের আসলে রাগটা যে সে জন্যেই, বুঝতে অসুবিধে হয় না মোহনপুরের বউয়ের। এতকাল বাদে ধানের দর যদি বা একটু উঠল—

গিরীন নিজেই বলেছে সে-কথা।—দাদা শুধু ধানের দরটাই দেখছে, বীজের দাম, খোলের দাম, সারের খরচ সব হিসেব করে দেখুন তো ক'পয়সা লাভ থাকে। শহুরে বাবু তো, ভাবে, রাশি রাশি টাকা করছি। নিজের হাতে চাষ নিয়েই দেখুক না একবার।

মোহনপুরের বউ অবশ্য অতশত ভাবতে চায় না, তার দুশ্চিন্তা মেয়ের বিয়ে নিয়ে। শয়নে স্বপনে কাঁটার মত বিঁধেছে এতকাল।

কিন্তু ইদানীং আরেকটা কাঁটা খচখচ করে বুকে লাগে। প্রতিটি কাজের মধ্যেই, বড় জায়ের প্রতিটি ব্যবহারে আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

কোনও-কোনও দিন রেগে গিয়ে গিরীনকে বলে, আমি কি সেবাদাসী নাকি ওর !

বুঝতে না পেরে হিসেবের লম্বা খেরোর খাতা থেকে খাগের কলমটা তুলে নিয়ে বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকায় গিরীন।

মোহনপুরের বউয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ঝরে পড়ে। বলে, সকাল বিকেল দু'বেলা রান্না করে মরছি, একবার এসে একটু সাহায্য করবে না বাপু ! দু' দুটো ধিঙ্গি মেয়ে...

বিমলা আর কমলার ওপরই সব রাগ গিয়ে পড়ে। সন্ধে হলেই বারান্দায় হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তে বসে মেয়ে দুটি। যেন সংসারের কোনও কাজ জানে না, দায়িত্ব নেই। শহুরে মেয়ে বলেই যেন পড়াশুনা করার অধিকার জন্মেছে। আর বেচারী টিয়া, দু'দিন বাদে বিয়ে হবে, মেয়ে দেখতে আসবে আবার, মা হয়ে রান্না করিয়ে করিয়ে তার মুখখানা কালি করে দেবে ! কোন মেয়ের মা তা পারে !

তাই টিয়া টুকিটাকি সাহায্য করতে এলেও রেগে যায় মোহনপুরের বউ। বলে, পড়াশুনার ইচ্ছে না থাকে, খাটে পা ছড়িয়ে ঘুমুগে যাও। তাতেও কাজ হবে, মেয়ে পছন্দ হবে লোকের।

বড় জায়ের ওপর, তার মেয়েদের ওপর যত রাগ হয়, ততই নিজেকে যেন শাস্তি দিতে চায় মোহনপুরের বউ। নিজেকে কষ্ট দিয়ে, অসহ্য পরিশ্রমে শরীর আর মনকে বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পায়। সারা জীবন ধরেই এই আনন্দ পেয়ে এসেছে সে। সেই কোন্ শৈশবে এ-বাড়িতে এসেছিল অনেক স্বপ্ন আর মধুর ভালবাসা নিয়ে, তারপর দিনে দিনে কবে যে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে ! সব অভিযোগ চাপা দিয়ে, মুখ বুজে সব যন্ত্রণা সহ্য করে কি এক বিচিত্র আনন্দ পায় মোহনপুরের বউ। কর্তব্যের আগুনে তিলে তিলে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলার আনন্দ। স্বামীর জন্যে, ছেলে-মেয়েদের জন্যে নিজেকে আমি নিঃশেষে বিলিয়ে দিচ্ছি। অথচ কেউ আমার মনের খবর রাখে না, পৃথিবীতে আমার জন্যে কারও কোনও সহানুভূতি নেই। অসহ্য দাঁতের ব্যথায় ভুগেছিল একবার মোহনপুরের বউ, তখন এত ব্যথা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা বাড়িয়ে দিয়ে কেমন একটা নৃশংস পরিতৃপ্তি ফুটেছিল ওর মুখে চোখে, ঠিক তেমনি একটা বিচিত্র আনন্দ।

সেই যন্ত্রণার আনন্দটাই যেন বাড়িয়ে দিয়েছে বড়-জা নিভাননী।

সেদিনও রান্নাঘরে বসে বসে উনোনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে নিজের মনেই গজগজ করছিল মোহনপুরের বউ। সামনে কুলুঙ্গির ওপর লম্পটা জ্বলছে ; মরাই-তলা, উঠোন, ভিতর-বাড়ির সর্বত্র অন্ধকার। শুধু দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরের দাওয়ার হারিকেন লণ্ঠনটা থেকে শিস উঠে উঠে চিমনিটাতেই কালি পড়ছে। মোহনপুরের বউ তাকিয়ে দেখলে, বিমলা-কমলা দু'জনেই মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে বইখাতা খুলে রেখেই।

একবার ভাবলে, যাক, চিমনিটা ফেটে যাক, জ্বালা জুড়োয়। পরমুহূর্তেই সদর দরজার ফাঁক দিয়ে বার-বাড়ির দিকে চোখ গেল। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোটা চোখে পড়ল।

গ্রামের লোকদের নিয়ে গল্পগুজব করছেন গিরিজাপ্রসাদ, মোহনপুরের বউয়ের কানে তাদের অস্পষ্ট কথাগুলো ভেসে এল।

সঙ্গে সঙ্গে কি ভেবে ছুটে গেল সে, হারিকেন লণ্ঠনের পলতে কমিয়ে দিয়ে বিমলা-কমলার ঘুমন্ত মুখের দিকে বিরক্তির চোখে তাকিয়ে ফিরে এল।

তারপর চিৎকার করে ডাকলে, টিয়া !

—কি মা ? ছোট্ট বোনটিকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে টিয়া সাড়া দিলে। তারপর তাকে শুইয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই মোহনপুরের বউ বললে, ওদের দু'বোনকে তুলে দে মা, খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার করুক।

উদ্ধার পেতে অবশ্য অনেক সময় লাগে মোহনপুরের বউয়ের। একে একে সকলের খাওয়া হয়, সকলে কপাটে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর স্বামী ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘাটে বাসনকোসন রেখে একা একা একটা পান সেজে নিয়ে গালে পুরে নিজের ঘরটিতে এসে ঢোকে মোহনপুরের বউ।

ছোট্ট দু'খানি মাত্র ঘর। ঘর জুড়ে সেই পুরনো আমলের নক্সাকাটা দু'খানা উঁচু খাট। রাশীকৃত তোরঙ-বাক্স, চালের বস্তা, গুড়ের নাগরি, কুলুঙ্গিতে ওষুধের শিশি, দোয়াত-কলম, দেয়ালে লক্ষ্মীর পট আর বাংলা ক্যালেন্ডার। বড়-জাকে দু'খানা ভাল ঘরই ছেড়ে দিতে হয়েছে, তাই ছোট এই দু'খানি ঘরে যেন দম চাপা পড়ে যায়। পা ফেলবার জায়গা নেই কোথাও। খাটের ওপর বিছানা, মেঝের ওপর বিছানা। কোনওমতে যেন এতগুলি ছেলেমেয়েকে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে হয়।

তবু মাঝরাত্তিরে এই ঘরে ঢুকেই মোহনপুরের বউয়ের শরীর-মন থেকে সব ক্লেদ, ক্রোধ, বিরক্তি ঝরে পড়ে। পান চিবুতে চিবুতে পরম পরিতৃপ্তিতে লম্পর ক্ষীণ আলোয় ঘুমন্ত মুখগুলোর দিকে তাকায় মোহনপুরের বউ। শুধু খাটের ওপর ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে ভুলে যায়। মানুষটা শুধু আছে, থাকবে, গাছের গুঁড়ির মত, ঠেস দিয়ে বসে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়ার মত নির্ভর একটা... আর কিছু নয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের ঘুমন্ত মুখগুলোর মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ খুঁজে পায় মোহনপুরের বউ। একে একে কারও মাথায় বালিশ ঠিক করে দেয়, কারও গায়ে চাদরটা টেনে দেয় ভাল করে। মশারিটা গুঁজে দেয় চারপাশে।

পাশাপাশি দু'খানা ঘরের মাঝখানের দরজা খোলাই থাকে। এদিকে স্বামী আর বিশু, ওদিকের ঘরে টিয়া আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে শোয় মোহনপুরের বউ।

শোবার আগে বিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কোলের মেয়েটিকে কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘন ঘন বারকয়েক চুমু খায় তাকে, নিজের মনেই হাসে, তারপর তাকে মাই দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ে সারাদিনের ক্লান্তিতে।

সেই মোহনপুরের বউয়ের একঘেয়ে জীবনে যে হঠাৎ এমন একটা রোমাঞ্চের খবর এসে পৌঁছবে কল্পনাও করতে পারেনি সে। ভাবতে পারেনি, এমন একটা খবর নিয়ে আসবে অট্টামা।

অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ি থেকে লাঠি ঠুক ঠুক করে ফিরতে ফিরতে অট্টামার মনে হল, যাই কথাটা বলেই যাই টিয়ার মাকে।

কোমরে ব্যথা নিয়ে কুঁজো হয়ে হয়ে এতখানি গিয়েছে অট্টামা, ডাক্তারের বাড়িটাও নেহাত কাছে নয়, তাই ফেরার পথে ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে। একবার ভাবলে, বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ি। কিন্তু পারল না, এমন একটা খবর মোহনপুরের বউকে না দিতে পারলে যেন শান্তি নেই।

ঠুক ঠুক করে লাঠি ঠুকে তাই এসে হাজির হল অট্টামা। চেঁচিয়ে ডাকলে, কই রে টিয়ে, টিয়ে কোতায় গেলি লো?

—কি গো অট্টামা? হাসি-হাসি মুখে টিয়া কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে তার একখানা কার্পেট আর উল। কার্পেটের আসন বুনতে বুনতে 'অট্টামার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কেমন যেন কৌতুকের চোখে তাকিয়ে রয়েছে অট্টামা তার মুখের দিকে। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারল না।

অট্টামা হেসে বললে, আসুন বুনছিস নাকি লো? ধন্যি মেয়ে, 'আমার মন করছে খাজনা খাজনা, রেখে দে তোর হরিভজনা।' পণ নাই, পুণ্যি নাই, মেয়ে ইদিকে পাখার

বাতাস করছে কবে বর আসবে ভেবে।

টিয়া অপ্রতিভ হাসি হেসেই এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, তোমরা বুঝি আসন বুনতে না, অট্টামা ?

অট্টামা হেসে বললে, কি করে বুনব বল, এই একরত্তি মেয়ে তখন, ঘুম থেকে তুলে এনে বিয়ের পিঁড়েতে বসিয়ে দিলে মা। তারপর থেকে তো জা-দের ছেলেমেয়ের জন্যে কাঁথাই বুনলাম লো সারাজীবন। সেই বলে না, 'আমার হল বুকে ঘা, আমায় বলে রসুন খা।'

বলে ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে হাসল অট্টামা, জিগ্যেস করলে, কই, তোর মা কই ?

টিয়া ইশারায় দেখিয়ে দিল ঢেঁকিঘরের পাশের দেয়ালে পাটকরুনি ঘুঁটে দিচ্ছে ছুপ ছুপ করে, আর মোহনপুরের বউ একটা মুনিশকে দিয়ে ঢেঁকির বাকি কাঠটা চেলিয়ে নিচ্ছে।

অট্টামা লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে, তারপর বললে, আমি ভাবি আপন আপন, গোপালে ভাবে পর। হ্যাঁ লো মোহনপুরের বউ, কখন হতে খুঁজছেলাম তোকে অথচ তোর দেখি সাড়া নাই।

মোহনপুরের বউয়ের মেজাজটা ভালই ছিল, অট্টামার কথায় তাই হেসে ফেলে বললে, ক্যানে, খুঁজছ ক্যানে ?

অট্টামাও হেসে বললে, খপর এনেছি একটা। আমায় না দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে ধনী। দেখব এইবার হ্যাঁ!

বলেই সামনের মুনিশটার দিকে চোখ গেল। কুড়ুলের ঘায়ে সে তখন ঢেঁকির কাঠখানা চেলা করছে।

তা দেখেই অট্টামা বললে, গাছ কাটলি নিকি রে ?

মোহনপুরের বউ বললে, না গো, ঢেঁকিটা। আধখানা তো আগেই গিয়েছিল...

কথা শেষ করতে দিল না অট্টামা। বললে, যাক, ও জঞ্জাল যাওয়াই ভাল। ভদ্দরনোকদের বাড়িতে আর ঢেঁকি রইল না তালে।

মোহনপুরের বউ বললে, তা রেখেই বা কি হবে বলো। উইয়ে খাচ্ছিল বই তো নয়। ঘরের খাওয়ার দু'চার মণ, ও তোমার কোটালদের বাড়ি, বাউরিদের বাড়ি ধান ভাচা দিয়েই চলে যায়, আর তো সব তোমার নিগনের কলে যাচ্ছে।

অট্টামা কোনও সাড়া দিল না এ-কথার। ঢেঁকির কাঠটার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। কুড়ুলের কোপে কোপে কাঠের চেলা তো বেরিয়ে আসছে না, যেন অট্টামার বুকের পাঁজরগুলোই ছিটকে পড়ছে একে একে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অট্টামা ধীরে ধীরে বললে, সব একে একে বিদেয় হচ্ছে লো মোহনপুরের বউ, সব একে একে বিদেয় নিচ্ছে। কি যে দিন ছিল তখন, বউ-ঝি মিলে সারাটা দুপুর কাটত ঢেঁকিঘরে, ঢেঁকিতে পাড় দিতাম, তোর শাশুড়ি সিকেল দিত হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে...তখন মেয়েদের পায়ের গোছ কি হত, হাত আর কাঁধ হত এই এমনি—

বলে দু'হাতের ইঙ্গিতে স্থূলত্বটা বুঝিয়ে দেয় অট্টামা। তারপর বলে, ঢেঁকিও গেছে ধানও গেছে। ধান নাই চাল নাই, গোলাভরা ইঁদুর, ভাতার নাই পুত নাই, কপালভরা সিঁদুর। এখন হয়েছে সেই অবস্তা।

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, কি বলতে এয়েছিলে, মনে আছে না ভুলে গেছ ?

—এই দেখো। অট্টামা জিভ কাটে। বলে, ভুলেই যেতাম লো মোহনপুরের বউ। তা, ভুলি ভুলি মনে করি, বংশীরবে রইতে নারি। চ' ঘরে চ' দিকিনি, একটা খপর

আছে।

অট্টামার ভাবভঙ্গি দেখে মোহনপুরের বউ বুঝতে পারে, কিছু একটা গোপন কথা আছে অট্টামার। তাই উৎকণ্ঠায় ভয়ে চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল মোহনপুরের বউয়ের। তাড়াতাড়ি অট্টামাকে নিজের আধো-অন্ধকার ঘরখানিতে নিয়ে এসে বসালে। ভাবলে, কোনও গ্রাম্য ঝগড়াঝাঁটির দুঃসংবাদ এনেছে হয়তো অট্টামা, কিংবা...

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে, কি ব্যাপারখানা খুলে বলো, যা দুঃসময় পড়েছে আমার, 'গোপন কথা' বললেই বুক ধড়ফড় করে।

অট্টামা একমুখ হেসে বললে, না লো না, ভাল খপর।

—কি ? দুশ্চিন্তার আতঙ্কের ছাপটা সরে গেল মোহনপুরের বউয়ের মুখ থেকে। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতেও পারল না।

অট্টামা হেসে বললে, অত ভয় ভয় করিস ক্যানে ? নদীর ধারে চায, বালির ওপর বাস। তার আবার সু-অদৃষ্ট, কু-অদৃষ্ট আছে নাকি !

মোহনপুরের বউ অধৈর্য হয়ে বলে, কি বলছিলে বলো আগে।

অট্টামা এবার ফিসফিস করে বলে, ওই যে পেভাকর না কি নাম, বিডি আপিস হতে আসে...

—হ্যাঁ, বি ডি ও প্রভাকর।

—গিরেনকে বল ওর বাপের নামঠিকানা জোগাড় করতে।

মোহনপুরের বউ বিস্মিত হয়ে বলে, কি হবে ?

অট্টামা হেসে বলে, স্বজাতির ছেলে, ভাল চাকরি করে, টিয়ের জন্যে সম্বন্ধ কর।

মোহনপুরের বউ হতাশার সুরে বলে, খেপেছ অট্টামা, ও ছেলে আমাদের ঘরের মেয়ে নেবে ক্যানে ? পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমার, দু'দশ বিঘে জমিজমা আছে এমন পাত্রের সন্ধান দাও যে চেষ্টাচরিত্তির করি।

অট্টামা হেসে বলে, গিরেনকে বলেই দেখ না, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওর।

—পছন্দ হয়েছে ? আকাশ থেকে পড়ে মোহনপুরের বউ। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে জ্বলে ওঠে তার সর্বশরীর। গেরস্থ ঘরের বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, কোথাকার কে অচেনা ছেলের তাকে পছন্দ হয়েছে কথাটায় যেন শিউরে ওঠে। বলে, এ অপবাদ কে দিলে বলো তো, মেয়েকে আমি চোখের আড়াল করি না, বলে কিনা...

অট্টামা হেসে বললে, এই দেখো, রাগছিস ক্যানে। ওই অবিনেশ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, অসহায় খোঁড়া মানুষ, একটা কয়েত বেল দিতে গেলাম। তা কথায় কথায় বললে, পেভাকর এয়েছিল, বলেছে রায়বাড়িতে একটা মেয়ে দেখলাম, লক্ষ্মী পিতিমের মত মুখ, যেমন গড়ন তেমনি রং...

মোহনপুরের বউ কৌতুকে হেসে উঠল এবার। বললে, তাই বলো। ও হয়তো ওদের বিমলার কথা বলেছে।

অট্টামা স্তম্ভিত চোখে তাকাল মোহনপুরের বউয়ের মুখের দিকে। বললে, কি যে বলিস, কিসে আর কিসে, চালে আর তুশে। লক্ষ্মী পিতিমের মত মুখ বলবে পেসাদের মেয়ের ? হ্যাঁ, ছিরি আছে, তা বলে তোর টিয়ের মত ডাগরডোগর গড়ন ? অমনি রং ?

মোহনপুরের বউ কথাটা শুনল। কি যেন ভাবল। কিন্তু প্রতিবাদ করল না আর। সত্যিই তো, দিনে দিনে ক্রমশ যেন শ্রী খুলছে টিয়ার। বয়সের জোয়ার নামছে শরীরে। আর কি চুল ! গাঁয়ের একটা মেয়েও ওর পাশে দাঁড়াতে পারে নাকি ! ভাবতে ভাল লাগল মোহনপুরের বউয়ের যে টিয়ার রূপের প্রশংসা করেছে প্রভাকর। করলেই বা প্রশংসা, খারাপ কিছু তো বলেনি।

মনে মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। স্বামীকে বলে খোঁজখবর নিতে হবে ছেলেটির।

গোপন মনের আনন্দটুকু চেপে রাখতে পারল না মোহনপুরের বউ। অত্রামা চলে যেতেই রান্নাঘরে এসে নিজের মনেই গুনগুন করতে শুরু করলে খুব চাপা গলায়, অনেকদিন আগে বর্ধমানে গিয়ে একটা বায়োস্কোপ দেখে এসেছিল, রাধাকৃষ্ণের ছবি, তারই একটা কলি। তারপর হঠাৎ লজ্জায় চুপ করে গেল। ছি ছি ছি, এই বয়সে গুনগুন করে গান গাইতে দেখলে কি ভাববে সবাই।

নিজের মনেই হাসতে হাসতে টিয়ার দিকে চোখ গেল। মোহনপুরের বউ তাকে ইশারায় ডাকলে। কাছে আসতেই এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দুধের কড়াই থেকে খানিকটা সর তুলে নিয়ে পরম আদরে টিয়ার মুখটা বুকের কাছে টেনে এনে তার দু'গালে ঘসে দিতে লাগল।

আদরে আহ্লাদে টিয়ার মুখেও খুশির হাসি দেখা দিল, দু'হাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে টিয়া বললে, মা, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো, না ?

তারপর মা'র কাছ থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটল রেণুদিদের বাড়ির দিকে। গোড়ের পাড় ধরে সামন্তদের খিড়কি দিয়ে বাঁশ ঝোপ পার হয়ে।

এত খুশি, এত উল্লাস যেন কোনদিন হয়নি টিয়ার। খুশি হবে না ? কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে সব কথা শুনেছে ও, সব—সব।

দশ

মনের ফুর্তিতে টিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল রাঙাবৌদি আর রেণুদিকে নিয়ে চলে যায় ঘোষপুকুরে স্নান করতে। আঃ, ওই দিঘির মত বড় পুকুরটায় স্নান করায় যে কি আনন্দ ! টিয়া যদি রাঙাবৌদির মত সাঁতার কাটতে পারত, ডুব সাঁতার দিতে পারত। না পারুক তা, ঘড়া বুকে নিয়ে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলে ভেসে বেড়ানোতেই কি কম আনন্দ নাকি ? কি ঠাণ্ডা আর কাচের মত স্বচ্ছ জল, তলায় গুগলি জমে থাকলে দেখা যায়, দাম শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে মৌরলা মাছের ঝাঁক সারি দিয়ে ছুটে বেড়ায়, এদিকে ওদিকে মোড় ফেরে ঝাঁকটা আর রুপোলি রং চিকচিক করে ওঠে। কি চমৎকার যে লাগে !

মা তো বোঝে না, তাই ঘোষপুকুরে নাইতে গেলেই রাগ করে। বলে, কালীমোড়লদের বাড়িতে গেলেই পারিস।

ঘোষপুকুরের কাছে টিউবওয়েল।

গ্রামে টিউবওয়েল হয়েছে অবশ্য অনেককাল আগেই। কখন হয়েছে টিয়ার স্পষ্ট মনেও পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, দামুদাদা কথায় কথায় বলত, ইংরেজ আমলে তবু একটা টিপকল করে দিয়েছিল, গাঁয়ের লোক জল খেয়ে বাঁচছে। ভোটের সময় সে-বার সেই যে দল এল জিপগাড়িতে চড়ে পতাকা উড়িয়ে, তাদের ওপর খুব চটে গিয়েছিল দামুদাদা। বলেছিল, আপনারা কি করেছেন কি, একটা টিপকলও তো করে দেন নাই।

উত্তরে তারা কত কি বলেছিল, পাহাড় কেটে বাঁধ হচ্ছে, মাটি কেটে ক্যানেল হচ্ছে, আরও কত কি।

মুগ্ধ হয়ে শুনত সবাই। কল্পনায় কত কি গড়ে নিত মনে মনে। আর হঠাৎ এক সময় দামুদাদা বলে বসত, ও-সব বচন অনেক শুনেছি মশাই, এ গাঁয়ে কি করেছেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিন। কাঁদরে পুল করেছেন ? দু'গাড়ি মাটি ঢেলে রাস্তাটা উঁচু করেছেন ? স্টেশনের কি পরিবর্তনটা হয়েছে দেখিয়ে দেবেন ?

দামুদাদার কথাগুলো কিন্তু কারও ভালো লাগত না। সবাই বলত, সবুরে মেওয়া ফলে দামু, সবুরে মেওয়া ফলে। আর দুটো বছর যেতে দাও, তখন দেখবে...

দামুদাদা হেসে বলত, আমি মশাই ক্যানভাসার মানুষ, নগদানগদি কারবার আমার। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, দেখিয়ে দিন কি হয়েছে। ওসব ধার-দেনার মহাজনি কারবার বুঝি না।

প্রথম প্রথম অনেকেই হাসত দামুদাদার কথা শুনে। কিন্তু একে একে অনেকেই তার কথায় সায় দিতে শুরু করল।

একটা রঙিন টিনের স্যুটকেসে হরেকরকমের জিনিস নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে আজও ফিরি করে বেড়ায় দামুদাদা। কয়েক বিঘে জমির ভাগের ধানটুকু নিতে ক'টা দিন বাড়িতে থাকে, বাকি বছরটা ভবঘুরে। শুধু মাঝে মাঝে সপ্তাহে একবার করে ফিরে আসে রাঙাবৌদির কাছে। ফিরে এলেই হৈ চৈ পড়ে যায় সারা বাড়িতে। রেণুদি আর রাঙাবৌদির কি ফুর্তি সেদিন। বাগদি বাড়িতে বলে আসত মাছের জন্যে, চুনোপুঁটি ল্যাঠা শোল যা হোক। দামুদাদা নিজেও হাতে ঝুলিয়ে কখনও দুটো ফুলকপি নিয়ে আসত, কখনও পাঁপড়ের প্যাকেট। বর্ষার সময় একটা গোটা ইলিশ। আর বাচ্চা ছেলেটার জন্যে পুতুল।

গুপ্তদের বউ তাই ঠাট্টা করে বলে, এবার ম'লে যেন ফিরিওলার বউ হই। বিয়ের ভোজ না পেলে মাছ খেতে পাই না, জামাই না এলে কপি দেখি না চোখে।

টিয়া শুনে হাসে, আবার মনে হয় কথাটা মিথ্যে নয়। বিমলা-কমলা দু বোন, অমরেশদা—তারাও প্রথম প্রথম বিশ্বাস করত না। ভাবত, পুকুরে মাছ, সারা বছরই বুঝি গাঁয়ের লোক মাছ খায়। ছিপ ফেলে মাছ ধরবে সময় আছে নাকি কারও। মাঝে মাঝে বাগদি মেয়েদের কাছে দু'চার আনা পয়সা দিয়ে চুনো মাছ যা মেলে। তেমন পয়সা যাদের আছে, চাটুজ্যেদের, মোড়লদের, তারাই বা চাষের সময় লোক পাঠাবে কি করে সদর থেকে এটা-ওটা আনাবার।

কিন্তু দামুদাদা যাই আনুক, ইলিশ মাছ কি কপি, রান্নার পর টিয়ার জন্যে বাটিতে করে পাঠিয়ে দেয় রাঙাবৌদি। অথচ ওসবের দিকে লোভ নেই টিয়ার। ওর লোভ দামুদাদার কাছে গল্প শোনার। কলকাতার গল্প, বর্ধমানের গল্প, ট্রেনের গল্প। নিত্য নতুন খবর আনে দামুদাদা—কোন দেশে আবার যুদ্ধ হবে, কলকাতার রাস্তায় পুলিশ কেন গুলি ছুঁড়ছে, কোথায় ট্রেন উল্টে গিয়ে কত লোক মরেছে।

শুধু টিয়াই নয়, গ্রামের সকলেই দামুদাদাকে সমীহ করে চলে ওই একটা কারণে। পৃথিবীর খবর নিয়ে আসে দামুদাদা, জমিদারি উচ্ছেদ হওয়ার আইনটা কি, জমিজমা নাকি কেড়ে নেবে সব, চাষীর ওপর আয়কর বাড়ছে...

আর সব শেষে দামুদাদা বলে, ওরা তবু একটা টিপকল দিয়ে গেছে, এরা কেড়ে নেবার গোঁসাই।

টিউবওয়েলটা এমন কি জিনিস, যার জন্যে দামুদাদার এত ভক্তি, টিয়া বুঝতে পারে না। ওটা যে একদিন ছিল না, নতুন হয়েছিল, তাও যেন ভাবতে পারে না। মনে হয় যেন চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে। জ্ঞান হয়ে থেকেই তো দেখে আসছে।

তবু মা-মাসীরা যখন সে-সব দিনের কথা বলে, যখন অমৃত থেকে জল আনতে যেত সকলে ঘড়া কাঁখে নিয়ে, লোকে স্নান করত ঘোষেদের ওই বিরাট পুকুরটায়, তখন টিয়ার মনে হয় সেই সব দিনগুলোই ভাল ছিল। এখন ভদ্দরলোকরা টিউবওয়েলে স্নান করে। চাটুজ্যে আর মোড়লরা নিজেদের বাড়িতেও টিউবওয়েল বসিয়েছে। শুধু বাউড়িপাড়া, বাগদিপাড়ার লোক কাছাকাছি পুকুরে ডোবায় ডুব দিয়ে আসে। আঃ ওদের মত টিয়াও

যদি রোজ ঘোষপুকুরে স্নান করতে পেত !

টিয়ার মনের ভেতর তখনও একটা খুশির সুর গুনগুন করছে। এমন আনন্দের খুশির খবর যেন কোনদিন শোনেনি টিয়া। দূর থেকে বি ডি ও প্রভাকরকে কতবারই তো দেখেছে ও। কখনও সাইকেলে চেপে গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে যায় স্টেশনের দিকে, কখনও বা জিপে চড়ে। দু'একদিন গ্রামের লোকের সঙ্গেও দু'একটা কথা বলে যায়।

একদিন বুঝি রেণুদির কাছে তার চেহারার প্রশংসা করে ফেলেছিল টিয়া, তার পর থেকেই রেণুদি আর রাঙাবৌদি ওকে দেখলেই ঠাট্টা করে। শুনতে ভালও লাগে, মনে মনে কখনও-সখনও একটু-আধটু স্বপ্নও দেখে ফেলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত ব্যাপারটাকে এমনই অসম্ভব মনে হয় যে নিজের বোকামিতে নিজেই হেসে ফেলে ও।

ভিতরে ভিতরে যত দুঃসাহসই থাক, প্রভাকরকে দূর থেকে দেখতে পেলেই আড়ালে লুকিয়েছে ও, লজ্জাবতী লতার মত কুঁকড়ে গেছে। লাজুক চোখজোড়া তুলে কোনওদিনই তাকাতে পারেনি। এমন কি বিমলা-কমলা যেদিন হেসে হেসে গল্প করেছে সেদিনও বিমলার পিঠের সঙ্গে লেপটে থেকেছে ও মাটির দিকে চোখ নামিয়ে।

অথচ প্রভাকর কিনা ওর কথাই বলেছে অবিনাশ ডাক্তারের কাছে! কেন বলেছে, কোন্ প্রসঙ্গে বলেছে কথাটা, কিছুই জানে না। টিয়ার তাই ভালও লেগেছে, আবার ভয় ভয়ও করেছে। কেমন এক বিচিত্র লজ্জা। ছি ছি, অবিনাশ ডাক্তার কি ভেবেছে কে জানে।

তবু রাঙাবৌদিকে কথাটা না বলে...না, কি থেকে কি হয় কেউ বলতে পারে। তার চেয়ে না বলাই ভাল।

বলবে না টিয়া। কিছুই বলবে না জেনেও দামুদাদার বাড়িতে ছুটে এসেছে। না এসে পারেনি।

আর ঘরে ঢুকেই দামুদাদার মুখোমুখি পড়ে গেছে।

টিয়া ঢুকে পড়তেই চুপ করে গেছে দামুদাদা, আর রাঙাবৌদি তখনও মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

টিয়া দেখলে, ওপাশে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে রেণুদিও হাসছে। আর দামুদাদার তিন বছরের ছেলে ফিরু---কিছু না বুঝেই সেও হাসছে খিলখিল করে।

টিয়া বললে, বন্ধ করলে কেন দামুদাদা, কিসের পালা করছিলে, করো না।

রাঙাবৌদি হেসে উঠে বললে, যাত্রার পার্ট নয় গো টিয়া, লোকদের কি করে বোকা বানায় তাই দেখাচ্ছিল।

টিয়া হাসতে হাসতে বললে, দেখাও দামুদাদা, দেখাও।

ইতিমধ্যে নড়বড়ে পায়ে একটা ছোট্ট টুকরি মাথায় নিয়ে উঠোনের ওপর হেঁটে বেড়াতে শুরু করেছে ফিরু আর থেকে থেকে ডাক ছাড়ছে : 'চা—ই, চা—ই' বলে।

দামুদাদা তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠল, বাপের ব্যাটা রে, ক্যানভাসারের ব্যাটা ক্যানভাসার।

রাঙাবৌদি হেসে বললে, ক্যানভাসার না আরও কিছু, ফিরিআলা বলো।

বলল চটাবার জন্যেই। হংস চাটুজ্জে একবার ওকে ফেরিওয়ালা বলেছিল বলে চটে গিয়েছিল দামু।

রেগে গিয়ে বলেছিল, ইস্কুলে টাকা দিয়ে পড়েছিলে হংস ? না ধান দিয়ে ? ফেরিওয়ালা কাকে বলে জানো ? মাথায় মোট বয়ে বেড়াই আমি ?

ক্যানভাসার হওয়া সহজ নয়, দামু বুঝিয়েছে সকলকে। বলেছে, আমি হলাম ক্যানভাসার। যাত্রার যেমন পার্ট করতে হয়, এও তেমনি! আমরা ঘরে ঘরে জিনিস

বেচি না, ট্রেনে ট্রেনে কথা বেচি।

হংস চাটুজ্যে ঠাট্টা করে বলেছিল, গাড়োয়ানদের এইবার থেকে ড্রাইভার বলতে হবে দেখছি!

শুনে চটে গিয়েছিল দামু। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হংস চাটুজ্যের সঙ্গে।

আর তাই কথায় কথায় তাকে ফিরিআলা বলে চটিয়ে দেবার চেষ্টা করে রাঙাবৌদি।

চটাবার জন্যেই বললে, দেখাও না টিয়াকে, ও বেচারী দেখতে পায়নি।

টিয়াও আবদার ধরলে।

দামু হেসে টিনের স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা শুরু করলে। হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, শুনছেন মশাইরা, শুনছেন সব? আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কি সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে আপনারা গিয়ে পড়বেন জানেন কি? গড় গড় করে এক রাশ কথা বলে যায় দামু, ট্রেনের যাত্রীদের যে-ভাবে বলে। গম্ভীর মুখে বলে চলে, আজ শনিবার, গৃহিণীর মান ভাঙাতে ভাঙাতেই রবিবারের বিকেল কেটে যাক, এই কি চান আপনি?

রাঙাবৌদি হেসে লুটিয়ে পড়ে বললে, মরে যাই, তাই কি কেউ চাইতে পারে!

দামু কিন্তু হাসল না, গম্ভীর হয়েই বললে, না চান তো আমার কাছে হাত পাতুন। মাদুলি নয়, শিকড় নয়, বশীকরণ মন্ত্র নয়, স্রেফ এক শিশি আলতা, জি ধর অ্যান্ড কোম্পানির সেই বিশ্ববিখ্যাত 'দিদিমণি' আলতা। চালের দাম বেড়েছে, তেলের দাম বেড়েছে, চিনির দাম বেড়েছে, বাড়েনি শুধু 'দিদিমণি' আলতার দাম। ছোট শিশি পাঁচ আনা, বড় শিশি ন'আনা। নেবেন নাকি একটা?

বলে খালি হাতটাই রাঙাবৌদির দিকে এগিয়ে দিলে দামু।

আর হাসতে হাসতে রেণু বললে, দাদা, সত্যি এমনি করে বলো?

রাঙাবৌদি ততক্ষণে হাসি সামলেছে। বললে, না গো না, ঠাকুজ্জি, প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে অমনি রসিকতা করলেই হল কি না।

দামু শুধু হাসে; হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। তারপর হঠাৎ গম্ভীর গলায় শুরু করে: নবশক্তি কার্যালয়ের 'অম্লনাশিনী', আর মাত্র তিন প্যাকেট আছে, পেটের ব্যথা, শূল ব্যথা, কলিকের ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট কামড়ানি, আমাশা, রক্তামাশা, হঠাৎ পেট কুনিয়ে ওঠা, বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঘোরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটের যাবতীয় রোগ তিন মিনিটে সারিয়ে দেবে নবশক্তি কার্যালয়ের এই 'অম্লনাশিনী'। মাত্র তিন প্যাকেট আছে, নিতান্ত প্রয়োজন থাকলে তবেই নেবেন। চার আনা, প্রত্যেক পুরিয়া চার আনা।

বলেই ফিরুকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় দামু। বলে, যাই, আমাদের যাত্রার কদ্দূর কি হল খোঁজ নিয়ে আসি।

দামুদাদা চলে যেতেই রাঙাবৌদি হাসি থামিয়ে বললে, এই শুরু হল এবার, যাত্রা আর যাত্রা, টিকি দেখা যাবে না আর মানুষের।

তারপর টিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, টিয়ারানীর কি খবর, খুব খুশি-খুশি দেখছি যে!

টিয়া তখন খিলখিল করে হাসছে দামুদাদার অভিনয় দেখে। হাসি থামিয়ে বললে, যাই বলো রাঙাবৌদি, গেলবারে যাত্রায় কি সুন্দর পার্ট যে করেছিল দামুদাদা।

রাঙাবৌদি হেসে বললে, তোমরাই তো মাথাটি খেয়েছ ওর। যাত্রা আর যাত্রা। তারপর হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তুমি যে এমন অসময়ে?

টিয়া ধীরে ধীরে বললে, আজ ঘোষপুকুরে নাইতে যাবে রাঙাবৌদি?

সুযোগ বড় একটা মেলে না, কিন্তু সুযোগ পেলেই রেণুদি আর রাঙাবৌদির সঙ্গে ঘোষপুকুরে স্নান করতে যায় টিয়া।

ওই বড় পুকুরটায় ঘড়া বুকে নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে মনে হয় যেন ওর চারপাশের সব বাধানিষেধ, মা'র শাসন, পায়ে পায়ে বাঁধন—সব খুলে গেছে, সরে গেছে। পাড়ে পাড়ে বনকুলের ঝোপ, টোপাকুলের ঝাঁক। জলে সবুজ কলমির লতা সরিয়ে ঘড়া বুকে নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত সাঁতার দিতে দিতে চলে যায় টিয়া। পাড়ের কচুর ডাঁটা আর কচুরিপানার পাতাগুলো সাপের ফণার মত মনে হয়। আর কচুরিপানার বেগুনি রঙের ফুলগুলো কি সুন্দর যে লাগে। একটু একটু করে এগিয়ে চলে টিয়া, মাছরাঙা উড়ে পালায়। রাঙাবৌদি আর রেণুদি ঘড়া না নিয়েই সাঁতার দেয়, কাছ দিয়ে কোনও লোক আসতে দেখলেই টুপ করে গলা অবধি ডুবিয়ে অপেক্ষা করে। ঘাটে মেয়েদের দেখলেই তারা সরে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে হুটোপুটি শুরু করে দেয় ওরা।

রাঙাবৌদি চমৎকার ডুবসাঁতার দিতে পারে। এই দেখা যাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে—খল্‌খল্‌ করে হাসছে রেণুদি, জল ছুঁড়ছে রাঙাবৌদি, আর পরমুহূর্তেই টুপ করে একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া পিঠছাওয়া চুলসুদ্ধ মাথাটা জলের তলায় লুকিয়ে পড়ে। এদিক ওদিক খুঁজে বেড়ায় টিয়া, তারপর হঠাৎ ওর পিছনে মাথাটা ভেসে ওঠে।

ডুব সাঁতার দিতে পারে না টিয়া, রেণুদির মত সাঁতার কাটতেও পারে না। ঘড়া বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে পুকুরের মাঝখান অবধি ভেসে যেতে তাই মজা লাগে ওর।

সুযোগ কম, তবু যেদিন পুকুরে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকতে পায় সেদিন অদ্ভুত এক আনন্দের রেশ নিয়ে বাড়ি ফেরে টিয়া।

সেদিনও মুখে হাসি নিয়েই ফিরে এল।

কিন্তু উঠোনে পা দিয়েই কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল।

দেখে মনে হল, এখনই যেন একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে বাড়ির মধ্যে। থমথমে মুখ করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে উঠোন ঘিরে। দক্ষিণ-দুয়োরির বারান্দায় জেঠিমা আর তার মেয়েরা। ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে টিয়ার মা। জ্যাঠামশাই আর বাবা উঠোনের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছে যেন।

ভয়ে ভয়ে মা'র কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল টিয়া। তারপর আরেকবার সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বিমলার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল।

—ও মা, ও কি গো? বিমলাদি কাদায় পড়ে গেছে না কি?

মোহনপুরের বউ টিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে চাপা গলায় বললে, চুপ।

একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা শুনল টিয়া। মোহনপুরের বউ মেয়েকে রান্নাঘরের ভিতরে ইশারায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, কি দোষ করেছি মা, এইমাত্র উঠোন নিকিয়ে দিয়ে গেছে কোটালবউ, বুড়ো ধাড়ি মেয়ে জানে না, উঠোন পিছল হয়ে আছে?

টিয়া আতঙ্কের গলায় প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে কি তাতে?

—অত বড় মেয়ে, পড়ে গিয়ে কাদা মাখামাখি করলে হাসি পায় না মানুষের! হেসে ফেলেছি ওকে দেখে, ছুটে তুলতে যাইনি, তাই তোর জেঠির কি রাগ।

টিয়া ধীরে ধীরে বললে, তা গেলে না কেন তুলতে।

মোহনপুরের বউ রেগে গেল।—ছোট ছেলে নাকি ও, তোরা যখন পড়ে যেতিস তুলতে যেতাম? পড়ে গেছে, নিজে নিজে উঠবে, তার আবার ছুটে যাব কি। রান্না করছি, দু'হাত জোড়া, যাব কি করে শুনি।

যুক্তিটা কিন্তু টিয়ার মনঃপূত হল না, ভাবলে, মা-টা যেন কি। আমাদের সঙ্গে তুলনা বিমলাদির? ও বেচারী শহুরে মেয়ে, নিকোনো উঠোনে হাঁটাচলার অভ্যাস আছে নাকি?

মনে মনে যাই ভাবুক, মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পেল না। শুধু চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, বাবা আর জ্যাঠাও তাই বলে রাগারাগি করছে?

মুখের প্রশ্ন মুখেই রয়ে গেল। জ্যাঠার কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে এল আবার।

গিরিজাপ্রসাদের রাগ তখন পড়ে এসেছে। কাচুমাচু মুখ করে বললেন, কি এমন বলেছি যে এত রেগে উঠলি? দু'চার বস্তা সিমেন্ট আর মোরম এনে উঠোনটা বাঁধিয়ে নিলে হত—এ কথায় এত রাগবার কি আছে। সে কি শুধু আমার মেয়েদের জন্য বলেছি?

গিরীন তখনও রাগে ফুলছে। চিৎকার করে উঠল সে আবার। বললে, আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে আর দরদ দেখাতে হবে না তোমাকে। দেখাতে হবে না, দেখাতে হবে না। বলি এতকাল তো এতেই কাটিয়ে এলাম, এখন ওসব ফ্যাশান আমার দরকার নেই। টাকা থাকে তো নিজে বার করো, করে ইচ্ছে হয় সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নাও।

বলেই রাগে গজগজ করতে করতে সদর দরজা পার হয়ে চলে গেল গিরীন। গিরিজাপ্রসাদও স্তম্ভিত বিস্ময়ে অভিমানে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন সদর দরজাটার দিকে, যেদিক দিয়ে এইমাত্র গিরীন বেরিয়ে গেল সেদিকে।

যেন তাঁর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। সেই গিরীন, ছোটভাই গিরীন, যার হাত ধরে ধরে রেললাইন বরাবর জনপুরের ইস্কুলে নিয়ে যেতেন; একবার গিরীনের যখন খুব অসুখ হল, কাছেপিঠে কোথাও ডাক্তার নেই, সাপখোপের ভয় না করে অন্ধকারে মাঠ ভেঙে ভেঙে ডাক্তার আনতে গিয়েছিলেন, নিজের মাইনের টাকাতে কোনরকমে চলে যেত বলে যার কাছ থেকে ভাগের ধানটুকুও নিতে চাননি—সেই গিরীন কিনা ছেলেমেয়েদের সামনে তাঁকে এমনভাবে অপমান করল।

গভীর দুঃখে বেদনায় ধীরে ধীরে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকলেন গিরিজাপ্রসাদ। তক্তপোশটার ওপর বসে গালে হাত দিতে গিয়ে ভিজে ভিজে ঠেকল। চোখের জল। হাতটা বিছানার ওপরই মুছে নিলেন।

নিভাননী, ছেলেমেয়েদের সকলেই গিরীনের এই আকস্মিক দুর্ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অসীম লজ্জা আর আত্মধিক্কারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশাতেই যেন একে একে ওরা আধো-অন্ধকার ছোট্ট ঘরখানায় মুখ লুকোতে চাইল।

শুধু নিভাননী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কতবার পই পই করে বলেছি, আগে থেকে ব্যবস্থা করলে এই হাল হত না আজ। দেখলে তো?

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। স্ত্রীর যুক্তিটা ঠিক না ভুল, আগে থেকে তাঁর সাবধান হওয়া উচিত ছিল কিনা, এ-সব কথা তাঁর মনের মধ্যে এতটুকুও স্পর্শ করল না। জমিজমা, সম্পত্তির ভাগ, ধানের টাকা, এই ভিটেবাড়ি—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে হয়ে গেছে তখন গিরিজাপ্রসাদের কাছে। তুচ্ছ, একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার এসব। যা ভেঙে গেল, হারিয়ে গেল, তাঁর সারাজীবনের ধারণা, ভালবাসা, মমতা—মুহূর্তের মধ্যে সব খান খান হয়ে গেছে। আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

গিরিজাপ্রসাদের মনে হল, সব কিছু দিয়ে, স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি দিয়েও যদি ফিরে পাওয়া যেত ওই হারিয়ে-যাওয়া প্রীতিটুকু। মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতা কি তা হলে কাচের বাসনের মত ঠুনকো? একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগানো যায় না?

গিরিজাপ্রসাদ হঠাৎ যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। একটা অদ্ভুত আতঙ্ক। যেন ওই ভাঙা টুকরো দুটোকে আবার জোড়া লাগানো যাবে না, এই ভয়।

তা হলে তিনি বাঁচবেন কি করে। কি নিয়ে বাঁচবেন?

নিভাননীর মনের ক্রোধ কিন্তু তখনও শান্ত হয়নি। স্বামীর এ অপমান যে তাঁরও অপমান, ছেলেমেয়েদের অপমান।

ধীরে ধীরে নিভাননী বললেন, সারাটা জীবন কি ওই ভাইয়ের হাততোলা খেতে হবে

নাকি ? বয়সে বড় দাদা বলেও তো মানুষ মান্যি করে।

গিরিজাপ্রসাদ তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। যা হয়ে গেছে তাকে সহজ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, না না, ওর দোষ নেই কোনও। বেচারা এত বড় দুটো সংসার চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে...

দপ করে জ্বলে উঠলেন নিভাননী।—না পারে টাকাকড়ির হিসেব-নিকেশের ভার তোমার হাতে তুলে দিলেই তো পারে। চলে কি না চলে দেখি তা হলে। একশো বিঘে জমির ধান থেকে না চললে কিসে চলবে শুনি ! ওরা কি ভেবেছে, যা সামান্য ক'টা টাকা আছে তোমার, তাই তুলে সংসার চালাব ?

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন নিভাননী, কপাটের দিকে চোখ পড়তেই চুপ করে গেলেন।

মোহনপুরের বউ নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াল কপাটের আড়ালে। হাতে একথালা মুড়ি।

জলখাবারের থালাটা গিরিজাপ্রসাদের সামনে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল মোহনপুরের বউ।

গিরিজাপ্রসাদ থালাটার দিকে তাকালেন। প্রতিদিনের নিয়ম থেকে কোথায় যেন একটা পার্থক্য লক্ষ করলেন। দুটো বেগুনি, খানিকটা ক্ষীরও আছে, আরেকটা নারকেল নাড়ু। সব কিছুর মধ্যে যেন একটু বিশেষত্ব আছে। তা ছাড়া মোহনপুরের বউ নিজে তো কোনদিনই আসে না জলখাবার দিতে !

মোহনপুরের বউ ইতিমধ্যে কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন কি বলতে চায় সে।

নাক পর্যন্ত টানা ঘোমটার ভেতর থেকে দুটো বিষণ্ণ চোখে নিভাননীকে ইশারায় ডাকলে মোহনপুরের বউ।

নিভাননী উঠে গেলেন বিরক্ত মুখে।

আর কপাটের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে যাতে গিরিজাপ্রসাদ শুনতে না পান এমন চাপা গলায় মোহনপুরের বউ বললে, ভাশুরঠাকুরকে রাগ করতে মানা করুন দিদি। পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ঘুরছে ও, মানুষের মাথার কি ঠিক থাকে সব সময় !

বলতে বলতে নিভাননীর একটা হাত খপ করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল মোহনপুরের বউ।

এগার

অপেরা পার্টির যাত্রা নিয়ে আসার সুযোগ হয় ক্বচিৎ কদাচিৎ। গ্রামের সচ্ছল অবস্থার লোকগুলো বেশির ভাগই দূর দূর শহরে চলে গেছে, কিংবা প্রবাসে গিয়েই হয়তো অবস্থা ফিরিয়েছে। তারা কেউই প্রতি বৎসর পুজোয় বাড়ি আসে না। আসে দু'পাঁচ বছর পর পর। মজুমদাররাও তাই। আর ইদানীং অবনীমোহন আসেন পাঁচ-সাত বছর বাদে বাদে। ব্যবসা তাঁর ফেঁপে উঠেছে, বাড়ি করেছেন কলকাতায়, আর বেশির ভাগ সময়েই থাকেন সেখানে। তাই আগেকার মত আর জমির ধানটার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে আসেন না, যেবার আসেন দু'পাঁচ বস্তা ধান চাঁদা দিয়ে দেন বারোয়ারিতলায়।

তাই যে বছর প্রবাস থেকে ফিরে আসে অনেকে, কিংবা আউশ ধানটা ভাল হয়, সেইবারেই দরাজ হাতে দু'চার বস্তা করে ধান দেয় সকলেই, আর সেই ধান-বেচা টাকায়

কলকাতা থেকে অপেরা পার্টির যাত্রা আনা হয়।

কিন্তু চাঁদা না উঠলেও যাত্রা হয় প্রতিবারই। গাঁয়ের লোকরাই করে, কাটোয়া নয় তো আমোদপুর থেকে ড্রেস ভাড়া করে নিয়ে এসে। পুজোর অনেক আগে থেকেই তাই পালা ঠিক হয়ে যায়, রিহার্সাল শুরু হয়ে যায় মজুমদারের বাংলা বাড়িতে।

গানের গলা নেই আর, সে-শরীরও নেই, তবু বংশীর উৎসাহ কমেনি। সেও এসে এক পাশে পা গুটিয়ে বসে তামাক টানতে টানতে রিহার্সাল দেখে, হঠাৎ এক এক সময়ে বলে ওঠে, হল না, হল না, সুদামা হলেন গিয়ে তোমার কৃষ্ণের সখা, কলকেতার বাবু নন গো তিনি।

কেউ উপদেশ নেয় তার, কেউ নেয় না।

কিন্তু দামু পালের কথায় তারা ওঠে বসে। বংশীর ছেলে উদাস। হংস চাটুজ্যে। উপেন গুঁই অবশ্য আসে অনেক পরে, পুজোর মাত্র দিন কয়েক বাকি থাকতে। রানীগঞ্জে স্বজাতি এক বাবুর বাড়িতে থাকে খায়, রান্নাবান্না করে সে। তার পার্ট লিখে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রান্না করতে করতে উনোনের ধারে বসে বসে পার্ট মুখস্থ করে সে। অথচ পুজোর সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেই যখন আসরে নামে, মনে হয় যেন কতদিন ধরে রিহার্সাল দিয়েছে।

তবে উৎসাহ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উদাসের। দামু বাড়ি এসেছে খবর পেলেই ছুটে আসে, কি পালা হবে, কোন পার্ট পাবে সে, ধীরেন সাঁইকে তার পার্ট লিখে পাঠানো হয়েছে কিনা ; সব খবর নেয়। সাইকেল নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে সবাইকে এনে জড়ো করে মজুমদারদের বাংলাবাড়িতে।

অথচ সেই উদাসের এবার আর কোন আগ্রহ নেই যেন।

দামু পাল তাই ফিরুকে কাঁধে নিয়ে একেবারে সটান চলে এল বংশীর বাড়িতে, কোটালপাড়ায়।

উদাসকে ডাকতে যাচ্ছিল দামু, তার আগেই চোখ পড়ল উদাসের বউ একটুকরো ময়লা কানি পরে ঝাঁটা হাতে চালার গায়ের ঝুল ঝাড়ছে।

ডাকতে গিয়েও থেমে গেল দামু। কে জানে, কেমন মেজাজে আছে উদাসের বউ। রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা, চোখের কোল দুটো বসে গিয়ে চোখ দুটোকে বীভৎস করে তুলেছে আরও। কিন্তু তার চেয়েও ভয় ওর ঝগড়াটে ব্যবহার আর চিৎকারকে। বউটার দিকে তাকালেই মায়া হয় উদাসের ওপর। এই বউ নিয়ে কি করে ঘর করে!

ঘর অবশ্য করে না উদাস, সমস্তক্ষণ বাইরে বাইরেই কাটায়। সকালে চলে যায় সাইকেল নিয়ে, কাটোয়ায় ড্রাইভারি শিখতে, সন্ধের আগে ফিরে আসে।

তবু খবরটা তো দেওয়া দরকার উদাসকে। তাই শেষ পর্যন্ত ডাক ছাড়লে দামু—উদাস আছ বাড়িতে ? উদাস!

উদাসের বউ লক্ষ্মীমণি ফিরে তাকাল ঝাঁটা হাতে। তারপর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।—উদাস, উদাস ঘরে থাকে নিকিন এক ডণ্ড ?

দামু শান্ত করার চেষ্টা করে বলল, আহা, রাগছ কেন, তাই জিগ্যেস করছি কখন আসবে ?

লক্ষ্মীমণি কাছে এগিয়ে এল এবার। হাত পা নেড়ে বলে উঠল, সে কোথায় কোন ভাগাড়ে পড়ে আছে তার খপর আমায় রাখতে হবে ?

চিৎকার শুনে ঘরের ভেতর থেকে বংশী বেরিয়ে এল। কপালে তিলক, গলায় তুলসী কাঠের মালা, হাতে হুঁকো নিয়ে বাইরে বেরিয়েই দামুকে দেখে বললে, ও, তাই বলি পাগলি চেঁচায় কেন এত।

লক্ষ্মীমণির রাগ যায়নি তখনও। শ্বশুরকে দেখে ঘোমটাও টানল না। দামুকে বললে, ওই যে গুণধর বেটার বোষ্টম বাপকেই শুধোও ক্যানে।

লক্ষ্মীমণির ব্যবহার আর ঝাঁঝালো গলার স্বর শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বংশী, তবু দামুর সামনে অস্বস্তি বোধ করলে সে। ধমক দিয়ে উঠল। —থাম তুই।

—ক্যানে, থামব ক্যানে ? গুণের বেটা তেনার ডাইভারি করছে। ডাইভারির মুখে ছাই, কচি খুকি আমি ? কিচ্ছু বুঝি না ?

বংশীও বিস্মিত হয় তার কথায়। বলে, কি বল্‌ছিস কি তুই ? থামবি না ?

ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা নিয়ে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে খেঁকিয়ে ওঠে লক্ষ্মীমণি। বলে, আমিও কাঁটোয়ার মিস্ত্রির বিটি গো, কত ধানে কত চাল সব জানি। বলি, বেটা তোমার দু'পহর দিন ডাইভারি করে, না ওই পদ্মকে খুঁজে বেড়ায়। মুখের ওপর নুড়ো ঘসে দিয়ে চলে গেল, তবু নাজনজ্জা নেই মানুষটার!

আরও কি বলে বসবে ঠিক-ঠিকানা নেই, ভয়ে ভয়ে দামুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বংশী। বললে, তুমি বরং গিরিদাদাদের বাড়িটা দেখে যাও দামু, দ্বিচক্র বাহন নিয়ে বাবু গেলেন বোধ হয় ওই দিকে।

তারপর থেমে বললে, না পাও তো বৈকালে ফিরে এলে বলব, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

সন্ধে হবার আগেই অবশ্য ফিরে আসে উদাস। তারপর সাইকেলটা তুলে রেখে ঘটির জলে মুখ হাত ধুতে গিয়ে দেখে জল নেই ঘটিতে। খিড়কির ডোবায় গিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসে।

দশ-বারো মাইল পথ নিত্যদিন সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আর আসা। সারা শরীরে ঘাম ঝরে, খিদেয় পেট জ্বলে যায়।

তবু ভয় হয় লক্ষ্মীমণিকে ডাকতে। এখনই হয়তো ঝগড়া বাধিয়ে বসবে, নয়তো চিৎকার জুড়ে দেবে। চুপচাপ তাই কিছুক্ষণ বসে থাকে উদাস। লক্ষ্মীমণি নিজেই মুড়ি-মুড়কি কিছু দিতে আসবে ভেবে। কোনও-কোনওদিন সত্যিই ভিজে ভাত আর পোস্ত, নয়তো মুড়ি চিঁড়ে কিছু এনে দেয় লক্ষ্মীমণি, যেদিন মন ভাল থাকে।

কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থেকেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল উদাস।

ডাকলে, বউ! অ বউ!

কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মীমণি, ডাক শুনে নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুল।

উদাস আবার ডাকলে।

অসীম বিরক্তিতে মুখের ওপর থেকে কাঁথাটা সরাল লক্ষ্মীমণি। মুখ বিকৃত করে বললে, গায়ে-গতরে দরদ নিয়ে শুয়ে আছি, জ্বরে পুড়ে মরছি, এট্টুকুন মায়া-দয়া নাই গো মানুষটার।

উদাস তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে, জ্বর হয়েছে তোর ? বলে লক্ষ্মীমণির কপালে হাত দিতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল লক্ষ্মীমণি।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে উদাস বললে, হ্যাঁ রে বউ, বড্ড খিদে নেগেছে, কি আছে বল, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

এবারও ঝাঁঝিয়ে উঠল সে। —কি আমার দু'মহল ভাঁড়ার আছে গো! দেখে খুঁজেপেতে লেবে যাও না। আমায় জ্বলানো ক্যানে।

আর কোনও কথা বললে না উদাস। রাগে অভিমানে এসে শুয়ে পড়ল দাওয়ার ওপর। শুধু একটা অসহ্য ব্যথা পাক দিয়ে দিয়ে বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। আর

শুয়ে থাকতে থাকতে ক্ষণিকের জন্যে পদ্মর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেই হাসি মুখখানা, সেই ঠাণ্ডা নরম চোখ দুটি!

কোন্ কুক্ষণে যে দশরথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, মোটর ড্রাইভার হওয়ার সাধ জেগেছিল!

সে-সব দিনের কথা ভাবলে নিজের ওপরই রাগ হয়। নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় তার।

কোটালের ঘরের ছেলে, কোথায় শশাঙ্ক হাজরাদের বাড়িতে বাগাল হয়ে দু'বেলা পেটের ভাত রোজগার করবে, তারপর লাঙল ধরতে শিখলে পাঁচ-দশ বিঘে জমি ভাগে চষবে, তা নয় ড্রাইভার হবার শখ হয়েছিল।

সেদিনটার কথা চিরকাল মনে থাকবে তার।

এক বাণ্ডিল কাগজপত্র দিয়ে হাজরাদের মেজোবাবু বলেছিল কাটোয়ায় উকিলবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে।

যাতায়াতের পয়সা নিয়ে সরানের ধারে অপেক্ষা করছিল উদাস।

একটু পরেই দেখলে ধুলো উড়িয়ে মোটর-বাস আসছে। যাত্রী দেখে মোটর-বাসটা এসে দাঁড়াল, কিন্তু বাসে তখন তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

পিছন দিকে উঠবার চেষ্টা করে পারল না উদাস। অথচ কাটোয়ায় না পৌঁছলে চলবে না। বাবুরা রেগে যাবে, গালাগালি দেবে, হয়তো...

পাংশু মুখে কি করবে ভাবছে উদাস, সেই সময়েই ড্রাইভারের পাশে-বসা লোকটা ডাকল তাকে। কোন রকমে পাশে বসার জায়গা করে দিল।

লোকটার সর্বাঙ্গে কালিঝুলি, প্যান্টের গায়ে, গেঞ্জিতে : সারা মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তবু লোকটাকে খুব বন্ধু মানুষ মনে হল। একটা বিড়ি নিজে ধরিয়ে আরেকটা উদাসের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর পরিচয় নিলে, কোন্ গাঁয়ে বাড়ি, কি নাম, কি জাত। তারপর হেসে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরে বললে, তবে তো হামারা জাতভাই রে বেটা।

তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বলেছে, এই দশরথ মিস্ত্রিকে সবাই চেনে কাটোয়ায়, কিন্তু কোটাল বলুক দিকিনি কেউ। বলেই ড্রাইভারের পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। —চালাও ড্রাইভার সাহেব, টায়ার ফাটে তো দশরথ মিস্ত্রি হাজির হ্যায়।

লোকটার মেজাজ, কথাবার্তা, অন্তরঙ্গতা সব কিছুই যেন আকর্ষণ করেছে উদাসকে। মনে হয়েছে, লোকটা গ্রামের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কাটোয়া যাওয়া-আসা করতে করতে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে দশরথের সঙ্গে। তারপর একদিন তার বাসাতে উদাসকে নিয়ে গেছে সে।

সেইদিন প্রথম লক্ষ্মীমণিকে দেখেছে উদাস। রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা, চোখের ওপর কর্কশ ঘন ভুরু। দেখেই মনে হয়েছে ভীষণ বদমেজাজি আর খিটখিটে।

দশরথের সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে মেয়েটা কাঁসার গ্লাসে করে চা এনে দিয়েছে।

উদাস বলেছে, চা তো আমি খাই না।

চা খায় না! মেয়েটা হেসে উঠেছে। যেন চা না খাওয়াটা চরম অসভ্যতা!

তারপর একদিন উদাসের খাটো করে চুল ছাঁটা মাথাটা দেখিয়ে ঠাট্টা করেছে! বলেছে, কাকের বাসা।

মেয়েটাকে মোটেই ভাল লাগেনি উদাসের। তবু হাটে চিরুনি কিনে এনে টেরি কাটতে শিখেছে ও, হাজরাদের বাড়িতে চা খেতে চেয়েছে কোনও-কোনওদিন। আসলে ধীরে

ধীরে ও দশরথের মেয়েকে খুশি করতে চেয়েছে, দশরথকে। কারণ, উদাসের মনে তখন একটা নতুন স্বপ্ন জেগেছে।

দশরথও বলেছে, ড্রাইভারির কাজে ইজ্জত আছে।

সত্যিই তো, মোটর-বাসের ড্রাইভারকে ঐ হাজরাদের মেজোবাবুও কত খাতির করে কথা বলে। অথচ, বাগাল বলে উদাসকে কি গালাগালিই না দেয় উঠতে বসতে।

দশরথ বলেছে, রোজ দুপুরে আসতে পারো তো ড্রাইভারি শিখিয়ে দেব। ড্রাইভাররা সব আমার হাতের লোক।

কিন্তু নিত্যদিন কাটোয়ায় আসবে কি করে সে। তাই দামু পালের কাছে সাইকেল চড়া শিখেছে, তারপর বাপের কাছে আব্দার ধরেছে, একটা সাইকেল কিনে দাও।

মা-মরা একমাত্র ছেলে, শেষ অবধি দশ কাঠা বাকুড়ি জমি বেচে সাইকেল কিনে দিয়েছে বংশী। ভাবেনি, শেষে এমন একটা কথা শুনতে হবে ছেলের কাছে।

সাইকেল পেয়েই কাটোয়ায় যাতায়াত শুরু করেছে উদাস, বাপকে বলেছে, ও সব মুনিশ-বাগালের কাজ করতে নারব আমি। ও তোমার ছোটনোকের কাজ। আমি ডাইভারি শিখছি।

—ডাইভারি ? আকাশ থেকে পড়েছে বংশী। মনে মনে ভয় পেয়েছে। ও-সব কাজে কখনও স্বভাবচরিত্র ভাল থাকে ? কত ঠগ বদমাশের সঙ্গে মেলামেশা, বেপাড়ায় যাতায়াত !

ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়েছে উদাসের জন্যে একটা সুন্দরমত মেয়েকে ঘরের বউ করে আনার। তা হলেই হয়তো ঘরে মন বসবে ছেলের। জমি বেচে কন্যাপণের টাকা রেখেছে হাতে।

তারপর ভিতরে ভিতরে মেয়েও দেখেছে।

শেষে একদিন উদাসকে বলেছে, মেয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

—মেয়ে কার নেগে ?

বংশী হেসে বলেছে, কার আবার, বুড়ো বয়সে আমি বিয়ে করব ?

উদাস বলেছে, উঁহুঁ।

—উঁহুঁ কি, মেয়ে যে খুব সোন্দর। মাত্তর পাঁচ কুড়ি টাকা নেবে।

উদাস হেসে উড়িয়ে দিয়েছে বাপের কথা। বলেছে, টাকা নাগবে না আমার জন্যে ; সে তুমি ভেবো না। দশরথ মিস্ত্রি বলেছে, ওর মেয়েকে বিয়ে করলে ডাইভারি শিখিয়ে দেবে। লাইসেন করিয়ে দেবে।—

শুনে রেগে গিয়েছে বংশী। ভেবেছে, নিজের চোখে মেয়ে দেখলে আর অমত করবে না উদাস। মিস্ত্রির মেয়ে কি আর এত সোন্দর হবে !

ভুলিয়ে-ভালিয়ে একদিন পাশের গাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাকে নিয়ে গেছে বংশী। খবর দিয়েছে, মেয়েকে কোনও এক অছিলায় নিয়ে এসে দেখাতে।

পাঁচু কোটাল মেয়েকে নিয়ে এসেছে সেখানে, কিন্তু তার আগেই কি করে যেন টের পেয়েছে উদাস, রেগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে সেখান থেকে।

তার দিন কয়েক পরেই লক্ষ্মীমণিকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছে। বাপকে বলেছে, বউ বউ করে খেপে গিয়েছিলে, এই লাও বউ।

তখনও ড্রাইভার হওয়ার নেশা লেগে আছে উদাসের চোখে। ড্রাইভার হবে, লাইসেন্স পাবে, তারপর বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি মোটর-বাস চালিয়ে যাবে ভোঁ ভোঁ করে, আর বনপলাশির বাবুরা, ওই হাজরা বাড়ির লোক সরানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, উদাসের খোশামোদ করবে তার পাশে একটু বসবার জায়গা পাওয়ার জন্যে।

লোকে বলবে, হ্যাঁ, কোটালদের একটা ছেলে মানুষ হয়েছে বটে।

মান-ইজ্জত আছে, রোজগার আছে ড্রাইভারির। তার কাছে কিনা বারো বছরের নোলক-পরা একটা খুকিকে বিয়ে করবে উদাস !

কিন্তু লক্ষ্মীমণিকে ঘরে আনার পরই স্বপ্ন ভেঙে গেছে তার। প্রথম দিনেই নাক বেঁকিয়েছে সে, মাগো, কাদা আর কাদা, এ-ঘরে মানুষ থাকে !

কখনও বলেছে, কাটোয়ায় চলো, ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব।

চটাতে সাহস পায়নি উদাস। বলেছে, দুটো দিন সবুর কর বউ, লাইসেনটা পেলেই চলে যাব।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠেছে লক্ষ্মীমণি। ধীরে ধীরে তার খিটখিটে স্বভাবটা অসহ্য ঠেকেছে উদাসের। বলেছে, তোর জন্যে তিনবেলা চায়ের জোগান দিতে নারব আমি। আজ হেন চাই, কাল তেন চাই...

চড়া গলায় লক্ষ্মীমণিও জবাব দিয়েছে, মটরমিস্ত্রির মেয়ে বটি গো আমি, মুনিশ-বাগালের মেয়ে নই।

দিনরাত ছেলে আর ছেলের বউয়ের ঝগড়া শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বংশী। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। কোনও-কোনও দিন বা নিজে গিয়ে হাতাহাতি থামিয়েছে দু'জনের।

ক্রমে ক্রমে তাই লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে দূরে সরে গেল উদাস। সকাল হলেই কিছু মুখে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর সন্ধের একটু আগে ফিরে আসে। বারো মাইল পথ, ঘামে ভিজে সারা শরীর জবজবে হয়ে যায়। খিদেয় পেট জ্বলে। তবু যেন অনেক শান্তিতে থাকতে পায় উদাস।

লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে দূরে থাকলেই যেন শান্তি। আর যখন যাত্রার মরশুম পড়ে তখন আরও খুশি হয় ও। দু'প্রহর রাত অবধি মজুমদারদের বাংলাবাড়িতে রিহার্সাল দিয়ে এসে নিজেই হাঁড়ি থেকে ভাত নিয়ে খেতে বসে। লক্ষ্মীমণিকে ঘুম থেকে তোলে না।

এমনি ভাবেই কাটছিল দিনগুলো। এমন সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

পাশের গাঁ থেকে পাঁচু কোটাল উঠে এসে ঘর বাঁধল এ গাঁয়ে। বললে, ভাগের জমি সব কেড়ে নিয়েছে বাবুরা, তাই এলাম এখানে, চাটুজ্যেদের জমি চষব ভাগে। পুকুরের পাড়ও দিয়েছেন ওনারা ঘর তোলার নেগে।

তারপর আবার একদিন এল সে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

উদাস তখন তার সাইকেলের চাকাগুলো মাজছিল ছাই দিয়ে। ছেঁড়া কানি দিয়ে যত্ন করে বাইকটা পরিষ্কার ঝকঝকে করে তুলছিল।

চোখ তুলে তাকাল সে মেয়েটার দিকে। তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। যৌবনে পরিপূর্ণ একটা সুপুষ্ট শরীর। এমন রূপ কোটালদের ঘরে ?

মেয়েটাও চোখ তুলে তাকিয়ে উদাসের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই লজ্জায় মাথা হেঁট করলে।

আর বংশী সেই মুহূর্তে বলে উঠল, আয় মা পদ্ম, আয়। ঘরের বউ করে আনব তোকে ভেবেছিলাম মা, তা আমার ডাইভার ছেলে কোত্থেকে যে একটা ডাইনিকে নিয়ে এল...

কথা শুনে স্তম্ভিত বিস্ময়ে উদাস যেন নিজের মনেই অস্ফুটে বলে উঠল, পদ্ম ! এই সেই পদ্ম বটে !

সমস্ত মুখ তার মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বারো

সেই পদ্মই নেই, যাত্রার আসর ঘেঁসে বসবে না সে, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকবে না উদাসের চূড়ার দিকে, রং-ঝলমল জোড়া-বুক-ছতরির দিকে, বেশকারীর নিপুণ তুলিতে আঁকা তার টানা টানা চোখের দিকে। আর তার অভিনয় দেখে বিভোর হয়ে থাকবে না পদ্মর শান্ত কোমল চোখজোড়া। মুগ্ধ গলায় গালে হাত দিয়ে হেসে হেসে বলবে না, তোমার কণ্ঠের কথাগুলোন চিনির মত নাগে গো বোনাই।

লক্ষ্মীমণির সঙ্গে গ্রাম্য আত্মীয়তার সূত্র ধরে বোনাই বলে ডাকত পদ্ম। বলত, তোমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করেচে সবাই, তুমি লট বটো গো বোনাই, পেকিতো লট।

উদাস হেসে বলেছে, আমার নেগে দুঃখু নয় পদ্ম, বলো হরিশ্চন্দের নেগে দুঃখ। কেমন সে মানুষটি ছিল, ভাবো তুমি।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পার্ট খুব ভাল করত উদাস, সবাই প্রশংসা করত। মজুমদারদের গিন্নি-মা একবার পাঁচ-সেরি একখানা বগি থালা পুরস্কার দিয়েছিল উদাসকে। পদ্মও প্রশংসা করত। তবু ও-সব পুরাণ-কথায় মন উঠত না উদাসের।

বলত, বেজেনবাবুর পালা আনাও গো দামুদাদা। অপেরা পার্টি এয়েছিল গতবারে কাটোয়ায়, পর পর চারদিন চারখানা পালা হল...

কখনও বা বলত, এবার থেয়টার করলে হয় না দামুদাদা ?

সেই উদাসের কিন্তু কোনও উৎসাহই নেই যেন এবার। বাপের কাছে খবর শুনে, এল বটে দামু পালের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু মনের আগ্রহ তার মরে গেছে। কার জন্যে সে রং মাখবে মুখে, অভিনয় করবে!

তবু দামুদাদার সঙ্গে দেখা না করে পারল না। সাইকেলটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেই খিড়কির ডোবায় হাত-পা ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল।

একবার মনে হল লক্ষ্মীমণিকে শুধোয় খাবার কিছু আছে কিনা। পরক্ষণেই ভাবলে, দামুদাদার বাড়ি থাকতে আবার খাবার ভাবনা।

পালেদের বাড়িতে পৌঁছে দেখলে ইতিমধ্যে আসর জমজমাট। একটা কম্বল বিছিয়ে বসেছে সবাই। দামুদাদার কোলে ফিরু আর সামনে কানা-উঁচু থালায় একরাশ মুড়ি আর ফুলুরি নিয়ে ঘিরে বসেছে গ্রামের ছেলে-বুড়ো অনেকেই।

উদাসকে দেখতে পেয়েই খুশি হয়ে উঠল দামু পাল। ডাকলে, আয় উদাস, আয়।

দাওয়ার এক প্রান্তে গিয়ে বসল উদাস। তারপর ফিরুকে ডাকলে। ফিরু বাপের কোল ছেড়ে নড়বড়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে উদাসের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর রেণু এক সময় এসে বললে, দাদা বাড়ি না এলে আর খোঁজখবর নিতে নাই, না উদাস ?

উদাস হাসল। —সময় পাই না গো দিদি, সারা দিনমান তো কাজের চাকায় ঘুরি।

গোপেন মোড়ল রসিকতা করে বললে, তা বটে, ও কি চাষাভুশো মানুষ এখন, মটোর ড্রাইভার!

বিনয়ে লজ্জায় মুখ নিচু করল উদাস। বললে, এখনও হইনি গো খুড়ো, লাইসেন পাই আগে।

গোপেন হেসে বললে, হ্যাঁ, লাইসেন্স পেলে বুঝবি কত ধানে কত চাল হয়। জমিজমার মূল্য তো বুঝলি না, দেখবি পরে।

উদাসের ইচ্ছা হল বলে, গোপেন তার ছেলেকে তা হলে শহরে রেখে কলেজে পড়াচ্ছে

কেন। জমিজমা তো তার অনেক, উদাসের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

তবু কিছু বললে না উদাস, শুধু হাসল। এতদিন পরে দামুদাদার সঙ্গে দেখা, দু'একটা সুখদুঃখের কথা হবে, যাত্রার পালা ঠিক হবে, এখন আর ও-সব কথা গায়ে মেখে কাজ নেই।

ফিরুকে আদর করতে করতে উদাস লক্ষ করলে ঘোমটা টেনে রাঙা বৌঠান ওদিকের ঘরের কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখে।

উদাস উঠে গিয়ে চৌকাঠের বাইরে থেকেই মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে। —পেন্নাম গো বৌঠান। বলে ফিরুকে আদর করে কোলে নিয়ে বললে, বেটা তোমার খুব বুদ্ধিবান হবে গো। কতদিন আসিনি, তবু ঠিক চিনতে পেরেছে আমায়।

দু'একটা সাধারণ কথাবার্তার পর আবার ফিরে এসে বসল উদাস।

আর রেণু বললে, বোসো উদাস, চলে যেও না যেন।

খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে তখন। কাটোয়া থেকে শুধু দু'খানা হোটেলের রুটি খেয়ে বেরিয়েছিল, তারপর এই বারো মাইল পথ আসতে আসতে কখন তা হজম হয়ে গেছে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ গিয়ে পড়ছিল কানা-উঁচু বড় থালাটার ওপর। একরাশ তেল-মাখা মুড়িতে ফুলুরি আর লাল লঙ্কা ছড়ানো, থালাটা থেকে সবাই মুঠো মুঠো মুড়ি তুলে মুখে পুরছে।

উদাস দেখলে, রেণু ইশারায় বাগাল ছেলেটাকে ডাকলে। আর সে মরাইতলা থেকে কাঁসার থালাটা এনে দাঁড়াল, রেণু মুড়ি ঢেলে দিলে তাতে, লঙ্কা আর ফুলুরি, আর একটু গুড়।

তারপর বললে উদাসকে দিয়ে আসতে।

বাগালটা উদাসের সামনে মুড়ির থালাটা রেখে যেতেই কিন্তু সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল ও।

রেণু বলে উঠল, কি হল উদাস ?

উদাস হাসল। —খিদে নাই গো দিদি।

এর আগেও উদাস এ-বাড়িতে বহুবার খেয়ে গেছে, এই থালাতেই ; কোনও দিন আপত্তিকর মনে হয়নি। কিন্তু আজ পার্থক্যটা যেন বড় বেশি চোখে পড়ল। অন্য কেউই কিছু বুঝতে পারল না। ভাবলে, সত্যিই হয়তো খিদে নেই তার।

উদাস নিজেই খানিকটা পার্থক্য বজায় রেখে চলে। ঘরের লোকের মত ভাবভালবাসা সবার সঙ্গে, তবু কম্বল ছেড়ে বসেছে সে, সম্মান করে কথা বলেছে। আর তারই জন্যে কিনা বাগালের থালা। অথচ কাটোয়ার হোটেলে সবাই সমান। ড্রাইভার না হলে, শহরে না গেলে বুঝি মানুষের মর্যাদা মিলবে না।

গোপেন মোড়ল অতশত মনের খবর রাখবে কেন। তাই ঠাট্টা করতে ছাড়লে না। বললে, ও এখন শহুরে ভদ্দরলোক হয়েছে দামু, মুড়ি খায় কখনো !

কথাটা শুনে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল উদাস। বললে, পেটের খাওয়াটাই সব নয় গো।

গোপেন আবার ঠাট্টা করলে, তাই তো বলছি, ড্রাইভারদের কীর্তিকাহিনী আমরা আর কি জানি বল ? কত রকম সব খিদে ওদের !

উদাস রেগে গেল।

বললে, আপনাদের ভদ্দরলোকদের কথাও আর বলবেন না গো। যা কীত্তি দেখে এলাম এবার !

—কি, কি ? কি দেখে এলি ? কোনও রসালো কাহিনী শোনবার জন্য সবাই যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

উদাস কথাটা চাপা দিয়ে বললে, সে কিছু না, ওই গিরিজাখুড়োর মেয়েদের কথা...

কথাটা বলে যেন উপস্থিত সব ক'টা লোকের বিরুদ্ধে একটা প্রতিশোধ নিতে চাইলে ও।

তেরো

গিরিজাপ্রসাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। তার একটা প্রধান কারণ হয়তো এই যে, সাজপোশাক কথাবার্তা এবং চালচলনে ওদের সঙ্গে গ্রামের লোক যে শুধু খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি তাই নয়, বিমলা-কমলারাও যেন মিশে যেতে চেষ্টা করেনি। একদিকে গ্রামের লোকের কিছুটা ঈর্ষা, আরেক দিকে তাদের প্রতি অসীম তাচ্ছিল্য—আর সেই অস্পষ্ট অস্ফুট বিরোধটাই চাপা গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছিল।

অবশ্য তার জন্যে মাথাব্যথা ছিল না বিমলার। মোহনপুরের বউয়ের সেদিনের কটূক্তি কানে এসেছিল নিভাননীর, শুনে মনে মনে গজরেছিলেন। তবু সাবধানও করতে চেয়েছিলেন মেয়েদের।—তোরা হই হই করে বেড়িয়ে বেড়াস, ওই বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিস...

বিমলা হেসে ফেলেছে সে-কথা শুনে।—তুমিও কাকিমার মত হয়ে গেলে মা!

নিভাননী তারপর আর আপত্তি তোলেননি। সত্যিই তো, বন্ধুবান্ধব নেই, মেলামেশার লোক নেই, এই আধো-অন্ধকার ঘরে সারাক্ষণ কাটাবে কি করে ওরা। নিভাননী নিজেই তো অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এক এক সময়। আর অমরেশও যেন এই গ্রাম্য আবহাওয়া থেকে, এই কর্মহীন নিস্তব্ধতা থেকে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। পুজোর পরই অবশ্য কলেজ খুলবে ওর, সেই দিন ক'টির অপেক্ষায় আছে ও।

কিন্তু বিমলা-কমলা? গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে, টিয়ার সঙ্গে, কোনও মিল নেই যেন। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন একটা চাপা কৌতুকে তাদের সঙ্গ ভাল লেগেছিল। এখন অট্টামার কথাগুলোও যেন একঘেয়ে লাগে। আর এই বনপলাশির জীবন যেন একটা দম বন্ধ হয়ে যাওয়া নিস্পন্দ ঘড়ি। থেমে আছে, থেমেই থাকবে। এখানে জন্ম ছাড়া আনন্দ নেই, মৃত্যু ছাড়া শোক নেই, বিবাহ একমাত্র স্বপ্ন। বিমলাও বুঝি এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

মাঝে মাঝে গিরিজাপ্রসাদ স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মেয়েদের শহরের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াবেন কিনা, কিংবা বড় ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তারই সমাধান খুঁজে বেড়ান।

বিমলা আর কমলা ততক্ষণে বই-খাতা গুটিয়ে উঠে পড়ে। অমরেশকে বলে, চল্ দাদা, আজ সেই আখের খেতটায় যাব।

নতুন-গোড়ের ঝুরি নামা বটগাছটার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা আল ধরে এগিয়ে চলে ওরা তিন ভাইবোন। নতুন-গোড়ের ঘাটে বাসন ধুতে ধুতে গ্রামের বউ-ঝিরা দু'একজন হয়তো দু'একটা কথা বলে, বেশির ভাগই তাদের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, তারপর নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসে, টিপ্পনী কাটে।

আল ধরে ধরে মাঠে মাঠে অনেকেই তারা যাতায়াত করে বটে, কিন্তু এমন নির্লজ্জ ভাবে হাসাহাসি চিৎকার করতে করতে নয়। তারা ঘোমটা টেনে পতপত করে শাড়ির শব্দ করে দ্রুত পায়ে যাওয়া-আসা করে, থমকে থামে, পথের মাঝখানে অন্য বাড়ির

বউ-ঝি দেখলে চাপা গলায় দুটো কথা বলেই ঘরে ফেরে। বারো বছরের মেয়েটাও এমন ভাবে বেড়িয়ে বেড়ানোর কথা ভাবতে পারে না।

সেইজন্যেই বুঝি বিমলার মনে তাদের সম্পর্কে এমন একটা তাচ্ছিল্য। তাচ্ছিল্যটা হাবে-ভাবে প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সেটা সব সময়েই চাপা থাকে।

আগের দিন দূর থেকে আখের খেতটা দেখে এসেছে, যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুপুরের চড়চড়ে রোদে যেতে পারেনি। আজ তিনজনে হাসাহাসি গল্পে মেতে সেদিকেই এগিয়ে গেল।

কখনও দৌড়ে, কখনও লাফ দিয়ে কাটা-আলের জলো খাল ডিঙিয়ে আখের খেতে নেমে পড়ল। আখের খেত থেকে গোটা কয়েক আখ ভেঙে নিয়ে আবার আলপথ ধরল।

আর কিছুটা গেলেই জেলাবোর্ডের বড় রাস্তা। ধুলো উড়িয়ে বিকেলের বাস আসছে, অনেক দূর থেকে—বিমলা দেখতে পেল।

বললে, চল্ দাদা, আজ রাস্তা অবধি যাই।

অমরেশও ফুর্তিতে নেচে উঠল।—যাবি ?

তিনজনেই দাঁতে চেপে আখের ছিলে ছাড়াতে ছাড়াতে এগিয়ে চলল বড় রাস্তাটার দিকে। আশপাশের মাঠে যারা নিড়েন দিচ্ছিল তারা মুখ ফিরিয়ে একবার দেখেই আবার কাজ করতে শুরু করলে। ভাবলে, বাস ধরতে যাচ্ছে হয়তো। তা না হলে এত বড় মেয়ে কি আর মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

কাশঝোপ পার হয়েই একটা বড় খাল, সামান্য জল আর কাদা থাকে এ-সময়টায়। বর্ষাকালে কাঁদরের জল বের করে দেওয়া হয় এখান দিয়ে।

ঝিরঝির হাওয়ায় কাশফুলের ঢেউ দুলছে, কাঁপছে। থমকে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে খালটা পার হল। ছোট একটা সাঁওতাল পল্লী একটা ডোবাকে ঘিরে। কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, মুরগি চরছে। আর সেই বাজে পোড়া অশথ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে কালো রুক্ষ চেহারা নিয়ে।

গাছটা পার হয়েই বাসের রাস্তা। দু'পাশে খোয়া জমা হয়ে আছে থাকে থাকে।

হঠাৎ নীল রঙের সুন্দর একটা পাখি উড়ে গেল ডোবার জলে ছোঁ মেরে।

কমলা জিগ্যেস করলে, ওটা কি পাখি রে দিদি ?

—কি জানি।

—মাছরাঙা না কি বলে, তাই বোধ হয়। অমরেশ বললে।

বিমলা হাসলে, দূর। মাছরাঙা নয়।

নানা রঙের পাখি, মাঠে নানা রঙের ফুল—সরষে, কলাই কি আলু—যা দেখে তাই পরস্পর পরস্পরকে জিগ্যেস করে। কেউ বলতে পারে না। কেউই নিঃসন্দেহ নয়।

মাঠের মুনিশদের কখনও কখনও জিগ্যেস করেছে। তারপর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে। ওমা, এই নাকি সরষে ফুল ! একটার পর একটা বিস্ময়। এত বিস্ময়ও গ্রামের জীবনে লুকিয়েছিল !

একটা সাঁওতালদের ছেলে ঘাটে নামছিল পায়ের কাদা ধুতে, তাকে ডাকতে যাচ্ছিল বিমলা। হঠাৎ হর্নের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল।

দুরন্ত স্পিডে ধুলো উড়িয়ে একখানা জিপ আসছে। আখ চিবোতে চিবোতে সেদিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে রইল বিমলা।

ওদের পার হয়ে সামান্য ক'গজ এগিয়ে গিয়েছিল জিপটা, তারপর থেমে পড়ল।

প্রভাকর ডাকল ওদের।

আর চিনতে পেরে ওরা তিনজনেই ছুটে গেল।

বিমলার দিকে তখনও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে প্রভাকর। গাছ-কোমর করে পরা রঙিন শাড়িতে বিমলার যৌবন যেন অজ্ঞাত এক রোমাঞ্চের সন্ধান দিয়েছে। প্রভাকরের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ করে তুলল বিমলাকে। পরক্ষণেই হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, কি মশাই, খুব ইস্কুল বানিয়ে দিয়ে গেলেন তো!

প্রভাকরও হাসল।—সে ইস্কুলে তুমিও পড়বে নাকি?

বিমলা হেসে উঠল।—তবেই হয়েছে। আপনাদের ইস্কুল হবে, আমি পড়ব সে ইস্কুলে, ততদিনে...

কমলা বাধা দিল।—দিদি না পড়ে, আমি তো পড়ব!

জিপে বসে বসেই কথা বলছিল প্রভাকর, পিছন থেকে পর পর কয়েকটা মালবোঝাই ট্রাক আসছে দেখে জিপটাকে একেবারে রাস্তার পাশ ঘেঁসে বুনোকুলের ঝোপের ধারে এনে থামালে।

অমরেশ জিগ্যেস করলে, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

—বলগাঁ স্টেশনে। হাসল প্রভাকর, বিমলার দিকে ফিরে বললে, যাবে? খুব বড় হাট বসে আজ।

—সত্যি? যেন কত অবিশ্বাস্য একটা কথা বলেছে প্রভাকর, এমন ভাবে প্রশ্ন করলে কমলা।

আর বিমলা হেসে বললে, ছাই, গেঁয়ো হাট তো আপনাদের, মুলো আর বেগুন পাওয়া যাবে শুধু। খিলখিল করে হেসে উঠল বিমলা।

—আমাদের হাট? হাসল প্রভাকর। আসলে বিমলারাই যে এ অঞ্চলের লোক, প্রভাকরই ভিনদেশীয়, তা মনে ছিল না বিমলার।

প্রভাকর বললে, চলো তা হলে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি বাড়িতে। অবিনাশবাবুর সঙ্গেও দেখা করে আসতাম।

অমরেশ বিমলার দিকে তাকাল।—চল্ না, স্টেশনের দিকে যাই।

বিমলার মুখ দেখে বোঝা গেল ওরও তাই ইচ্ছে। তবু কোথায় যেন একটু সঙ্কোচ ঠেকছে। ও প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কতক্ষণ লাগবে ফিরতে?

—কতক্ষণ আর, আধ ঘণ্টাও না।

বিমলা হেসে বললে, তবে তাই চলুন। হাটটাই দেখে আসি। বলে গাছ-কোমর করে পরা শাড়ির আঁচলটা কোমর থেকে খুলে ভাল করে পরে নিল।

অমরেশ আর কমলা পিছনের আসনে বসতে যাচ্ছিল, প্রভাকর হেসে কমলাকে বললে, তুমি আমার পাশে বসো।

কমলার বয়স কম, তাই লজ্জা আর অস্বস্তিও তার বেশি। কমলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, না বাবা, আমি পিছনে বসব। আর বিমলা কমলার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে কিংবা প্রভাকরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পিছনের দিক থেকে লাফিয়ে উঠে বসল ভিতরে।

জিপ ছুটল পাকা রাস্তা ধরে। মুহূর্তের মধ্যে মনটা খুশি হয়ে উঠল বিমলার। নিঃসঙ্গ নিস্পন্দ গ্রাম-জীবনের মধ্যে এসে নিজেকে এতদিন মনে হয়েছে যেন কারাগারের বন্দী। ক্ষণিকের জন্যে হলেও, এ যেন মুক্তির আনন্দে ছুটে চলা। হাওয়ায় চুল উড়ছে, শাড়ির প্রান্ত উড়ছে, চোখেমুখে ঠাণ্ডা বাতাসের দাপট।

তারপর সেই ছোট লাইনের ছোট্ট রেল স্টেশন, বিকেলের ভাঙা হাটে সাঁওতাল

মেয়েপুরুষের ভিড়। চুড়ি, মোটা সুতোর খাটো শাড়ি, মাটির পুতুল আর শাকসবজি। ভিড় ফিকে হয়ে গেছে তখন।

ওদের একটা টিনের চালা দেওয়া চায়ের দোকানে বসিয়ে রেখে নিজের কাজ সারতে গেল প্রভাকর। ইতিমধ্যে হুইসল দিয়ে ট্রেনটা এসে থামল। যাত্রী উঠল, নামল। আবার চলে গেল ট্রেনটা।

চা খেয়ে মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। উঠে এসে হাটটা ঘুরে ঘুরে দেখল বিমলা। সাঁওতাল মেয়েপুরুষগুলোকে। তারা বিস্ফারিত চোখে দেখল ওদের, আর দূর দূর গ্রামের লোক ওদের সাজপোশাক দেখে কানাকানি করে হাসল।

অস্বস্তিতে হাট থেকে বেরিয়ে এসে জিপের ওপর উঠে বসে রইল ওরা।

তারপর এক সময় প্রভাকর ফিরেও এল। জিপ ছুটল আবার বনপলাশির দিকে। কিন্তু জিপটা বাজে পোড়া গাছটার কাছে পৌঁছে বনপলাশির দিকে বাঁক নিতেই হইহই করে উঠল বিমলা।

বললে, এখানেই নামিয়ে দিন।

প্রভাকর পৌঁছে দিতে চাইল, কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়েছে বিমলা।

বললে, এটুকু হেঁটে হেঁটে চলে যাব আমরা।

—কেন? প্রভাকর বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলে।

বিমলা হেসে উঠে বললে, আমার খুশি। আপনি যান তো মশাই; কাজে ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ালে রিপোর্ট করে দেব।

বিমলার কথায় অমরেশ আর কমলাও হেসে উঠল। আর প্রভাকর হাত তুলে বিদায় জানিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে মাঠের আল ধরে হেঁটে আসতে আসতে বিমলা হঠাৎ বললে, এই দাদা, হাট দেখতে গিয়েছিলাম, মাকে বলিস না যেন!

বিমলার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল ছোট বোন কমলা।

অমরেশ শুধু বললে, এত ভয় যদি তো না গেলেই পারতিস!

ভয়? নিজের মনেই হাসল বিমলা। আর এপাশ-ওপাশ চোরা চোখে তাকিয়ে দেখতেই চোখোচোখি হয়ে গেল উদাসের সঙ্গে। অনেকটা দূরে, ওদিকের কাঁচা রাস্তার মোড়ে সাইকেলে ঠেস দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উদাস। বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছে বিমলাদের দিকে।

চৌদ্দ

তাঁর সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হয়, কে কি টিপ্পনী কাটে, কিছুই কানে পৌঁছয় না গিরিজাপ্রসাদের। তবু একটা ব্যাপার তিনি স্পষ্ট লক্ষ করেন। গ্রামের লোকরা প্রথম প্রথম তাঁকে যতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখত, যতখানি সম্মান করে কথা বলত, ইদানীং আর তেমনটি করে না। কখনও কখনও অবশ্য ভাবেন, এ তাঁর মনের ভুল। আবার এক-এক সময় ব্যবহারের পার্থক্যটা চোখে পড়ে যায়।

কথায় কথায় আগে অনেকেই আসত যুক্তি-পরামর্শ নিতে। সরকারি আপিস থেকে সারের দাম মেটাবার নোটিশ এলে, কিংবা নতুন আইনের নির্দেশ অনুযায়ী জমিজমার রিটার্ন দিতে হলে একবার গিরিজাপ্রসাদের উপদেশ নিয়ে যেত অনেকেই।

অবশ্য এখনও আসে কেউ কেউ, তবে দু-পাঁচ মিনিটের জন্যে, সে শুধু মুখটা দেখিয়ে

যাওয়া। আর তেমনভাবে দু'দণ্ড বসে গল্পও করতে চায় না, পরামর্শও চায় না।

তবু বাংলাবাড়ির উঁচু দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসেন গিরিজাপ্রসাদ প্রতি সন্ধ্যায়, হ্যাজাক বাতিটা এক সময় সামনে রেখে দিয়ে যায় টিয়া, আর বিমলা নয়তো কমলা চা করে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়ে যায়। গিরীনের সঙ্গে একদিন খরচপত্তর নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর থেকে চায়ের পাটটা পৃথক করে নিয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। চা-চিনির খরচ নিজেই জোগান, চা তৈরির ভারও নিয়েছেন নিভাননী। কিন্তু তার পর থেকেই বাংলাবাড়ির লোকদের জন্যে ঢালাও চায়ের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে।

তবুও গোপেন মোড়ল কি বংশী এলে কোনও-কোনওদিন চা দিতে বলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর চায়ের লোভেই হয়তো গোপেনও একবার করে আসে।

কিন্তু অন্য লোভও বোধহয় ছিল গোপেনের। সুযোগ বুঝে কথাটা একদিন পেড়েই ফেললে ও।

বংশী বলছিল, বাড়ি-ঘরগুলো এবার সারাও গিরিদাদা ? লোকে বলবে কি, এত বড় মানুষটা, তার কি না ঘর-দুয়োরের এই অবস্থা ? পিলপিল করে ডোঁরা বেরুচ্ছে গত্ত থেকে...

বলে মাটির দেয়ালের একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখালে বংশী। সত্যিই সেখান থেকে সারি সারি কালো কালো মাথাভারী ডেঁয়ো পিঁপড়ে বের হচ্ছে।

বংশী বলল, কত কাল যে মাটি পড়েনি দেয়ালে-মেঝেতে, চাল ছাওয়াওনি !

গিরিজাপ্রসাদ ঈষৎ রুষ্ট গলায় বললেন, সে-কথা বললেই তো রাগ হবে ভাইয়ের আমার !

বংশী হেসে বললে, তা তুমিই এবার ব্যবস্থা করো ক্যানে। কপাট, কাঠের কড়ি বরগা যা দরকার, উদাসকে বলে আনিয়ে দেব, ওর চেনা দোকান আছে...

—কাঠের যা দাম আজকাল। আগুন একেবারে। সুযোগ পেয়েই গোপেন বললে।

বংশী হেসে বললে, সে তোমার লোহা, কাঠ, সিমেন্ট সবই তাই। ধানের দর বেড়ে কোনও লাভ হল না গো, চাষীর ঘরে যে আতান্তর, সেই আতান্তরই রয়ে গেল।

গোপেন বললে, তা ঠিক, এখন টাকা শুধু ব্যবসায় ; পেতাম কিছু টাকা, কাঠের গোলা খুলে দিতাম তোমার বলগাঁয়।

গোপেনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বুঝলেন না গিরিজাপ্রসাদ, তাই চুপ করে রইলেন। হয়তো বা তখনও তাঁর মনের মধ্যে বংশীর কথাটাই ঘুরছে। স্বপ্ন দেখছেন দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরখানার পাশের জমিটুকুতে আরও দু'খানা ঘর তোলার। বড় ছেলে যদি ছুটি নিয়ে দু-পাঁচ দিনের জন্যেও আসে, বউমাকে, ছেলেমেয়েকে নিয়েই যদি আসে, তো শুতে দেবার ঘর নেই একখানা। তাছাড়া নিজেরাই বা ওই প'ড়ো ঘরখানায় মাথা গুঁজে থাকবেন কেন ? তাই দু'খানা ঘর তোলার ইচ্ছে গিরিজাপ্রসাদেরও। কিন্তু সামান্য যা টাকা আছে, তা ভেঙে চালাবেন কি করে ? সারা জীবন বাকি রয়েছে এখনও, কতদিন বাঁচবেন কে জানে। তাছাড়া অমরেশের পড়াশোনার খরচ, মেয়ে দুটির বিয়ে—স্ত্রীর জন্যেও তো কিছু ব্যবস্থা রেখে যেতে হবে !

কয়েকদিন থেকেই ইচ্ছে হচ্ছে গিরীনকে কথাটা বলার। জমির আয় থেকেই তো করা উচিত এ-সব।

এমনি সব সাত-পাঁচ কথা ভাবছিলেন, বংশী এক সময় বললে, যাই, আবার যাত্রার পালা ঠিক হবে আজ।

বলে বংশী চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপেন বললে, তোমাকে অনেক দিন থেকে বলব বলব ভাবছি একটা কথা।

—কি বলো তো ? উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

গোপেন চাপা গলায় বললে, হাজার তিন-চার টাকা ফেলো তো একটা ভাল ব্যবস্থা হয়। বলগাঁয় একটা কাঠের গোলা করি, রাঁচির দিক থেকে শালবল্লি কিনে আনব সস্তায়, ডবল দামে বিক্রি হবে এখানে। তাছাড়া ছুতোর মিস্ত্রি দিয়ে কড়ি, বরগা, দরজা, জানলা বানিয়ে বিক্রি করলে...

গিরিজাপ্রসাদ আর একটু হলেই বলে বসতেন, টাকা কোথায় আমার। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। এই ক' মাসেই বুঝে ফেলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, টাকা নেই তাঁর এ-কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে গাঁয়ের লোক যেটুকু বা সম্মান দেখায়, সেটুকুও উবে যাবে রাতারাতি।

তাই কথাটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, ব্যবসা কি আমাদের পোসায় গোপেন ! না, ও ব্যবসা-ট্যাবসা আমি করব না, তা হলে অনেক আগেই করতাম।

গোপেন মনে মনে চটে গেল। বহুদিন থেকে কাঠের ব্যবসা করার নেশাটা চেপে বসে আছে তার মনে। গিরিজাপ্রসাদ চাকরি করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছেন, সুতরাং সামান্য দু-চার হাজার টাকা ফেলে নিশ্চয় ব্যবসা করতে রাজি হবেন, এমনি একটা ধারণা ছিল গোপেনের।

মনে মনে চটে উঠল গোপেন মোড়ল। তারপর বললে, ব্যবসা আবার পোসাবে না ! গিরীন যে গিরীন, ভেতরের খবর জানো কিছু !

—না। কিসের খবর ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

গোপেন ধীরে ধীরে চাপা গলায় বললে, ভেতরে ভেতরে বেনামিতে একটা হাস্কিং মেশিনের লাইসেন্স জোগাড় করেছে, মেশিন বসাচ্ছে নিগনে।

গিরিজাপ্রসাদ শুনলেন কথাটা। কোন সাড়া দিলেন না। স্তম্ভিত বিস্ময়ে আহত অভিমানে চুপ করে রইলেন। কিন্তু কথাটা কিছুতেই যেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। সত্যি ? সত্যিই হয়তো গোপনে গোপনে নিজের নামে একটা হাস্কিং মেশিন চালাবে গিরীন, হয়তো দু'দিন পরে একটা ধানকলের মালিক হবে। আর গিরিজাপ্রসাদ ?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে নিভাননীকে খবরটা দিলেন।

নিভাননী শুনলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, দাসীর কথা বাসি না হলে তো কেউ দাম দেয় না। তখন পইপই করে বলেছি, জমিজমার একটা ব্যবস্থা করো। তা তো করলে না। ধানকলই হোক, চালকলই হোক, জমির ধান-বেচা টাকাতেই তো হচ্ছে !

গিরিজাপ্রসাদ কোনও উত্তর দিলেন না।

খবরটা গোপেনের কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নেবার ইচ্ছে ছিল গিরিজাপ্রসাদের। ভাবলেন, পরের দিন সে এলেই জেনে নেবেন।

কিন্তু পরের দিন আর এল না গোপেন। তার পরের দিনও না।

শুধু গোপেন নয়, একে একে সকলেই সরে এল গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে। লাইব্রেরির নামে কিছু বই কিনে দেওয়ার জন্যে দিনের পর দিন আব্দার ধরেছে পঞ্চে চাটুজ্যে, তারপর বিরক্ত হয়ে আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে এসে জুটেছে মজুমদারদের বৈঠকখানায়, যাত্রার রিহার্সালে। হংস চাটুজ্যেও যাতায়াত বন্ধ করেছে। বলেছে, টাকায় যখ দেবে গিরিজাকাকা ম'লে, তবু দুশোটা টাকা দিলে না বাবু কালীতলার উঠোনটুকু সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাতে।

একজন একজন করে সবাই সরে গেছে। তবু আশা ছিল বংশী আসবে মতই সেদিনও হ্যাজাক জ্বেলে বাংলাবাড়ির দাওয়ায় বসে অপেক্ষা গিরিজাপ্রসাদ।

রাত ঘন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হ্যাজাকের আলোয় একা-একা বসে অপেক্ষা করছেন তিনি, আর ঠায় তাকিয়ে থেকেছেন সামনের অন্ধকারের দিকে। জোনাকির সারি জ্বলছে নিভছে। অন্ধকারে চাঁদের ক্ষীণ আলোয় মাখামাখি হয়ে খড়ের পালুইটা দাঁড়িয়ে আছে একটা অতিকায় জন্তুর মত। মরাইতলার সাপ কি ইঁদুরের ছোটাছুটির সরসর শব্দ। দূরে কোথাও বাউড়ি পাড়ায় কারা যেন চিৎকার করছে।

কতক্ষণ একা-একা বসে থেকেছেন গিরিজাপ্রসাদ। না, কেউ আসেনি। কেউ না। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়েছে তাঁর। নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে হ্যাজাক বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর এক সময় নেভানো হ্যাজাকটা হাতে নিয়ে ভিতর-বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

নিভাননী প্রশ্ন করেছেন, কি হল, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে আজ ?

গিরিজাপ্রসাদ সে-কথার কোনও উত্তরই দেননি। চোখ ঠেলে জল এসেছে তাঁর। চোখের পাতা দুটো ভিজে ঠেকেছে নিজের কাছেই।

তারপর অকারণেই হঠাৎ অট্টামার কথা মনে পড়ে গেছে। আহা বেচারী, বুড়ো মানুষ, কথা বলবার একটা সঙ্গীও নেই। কি দুঃসহ জীবন। অট্টামার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছে গিরিজাপ্রসাদের।

অট্টামার অসহায় একাকিত্বের মধ্যে যেন নিজেকেই খুঁজতে চেয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ।

একে একে সকলেই কেন যে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, বুঝতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। বংশী তবু সকালে দুপুরে একবার খবরাখবর নিয়ে যায়, কিন্তু সন্ধে হলেই যেন সব নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। বাইরের বৈঠকখানা খাঁ খাঁ করে। হ্যাজাক বাতিটা জ্বালাবার প্রয়োজন হয় না আর। তবে কি সকলেই জেনে গেছে, তাঁর কাছে আশা করবার কিছু নেই ? তিনিও গ্রামেরই আর পাঁচটা লোকের মতই দীনদরিদ্র ?

মাঝে মাঝে গোপেন মোড়লের কথাটা মনে পড়ে। গিরীন একটা হাস্কিং মেশিনের লাইসেন্স পেয়েছে, মেশিন বসাচ্ছে নিগনে। এর পর হয়তো ব্যবসা ফেঁপে উঠবে গিরীনের, দালান-কোঠা তুলবে, টাকা করবে—আর গাঁয়ের লোক হয়তো বলবে, গিরিজা, সারাটা জীবন মাস্টারি করে কাটালে...

শিক্ষাদীক্ষা আর নিজের জীবনের ওপরই অশ্রদ্ধা হচ্ছিল গিরিজাপ্রসাদের। এমন সময় হঠাৎ একদিন হংস চাটুজ্যে এসে হাজির হল।

বললে, একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে কাকা। ইংরেজিতে দু'কলম লিখে দিতে পারে, তুমি ছাড়া তো লোক নেই গো।

শুনে খুশি হয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। প্রশ্ন করেছেন, কিসের দরখাস্ত।

জবাব শুনে কিন্তু খুশি হতে পারেননি। একটা খবরের কাগজের 'কর্মখালি' বিজ্ঞাপন দেখিয়েছে হংস। বলেছে, অবনী জ্যাঠা বলেছেন দরখাস্ত করতে। চাকরিটা যাতে হয় চেষ্টা করবেন।

—অবনী জ্যাঠা ?

—হ্যাঁ, এসেছেন তো। খবর পাননি ?

উত্তরটা বোধহয় কানে যায়নি। কি আশ্চর্য, গ্রামে একটা মানুষ এসেছে এতদিন পরে. অথচ সে-খবরটা তিনি জানেন না! বংশী একদিন বলেছিল বটে, গিরিজাপ্রসাদের মনে

পড়ল। বলেছিল, চাটুজ্যেদের বড় তরফের দালানকোঠা সব সাফসুফ করছে, শুনছি অবনী চাটুজ্যে নাকি এবার পুজোয় বাড়ি আসবে।

গিরিজাপ্রসাদ বলেছিলেন, আসে বুঝি প্রতিবার ?

বংশী হেসেছিল। —না গো না, এদিক পানে মুখ করেন না কস্মিনকালে, কিন্তু এবারে না এসে যে চলছে না।

—চলছে না কেন ?

বংশী হেসেছে। —জমিজমা সব বেনামি করতে হবে না ? পঁচিশ একর তোমার নিজের নামে রেখে বাদবাকি সব এর ওর নামে...বলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছে বংশী। বলেছে, ওনারই বা দোষ কি বলো, সবাই তো তাই করছে।

জমিজমার আইনকানুন, সম্পত্তি রক্ষার প্যাঁচ-পয়জার অত শত বোঝেন না গিরিজাপ্রসাদ। বুঝতে চেষ্টাও করেন না। কিন্তু অবনীমোহন গ্রামে এসেছেন এ খবরটা গিরীন তো তাঁকে দিতে পারত।

ইদানীং গিরিজাপ্রসাদ অবশ্য লক্ষ করেছেন গিরীন তাঁকে এড়িয়ে চলে, নেহাত ডেকে প্রশ্ন না করলে সাড়া দেয় না নিজের থেকে। কেন, তা এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। গোপনে ধানের ব্যবসা শুরু করেছে ও নিগনে, হাস্কিং মেশিনের লাইসেন্স নিয়েছে, তাই বোধহয় এত ভয় তার।

কিন্তু অবনীমোহনের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত ছিল তাঁর। কত দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, দেখলে চিনতে পারবে কিনা তাই সন্দেহ।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন গিরিজাপ্রসাদ। হংসকে বললেন, লিখে রাখব এখন, কাল এসে নিয়ে যেও।

হংস চলে যেতেই ভিতর-বাড়িতে ফিরে এসেছেন গিরিজাপ্রসাদ চটির শব্দ করে, গলা খাঁকারি দিয়ে। মোহনপুরের বউকে জানান দেবার জন্যেই একটু শব্দ করে, গলার আওয়াজ করে ভিতর-বাড়িতে আসেন গিরিজাপ্রসাদ।

মোহনপুরের বউ শব্দ শুনেই ঘোমটা টেনে মুহূর্তের মধ্যে আড়ালে সরে গেছে। আর গিরিজাপ্রসাদ বিমলাকে ডেকেছেন।

ডাক শুনেই চমকে উঠেছে সে। বইয়ের পাতা খুলে রেখে কি ভাবছিল সে সে-ই জানে। হয়তো কোন স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু মনে মনে যতই সেদিনের মধুর দৃশ্যটুকু রোমন্থন করুক, মাঝে মাঝেই ওর ভয় হচ্ছিল, বাবা-মা হয়তো শেষ অবধি সব শুনতে পাবে।

তাই গিরিজাপ্রসাদ হঠাৎ বিমলাকে ডাকতেই সে চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে তাকাল তাঁর মুখের দিকে।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, জামাটা দে তো মা, একবার ঘুরে আসি।

কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হল বিমলা, অকারণ আতঙ্কের জন্যে নিজের মনেই হাসল। তারপর জামাটা এনে দিয়ে বললে, কাপড়টা বদলাও, এই ময়লা কাপড় পরে যাবে নাকি !

তা ঠিক। নিজের কাপড়টার দিকে তাকিয়ে হাসলেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে গিয়ে হাজির হলেন অবনীমোহনের বৈঠকখানায়।

ইটের দোতলা দালানটা দূর থেকে দেখেছেন গিরিজাপ্রসাদ এর আগেও, কিন্তু অবনীমোহন আসার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা যে এত বদলে গেছে ভাবতে পারেননি। সারা বাড়িটা যেন আলোয় ঝলমল করছে। বৈঠকখানায় চৌকির ওপর সাদা ফরাস বিছানো হয়েছে, আর তার ওপর ভিড় করে আছে গ্রামের সকলে। দূর থেকেই তাদেব কথাবার্তা কানে আসছিল, কাছে গিয়ে সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখটা বুলিয়ে

নিলেন। গোপেন, পঞ্চে, নিত্য মল্লিক—সকলেই এসে জুটেছে।

গিরিজাপ্রসাদকে দেখে সরে বসল নিত্য মল্লিক। অর্থাৎ বসতে জায়গা ছেড়ে দিলে। তারপর বললে, অবনী জ্যাঠা এখনো বার হননি ঘর থেকে, কাজকম্ম কিছু করছেন হয়তো।

অবনীমোহনের বৈঠকখানায় এই লোকগুলোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ বোধ করলেন গিরিজাপ্রসাদ। নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন যেন। তবু অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দিয়ে বসে পড়লেন সেখানেই।

কিন্তু অবনীমোহনের দেখা পেলেন না। অনেকক্ষণ বসে থেকেও যখন অবনীমোহন এল না, গিরিজাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, খবর দিয়েছ ?

গোপেন বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, খবর ঠিক পেয়েছেন গো, খবর পেয়েছেন। ব্যস্ত মানুষ, কাজের কি শেষ আছে ! সময় পেলেই আসবেন।

কথাটা যেন একটা চাবুকের মত এসে পড়ল। অসীম ঘৃণায়, অপমানে গোপেনের দিকে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

নিত্য মল্লিক প্রশ্ন করলে, বসবেন না কাকা ?

গিরিজাপ্রসাদ সে-প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন, এসে সোজা বাড়ির পথ ধরলেন।

একটা তীব্র ধিক্কার যেন তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। গ্রামের লোকগুলির বিরুদ্ধে, অবনীমোহনের বিরুদ্ধে। না, নিজের বিরুদ্ধেই একটা আত্মধিক্কার তাঁর বুক ঠেলে উঠতে চাইল।

মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই পুরনো দিনের পৃথিবীটা।

পনেরো

অবনীমোহন নয়, অবু।

'অমৃত'র পাড় দিয়ে আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে অনেকখানি গিয়ে তবে রেল্‌লাইন। ছোট লাইনের ট্রেন, ছোট ইঞ্জিন, ভুসভুস করে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে চলে যায়। মাঠের মাঝ থেকেই দেখতে পায় গিরি। কি চমৎকার যে লাগে, আর কি রহস্যময় ! বাবার কাছে গল্প শুনেছে, গোঁসাইদিদি বলেছে, এর চেয়েও নাকি অনেক বড় বড় রেলগাড়ি আছে, মস্ত বড় বড় ইঞ্জিন। এই ছোট লাইন তার কাছে খেলনার মত। এই ট্রেন নাকি ওদিকে কাটোয়া অবধি গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। অতশত বুঝতে পারে না গিরিজা, বুঝতে চায় না। বই-খাতার বাক্সটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায় ও রেললাইনের ধারে, হাঁপাতে হাঁপাতে কপালের ঘাম মোছে। তারপর লাইনের ধারে ধারে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মন চলে যায় অনেক অনেক দূরে। দেড় হাত তফাতে একজোড়া সরু সরু লাইন, চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। কুয়াশাঢাকা মেঘের দিকে। কোন এক নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

গিরির ইচ্ছে হয় ওই ট্রেনে চড়ে সেই অজানা গন্তব্যের কোথাও চলে যেতে। দেখে আসতে ইচ্ছে হয় কোথায় এর শেষ।

কোনও-কোনও দিন চাটুজ্যেদের অবু আসে, পিছনে পিছনে আশপাশের গাঁ থেকে আরও চার পাঁচটি ছেলে।

লাইনের পাশে পাশে অসংখ্য নুড়ি পাথর জমা হয়ে আছে। দল বেঁধে ওরা সাদা আর গোল গোল নুড়িগুলো বেছে বের করে। কি মসৃণ আর গোল, কোনওটা ডিমের মত। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে টিনের বাক্সে নয়তো জামার পকেটে রাখে গিরিজা, আর ভাবে, রহস্য-ঘেরা চোখ নিয়ে ভাবে, কোত্থেকে আসে এমন সুন্দর সুন্দর পাথর, কি সুন্দর জায়গাটা, না জানি আরও কত বিচিত্র জিনিস আছে সেখানে।

আর তো ক'টা মাস, তারপরই কলকাতায়। নয়তো বহরমপুরের রাজার কলেজে পড়তে যাবে গিরি। কোনওরকমে যদি এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা পাশ করতে পারে। মা বলেছে, কলেজে পড়াবে গিরিকে। গিরি যাবে, অবু যাবে, আরও অনেকেই হয়তো যাবে।

কে জানে হয়তো কারও যাওয়া হবে না শেষ অবধি। জনপুরের কৌঁয়ারদের একটা ছেলে তো পাশ করে আর পড়তে গেল না, নাশগাঁয়ের ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারি নিল। হয়তো গিরিজাও শেষ অবধি...

সেদিন কথা হচ্ছিল মা'র সঙ্গে, গিরিজা শুনতে পায়নি। হঠাৎ এসে পড়ে শুধু শুনেছিল, বাবা বলেছে, আর কলকাতায় পাঠিয়ে কাজ নেই, বরজোকে পাঠিয়ে দেখলে তো ফল, বড় ঠাকুর এখন চুল ছিঁড়ছেন।

আরও দু-একটা কথা কানে গিয়েছিল গিরিজার, আর তাই ভয় হয়েছিল ওর।

পড়াশুনোর কথা উঠলেই লোকে কথায় কথায় ব্রজমোহনের কথা বলত। বলত, লেখাপড়া করে কি শিক্ষা পেয়েছে দেখো, অমন সুন্দরী বউ, তাকে ত্যাগ করে কাকে নিয়ে আছে কে জানে!

ব্রজমোহন নামটা ছিল গ্রামের কলঙ্ক, আর কালীমোহনের সামনে কেউ ভুলেও তাঁর ছোটভাইয়ের নাম উচ্চারণ করত না।

কিন্তু জনপুরের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা খুব প্রশংসা করতেন তার। বলতেন, এই ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে ব্রজমোহন, হীরের টুকরো ছেলে। দেখো, ও ঠিক বড় হবে জীবনে, অনেক বড় হবে।

ব্রজমোহনের মতই বড় হতে ইচ্ছে হত গিরিজার। শহরের কলেজে পড়তে ইচ্ছে হত। তবু মাঝে মাঝে ছোটমার কথা মনে পড়ে যেত, আর বুকের মধ্যে কেমন একটা অবোধ্য কষ্ট। ভেবে ভেবে তবু কোনও কূলকিনারা পেত না ও, ব্রজমোহনের মত শিক্ষিত মানুষ কেন এমনভাবে পানুর ছোটমাকে—অট্টামাকে—এত কষ্ট দেয়।

ছোটমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হত যেন দুটো বড় বড় ঠাণ্ডা চোখের আড়ালে কান্না থমথম করছে। কিন্তু কেন, তা বুঝতে পারত না।

সেই দিনটার কথা মনে আছে গিরিজার। শুখোর বছর সেটা। বৃষ্টি নেই, বৃষ্টির জন্যে সে কি হা-হুতাশ। বাবার মুখ থমথম করে, মা'র মুখ থমথম করে, গাঁয়ের লোক বার বার আকাশের দিকে তাকায়, আসতে যেতে দেখা হলে শুধু ওই এক কথা। তারপর পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ হলেও পড়ানো বন্ধ হত না। মাস্টারমশাইরা কেউ নিজের বাড়িতে, কেউ বা ইস্কুল ঘরেই ছাত্রদের পড়াত। পরীক্ষার জন্যে তৈরি করাত তাদের। তাই ছুটির সময়েও নিয়মিত ইস্কুলে যেত গিরিজা।

আর দেখত, মাঠ ফাটছে। পাকা ফুটির মত ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছে মাঠ, চোখের সামনে। আলের মাঝে মাঝে প্রথম প্রথম ফাটল দেখা দিল। আঁকাবাঁকা দাগ। আষাঢ় মাস এল, শ্রাবণ এল। তবু বৃষ্টি নেই। ছাতা মাথায় দিয়ে যে ফাটলগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রেললাইনের দিকে যেত গিরিজা, হঠাৎ একদিন সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে হল। মাঠের বড় বড় পুকুরগুলোতেও তখন আর জল নেই। গাছের পাতাও জ্বলে

গেল। দেখতে দেখতে রং বদলে গেল পাতার। গাঁয়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া সরু খড়ি নদীতে শুধু বালি আর বালি। অমিত্তর জলও যেন শুকিয়ে যাবে।

বাউড়ি বাগদি সবাই হাহাকার করে উঠল। আর সেই সময় একদিন বংশী ছুটে এসে বললে, গিরিদাদা, শিগগির এসো।

—ক্যানে রে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে গিরিজা।

বংশী উত্তর দিলে না, টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে মোড়লদের বৈঠকখানায়।

গিরিজা সেখানে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সারা গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করেছে। আর বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হৃদয় মোড়ল চিৎকার করে করে হুকুম দিচ্ছে। একটার পর একটা মরাই খুলে ধান 'বাড়ি' দিচ্ছে গ্রামের লোকদের।

আর সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লিখে রাখছে হৃদয় মোড়ল।

বিশ পঁচিশটা মরাই সারা বছরই বাঁধা থাকত হৃদয় মণ্ডলের বাড়িতে। দেখতে দেখতে তার তিন চারটে মরাই শেষ হয়ে গেল।

বংশী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। নিজের মনেই বললে, নামটা সাথ্যক বটে গো মোড়লের। রিদয় আছে ওনার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বংশীর কথায় সায় দিল গিরিজা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে টিপ্পনী এল, বাড়ির ধান, কত লুটবে পোষ মাসে সেটা ভাবো!

ফিরে তাকাল গিরিজা। দেখল, অবু—চাটুজ্যেদের অবু।

মোড়লদের সঙ্গে চাটুজ্যেদের তখন কি নিয়ে যেন ফৌজদারি মামলা চলছে। গিরিজার, বংশীর—কারও তাই অবুর কথাটা মনঃপূত হল না। টাকা ধার দিয়ে সুদ নেয় না কে? কিন্তু এমন অভাবের সময় গ্রামসুদ্ধ লোকের জন্যে মরাই খুলে দেয় কেউ?

বংশী তাই রেগে গিয়েছিল অবুর ওপর। বলেছিল, মামলায় ওরা হেরে গেলেই ভাল। শুধু মামলায় হেরেই যায়নি চাটুজ্যেরা, প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে-খবর শুনেছিল গিরিজা।

রান্নাঘরে বসে মা তখন রুটি বেলছে, আর পাশে বসে আছে গিরিজা। নিজের মনেই গজগজ করছে মা, দিদির শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে।

কিন্তু একটা কথা বলার জন্যে চেষ্টা করছে তখন গিরিজা। খবরটা জানার পর থেকে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। বেচারি অবু!

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে গিরিজা বলে উঠল, মা!

—কি রে!

—মা, অবু নাকি পরীক্ষা দেবে না।

—দেবে না? চমকে উঠল মা। বললে, কেন রে?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গিরিজা বললে, অবুর বাবা যে টাকা দিতে পারবে না পরীক্ষার!

তারপর কি হয়েছিল জানে না গিরিজা। শুধু জানে বাবাও শুনেছিল কথাটা।

শুনে বলেছিল, বটে, টাকার জন্যে পরীক্ষা দিতে পারবে না চাটুজ্যেবাড়ির ছেলে! কেন, গাঁয়ে লোক নেই নাকি!

পরীক্ষা দিয়েছিল অবু।

সেই প্রথম বনপলাশি ছেড়ে বাইরের জগৎ দেখতে পেয়েছিল গিরিজা। সেই প্রথম ট্রেনে চড়ে বর্ধমান গিয়েছিল বাবার সঙ্গে, পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল।

সে কি আনন্দ তার। আর কেমন বড় বড় চোখ করে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে বংশী। ঠিক

যেমন ভাবে গোঁসাইদিদির কথা শুনত সে ! নবদ্বীপের রাসের গল্প, ধুলোটে কীর্তনের গল্প।

গিরিজার কাছে শহরের গল্প শুনে, রেলগাড়ির গল্প শুনে বংশী ধীরে ধীরে বলেছিল, আমিও একদিন গোঁসাইদিদির সঙ্গে চলে যাব গিরিদাদা, গোঁসাইদিদি বলেছে নিয়ে যাবে আমায় ট্রেনে করে।

গোঁসাইদিদির কাছেই খবরটা শুনলে গিরিজা।

প্রতিদিনের মতই খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এসে সদর দরজায় দাঁড়াল গোঁসাইদিদি। তারপর গান শেষ করে জোরে জোরে বার কয়েক খঞ্জনি বাজিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। চিৎকার করে ডাকলে, কই গা, আমার গিরিগোবর্ধন কই ?

ওই ডাকটার জন্যই চুপ করে বসেছিল গিরিজা, মনে মনে হাসছিল কখন গিরিগোবর্ধন বলে ডাক আসে।

গিরিজার উদ্দেশে ডাক দিয়েই ভেতরে চলে এল গোঁসাইদিদি। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখোচোখি হল গিরিজার সঙ্গে, আর মিষ্টি হেসে গোঁসাইদিদি বললে, এসো গোপাল, পরীক্ষা দিয়ে এলে তাই তোমার নেগে মহাপ্রভুর পেসাদ এনেছি। নাওসে গোপাল ! বলে প্রসাদ দিয়েছিল গোঁসাইদিদি।

তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেছিল, মা কই গো ছেলে, ডাকো। বলে গিয়ে বসেছিল রান্নাঘরের পৈঠেতে।

আর এক সময় গিরিজার কানে এসেছিল অট্টামার নাম।

গোঁসাইদিদি বলছিল, চাটুজ্যেদের বাড়িতে আজ আর ভিক্ষে মিলল না।

—কেন ? মা বিস্মিত হল তার কথায়। আর কালো ঢলো-ঢলো বসকলি আঁকা হাসি-হাসি মুখখানা হঠাৎ যেন থমথম করে উঠল।

বললে, কি জানি দিদি ! বড়ঠাকুর রেগে অগ্নিশম্মা হয়ে গেছেন।

—কেন ? সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল মা, আর গিরিজা নিজেও ভয় পেয়ে গেল।

অট্টামার ভাশুর কালীমোহন ভটচাজকে গাঁয়ের সকলে বলত বড়ঠাকুর। আর সে-মানুষের রাগকে সবাই ভয় পেত।

দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা ছিল কালীমোহনের, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। টকটকে লাল পাড় গরদের একখানা শাড়ি পরে ভোরবেলা থেকে পুজোয় বসতেন কালীমোহন। তারপর পুজো শেষ করে টোলের ছাত্রদের নিয়ে বসতেন। কিন্তু গ্রামের সকলেই তাঁকে ভয় পেত।

তাই গোঁসাইদিদির কথা শুনে কান খাড়া করল গিরিজা। শুনল, গোঁসাইদিদি মাকে বলছে, কি হয়েছে জানি না বুন, ছোট ঠাকুরের বউ দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানছে।

ছোটমা কাঁদছে ? কেন ? ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না গিরিজা। কিন্তু মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আহা বেচারী। হাতে শাঁখা সিঁদুর পরেও বিধবা মানুষের মত থাকে। দু'বেলা দুটি খায় বই তো নয়। তার ওপর এত রাগ হবার কি থাকতে পারে।

ব্যাপারটা না জেনে বুঝি শান্তি নেই। কিন্তু কি করেই বা জানতে পারবে গিরিজা। জানতে না পারুক, ছোটমার মুখখানা দেখতে তো পাবে।

ধীরে ধীরে গিরিজা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তারপর এক ছুটে একেবারে ভটচাজবাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখলে, অবু বেরিয়ে আসছে।

গিরিজা ডেকে বললে, ওদের বাড়িতে কি হয়েছে রে অবু ?

অবু জবাব দিলে না এ-প্রশ্নের। পরিবর্তে জিগ্যেস করলে, হ্যাঁ রে গিরি, অট্টামা তোকে

কোনও চিঠি ফেলতে দিয়েছিল ?

—চিঠি ! সারা শরীর শিউরে উঠল গিরিজার । কোনওরকমে বললে, না তো !

অবু আর কোনও কথা বললে না । চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, অট্টামা না ব্রজকাকাকে চিঠি দিয়েছিল, ব্রজকাকা তো থাকে না সেখানে, তাই চিঠি ফিরে এসেছে । আর কালীজ্যাঠার কি রাগ তার জন্যে ।

গিরিজা ভটচাজ-বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই অবু বললে, যাস না গিরি, কালীজ্যাঠা যা রেগে আছে, দেখবি...

গিরিজার মনেও যে ভয় না হচ্ছিল তা নয়, তবু অসীম কৌতূহলের আকর্ষণে ও পা বাড়াল । ছোটমা কাঁদছে কেন ! কাঁদবার কি আছে এতে ! আর কালীমোহনই বা তাঁকে বকবেন কেন ? স্বামীকে চিঠি লেখার মধ্যে আপত্তির কি থাকতে পারে গিরিজা খুঁজে পেল না । শুধু মনে পড়ল ওকে চিঠিটা ফেলতে দিয়েও কেমন ভয় ভয় চোখে এপাশ-ওপাশ দেখছিল ছোটমা । সেদিনও বোঝেনি, এত ভয় কেন তার ।

ব্রজমোহন তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে, নিজেও আসে না—এইটুকুই গ্রামের সকলে জেনে আসছে । তার জন্যে স্বামীর বিরুদ্ধে রাগ অভিমান থাকতে পারে ছোটমার । কিন্তু সে-সব ভুলে যদি নিজে থেকেই চিঠি লিখে থাকে ছোটমা, কি এমন অন্যায় করেছে !

না কি, স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে বলেই কালীমোহন তাঁর ভাইকে ক্ষমা করতে পারেননি !

গিরিজা ধীরে ধীরে ভটচাজ-বাড়ির চৌকাঠ পার হতেই দেখলে কালীমোহন খড়ম পায়ে খট খট করে উঠোনে পায়চারি করছেন । লাল পাড় গরদের শাড়িটা ধুতির মত করে পরা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, আর শ্বেতশুভ্র উপবীতে হাত দিয়ে মনে মনে কি যেন বিড় বিড় করছেন কালীমোহন ।

সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই দূরে একটা কপাটের আড়ালে চোখ গেল গিরিজার । দেখলে, ছোটমা দাঁড়িয়ে আছে মুখ নিচু করে ।

চোখোচোখি হতেই তাকে ইশারায় চলে যেতে বললে ছোটমা । আর ভয়ে আতঙ্কে ছুটে পালিয়ে এল ও । কিন্তু আতঙ্কটা গেল না মন থেকে ।

এদিকে দিনের পর দিন কেটে চলেছে । মনের ভেতর আর এক আতঙ্ক । পরীক্ষার ফল বের হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে তখন ।

যেদিন ফল জানতে পারল সেদিন কি আনন্দ !

নতুন গোড়ের পাড়ে মোড়লদের গুড়ের শাল বসেছে । এক পাশে আখ স্তূপীকৃত হয়ে আছে, আখ-মাড়াই চলছে । আর বিরাট বিরাট দুটো উনোনে গনগনে আগুনে কড়াই চাপানো আছে । রস ফুটছে টগবগ করে, আর কি মিষ্টি মিষ্টি অদ্ভুত একটা গন্ধে ভরে গেছে চতুর্দিক । মাছি উড়ছে ভনভন করে ।

গিরিজা, অবু, বংশী—সকলেই ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, দেখছিল কি করে রস ফুটছে, রস ঘন হচ্ছে ।

মাঝে মাঝে শালপাতায় একটু করে গরম রস নিচ্ছিল ওরা । ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে চেখে চেখে দেখছিল ।

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল খেজুর গাছের সারির ওপারে । আলপথ ধরে একজন ভদ্রলোক এদিকেই এগিয়ে আসছেন ।

গিরিজা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেদিকে । একবার সন্দেহ হল ওর, তারপরই মনে হল, দূর, তাই কখনও হয় !

কিন্তু না, ভদ্রলোক ততক্ষণে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছেন । আর সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছে গিরিজা ।

আনন্দে, আতঙ্কে—অদ্ভুত এক আবেগে বুক দুলে উঠছে ওর। ছুট, ছুট, ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেছে সে তাঁর দিকে।

তারপর কাছে পৌঁছেই পা ছুঁয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করেছে।

জনপুর ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই যে হঠাৎ বনপলাশিতে এসে হাজির হবেন ভাবতেই পারেনি গিরিজা। বলেছে, স্যার আপনি এখানে ?

হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখখানা কাঁচাপাকা দাড়ির আড়াল থেকে হেসে উঠেছে। —পাশ করেছ তুমি। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছ।

আনন্দে খুশিতে নেচে উঠেছে গিরিজা।

আর হেডমাস্টারমশাই বলেছেন, আজকেই ছেলেদের সব ফল দেখে ফিরছি, ভাবলাম যাই গিরিজাপ্রসাদকে খবরটা দিয়ে যাই।

—আর অবনীমোহন ? গিরিজা প্রশ্ন করেছে।

হেডমাস্টারমশাই বলেছেন, হ্যাঁ, পাশ করেছে, তবে...

জোর করে তাঁকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেছে গিরিজা। আর গিরিজার বাবা বলেছে, মাস্টারমশাই, এ-বেলা এখানেই খেয়ে যেতে হবে।

না, থাকতে রাজি হননি তিনি। মা তাড়াতাড়ি দুখানা লুচি ভেজে দিয়েছে, তাই খেয়েছেন নতুন গুড় দিয়ে। তারপর যাবার সময় বলেছেন, বাবলাডিহি যেতে হবে, তারপর বাণেশ্বর...ছেলেরা রাতে ঘুমোতে পারছে না সব, খবরটা দিয়ে যেতে হবে তো !

গিরিজার বাবাকে বলেছেন, কলকাতায় কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করুন রায়মশাই, ছেলে আপনার অনেক বড় হবে, হীরের টুকরো ছেলে।

অবুদের বাড়িতে দেখা করে ধীরে ধীরে খেজুর গাছের সারি পার হয়ে মেঠো রাস্তা পার হয়ে আল-পথ ধরে চলে গেছেন তিনি। অবু আর গিরিজা তাঁর পিছনে পিছনে গাঁয়ের শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে।

সেদিন গিরিজার চেয়েও যেন সমস্ত গ্রামের লোক বেশি খুশি হয়েছে। আর গিরিজার বাবা পুকুরে মাছ ধরিয়ে রসুইকর ডেকে এনে একদিন গাঁ-ষোল-আনাকে ভোজ দিয়েছেন। সেই শুখোর বছরেও, অভাব-অনটনের দিনেও ছেলের বিয়েতে যে-ভাবে খাওয়ানো হয় তেমনি।

কালীমোহন ছিলেন গিরিদের গুরুবংশ, তাই মা বলেছে, যা বড়ঠাকুরকে পেন্নাম করে আয়।

খবর শুনে খুশি হয়েছেন কালীমোহন, স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে গৃহ-দেবতার পা থেকে পুজোর ফুল তুলে নিয়ে গিরির মাথায় ঠেকিয়েছেন। আশীর্বাদ করেছেন, মানুষ হও।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলেছেন, শিক্ষিত হও বলব না বাবা, আশীর্বাদ করি মানুষ হও।

কথাটা শুনে গিরিজা বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মোচড় অনুভব করেছে। মনে পড়েছে, বাবাও একদিন বলেছিল, পড়াশুনো করে কি হবে শুনি, সেই তো বরজোর মত হবে !

কালীমোহন কিন্তু সে-কথা বলেননি। শুধু মেয়েকে ডেকে বলেছিলেন, বৌমাকে বল গিরিকে মিষ্টি খাওয়াতে। গ্রামের মুখোজ্জ্বল করেছে গিরি।

ছোটমা তা শুনে ইশারায় কাছে ডেকেছে। পিঠে হাত দিয়ে কাছে বসিয়ে কত কি গল্প করেছে। কি হতে চায় পেসাদ বড় হয়ে, কোথায় পড়বে, ছোটমাকে ভুলে যাবে কিনা।

গিরিজা ছোটমার হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে আপত্তি করেছে। বলেছে, বাঃ রে,

কলকাতায় গেলেই বুঝি গাঁয়ের কথা ভুলে যায় মানুষ ?

ছোটমা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, যায়ই তো। যায় না ?

তারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে বলেছে, কলকাতায় যাবার আগে তুই বাবা আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবি, কেমন ? তোর সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।

শুনে উৎসুক হয়ে উঠেছে গিরিজা। অথচ ছোটমার চাপাগলার কথা শুনে ওর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে, কোনও গোপন কথা যেন বলতে চায় ছোটমা।

তাই গিরিজাও গলার স্বর নামিয়ে বলেছে, এখনই বলো।

ছোটমা হেসেছে, আদর করে গিরিজাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, না পেসাদ, এখন না বাবা। যাবার আগে দেখা করিস, তখন বলব।

গিরিজা কথা দিয়েছিল।

তারপর বাবা একদিন এসে বললে, হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ঠিক করে এলাম, জনপুর পৌঁছে দিয়ে আসব তোকে, উনি নিয়ে গিয়ে কলকাতায় ভর্তি করে দিয়ে আসবেন।

দিন ঠিক হলেও ছোটমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ল না গিরিজার। ওর মনে তখন অদ্ভুত একটা উল্লাস। আনন্দে রাতে ঘুম হয় না। কলকাতায় যাবে গিরিজা, কলকাতা দেখবে। ছোটবেলা থেকে কত কি গল্প শুনে আসছে কলকাতা শহরের। সেখানে নাকি মস্ত বড় গড় আছে একটা, তার সামনের মাঠে গোরা পল্টনরা ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজ করে, ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলে রাস্তায় রাস্তায়, খুঁটি নেই থাম নেই তবু গঙ্গার বুকের ওপর একটা পুল ভাসছে আর তার ওপর দিয়ে লোকজন, ঘোড়ার গাড়ি অক্লেশে পার হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ধারে গ্যাসবাতি জ্বলে—হারিকেন লণ্ঠনের মত ঘোলাটে আলো নয়, জোছনার মত সাদা ফুটফুটে আলো।

কলকাতা দেখার, ট্রামগাড়ি আর গ্যাসের আলো দেখার আনন্দ এক দিকে, আরেক দিকে অবোধ্য একটা আতঙ্ক। ভয়। নতুন জায়গা, অচেনা মানুষ। মা-বাবাকে ছেড়ে বোর্ডিংয়ে গিয়ে থাকতে হবে, অচেনা লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, কথাবার্তা বলতে হবে, বন্ধুত্ব করতে হবে। অপরিচিত লোকের সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে ভারী ভয় করত গিরিজার।

এমনি সব আশা আর হতাশার মধ্যে দুলছে গিরিজা, অস্বস্তিতে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে না, তাই ছোটমার কথাটা কখন ভুলেই গিয়েছিল।

যাবার আগের দিন বংশী এসে বললে, গিরিদাদা, অট্টামা তোমায় দেখা করতে বলেছে একবারটি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে গিরিজার। তাড়াহুড়োর মধ্যে আবার কখন ভুলে যাবে তাই তখনই উঠতে যাচ্ছিল সে।

বংশী ওর হাত ধরে পাশে বসতে বললে।—যাবে এখন, একটু বসো ক্যানে গো গিরিদাদা।

গিরিজা বসে পড়ল পুকুরের ধারেই। ফাটা ফাটা মাটি, ঘাস নেই, বাঁশঝাড়ে পাতা নেই, শুধু কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা লাগিয়ে। নিষ্পত্র কঞ্চিগুলো অবধি রোদে ঝলসে তামাটে হয়ে গেছে। পুকুরের জল নেমে গেছে অনেক নীচে, কাদামাখা ঘোলাটে জলের তলানি শুধু।

একটা কঞ্চি ভেঙে নিয়ে জলের ওপর বারকয়েক ছপাত ছপাত করে ফেললে গিরিজা, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকিয়ে রইল সেদিকে উদাস চোখে।

বংশীও চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ ভারী গলায় বলে উঠল, তুমি চলে যাচ্ছ গিরিদাদা ?

—হুঁ। আর কোনও কথা বললে না গিরিজা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বংশী। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তোমায় একটা জিনিস দোব, রাখবে গিরিদাদা?

—কি? বিস্মিত হয়ে গিরিজা প্রশ্ন করলে।

আর বংশী লাজুক বিষণ্ণ মুখে গিরিজার দিকে তাকিয়ে বললে, এই মাদুলিটা তুমি হাতে বেঁধে রেখো গিরিদাদা। কাল সারাদিন উপোস করে গোঁসাইদিদির মোহান্তর ঠাঁই থেকে নিয়ে এয়েছি, হাতে রেখো, তোমার কোনও বিপদ হবে না। দেখো তুমি!

বলতে বলতে বংশীর চোখ থেকে টপ টপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আর তা দেখে গিরিজার বুকটাও ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। তবু মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বলেছে ও, দূর পাগল, কাঁদছিস তুই?

বংশীও হেসেছে—না গো না, কাঁদব ক্যানে। কলকাতায় যাচ্ছ, বড় হবে, কত বড় হাকিম হবে তুমি, আর আমি কিনা কাঁদব?

গিরিজাও হেসেছে। তারপর দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে গেছে খড়ি নদীর ধারে ধারে নির্জলা ঢালু রেখাটার পাশে পাশে। বালির আঁকাবাঁকা একখানা চাদরের তীর ধরে। অনেক দূর অবধি, গোঁসাইদিদির আখড়া অবধি চলে গেছে দু'জনে। বন-তুলসীর ঝোপ, নয়নতারার ঝাড়গুলো শুকিয়ে গেছে, খ্যাপা সজারুর মত সারা গায়ে কাঁটা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাতাঝরা কয়েকটা বাবলা গাছ।

না গোঁসাইদিদি, না নিকুঞ্জ দাস—কারও দেখা পায়নি, ভিন গাঁয়ে ভিক্ষে করতে চলে গেছে হয়তো।

এদিকে আবছা সন্ধ্যা নেমেছে। ছায়া-ছায়া অন্ধকার। গিরিজাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে বংশী।

আর সারকুড়ের পাশ দিয়ে খড়ের পালুইয়ের পাশ দিয়ে আবছা অন্ধকারে আসতে আসতে হঠাৎ একটা সরসর শব্দ শুনে চমকে উঠেছে গিরিজা। সাপ নাকি?

না।

চমকে এদিকে ওদিকে তাকাতেই খড়-পালুইয়ের এক পাশ থেকে চাপা গলায় ডাক এসেছে, পেসাদ, ও পেসাদ।

—ছোটমা? বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছে গিরিজা। ছোটমার আবছা ছায়া-শরীরটাও দেখতে পেয়েছে তখন।

ছোটমা দ্রুত পায়ে কাছে এগিয়ে এসেছে।

গিরিজার হাত দু'খানা ধরে বলেছে, তুই যে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি বলেছিলি পেসাদ।

গিরিজা বলেছে, যেতাম গো ছোটমা, এখনি যেতাম, ক্যানে এলে বলো তো তুমি?

ছোটমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে, তুমি কলকেতায় যাচ্ছ বাবা, আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা ছোটমা?

—ওর সঙ্গে তো দেখা হবে তোমার...গিরিজার হাত দু'খানা অনুরোধের উপরোধের উষ্ণতায় চেপে ধরেছে ছোটমা। বলেছে, ওর সঙ্গে দেখা হলে বোলো...

কথা শেষ করতে পারেনি ছোটমা। গিরিজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, কান্নার আবেগে গলার স্বর মাঝপথেই থেমে গেছে তার।

তাই বলেছে, বলো ছোটমা, দেখা হলে কি বলব বলো।

ছোটমা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলেছে, বাবা পেসাদ, বলিস যে আমি ভুল

করেছিলাম ; বলিস, ছোটমা ভুল বুঝতে পেরেছে। তার পথ চেয়েই আমি বসে আছি, বলিস বাবা তাকে।

কথাগুলো আবেগের সঙ্গে বলে গেছে ছোটমা, গিরিজা শুনেছে। কিন্তু কিছুই যেন বুঝতে পারেনি সে। অবোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে শুধু।

—ভুল করেছ ? কি ভুল ছোটমা ? উৎকণ্ঠার স্বরে প্রশ্ন করেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছে গিরিজা।

তারপর ছোটমা ধীরে ধীরে বলেছে। —সব মিছে কথা পেসাদ, সব মিছে কথা। ওর কোনও দোষ নেই রে, ও কতবার নিয়ে যেতে চেয়েছে, আমিই যাইনি। মেয়েমানুষের কাছে স্বামীর চেয়ে বড় যে আর কিছু নেই তা যে তখন বুঝিনি বাবা।

রহস্যের পর রহস্য। সারা শরীর শিউরে উঠেছে গিরিজার। এতদিনের ধারণাটা তা হলে ভুল ? ছোটমা নিজেই যেতে চায়নি ? কেন ? কেন ?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ছোটমা বললে, যখন ভুল ভাঙল আমার, যখন তার কাছে যেতে চাইলাম, তখন...তখন বটঠাকুর তাকে একখানা চিঠি লিখতেও দিলেন না পেসাদ। শুধু বংশের সুনাম রাখবার জন্যে, বটঠাকুরের মান রাখবার জন্যে নিজের জীবনটা পুড়িয়ে ছারখার করেছি পেসাদ, মিছে কথা বলে লোকের ঘৃণা কুড়িয়েছি।

একটু থেমে ছোটমা আবার বলেছে, আমায় নাকি স্বামী নেয় না। হ্যাঁ পেসাদ, আমার স্বামীর মত স্বামী কার হয় বাবা। তার নামে মিথ্যে দুর্নাম দিয়েছি রে !

বলতে বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছোটমা।

ষোল

দিনে দিনে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল ! বাংলাবাড়ির উঠোনে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। মনে হয় এই তো সেদিন। সত্যি, একটা জীবনই তো প্রায় পার হয়ে এলেন, অথচ মনে হয় কত সংক্ষিপ্ত এই জীবন। কিন্তু এরই মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটাই যে কেমন করে বদলে গেল ! হৃদয় মণ্ডলদের টাকার অভাব ছিল না। তিনখানা গাঁ ছড়িয়ে জমিজমা, খামারবাড়িতে মরাইয়ের পর মরাই বাঁধা থাকত শুখোর বছরেও। মাঠের ধান ঘরে তুলতে না তুলতে বেচে দিতে হত না তাদের আর পাঁচজনের মত। তবু কই, মোড়লদের ছেলেগুলো তো সেদিন গ্রামের লোকের কাছে তেমন সম্মান পেত না ! গিরিজাপ্রসাদকেই সকলে সম্মান দিত। হৃদয় মোড়লও বলত তুমিই গাঁয়ের মুখোজ্জ্বল করেছ গিরিজা, টাকা আজ আছে, কাল নেই, শিক্ষাদীক্ষা চিরকালের।

গিরিজাপ্রসাদ নিজেও সেদিন এ-কথাই ভাবত। কিন্তু আজ যেন সব বদলে গেছে। সেই অবনীমোহনই আজ মর্যাদার আসনে বসেছে। আর গিরিজাপ্রসাদ ? গ্রামের লোক বুঝে নিয়েছে হয়তো, গিরিজাপ্রসাদ ব্যর্থ হয়ে, নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁকে আর মানুষ বলেও কেউ গণ্য করে না, অপমান করতেও বাধে না তাদের।

অবনীমোহন কাজের মানুষ, খবর দিলেই কি আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে ! একটা মানুষের টাকা আছে জেনেই গাঁ-সুদ্ধ লোক কেমন তোষামোদের ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও অপমান বোধ করে না। নাকি কথাটা বলে গোপেন গিরিজাপ্রসাদকেই শুধু অপমান করতে চেয়েছে ? বোঝাতে চেয়েছে, গিরিজাপ্রসাদ বেকার, গিরিজাপ্রসাদ কাজের মানুষ নন !

পায়চারি করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ। থমকে দাঁড়ালেন।

যতে কোটাল তাঁর চোখের সামনে দিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকল, হাড়-জিরজিরে গরু দুটোকে খুলে নিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য দিন যতেকে ডেকে দু'-একটা কথা বলেন, আজ আর ইচ্ছে হল না। পাটকরুনি ঝিটা ওঁকে দেখে গোবরজলের ছিটে দিতে দিতে ঘোমটা টেনে দিল আরেকটু। চড়ুই পাখিগুলো লাফাতে লাফাতে আসছে, ঠোঁটে ধান তুলে নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। তালগাছের কাঁধে বাবুইয়ের বাসাটা দুলছে। ঘুঘু ডাকছে কোথায় থেকে থেকে। ঘাট থেকে একরাশ বাসন ধুয়ে নিয়ে পাঁচিলের ওধার দিয়ে ঘোমটা টেনে কে যেন চলে গেল। ছবির মত কত কি ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু কোন কিছুই যেন চোখে পড়ছে না। এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার যে এত গভীরভাবে বুকের ভেতর নাড়া দিতে পারে, কে জানত। জীবনে এর চেয়ে অনেক বেশি অপমান কুড়িয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু অবনীমোহনের কাছে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়েছে বলেই কি...গ্রামের লোক তাঁকে তুচ্ছ মনে করেছে বলেই হয়তো এতখানি আঘাত পেয়েছেন।

না, উপায় থাকলে এ-গ্রাম ছেড়ে, এই পঙ্কিল আবহাওয়া ছেড়ে চলে যেতেন তিনি। চলে যাবেন ? আবার নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করবেন কোথায় গিয়ে ? কিন্তু কত স্বপ্ন ছিল মনে, ফিরে আসবেন, নতুন করে গড়ে তুলবেন গ্রামখানা। ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কাঁদরের পুল—কত কি গড়বেন। পুকুরগুলোর পানা সাফ করাবেন, পোনা ফেলবেন ! সবই স্বপ্ন রয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেলেই বেঁচে যান। আর মেয়ে দুটির, অমরেশের ব্যবস্থাটা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আর কিছু চাই না।

বিব্রত দুশ্চিন্তায় আবার পায়চারি করতে শুরু করলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর হঠাৎ দেখতে পেলেন ধুতির ওপর খাকি বুশ শার্ট, দু' বগলে দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে অবিনাশ ডাক্তার।

গিরিজাপ্রসাদের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই একমুখ হাসি হেসে অবিনাশ ডাক্তার দূর থেকেই চিৎকার করে উঠল—মাস্টারমশাই, ও মাস্টারমশাই, গুড নিউজ, আপনার জন্যে একটা গুড নিউজ এনেছি।

গিরিজাপ্রসাদও মুখে হাসি টেনে এগিয়ে এলেন।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে আসতে আসতে অবিনাশ ডাক্তার বললে, পা নেই তবু নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছি মাস্টারমশাই, কেন জানেন ? যা ধরব তার শেষ না দেখে ছাড়ব না এই প্রতিজ্ঞা আছে বলে, বুঝলেন ?

গিরিজাপ্রসাদ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। মানুষটাকে বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। একটা পা নেই, অসহায় মানুষ, তাই এদিকটাই চাপা রাখতে চান গিরিজাপ্রসাদ, এমন ভাব দেখান যেন ওটুকু চোখেই পড়ে না। অথচ অবিনাশ ডাক্তার কথায় কথায় সেটুকুই চোখে পড়িয়ে দিতে চায়। যেন ওইটুকুই ওর গর্ব।

অবিনাশ ডাক্তার ততক্ষণে হাসতে হাসতে কাছে এসে পড়েছে। হেসে উঠে এবার বললে, আপনি তো মাস্টারমশাই ছাত্রদের ইস্কুলে অনেক 'এসে' লিখিয়েছেন। তাই না ?

গিরিজাপ্রসাদ বুঝতে না পেরে শুধু হাসলেন।

অবিনাশ ডাক্তার কিন্তু থামতে চায় না। বললে, গাধা ঘোড়া গরু এই সবের, কেমন ?

—হ্যাঁ, তা তো লিখিয়েছি। হাসলেন গিরিজাপ্রসাদ।

—কিন্তু মানুষের ওপর লিখিয়েছেন কখনও ?

—হ্যাঁ, তা বিবেকানন্দ, রামমোহন...

বাধা দিয়ে অবিনাশ ডাক্তার বলে উঠল, উহুঁহুঁ, ওসব নয়, ওঁরা হলেন মহামানব— গ্রেট মেন। ওঁদের কথা নয়, মানুষ—ম্যান—ম্যানকাইন্ড সম্বন্ধে 'এসে' লিখিয়েছেন ?

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, না তো।

অবিনাশ ডাক্তার হেসে উঠল—জানি, লেখাননি তা জানি। এইখানেই আমাদের এড়ুকেশন সিস্টেমের ডিফেক্ট, বুঝলেন।

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে গেলেন। হাসতে পারলেন না। ভাবলেন, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কেই হয়তো কিছু বলতে চায় ডাক্তার। আর ওই একটা জায়গাতেই দুর্বলতা তাঁর। আজকালকার মাস্টারদের ওপর, শিক্ষারীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ তিনি। কথায় কথায় সমালোচনা করেন তার। কিন্তু তাঁদের যুগের সেই পুরনো রীতির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই আহত বোধ করেন। তেমন তেমন ক্ষেত্রে মুখ ফুটে বলেই ফেলেন, পুরনো প্রথায় পড়িয়েই তো বিদ্যাসাগর, রামমোহন হয়েছিল...

অবিনাশ ডাক্তার কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না।

বললে, আমাকে যদি মানুষের ওপর 'এসে' লিখতে বলেন, প্রথম লাইনেই কি লিখব জানেন ?

গিরিজাপ্রসাদের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। না, তা হলে কোনও রসিকতা করতে চায় ডাক্তার।

হেসে প্রশ্ন করলেন, কি লিখবেন ?

—লিখব, এভরি ম্যান হ্যাজ এ টেল। প্রত্যেক মানুষেরই একটি ল্যাজ-আছে।

গিরিজাপ্রসাদ হেসে উঠলেন হো হো করে।

প্রশ্ন করলেন, মানে ?

—মানে, মানুষ মাত্রেরই একটা ল্যাজ আছে, কায়দামত সেই ল্যাজে যদি একটু সুড়সুড়ি দিতে পারেন তা হলে তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন হতে পারে। আর সুড়সুড়ি দিলে যদি না হয় তো ল্যাজে একটু মোচড় দিলেই...

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বললেন, ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন।

অবিনাশ ডাক্তার বললে, ইস্কুল হবে।

—ইস্কুল ? হবে ? আকাশ থেকে পড়লেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর অবিনাশ ডাক্তার বললে, অবনীবাবু আপনাদের গ্রামের জন্যে নাকি একটা পয়সা কখনও দিতে চাননি ? ইস্কুলের জন্যে পাঁচ হাজার টাকাই উনি দেবেন, কথা আদায় করে আনলাম।

—সত্যি ? অবনী দেবে ? গিরিজাপ্রসাদ যেন বিশ্বাসই করতে চান না।

অবিনাশ ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, দেবেন। তবে ইস্কুলটা ওঁর মায়ের নামে করতে হবে। হোক না, ইস্কুল নিয়ে কথা, নাম যারই হোক, ছেলেগুলো তো শিক্ষিত হবে।

গিরিজাপ্রসাদ বললে, তা তো সত্যিই, কিন্তু অবনী দেবে এত টাকা ?

হ্যাঁ, দেবেন। তাই তো ছুটে এলাম খবরটা দিতে। ভেবেছিলাম, ওঁর বুঝি ল্যাজ নেই, কিন্তু আছে...সব মানুষের আছে, আর ওঁর থাকবে না।

গিরিজাপ্রসাদও এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।

বললেন, বসুন, একটু চা করতে বলি।

অবিনাশ ডাক্তার বাধা দিল। বললে, না। ভেরি সরি, এখুনি ফিরতে হবে। প্রভাকর আসবে বলেছে, হয়তো দেখা না পেয়ে চলে যাবে। জমা রইল এখন, পরে যে-কোনও সময় এসে খেয়ে যাব—শুধু চা নয়, চা-টা !

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অবিনাশ ডাক্তার আবার ক্রাচ দুটোকে ঠিক করে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন। গিরিজাপ্রসাদ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ধুতির ওপর

খাকি বুশ শার্ট পরা মানুষটাকে দেখা যায়।

মনে মনে ভাবলেন, আশ্চর্য মানুষ !

খুশিতে ডগমগ হয়ে তালতলার চটি টানতে টানতে ভিতর-বাড়িতে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। না, অবনীমোহন সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা বোধহয় ভুল। গ্রামের লোকগুলোকে তিনি যেমন চিনে ফেলেছেন, অবনীমোহনও তেমনি। তাই হয়তো তাচ্ছিল্য দেখাবার জন্যেই লোকগুলোকে বসিয়ে রেখেছিল। গিরিজাপ্রসাদও গেছেন দেখা করতে এ-খবর পেলে নিশ্চয় বেরিয়ে আসত তাড়াতাড়ি।

সে যাই হোক, লোকটার হৃদয় আছে বটে, প্রায় সেই পুরনো দিনের হৃদয় মোড়লের মত। সবাই বলে, গাঁয়ের জন্যে দুটো পয়সাও দিতে চায় না অবনীমোহন। তা যদি সত্যি হত তা হলে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি হত সে ? পাঁচ হাজার টাকা ! ভাবতেও বিস্ময় জাগে। একটা মানুষ এতগুলো টাকা কিনা এক কথায় দিয়ে দিতে রাজি হয়েছে !

জীবনে কোনওদিনই খুব বেশি টাকা দেখার সৌভাগ্য হয়নি গিরিজাপ্রসাদের। যা দেখেছেন চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর। সেও এমন কিছু মোটা টাকা নয়। তাই বিশ্বাস করতেও বাধে তাঁর। এত টাকা কেউ দিতে পারে এক কথায় ? যে পারে কত টাকাই না করেছে সে ! আর গিরিজাপ্রসাদ ভাল ছাত্র হয়ে, পরীক্ষায় ভাল ফল করে কি করলেন ? কি পেলেন ?

তবু খুশি হয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ, আর এই খুশি হবার মত খবরটা নিভাননীকে না শুনিয়ে যেন তৃপ্তি নেই। তাই চটি টানতে টানতে ভিতর-বাড়িতে একরকম ছুটে এলেন।

হাঁক ছাড়লেন, শুনছ ?

কেউ সাড়া দিল না। কম্বল বিছিয়ে বসে পড়ছিল দু'বোন। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলল তারা।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, তোর মা কোথায় গেল রে !

বিমলা ফিরে তাকাল দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরখানার দিকে। গিরিজাপ্রসাদ দেখলেন নিভাননী এসে দাঁড়িয়েছে খুঁটি ধরে। কিন্তু নিভাননীর মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেলেন। থমথমে মুখ নিভাননীর, রাগ থমকে আছে যেন মুখে-চোখে।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, কিংবা লক্ষ করেননি এমন ভান করে গিরিজাপ্রসাদ মুখে হাসি টেনে বললেন, অবনীর বুকটা দরাজ, বুঝলে ! বুঝলি বিমলা—মেয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, অবনী হ্যাজ এ বিগ হার্ট। ইস্কুলের সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছে ও, ডাক্তার বলে গেল, পাঁচ হাজার টাকাই ও দেবে বলেছে।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি নিভাননী। এবার রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, ঘরের খবর রাখার সময় তো নেই তোমার, বনের মোষ তাড়িয়েই বেড়াও।

গিরিজাপ্রসাদ বিমূঢ়ভাবে তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে। প্রশ্ন করলেন, কেন, কি হল আবার ?

—কি হতে আর বাকি আছে ? বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল নিভাননীর, রাগে অভিমানে। বললেন, তোমায় এখনও বলছি, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করো তুমি, তা না হলে কপালে অনেক দুঃখ আছে জেনে রেখো।

কথাটা গিরিজাপ্রসাদকে না বলে যেন শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। মোহনপুরের বউয়ের কাছ থেকে কথাটা শুনে অবধি রাগে গজরাচ্ছিলেন। রাগ মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, ওঁর নামে অপবাদ রটাবার জন্যেই এমন একটা বিশ্রী কথা বলেছে মোহনপুরের বউ।

নিভাননী কিনা নিজে থেকে বিমলাকে...

ছি ছি ছি। এমন কথা কি করে বলতে পারল মোহনপুরের বউ! আসলে কথাটা শুধু তাঁকেই নয়, হয়তো আরও অনেককে শুনিয়েছে সে! ওর ওই হাসি-হাসি মুখ দেখলেই তাই জ্বলে যান নিভাননী। এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই, ঠাকুরপোর মন ও-ই বিষিয়ে দিয়েছে। তাই কথায় কথায় আজকাল গিরীনও দাদাকে দু'কথা শোনাতে কসুর করে না। এতটুকু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই।

গিরিজাপ্রসাদকে তাই কাছে ডাকলেন নিভাননী, এখন থেকেই সাবধান হতে বলতে হবে। বিমলার নামে, তাঁর নামে ঘরের লোক যদি এমন দুর্নাম দেয় তা হলে মেয়েদের বিয়ে দেবেন কেমন করে?

গিরিজাপ্রসাদকে কথাটা বলতে গিয়ে একবার দূরে রান্নাঘরের দিকে কটাক্ষ ফেললেন নিভাননী। দেখলেন, মোহনপুরের বউ উনোনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে ধোঁয়া-লাগা চোখে আঁচল ঘসছে।

আঁচলটা ঘসছিল মোহনপুরের বউ শুধু ধোঁয়ার জন্যে নয়, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবেই হয়তো চোখে জল এসেছিল তার।

নিভাননীকে বলেও যেন শান্তি পায়নি মোহনপুরের বউ। খবরটাই যে অশান্তির। বিমলার জন্যেই দুশ্চিন্তা নয়, সত্যি হলে যে টিয়ারও বিয়ে হবে না! লোকে বলবে, ওই বাড়িরই মেয়ে তো!

উদাসের কথাটা পাঁচ-কান হয়ে যখন মোহনপুরের বউয়ের কানে এল তখনই তার বুক কেঁপে উঠেছিল ভয়ে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি; তবু অবিশ্বাস করারও উপায় ছিল না।

বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদে বসে বসে কুলো হাতে নিয়ে চালের খুদ বাছছিল টিয়ার মা। এমন সময় গুপ্তদের মেজগিন্নি এসে বললে, হ্যাঁ লা মোনপুরের বউ, কি শুনছি সব?

কথার ধরন দেখেই চমকে উঠেছিল মোহনপুরের বউ। তাই চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, কি শুনছ?

—কালে কালে কতই দেখব। শহুর-বাজারের লোকদের ধরন-ধারণই আলাদা, বুঝলি। বলে মেজগিন্নি ফিসফিস করে বললে, তোর বড়-জা ভাল ফন্দি বের করেছে মেয়ের বিয়ের।

মোহনপুরের বউ বুঝতে না পেরে বললে, কিসের ফন্দি? কি বলছ তুমি?

গুপ্তদের মেজগিন্নি এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, ওই যে বিডিও না কি, সোন্দর মত সেই ছিমছাম ছেলেটি আসে মটোর করে?

—হ্যাঁ, প্রভাকর। কি করেছে? মোহনপুরের বউ বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকায়।

—তাই হবে হয়তো, নামধাম কি আর জানি ছাই! তার সঙ্গে নাকি তোর জা মেয়েদের বেড়াতে পাঠায়।

হাজার হোক নিভাননী পর নয়। বিমলা রায়বাড়িরই মেয়ে। ভিতরে ভিতরে যত রাগবিদ্বেষই থাক, অন্য কারও মুখে তাদের নিন্দে শুনতে ভাল লাগে না। মোহনপুরের বউয়েরও গায়ে এসে লাগে। দোষত্রুটি যাই থাক, মোহনপুরের বউ নিজে বলতে পারে নিভাননীকে। তা বলে অন্যে এসে বলে যাবে?

মোহনপুরের বউ বিরক্ত হয়ে বলে, কি যা-তা বকছ!

গুপ্তদের মেজগিন্নি হেসে বলে, বিশ্বেস না হয় উদাসকে ডেকে শুধো ক্যানে? মোড়লবউ বললে, গোপেন নাকি নিজের কানে শুনেছে।

—কি শুনেছে? মোহনপুরের বউ চটে যায় যেন।

উত্তর আসে, সব কি আর জানি ছাই ! মটোরে করে বেড়াতে পাঠায়, চিঠি নেকানিকি করে, আরও কত কি। শহর-বাজারের মেয়ে তো, মা-মেয়ে দুই সমান, টোপ ফেলে মাছ ধরছে লা, টোপ ফেলে মাছ ধরছে !

বলে গটগট করে হেঁটে চলে যায় মেজগিন্নি। কিন্তু মোহনপুরের বউয়ের মনের ভেতর যেন ঝড় বয়ে যায়। সত্যি ? হতেও পারে, সেই প্রথম দিনই তো দেখেছে সে, বাংলাবাড়িতে নির্লজ্জের মত কেমন হেসে হেসে বিমলা-কমলা গল্প করছিল প্রভাকরের সঙ্গে। টিয়া একবারটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মারতে বাকি রেখেছিল মোহনপুরের বউ, অথচ কই বড় জা তো মেয়েদের কিচ্ছু বলেনি। মেয়েগুলোও দিনরাত হই হই করে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়, মানা তো করে না কেউ ! না বটঠাকুর, না বড়-জা।

কিন্তু এও কি সত্যি হতে পারে ?

ক'দিন ধরেই টিয়ার বিয়ের জন্যে স্বামীকে খোঁচাচ্ছে মোহনপুরের বউ। মেয়ে বড় হলে যে মায়ের বুকে চলতে ফিরতে খোঁচা লাগে, রাতে ঘুম হয় না—তা কি বোঝে পুরুষমানুষরা ! তবু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্বামীকে পাঠিয়েছে সে, প্রভাকরের বাবার নাম-ঠিকানা জোগাড় করে আনতে, খবরাখবর নিতে। অট্টামা যখন ডাক্তারের কাছে শুনে এসেছে, টিয়াকে মনে ধরেছে প্রভাকরের, তখন চেষ্টা করলে হয়তো...

কিন্তু গুপ্তদের মেজগিন্নির কথা শুনে এ-ক'দিন আশায় আশায় যে স্বপ্নটা গড়ে তুলেছিল সেটা যেন হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কি আশ্চর্য ! নিভাননী ভিতরে ভিতরে এমন কাণ্ড করছে টেরও পায়নি সে ?

ঘাট থেকে কাপড়চোপড়গুলো কেচে এনে মেলে দিচ্ছিল টিয়া। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণেই যেন চটে গেল মোহনপুরের বউ। জবুথবু মত, শাড়িটা কোনও রকমে শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে টিয়া, কাপড় পরার মধ্যে এতটুকু শ্রী নেই, ছাঁদ নেই। এমন স্বাস্থ্য, এমন বাড়ন্ত গড়ন, নাক-চোখ-মুখ এত ভাল, এক পিঠ চুল, হাত-পায়ের গোছ—কি নেই টিয়ার ? রংটাও তো মাজামাজা, পাড়াগাঁয়ে মানুষ, রোদে-জলেও এমন রং। অট্টামাও তো বলেছিল, বিমলার চেয়ে টিয়া অনেক সুন্দর। তবু মোহনপুরের বউয়ের মনে হয়, বিমলার চেহারাটা অনেক ছিমছাম, পোশাকে-আশাকে কত পরিচ্ছন্ন। কথাবার্তা, হাঁটা-চলায় কি এক ছন্দ আছে। দেখে ভালই লাগে মোহনপুরের বউয়ের। টিয়া কি বিমলার কাছ থেকে ওদের মত করে কাপড় পরতে শিখে নিতে পারে না ? একটু চালাক-চতুর হতে পারে না ? কেমন যেন বোকা বোকা চোখে তাকায়, পায়ে পা জড়িয়ে যায় হাঁটবার সময়। টিয়া যত সুন্দরই হোক, মোহনপুরের বউয়ের কেমন ভয় হয়, প্রভাকর কেন, যে কেউ মেয়ে দেখতে এলে বিমলাকেই পছন্দ করবে।

তাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল গিরীন ফিরে এলে বলবে, মেয়ের বিয়ের যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাড়াতাড়ি। গুপ্তদের মেজগিন্নির কথায় ভয়টা আরও বেড়ে গেছে। কি জানি, বিমলার জন্যে শেষে না টিয়ার নামেও অপবাদ দিয়ে বসে লোকে। দূর দূর গাঁয়ের লোক কি আর এত খবর রাখবে ! বলবে, রায়বাড়ির একটা মেয়ে বি ডি ও-র গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কোন্ মেয়ে, কার মেয়ে সে খবর কি রাখবে তারা !

তাই রাত্রের পাট চুকিয়ে শোবার ঘরটিতে এসে ঢুকেই স্বামীর মুখের দিকে তাকাল মোহনপুরের বউ। অন্যান্য দিন স্বামীর দিকে ফিরে তাকাতেও অনেক সময় মনে থাকে না তার। ছেলেমেয়েদের ঠিক করে শুইয়ে দেয়, মশারি গুঁজে দেয় বিছানার চারধারে, বালিশ ঠিক করে দেয় কারও মাথায়, তারপর বাটা থেকে একটা পান নিয়ে সেজে মুখে পুরে দিয়ে লম্পটা নিবিয়ে কোলের ছেলেটাকে বুকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। আর শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু আজ একটা দুশ্চিন্তা ঢুকেছে মাথায়। পানটা মুখে পুরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল মোহনপুরের বউ। তারপর প্রশ্ন করলে, ঘুমোলে ?

কোনও সাড়া এল না।

এবার কাছে এগিয়ে গেল মোহনপুরের বউ। তারপর স্বামীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এই! ঘুমোলে নাকি ?

—উঁ। ঘুমজড়িত স্বরে সাড়া দিল গিরীন।

মোহনপুরের বউ পান চিবোতে চিবোতে খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসল গিরীনের পাশে। বললে, শোন।

চোখ না খুলেই গিরীন আধো-ঘুম আধো-জাগা কণ্ঠে বললে, কি ? বলে বালিশটার ওপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুল, একখানা হাত রাখল মোহনপুরের বউয়ের কোলের ওপর।

হাতখানা দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মোহনপুরের বউ বললে, আচ্ছা ঘুম বাপু তোমার! শোনো...

গিরীন সাড়া দিল না, শুধু হাতখানা তার মোহনপুরের বউয়ের কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

মোহনপুরের বউ হেসে ফেলল! বললে, শোনো, খবর পেলে কিছু ? সেই যে দেখতে আসবে বলেছিল যারা...

গিরীন এবার চোখ মেলে তাকাল। বললে, প্রভাকরের খবরটা পেয়েছি আজ। কালনার ওদিকে বাড়ি, বাপ-মা আছে, ভাবছি এই সপ্তাহেই যাব একবার ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে...

মোহনপুরের বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বললে, ছাই হবে গিয়ে!

—কেন ?

—এদিকে ভেতরে ভেতরে দিদি যে কি চাল চেলেছে তা তো জানো না!

ফিসফিস করে একে একে গুপ্তদের মেজগিন্নির কাছে শোনা সব কথাগুলো বললে মোহনপুরের বউ।

গিরীন হঠাৎ উঠে বসল। ধমক দিয়ে বলে উঠল, কি যা-তা বলছ ? তোমারও মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

—রাগছ কেন ? সত্যি কি না উদাসকে ডেকে শুধিয়ে দেখলেই তো হয়!

গিরীন বলে উঠল, কি বলছ তুমি ? উদাস...উদাসকে ডেকে শুধোব ? রায়বাড়ির মান-ইজ্জত তা হলে থাকবে আর ?

মোহনপুরের বউ বললে, ভাইঝির কীত্তি, গায়ে তো ফোস্কা পড়বেই তোমার! আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না, সময় থাকতে পৃথক হয়ে নাও, তা নইলে শেষে...

গিরীন চুপ করে রইল।

মোহনপুরের বউই বললে, ওই যে মেয়ে দেখতে আসবে কথা ছিল, তারাই যদি আসে...দিদিকে জানো না তো, দেখো ঠিক বিমলাকে তাদের সামনে কোনও ছলছুতো করে পাঠিয়ে দেবে।

গিরীন বুঝতে না পেরে বললে, দিলেই বা!

—তা হলে আর টিয়াকে পছন্দ হবে তাদের ?

গিরীন হেসে বলে, কি যে বলো! টিয়ার কাছে বিমলা! যারা বই-খাতাকে বিয়ে করতে চায় তাদের কথা আলাদা, কিন্তু মেয়ে দেখে যদি বিয়ে দিতে চায়...

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, ওই গরবেই থাকো। বলে গিরীনের পাশেই শুয়ে পড়ে মোহনপুরের বউ। তারপর গল্প করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে কিন্তু নিভাননীকে কথাটা না বলে স্বস্তি পায় না। হাজার হোক, তার নামটাও জড়িয়ে যাবে বড়-জায়ের সুনাম-দুর্নামের সঙ্গে। তাই সাবধান না করে পারে না।

আর সে-কথাটা বলবার জন্যেই নিভাননীকে একসময় ডাকলে রান্নাঘর থেকে। যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়।

—দিদি ! ডাকলে ঘাড় নেড়ে ইশারায়।

-হ্যাঁ। নিভাননী কাছে আসতেই মোহনপুরের বউ বললে, বলছিলাম কি, আপনাদের নিন্দে মানে তো আমাদেরও নিন্দে দিদি !

নিভাননী চোখ কপালে তুললেন। মোহনপুরের বউয়ের হাবভাবে, কথা বলার ধরন দেখেই কেমন যেন বুঝতে পারলেন, এমন কিছু শুনতে হবে যা রীতিমত আতঙ্কজনক। দেয়ালে পিঠ দেওয়ার মত ভিতরে ভিতরে রুখে দাঁড়ালেও গলার স্বর যথাসম্ভব বিনীত করে প্রশ্ন করলেন, কি বলছ, বুঝতে পারছি না ছোটবউ।

মোহনপুরের বউও যেন ঠিক কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারছে না। বললে, বলছিলাম কি, গাঁ-সুদ্ধ লোক বলছে ওই প্রভাকর ছেলেটির সঙ্গে মটোরে করে বিমলাকে বেড়াতে পাঠাচ্ছেন...

নিভাননী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অগ্নিবর্ষী চোখে তাকালেন মোহনপুরের বউয়ের দিকে।

মোহনপুরের বউ আমতা আমতা করল।

—না, মানে দোষের কিছু না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোকদের তো চেনেন দিদি।

নিভাননী এবার রাগে ফেটে পড়লেন। এমন একটা অসম্ভব অবিশ্বাস্য কথা যেন কখনও শোনেননি নিভাননী।

কঠিন, ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, দেখো ছোটবউ, এখানে আসার দিন থেকে পদে পদে তোমরা অনেক অপমান করেছ। কথায় বলে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা, তাই। শেষে কিনা আমার মেয়ের নামে, আমার নামে এমন কথা তুমি বলতে পারলে ?

বলেই রেগে উঠে চলে গেলেন নিভাননী।

হতভম্ব বিস্মিত মোহনপুরের বউ খানিক বসে থেকে নিজের কাজে চলে গেল। এত লোক যখন বলছে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। আর এমন কিছু রাগারাগি করেও বলেনি মোহনপুরের বউ। তবে ? না কি বড়-জায়ের এও এক অভিনয়।

কিছুক্ষণ পরেই তাই গিরিজাপ্রসাদ যখন খুশি মনে ইস্কুলের খবরটা দিতে এলেন স্ত্রীকে, নিভাননীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। ভাবলেন, প্রতিদিনের মতই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হয়তো কিছু খুঁটিনাটি নিয়েই থমথমে মুখ করে আছে।

গিরিজাপ্রসাদকে কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিলেন নিভাননী।

বললেন, ওরা আমাদের নামে কি নিন্দে রটাচ্ছে কানে এসেছে তোমার ? শুধু ইস্কুল-ইস্কুল করে...

কথা শেষ হল না নিভাননীর। বাইরে থেকে ডাক এল, মাস্টারমশাই, ও মাস্টারমশাই !

অবিনাশ ডাক্তারের গলা। আবার ফিরে এল কেন ? হন্তদন্ত হয়ে চটি টানতে টানতে

ছুটে বেরিয়ে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ।

ফিরে এলেন মিনিট কয়েক পরেই। বললেন, শুনছ! দু' কাপ চা করে দাও... বিমলা, দু' কাপ...আচ্ছা তিন কাপই দে মা, তিন কাপ। ডাক্তার প্রভাকরকেও ধরে এনেছে।

বলেই বেরিয়ে গেলেন আবার বাংলাবাড়ির দিকে।

বিমলা উঠে গিয়ে কেটলিটা তুলতে যাচ্ছিল, নিভাননী ধমক দিলেন, তুই থাম। দে আমি করে দিচ্ছি।

বিমলা অতশত বুঝল না। মা যদি চা-টা করে দেয় ভালই তো। ও বই-খাতা তুলে রেখে সবে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, নিভাননী হাঁক ছাড়লেন, কোথায় যাচ্ছিস?

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে বিমলা। ইতিমধ্যে কোথায় কি ঘটে গেছে, কাকিমা কি বলেছে না বলেছে, কিছুই কানে আসেনি তার। তাই বললে, বাইরে।

—বাইরে! বিমলার কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলেন নিভাননী, প্রায় ভেংচি কেটে উঠলেন। তারপর উষ্মার স্বরে বললেন, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, বয়স বাড়ছে, না কমছে তোমার?

বলেই রাগে গজগজ করতে করতে এসে স্টোভ ধরালেন। স্টোভে পাম্প করতে করতে আগুনটা যত বেড়ে উঠছে, মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে চাপা আক্রোশটাও যেন ততখানিই বেড়ে উঠছে। যে কোনও মুহূর্তে বুঝি ফেটে পড়বে।

না, মুখের মত জবাব দেবেন নিভাননী। কি ভেবেছে মোহনপুরের বউ। যা খুশি অপবাদ দেবে তাঁর নামে, বিমলার নামে? বেশ, তাই হোক, দেখুক মোহনপুরের বউ, দেখে জ্বলে পুড়ে মরুক।

দু' কাপ চা-ই ছাঁকলেন নিভাননী। এত বেলায় আর গিরিজাপ্রসাদকে চা খেতে হবে না, মনে মনে ভাবলেন।

তারপর ডাকলেন বিমলাকে।

বিমলা অভিমানে, অবোধ্য রাগে বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে বসেছিল। প্রথমটা সাড়া দিল না।

বারকয়েক ডাকতে তবে মুখ তুলে তাকাল।

নিভাননী বললেন, শুনে যা।

উঠে এল বিমলা।

নিভাননী হঠাৎ গলার স্বর নরম করলেন। বললেন, চা-টা দিয়ে আয় তো মা ওদের।

—আমি পারব না। রাগ দেখাল বিমলা, বললে, কুমিকে ডাকো না!

—সে কোথায় গেছে কে জানে, যা লক্ষ্মীটি তুই দিয়ে আয়, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বিমলা অবশ্য বাইরে যাবার আগ্রহে এতক্ষণ মা'র ওপর চটছিল; এবার কাপ দুটো তুলে নিল, একটা কাঁসার থালার ওপর বসিয়ে নিয়ে চলে গেল বাংলাবাড়ির দিকে।

আর নিভাননী প্রতিশোধের আনন্দে ক্রুদ্ধ তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন রান্নাঘরের দিকে, মোহনপুরের বউয়ের দিকে।

দেখুক ও, দেখে জ্বলে পুড়ে মরুক। অদ্ভুত নৃশংস একটা আনন্দ অনুভব করলেন নিভাননী।

সতেরো

গিরিজাপ্রসাদ আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ নন। সবই চোখ মেলে দেখেন, বোঝেনও সব কিছু, তবু মুখের কথা তো সব সময় হিসেব মেনে চলে না।

অবিনাশ ডাক্তারের ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। দেখলেন প্রভাকরও সঙ্গে এসেছে।

ডাক্তার নিজেই বললে, ফিরে এলাম মাস্টারমশাই, মাঝপথেই দেখা হয়ে গেল বি ডি ও সাহেবের সঙ্গে, তাই নিয়ে এলাম আপনার কাছে।

গিরিজাপ্রসাদ বসতে বললেন প্রভাকরকে। বেশ বোঝা গেল, খুব খুশি হয়েছেন তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে। মনে মনে ভাবছেন হয়তো, অবনীমোহনকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আসবেন কিনা।

ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে বাংলাবাড়ির দাওয়ায় উঠে বসল অবিনাশ ডাক্তার, পিছনে পিছনে প্রভাকর।

ক্রাচ দুটো বগল থেকে নিয়ে পাট করে পাশে রেখে কম্বলটার ওপর বসল ডাক্তার। আর প্রভাকরও। গিরিজাপ্রসাদ সেই ফাঁকে চায়ের কথা বলে এলেন।

খানিক পরেই কাঁসার থালায় দু' কাপ চা এনে নামিয়ে রাখলে বিমলা, আর কাপ দুটো তুলে প্রথমে ডাক্তারকে তারপর প্রভাকরকে দিতে গিয়ে চোখোচোখি হল, ঠোঁট টিপে হাসল বিমলা।

প্রভাকর হাসল লাজুক মুখ নামিয়ে। তারপর বললে, এত বেলায় আবার চা কেন!

বিমলা থালাটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে কৌতুকের সুরে বললে, তা হলে ভাত খেয়ে যান!

গিরিজাপ্রসাদও হেসে উঠলেন। আর বিমলার কথার জের ধরেই প্রভাকরকে বার বার খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন, ফিরতে তো অনেক বেলা হয়ে যাবে...

প্রভাকর এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে, আজ থাক, আরেকদিন এসে খেয়ে যাব।

—কবে, বলে যাও। অবিনাশ ডাক্তারকেও সেই সঙ্গে অনুরোধ করলেন গিরিজাপ্রসাদ। মুহূর্তের জন্যে তিনি ভিতর-বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াটার কথা যেন ভুলে গেলেন। এমনকি একটু আগে নিভাননী কি বলতে চেয়েছিলেন, কেন রাগে থমথম করছিল তাঁর মুখ, হঠাৎ একটা বাইরের লোককে খেতে বললে গিরীন কি বলবে—এসব কোনও কথাই তাঁর মনে পড়ল না।

সকাল থেকেই খুশিতে ভরে আছে তাঁর মন, তাই অন্য কারও কথা ভাববার সময় পেলেন না।

জিগ্যেস করলেন, কবে আসবে বলো।

—রবিবার। অবিনাশ ডাক্তারই কথা দিয়ে দিল প্রভাকরের হয়ে। —বলছেন যখন মাস্টারমশাই, চলে আসুন রবিবারে।

শেষ পর্যন্ত সে-কথাই ঠিক রইল। আর বিমলা মুখে হাসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল মাকে। —মা, মা, এই রবিবারে ডাক্তার আর ওই যে জিপে করে আসে...ওরা দু'জনে এখানে খাবে।

—খাবে? আকাশ থেকে পড়লেন নিভাননী।

বিমলা হেসে বললে, হ্যাঁ শুনে এলাম, বাবা নেমন্তন্ন করল ওদের...এই রবিবারে!

নিভাননী কোনও কথা বললেন না। শুধু একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন।

নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগল তাঁর। দুটো লোককে খেতে বলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, এমন কিছু অন্যায় করেননি। সত্যিই তো, প্রভাকর ছেলেটি এই এত বেলায় ফিরে যায়, কখন স্নান করে, কখন খায় তার ঠিক নেই, পারলে আজই খেয়ে যেতে বলতেন নিভাননী। তাকে যদি একটা দিনের জন্যে খেতে বলেই থাকেন গিরিজাপ্রসাদ, এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। তবু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলেন। মোহনপুরের বউ শুনলে না জানি কি কাণ্ড করে বসবে! আর গিরীন?

বনপলাশিতে আসার পর থেকে যেন শান্তি নেই তাঁর মনে। প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্ক, প্রতিটি পদক্ষেপ ভেবেচিন্তে, কোন্ কথাটা কি ভাবে নেবে মোহনপুরের বউ, কোন কাজটার কি অর্থ করবে!

তবু না বলে পারলেন না নিভাননী। নাকি, ইচ্ছে করেই, সেই নৃশংস আনন্দটা উপভোগ করার জন্যেই বললেন, প্রভাকর আর ডাক্তার এই রবিবারে এখানে খাবে, মাছটাছ ধরাতে হবে, বলো ঠাকুরপোকে।

মোহনপুরের বউ শুনল কথাটা, স্থির চোখে তাকিয়ে রইল নিভাননীর মুখের দিকে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, সে কথা নিজের মুখেই বলবেন।

নিভাননীও রুষ্ট গলায় উত্তর দিলেন, বলতাম, কিন্তু ঠাকুরপো যে কখন আসে কখন যায় তার খবরই পাই না। দেখা হলে তবে তো বলব।

মোহনপুরের বউ এবার আরও চটে গেল। বললে, কাজের মানুষদের পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ছুটতে হয়, ঘরে বসে বসে তামাক খেলে তো চলে না।

নিভাননী আর কোনও কথা বললেন না। ভাবলেন, গিরীনকেই বলবেন।

কিন্তু তা আর বলতে হল না। দুপুরে গিরীন যখন ভাত খেতে এল, মোহনপুরের বউ-ই উষ্মার স্বরে বললে, এ ঝামেলা আমি আর পোয়াতে পারছি না। ওদের রান্নাবান্নার আলাদা ব্যবস্থা করতে বলো।

—কেন? বুঝতে না পেরে থালা থেকে মাথা তুলল গিরীন।

—কেন আবার! ওদের সাতগুষ্ঠির রাঁধোবাড়ো, আবার এখন একে-ওকে নেমন্তন্ন করতেও শুরু করেছে।

একে একে সব খুলে বললে মোহনপুরের বউ। সব শুনে গিরীন বললে, সে ভালই হয়েছে!

—ভালই হয়েছে? বিস্মিত না হয়ে পারে না মোহনপুরের বউ।

গিরীন হেসে বললে, প্রভাকরের বাপের কাছে তো যাব, কিন্তু শিক্ষিত উপার্জনক্ষম ছেলে, বাপ কি বলবে তা তো জানাই।

—কি বলবে?

—বলবে, ছেলের পছন্দই পছন্দ, আমার মতে কি আর বিয়ে হবে!

মোহনপুরের বউয়ের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। বললে, তা হলেও তো বাঁচা যায়। অট্টামা তো বলছিল...

গিরীনও হাসল। বললে, দাদা ওদের খেতে বলে ভালই করেছে, বুঝলে। মতামতটাও একটু টের পাওয়া যাবে, আর বাপকেও ওর বলা যাবে, ছেলে মেয়ে দেখেছে।

মোহনপুরের বউয়ের মুখে তৃপ্তির হাসি নামল। বললে, তা হলে শুক্কুর-শনি করে একদিন বদ্দমান যাও, দু-একটা তরিতরকারি...

গিরীন বললে, হ্যাঁ জেলেদেরও খবর দিয়ে রাখতে হবে।

একটু আগেই যে-কথাটা শুনে রীতিমত চটে গিয়েছিল মোহনপুরের বউ, এখন সেটাতেই যেন তার সবচেয়ে উৎসাহ।

এমনকি টিয়াকেও খবরটা না শুনিয়ে পারল না। বললে, রুপোর বাসনগুলো মেজে রাখতে হবে টিয়া। এই রবিবারে আবার প্রভাকরকে খেতে বলা হয়েছে।

খবরটা গর্ব করারও। বি ডি ও সাহেব, যার কাছে কত সব গ্রামের লোক গিয়ে ধর্না দিয়ে বসে থাকে এটা-ওটার জন্যে, সেই মানুষটা রায়বাড়িতে আসবে, খাবে, সুতরাং পাঁচজনকে না জানিয়ে থাকবে কি করে মোহনপুরের বউ।

দেখতে দেখতে তাই খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর তা শুনে লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির হল অট্টামা।

দুপুরবেলায় দাওয়ার রোদে বসে বসে একটা কুলোর পিঠে বড়ি দিচ্ছিল মোহনপুরের বউ, আর টিয়া পাশে বসে শিলের ওপর ডাল বাটছিল। মুখে তার হাসি লেগে ছিল এক টুকরো, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে মা'র সঙ্গে গল্প করছিল টিয়া। ও কোনও দিন ভাবতেই পারেনি, প্রভাকর এ-বাড়িতে আসবে, খাবে। তাই খবরটা আভাসে জেনে থেকে মনটা গুনগুন করে উঠছিল ওর। নিজের মনেই কত কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। আর ভাবছিল, খবরটা শুনে রাঙাবউদি, রেণুদি—সবাই কি ভাববে, কি বলবে তাকে। না, কিচ্ছু বলবে না ও নিজে থেকে। যেদিন আসবে প্রভাকর সেদিন কারও না কারও কাছে ওরা নিজেরাই হয়তো শুনতে পাবে। কিন্তু প্রভাকর কেন আসছে, কে নিমন্ত্রণ করল, কিছুই খুঁজে পায় না টিয়া। এক একবার ইচ্ছে হয় মাকে জিগ্যেস করে, কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জা পায়। মা যদি বুঝতে পারে! তবু, মনে মনে ভাবতে ভাল লাগে, প্রভাকর আসছে তার জন্যেই। তা না হলে হঠাৎ আসবে কেন! এক একবার সন্দেহ হয়, প্রভাকর কি তাকে দেখতে আসছে? মেয়ে দেখতে? বিয়ের একটা কথা বলেছিল বটে অট্টামা, সেদিন দরজার আড়াল থেকে তার কানে গিয়েছিল। রাত্রে শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতেও একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর চোখ বুজে বুজেই শুনতে পেয়েছিল বাবা-মা তার বিয়ের কথাই বলাবলি করছে, প্রভাকরের সঙ্গে বিয়ের কথা। তবে কি বাবা-মা'র সেই জল্পনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, সত্যিই মেয়ে দেখতে আসছে প্রভাকর?

নিজের মনে মনেই একটা স্বপ্ন গড়ে তুলছিল টিয়া শিলের ওপর ডাল বাটতে বাটতে। আর মোহনপুরের বউ মাঝে মাঝে বাটা-ডালটা একটা বাটিতে তুলে নিয়ে সেটা ফেনাচ্ছিল।

এমন সময় বাইরে থেকে অট্টামার গলা ভেসে এল।—কই লো মোহনপুরের বউ? বলি ভেতরে ভেতরে অ্যাদ্দূর এগুলি, আর আমায় একটা কথাও কইলি না লা?

বলে লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে এল অট্টামা লাঠির ডগায় ভর দিয়ে। তারপর মোহনপুরের বউ আর টিয়া দু'জনকেই দেখতে পেয়ে বাঁ হাতটা কাপড়ে আড়াল রেখে ফোকলা মুখে এক মুখ হেসে বললে, আহা হা, বিটির তোর মুখের হাসি দেখ লা মোনপুরের বউ। বলে, কেউ নাচে ধনে জনে, কেউ নাচে বোঁচা-নাকে।

টিয়া হেসে বললে, আমার কি বোঁচা-নাক নাকি অট্টামা?

অট্টামা পৈঠের ধাপে বসে পড়ে লাঠিটা নামিয়ে রাখল। কি যেন লুকিয়ে রাখলে কাপড় ঢাকা দিয়ে। তারপর বললে, ওঁচা নাক না বোঁচা নাক সে বিচার করবে নাতজামাই এসে, আমরা তার কি জানি!

তারপর টিয়ার মাকে উদ্দেশ করে বললে, ধন্যি মেয়ে বটিস মোনপুরের বউ, খপর দিলাম আমি, আর তলে তলে অ্যাদ্দূর এগুচ্ছিস, আর আমার কিনা...

মোহনপুরের বউ হেসে বললে, না গো না, সে-সব কিছু নয়। বলে টিয়ার দিকে ফিরে

বললে, বিশু কাঁদছে বোধহয়, দেখে আয় তো মা।

টিয়া মৃদু হেসে উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলে, অট্টামার সঙ্গে কোনও গোপন পরামর্শ আছে, তাই টিয়াকে সরিয়ে দিল মা।

টিয়া চলে যেতেই অট্টামা বললে, তবে যে ডাক্তার বললে, অবিবারে পেভাকর আসবে...

মোহনপুরের বউ হেসে বললে, সে এমনি। তেমন কিছু খপর হলে তুমিই আগে জানতে পারবে।

অট্টামা বললে, তবু ভালো। তাই ভাবছি, যার দৌলতে চুয়াচন্দন তারই পাতে খোলার ব্যঞ্জন! খপর দিলাম আমি, আর পেভাকর আসছে মেয়ে দেখতে সে-খপর মোনপুরের বউ আমায় দেবে না?

মোহনপুরের বউ হেসে ফেলে বললে, কোথায় কি, মেয়ে দেখতে আসবে ক্যানে? ও বটঠাকুর খেতে বলেছে তাই...

বটঠাকুরের নাম শুনেই অট্টামা গলার স্বর নামিয়ে বললে, হ্যাঁ রে, শুনছি বড়জায়ের সঙ্গে নাকি খুব খিটিমিটি হচ্ছে তোদের!

মোহনপুরের বউ শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল। কথা বললে না।

অট্টামা বললে, তবে আগে থেকে পেথক হয়ে যা না বাপু।

মোহনপুরের বউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাই তো ভাবছি। এই বিয়ে বিয়ে বলছ, সম্বন্ধ আনলেও কি টিকবে ভেবেছ, দেবে ভাঙিয়ে। মেয়ে দেখতে যদি কেউ আসেও ওই বিমলার মত বিদ্যেধরী সামনে ফরফর করে ঘুরে বেড়ালে কার চোখে লাগবে বলো টিয়াকে!

অট্টামা ফোকলা মুখে হা হা করে হেসে উঠে বললে, দাদা যে মরল তা তো ভাবি না, যমে যে বাড়ি চিনল। তোর হয়েছে তাই। বেশ তো, ওদেরটা পার হলেও তো শান্তি, সেও তো তোদেরই দেখতে হবে!

মোহনপুরের বউ মুখ ব্যাজার করে বললে, নিজের পারি না, আবার পরের চিন্তে!

অট্টামা এবার লাঠিটা তুলে নিয়ে উঠে পড়ল। বাঁ হাতটা তেমনি কাপড়ে ঢেকে রেখে বললে, যাই দেখি, পেসাদ উঠল কিনা।

বলে ঠুক ঠুক করে বিমলাদের ঘরের দিকে চলে গেল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই ডাকলে, কই লো বিমলে, পেসাদ উঠেছে?

ভিতর থেকে সাড়া পেয়ে ঘরের ভেতরই ঢুকে পড়ল অট্টামা। তারপর কাপড়ের আড়াল থেকে বাঁ হাতটা বের করলে।

হাতে দুটো কচি কচি শশা। বললে, বিন্দে সাঁইদের মাচায় হয়েছিল, দিলে আমায়। বললে, দুটো শশা তুমি নিয়ে যাও অট্টামা। তা আমার কি আর দাঁত আছে রে ভাই, না খেতে সোয়াদ আছে? তাই নিয়ে এলাম পেসাদের জন্যে।

বলে শশা দুটো বিমলার হাতে দিলে অট্টামা। বললে, মুড়ির সঙ্গে দিস লো পেসাদকে। ভুলে যাস না যেন।

নিভাননী বললেন, ডেকে দে না বিমলা তোর বাবাকে।

অট্টামা সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করলে হাত নেড়ে। না-না-না, ঘুমুচ্ছে বেচারি ঘুমুক।

বিমলার মনের মধ্যেও এদিকে একটা মধুর গুনগুনুনি দেখা দিল, সেদিন সকাল থেকেই। গ্রামে আসার পর থেকে দিনের হিসেব ভুলে গেছে বিমলা। সব বারই রবিবার।

তবু মনে মনে হিসেব রাখতে ভোলেনি সে। শনিবার থেকেই বার কয়েক মনে

পড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে পারেনি, কোথাও একটা সংকোচ বোধ করেছে, তাই গিরীনকে কখনও জিগ্যেস করেছে, আজ কি বার কাকা ? কখনও বাবাকে বলেছে, তোমার যা ভুলো মন, লোকটাকে খেতে বলেছ মনে রেখো।

গিরীন অবশ্য শেষ অবধি ভুলে যায়নি। শনিবার বর্ধমান থেকে দই মিষ্টি তরিতরকারি নিয়ে এসেছে। ভোরবেলায় উঠেই খোঁজ করেছে, জেলে এসেছে কিনা।

নিজেই তাদের নিয়ে গেছে ছোট গোড়ে পুকুরটায়। বলেছে, সের পাঁচেকের একটা মাছ ধরে দে তাড়াতাড়ি।

বিমলা নিজেও গেছে পিছনে পিছনে। অমরেশ আর কমলাও, তারপর মাছ নিয়ে ফিরে আসতেই মোহনপুরের বউয়ের মুখেও হাসি ফুটেছে।

ছাই নিয়ে বড় বঁটিটা ফেলে বসেছে, মাছ কুটতে কুটতে অমরেশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে মাছের। কবে কোন পুকুরে কত বড় মাছ ধরা হয়েছিল, কোন পুকুরের মাছের স্বাদ সবচেয়ে ভাল।

এত কাজের মধ্যে বিরক্ত আর বিব্রত মুখেও মোহনপুরের বউয়ের হাসি ফুটে ওঠে যখনই ঘরে বড় মাছ আসে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা তেমন সাধারণ নয়। ভিতরে ভিতরে যে নতুন একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। একটা সুন্দর আশা !

প্রভাকরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোয় যেন তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তবু সাহায্য করার জন্যে নিভাননীও ছুটে আসেন। এমন যজ্ঞির ব্যাপার, মোহনপুরের বউ একা পারবে কেন।

দুই জায়ে পরামর্শ চলে কি কি রান্না হবে, মাছের ক'টা পদ। টিয়াকে দেখে বিমলা আর কমলাও রান্নাঘরে গিয়ে ভিড় করে, এটা-ওটা করে দেয়।

এক ফাঁকে গিরিজাপ্রসাদের কাছে এসে নিভাননী বলেন, যাই বলো, লোক মন্দ নয় ছোটবউ। তুমি প্রভাকরকে নেমন্তন্ন করেছ শুনে আমিই সেদিন ভয়ে মরছিলাম, না জানি কি রাগারাগি করবে।

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বলেন, গিরীনকেও দেখ, দাদার মর্যাদা রাখার জন্যে সেই বর্ধমান গিয়ে সব দই মিষ্টি কপি-টপি নিয়ে এল তো।

গিরিজাপ্রসাদ আর নিভাননী দেখেন আর মনে মনে খুশি হন। মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে দিনে দিনে যত কিছু আক্রোশ আর অভিমান সব যেন উবে গেছে।

বিমলা কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে উঁকি দিয়ে আসে বাংলাবাড়ির দিকে। কখনও খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে দূরের মেঠো রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দেখে।

ক্রমশ বেলা বাড়ে। আর একসময় বিমলা দেখতে পায় অবিনাশ ডাক্তার আর প্রভাকর আসছে। দু' বগলে দুটো ক্রাচ এঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে ডাক্তার, আর পাশে পাশে প্রভাকর।

বিমলা দেখতে পেয়েই এক মুখ হেসে ছুটে গিয়ে গিরিজাপ্রসাদকে খবর দিয়ে আসে। তারপর কম্বলটা পেতে দেয় বাংলাবাড়িতে।

ইতিমধ্যে প্রভাকর আর ডাক্তার দু'জনেই এসে পড়ে। চোখোচোখি হয় প্রভাকরের সঙ্গে। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয় প্রভাকর। বিমলাও।

পরস্পর পরস্পরের চোখের দৃষ্টিতে যেন মৌনমুখর কোনও ইশারা দেখতে পায়। মনের গোপনে দু'জনেই বুঝি কোনও তুচ্ছ আশা লালন করেছে।

বিমলার মনের পাতায় যেন নতুন রং ধরেছে, ধরতে শুরু হয়েছে তখন। তাই সময় পেলেই একবার এসে দেখা দিয়ে যায় বিমলা, যে-কোনও তুচ্ছ অজুহাতে।

সারা বাড়িতেই তখন একটা রীতিমত চাঞ্চল্য। প্রভাকরকে ঘিবে সকলেই যেন

ত্রস্তব্যস্ত। সকলেই তাকে খুশি করতে চায়।

গিরিজাপ্রসাদ তখন স্বপ্ন দেখছেন একটা নতুন ইস্কুলের। প্রভাকর খুশি হলে গ্রামে ইস্কুল হবে, গিরিজাপ্রসাদের বেকারজীবন আবার একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে, থেমে থাকা দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির কাঁটা আবার ঘুরতে শুরু করবে। নিভাননী ভাবছেন, গ্রামের লোক যখন তাঁর নামে, তাঁর মেয়ের নামে অপবাদ দিতে চেয়েছে অকারণেই, তখন দেখুক তারা চোখ মেলে, আর জ্বলে পুড়ে মরুক। কি যায়-আসে তাঁর গ্রামের লোকের কথায়! গিরীন আর মোহনপুরের বউ তখন ভাবছে, অতিথি আপ্যায়নে না ত্রুটি হয়। এখন আর প্রভাকরকে তেমন লজ্জাও করছে না মোহনপুরের বউয়ের। শুধু মনে হচ্ছে, অবিনাশ ডাক্তার না থাকলে ভাল হত, নিজে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারতেন প্রভাকরকে।

আর টিয়া? সে বেচারী দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়। মা'র পায়ে পায়ে। এটা-ওটা ফাই-ফরমাশ খাটে। তাতেই যেন আনন্দ। সব কাজ তো প্রভাকরের জন্যেই। তাই দু পুরুষ আগেকার ময়লা-জমা রুপোর থালা বাটি পরিষ্কার করতে করতে স্বপ্ন দেখে মনে মনে।

বাংলাবাড়িতে গিয়ে বসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। গিরীনও প্রায়ই গিয়ে দেখা দিয়ে আসছে, দু-চারটে কথা বলছে।

এদিকে ভিতর-বাড়িতে তখন রান্না শেষ হয়ে এসেছে। বেলাও হয়েছে অনেক। বিমলা বোধহয় ওদের স্নান হয়েছে কিনা দেখতে যাচ্ছিল। মোহনপুরের বউ বললে, রান্না হয়ে গেছে, জায়গা কর।

বিমলা যাবার আগেই টিয়া ছুটে গেল। —উলের আসন দু'খানা তুরুঙ্গ থেকে বার করে আনব মা? জিগ্যেস করল।

· মোহনপুরের বউ সায় দিলে।

একটু পরেই আসন দুটো নিয়ে এল সে। দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরের দাওয়ায় আমগাছটার ছায়া পড়েছে তখন। মাটির দাওয়াটা ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করে আসন দু'খানা পেতে দিল টিয়া, রুপোর সরু সরু গ্লাস দুটোয় জল এনে রাখলে, তারপর দু'খানা কম্বলের আসন পেতে কাঁসার গ্লাসে জল।

এমন ধীর হাতে সযত্নে প্রত্যেকটি কাজ করে যায় টিয়া, যেন তার কাজের মধ্যে দিয়েই গোপন আশাটুকু ব্যক্ত করতে চায়।

মোহনপুরের বউ মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তার। মনে মনে ভাবে, এ মেয়েকে নিশ্চয়ই পছন্দ হবে প্রভাকরের। সত্যি, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে আবার কয়েক বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত।

আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে এবার ডাকলে টিয়াকে। —শোন।

টিয়া ছুটে এল।

বললেন, জেঠিমাকে বল, ওদের এইবার ডেকে পাঠাতে। আর...

টিয়া থেমে দাঁড়াল।

মোহনপুরের বউ মৃদু হেসে বললে, লোকে দেখলে বলবে কি, কাপড়টা বদলে নে গে। আর চুপ করে এসে এইখানে বসবি, হুটহাট করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হোস না।

মুহূর্তে টিয়ার মুখটা চুপসে গেল মা'র কথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে ও চলে গেল জেঠিমাকে খবর দিতে।

গিরিজাপ্রসাদ আর গিরীনও বসল প্রভাকরদের সঙ্গে। মোহনপুরের বউ ঘোমটা টেনে একটার পর একটা থালা বাটি এনে দাঁড়ায় কপাটের আড়ালে, আর নিভাননী তার হাত

থেকে নিয়ে এসে নামিয়ে দেন। বিমলা আর কমলা সামনে বসে জিগ্যেস করে কে কি চায়, কখনও-কখনও নিজেরাই উঠে গিয়ে এনে দেয়।

রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে বসে টিয়া এটা-ওটা এগিয়ে দেয় তাদের হাতের কাছে। মা বারণ করেছে, তাই একবার উঠে গিয়ে দূর থেকে দেখে আসতেও ওর ভয়। শুধু কি ভয় ? লজ্জাও।

একে একে খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেল ওদের।

গিরিজাপ্রসাদ বিমলাকে বাংলাবাড়িতে দুটো বালিশ দিয়ে আসতে বললেন। প্রভাকরকে বললেন, এই রোদ্দুরে যেতে হবে না প্রভাকর, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, রোদ পড়লে চা খেয়ে যাবে।

প্রভাকর চোখ তুলে একবার গিরিজাপ্রসাদ, একবার অবিনাশ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালে, তারপর বিমলার অনুনয়ভরা চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মাথা নিচু করে সম্মতি জানালে।

প্রভাকরের মনের মধ্যেও তখন একটা নেশা ঘুরতে শুরু করেছে। বিমলাকে ঘিরে।

বাংলাবাড়িতে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকার চেষ্টা করল প্রভাকর। কিছুক্ষণ আগেই বিমলা পান দিয়ে গেছে। প্রভাকর আশা করছিল বিমলা আবার আসবে।

কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে কখন যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল টেরও পায়নি সে। বিকেলের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলে বিমলা চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। নাকি বিমলার হাতের স্পর্শ পেয়েই ঘুম ভেঙে গেছে তার !

প্রভাকরের দিকে তাকাল বিমলা, আর একবার ডাক্তারের ঘুমন্ত মুখের দিকে।

প্রভাকর উঠে বসল, তাকাল বিমলার মুখে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে। হাত বাড়িয়ে বিমলার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকল। প্রভাকর আর বিমলা দু'জনেই যেন মুহূর্তের জন্যে হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গেল। দু'জনের চোখই যেন পরস্পরকে লজ্জা পেল এই স্পর্শের অনুভূতিতে।

বিমলার সমস্ত শরীরে যেন একটা বিচিত্র শিহরন খেলে গেল। ভয়, বিস্ময়, আনন্দ !

হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এল বিমলা, ভিতর-বাড়িতে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে। না, কেউ কোথাও নেই। সকলেই ঘুমিয়ে আছে। শুধু টিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রুপোর থালাবাসনগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ঘসে ঘসে পরিষ্কার করছে একমনে। আর কি যেন ভাবছে !

আঠারো

দেখতে দেখতে পুজোর দিন ঘনিয়ে এল।

সকাল হলেই বুড়ি অট্টামা লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির হয় কালীতলায়। গাঁয়ের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও ভিড় করে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্‌গ্রীব বড় বড় চোখ মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

কবে সেই চাটুজ্যেরা কালীতলার ঘর দু'খানা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল, বেঁধে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল সামনের চত্বরটা। তারপর থেকে আর খড়ি পড়েনি দেয়ালে, চুনসুরকি খসে খসে পড়েছে। এখানে ওখানে দেওয়ালের গায়ে বট-অশ্বত্থের চারা গজায়, গরুতে খেয়ে দেয় তাই রক্ষে তা না হলে কবে দেয়াল ভেঙে পড়ত। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে লোকের পায়ে পায়ে সামনের চত্বরটা জলকাদায় প্যাচ প্যাচ করে। ক'বছর

ধরেই চেষ্টা হচ্ছে ইঁট পেতে দিয়ে সিমেন্ট করাবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই জল্পনা-কল্পনাই হয়।

অট্টামা মাঝে মাঝে বলে, অ গুপেন, কালীতলাটা বাবা শান বাঁধিয়ে দে তোরা, বুড়ো মানুষ কবে পা হড়কে পড়ে মরব, সেই ভালো হবে!

গোপেন মোড়ল শুনে হাসে। বলে, হবে, হবে!

অট্টামা সান্ত্বনা পায় না সে কথায়। বলে, ও তোমার পাঁচজনে মিলে হবে না, তুই দে বাবা, ওটুকু বিলিতি মাটি ফেলে বাঁধিয়ে দে!

গোপেন মোড়ল হাসে। —অত টাকা কোথায় গো!

—হেই মা! গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে অট্টামা, ফোকলা মুখে হেসে উঠে বলে, রিদয় মোড়লের বেটার কথা শোনো। সেবার, আমরা সব পোষলা করতে বেরিয়েছি। উপুরঝুপুর বৃষ্টি, কালীতলা থেকে ফিরতে পারি না এমন কাদা। তোর বাপ করলে কি জানিস, মুনিশ দিয়ে পাঁচ বস্তা তুশ ঢেলে দিলে কাদা মারতে!

গোপেন হেসে বললে, সেই সব লবাবির জন্যেই তো আজ এই হাল হয়েছে গো অট্টামা।

অট্টামা আপত্তি করে বলে, ও কথা বলিস না গুপেন, মানুষের দেয়া কুলোয় না, ভগবানের দেয়া ফুরোয় না। তোর বাপের তো কই কোনও অভাব ছিল না বাবা।

গোপেন কোনও জবাব দেয় না, মনে মনে শুধু বলে, বাপকে বোকা পেয়ে যা পেরেছ করিয়ে নিয়েছ, তা বলে আমাকে অত বোকা পাওনি।

অট্টামা অবশ্য শুধু গোপেনকেই নয়, যাকে কাছে পায় তাকেই বলে—হংসকে, গিরীনকে, এবার পেসাদকেও বলবে। শুধু দুর্গাপুজোর সময়েই নয়, কালীপুজোয় পাঁঠা বলির রক্তে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলেও ওই একই দশা।

কালীতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব কথাই ভাবছিল অট্টামা, আর মনে পড়ছিল ফেলে-আসা-জীবনের সেই সব দিনগুলোর কথা। ওই বাচ্চা ছেলেগুলোর মত অট্টামাও যখন বড় বড় চোখ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখত কুমোরদের কারসাজি।

এখন আর তেমন ধানও নেই, ধ্যানও নেই। তেমন কুমোরও আসে না আজকাল, তেমন পিতিমেও হয় না।

বেদির ওপর খড়ের গায়ে মাটি লেপছে কুমোরের দল। একমেটে শেষ হয়ে এসেছে।

বাচ্চা ছেলেগুলো আবদার করে, গণেশের ইঁদুরটা করো না আগে।

কেউ বলে, মৌরটা আগে করো।

কুমোরের দল কান দেয় না সেসব কথায়, এক একবার বিরক্ত হয়ে ছেলেগুলোকে তাড়া করে। তারা ছুটে পালায় হাসতে হাসতে, আবার আসে।

অট্টামার মনে পড়ে সেই সব আগেকার দিনগুলো। খাওয়া-দাওয়া ভুলে সকাল-সন্ধে সব দাঁড়িয়ে থাকত দিনের পর দিন। দেখত, চোখের সামনে কেমন একে একে হাতের আঙুল, নাক মুখ চোখ, চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠত প্রতিমার।

এদের মত কুমোরের দল তখন দু'দিন কাজ করেই অন্য গাঁয়ে পালাত না। প্রথম থেকে শেষ অবধি থাকত, কাজ সেরে তবে ছুটি নিত। এখন আর পুজোয় প্রাণ নেই যেন। সব ব্যবসাদার হয়ে গেছে, মনে মনে ভাবে অট্টামা। দশটা কাজ একসঙ্গে হাতে নেয়, একমেটে করেই আবার পালাবে, হঠাৎ একদিন এসে দোমেটে করবে। তারপর আবার একদিন হয়তো রং করবে প্রতিমার গায়ে, ঘামতেল দেবে। ডাকের সাজ—তাও ক্বচিৎ কদাচিৎ হয়। ও-সবের নাকি অনেক খরচ।

লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর টাটিয়ে ওঠে, লাঠি নামিয়ে বসে পড়ে অট্টামা।

ছেলেগুলোকে বলে, মা দুগ্‌গার পুজো তোরা আর কি দেখলি মানিক। এখন আর পুজো বলে মনেই হয় না।

সত্যি, তখন এমনভাবে ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দিত নাকি কুমোররা! বরং ডেকে ডেকে কাউকে সাপ, কাউকে ইঁদুর, প্রজাপতি, টিকটিকি সব গড়ে দিত কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে অট্টামা। কুমোরদের বলে, ডাকের সাজ না হলে মানায় না মাকে, বুঝলে গা।

কুমোররা হাসে। বলে, টাকা না দিলে কি ডাকের সাজ হয় মা।

কখনও অট্টামা বলে, তখন সব কুমোর আসত, পিতিমে গড়া শেষ করে, মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তবে ছুটি নিত। তোমাদের মত এমন খেপে খেপে কাজ করে পালাত না।

কুমোররা হেসে বলে, তখন যে একটা গাঁয়ের পিতিমে গড়েই পেটের ভাত জুটত!

টাকা আর পেটের ভাত! এ ছাড়া যেন কথা নেই। কই, তখন তো এসব কথা তারা বলত না। অট্টামার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মা দুগ্‌গার প্রতিমা গড়ছে, এ কি কম পুণ্যির কথা! তাদের মুখে পেটের ভাতের কথায় মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। চোখের সামনে কাঠের পাটায় খড়ের মেড় বাঁধা হল, তার ওপর মাটি, একমেটে, দোমেটে, রং-সাজ...এ যে কি আনন্দ। ভাশুরের ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে ননীকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে যেদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বিয়ে দিলে সেদিন যেমন আনন্দ হয়েছিল, এও যেন তেমনি!

বসে থেকে থেকে কুমোররা যখন পুকুরে ডুব দিয়ে খেতে গেল তখন উঠল অট্টামা। লাঠিটা তুলে নিয়ে ঠুকঠুক করে বাড়ির পথ ধরলে। ভাবলে, আর ক'টা দিনই বা আছি। পেসাদকে একবার ডাকের সাজ করাতে বললে হয়।

পরমুহূর্তেই কি ভেবে মাঝপথেই থমকে দাঁড়াল। না, গিরিজাপ্রসাদকে বলা উচিত হবে না। কি ভাববে পেসাদ কে জানে। হয়তো ভাববে মাথা খারাপ হয়ে গেছে অট্টামার। তা না হলে কালীতলা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন তার। যেন একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে বলেই সব কিছু ভুলে যেতে হবে। রক্ত-মাংসের মানুষ তো অট্টামা, ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা ভুলবে কি করে! কালীতলায় দাঁড়িয়ে পুজো দেখতে দেখতে এখনও নেশা হয় যেন।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে অট্টামা। পুরনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে যায়, স্বামীর কথা, ভাশুরের ছেলেমেয়েদের কথা। আর বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কথা বলার লোক পেলেই মুখর হয়ে ওঠে অট্টামা। হাসে, কথা বলে অনর্গল। অপরের আনন্দ দেখে নিজেও আনন্দ পায়। কিন্তু একা হলেই দুঃখে বেদনায় মুসড়ে পড়ে। সমস্ত বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে।

গিরিজাপ্রসাদ ভাবে, বংশী ভাবে, তেমন মানুষটা কেমন করে এমন হয়ে গেল। দিনরাত যার চোখ দুটো ছলছল করত কোনও এক লুকোনো ব্যথায়, বুড়ো হয়ে এমন হয়ে গেল কি করে সে।

অট্টামা নিজেও হয়তো ভাবে কখনও-কখনও। আর নিজের মনকেই বলে, বদলে কি আর গেছি আমি? না, বদলায়নি। হাসি ঠাট্টা আর অনর্গল কথার আড়ালেই বুঝি নিঃস্ব জীবনটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে।

নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে কখন যে কোটালপাড়ার দিকে ঠুক ঠুক করে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে অট্টামা, নিজেই টের পায়নি।

উদাসের বউয়ের চিৎকারে চমক ভাঙল।

পুকুর পাড়ে চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে শুনল অট্টামা। দূর থেকে উঁকি দিল বংশীর বাড়ির দিকে।

দেখলে, উদাস সাইকেলটা মাটিতে ফেলে বসে বসে কি করছে, আর উদাসের বউ লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে।

বংশীকে কি যেন বলতে এসেছিল অট্টামা। লক্ষ্মীমণির চিৎকার শুনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরল।

বাবলার কাঁটা লেগে সাইকেলের চাকা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। তাই বসে বসে সারাচ্ছিল উদাস। আর লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছিল।

পয়সাকড়ি দেবার নাম নেই, সংসারের ওপর এতটুকু মায়া নেই ; আর লক্ষ্মীমণির কোলে একটা ছেলেও দেয়নি উদাস। তাই সদাসর্বদাই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে থাকে।

কিন্তু এমন তো ছিল না উদাস। পদ্মকে দেখার পর লক্ষ্মীমণির মেজাজও যেন আরেক পর্দা চড়ে গিয়েছিল।

বনপলাশিতে উঠে এল পদ্ম আর পদ্মর বাপ পাঁচু কোটাল। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এল বংশীর সঙ্গে।

সেই প্রথম পদ্মকে দেখল উদাস। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতর পর্যন্ত একটা মোচড় দিয়ে উঠল। এ যেন সোনা ফেলে দিয়ে ধুলোমুঠি আঁচলে বাঁধার মত। চেয়ে চেয়ে পদ্মর রূপ দেখল উদাস, তার হাসি, তার কথা বলার ঢঙ। এমন মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছিল বংশী ! অথচ মেয়েটাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে চায়নি উদাস। ড্রাইভারির নেশায় তখন ডুবে আছে ও। ভেবেছে, লক্ষ্মীমণিকে বিয়ে না করলে ড্রাইভারি শেখার সুযোগ কেড়ে নেবে লক্ষ্মীমণির বাপ।

পদ্মর মনেও একটা কৌতূহল ছিল। বাপের কাছে শুনেছিল ও, বনপলাশির উদাস কোটালের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

মনে মনে তা নিয়ে এক-আধটু স্বপ্নও হয়তো দেখেছিল।

পাশের গাঁয়ে মামার বাড়িতে গিয়েছিল ও। হঠাৎ খবর এল উদাস আর তার বাপ এসেছে মেয়ে দেখতে। গাড়ি জুতে তখনই পদ্মকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার মামা।

কিন্তু এসে পৌঁছোল যখন, শুনলে, উদাস চলে গেছে। মেয়ে দেখবে না সে, বিয়ে করবে না এখানে।

সেদিন কথাটা শুনে মনে আঘাত পেয়েছিল পদ্ম। ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে, সে দেখতে রূপসী, কোটালদের ঘরে এমন মেয়ে মেলে না। যেমন তেমন মেয়ে পেতেও যেখানে মুঠো মুঠো টাকা লাগে, সেখানে তার মত মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না উদাস, ভাবতেই পারেনি পদ্ম।

কি আছে উদাসের ! ড্রাইভারি শিখছে এই যা। উদাসের বিয়ের খবরটাও পদ্মর কানে গিয়েছিল, আর তাই লক্ষ্মীমণিকে দেখার এত উৎসাহ। ভেবেছিল, না জানি পদ্মর চেয়েও সুন্দর বুঝি। তা না হলে পদ্মকে ফেলে সে-মেয়েকে বিয়ে করবে কেন উদাস।

আর, আর ভিতরে ভিতরে উদাসের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার বাসনাও যেন জেগে উঠল পদ্মর মনে।

তাই সময় পেলেই এসে হাজির হত ও উদাসের কাছে। গ্রাম্য সম্পর্ক টেনে লক্ষ্মীমণিকে বলত, বুন। আর উদাসকে ডাকত বোনাই বলে। ঠাট্টা রসিকতা লেগেই

থাকত মুখে।

ভোরবেলাতেই একবার টুঁ মেরে যেত। বলত কি গো বোনাই, নেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছো নিকি? বলি বুনটাকে আমার ছেড়ে দাও গো, ওর কাজ আছে অনেক।

কখনও ঘরে গিয়ে উঁকি দিত। লক্ষ্মীমণিকে বলত, রোদ উঠল মাথার ওপর, আর ফিসফিস করিস না লো।

সব ব্যাপারেই রসিকতা করে কথা বলত পদ্ম। আর রাগে জ্বলে যেত লক্ষ্মীমণি। উদাসও রাগত ; তবু বলত না কিছু।

রাগ হবারই তো কথা। মনের মিল নেই যাদের, দু'জনে দু'জনকে যখন একেবারেই সহ্য করতে পারে না, তখন কেউ পিরিত ভালবাসা নিয়ে রসিকতা করলে চটে উঠবে না?

উদাস কোনও কোনও দিন আড়ালে বলত, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ো না পদ্ম, বুকের জ্বালাটা তোমার ব্যঙ্গ শুনে আরও দপ করে ওঠে।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠত পদ্ম। বলত, লটের মতন কথা কইছ, তুমি বোনাই। বুকের জ্বালাটা কিসের বটে, শুনি।

উদাস বিষণ্ণ মুখে বলত, সে জ্বালা তুমি বুঝবে না গো, বুঝবে না। ফুলকাঁটার শয্যায় শয়ন আমার, যেদিক পানে ফিরে শুই না ক্যানে, কাঁটা ভুঁকবে গায়ে।

শুনে আরও সশব্দে হেসে উঠত পদ্ম। বলত, বুনকে আমার বলে দোব!

উদাস জবাব দিত, সে আমিই বলি তাকে, লুকোছুপো নেই গো আমার। পষ্ট কথার মানুষ আমি।

কথাগুলো বলার সময় উদাস কোনও কোনও দিন রেগে যেত। আর তা দেখে পদ্ম বুঝতে পারত জ্বালাটা কোথায়। কিন্তু উদাসকে অসুখী দেখে হয়তো খুশিই হত পদ্ম। যেন নিজের অপমানটার প্রতিশোধ নিচ্ছে এমনি ভাবে রসিকতা করত আবার। একদিন তাকে যে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিল উদাস, চোখের দেখাও দেখতে চায়নি, তারই জবাব যেন।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি ধৈর্য ধরে থাকতে পারত না। প্রথম প্রথম পদ্মর ঠাট্টা শুনে উদাসকেই গালাগালি দিত। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে যেন একটা সন্দেহ উঁকি দিতে শুরু করল লক্ষ্মীমণির মনে। এত হেসে হেসে কথা বলে কেন সে উদাসের সঙ্গে। আর উদাসও যেন পদ্ম এলেই খুশি হয়। রসিয়ে রসিয়ে কথা বলে, গল্প করে।

প্রথম প্রথম তাই একটু ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলত লক্ষ্মীমণি, আড় চোখে তাকিয়ে দেখত পদ্মকে আর উদাসকে। হাসি-হাসি মুখে তাদের গল্প করতে দেখত, আর জ্বলে যেত ভেতরে ভেতরে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রাগ চেপে রাখতে পারল না। হাজরাদের বাড়িতে ধান ভাচা নিতে গিয়েছিল সে, ফেরার পথে দেখলে, ঘাটে বসে বাসন মাজছে পদ্ম, আর উদাস তার সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

দূর থেকে দু'জনকে দেখেও কিছু বললে না লক্ষ্মীমণি, মনের রাগ মনেই পুষে রাখলে। ভাবলে, পদ্মকে মুখের ওপরই একদিন বলবে, এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেবে।

আরেকদিন বাড়ি ফিরেই দেখলে, কোলে পুনকো শাকের ঝুড়ি নিয়ে শাক বাছছে পদ্ম ঘরের পৈঠেতে বসে, আর উদাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

লক্ষ্মীমণিকে দেখেই মুখচোখের ভাব বদলে গেল উদাসের। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে ফেটে পড়ল লক্ষ্মীমণি। কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল সে।

বললে, আমার ঘরকে আর আসবি না তুই পদ্ম।

—ক্যানে ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে পদ্ম।

লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে উঠল আবার। —এটা পিরিত করার ঠাঁই লয় তোর, লাগরকে নিয়ে রসের কথা কইতে হয় তো খড়ি লদীর পাড়কে যেয়ে কর।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে, লজ্জায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পদ্ম। তারপর একবার উদাসের মুখের দিকে তাকিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর সেইদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করলে, লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে উদাসকে সে ছিনিয়ে নেবে। উদাসের জন্যে সেই প্রথম যেন একটা সহানুভূতি বোধ করলে। মনে হল, মানুষটার মনে সত্যিই বুঝি কোনও শান্তি নেই।

তারপর থেকেই দিনে দিনে উদাসের ওপর মায়া পড়ে গেছে পদ্মর। মনে হয়েছে মানুষটার মন থেকে দুঃখটুকু যদি মুছে নিতে পারত।

আর উদাস অনুরোধ করে বলেছে, ও ডাইনির কথাটা তুমি কানে নিয়ো না পদ্ম। আমার ঘর আর তোমার ঘর পেথক নয়।

তা শুনে হাসি-হাসি মুখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় সে উদাসের চোখে চোখ রেখে। বলে, আমার নেগে তোমার ঘর ভাঙবে, আমি চাই না বোনাই।

উদাস পদ্মর হাতখানা চেপে ধরে। বলে, ঘর ভাঙুক পদ্ম, আমার ভাঙা বুকটা জোড়া লাগবে। বলে অসহায়ের মত তাকিয়েছে উদাস।

তা দেখে পদ্মর বুকেও ব্যথা লেগেছে, উদাসের অনুনয়ভরা চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

ধীরে ধীরে পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছে, দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়েছে দু'জনে।

তারপর সেই অন্ধকার রাত্রি। গোপনে বেরিয়ে এসেছে উদাস তার ঘর থেকে। এসে অপেক্ষা করেছে পুকুরের পাড়ে, অন্ধকারে।

পদ্মর ছায়া-শরীরটাও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। আর অন্ধকারের মধ্যে দুটি ছায়া আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে গেছে একদিন।

পরদিন থেকেই উদাস জেগে উঠেছে একটা নতুন মানুষ হয়ে। মনের ফুর্তি চাপা রাখতে পারেনি ; দামু পালের আড্ডায় গিয়ে বলেছে, একটা যাত্রা লাগিয়ে দাও দামুদাদা !

এমনিভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীমণিকে এসে বললে উদাস, পদ্মকে আমি বিয়ে করব।

স্তম্ভিত বিস্মিত চোখ তুলে উদাসের মুখের দিকে তাকাল লক্ষ্মীমণি।

উদাস আবার বললে, পদ্মর বাপকে বলেছি, মত দিয়েছে পাঁচু কোটাল।

কোনও কথা বললে না লক্ষ্মীমণি ; কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল উদাস। একটা খ্যাপা বেড়াল যেন রোঁয়া ফুলিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

তারপর লক্ষ্মীমণি হঠাৎ চালা থেকে কাটারিটা বের করে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। পাঁচু কোটালের ঘরের দিকে।

কিন্তু পদ্ম কেন যে শেষ পর্যন্ত উদাসকে একটা কথাও না জানিয়ে চলে গেল, কোথায় গেল, খুঁজে পায় না উদাস।

কালীতলার সামনে দিয়ে যেতে যেতে প্রতিমার দিকে চোখ পড়ে তার। কুমোরের দল মাটি দিচ্ছে প্রতিমার গায়ে। আর ক'টা দিন তো মাত্র বাকি। ওদিকে যাত্রার রিহার্সালি চলছে প্রতি রাত্রে। কিন্তু কই আগের মত কোনও উৎসাহই পাচ্ছে না যেন উদাস।

কার জন্যে গলা ফাটিয়ে অভিনয় করবে সে। কেউ তো মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে না, তোমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করেচে সবাই, তুমি লট বট গো বোনাই, পেকিতো লট !

উনিশ

ষষ্ঠীর দিন ভোর হতে না হতেই ঢাকের আওয়াজে সারা গাঁ মেতে ওঠে। ঢাকে কাঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় সকলের।

সিরসিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে তখন। অন্য সকলের মত লক্ষ্মীমণিও বিছানা ছেড়ে উঠে গোবর জলের ছিটে দেয় উঠোনে। ক'দিন আগেই পাশের গাঁ থেকে রাঙামাটি আনিয়ে রেখেছে সে। টিনের কৌটো থেকে রাঙামাটির ডেলা বের করে জলে গুলে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে দেয়ালে আলপনা আঁকে।

পুজোর এ ক'টা দিন অন্তত উদাসের সঙ্গে ঝগড়া করবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে লক্ষ্মীমণি। আর প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা তার খুশি হয়ে ওঠে।

উঠোনে গোবর লেপে আলপনা এঁকে বেরিয়ে পড়ে সে ঘাটের পথে। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে দাঁড়ায় ভিজে কাপড়ে। তারপর ঘিয়ের বাটি থেকে সামান্য কয়েক ফোঁটা ঘি নিয়ে সিঁদুর গুলে ঘরের দরজায় পাঁচটা ফোঁটা দেয়।

ষষ্ঠীর দিনে কপাটে সিঁদুরের ফোঁটা দিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে লক্ষ্মীমণি। সব রকম চেষ্টাই তো করেছে সে উদাসের মঙ্গলের জন্যে। স্বামীর মন পাবার জন্যে কি করতে বাকি রেখেছে! তবু কেন যে উদাসের মন পায়নি লক্ষ্মীমণি, নিজেও সে খুঁজে পায় না। উদাসের বাপ তাকে ডাইনি বলে, পাড়ার লোক তাকেই দোষ দেয়। আর সেই দুঃখে ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরে লক্ষ্মীমণি। ভাবে, ভগবান তাকে রূপ দেয়নি বলেই উদাস তাকে সহ্য করতে পারে না।

প্রথম প্রথম সন্দেহ হয়নি তার। বরং তার বাপ দশরথ যেদিন কাটোয়ার বস্তির ঘরে উদাসকে নিয়ে এসেছিল, সেদিন উদাসকে ঘিরে কত স্বপ্নই না দেখেছিল। তারপর বিয়ে হল, নতুন সংসার পাতার উল্লাসে সব কিছু দেখেও দেখেনি সেদিন। নাকি উদাস তখন সত্যিই ভালবাসত তাকে, পদ্ম আসার পর থেকেই তাদের মধ্যে এই ভাঙন দেখা দিয়েছে!

না! লক্ষ্মীমণি বেশ বুঝতে পারে, তাকে কোনও দিনই ভালবাসেনি উদাস। কোনও দিনই তাকে পছন্দ করেনি। শুধু নিজের কাজ হাসিল করার লোভেই তাকে বিয়ে করেছে উদাস, ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স জোগাড় করার নেশাতেই বুঝি লক্ষ্মীমণিকে সহ্য করেছে।

কপাটের গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিতে দিতে মনে মনে তবু প্রার্থনা জানায় লক্ষ্মীমণি। বলে, ঘরের দিকে স্বামীর মন ফিরিয়ে দে মা, সংসারের মঙ্গল হয় যেন।

ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেলে লক্ষ্মীমণি। মনে হয়, আসলে দোষ তো তারই। উদাসের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ব্যবহারে সে যদি এমন তিরিক্ষি হয়ে না উঠত! কিন্তু কেন যে এমন হয়, বুঝতে পারে না সে। মনে মনে তাই প্রতিজ্ঞা করে পুজোর এ ক'টা দিন অন্তত ভালভাবে কাটাবে। না স্বামী, না শ্বশুর, কারও সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না।

ভিজে কাপড়টা ছেড়ে লক্ষ্মীমণির হঠাৎ ইচ্ছে হল, ঘুমন্ত উদাসকে তুলে দিয়ে আজ পুজোর দিনে একটা গড় করবে তার পায়ে মাথা রেখে।

উদাস হাসবে হয়তো, ঠাট্টা করবে। তা করুক, তবু—

কাপড় ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে লক্ষ্মীমণি। কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই বিস্মিত

হয়। বিছানায় কেউ নেই।

এদিকে ওদিকে তাকায় লক্ষ্মীমণি। না, কোথাও নেই উদাস। ও যখন পুকুরে ডুব দিতে গেছে, সেই ফাঁকে কখন চুপি চুপি বেরিয়ে গেছে সে !

হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মনটা বদলে গেল, রাগে অভিমানে মন তার বিষিয়ে উঠল উদাসের বিরুদ্ধে।

মিউ মিউ করতে করতে একটা বেড়াল ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, বেড়ার গা থেকে একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে সজোরে সেটা ছুঁড়ে মারল সে বেড়ালটার দিকে।

যেন উদাসের দিকেই ছুঁড়ে মারলে খুশি হত।

ঢাকের আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উদাসের। বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলে, কাছেপিঠে কোথাও লক্ষ্মীমণি নেই। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলে তা দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা নিয়ে দামু পালের বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ল। ভোরের নিস্তব্ধ বাতাসে তখন একটানা ঢাক বেজে চলেছে। বাগদি পাড়ার একটা ছেলেকে দেখলে নাচতে নাচতে চলেছে কালীতলার রাস্তায়। ছেলেটা নাচছে আর চিৎকার করে বলছে, ঢাক কুড়কুড় কুড়, ঢাক কুড়কুড় কুড়।

দেখে হাসল উদাস। মনটা খুশি হয়ে উঠল অকারণে।

তাই দামু পালের বাড়িতে ঢুকেই ফিরুকে কাঁধে তুলে নিল, তারপর নাচতে নাচতে সুর টেনে টেনে বললে, ডাং ডাং ড্যাডাং ড্যাডাং...

হাত-পা নেড়ে এমন ভাব করলে যেন উদাস নিজেও ঢাক বাজাচ্ছে। আর তা দেখে বউঠান তার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

উদাস নাচ থামিয়ে বললে, চা দাও গো বউঠান, ঘুম থিকে উঠেই পালিয়ে এয়েচি।

দামু বললে, বোস বোস, চা দিচ্ছি। তারপর চল, আজ বাঁশ দড়ি নিয়ে আসর বেঁধে ফেলি।

আসর, অর্থাৎ যাত্রার আসর। যাত্রার কথায় উদাসের মনটা মুহূর্তের মধ্যে মুসড়ে পড়ল।

এবার পুজোয় সত্যিই যেন কোনও আনন্দ নেই তার, যাত্রায় কোনও উৎসাহ নেই।

অথচ এবার সময় থাকলে থিয়েটারও করা যেত, দামুদাদা বলেছে। তা থিয়েটার না হোক, চার দিন যাত্রাও আনা যেত অপেরা পার্টির। কিন্তু সব ক'টা ভাল অপেরা পার্টিরই বায়না হয়ে গেছে অনেক আগে থেকে। তবে দামি ড্রেস আনা হয়েছে এবার, ভাল বেশকারী এসেছে। মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন অবনীমোহন।

শুনে সবাই বিস্মিত হয়েছে। অমন কৃপণ মানুষটা হঠাৎ যেন রাতারাতি বদলে গেছে। ইস্কুলের জন্যে টাকা দিয়েছে, বলগাঁর বড় রাস্তার ধারে হাসপাতালের বাড়ি করে দেবে বলেছে, দরাজ হাতে টাকা দিয়েছে গ্রামের বারোয়ারি পুজোয়।

মনে মনে সবাই খুশি হয়। প্রশংসা করে অবনীমোহনের। শুধু গোপেন মোড়ল হেসে বলে, কি ব্যাপার গো দামু, যাত্রার জন্যেও টাকা দিচ্ছে বেনে চাটুজ্যে ?

আড়ালে আড়ালে এতদিন সকলেই অবনীমোহনকে বেনে চাটুজ্যে বলে বিদ্রূপ করত। কিন্তু এখন আর সে বিদ্রূপ যেন দামু পালের ভাল লাগল না। বললে, না গো, মানুষ ভাল উনি, তা না হলে...

গোপেন হেসে বলে, ওর বাবা জিলিপির প্যাঁচ পেটে পেটে ; এমনি দিচ্ছে ? ও আমি নারায়ণ সাক্ষী করে বললেও বিশ্বেস করব না।

কথাটা উদাসের কানে গেল। নারকেলদড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে বাঁধতে গোপেন

মোড়লের দিকে ফিরে তাকাল উদাস। গোপেন মোড়লকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। লোকটা যেন কারও ভাল দেখতে পারে না।

বিরক্ত হয়ে হাতের কাজ ফেলে প্রতিমার দিকে এগিয়ে গেল। ষষ্ঠীকল্প হচ্ছে, পুকুর থেকে ঘট এনে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের বউরা। ঘন্টা বাজছে পুরুতের হাতে, আর ঘন্টা থামলেই ঢাকের আওয়াজ উঠছে।

নতুন নতুন রং-বেরঙের জামাকাপড়, নতুন জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের দল, বউঝিদের পরনেও নতুন কাপড়। আর তাদের পিছনে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাগদি-বাউড়ি-কোটালদের মেয়েরা। তাদের সবাই লাল পাড় নতুন কোরা শাড়ি পরেছে। বাউড়ি-বাগদিদের ছেলেমেয়েদের গায়েও নতুন জামা।

তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষ্মীমণির দিকে চোখ পড়ে উদাসের। ভিড়ের মধ্যে সেও দাঁড়িয়ে আছে তন্ময় হয়ে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর টেনেছে। কিন্তু...

হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগে উদাসের, লক্ষ্মীমণির কাপড়খানার দিকে তাকিয়ে। নোংরা পুরনো একখানা কাপড় পরে আছে লক্ষ্মীমণি!

উদাসের হঠাৎ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। ছি ছি, লক্ষ্মীমণিকে একখানা শাড়িও দিতে পারেনি সে! নাকি দিতে ইচ্ছে হয়নি। পুজোর দিনে সকলেই বাবুদের বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড়, পার্বণি পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীমণি?

লক্ষ্মীমণি বলে, চাষী কোটালের বউ নই আমি যে, পাটকরুনির কাজ করব বাড়ি বাড়ি।

মিস্ত্রির মেয়ে সে, তাই অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে সম্মানে বাধে তার। তাই পার্বণিও পায়নি।

কিন্তু উদাস নিজে কি একখানা কাপড় দিতে পারত না পুজোর সময়?

উদাস বাঁশের খুঁটিতে ঠেসিয়ে রাখা সাইকেলটা নিয়ে দামু পালের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, পাঁচটা টাকা ধার দেবে দামুদাদা?

—পাঁচ টাকা? কেন রে! বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে দামু।

উদাস ধীরে ধীরে বলে, দেবে কিনা বলো।

উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দামু, তারপর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেয়। যাত্রাদলের খরচ-খরচার হিসেবের টাকা। ভাবে, টাকা না পেলে হয়তো শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে উদাস।

টাকাটা পেয়েই কিন্তু হাসি ফোটে তার মুখে। সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বলগাঁর স্টেশনের দিকে। স্টেশনের ধারের পোশাক-আশাকের দোকানের উদ্দেশে। বলে যায়, রসো, এই এলাম বলে।

দুপুরের আগেই ফিরে আসে একখানা ডুরে শাড়ি নিয়ে। ডুরে রঙিন শাড়িখানা অনেক খুঁজেপেতে পছন্দ করে এনেছে।

বাড়ি ফিরে সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেসিয়ে রেখেই চিৎকার করে ডাকে উদাস, লক্ষ্মী,

এ ডাক যেন বহুদিন শোনেনি লক্ষ্মীমণি। সেই কবে বিয়ের আগে এ নামে ডাকত উদাস, এ নাম ভুলেই গিয়েছিল। ডাকটা তাই অনভ্যস্ত লাগল দু'জনের কানেই।

তবু ফুর্তির গলায় উদাস চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল। —লক্ষ্মী, শুনে যা, দ্যাখ, কি এনেচি, দেখে যা।

বিস্ময়ে কৌতূহলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল লক্ষ্মীমণি। অবোধ্য দৃষ্টিতে উদাসের মুখের

দিকে তাকিয়ে রইল, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

উদাস বললে, এই দ্যাখ! বলে শাড়িখানা লক্ষ্মীমণির হাতে দিলে।

বোকা বোকা চোখ মেলে লক্ষ্মীমণি একবার উদাসের মুখের দিকে তাকালে, একবার শাড়িখানার দিকে। যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। যেন স্বপ্ন দেখছে সে জেগে জেগে।

তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, আমার নেগে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর নেগেই আনলাম।

—আমার নেগে! আবার প্রশ্ন করলে লক্ষ্মীমণি। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল শাড়িটার ওপর।

কুড়ি

বিমলা আর কমলা কখনও যাত্রা দেখেনি। তাই তাদের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশি। সন্ধে থেকেই মাঝে মাঝে এসে যাত্রার আসরটা ঘুরে ঘুরে দেখে যায় দু'জনে। খানকয়েক পুরনো ভাঙা করোগেটের টিন আর ধানের বস্তার চট দিয়ে ঢেকে সাজঘর তৈরি হয়েছে আসরের সামনেই। দু'পাশে বাঁশ বেঁধে আসরে যাতায়াতের পথ তৈরি হয়েছে। ওপাশে মেয়েদের বসার জায়গা, এপাশে পুরুষদের।

যাত্রার কথা অনেক শুনেছে বিমলা, তবু চোখে দেখার সুযোগ হয়নি এর আগে। তাই যা দেখে তাতেই কৌতুক বোধ করে দু'বোনেই, হেসে ওঠে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহলও কম নেই।

সাজঘরে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলতেই একবার এসে উঁকি দিয়ে গেল বিমলা। দেখলে, বেশকারী এক সারি বাটি সাজিয়ে রং গুলছে—লাল, কালো, গোলাপি...

দেয়ালে ঝকমকে পোশাক টাঙানো হয়েছে। কোনটা রাজার, কোনটা মন্ত্রীর, নিয়তি আর সৈনিকের—আরও কত কি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে চট তুলে উঁকি দিয়ে দেখলে বিমলা। দেখলে, বেশকারীর সামনে চুপ করে বসে আছে উদাস, আর তার গালে লাল রং ঘসছে লোকটা, চোখে কাজল টেনে দিচ্ছে। অন্যান্য অনেকেও সাজপোশাক নিয়ে ব্যস্ত। ধীরেন সাঁই দাড়িগোঁফ কামিয়ে রানী সাজছে। তাকে দেখে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে এল বিমলা।

ওখান থেকে সরে এসে প্রতিমার আরতি দেখতে লাগল সে। আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজছে তখন একটানা, ধূপধুনোয় চাপ চাপ ধোঁয়া আর স্নিগ্ধ একটা গন্ধ, সমস্ত পুজোমণ্ডপের আবহাওয়াটা যেন বদলে গেছে। গ্রামের সবাই এসে হাজির হয়েছে কালীতলায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছে সকলে।

বিমলা একবার ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গেল। কাকে যেন খুঁজল ও। ক্রাচে ভর দিয়ে বুশ শার্ট পরা অবিনাশ ডাক্তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে। সামনের লোক সরে গিয়ে ডাক্তারকে আরতি দেখার সুযোগ করে দিল।

ডাক্তারকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমলার মুখেও হাসি ফুটে উঠল, আশেপাশে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু, না প্রভাকর আসেনি।

গিরিজাপ্রসাদ বার বার করে বলে দিয়েছিলেন প্রভাকরকে। গাঁয়ের সকলেই যাত্রা দেখতে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছে তাকে। আর যাত্রা দেখতে আসবে কথাও দিয়েছিল প্রভাকর। তাই সন্ধে থেকে বার বার লক্ষ করেছে বিমলা, প্রভাকর এসেছে কিনা।

ভেবেছিল, ডাক্তার এলেই তার সঙ্গে প্রভাকরও আসবে। কিন্তু অবিনাশ ডাক্তারকে একা আসতে দেখে হতাশ দেখাল তাকে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল বিমলা। আসরের এক পাশে মেয়েদের বসার জায়গা হয়েছে সতরঞ্চি বিছিয়ে, আরেক দিকে পুরুষদের। বাউড়ি-বাগদি-কোটালবাড়ির মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছে। আগে না এলে জায়গা পাবে না, পিছিয়ে বসতে হবে এই ভয়। পুরুষদের দিকেও অনেকে এসে গেছে। কিন্তু দু'দিকেই খানিকটা করে জায়গা খালি রেখেছে সবাই, খালি রেখেই বসছে। অর্থাৎ গাঁয়ের ভদ্রলোকদের জন্যে, তাদের বাড়ির মেয়েদের জন্যে।

ওদিকে এর ওর বাড়ি থেকে চেয়ে আনা কয়েকখানা ভাঙা পুরনো চেয়ার এনে সবচেয়ে ভাল জায়গাটুকুতে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তখনও খালি পড়ে আছে। কেউই হয়তো বসতে সাহস পাচ্ছে না।

অবিনাশ ডাক্তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তারই একটাতে বসে পড়ল। গিরিজাপ্রসাদকেও ডাকলে।

আসরটা হয়েছে ঠিক প্রতিমার সামনেই, ওখান থেকে বসে বসে আরতি দেখা যায়। কিন্তু আরতি দেখার চেয়ে যাত্রা দেখার জন্যেই যেন উৎসাহ সকলের।

বিমলা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কমলাকে বললে, চল, ওদিকে যাই।

বলে গিরিজাপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই সময়েই দেখতে পেল প্রভাকর আসছে, অবনীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রথমটা সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করে বিমলা ভেবেছিল প্রভাকরকে দেখেই বুঝি সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ভুল ভেঙে গেল। দেখলে, সকলে যেন অবনীমোহনকেই খুশি করতে ব্যস্ত। এমনকি গিরিজাপ্রসাদও এগিয়ে গেলেন হাসিমুখে। গোপেন মোড়ল আর হংস মাঝখানে রাখা সবচেয়ে ভাল আর বড় চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বলল অবনীমোহনকে। আর অবনীমোহন পাশের চেয়ারটায় প্রভাকরকে বসতে বললেন।

সমস্ত আসরটা যেন মুহূর্তের মধ্যে গমগম করে উঠল।

আসরের ভিতরে চারপাশ ঘিরে বসে গেছে তখন গাইয়ে-বাজিয়ের দল। গিরিজাপ্রসাদ দেখলেন, বংশীও আছে তার মধ্যে। চোখোচোখি হতে হাসল বংশী। বাজনা শুরু হয়ে গেল। আর গিরিজাপ্রসাদের মন চলে গেল শৈশবের সেই দিনগুলিতে। মনে হল যেন কিছুই বদলায়নি, গ্রামটা ঠিক তেমনিই আছে। শুধু সেই জমিদার নেই, দারোগা নেই। হ্যাঁ, মনে পড়ল গিরিজাপ্রসাদের—মাঝখানে একটা নকশাকাটা দামি চেয়ারে বসত গাঁয়ের জমিদার হৃদয় মোড়ল, আর দারোগাবাবুকে ঠিক অবনীমোহনের মতই পাশে বসতে বলত সে। ঠিক যেভাবে প্রভাকরকে বসতে বললেন অবনীমোহন। কই, আর তো কিছুই বদলায়নি।

দেখতে দেখতে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। গান গাইতে গাইতে আসরে এল মণিপুরের রানী। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বিমলা। সাজপোশাক দেখে চোখ ঝলসে যায়, আর কি সুন্দর মানিয়েছে।

কমলা ফিসফিস করে বললে, সত্যি মেয়ে নাকি রে দিদি।

বিমলা চাপা গলায় ধমক দিলে।—চুপ।

তার বোকামিটা চাপা দেওয়ার জন্যে, না বিমলা সত্যিই যাত্রা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে।

কমলা শুধু ফিরে তাকিয়ে দেখলে অবনীমোহন উঠে চলে গেল এক সময়। গোপেন

মোড়ল, হংস, আরো দু'-একজন তাঁর পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এল।

আসরের আর সকলেই তন্ময় হয়ে দেখছে। রাত্রি অনেক হয়েছে তখন, চতুর্দিক অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। মেয়েদের এলাকায় মাঝে মাঝে দু'-একটা কোলের ছেলে কেঁদে উঠছিল, তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিস্পন্দ বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলে দেখছে সকলেই। আর নিস্তব্ধতার মাঝে অভিনেতাদের গলার স্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে সকলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই অভিনয় করে চলেছে উদাস। আর তার অভিনয় দেখতে দেখতে চোখে জল এসে পড়ে লক্ষ্মীমণির। অন্য সকলের মত সেও ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল মোছে। উদাসের অভিনয়কে কোনওদিনই বুঝি এমন চোখে দেখেনি লক্ষ্মীমণি। আজ একটা দিনেই মানুষ বদলে গেছে সে। এতদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ আর বিরুদ্ধভাব যেন মুছে গেছে।

পাশের ভিড় থেকে কে যেন বলে উঠল, উদাসের মত যাত্রা করতে বাবুরাও পারে না লো!

আরেকজন কে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, রাজা হয়েছে উদাস? ও মা, আমি চিনতেই নারতাম না বলে দিলে!

লক্ষ্মীমণি শোনে সে-সব কথা, আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওর। মনে হয়, কি ভুলই না করেছিল সে, কি অবিচারই করেছে স্বামীর ওপর!

তা না হলে হঠাৎ তার জন্যে একখানা শাড়ি কিনে এনে দেবে কেন উদাস! কোনদিন যা আশাও করেনি সে, মুখ ফুটে বলেনি কোনদিন ...

লক্ষ্মীমণি মনে মনে ভাবে, এবার থেকে খুব ভাল ব্যবহার করবে সে উদাসের সঙ্গে। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। না, উদাসের কোনও দোষ নেই। সব দোষ পদ্মর।

সাবিত্রীও বলেছিল লক্ষ্মীমণিকে। বলেছিল, ভাতারকে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখ লো লক্ষ্মী, তা নইলে পদ্ম তুক করবে।

তখন শুনে রেগে গিয়েছিল লক্ষ্মীমণি। কিন্তু তুকই করেছিল পদ্ম, নিশ্চয় করেছিল। তাই পদ্মও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর মন ফিরে এসেছে উদাসের।

তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখে সে, আর গর্বে বুক ভরে ওঠে আশপাশের লোকের মুখে উদাসের প্রশংসা শুনে।

তন্ময় হয়েই অভিনয় করছিল উদাস। যাত্রায় এবার আর ওর একটুও মন ছিল না। নেহাত দায়ে পড়েই পার্ট নিতে হয়েছে। দামুদাদাকে খুশি করার জন্যে। বেশকারীর সামনে বসেও বার বার পদ্মর কথাই মনে পড়েছে তার। বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। বেশকারী অতশত বুঝতে পারেনি। যত্ন নিয়ে উদাসের গালে-মুখে রং মাখিয়েছে সে, চোখে আর ভুরুতে কাজল টেনে দিয়েছে। তারপর রাংতা মোড়া ঝলমলে চূড়া পরিয়ে দিয়েছে মাথায়, গায়ে জোড়া-বুক-ছতরি। ঝলমলে মখমলের পোশাক, নকল মুক্তোর মালা, হাতে ধনু নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কিন্তু অভিনয়ের নেশা জেগে উঠেছে। সমস্ত শিরা উপশিরা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে মুখস্থ করা পার্ট মনে পড়তেই। মুহূর্তে নিজেকে ভুলে গেছে উদাস। পদ্মকে, লক্ষ্মীমণিকে, তার ড্রাইভারি শেখার নেশা, তার দ্বিচক্র বাহন, সব ভুলে গেছে। উদাস যেন বংশী কোটালের ছেলে নয়, সূতপুত্র কর্ণ—মহাবীর!

তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, গ্রাম্য উচ্চারণে বড় বড় শব্দ—যার অর্থও ভাল করে বোঝে না সে—তার অভিনয় যেন উদাসকে সত্যিই মহাভারতের যুগে নিয়ে গেছে।

আসরে নেমেই তার অভিনয়ের নেশায় ডুবে গিয়েছিল সে। বাঁশ দিয়ে ঘেরা চৌকো

আসরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে করতে অতিপরিচিত মুখগুলোর ওপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি ঘুরছিল তার, কিন্তু কাউকেই যেন চিনতে পারছিল না। বনপলাশির মানুষ নয় যেন ওরা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র সৈনিকরা যেন ঘিরে আছে তাকে।

অভিনয় করতে করতে অনর্গল পার্ট বলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আস্ফালনের মাঝখানে থেমে পড়ল উদাস। হৈ হৈ করে উঠল সকলে, প্রম্প্‌টারের গলা শোনা গেল। বার বার পার্ট মনে পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু উদাস অপ্রতিভ. বিস্মিত—অস্বস্তিতে ঘেমে উঠেছে সে।

হাসাহাসি শুরু করল অনেকে। কেউ কেউ চিৎকার করে ঠাট্টা করলে।

আবার অভিনয়ের চেষ্টা করলে উদাস, পারলে না। গ্রামের লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ চিৎকার কানে গেল তার।

লজ্জায় অস্বস্তিতে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এল। কোনওরকমে পার্ট শেষ করে ছুটে বেরিয়ে এল সে আসর থেকে।

অভিনয় করতে করতে কেন যে দৃষ্টি পড়েছিল সাজঘরের পাশের আবছা অন্ধকারে! কেন যে...

ছুটতে ছুটতে আসর থেকে বেরিয়ে এসে পদ্মর হাত দু'খানা মুঠোর মধ্যে ধরলে উদাস। —পদ্ম, পদ্ম এয়েছিস তুই ?

একুশ

দৃশ্য থেকে দৃশ্য বদলায়, যতি পড়ে, সুন্দর-মুখ 'একানে' ছেলেটা সন্ন্যাসীর বেশে আসরে ঘুরে ঘুরে গান গায়। আর সেই ফাঁকে দলে দলে লোক উঠে গিয়ে বাড়ি থেকে খেয়ে আসে, কেউ বা চা খেতে যায়, কেউ কোঁচড়ে বেঁধে আনা মুড়ি-মুড়কি নয়তো রুটি তরকারি খেয়ে জলের খোঁজে বের হয়।

সাজঘরের পাশে যাত্রাদলের রান্না বসেছে। দামু পাল, হংস—আরও দু'-চারজনের খাবার আসে বাড়ি থেকেই। বাগদি-বাউড়িরা এনামেলের থালায় ভাত-ডাল নিয়ে গামছায় বেঁধে এনে রাখে। দু'-পাঁচজন শুধু যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাই রান্না করে নেয়। পালার ফাঁকে ফাঁকে যে যখন সময় পায় এসে উনোন ধরিয়ে দিয়ে যায়, কেউ পিতলের বড় থালাটায় আটা মাখতে মাখতে হাত ধুয়েই আসরে ছুটে যায় পার্ট চিৎকার করতে করতে, কেউ করুণ কণ্ঠে হৃদয়ের বেদনা উজাড় করতে করতে এসেই আটা ঠাসতে বসে যায়। কিংবা রুটি বেলতে। মাঝে মাঝে তাওয়া নামিয়ে দিয়ে চায়ের জল গরম হয়। গলা ভিজিয়ে নেয় সকলে একে একে।

হঠাৎ উদাস পার্ট ভুলে যেতেই আসর ঘিরে একটা হইহই উঠেছিল। চিৎকার হট্টগোল। কোনওরকমে পার্ট শেষ করে উদাস ছুটে বেরিয়ে গেল আসর থেকে, আর সেই হট্টগোলে একানে ছেলেটার মিহি গলার গান চাপা পড়ে গেল।

এখন নিশ্চয় অনেকক্ষণ লাগবে পরের দৃশ্য শুরু হতে, তাই দলে দলে লোক উঠে পড়ল। এতক্ষণ একনাগাড়ে বসে বসে পা ভারিয়ে গেছে, একটু পায়চারি করে আসতে চায় কেউ, কেউ বা বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে।

রাত অবশ্য তখনও এমন কিছু বেশি হয়নি।

গিরিজাপ্রসাদ ওঠবার জন্যে উসখুস করছিলেন। অনেকক্ষণ চা খাননি। একবার বিমলার দিকে তাকালেন। তারপর প্রভাকরকে বললেন, চলো প্রভাকর, বাড়ি থেকে

একটু চা খেয়ে আসবে।

ডাক্তারের দিকেও তাকালেন। অবিনাশ ডাক্তার বললে, চা এক কাপ পেলে অবশ্য মন্দ হত না, কিন্তু বড় ভাল গাইছে ছেলেটা!

সত্যিই বড় মিষ্টি গলা! বেচারা যখন শুনতে চায়! তা ছাড়া অন্ধকারে অন্ধকারে যাওয়া-আসাও কষ্টকর তার পক্ষে।

তাই বিমলা বললে, না, না, গান শুনুন আপনি। আমি চা এনে দিচ্ছি।

বলে মেয়েদের ভিড়ের দিকে চলে গেল বিমলা। মাকে খুঁজে বের করে চাবি নিলে ঘরের।

নিভাননী বললেন, আমার জন্যেও এক কাপ চা আনিস বিমলি।

চাবি নিয়ে এসে বিমলা বললে, চলো।

গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন, পিছনে পিছনে প্রভাকর। গিরীন কোথায় ছিল, গিরিজাপ্রসাদকে উঠতে দেখে বললে, ঘরে যাচ্ছো? বাছুরটা দড়া ছিঁড়ে ফেলেছে কিনা দেখো তো, আজ দুধ দেয়নি কালো গাইটা।

গিরিজাপ্রসাদ ঘাড় নাড়লেন, আচ্ছা।

যেতে যেতে প্রভাকরের হাতের টর্চটা কেড়ে নিল বিমলা। সামনে আলো ফেলতে ফেলতে চলল।

গিরিজাপ্রসাদ তখনও যাত্রার মধ্যে ডুবে আছেন। সেই কোন ছেলেবেলায় যাত্রা দেখেছেন, কত বড় বড় অপেরা পার্টির যাত্রা। আর আজ এই এত বছর বাদে আবার দেখছেন। গাঁয়ের লোকও তখন পালা নামাত। কিন্তু তেমন অভিনয় যেন এখন আর হয় না। গিরিজাপ্রসাদের মনে হয়, যাত্রা মরে গেছে। থিয়েটারের ঢঙে পার্ট করছে সবাই। যেন পিছনে সিন না টাঙালে বোঝা যাবে না দৃশ্যগুলো। অথচ তখন শুধু অভিনয় করে রাজপ্রাসাদ, রাজার উদ্যান, যুদ্ধক্ষেত্র সব চোখের সামনে এনে হাজির করত।

সত্যিই কি তাই? যাত্রা মরে গেছে? গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই সন্দেহ হয়। হয়তো শৈশবের সেই মন, সেই কল্পনার জগৎ চোখ থেকে মুছে গেছে বলেই তেমনভাবে আর মুগ্ধ হতে পারছেন না।

একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্নের মত আগে আগে হেঁটে চলেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে, উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পুকুরপাড়ের খানাখন্দ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।

ক্ষণে ক্ষণে প্রভাকরের গায়ে উড়ে এসে পড়ছে বিমলার সিল্কের শাড়ির আঁচল। একটা স্নিগ্ধ রোমাঞ্চের মত।

নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'-একটা কাটা-কাটা কথা।

—উদাস কিন্তু বেশ ভাল পার্ট করে!

—হঠাৎ পার্ট ভুলে গেল এমন। বেচারি!

আবার খানিকটা চুপচাপ।

সিল্কের শাড়ির খসখসানি কানে আসছে। টর্চের ঈষৎ আলোয় বিমলার মুখ দেখা যাচ্ছে। বড় স্নিগ্ধ সুন্দর লাগছে প্রভাকরের। ইচ্ছে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে বিমলার হাতখানা স্পর্শ করার। কিন্তু সঙ্কোচ এসে বাধা দিচ্ছে।

আড়চোখে মাঝে মাঝে প্রভাকরের মুখের দিকে তাকায় বিমলা। কৌতুকের হাসি চাপে। ওর মনেও বুঝি ওই একই বাসনা।

হঠাৎ সরসর করে কিসের যেন শব্দ হল অন্ধকারে, বাঁশপাতার ওপর দিয়ে কি যেন

ছুটে গেল।

থমকে দাঁড়াল প্রভাকর।

সাপ নয় তো ? আঁতকে চিৎকার করে উঠল বিমলা, এসে লাফিয়ে পড়ল প্রভাকরের গায়ের ওপর।

মুহূর্তের জন্যে। মুহূর্তের জন্যে বিমলার কোমল যৌবনের স্পর্শ পেল প্রভাকর। বিমলাও। পরক্ষণেই অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে টর্চ ফেলল বিমলা। গিরিজাপ্রসাদও থেমে পড়েছিলেন।

বললেন, এদিক দিয়ে সরে আয়।

আবার পাশাপাশি হেঁটে এসে খিড়কির দরজা খুলে ঢুকল সকলে।

বিমলার মনের মধ্যে তখন একটা তোলপাড় চলছে। সাপের কথা শুনে সত্যিই আতঙ্ক হয়েছিল তার। আতঙ্কেই লাফিয়ে এসে প্রভাকরের ওপর পড়েছিল। কিন্তু তারপর অপ্রতিভ ভাবটা কেটে যেতেই রোমাঞ্চ জেগেছিল মনে।

প্রভাকর যখন ওকে স্পর্শ করল, হোক ক্ষণিকের জন্যে, তবু ওই স্পর্শটুকুর মধ্যেই যেন স্বীকৃতির ইশারা শুনেছে বিমলা। তবে কি প্রভাকরের মনের গোপনেও ওই একই স্বপ্ন !

লণ্ঠন জ্বালতেই কেমন যেন লজ্জা পেল বিমলা। চোখ নামিয়েই রইল।

গিরিজাপ্রসাদ গল্প জুড়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। শিষ্ট ছাত্রের মত শুনছে প্রভাকর।

একবার আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকাল বিমলা, আর সেই মুহূর্তে চোখোচোখি হল।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল ও।

বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে গল্প করতে করতে বিমলাকে লক্ষ করে প্রভাকর। একটা মুগ্ধ আবেশের চাদর যেন ধীরে ধীরে তার সমস্ত চেতনাকে মুড়ে দেয়।

লণ্ঠনের আলো পড়েছে উঠোনে। ঝোপ ঝোপ অন্ধকার আমগাছটার ডালে, ঢেঁকিঘরের ওপাশের স্তূপীকৃত জঞ্জালে, টিয়াদের ঘরের বারান্দায়, পশ্চিমের রান্নাঘরে। সদর দরজাটা বন্ধ, কিন্তু তার পাঁচিলের ওপারে খড়ের পালুই, মরাইয়ের গোল চূড়াটা—সবই আবছা আলোয় ছায়া ছায়া—কাঠকয়লা ঘসে আঁকা দেয়ালের ছবির মত দেখায়।

স্টোভ ধরাল বিমলা। কেটলি ধুয়ে জল বসাল। পেয়ালা পিরিচ ধুয়ে নিল বারান্দায় বসে বসেই। চামচ, ছাঁকনি, চা-চিনির কৌটো এনে রাখল। দুধের বাটি। খুব ভোরে উঠে চা খাওয়া অভ্যাস গিরিজাপ্রসাদের। গাই দোয়াতে বাগালটা আসে অনেক বেলায়, তাই রাত্তিরের খানিকটা দুধ রেখে দেন নিভাননী। গরুর দুধ যেদিন থেকে ভাগাভাগি করে চায়ের পাট আলাদা করে দিয়েছে গিরীন, সেদিন থেকেই এই ব্যবস্থা।

চায়ের জল ফুটে উঠতেই স্টোভটা নিবিয়ে দিল বিমলা। তিনটে পেয়ালায় চা ছেঁকে চামচ নাড়লে। নিঃশব্দতার মধ্যে ঠুং ঠুং শব্দ উঠল, আর দূর থেকে যাত্রার আসরের চিৎকার। নতুন দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিল প্রভাকর। গিরিজাপ্রসাদের হাতের কাছে আরেকটা পেয়ালা এগিয়ে দিল বিমলা।

তারপর নিজের পেয়ালাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-টুকু প্লেটে ঢেলে খেয়ে নিল ফুঁ দিয়ে দিয়ে।

কেটলিটা ধুয়ে বাড়তি এক কাপ চা তাতে ঢেলে নিভন্ত স্টোভে বসিয়ে রাখল।

গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন। —দাঁড়াও, একবার ঘরগুলো দেখে যাই।

টর্চ নিয়ে সব ঘরগুলোর শিকলের তালায় হাত দিয়ে দিয়ে দেখলেন। গিরীনদের

ঘরটাও। সব ঠিক আছে।

বিমলাকে বললেন, চাবিটা দে তো মা।

—কেন?

—ওদিকটা একবার দেখে আসি। গিরীন যে বললে, বাছুরটা...

চাবি নিয়ে টর্চ হাতে চলে গেলেন।

প্রভাকরও উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল। গিরিজাপ্রসাদের চটির শব্দ, সদর দরজার খিল খোলার শব্দ—মিলিয়ে গেল। মরাইতলায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর আর বিমলা। বিমলা আর প্রভাকর।

পাশাপাশি দু'জন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে টর্চের আলোটা বিদ্যুতের মত এদিক থেকে ওদিকে সরে যাচ্ছে।

বিমলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা অবোধ্য অস্বস্তি, ভয়, ভাল লাগা। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে বিমলার। বুক কাঁপছে।

বিমলার হাত ছুঁয়েছে প্রভাকর। প্রভাকরের হাতের মুঠোয় বিমলার হাত। কাঁপছে বিমলা, তবু হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

হারিকেন লণ্ঠনটায় কালি উঠছে। তেল কমে গেছে হয়তো। কাচটা কালো হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কাচটা হয়তো ফেটে যাবে। তবু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পলতেটা কমিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চিমনিতে কালি পড়ে পড়ে আলোটা কমে আসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে যেন চতুর্দিক।

পিঠের ওপর হাত রেখেছে প্রভাকর। প্রভাকরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে যেন বিমলা। মুখের ওপর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ।

প্রভাকর বললে, চলো।

মরাইতলার দিকেই পা বাড়াল প্রভাকর। পিছনে পিছনে বিমলা।

আর সেই মুহূর্তে গিরিজাপ্রসাদের গলা শোনা গেল।—বিমলা! বিমলা! আতঙ্কের ডাক।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পলতেটা কমিয়ে দিয়ে ছুটে গেল বিমলা।

দেখলে, বিস্ময়ের চোখে একটা মরাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বড় কেটে ধান নিয়ে গেছে।

—ধান নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ, যাত্রা দেখতে গেছে সকলে। এই সুযোগে মরাই থেকে ধান চুরি করে নিয়ে গেছে কে। সামনে তখনও ধান পড়ে রয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মরাইয়ের ভিতর থেকে।

—ছি ছি ছি। গিরিজাপ্রসাদের গলার স্বর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।—যাত্রা দেখতে গেছে সব, পুজোর দিন। ছি ছি ছি, তারই মধ্যে চুরি করতে এল!

হতাশ শোনাল গিরিজাপ্রসাদের কণ্ঠস্বর।

বললেন, কত নিয়েছে কে জানে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর মুখ নিচু করে রইল। বিমলাও। ও যেন কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারছে না প্রভাকরের দিকে।

জীবনের প্রথম পুরুষস্পর্শের আনন্দে ধিক্কারে বিমলার সারা শরীর তখনও রোমাঞ্চিত।

পানের ডিবে নিয়ে গুছিয়ে বসেছিল মোহনপুরের বউ। পাশে টিয়া। একমনে যাত্রা দেখছিল। সারা বছরে এই ক'টা দিন মাত্র ছুটি। না, ছুটি নয়। পুজোর সময়েই কাজ বাড়ে সংসারের। তবু কাজকে কাজ মনে হয় না। সদা সর্বদা একটা চাপা ফুর্তিতে মা'র পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় টিয়া। আর মোহনপুরের বউয়ের মনটাও হালকা থাকে। সেই প্রথম যখন বিয়ের পর নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল, পায়ে মল পরে যখন ঘুরে বেড়াত ঘোমটা টেনে টেনে, আর মলের আওয়াজের মত খুশিতে ভরা মনটুকুও ঝুমঝুম করে বাজত, ঠিক সেদিনকার মত একটা অদ্ভুত আনন্দে যেন সারা মন ছেয়ে থাকে এই পুজোর ক'টা দিন।

তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে রেখে মোহনপুরের বউ বেরিয়ে পড়েছিল যাত্রা দেখার জন্যে। তোরঙ্গ খুলে বের করেছিল অনেক কাল আগে কেনা দামি বিষ্টুপুরি শাড়িখানা। নেড়েচেড়ে দেখে হেসেছিল। এতকাল আগের কাপড়, তবু যেন নতুনই আছে। ক'দিনই বা পরতে পেরেছে মোহনপুরের বউ। বিয়ের নিমন্ত্রণে দু'-চারবার পরেছে, একবার একটু ল্যাংচার রস লেগেছিল। জলে ধুয়েও দাগটা ওঠেনি। টিয়াকেও পুজোয় কেনা নতুন শাড়ি-ব্লাউজ বের করে দিয়েছিল মোহনপুরের বউ। আর টিয়া নিজে কাপড় বদলে এসে মাকে বিষ্টুপুরি শাড়িখানা পরতে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃদু হেসে বলেছিল, কি সুন্দর মানিয়েছে মা তোমাকে!

বলে চুল বেঁধে দিয়েছিল মা'র, খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল সোনার 'বাগান'।

মোহনপুরের বউ লজ্জা পেয়ে হেসে বলেছিল, তুই কি আমায় কনেবউ সাজাবি নাকি?

টিয়া হেসে বলেছিল, সাজলে মানায় তোমাকে, সাজবে না কেন?

সিঁদুরের কৌটো এনে মা'র কপালে একটা বড় করে টিপ পরিয়ে দিয়েছিল টিয়া, মোহনপুরের বউ কৌটোটা হাতে নিয়ে নিজের সিঁথিতে টেনে দিয়েছিল লম্বা রেখা, তারপর সেই সিঁদুরটুকুই হাতের নোয়ায় ঠেকিয়ে নিয়েছিল।

তারপর মোহনপুরের বউ টিয়ার কপালেও টিপ পরিয়ে দিতে দিতে কৌতুকের হাসি হেসে আশীর্বাদ করেছিল, এই অঘ্যানেই বিয়ে হোক।

লজ্জার হাসি হেসেছিল টিয়া। তারপর ঘরদোরে তালা দিয়ে মা'র পিছনে পিছনে এসে বসেছিল যাত্রার আসরে। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে।

বিমলা আর কমলাকে মোহনপুরের বউও লক্ষ করেছিল। পুরুষদের দিকে গিরিজাপ্রসাদের পাশে বিমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু বিরক্ত হল মোহনপুরের বউ। ফিসফিস করে বললে, ধিঙ্গি মেয়ে, ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখ!

টিয়াও দেখেছিল। দেখে ওরও ইচ্ছে হচ্ছিল বিমলার কাছে যেতে। কিন্তু সাহস হয়নি।

তারপর প্রভাকর যখন এল তখনও দেখেছে টিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে কনুইয়ের কাছে একটা চিমটি কেটেছে কে।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়েই ফিক্ করে হেসে ফেলেই হাসি চেপেছে টিয়া। তারপর যথাসম্ভব গাম্ভীর্য টেনে এনেছে মুখে।

রেণুদি আর রাঙাবৌদি। কোথায় ছিল কে জানে, কখন টিয়াকে দেখে কাছে সরে এসে বসেছে।

পালবউকে দেখে টিয়ার মা বলে উঠেছে, ও মা, অধিকারীর বউ, এত পেছনে বসবে কি লো। বলে তাকে সামনে জায়গা করে দিয়েছে।

দামু পালই যাত্রা-দলের প্রাণ। দামু পাল না থাকলে যাত্রা হয় না সেবার। তাই সবাই ঠাট্টা করে তাকে যাত্রা দলের অধিকারী বলে।

পালবউ তা শুনে খুশিই হয়।

মোহনপুরের বউকে তার সঙ্গে গল্প করতে দেখে রেণুদি ফিসফিস করে টিয়াকে বলে, তাই বুঝি এত সেজেগুজে এয়েছিস ?

ফিরে তাকিয়েছে টিয়া রেণুদির মুখের দিকে। চোখের ইশারায় মাকে দেখিয়েছে। অর্থাৎ মা শুনতে পাবে।

কিন্তু প্রভাকরের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি ও। অস্বস্তি, লজ্জা—তবু ইচ্ছে হয়েছে প্রভাকর ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুক। ওর চোখে চোখ পড়ুক প্রভাকরের।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে প্রভাকর। আশপাশের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু কিছুতেই ওর চোখজোড়া যেন টিয়ার দিকে আসছে না।

আগে দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রভাকরকে দেখত টিয়া। গোপনে গোপনে রেণুদি আর রাঙাবৌদির সঙ্গে হাসাহাসি করত। কিন্তু শুধু প্রভাকরকে দেখতে পেয়েই যেন তৃপ্তি নেই আর, দেখা দিতে চায় টিয়া। চোখে চোখ পড়লে বুকের ভেতর অবধি কেমন করে ওঠে টিয়ার আজকাল। তবু দেখা না দিয়েও যেন শান্তি নেই।

যাত্রা শুরু হওয়ার পর কখন যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল টিয়া। প্রভাকরের কথাও যেন ভুলে গিয়েছিল। দামুদাদার অভিনয়, উদাসের অভিনয় বুঝি প্রভাকরের কথাও ভুলিয়ে দেয়।

তন্ময় হয়েই যাত্রা দেখছিল টিয়া। হঠাৎ আবার চিমটি কাটলে রেণুদি। ফিসফিস করে বললে, ওই দেখ তোর জন্যে পাশে একটা খালি চেয়ার রেখেছে।

টিয়া তাকিয়ে দেখলে। অবনীমোহন উঠে গেছেন, তাই প্রভাকরের পাশের চেয়ারটা খালি পড়ে আছে। স্থির চোখে প্রভাকরের দিকেই তাকিয়ে রইল টিয়া। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চোখে চোখ পড়ল। ক্ষণিকের জন্যে টিয়ার সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠল আনন্দের আবেগে।

আর সেই সময়েই সকলে হৈ হৈ করে উঠল। টিপ্পনী ছুঁড়ল উদাসের উদ্দেশে। পার্ট ভুলে গেছে উদাস, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না তার।

একটু পরেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে এল বিমলা, নিভাননীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ফিরে গেল।

গিরিজাপ্রসাদকে উঠতে দেখেই টিয়াও উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনপুরের বউ ধমক দিল, কোথায় যাচ্ছিস !

—জ্যাঠা বোধহয়...

অর্থাৎ জ্যাঠামশাই বোধহয় বাড়ি ফিরছেন, যদি কোনও কিছু খুঁজে না পান, যদি কোনও প্রয়োজন হয়।

মোহনপুরের বউ ধমক দিল, তুই বোস।

আবার বসে পড়ল টিয়া। তাকিয়ে দেখলে গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন, প্রভাকর উঠল। আর পিছনে পিছনে বিমলা।

একটা খালি চেয়ারে গিয়ে কমলা বসল।

এদিকে ধীরে ধীরে আবার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু যাত্রায় যেন আর মন নেই টিয়ার।

বার বার খালি চেয়ারটার দিকে, প্রভাকরের খালি চেয়ারটার দিকে তাকায় টিয়া। ওর বুকের মতই ফাঁকা যেন। এত লোক, এত ভিড়, রেণুদি, রাঙাবৌদি, মা—তবু কেউ যেন নেই। টিয়া যেন একা নিঃসঙ্গ। সমস্ত বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে অসহ্য এক শূন্যতায়। যাত্রায় মন বসে না, কানে যায় না কে কি বলছে।

এতক্ষণ প্রভাকর ছিল, সমস্ত মন ভরে ছিল টিয়ার। প্রভাকর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সব আকর্ষণ চলে গেছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে গিরিজাপ্রসাদ ফিরে এলেন, পিছনে পিছনে প্রভাকর। আর বিমলা ভিড়ের মধ্যে পথ করে করে এগিয়ে এল টিয়ার মা'র কাছে।

এসে বললে, কাকিমা, ধান চুরি হয়ে গেছে মরাই থেকে।

—চুরি হয়ে গেছে ? চমকে উঠল মোহনপুরের বউ।

সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। টিয়াও। কোলের ছেলেটা গিরীনের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্যগুলোও গিরীনের পাশেই বসে আছে ওদিকে।

তাকে ইশারায় ডাকলে মোহনপুরের বউ, তারপর টিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। গিরীনও।

পথে যেতে যেতে মোহনপুরের বউ বললে, ধন্যি বাবা, ধান চুরি হয়ে গেছে দেখেও আবার যাত্রা দেখতে এল বাপ-বেটিতে !

গিরীন বললে, যত দায় যেন আমাদেরই।

টিয়া কিছু বললে না। আহা, বেচারী বিমলা, জ্যাঠামশাই, ওরা কি কখনও যাত্রা দেখেছে ! দেখতে পায় !

ধান চুরি গেছে কারও দোষে নয়। সারা বছরে তো এই পুজোর ক'টা দিন হাসি আহ্লাদ, যাত্রা দেখার আনন্দ। ঘরে বসে কে মরাই পাহারা দেবে !

যতে কোটালকে তবু বলেছিল গিরীন। যতে ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল, কি কথাই বললেন গো, সম্বচ্ছরে তিনটে দিন যাত্রা হয়, আমি এখন ঘর পাহারা দিই !

গিরীন হেসে বলেছে, আহা, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবি।

যতে তবু অসম্মতিতে মাথা হেঁট করে থেকেছে। জবাব দেয়নি। আর গিরীনও বেশি ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। যা দিনকাল পড়েছে, রাখাল-বাগাল মুনিশ-মাহিন্দারদের কি কিছু বলার উপায় আছে, মনে মনে গজরায় গিরীন। এমনিতেই গাঁয়ে-ঘরে লোক পাওয়া যায় না চাষে খাটার। যা দু-চার ঘর আছে, তারাও একে একে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে। কেউ কলকারখানায় কাজ নিয়ে, কেউ ইস্টিশনে চায়ের দোকান খুলে, কেউ বা উদাসের মত ড্রাইভারি শিখে, নয়তো রেলের কাজ নিয়ে ! দূরের মুসলমানদের গাঁ থেকে লোক আনিয়ে কোনও-কোনওবার চাষ হয়, সাঁওতালের দল না এলে ধান-কাটা পড়ে থাকে।

মাঝে মাঝে সে-কথা বলেও গিরীন। বলে, আমাদের ভদ্দরলোকদেরই হয়েছে জ্বালা। লাঙল ধরলে জাত মান দুই-ই যায়, লাঙল না ধরলে চাষ হয় না। জমিজমা ক'টাও গরমেন্ট কেড়ে নিলেই বাঁচি।

মোহনপুরের বউ শুনে হাসে। —কেড়ে নিলে নিজে দাঁড়াবে কোথায় ? চাকরি দেবে গরমেন্ট ?

গিরীন বলে, কেড়ে তো নেবে না, টাকা দেবে যা-হোক কিছু।

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, সে টাকা তোমার নাতি পেলেও ভাগ্যি বলতে হবে।

চাষের ঝামেলা আর নিজের দুর্ভাগ্যের ওপর বিরক্ত হয়েই অবশ্য গিরীন বলে, জমি ক' বিঘে ঘুচে গেলেই বাঁচি। কিন্তু সত্যিই যদি তা হবে, তা হলে ওই ক' বস্তা ধান চুরি যাওয়ার জন্যে এমন মুসড়ে পড়বে কেন ?

দোষ কারও নয়। পুজোর দিনে কেউ যে ধান চুরি করতে আসবে কেউ কি ভেবেছিল ! তবু মোহনপুরের বউয়ের সব রাগটা গিয়ে পড়ল নিভাননীর ওপর, গিরিজাপ্রসাদের ওপর।

চুরির খবরটা মেয়েকে দিয়ে বলে পাঠিয়ে দিব্যি নিজে গিয়ে বসে বসে যাত্রা দেখল !

যেন ওরা এ-বাড়ির মানুষ নয়। দায়দায়িত্ব নেই কোনও। আর সারা বছরে এই একটু আনন্দ, যাত্রা দেখার নাম করে গাঁয়ের সকলের সঙ্গে একজোট হয়ে গল্প করা, সেটুকুও বুঝি কপালে নেই।

মোহনপুরের বউয়ের টিপ্পনী পরের দিন সকালে গিরিজাপ্রসাদের কানে এল। নিভাননীই শোনালেন। শুনে একটু আঘাত পেলেন মনে মনে। মুখে কিছু বললেন না। কি আর বলবেন, গ্রামে ফিরে আসার পর থেকে শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

কিন্তু, কিন্তু প্রভাকরকে ছেড়ে তখন চলে আসা কি যেত? ফিরে এলেও কি চুরি-যাওয়া ধান ফিরে পেতেন?

নিজের মনকে বোঝাবার জন্যেই হয়তো গিরিজাপ্রসাদ তাই নিভাননীকে বললেন সে-কথা।

নিভাননী তো মনে মনে মোহনপুরের বউয়ের ওপর চটেই আছেন। বনপলাশিতে ফিরে আসার পর থেকেই যে ব্যবহার পেয়েছেন তাতে চটে থাকারই কথা। কিছুতেই যেন মন থেকে বিরুদ্ধ ভাবটা দূর করতে পারছেন না। তাই বলে উঠলেন, চুরি তো শুধু তোমার ধানই যায়নি বউ, ও ধান আমাদেরও!

সংসারের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনও খবরই রাখে না অমরেশ। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নিজের খেয়ালে। ক'টা দিন তো, তারপরই কলেজ খুলবে, কলকাতায় চলে যাবে। এ-সব সাংসারিক ঝগড়াঝাঁটি তার ভালও লাগে না।

মা'র কথা শুনে তাই সেও বলে উঠল, ভারী তো দু'বস্তা ধান...

মোহনপুরের বউ নিভাননীর কথা শুনে যত না চটেছিল, অমরেশের কথা শুনে আরও চটে গেল। ভারী তো দু'বস্তা ধান?...

নিভাননীর কথার জবাবে তাই ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, ধানে ভাগ আছে সে-কথা তো জানেন, বলি কাজের ভাগটার কথা মনে থাকে না কেন?

বাইশ

মোহনপুরের বউ নিজের সুখ-সুবিধার কথা ভেবে বলেনি কথাটা। বলেছিল স্বামীর কথা ভেবে। গিরীনের দিকে তাকিয়ে এক-একদিন তার চোখের পাতা ভিজে আসে। এত বড় সংসারটার ভার মানুষটার ঘাড়ে। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। এক-একদিন মোহনপুরের বউ যখন রান্নাঘরের কাজ সেরে বাসনকোসন তুলে লম্প হাতে নিজের ঘরটিতে ফিরে আসে, ফিরে এসে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকায়, তখন বড় মায়া হয়। কোনও-কোনওদিন ক্ষণিকের জন্যে ভুলে-যাওয়া মুছে-যাওয়া অতীতের দু-এক টুকরো ছবি ভেসে উঠেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কপালের ওপর দু'ভাগ করে পাতাকাটা ধরনে আঁচড়ানো, গায়ে গিরিজাপ্রসাদের কিনে দেওয়া চাঁদনির দোকানের ডোরাকাটা ছিটের কোট, কোটের বুকপকেটে রুমাল। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সেই যুবক চেহারাটার সঙ্গে কত হাসি-আনন্দ অভিমান-বেদনার ইতিহাস যে জড়িয়ে আছে মোহনপুরের বউয়ের জীবনে। ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতেও যেন কষ্ট হয়। আজ গিরীনের কপাল বিস্তৃত হয়ে গেছে টাক পড়ে, শরীর শুকিয়ে দড়ির মত, গাল বসে গেছে, চোখের কোলে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা।

শীত-গ্রীষ্ম নেই, সারাটা বছর ছোটাছুটি লেগেই আছে। কখনও মুনিশ জোগাড় করতে, কখনও ভিন-জেলা থেকে মসলমান কিষাণ নয়তো সাঁওতালদের দল ডেকে

আনতে হয় ধান কাটার সময়ে। ভাগ্য ভাল থাকলে তবেই সে-বছর কাস্তে হাতে তাদের দল নিজে থেকেই এসে হাজির হয়। দিনে দিনে মজুরি বাড়ছে, তবু লোক পাওয়া যায় না। তার ওপর আজ যাও কৃষি-আপিসে ধর্না দিয়ে সার আনতে, নয়তো কাল অ্যামোনিয়া কিংবা বীজধান। দুপুর রোদে মাথায় ভিজে গামছা বেঁধে এতটা পথ গিয়েও বাবুদের দেখা মেলে না। দেখা মিললে মেজাজ তাদের যেন লাটসাহেবের। ফিরে এসে তাই এক-একদিন রাগে গজ গজ করে গিরীন, কখনও-কখনও মোহনপুরের বউয়ের ওপরই অকারণে চটে যায়। তার ওপর সেস, ক্যানেল ট্যাক্স, খাজনা—হাজারো গণ্ডা ঝামেলা। সে-সবের নোটিশ দেবার নাম নেই, হঠাৎ হয়তো নিলামের হুমকি এসে হাজির। জমিতে মই দেয়া হল কি না হল, ক'আনা পয়সা দেবার জন্যে কাজ কামাই রেখে ছোটো সেখানে। চাষের মুনিশদেরও বিশ্বাস নেই এতটুকু, রোদে জলে ঘুরে ঘুরে মাঠে মাঠে তাদের দেখে বেড়াও। এত সব করে তবে তো ক'মরাই ধান ওঠে। চাষের খরচখরচা বাদ দিয়ে, যে-ক'টা টাকা বাঁচে, একটা সংসারকে সারা বছর টানতে গিয়ে সে-ক'টা টাকা কোন দিক দিয়ে যে উড়ে যায় টেরও পায় না মোহনপুরের বউ। চাষের সময় ছেলেমেয়েদেরও খাটুনি, তার নিজের কাজও কি কম নাকি। দশ-বিশটা মুনিশের ভাত রাঁধতে হয়, জলখাবারের মুড়ি ভাজ। বাউড়ি-বাগদি অনেকেরই দু'-পাঁচ বিঘে জমি আছে, যাদের নেই তারাও ভাগে জমি নেয়, তাই মুড়ি ভাজার লোকও মেলে না।

মোহনপুরের বউও তাই মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে চোখের জল ফেলে বলে, ভারী আমার চাষ, রাঁধুনির মাইনে দিতে হত আমাকে তো চাষের পাট কবে ঘুচে যেত।

গিরীনও তাই মাঝে মাঝে যখন বলে, 'জমি ক'বিঘে গরমেন্ট নিয়ে নিলেই বাঁচি' তখন ক্রোধটা কিসের জন্যে, কার বিরুদ্ধে তা বোঝে মোহনপুরের বউ। এরই ফাঁকে যে বছর ধান ভাল হয় কিংবা ধানের দর বাড়ে, সে-বার আনন্দ হয়, মনে হয় এইবার বুঝি দুঃখ ঘুচবে। আবার যখন ধানের দর কমানোর জন্যে শহরবাজারের লোক হই-হই করে তখন মুখ শুকিয়ে যায় সকলের।

এত পরিশ্রম এত দুশ্চিন্তার পর ক'মরাই ধান ওঠে। অথচ নিভাননীর ধারণা জমির ভাগটাই বড় কথা। যেন চাষ আপনি হয়।

সেইজন্যেই জমি ভাগের কথাটা শুনে দপ করে জ্বলে উঠেছিল মোহনপুরের বউ। গিরিজাপ্রসাদ যখন প্রথম এসেছিলেন তখন ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, অনেক টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি, একটা লাঙল বাড়ানো যাবে, দুটো মোষ কেনা যাবে। তারপর ভাগে-দেওয়া আরও কিছু জমি ছড়িয়ে নিয়ে খাসে আনবে। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই তো পেল না গিরীন। এদিকে এত বড় একটা সংসারের খাইখরচই কি কম ? তাও সেই গিরীনের ওপর।

এত সব দেখেশুনেই গিরীন বলেছিল, শুধু চাষের রোজগারে আজকাল আর চলে না। বুঝলে ? ভাবছি...

মোহনপুরের বউ হেসে বলেছিল, চাকরি নেবে ?

—চাকরি আর কে দেবে বলো। গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, চাকরি নয়। কিছু টাকা ধারধোর করে একটা হাস্কিং মেশিন যদি করা যায়...

পাশের গাঁয়ের যশদের সঙ্গে মিলে একটা হাস্কিং মেশিন বসিয়েছিল গিরীন, বলগাঁ স্টেশনে। কিন্তু মনে একটা ভয় ছিল, ব্যবসাও অর্ধেক না চেয়ে বসেন গিরিজাপ্রসাদ। যৌথ পরিবারের টাকায় মেশিন কেনা হয়েছে বলে একদিন যদি গিরিজাপ্রসাদের ছেলেরা মামলা-মকদ্দমা জুড়ে দেয়...

নিভাননীর কথাটায় তার সূত্রপাত হয়ে গেল। বেশ খানিকটা চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটির

পরে গিরীন রাগের মাথায় বলে বসল, জমির ভাগ আছে যখন তোমাদের, ভাগাভাগিই করে নাও। বলে দুম দুম করে পা ফেলে মোহনপুরের বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকে আঙুল তুলে বললে, আর এই তুমি—তোমাকে বলে রাখছি, আজ থেকে ওদের জন্যে এক মুঠো ভাতও যদি সিদ্ধ করে দাও তো আমার মরা মুখ দেখবে!

অন্য যে কেউ সে-সময় গিরীনের ভাবভঙ্গি দেখলে হয়তো হেসে উঠত। কিন্তু মোহনপুরের বউ স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাগ হল চণ্ডাল। কিন্তু তা বলে এমন একটা দিব্যি দিয়ে বসবে গিরীন, মোহনপুরের বউ ভাবতেই পারেনি।

নিভাননীর ওপর তারও রাগ কম হয়নি। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কথা বলে বসবে গিরীন?

গিরীন চিৎকার করে অভিশাপ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই অসহায়ের মত নিভাননীর দিকে, কমলা-বিমলার দিকে তাকাল মোহনপুরের বউ। দেখলে, ওরা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে, আর গিরিজাপ্রসাদ দক্ষিণ-দুয়োরির বারান্দায় বসে আছেন মাথা হেঁট করে। লজ্জায়, না অপমানে, বোঝা গেল না।

আঁচলে চোখ মুছে অনেকক্ষণ পরে মোহনপুরের বউ টিয়াকে ধীরে ধীরে বললে, টিয়া, জেঠিকে বল উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।...

কথা শেষ করতে পারল না মোহনপুরের বউ, সশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মত।

হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল, দু'ভাগ হয়ে গেল রান্নাঘরখানাও। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই মুনিশ ডেকে রান্নাঘরের মাঝখানে একটা কাদার দেয়াল তুলে দিলেন গিরিজাপ্রসাদ। এখন এই থাক, এরপর ধীরেসুস্থে পৃথক রান্নাঘর তুলে নেবেন।

মাঝখানে দেয়াল তুলতে দেখে গিরীন মুখে বলেছিল, যাক বাঁচা গেল!

কিন্তু ঘরের বারান্দায় সন্ধের অন্ধকারে বসে রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন গিরীনের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল।

দু' তরফের কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, চোখোচোখি হলে দু'পক্ষই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঘাটে যেতে যেতে একজন আরেকজনকে পার হয়ে যায় অচেনা লোকের মত। গিরীন ভেবেছিল, দু'দিন পরেই বুঝি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। হল না!

নিত্যদিন মন-কষাকষি, ঝগড়াঝাঁটি, বাঁকা বাঁকা কথা—জীবনে স্বস্তি ছিল না এতটুকু। গিরীনের মনের ভেতর সদাসর্বদাই একটা দুঃসহ জ্বালা যেন তাকে পুড়িয়ে ফেলছিল তিলে তিলে। জীবনে এতটুকু শান্তি ছিল না গিরিজাপ্রসাদ ফিরে আসার পর থেকে। তাই ভেবেছিল, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, পৃথক হয়ে গেলেই বুঝি সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।

কিন্তু শান্তি ফিরল না। একটা চাপা ক্রোধ আর অভিমানে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছিল একদিন। অথচ পৃথক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরীনের মনে হল, জীবনের সব রস যেন নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে। অসহ্য একটা অস্বস্তি, বুকের ভেতর নিঃস্বতার জ্বালা। সেই শৈশবের দিন থেকে গড়ে ওঠা বন্ধনটা যেন পলকা সুতোর মত হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। তুশের আগুনের জ্বালা বুঝি একেই বলে! এমন তো চায়নি গিরীন। ও তো ভাঙতে চায়নি, চেয়েছিল জোড়া লাগাতে। কিন্তু এ কি হয়ে গেল মুহূর্তের ভুলে! কোনও কাজে আর মন বসাতে পারে না গিরীন, রাত্তিরে ঘুম হয় না। বার বার এই ক'দিনের ঘটনাগুলো, কথাগুলো মনের মধ্যে উঁকি দেয়, সারা মন তোলপাড় করে।

পৃথক হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও গিরীন বুঝতে পারেনি গিরিজাপ্রসাদ-নিভাননী-কমলা-বিমলাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কত গভীর, কত আন্তরিক। আজ তাই মনে হয়

জীবনের সব আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে। যা হারিয়ে গেছে তা বুঝি আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

গিরীনের ইচ্ছে হয় নিজে থেকে গিয়ে গিরিজাপ্রসাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসে। নিভাননীকে বলে, বৌঠান, ঘাট হয়েছে আমার...

নিঃস্বতার দুঃখে চোখে জল আসে গিরীনের। বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গিরীন। দেখে, একদিকে মোহনপুরের বউ রান্না করছে, অন্যদিকে নিভাননী। কয়লার উনোন।

কমলা-বিমলাকে ডেকে দু'-একবার কথা বলে বুকের ভারটা হাল্কা করতে চেয়েছে গিরীন। কিন্তু কমলা-বিমলা দু'-একটা সংক্ষিপ্ত 'হ্যাঁ' 'না' উত্তর দিয়ে সরে গেছে। গিরীন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, ওরা গিরীনের সঙ্গে কথা বলতেই ঘৃণা বোধ করছে। কথা বলতে চায় না ওরা। বুকের ভেতর নতুন করে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছে।

বাড়ি থেকে পালাতে পারলেই বুঝি স্বস্তি পাবে সে, ভেবেছে গিরীন। কখনও মনে হয় বনপলাশি থেকে দূরে সরে গেলে স্বস্তি পাবে। তাই শেষ পর্যন্ত কালনায় চলে গিয়েছিল প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

পুজোর দিন ক'টাই নয়, পুজোর পর একটা মাস কেটে গেছে এই মানসিক দাহ নিয়ে। রান্নার পাট পৃথক হওয়ার পরও এতখানি ব্যথা লাগেনি বুকে, কিন্তু যেদিন যতে কোটালকে ডেকে গিরিজাপ্রসাদ পশ্চিম-দুয়োরি আর দক্ষিণ-দুয়োরি ঘর ক'খানার মাঝখানের উঠোনে কাদার পাঁচিল তুলে দিতে বললেন, সেদিন মোহনপুরের বউয়ের চোখেও জল এসেছিল।

আর গিরীন ? বেচারি ভাবতেই পারেনি পৃথক হওয়ার মধ্যে এত ব্যথা, এতখানি বেদনা লুকিয়ে আছে। আশ্চর্য, কোনও মানুষই বুঝি সেটা আগে বুঝতে পারে না। জানে না, হাজারো দ্বন্দ্ব-বিবাদের মধ্যেও একটা স্বস্তি আছে, আনন্দ আছে।

শুধু কি তাই। প্রথম প্রথম একটা অসীম লজ্জা এসে গিরীনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। যেন সব দোষটুকুই তার। যেন পৃথক হওয়ার চেয়ে লজ্জা নেই। তাই কথাটা স্পষ্ট করে গ্রামের কাউকে বলতে পারেনি সে। কিংবা তাদের প্রশ্নের সামনে থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর তাই একদিন যাবার জায়গা খুঁজে না পেয়ে চলে গিয়েছিল কালনার পথে।

রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিরিজাপ্রসাদকে দেখছিল টিয়া। রান্নাঘরের দাওয়াটা অনেকখানি উঁচু, সেখান থেকে নতুন পাঁচিলটার ওপাশেও চোখ যায়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে টিয়া। কমলা-বিমলা কাছে-পিঠে নেই, হয়তো অট্টামার বাড়ি গেছে গল্প করতে। এপাশে মা রান্না করছে, ওপাশে জেঠিমা। শুধু অমরেশ—অমুদা, মা'র কাছে বসে গল্প করছে। দুটো পরিবারের মধ্যে এত ঝগড়াঝাঁটি কথাবার্তা বন্ধ, তবু অমুদার ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলের সামনেই সে মাঝে মাঝে টিয়ার সঙ্গে, টিয়ার মা'র সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু টিয়া যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ওদের কারও সঙ্গে কথা বলে, টিয়ার মা যেন জ্বলে ওঠে।

একই বাড়ির মধ্যে কি এভাবে কথা না বলে থাকা যায়! অভিমানে চোখ ঠেলে জল আসে টিয়ার। মা যেন কি!

গিরিজাপ্রসাদকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল টিয়া। বারান্দায় বসে বসে একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। তা দেখে হাত দুটো নিশপিশ করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল গিয়ে কাপড়টা কেড়ে নিতে। কেড়ে নিয়ে নিজে সেলাই করে দিতে। ভিতরে ভিতরে কমলা-বিমলার ওপরও রাগ হচ্ছিল তার। একটা কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেটুকু রিপু

করে দিতে পারে না ওরা ?

মা একটু অন্যমনস্ক হতেই পা টিপে টিপে গেল টিয়া, কিন্তু সবে ওদের চৌকাঠে পা দিয়েছে অমনি পিছন থেকে ডাক এল—টিয়া !

চমকে ফিরে তাকাল টিয়া।

বাবাকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল সে।

গিরীন ঘামতে ঘামতে ফিরে এসেই জামাটা খুলে ফেললে। তারপর জামাটা টিয়ার হাতে দিয়ে বললে, কোথায় যাচ্ছিলি ?

—কই না তো !

গিরীন নিজের ঘরটির সামনে উঁচু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল। গরমে ঘামে চিড়চিড় করছে সারা শরীর। খাটো ধুতিটা হাঁটুর ওপর গুটিয়ে তালপাতার পাখাটা নিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে, গাড়ুটা নিয়ে আয় তো মা, আর ঘাটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বাবাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে, তার ডাক শুনে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল টিয়া। কিন্তু তারপরই একটা কৌতূহল জেগে উঠল ওর মনে।

গিরীন কালনায় গেছে সে-খবর শুনেছিল টিয়া, বুঝেছিল কেন গেছে। তাই ফলাফল জানবার জন্যে ওর বুকের ভেতরটা যেন ছটফট করে। প্রভাকরের বাবার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে ? কি বলেছেন তিনি ? জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। অথচ জানবার উপায় নেই।

গিরীনের জামাটা দেয়ালের আলনায় টাঙিয়ে রেখে গাড়ুটা খিড়কির পুকুরে ডুবিয়ে এনে রাখলে টিয়া। গামছা এনে দিলে।

গিরীন দাওয়া থেকে পা বাড়িয়ে সেখানেই পা ধুয়ে নিল, গামছায় মুছল পা দু'খানা।

একটা মাদুর পেতে দিল টিয়া। ক্লান্তিতে সেখানেই শুয়ে পড়ল গিরীন।

টিয়া খানিক পাখা করলে, তারপর প্রশ্ন করলে, খাবে কিছু ?

—না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পাখাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে মা'র কাছে রান্নাঘরে চলে এল। বললে, বাবা এয়েছে।

—হুঁ। অর্থাৎ দেখেছে মোহনপুরের বউ।

টিয়া বললে, চা করে দেব বাবাকে ?

—দে। ছোট্ট একটা অবহেলার উত্তর। আর কোনও কথা বললে না মোহনপুরের বউ।

বসে বসে পাশের উনুনে পাটকাঠি জ্বেলে জল গরম করলে টিয়া। চা ছেঁকে গিরীনকে দিয়ে এল।

একটার পর একটা কাজ করে চলে সে, একটার পর একটা ফরমাশ খাটে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহল চেপে রেখেছে যেন। একটা আশঙ্কাও। বাবা গিয়েছিল তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে, প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কি বলেছেন তিনি ? মেয়ে দেখতে আসবেন ? কবে আসবেন ? আরও হাজারো প্রশ্ন এসে জড়ো হয় তার মনে। কিন্তু মুখ ফুটে তো জিগ্যেস করতে পারে না।

মা কেন আসছে না, খোঁজ নিচ্ছে না বাবার কাছে ? তা হলেই তো দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনতে পাবে সে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে, রাত গভীর হয়। হ্যারিকেন জ্বেলে গিরীন রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে খেতে বসে এক সময়। মা'র হাতের কাছে এটা ওটা জুগিয়ে দেয় টিয়া। বাটি গেলাস। মা পরিবেশন করে পাখা নিয়ে বসে। টিয়া রান্নাঘরের ভিতরে দুধ জ্বাল

দেয়। দুধ জ্বাল দেয় আর কান খাড়া করে রাখে। যদি বাবা কোনও কথা বলে, মা কোনও প্রশ্ন করে।

না, কেউ কোনও কথা বলছে না। দু'জনেই চুপচাপ।

—ডাল দেব আর ? মা'র কথা শুনতে পায় এক সময়।

কোনও উত্তর আসে না। হয়তো মাথা নেড়েই জবাব দিয়েছে বাবা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় মা জিগ্যেস করে, গিয়েছিলে ?

—হুঁ।

—দেখা হল ?

—হুঁ।

একটু থেমে আবার গিরীনের গলার স্বর। —পরে বলব।

অর্থাৎ দেয়ালের ওদিকে জেঠিমা আছেন, যদি তাঁর কানে যায় এই ভয়।

পরে বলব। কি বলবে বাবা ? কি বলতে পারে ! সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবতে ভাবতে কড়াইয়ের দুধে হাতা নাড়তে ভুলে যায় টিয়া।

মা এক ফাঁকে এসে বাটিতে কয়েক হাতা দুধ ঢেলে নিয়ে চলে যায়।

একে একে সব কাজ সারা হয়। বাসনকোসন তুলে রেখে টিয়া ঘুম-জড়ানো চোখে বলে, ঘুম পেয়েছে।

—বেশ তো, যা না তুই, শুয়ে পড়বি যা।

টিয়া চলে আসে খুশি মনে। আসলে ঘুম তো ওর পায়নি, পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা আর মার কথা শুনতে পাচ্ছে।

দেয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে নিয়ে ভাইবোনদের পাশে শুয়ে পড়ে টিয়া। শুয়ে চোখ বুজে থাকে।

সময় যেন পার হচ্ছে না। টুং টাং শব্দ, ঝাঁটার সপ্‌সপ্‌ শব্দ। কান পেতে থাকে টিয়া। অনুভবে বুঝতে পারে, বাবা বারবার পাশ ফিরছে। অর্থাৎ জেগে আছে। নিশ্চয় বলবার মতই কোনও খবর এনেছে বাবা, মা ফিরে এলেই বলবে।

অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ কখন যেন একটু তন্দ্রার মত এসে পড়েছিল। কতক্ষণ পার হয়ে গেছে কে জানে, মা কখন ফিরে এসে বাবার কাছে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছে, টেরও পায়নি ও। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ওদের কথাবার্তা কানে এল।

মা বলছে, আজকালকার দিনে এমন ছেলে দেখা যায় না। বাপ বলেছে, তার মতেই ছেলে বিয়ে করবে ?

বাবা উত্তর দিলে, সব ছেলেই বিয়ের সময় ভাল, তা না হলে যে পণের টাকাটা বাড়ানো যায় না।

—পণ কে না নেয় বলো।

—তা ঠিক।

—কত নেবে আন্দাজ দিল কিছু ?

—সব নিয়ে প্রায় আট-দশ হাজার।

—কেন চাইবে না, অমন পাত্র—শিক্ষিত, ভাল চাকরি করছে, তারপর আমাদের মেয়ে যখন পাড়াগেঁয়ে, শিক্ষিত নয়, তখন একটু বেশি তো চাইবেই।

কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শোনে টিয়া, অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে। কিন্তু আসল কথাটা কিছুতেই জানতে পারে না।

মোহনপুরের বউ এক সময় বললে, ছেলেরা শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু পণ নিতে তো ছাড়ছে

না।

গিরীন চুপ করে রইল। তারপর বললে, প্রভাকর নাকি বাপকে বলছে বোনের বিয়ের জন্যেও তো টাকা লাগবে, সেইজন্যেই পণ নেবে বিয়েতে।

মোহনপুরের বউ হাসলে। বললে, সবাই তাই বলে। যাদের মেয়ে নেই বিয়ে দেবার মত, তারা নিচ্ছে না?

এত সব তর্ক শুনতে চায় না টিয়া। ও শুধু জানতে চায় অত টাকা পণ দিতে বাবা রাজি হয়েছে কিনা।

মোহনপুরের বউ জিগ্যেস করলে, কি করবে?

গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে। বিয়ে তো দিতেই হবে মেয়ের। আর ওর চেয়ে কমেই বা কোথায় হবে, এই পাত্র তো পাব না।

মোহনপুরের বউ বললে, তা বলে সব টাকা নিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি ওরা? তা হলে ওখানে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। গয়নাগাটি দেবে না?

—তা দেবে কিছু। ঘুম-জড়ানো চোখে বললে গিরীন।

মোহনপুরের বউ আবার প্রশ্ন করলে, কি করবে তা হলে? টাকার?

—দেখি। ব্যবস্থা যেমন করে হোক করতে তো হবেই।

মোহনপুরের বউ হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ওরা যা চটবে না!

—কারা? বুঝতে না পেরে গিরীন প্রশ্ন করে।

—তোমার দাদা গো। দাদা, বৌঠান...

হেসে ওঠে মোহনপুরের বউ।

গিরীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, দেখো আবার, শোনে না যেন কেউ, শেষে দেবে ভাঙিয়ে। গুণের তো ঘাট নেই ওদের।

বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল গিরীন। মোহনপুরের বউ নেমে এল নিজের বিছানাটিতে। কোলের ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে টিয়ার পাশেই শুয়ে পড়ল।

টিয়া চোখ বুজে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। মা যেন বুঝতে না পারে টিয়া জেগে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে টিয়া হঠাৎ টের পেল মা'র একখানা হাত এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। হাতখানা নরম করে টিয়ার পিঠে বুলিয়ে বুলিয়ে টিয়ার গাল ছুঁল। আদরের স্পর্শ যেন।

টিয়া বুঝতে পারল মা খুব খুশি হয়েছে, ও যতখানি খুশি হয়েছে ঠিক ততখানিই।

মা'র হাতখানা ছুঁতে ইচ্ছে হল টিয়ার। পারল না, তা হলেই যে মা বুঝতে পারবে টিয়া ঘুমোয়নি, সব শুনেছে কান পেতে পেতে।

ছি ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা। তা কি কখনও পারে টিয়া!

তেইশ

এক-এক সময় মনে হয় বনপলাশি গ্রামটা কতই না বদলে গেছে, আবার কখনও কখনও মনে হয়, কিছুই বুঝি বদলায়নি। যেমন ছিল তেমনি আছে, বদলেছে শুধু বাইরের চেহারা।

বাইরের চেহারাই বা কতটুকু বদলেছে? নিজের মনকেই প্রশ্ন করেন গিরিজাপ্রসাদ।

না, বদলায়নি কিছুই। সেই পচা ডোবা ; ইস্কুল নেই, হাসপাতাল নেই। দিঘির মত বড় বড় মাঠের পুকুরগুলো মজে গেছে, আর তার বদলে এসেছে ক্যানেলের জল। নিজের নিজের সেচের পুকুর থেকে তখন সবাই প্রয়োজনমত জল নিতে পারত, এখন সেটুকুরও উপায় নেই। চোখের সামনে ক্যানেল আছে বটে, কিন্তু জলের জন্যে ধর্না দিতে হয়। কখন বাবুদের মর্জি হবে, জল ছাড়বে, তার জন্যে হা-হুতাশ করে বসে থাকো। ঠিক সেই শুখোর বছরে মেঘের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করার মতই ! তখন তবু একজন দেবতার নামে যাগ-যজ্ঞি করলেই চলত...

যতে কোটাল হেসে বলে, এখন মশাই, রাশি রাশি দেব্‌তা। গাঁয়ের চৌকিদার থেকে আপনার বড় বড় অপিসার অবধি সবাইয়ের পায়ে টিন টিন তেল দাও।

শুনে হেসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু অভিযোগটা উপেক্ষা করতে পারেননি।

শুধু চেহারা কেন, গ্রামের মানুষের চরিত্রও তো বদলায়নি এতটুকু ! কিংবা বদলেছে। হৃদয় মোড়লের মত মানুষগুলোর আজ আর দেখা মেলে না।

ইস্কুল-হাসপাতাল ইত্যাদির জন্যে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে পুজোর পরই অবনীমোহন চলে গেছে। আর চলে গেছে বলেই তাকে ঠিক হৃদয় মোড়লের আসনে বসাতে পারেননি গিরিজাপ্রসাদ। নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হয়েছে। স্পর্শ বাঁচিয়ে মানুষ যেমনভাবে ভিক্ষে দেয় এও যেন তেমনি। গ্রামের জীবনের সঙ্গে মিশতে চায় না, শুধু টাকা ক'টা দিয়েই ভাবে কর্তব্য সারা হল। গাঁয়ের লোক ফিসফিস করে বলেছে, দান না কচু, এর পেছনে নিঘ্‌ঘাত কোনও ফন্দি আছে।

সত্যি, ভাবলেও হাসি পায় গিরিজাপ্রসাদের। কলেজে পড়ার সময় বিধবা-বিবাহ নিয়ে কত তর্ক করেছেন, পণপ্রথার বিরুদ্ধে কত যুক্তি খাড়া করেছেন। ভেবেছিলেন, আর ক'টা বছর, তারপরই গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে, সব কুসংস্কার, সমাজেব সব জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে।

জঞ্জাল জমেছে আরও। পণ বেড়েছে, পণ নেবার লোভটাও। আশ্চর্য, দিনের পর দিন মানুষ যত দরিদ্র হচ্ছে, যত নিঃস্ব হচ্ছে, পণের টাকাও বাড়ছে তত। বিশ বছর আগেও ছোট বোনের বিয়েতে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছিল তিন হাজার টাকা, আর বিমলার বিয়ের যেখানেই সম্বন্ধ করেন, আট-দশ হাজারের কমে কোনও হিসেবই পান না।

যেটুকু উন্নতি, যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে, সবই শহরে। মেয়েরাও শিক্ষিত হচ্ছে সেখানে, স্বাবলম্বী হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে ?

না, গ্রামে কোনও মানুষ থাকবে না। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন গিরিজাপ্রসাদ। শৈশবের সেই বনপলাশি গ্রামে কত লোক ছিল, আট-দশটা বাড়িতে পুজো হত। বাগদিপাড়া, বাউড়িপাড়া, কোটালপাড়ায় লোক গিসগিস করত। ভদ্রলোকও কি কম ছিল তখন ?

বিজয়া-দশমীর দিনটিতে বার বার সেই শৈশবের দিনগুলি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সারা গাঁ যেন খাঁ খাঁ করছে। রাশি রাশি পোড়ো বাড়ি, দেয়াল ভেঙে পড়ে বেশির ভাগই মাটিতে মিশে গেছে। ফিরে এসে কেউ আর ভিটেটুকুও খুঁজে পাবে না।

ফিরে আসবেও না হয়তো কেউ। একে একে সকলেই চলে গেছে, চলে যাবে। হংস চাটুজ্যে চাকরির দরখাস্ত করছে, সেও হয়তো চলে যাবে। উদাস চলে যাবে ড্রাইভারির চাকরি পেলেই। দামু পালও আর কিছু টাকা জমিয়ে নাকি দোকান খুলবে বর্ধমানে। কালীমোহনের তিন বিয়ে—তিন পক্ষেরই ছেলেদের মত গিরীনও হয়তো একদিন বলগাঁর স্টেশনে দালান তুলবে ধানচালের ব্যবসা করে।

রেলগাড়িতে চড়লেও যিনি ম্লেচ্ছস্পর্শ বলতেন, সেই কালীমোহনের বড় বউয়ের

ছেলেরাও গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, নিগনে ব্যবসা ফাঁদবে, কেউ কি ভেবেছিল ?

না, সারাজীবন চাকরি করে তাঁর মত দু'-চারজন নিঃস্ব ব্যর্থ মানুষই হয়তো শুধু ফিরে আসবে বৃদ্ধ বয়সে, আর আসবে রাশি রাশি সরকারি চাকুরে—প্রভাকরের মত। ভাবলেন গিরিজাপ্রসাদ।

বংশী বলেছিল, জমি আর থাকবে না গিরিদাদা, সব দালান হয়ে যাবে, শুধু সরকারি দালান উঠবে।

সত্যিই বুঝি তাই। শুধু দালান নয়। গ্রামগুলো ভরে যাবে সরকারি চাকুরে লোকের ভিড়ে। কৃষি-আপিস, ব্লক-আপিস, ক্যানেল-আপিস, ট্যাক্স-আপিস। জমি আর জমিদারি যদি যায় ক্ষতি নেই, কিন্তু লাভ কি হবে গ্রামের ? বড় বড় আপিস খোলা হবে হয়তো, একটা গোমস্তার বদলে সতেরোটা লোক চাকরি পাবে।

যারা চাষের কিছুই বোঝে না, জানে না, শহরে বসে তারা কলমের খোঁচায় যেমন মুনাফা কষে দিয়ে ট্যাক্স বসিয়ে দেয়, সারা বছরের একটা চাষী পরিবারের খোরাকির খবরটাও রাখে না, এরাও তখন হয়তো এমনি সব নিত্যনতুন কাজির বিচার দেবে !

কাজির বিচার !

কালীমোহনও বুঝি কাজির বিচার দিয়েছিলেন ! একাধিক বিয়ের রেওয়াজ ছিল বলে, বিয়ের দৌলতে সম্পত্তি বাড়ানোর রীতি ছিল বলেই ব্রজমোহনকে বুঝতে চেষ্টা করেননি, বুঝতে পারেননি।

বিসর্জনের দিন দুর্গা-প্রতিমার সঙ্গে গ্রামের মাত্র তিরিশ-চল্লিশটি লোকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চলতে শৈশবের সেই হারিয়ে-যাওয়া উচ্ছল আনন্দের, ঢাক-ঢোল-হাসি-উল্লাসের দিন ক'টির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

সেই সুখের দিনগুলির স্বপ্ন দেখছিলেন। আর তারই ফাঁকে হঠাৎ একসময় একটি বিষণ্ণ করুণ মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল বুড়ি অট্টামার দিকে তাকিয়ে।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরছে গিরিজা। ছোট লাইনের ট্রেনটা তাকে নামিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে যেতেই গিরির নিজেরই লজ্জা বোধ করল নিজের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে।

মাত্র ক'টা মাসের মধ্যে গিরি যেন একেবারেই বদলে গেছে। কলেজের সাহেব অধ্যাপকদের নির্দেশে তখন ও ধুতির নীচে কামিজ গুঁজতে শিখেছে।

ধুতি পরায় আপত্তি ছিল না টনি সাহেবের। শুধু চটে যেতেন ধুতির ওপর শার্টের প্রান্তটুকু লটপট করতে দেখলে। বলতেন, শার্ট বা পাঞ্জাবি যা খুশি পরো, কিন্তু ধুতি পরবে তার ওপর। ঠিক যেমনভাবে প্যান্ট পরতে হয়।

গিরিজাও সেইভাবে কাপড় পরেছিল। কামিজের ওপর কোট। পায়ে মোজা, নিউকাট জুতো।

হাতে ব্যাগ নিয়ে ধুলোটে রাস্তা ধরে গ্রামে ফিরছিল গিরিজা। পুজোর ছুটিতে গ্রামে ফিরছে, মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উল্লাস।

বাজ-পড়া গাছটার তখন এমন চেহারা হয়নি। শাখা-প্রশাখায়, পাতায়-পাতায় সারা সাঁওতাল পল্লীটিকে ছায়ায় ঘিরে রেখেছে।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সাঁওতালদের পুকুরটায় মুখ-হাত ধুয়ে নিল গিরিজা, তারপর ব্যাগটা আবার তুলে নিয়ে সবে আলপথ ধরে দু'-চার পা এগিয়েছে, পিছন থেকে গম্ভীর গলার ডাক এল। —গিরিজা !

গিরিজা ফিরে তাকাল।

দেখলে, কালীমোহন আসছেন। কাঁধে পাট করে রাখা চাদর, কপালে সিঁদুরের তিলক, হাতে রুপোর সিংহাসনে রক্তবস্ত্রে ঢাকা দেওয়া কি যেন।

গিরিজা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, তারপর মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে কালীমোহনকে।

কালীমোহন বিড় বিড় করে কী যেন আশীর্বাদ করলেন।

তারপর কঠিন স্বরে বললেন, তুমি ম্লেচ্ছ পোশাক পরলে গিরিজা!

গিরিজা কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সারা শরীর তার শিউরে উঠল ব্রজমোহনের কথা মনে পড়তেই।

কালীমোহন ধীরে ধীরে কুশল প্রশ্ন করলেন। আর পরক্ষণেই যেন একটা আতঙ্ক অনুভব করল গিরিজা। কালীমোহনের কাছ থেকে যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে সে।

ব্রজমোহনের সঙ্গে তার দেখা হবে, কোনওদিন ভাবেনি গিরিজা। দেখা করার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে, আর একটা আতঙ্কের, রহস্যের ঘর খুলে দিয়েছে ব্রজমোহন তার চোখের সামনে।

সে-রহস্যের হদিস পেয়ে সমস্ত শরীরে শিহরন খেলে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, ব্রজমোহনের সঙ্গে বুঝি দেখা না হলেই ভাল হত।

আলপথ ধরে আগে আগে চলেছেন কালীমোহন, পিছনে পিছনে গিরিজা।

অনেকখানি পথ চুপচাপ এগিয়ে এসে হঠাৎ এক সময় থেমে দাঁড়ালেন কালীমোহন। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, ব্রজর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল গিরিজা?

সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠল গিরিজার। কোনওরকমে উত্তর দিল, না।

গিরিজা লক্ষ করল, প্রশ্ন করার সময় কালীমোহনের মুখচোখে যে উৎকণ্ঠা যে ভয় দেখা দিয়েছিল, উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন অন্তর্হিত হল। যেন নিশ্চিন্ত হলেন কালীমোহন।

কিন্তু ভয় গেল না গিরিজার। গ্রামের সকলেই কালীমোহনকে ভয় পেত, শ্রদ্ধা করত। আর যখন রাগে সর্বশরীর ফুলে ফুলে উঠত তাঁর, খড়ম পায়ে খটখট শব্দ করে পায়চারি করতেন কালীমোহন, তখন কেউ সাহস করে তাঁর কাছে যেতে চাইত না।

সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল ছোটমার। অসহায়ের মত নির্বিবাদে কালীমোহনের প্রতিটি আদেশ মেনে চলত।

গিরিজা সে-রাত্রে ঘুমোতে পারলে না। কেবলই ভয়, যদি কালীমোহন কোনওক্রমে জানতে পারেন তার সঙ্গে ছোটঠাকুরের দেখা হয়েছে। যদি জানতে পারেন গোপনে ছোটমার নামে চিঠি পাঠিয়েছে ব্রজমোহন!

নিজের ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা চিঠিখানা বার বার দেখে গিরিজা, স্পর্শ নেয়। ভয় হয়, যদি কারও হাতে পড়ে এ-চিঠি!

চিঠিতে কি লেখা আছে, কি এমন নিষিদ্ধ কথা লেখা থাকতে পারে ভেবে পায় না গিরিজা। তবু পড়ে দেখতে চায় না। যে-চিঠি বিশ্বাস করে তার হাতে তুলে দিয়েছে ব্রজমোহন, সে-চিঠি খুলবে কি করে!

কিন্তু চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পায় না। কি করে পৌঁছে দেবে চিঠিটা, যে-কথা বলতে বলেছে ব্রজমোহন সে-কথা ছোটমাকে কি করে শোনাবে!

শেষে সুযোগ পেয়ে গেল একদিন।

প্রতিদিনের মতই গোঁসাইদিদি সেদিনও খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এসে ঢুকল ঘরে।

ডাকলে, কই গো আমার গিরিগোবর্ধন এসেছে নাকি!

হাসি-হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়াল গিরিজা।

গোঁসাইদিদি জয় মাধব, জয় রাধে বলে ঝনক ঝনক দু'বার খঞ্জনি বাজিয়ে বললে, মথুরা থেকে এলেন গোপাল, বিন্দের জন্যে কি এনেছেন গো!

গিরিজা দেখলে, গোঁসাইদিদির কথা শুনে মা হাসতে হাসতে ঘাটের দিকে চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইদিদি ফিসফিস করে বললে, সই যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে গোপাল।

গিরিজা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে তাকালে তার মুখের দিকে।

গোঁসাইদিদি এদিক ওদিক তাকালে। কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে চাপা গলায় বললে, ছোটঠাকুরের বউ অমিত্তির পাড়ে যেতে বললে তোমায়। কথা আছে তার।

সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা বের করে নিয়ে ছুটল গিরিজা। ছুট ছুট...একেবারে অমিত্তির পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে দেখলে খড়ি নদীর ধার বরাবর খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কুঞ্জের দিকে হেঁটে চলেছে গোঁসাইদিদি। বনতুলসী আর নয়নতারার ঝোপের ধারে ধারে।

আর কিছুক্ষণ পরেই কলসী নিয়ে ছোটমাকে তরতর করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখলে।

তাড়াতাড়ি এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালে ছোটমা। আর গিরিজা ছুটে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানা দিল।

চিঠিটা পড়ল ছোটমা, পড়তে পড়তে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ বেয়ে। তারপর হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, না, না পেসাদ,তা হয় না বাবা, তা হয় না।

গিরিজা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল ছোটমার মুখের দিকে। কত আশা নিয়ে, কত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তার এ-চিঠি পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে সে। সে তো শুধু ছোটমার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যেই। ছোটমার ব্যর্থ জীবনকে নতুন করে ভরে তুলতে পারবে বলেই।

আর ছোটমা কিনা...

ছোটমা বলে উঠল, না পেসাদ, তুমি তাকে বুঝিয়ে বোলো, তা হয় না। আমার জীবন তো নষ্ট হয়েছে, বটঠাকুরের সুনাম, বংশের সুনাম আমি নষ্ট হতে দেব না। লোকে হাসবে, অপমান করবে বটঠাকুরকে, হয়তো—

হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল গিরিজা।

বললে, ছোটঠাকুর খ্রিস্টান হয়েছেন এ-কথা তুমি বলোনি কেন, কেন চেপে রেখেছিলে?

চমকে উঠল ছোটমা। মুখে আঙুল দিয়ে অনুনয় করলে, চুপ, চুপ করো পেসাদ।

রাগে ফেটে পড়ল গিরিজা। বললে, না, চুপ করব না আমি। বলো তুমি, কেন বার বার মিছে কথা বলেছ, কেন জানতে দাওনি তুমি খ্রিস্টানের বউ।

গিরিজার রাগ দেখে সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছোটমার।

ধীরে ধীরে বললে, না, না পেসাদ, এ-কথা তুমি আর কাউকে জানতে দিয়ো না বাবা। এ তুশের আগুনে আমাকেই শুধু জ্বলতে দাও। বটঠাকুরের সম্মান, বটঠাকুরের মেয়েদের বিয়ে...সবই যে আমাকে ভাবতে হয়েছে পেসাদ। আমার নিজের সুখের সঙ্গে যে আরও অনেকের জীবন জড়িয়ে আছে—অনেকের!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরিজা সে-কথা শুনে। বিস্ময়ের চোখে ও শুধু তাকিয়ে রইল

ছোটমার মুখের দিকে। কি আশ্চর্য, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবনকে আহুতি দিয়ে চলেছে ছোটমা, শুধু সংসারের আর পাঁচজনের কথা ভেবে ?

ছোটমা খানিক চুপ করে থেকে বললে, ও কেন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে গেল পেসাদ, কেন, কেন !

গিরিজা ধীরে ধীরে বললে, ছোটঠাকুর তোমাকে নিয়ে যাবেন, জোর করে নিয়ে যাবেন ছোটমা। শুধু তুমি যদি রাজি হও।

শিউরে উঠল ছোটমা। বললে, না, না, তুই তাকে নিষেধ করিস বাবা। আমার এই সিঁথির সিঁদুরটুকুই অনেক সুখ পেসাদ, এটুকুও তুই মুছে দিতে চাস ?

গিরিজা চমকে উঠল সে-কথা শুনে। বললে, কি বলছ ছোটমা ?

—হ্যাঁ বাবা, ও যদি এ-গাঁয়ে ফিরে আসে, যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায় আমাকে...তা হলে...

—তা হলে বটঠাকুর ওকে খুন করাবেন ?

মাথা নিচু করে রইল ছোটমা। কোনও উত্তর দিল না। গিরিজা দেখলে, ছোটমা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখে আঁচল দিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে গিরিজা বললে, কিন্তু ব্রজকাকা যে তোমার সঙ্গে দেখা করবেই ছোটমা। ব্রজকাকা যতদিন ভেবেছে তোমার কাছে ধর্মই বড়, ততদিন তোমার ওপর অভিমানে দূরে সরে থেকেছেন। কিন্তু সে ভুল যে তুমিই ভেঙে দিয়েছ। তোমার জন্যেই যে খ্রিস্টান হয়েছিলেন তিনি, তোমার জন্যেই...

—আমার জন্যে ? কি বলছিস পেসাদ ? বিস্ময়ে অবিশ্বাসে চোখ কপালে তোলে ছোটমা।

গিরিজা উত্তর দিল, হ্যাঁ, ছোটমা, তোমার জন্যেই। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরিজা। তার চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল, যেদিন ব্রজমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সরু গলির সেই মেসের ঘরে একান্তে বসে সব কথা খুলে বলেছিল ব্রজমোহন।

বলেছিল, স্ত্রীর মর্যাদা রাখার জন্যেই আমি ধর্মত্যাগ করেছিলাম গিরিজা।

স্ত্রীর মর্যাদা ! গিরিজার মনে পড়ে গিয়েছিল—মনে পড়ে গিয়েছিল কালীমোহনের তিন-তিনটে বিবাহের কথা। তিন সপত্নীর পরিবার নিয়ে বাস করতেন কালীমোহন। সে-কালে এর মধ্যে কেউ কোনও অন্যায় দেখত না, কোনও অসামাজিকতা ছিল না।

সম্পত্তির লোভে তাই ব্রজমোহনেরও দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন কালীমোহন। বিবাহের দিন পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ব্রজমোহন অসম্মতি জানাল।

ব্রজমোহনের চিঠি পেয়ে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কালীমোহন। ক্রুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখেছিলেন তাকে ; জানিয়েছিলেন, স্বেচ্ছায় রাজি না হলে তাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তিনি, কন্যাপক্ষের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা তিনি রাখবেনই।

কালীমোহনকে ভয় পেত ব্রজমোহন। পিতার স্নেহ দিয়ে অগ্রজ তাঁকে মানুষ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর শাসনকে, তাঁর প্রতিজ্ঞাকে অমান্য করার সাহস ছিল না। জানত, জ্যেষ্ঠ কালীমোহনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস নেই কারও। পিতৃহীন ব্রজমোহন ভয় পেয়েছিল, তাই পরিত্রাণ পাবার জন্যে...

ব্রজমোহন বলেছিল, তাই ধর্মান্তর গ্রহণ করলাম আমি গিরিজা। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আমি, দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের কথা আমি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু...

সপ্রশ্ন চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছে গিরিজা।

আর ব্রজমোহন বলেছিল, অথচ তোমার ছোটমার কাছে ধর্মই বড় হল গিরিজা।

—ছোটমা জানে সে কথা ? প্রশ্ন করলে গিরিজা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে ব্রজমোহন। বললে, না। একটু থেমে আবার বললে, না গিরিজা, কোনওদিন তাকে জানাইনি সে-কথা...আমারও তো অভিমান আছে, গিরিজা, কেন ভুল বুঝল সে, কেন জানতে চাইল না...তবু বার বার আমি তাকে নিয়ে আসতে চেয়েছি, ফিরে পেতে চেয়েছি তাকে।

ব্রজমোহনের সেই কথাটাই ধীরে ধীরে বললে সে ছোটমার কাছে। আর তা শুনে বিস্ফারিত চোখ মেলে গিরিজার মুখের দিকে তাকাল ছোটমা।

গিরিজার দু'খানা হাত ধরে আবেগের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, সত্যি ? সত্যি বলছিস পেসাদ ?

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা'র দুটি বিস্ফারিত চোখ বেয়ে ঝরঝর করে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু পেসাদ, বংশের, পরিবারের মান-সম্মান তো আমি নিজের স্বার্থের খাতিরে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারব না বাবা ! না, না, তা আমি পারব না।

প্রথম প্রথম তাই ব্রজমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও রাজি হয়নি ছোটমা।

বার বার ছোটমার চিঠি বয়ে নিয়ে গেছে গিরিজা, ব্রজমোহনের হাতে সে-চিঠি পৌঁছে দিয়েছে, মিথ্যা স্তোকে ভুলিয়েছে তাকে, আর বার বার ব্রজমোহনের অনুনয়ভরা চিঠি এনে দিয়েছে ছোটমার হাতে। গোপনে গোপনে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু সাহস বাড়েনি ছোটমার। শুধু গিরিজার এনে দেওয়া চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ছোটমা, আর চোখের জল ফেলেছে।

প্রশ্ন করলেই বলেছে, না, না পেসাদ, তা হয় না। এত বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই তার সঙ্গে, এ বেশ আছি। দেখা হলে জ্বালা বাড়বে বই কমবে না।

তারপর কখনও-কখনও একটু থেমে বলেছে, আমার সুখ-আনন্দই তো সব নয়, এত বড় একটা গুরুবংশ, কত সম্মান, সুখ্যাতি, সে-বংশের গায়ে কলঙ্কের দাগ আমি দিতে পারব না পেসাদ।

—কলঙ্ক ? গিরিজা বিস্মিত হয়েছে। কলেজে পড়ে শহরের মানুষের সঙ্গে মিশে ওর মন তখন অনেকখানি মুক্ত হয়েছে। তাই বুঝতে পারেনি ও।

ছোটমা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, কলঙ্ক নয় ! ভটচাজ-বাড়ির ছেলে খ্রিস্টান হয়েছে, এ-কথা শুনলে যে অপমানের শেষ থাকবে না পেসাদ। ভাশুরের মেয়েগুলোর বিয়ে হবে না ! তুই কাউকে বলে ফেলিসনি তো পেসাদ ?

গিরিজা সান্ত্বনা দিয়েছে।—না, না। সেকথা কি বলতে পারি ছোটমা। কিন্তু তুমি যদি ব্রজকাকার কাছে চলে যাও, তা হলে...

ছোটমা গম্ভীর হয়ে গেছে। চোখ ছলছল করে উঠেছে।—কেউ যে বিশ্বাস করবে না রে। কত কি মন্দ কথা ভাববে। সেও যে বংশের দুর্নাম।

তারপর, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে ছোটমা। বলেছে, না, না, আমি সব ছাড়তে পারব, আমি ধর্ম ছাড়তে পারব না পেসাদ। ধর্ম ছাড়তে পারব না।

কি আশ্চর্য, সে-কথা শুনে মনে মনে খুশি হয়েছে গিরিজা, ছোটমার কথায় নিজেও যেন গৌরব বোধ করেছে। ধর্ম। গিরিজার মনে পড়ে প্রথম যেদিন ব্রজমোহন বলেছিল, আমি খ্রিস্টান হয়েছি গিরিজা। সেদিন ভিতরে ভিতরে ব্রজমোহনকে কিছুতেই যেন পছন্দ করতে পারেনি সে। সেদিন একটা অন্ধ ক্রোধে যেন জ্বলে উঠেছিল সে ব্রজমোহনের

বিরুদ্ধে।

অথচ, আশ্চর্য, গোঁসাইদিদির মনে তার জন্যে কোনও ক্ষোভ ছিল না। কোনও ক্রোধ ছিল না।

নতুন গোড়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল গিরিজা। পুকুর পাড়ের বাঁশ কাটছিল ঘরামির দল। চাটুজ্যেদের ঘর ছাওয়াবার জন্যে।

হঠাৎ চাপা গলার গুনগুননি শুনে ফিরে তাকালে গিরিজা। দেখলে গোঁসাইদিদি আসছে। শ্যামলা রঙের মসৃণ গোলগাল মুখখানা তৃপ্তির হাসিতে ভরা। নাকে কপালে ফোঁটা-তিলক, উন্মুক্ত দু'খানা সুডোল কালো কালো বাহুতে গঙ্গামাটির ছাপ, হাতে খঞ্জনি।

খঞ্জনি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এল গোঁসাইদিদি। কণ্ঠে মৃদুসুরের গান, কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজে শ্যাম অনুরাগে...

তারপর কাছে এসে হঠাৎ খঞ্জনি থামিয়ে বললে, কি গোপাল, কুঞ্জে যাবে আমার সঙ্গে ? চলো, বড় গাছের কৃষ্ণফল পেকেছে।

কৃষ্ণফল অর্থাৎ জাম। গোঁসাইদিদি রহস্য করে বলত, আমার শ্যামের ছটায় এমন রং হয় গো, এ ফল কৃষ্ণফল।

গিরিজা হাসল। ইচ্ছেও হল খড়ি নদীর ধারের সেই নয়নতারা-বনতুলসীতে ঘেরা কুঞ্জটা দেখে আসতে। বহুকাল ওদিক পানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তাই বললে, চলো, যাব তোমার সঙ্গে।

গোঁসাইদিদি খুশিতে হেসে বললে, চলো গোপাল, চলো। বলে আলপথ ধরে মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলল তরতর করে, পিছনে পিছনে গিরিজা।

গিরিজার কাছে গোঁসাইদিদি চিরদিনই এক রহস্য। গ্রামের সব মেয়েদের মুখেই দুঃখের ছাপ, কান্না, ব্যথা। অথচ গোঁসাইদিদির ঢলোঢলো মুখে সব সময় তৃপ্তির হাসি।

গিরিজা তাই হঠাৎ এক সময় বলে বসল, তোমার কোনও দুঃখ নেই, না গোঁসাইদিদি !

গোঁসাইদিদি ফিরে তাকাল, হেসে বললে, গোবিন্দ তো দুঃখ কাউকে দেন না। বলেই গান ধরল, শ্যামেরে পাইলে কাছে সে যে গো অতীব সুখো, শ্যাম-বিচ্ছেদে সে যে আনন্দ-দুঃখ !

আর গিরিজার মনে হল, ছোটমার মনেও যদি এমনি আনন্দ থাকত, এমনি তৃপ্তি !

কাঁটাকুলের ঝোপ এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল গিরিজা। হঠাৎ গোঁসাইদিদি বললে, গোপাল, শোন একটা গোপন কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—কি কথা ? বিস্মিত হল গিরিজা।

গোঁসাইদিদি বললে, ছোটঠাকুরকে একবার লুকিয়ে আমার কুঞ্জে আনতে পারো গোপাল

গিরিজা চমকে উঠল কথা শুনে। কোনও উত্তর দিতে পারল না।

আর গোঁসাইদিদি বললে, একবার আসতে বল গোপাল, সইকে এনে একবার দেখা করিয়ে দিই।

গিরিজা স্তম্ভিত হয়ে বললে, কি বলছ গোঁসাইদিদি ?

গোঁসাইদিদি হাসল। বললে, সব জানি রে, সেই কবে থেকে—সব জানি। সই আমায় সব বলেছিল।

তারপর ধীরে ধীরে গাইলে,

হৃদয়ের ভূষণ আমার চিন্তামণি ধন,
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন।
কাজল দিয়ে কি সাজাবি ?

পরক্ষণেই হঠাৎ গান থামিয়ে বললে, জীবন হল কুসুমের বন, কাঁটা ফেলে দিয়ে গাঁথো চিকন মালা।

গিরিজা তাকাল গোঁসাইদিদির মুখের দিকে।

বললে, কিন্তু ছোটমা যে রাজি হবে না গোঁসাইদিদি!

—হবে গোপাল, হবে। কেত্তন শোনার নাম করে নিয়ে আসব আমি। বড়ঠাকুর জানতেও পারবে না।

কিন্তু বড়ঠাকুর জানতে পারলেই হয়তো ভাল ছিল!

চব্বিশ

সেদিন সাজঘরের আড়ালে আবছা অন্ধকারে দাঁড়ানো ছায়া-ছায়া মানুষটার দিকে কারও হয়তো চোখ পড়েনি, চোখ পড়েছিল শুধু লক্ষ্মীমণির।

কোনওরকমে পার্ট শেষ করে গাঁয়ের লোকের হৈ-হুল্লোড় বিদ্রূপের চিৎকারকে তুচ্ছ করে উদাস ছুটে বেরিয়ে গেল আসর থেকে, আর তার পিছনে ধাওয়া করল লক্ষ্মীমণির বেদনার্ত দুটি চোখ। উদাসের কাছ থেকে কোনওদিন এতটুকু ভাল ব্যবহার পায়নি সে, তাই নিঃস্বতার জ্বালায় কোনওদিন উদাসকে সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিশ্চয় সে উদাসের ভালবাসা পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছিল। পুজোর দিনটিতে সেই উদাস একখানা নতুন শাড়ি এনে তুলে দিয়েছিল তার হাতে। হেসে বলেছিল, পুজোপাব্বনের দিন আমার বউটাকে কানি পরিয়ে রাখলাম রে লক্ষ্মী, আমি মানুষ লয়, মানুষ লয়।

আর তা শুনে প্রথমটা যেন বিশ্বাসই হয়নি লক্ষ্মীমণির। বিশ্বাস যখন হয়েছে তখন বিস্মিত আনন্দে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। সুখের আনন্দের অশ্রু। উদাস যে কোনওদিন তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবে, এমন আদর-সোহাগের সুরে, ভাবতেই পারেনি সে। তাই সঙ্গে সঙ্গে যেন মানুষ বদলে গেছে লক্ষ্মীমণি। করুণ চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছে। নতুন শাড়িখানা পরে এসে ঢিপ করে একটা গড় করেছে উদাসের পায়ে। উঠে লাজুক লাজুক চোখে তাকিয়েছে স্বামীর মুখের দিকে। আর শক্ত একখানা হাতে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে উদাস, হেসে বলেছে, পটের বিবি লাগছে তোরে।

সারাটা দিন মনের মধ্যে তার ফুর্তির মৌমাছি গুনগুন করেছে। এক-একবার শুধু সন্দেহ হয়েছে ন্যাংটেশ্বরতলার মানত ফলেছে বুঝি, কখনও বা মনে হয়েছে বেলাংডিহির রোজা-বউয়ের মাদুলির ফল।

তবু খুশি হয়েছিল লক্ষ্মীমণি। ভেবেছিল, নতুন করে জীবন শুরু করবে আবার। স্বামী শ্বশুর সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে এবার থেকে।

কিন্তু সব স্বপ্ন যেন মুহূর্তে ভেঙে গেল তার।

মুগ্ধ হয়ে সে'ও শুনছিল উদাসের পার্ট, যাত্রা দেখছিল। কি আশ্চর্য, এত সুন্দর পার্ট করে উদাস, গাঁ-সুদ্ধ লোক এত তারিফ করে তার, অথচ কোনওদিন জানতে চায়নি সে, দেখতে চায়নি।

লোকের মুখে বাহবা শুনে মনে মনে বেশ একটা গর্ব বোধ করছিল লক্ষ্মীমণি ; নিজেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তন্ময়তা কেটে গেল হঠাৎ।

পার্ট ভুলে যেতেই বিভ্রান্ত বিচলিত দেখাল উদাসকে, আর সবাই হাসাহাসি শুরু করলে। মরমে মরে গেল লক্ষ্মীমণি। উদাসের অপমান যেন তারও লজ্জা।

কিন্তু কেন যে পার্ট ভুল হয়ে গেল উদাসের, জানতে বাকি রইল না লক্ষ্মীমণির।

উদাস আসর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেই লক্ষ্মীমণির চোখের দৃষ্টিও তার পিছনে পিছনে ছুটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরের আড়ালে নির্জন ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল লক্ষ্মীমণি, চিনতে পারল।

পদ্ম!

স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। ভেবেছিল, তার জীবন থেকে দুঃখের কাঁটাটা বুঝি চিরতরে সরে গেছে। যায়নি।

পরের দৃশ্যে আবার আসরে ফিরে এল উদাস, ঘুরে ঘুরে আবার অভিনয় করতে শুরু করলে, ঘন ঘন হাততালি পড়ল, সবাই বললে এত ভাল অভিনয় কোনওদিন করেনি উদাস। কিন্তু, উদাস লক্ষ করল না কখন চুপিচুপি আসর থেকে উঠে চলে গেছে লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মীমণির কথা তখন মুছে গেছে উদাসের মন থেকে। এতদিন পরে ফিরে পাওয়া সেই পুরনো নেশাটায় ও তখন আবার মেতে উঠেছে।

পদ্ম ফিরে এসেছে! পদ্ম ফিরে এসেছে! সারা শরীরে একটা পুলকের শিহরন খেলে যায়।

পদ্মর হাত দু'খানা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে উদাস বলেছিল, তুই থাকবি তো পদ্ম, পার্ট শেষ করেই আসব আবার, পালিয়ে যাবি না তো!

তা শুনে পদ্ম হেসেছে। রহস্যের সুরে বলেছে, পালাব ক্যানে গো বোনাই, পালিয়ে থাকতে নারলাম বলেই তো ফিরে এলাম। তুমি যাও, আমি ডাঁরিয়ে আছি।

কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলিটা বগলে চেপে সত্যিই শেষ অবধি যাত্রা দেখেছে পদ্ম। এদিকে একে একে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে চারধারে, যাত্রা শেষে একে একে ভিড় ফিকে হয়ে গেছে, আর পদ্মর হাত ধরে শেষরাত্রির হাল্কা অন্ধকারে খড়ি নদীর দিকে হেঁটে গেছে উদাস।

শুকনো খড়ি নদীর মাঝ বরাবর ঝিকমিক করে সরু ফিতের মত জলের ধারা—তারই পাশে বসেছে দু'জনে।

উদাস বলেছে, তুই ফিরে আসবি, আমি কতবার স্বপন দেখেছি পদ্ম, কিন্তু এমনভাবে আসবি...

হেসে উঠেছে পদ্ম খিলখিল করে। বলেছে, পালা নামাবে তুমি, লটের বেশ পরবে, আমি না এসে পারি গো বোনাই!

বলে কাপড়ের পুঁটলি খুলে গলায় কালো সুতোর ফাঁস-আঁটা তেলের শিশিটা বের করে বলেছে, এসো, রঙগুলোন তুলে দিই তোমার মুখ থেকে!

হেসে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে উদাস। প্রশ্ন করেছে, মনে আছে তোর, পদ্ম?

মনে থাকবারই তো কথা। প্রতি বছরই যাত্রার পর শেষ রাতে বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে পড়ত উদাস, ঘুমোত সেই দুপুর অবধি, ছায়া যখন মানুষের পায়ের কাছে এসে পড়ত। আর সেই সময় এসে তাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলত পদ্ম, বলত, রাজা হয়েই রইবে নাকি গো জীবনভোর, রং ধুতে হবে না মুখের? বলে মুখে তার তেল ঘসে ঘসে তুলে দিত সব রঙের দাগ।

আর দূর থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেদিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখত লক্ষ্মীমণি। চাপা রাগে গুমরে মরত সে। রাগ শুধু স্বামীর ওপর নয়, পদ্মর ওপরই নয়,

পদ্মর বাপের ওপরও ভিতরে ভিতরে চটত সে। কিন্তু উদাস সত্যিই কোনওদিন পদ্মকে বিয়ে করতে চাইবে, পদ্মর বাপ মত দেবে সে বিয়েয়, ভাবেনি লক্ষ্মীমণি। আর তাই একদিন রাগের মাথায় ছুটে গিয়েছিল কাটারি নিয়ে, পদ্মর বাপকে হয়তো আরেকটু হলেই কুপিয়ে ফেলত ; যদি না পদ্ম ধরে ফেলত শেষ মুহূর্তে।

উদাস ভাবত, সেই দুঃখেই বুঝি গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল পদ্ম ! লক্ষ্মীমণিকে শাস্তি দেবার জন্যে, কিংবা তার নিজের বুড়ো বাপটাকে লক্ষ্মীমণির আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

পদ্ম তার মুখের রং ঘসে ঘসে তুলে দিতে দিতে কেন জানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আর উদাস প্রশ্ন করলে, তুই ক্যানে গাঁ ছাড়লি পদ্ম, কোথায় যেয়েছিলি ?

পদ্ম হেসে বললে, আমার সাথে চলো ক্যানে বোনাই সিখানে, নাকিন আমার লক্ষ্মী বুনটার জন্যে মন কাঁদবে তোমার ?

কোনও উত্তর দিল না উদাস। সমস্ত শরীরটা তার হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। পদ্মর মুখে এই একটা রসিকতা বহুবার শুনেছে সে, শুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছে। কেন পদ্ম বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না যে লক্ষ্মীমণির জন্যে তার মনে কোনও টান নেই, ভালবাসা নেই।

কিন্তু পদ্ম অতশত বোঝবার চেষ্টা করল না। হাসি থামিয়ে হঠাৎ থমথমে মুখে ও প্রশ্ন করলে, ডাক্তার মানুষটা ভাল আছেন গো বোনাই ?

খবরটা শুনেই লাঠি ঠুক ঠুক করে ডাক্তারের বাড়িতে এসে হাজির হল বুড়ি অট্টামা।

পুজোর মধ্যেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আর তার পর থেকেই সিরসিরে শীত পড়েছে। রোদের রং গেছে বদলে, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ।

অবিনাশ ডাক্তার তাই ভোরবেলায় মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল। গালে সাবান লাগাতে লাগাতে মুখ তুলতেই দেখলে, লাঠির ডগায় রোগা শীর্ণ দেহটার ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে আসছে অট্টামা।

এমন প্রায়ই আসে অট্টামা, কখনও দুটি গাছের সিম নয়তো খেঁড়ো দিতে, কখনও শুধুই দু'দণ্ড বসে গল্প করতে। বুড়োমানুষ, রাতে ভাল ঘুম হয় না, আঁধার না কাটতেই উঠে পড়তে হয় বিছানা ছেড়ে। কখনও কৌশল্যাকে ডাকে, কখনও বা ভোর হতেই এর-ওর বাড়ির পৈঠেতে গিয়ে বসে লাঠিটা নামিয়ে রেখে। কিন্তু গিয়ে বসলে কি হবে, সকালে উঠে সকলেরই হাজারো কাজ। ব্যস্ত বা বিরক্ত মানুষগুলো দেখেও দেখে না অট্টামাকে, ভাল করে দুটো কথাও বলে না। তাই শরীর একটু ভাল থাকলেই ডাক্তারের কাছে চলে আসে সে।

সেদিনও লাঠি ঠুক ঠুক করে ডাক্তারের বাড়ির দিকেই এগিয়ে এল অট্টামা। পাড়া ছেড়ে গাঁয়ের এক প্রান্তে ডাক্তারের বাড়ি, এতখানি হেঁটে আসতেও কষ্ট হয়। তবু কি এক নেশার আকর্ষণ যেন, না এসে থাকতে পারে না।

অবিনাশ ডাক্তার অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছিল অট্টামাকে। বারান্দার ঠাণ্ডা রোদে পিঠ দিয়ে বসে গালে সাবানের ব্রাশ বোলাতে বোলাতে একবার সামনের দিকে তাকালে অবিনাশ ডাক্তার, হাড়-জিরজিরে চেহারা নিয়ে অট্টামাকে তিড়িং তিড়িং করে প্রায় লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে নিজের মনেই হাসল সে।

অট্টামা অবশ্য দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখে ছানি পড়েছে, বেশি দূর থেকে লোক চিনতে পারে না একেবারেই। সাদা কাপড়টা শুধু ফটফট করে, মানুষ কেউ একটা, শুধু এইটুকুই বুঝতে পারে।

লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে কাছে এসে তাই হাঁক ছাড়লে অট্টামা। —কই গো ছেলে, আছো নিকিনি।

ডাক্তার হেসে বললে, এই তো বসে রয়েছি, চোখে আর ভাল দেখতে পাচ্ছেন না নাকি অট্টামা।

—না বাবা, দূর থেকে মনে হচ্ছিল বটে, সাদা মতন কি যেন ফটফট করছে, দিষ্টি তা বাপু একটু ক্ষীণ হয়েছে। বলে ধীরে ধীরে বারান্দায় বসলে অট্টামা, লাঠিটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকাতেই স্পষ্ট দেখতে পেল।

নিজের মনেই হেসে বললে, রোদের ছটা লেগে দেখতে পাই নাই, বুঝলে ডাক্তার, দৃষ্টি আমার এ-বয়সেও যা আছে...

অবিনাশ ডাক্তার সায় দিয়ে বললে, তা ঠিক। শরীরটা বেশ ভাল আছে তো আপনার ?

শরীর ? মুখ বেজার করলে অট্টামা। বললে, ওই বাতের ব্যথাটা বাবা...ও সারবে না। বলে ডান পা'টা সামনে মেলে দিয়ে নিজেই নিজের হাঁটুটা টিপতে শুরু করলে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল ডাক্তার দাড়ি কামাচ্ছে। এতক্ষণ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। তাই নিজের মনেই বললে, দিনে দিনে কত পরিবত্তনই হল বাবা। পরামানিক গাঁয়ে-ঘরে আর রইল না।

অবিনাশ ডাক্তার গালের ওপর দিয়ে চরচর করে সেফটি রেজর টানতে টানতে শুধু বললে, হুঁ।

অট্টামা আবার বললে, এক ঘর ছিল, তা বাপ-বেটায় নাকি চুঁচড়োয় না কোথায় গিয়ে দোকান খুলেছে। বলেই ফোকলা মুখে সশব্দে হেসে উঠল। বললে, বাপের কালেও শুনি নাই ডাক্তার। ফ্যান খেয়ে মলো বাপ, তারও নাম পরতাপ...চুল ছাঁটিবে, দাড়িমোচ কামাবে, তারও নাকি দোকান !

ডাক্তার প্রশ্ন করলে, এ-গাঁয়ে পরামানিক ছিল তা হলে ?

—ছিল না ? হেই মা, পাঁচ বিঘে চাকরান ছিল বিধু পরামানিকের, ঘরে-ঘরে বছরে ছ'টাকা করে মাইনে...তা থাকবে ক্যানে বলো, এখন যে গাঁয়ের মানুষ গোলাম, শহুরে হলেই সেলাম !

ডাক্তার হাসল, কোনও কথা বললে না। তারপর জিগ্যেস করলে, একটু চা খাবেন নাকি ?

—চা ? ছানি-পড়া চোখ দুটোয় খুশি উপছে পড়ল। —তা দেবে তো দাও। বলে নিজেই ডাকলে, পাব্বুতি, অ কেলে পাব্বুতি !

কপাটের আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনছিল পার্বতী, কিন্তু সাড়া দিল না। কেলে পার্বতী বলে ডাকে বলেই অট্টামার ওপর তার রাগ।

তার দিকে চোখ পড়তেই ডাক্তার হেসে ফেললে, আর অট্টামাকে ভেংচি কেটে পার্বতী ভিতরে চলে গেল।

অট্টামা পার্বতীর সাড়া না পেয়ে ভাবলে সে বাড়িতে নেই। তাই কথা ঘুরিয়ে বললে, হ্যাঁ গা ডাক্তার, গরমেন্ট সব জমিজমা নাকি নিয়ে নেবে ? ওই যে সব দু'বার দু'বার ফরম সই করে পাঠালে সেবার...

ডাক্তার হেসে বললে, সব নেবে না, পঁচিশ একরের বেশি হলে তবেই...

—জমি নিয়ে কি করবে গরমেন্ট ?

—কি আর করবে, যাদের জমিজমা নেই, তাদের পাঁচ-সাত বিঘে করে দেবে হয়তো।

অট্টামার ফোকলা মুখখানা এবার হেসে উঠল। বললে, হায় কপাল, পাঁচ বিঘে জমিতে

দুঃখ ঘুচবে। তা হলে বিধু পরামানিক বউ-বেটা নিয়ে চুঁচড়োয় গিয়ে দোকান খুলত ডাক্তার? আর ওদেরও বলি, দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে তেঁতুল রইল গাছে বেঁকে। ভাবলে, দোকান খুললেই অবনী চাটুজ্যের মত ধনী হবে।

বলে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সিমেন্টের ওপর বাঘবন্দির ঘর কাটলে অট্টামা, তারপর হঠাৎ বললে, তা দেশের লোকের জমিজমা নিচ্ছে নিক, শহর-বাজারের লোকেদের নেবে না ক্যানে!

অবিনাশ ডাক্তারের ততক্ষণে দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। ভিজে গামছায় মুখের সাবান মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলে, শহরে আবার চাষের জমি কোথায়?

—না গো ডাক্তার, তা নয়। ওই যে বলগাঁর কোঙারদের পাঁচখানা বাড়ি আছে বদ্দমানে, অবনী চাটুজ্যের রাজপেসাদ আছে কলকাতায়...কাজি বলে, আমি সবাইকে সমান দেখি, রাজার হলেও কাড়ব ঢেঁকি। বলে, ঢেঁকি নেই রাজার ঘরে তাই কেড়ে নিই না, সেই বিত্তান্ত। বলে ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে হাসলে।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল অট্টামা, পার্বতী এসে তার আগেই অট্টামার সামনে ঠকাস করে এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অট্টামা তার দিকে তাকালে কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে, তারপর হাসি চেপে বললে, অত দেমাক ভাল নয় লো, ভাল নয়। ওঃ, ছুঁড়ি যেন মরাইতলায় মুনিশকে ভাত দিচ্ছে। নাক নেই বেটির, নথের শখ, ফেলনা বেটির কত ঠমক।

বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল অট্টামা। বিড়বিড় করে বললে, একেবারে জুড়িয়ে এনেছে ছুঁড়ি।

তারপর একটু থেমে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ গা ডাক্তার, তোমাদের ওই বিডি-আপিসের পেভাকর না কি নাম...আজকাল সব স্মরণ থাকে না বাপু...তার বিয়ের কিছু শুনেছ নাকি?

ডাক্তার এতক্ষণে যেন উৎসাহ পেল। বললে, আপনারা সব ধরে বেঁধে দিয়ে দিন, তা নইলে হবে কি করে?

অট্টামা একমুখ হেসে বললে, ও ছেলে কি নুকিয়ে বিয়ে করবে নাকি ডাক্তার। ও ভারী ভাল ছেলে, সৎপুত্র বাপের, মোনপুরের বউ বলছিল, পেভাকর নাকি বলেছে বাপ যেখানে বলবে, সেখানেই করবে বিয়ে।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললে, তাই নাকি? এ-বাজারে তা হলে খুব পিতৃভক্ত ছেলে বলতে হবে।

—হ্যাঁ বাবা, পিত্তিভক্ত বটে। তারপরই হেসে বললে, গোকুলে নেই সুবলসখা, কেঁদে মলো শূর্পণখা। সেই বিত্তান্ত। মেয়ের বাপরা যদি না ভাবে তো আমার চিন্তা ক্যানে!

চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজবে মেতে উঠল অট্টামা।

একসময় হঠাৎ খেয়াল হল, বেলা বেড়েছে। রোদ কাঁপছে মাঠের ওপর। তাকানো যায় না চোখ মেলে। বললে, কি চনমনে রোদ হয়েছে বাবা, উঠি আজ। আবার এতখানি পথ যেতে হবে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অট্টামা। তারপর লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললে, হ্যাঁ গা ডাক্তার, পদ্ম ফিরে এয়েছে শোনলাম।

—পদ্ম? বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলে অবিনাশ ডাক্তার।

অট্টামা বললে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পদ্ম ফিরেছে। আমি যে শোনলাম।

পঁচিশ

পাঁচিল তুলে ভদ্রাসন ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জমিপুকুর তখনও ভাগ হয়নি। আঘাতটা তখনও গিরিজাপ্রসাদের বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে। অবোধ্য একটা নিঃস্বতা যেন।

সারা জীবন ধরে কত কি স্বপ্ন দেখেছেন গিরিজাপ্রসাদ। সারা জীবন সব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, মুখ বুজে কাজ করে গেছেন সকাল-সন্ধে, কিন্তু সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে একটি মাত্র স্বপ্ন ছিল। বনপলাশিতে ফিরে আসবেন, সুখে শান্তিতে কাটাবেন শেষ জীবনটা, বনপলাশির সেই শৈশবের স্মৃতিতে ঘেরা মধুর জীবনটুকুই আবার ফিরে পাবেন। অভাব আর দৈন্যকেও ভয় পাননি গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু গিরীন যে তাঁর হৃদয়কে নিঃস্ব করে দেবে কোনওদিন এ আশঙ্কা তো তিনি করেননি!

গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়ে একবার দাঁতের ব্যথায় অসহ্য যন্ত্রণায় মাড়িতে সেফটিপিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষিয়ে তুলেছিলেন তিনি। ইচ্ছে হয়েছিল ছুরি দিয়ে কেটে খানিকটা রক্ত বের করে দিতে। আসলে সেটা ছিল অসহ্য যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটা বোবা আক্রোশ। এই পারিবারিক কলহ যেন সেই দাঁতের ব্যথার মতই। একটু একটু করে দিনে দিনে কখন যেন চাপা যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারেননি। এই দৈনন্দিন জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশাতেই, না কি এই জ্বালা যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশে, মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হয়েছে দু'-বাড়ির মাঝখানে, দুটি পরিবারের মাঝখানে একটা পাঁচিল তুলে দিতে পারলেই বুঝি শান্তি ফিরবে।

কোদালের কোপটা মাটির বুকে নয়, গিরিজাপ্রসাদের বুকের মাঝেই পড়বে, কে জানত। যন্ত্রের মত, হয়তো বা আক্রোশের বশেই একটার পর একটা হুকুম দিয়ে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ, স্ত্রীকে বলেছেন হাঁড়ি আলাদা করতে, ছেলেমেয়েদের বাধা দিয়েছেন ও-বাড়ির সঙ্গে মেলামেশা করতে, যতে কোটালকে ডেকে পাঁচিল তুলে দিতে বলেছেন. আর দিনে দিনে ফাটল বেড়েছে, ঠিক সেই শুখোর বছরের মাঠের মত। নিষ্করুণ আকাশ আর রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মতই ভিতরে ভিতরে তাঁর সারা বুক খাঁ খাঁ করে উঠেছে। অথচ তখন আর উপায় নেই ফিরে যাবার। নেশার ঘোরেই যেন বিচ্ছেদকে বাড়িয়ে তুলেছেন দিনে দিনে।

কিন্তু তারপর যা ঘটে গেছে, ঘটে গেল, তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে। কাঁদতে পারেননি, পারেননি বলেই জ্বালা বেড়েছে।

সব সময়েই তাই অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু অন্যমনস্ক কি হতে পারেন? পারেন না। ঘুরে ঘুরে কেবলই তুচ্ছ এক-একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। মোহনপুরের বউ কবে কি বলেছে নিভাননীকে, গিরীন বলেছে তাঁকে। কিংবা গিরীনের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার, কে কখন তাঁকে এড়িয়ে গেছে, কিংবা ভাল করে কথা বলেনি। প্রত্যেকটি তুচ্ছ ঘটনাই যেন ছুঁচের মত এসে বুকে বিঁধে থাকে, ক্রোধে অধীর করে তোলে তাঁকে।

বংশী মাঝে মাঝে আসে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভালই হল গো গিরিদাদা, পেথক হয়েছ এ তোমার অনেক শান্তি।

বুড়ি অট্টামা লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বলে, মন খারাপ করিসনে পেসাদ, দিনকালের যা নিয়ম তাই হয়েছে। কার না হচ্ছে এমনটা।

কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ এ-সবের মধ্যে কোনও সান্ত্বনাই খুঁজে পান না। বংশীর সঙ্গে.

কিংবা অবিনাশ ডাক্তার যেদিন আসে, সেদিনও গল্পগুজব করতে ভাল লাগে না গিরিজাপ্রসাদের। নিজের মনেই তাই ঘরে বসে টুকিটাকি কাজ করেন। ছুঁচসুতো নিয়ে এটা-ওটা সেলাই করেন।

সেদিনও পুরনো ছেঁড়া শালখানা নিয়ে রিপু করার চেষ্টা করছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

হঠাৎ গিরীন এল, এসে দাঁড়াল সামনে। কোনও কথা বললে না।

গিরিজাপ্রসাদ ছেঁড়া শালে রিপুর ফোঁড় দিতে দিতে একবার চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে, চোখ নামিয়ে নিলেন।

গিরীন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, বলছিলাম কি, এবার জমিজমাগুলো ভাগ করে নাও!

চোখ তুলে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, অবনী তো চলে গেল, মধ্যস্থ করতে হবে তো একজনকে।

গিরীন বাধা দিল। —মধ্যস্থ কি হবে! তা তুমি যদি চাও...

গিরিজাপ্রসাদ কোনও কথা বললেন না। একটু অপেক্ষা করে গিরীন বললে, তা হলে একদিন বসে...

এবারও কোনও সাড়া দিলেন না গিরিজাপ্রসাদ। যেমন ছুঁচ ফুঁড়ছিলেন তেমনি ছুঁচ ফুঁড়তে লাগলেন ছেঁড়া শালটায়।

গিরীন চলে গেল। আর কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন নিভাননী। প্রশ্ন করলেন, কি বলছিল ঠাকুরপো?

—শুনতেই তো পেলে।

নিভাননী বললেন, ও যাই বলুক, মধ্যস্থ কাউকে রেখো। নইলে লোকে বলবে, ছোট ভাইকে ঠকিয়ে নিয়েছ।

একটু থেমে আবার বললেন, লোকে বলবে কেন, ওরাই বলবে দু'দিন পরে।

গিরিজাপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুঁ।

গিরীন সরে এল বটে, কিন্তু তার বুকের ওপর তখনও যেন একটা ভারী পাথর চেপে বসে আছে। দাদার মুখের দিকে তাকাতে সত্যিই কষ্ট হয়। এমন যে হবে, এমন যে হতে পারে, সেও কি ভেবেছিল! কোত্থেকে কি যে হয়ে গেল!

ফিরে এসে গিরীন ডাকলে, টিয়া!

টিয়া সাড়া দিল না, ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। সেদিন রাতে বাবা আর মাকে তার বিয়ের কথা বলতে শুনে থেকেই রাতারাতি তার শরীরে মনে যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে। আগের মত আর ছুটোছুটি করতে পারে না, জোরে কথা বলতেও কেমন সঙ্কোচ। সমস্ত শরীর ঘিরে একটা কমনীয় জড়তার জালে যেন সে বাঁধা পড়ে গেছে। যেন কেউ অলক্ষ্যে থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আচরণ লক্ষ করছে। অন্ধকার নির্জন রাতে যেমন নিজের পায়ের শব্দটাকেই মনে হয় কেউ অনুসরণ করছে, এও যেন অনেকটা তাই। অদ্ভুত একটা লজ্জা সঙ্কোচ যেন পিছু নিয়েছে।

গিরীনও এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ করেছে। লক্ষ করে খুশি হয়েছে মনে মনে।

টিয়া সামনে এসে দাঁড়াতেই তার মুখের দিকে তাকালে গিরীন, তারপর ফিসফিস করে বললে, টিয়া! দেখ তো জ্যাঠা বসে বসে কি সেলাই করছে, যা না। গিয়ে তুই করে দিলেও তে পারিস!

বিস্ময়ে চোখ তুলে বাপের দিকে তাকাল টিয়া। সঙ্গে সঙ্গে গিরীন মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালে। নিজের মেয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াতে যেন লজ্জা।

টিয়ার চোখে ধীরে ধীরে একটা খুশির স্নিগ্ধ চাপা হাসি উঁকি দিয়েই নিবে গেল। জড়তার ধীর পদক্ষেপে পাঁচিলের ওপারে, জ্যাঠাদের দক্ষিণ-দুয়োরি ঘরখানার দিকে চলে গেল টিয়া।

আর গিরীনের মুখেও তৃপ্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই লাল পাড় শাড়ির আঁচলে হলুদের হাত মুছতে মুছতে মোহনপুরের বউ এসে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলে, বলেছ !

—হ্যাঁ। ব্যবস্থা করতে বলল ! দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরীন। যেন বুকের ভিতর একটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মোহনপুরের বউ বললে, তা হলে আর দেরি কোরো না।

—না।

দেরি করলে চলবেই বা কি করে ! প্রভাকরের সঙ্গেই যে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে, এতখানি আশা অবশ্য করে না মোহনপুরের বউ। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে ! তাই পণের টাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি করে রাখতে হবে। ওদিকে সব গয়নাগাটি বন্ধক দিয়ে টাকা নিতে হয়েছে, হাস্কিং মেশিনটা কেনবার সময়। সেগুলোও ফিরিয়ে আনতে হবে। সুতরাং জমিজমা কিছু বেচতেই হবে। সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি পৃথক হওয়া প্রয়োজন।

তিরিশ একর তো মাত্র জমি। তার পঁচিশ একর রেখে বাকি পাঁচ একর গবর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে গিরীন। অনেকদিন আগেই। ভেবেছিল, গবর্নমেন্ট এত ঢাক পিটিয়ে যখন বলছে, জমির জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবে, তখন নিশ্চয় টাকাটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেছে, টাকা তো দূরের কথা, কোনও খোঁজখবরও মেলেনি।

মোহনপুরের বউ বললে, কোন জমি বেচবে তাও তো ভাবতে হবে।

গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—হুঁ। একটু থেমে বললে, চাটুজ্যেদের অবনীর মত করলেই হত তখন, ক'টা টাকা ঘুস দিয়ে পুরনো তারিখে বেনামি করে রাখলে এত ঝঞ্ঝাট হত না।

—তা ঠিক। যে পাঁচ একর ছেড়ে দিতে চেয়েছ, সে তো আর বেচতে পাবে না ?

—না। যে জমিগুলো রাখব বলছি তা থেকেই বেচতে হবে।

—তা হলে পঁচিশ একরও থাকবে না যে ! ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে সেটুকুও থাকবে না ? খাবে কি ?

—কেন, হাস্কিং মেশিন একদিন রীতিমত ধানকল হয়ে যাবে, দেখো।

মোহনপুরের বউ বিদ্রূপের হাসি হাসলে—তবেই হয়েছে। ঘুসটুস দিয়ে এখন নয় লাইসেন্স বের করেছ, দু'বছর বাদে লাইসেন্স যদি কেড়ে নেয় ! অন্য কেউ বেশি ঘুস দিলেই তো কেড়ে নেবে।

গিরীন বিষণ্ণ হাসি হাসল।—তখন চাকরি করবে !

—কে দেবে চাকরি ওদের ? একটা ইস্কুল নেই যে পড়ে পাশ করবে।

চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠল মোহনপুরের বউয়েব। রাগে জ্বলে উঠল সারা শরীর। বললে, নুড়ো ঘসে দাও অমন গরমেন্টের মুখে।

সংসারের দিঘিতে অষ্টপ্রহর সাঁতার কেটেও গায়ে না লাগে জল, না কাদা—এমন একজনই আছে। ডানা ঝাড়া দিলেই যেমন হাঁসের পালক থেকে জল ঝরে পড়ে, টিয়াও যেন তেমনি। ভোর থেকে নিশুতি রাত অবধি কাজের ঘানিতে নিজেকে বেঁধে রেখেও সংসারের কোনও দুশ্চিন্তা নিয়েই তার মাথাব্যথা নেই।

তবু সবকিছুর মধ্যে একটাই শুধু স্বপ্ন। বিয়ের।

মা আর বাবাকে আড়ালে ওর বিয়ের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে শুনলেই মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে টিয়া। আবার যখন বেশ কিছুদিন ধরে কোনও আলোচনাই শুনতে পায় না, তখন সব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকেই কিসের যেন অভাব বোধ করে। কি যেন নেই, কি যেন নেই—বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত কথা গুমরে ওঠে। আর তখনই প্রভাকরকে মনে পড়ে যায়। তুচ্ছ ছোট ছোট দু'-একটা ঘটনা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। যাত্রার আসরে যেদিন চোখোচোখি হয়েছিল একবারের জন্যে, কিংবা অট্টামার সেই প্রথম দিনের কথা : টিয়াকে বোধহয় খুব পছন্দ পেভাকরের। কিংবা এমনি ধারার কিছু একটা।

প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করে যেদিন গিরীন ফিরে এল, মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে পণের টাকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বললে, দেখি, যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। সেদিন কি আনন্দ যে হয়েছিল টিয়ার!

বাবা-মা'র দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয়নি তার। শুধু কথাটা কোনও একজনকে বলতে ইচ্ছে হয়েছে। এত বড় একটা আনন্দের খবর টিয়া তার ছোট্ট বুকে কি করে লুকিয়ে রাখবে! ইচ্ছে হয়েছে রেণুদি নয়তো রাঙাবৌদিকে গিয়ে বলতে। সুখের খবর আরেকজনকে না বলে কি আনন্দ পাওয়া যায়!

তাই সকালবেলাতেই এক ফাঁকে রেণুদিদের বাড়িতে এসে হাজির হল টিয়া। দেখলে দামুদাদা, রাঙাবৌদি, রেণুদি সবাই হাসি-হাসি মুখ। দামুদার কোলে নাদুসনুদুস চেহারার বাচ্চা ছেলে ফিরু।

টিয়াও একমুখ হাসি নিয়ে ঢুকল, ছুটে গিয়ে দামু পালের কোল থেকে ফিরুকে তুলে নিয়ে জিগ্যেস করলে, কখন এলে দামুদা!

রেণুদি হেসে বললে, কাল রাতে এসেছে দাদা। বলেই যোগ করলে, একটা খুব ভাল খবর আছে টিয়া।

টিয়া বিস্ময়ের চোখে তাকালে রেণুদির মুখের দিকে। সেই যে পুজোর পর চলে গিয়েছিল দামুদা, তারপর দু'-একবার এসেছে গ্রামে, দু'-একবার আভাস দিয়েছে এ ব্যাপারে, কিন্তু সেদিনটা যে এত কাছে ঘনিয়ে আসবে ভাবতে পারেনি।

টিয়ার বিস্মিত চোখের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকাল রেণুদি। বললে, বুঝলি টিয়া, দাদা বর্ধমানে বটতলায় একটা দোকান ভাড়া পেয়েছে! এমনভাবে বললে, যেন এর চেয়ে বড় সুখবর আর হতে পারে না।

দামু পালও হাসলে। ফিরুকে বললে, আয় ব্যাটা, এদিকে আয়। ক্যানভাসারের ব্যাটা এবার দোকানদার হবে।

ফিরু কিছু না বুঝলেও বাপের ভাবভঙ্গি দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠল। টলতে টলতে বাপের দিকে ছুটে এল টিয়ার কাছ থেকে।

দামু তাকে কোলে টেনে নিয়ে দু'হাতে ছুঁড়ে দিয়ে লুফতে লুফতে বললে, এইবার গোপেন শালা বলুক দিকি ফিরিওলা। দোকানে বাবা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব, যা দাম বলব, নেবে তো নাও, নয়তো পথ দেখো!

দামুদার গম্ভীর গলার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল রাঙাবৌদি, আর তা দেখে টিয়াও।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বললে, টিয়ারানী তোমার দোকানের খদ্দের নয়গো, ওকে অমন করে বলছ কেন।

দামু হেসে বললে, উঁহু, টিয়াকে বলব কেন, টিয়ার জন্যে সব কমিশন ছেড়ে দেব! টাকায় দু আনা, কি বলো টিয়া?

রাঙাবৌদি বললে, দোকান চলুক আগে, তারপর অত বড় বড় কথা বলবে !

—দোকান চলবে না মানে ? দুটো মাস, দু'মাস পরেই ঘর ভাড়া নেব তোমাদের জন্যে, সব নিয়ে চলে যাব, দেখে নিয়ো।

—চলে যাবে ? হঠাৎ যেন টিয়ার গলার স্বরটা হতাশ শোনাল। বললে, সবাইকে নিয়ে চলে যাবে দামুদা ?

টিয়ার মুখখানা ম্লান দেখাল। আর রাঙাবৌদির মুখ দেখে বোঝা গেল, ভিতরের উল্লাস, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দটুকু যেন চাপা রাখতে পারছে না। রাঙাবৌদি বললে, আমার কপালে শহরে গিয়ে বাস করা আছে কিনা ! না টিয়া না, ওসব বিশ্বাস কোরো না, বিয়ের পর থেকে কতবার শুনলাম !

দামু রেগে গেল। বললে, দোকান করার টাকা ছিল না তাই, আর দোকানঘরও তো যেখানে সেখানে নিলেই হল না।

টিয়া তবু কোনও সান্ত্বনাই পেল না। বললে, দামুদা, তুমি চলে গেলে যে যাত্রা হবে না আর !

কিন্তু যাত্রার জন্যে তো দুঃখ নয় টিয়ার। তার ভাবনা অন্য। সুখে দুঃখে এই একটা পরিবারের মধ্যেই তো তার আশ্রয় ছিল। এই দুটি মাত্র সঙ্গী, বন্ধু। কথায় কথায় তাই সে রাঙাবৌদি আর রেণুদির কাছে ছুটে আসত। মা'র বকুনি খেয়ে চোখের জল মুছতে এখানেই আসত, বিয়ের কথা শুনে মনের উল্লাস হাল্কা করতেও এখানেই। কিন্তু দামুদা যদি একদিন সত্যিই সকলকে নিয়ে চলে যায়—

দামু হাসল।—আর যাত্রা নয় গো, আর যাত্রা নয়।—হেঁ হেঁ বাবা, এবার থিয়েটারের পালা। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য হয়ে গেল, এবার দ্বিতীয় অঙ্ক...

টিয়ার মুখের দিকে চোখ পড়তেই রেণু বাধা দিল। বললে, না রে টিয়া, এই তো বর্ধমান, আধ ঘণ্টার তো রাস্তা, আসব বৈকি, মাঝে মাঝেই আসব আমরা। জমিজমা, বাড়িঘর থাকবে—না এসে কখনও চলে !

টিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসল। অভিযোগের স্বরে বললে, সে তো শুধু ধান ক'টা আদায় করে বেচে দিয়ে যেতে। সে তো সবাই আসে রেণুদি, চাটুজ্যেদের বড় তরফের ছেলেরা আসে, গুপ্তরা আসে, নিকুঞ্জ সাইরা আসে...

রাঙাবৌদিও এতক্ষণে লক্ষ করলে। বুঝতে পারল তার আনন্দের খবরটা টিয়ার কাছে আনন্দের নয়। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মুখে টিয়ার কাছে সরে এল রাঙাবৌদি। টিয়ার পিঠে হাত রেখে বললে, না টিয়া, ওসব শুনো না। ও তোমার দাদার আকাশকুসুম স্বপ্ন।

রাঙাবৌদির মুখের দিকে ফিরে তাকাল টিয়া, হঠাৎ ও হেসে উঠল, আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের পাতা ভিজে এল।

ফিরুকে আবার ছুটে এসে কোলে তুলে নিল টিয়া। তারপর পাগলের মত ফিরুর গালে, মুখে, কপালে চুমু খেতে খেতে হঠাৎ হাসতে হাসতে ফিরুর মোটাসোটা একখানা হাত আস্তে করে দাঁতে চেপে ধরল। যেন ফিরুর হাতখানা সত্যিসত্যিই কামড়ে দিতে ইচ্ছে হয় তার। ফিরুর দুধে গড়া নরম তুলতুলে চেহারাখানাকে বুকে চেপে, তার গালে গাল ঘসে চটকে ঠেসে ফিরুকে বিপর্যস্ত করে তুলেই যেন আনন্দ।

কৌতুকের চোখে তার কাণ্ড দেখছিল রাঙাবৌদি। দু'মিনিট আগে যার চোখ ছলছল করে উঠেছিল, দামুদা সকলকে নিয়ে চলে যাবে শুনে, সামান্য একটা কথায় সেই মেয়েটাই কেমন আশ্বস্ত হয়েছে। দেখে বিস্ময় জাগে রাঙাবৌদির। সত্যি, কি সরল এই মেয়েটা !

সেই কোন কিশোরী চপল একটি মেয়ে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল তাদের পরিবারের সঙ্গে, আজ তাই বিচ্ছেদের সামান্য আশঙ্কায় তার মনেও ব্যথা লাগে।

টিয়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাঙাবৌদি। আর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল, টিয়া সেই কৈশোরের বয়স পার হয়ে যৌবনের ভরা দিঘির ঘাটে এসে পা বিছিয়ে বসেছে। সমস্ত শরীরের গঠন-গৌরবে, চিবুকের নিটোল কমনীয় ভঙ্গিতে চোখের চাহনি আর বুকের স্পন্দনের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে কি যেন পরিবর্তন ঘটে গেছে।

দুপুরেও খাওয়াদাওয়ার পর আবার এসে হাজির হল টিয়া। সারাটা দিন রাঙাবৌদির পায়ে পায়ে ঘুরল। আর রাঙাবৌদিকে দেখতে দেখতে তার মনেও স্বপ্ন উঁকি দিল।

পরের দিনই চলে যাবে দামুদা, তাই সযত্নে বাক্স গুছিয়ে দিচ্ছে রাঙাবৌদি। দিনের পর দিন দুধের সর তুলে রেখে রেখে ঘি বানিয়েছে, একটা শিশিতে ভরে ঘি-টুকু স্যুটকেশে রেখে দিয়ে বললে, ভাতে দিয়ে খেয়ো যেন। কাগজে মুড়ে একটু আমসত্ত্ব, ছোট্ট টিনের কৌটোয় বড়ি, গোটাকয়েক নারকোলের নাড়ু...একটার পর একটা গুছিয়ে ভরে দেয় রাঙাবৌদি, আর মাঝে মাঝে বলে, বাক্সে দেওয়াই সার হচ্ছে, যা মানুষ, খাবে নাকি ? ওই কৌটোর মধ্যেই থাকবে।

টিয়াও এটা-ওটা সাহায্য করে। আর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, সেও একদিন এমনিভাবে জিনিসপত্তর গুছিয়ে দেবে অন্য একজনের জন্যে।

সব কাজ শেষ হল এক সময়। রোদ নরম হল বিকেলের। আর রেণু এসে টিয়াকে ডেকে নিয়ে গেল একধারে।

তারপর ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ রে টিয়া, তোর নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে, সত্যি ?

লাজুক হাসি হেসে মাথা হেঁট করল টিয়া।

—ওই প্রভাকরবাবুর সঙ্গে ?

এবারও মাথা তুলতে পারলে না টিয়া। শুধু বললে, আমাকে ওদের পছন্দ হবে নাকি ! মিথ্যে চেষ্টা করছে বাবা।

রেণু হাসলে। —কেন পছন্দ হবে না, তোর মত সুন্দর ক'টা আছে রে গাঁয়ে ?

টিয়ার শুনতে ভালই লাগল কথাটা, তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হয় না। এ যেন কল্পনাতীত, স্বপ্নেও যা কোনওদিন ভাবতে পারেনি সে, তাই ঘটতে চলেছে। প্রভাকরের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে সত্যিই কোনওদিন ভাবতে পারেনি।

তাই বললে, আমি যে লেখাপড়া জানি না রেণুদি, কত ইস্কুল-কলেজে পাশ করা মেয়ে আছে...

রেণু হাসলে। বললে, হবে হবে, দেখিস তুই।

টিয়া চোখ তুলে তাকালে রেণুদির মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, রেণুদি, তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে না ? তুমি বিয়ে করবে না ?

কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারল না রেণু। চুপ করে রইল। সমস্ত মুখটা তার যেন থমথম করে উঠল। তারপর হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল।

—বিয়ে করব না ? খিলখিল করে হেসে উঠল রেণু। বললে, আমি করতে চাইলেই তো হবে না ভাই। কে বিয়ে করবে আমায়, বল তুই। আবার হেসে উঠল রেণু।

টিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারল রেণুদি চেষ্টা করে হাসছে, হাসি দিয়ে গোপন ব্যথাটুকু চাপা দিতে চাইছে।

রেণু একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, পণ দেবার মত টাকা তো নেই ভাই আমার দাদার। কোনওরকমে দুটি খেতে দিতেই পারে না, আবার পণ ? বিষণ্ণ হাসি হাসলে রেণু।

—তা বলে বিয়ে করবে না তুমি, বিয়ে হবে না তোমার ? কান্নার মত শোনাল টিয়ার

গলার স্বর।

রেণু হাসবার চেষ্টা করলে। বললে, ওসব কথা ভাবি না টিয়া। দাদার দোকানটা যদি ভাল চলে, বর্ধমানে যদি বাসা করতে পারে দাদা...

—তা হলে ?

—তা হলে আমি ইস্কুলে ভর্তি হবো ওখানে গিয়ে, দেখিস তুই। দাদা বলেছে, পাশ করলে নার্সিং পড়াবে আমাকে...নিজের পায়ে তো দাঁড়াতে পারব ভাই !

নার্স। নার্স হবে রেণুদি। কই, টিয়া তো কোনওদিন এ-কথা ভাবেনি। ভাবতে ভয় পায়। একদিন তার বিয়ে হবে, সংসার করবে, নিজের হাতে বেঁধেবেড়ে স্বামীকে দু'বেলা খাওয়াবে, ছেলে মানুষ করবে। কই, এর বাইরে আর তো কিছুই ভাবেনি সে, ভাবতে পারেনি কোনওদিন। আর রেণুদি...

রেণুদিরা চলে যাবে শুনে মনে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিল টিয়া। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা বিচ্ছেদের ব্যথা। মনে হয়েছিল তার এই সুখদুঃখের একমাত্র আশ্রয়টুকুও বুঝি সরে যাচ্ছে তার নাগালের বাইরে। কিন্তু রেণুদির কথা শুনে অনেক রাত অবধি সেদিন ঘুমোতে পারল না টিয়া। সত্যি তো, এত টাকা কোথায় পাবে দামুদা। কি করে বিয়ে দেবে রেণুদির !

চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে টিয়া মনে মনে বললে, ভগবান, দামুদার দোকান যেন ভাল চলে, যেন বাসা করতে পারে দামুদা।

তা হলে, তা হলে—এত ছোট্ট আশা রেণুদির, এমন একটা তুচ্ছ স্বপ্ন—অন্তত সেটুকুও সফল করার সুযোগ পাবে।

টিয়া মনে মনে ভাবলে, রেণুদি চলে গেলে যত দুঃখই পাক ও, রেণুদি তো সুখী হবে। রেণুদি যেন সুখী হয়।

ছাব্বিশ

ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়ে কাটোয়া থেকে গাঁয়ে ফিরছিল উদাস। দুপুররোদ তখন মাথার ওপর। তবু অন্য দিনের মত অপেক্ষা করে বিকেলের বাসটার মাথায় সাইকেলটা তুলে দিয়ে রাস্তার মোড়ে নেমে পড়ার আয়েসটুকু নিতেও ইচ্ছে হয়নি উদাসের।

সমস্ত মন তখন ফুর্তিতে নেচে উঠেছে তার। তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরে সবাইকে না শুনিয়ে যেন আনন্দ নেই। বাইক চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই নিজের পকেটে একটা হাত ঠেকিয়ে দেখে উদাস, আর হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ওর মুখ। দীর্ঘদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আনন্দ। ঝড়ের বেগে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলে উদাস, ঝড়ের মতই দুপুরের উত্তপ্ত বাতাসের হলকা এসে লাগে মুখে চোখে, বুক চিতিয়ে ঘাড় উঁচু করে সে-বাতাসের স্পর্শ নেয় উদাস, মুখেচোখে ঝাপটা লাগে উষ্ণ হলকার, তবু ভাল লাগে। কারণ জীবনের একমাত্র স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে।

লাইসেন্স পেয়েছে উদাস, আর একটা চাকরি।

মনে মনে লক্ষ্মীমণির ওপর খুশি হয়ে ওঠে। উদাস মনে মনে অনেক কথা ভাঁজে, কি বলবে সে লক্ষ্মীমণিকে, কি ভাবে আদর করবে। লক্ষ্মীমণিকে বলবে, তোর বাপের চেষ্টাতেই হল রে বউ, নইলে এত তাড়াতাড়ি চাকরি মিলত না।

শুনে লক্ষ্মীমণি নিশ্চয় মুখ বেজার করবে, কিংবা কোনও কথাই বলবে না। তবু যেমন করে পারে তার মুখে আজ হাসি আনবে উদাস।

আর পদ্ম ? পদ্ম হয়তো সত্যিই খুশি হবে। একদিন যেমন লাইসেন্সটা হাতে নিয়ে দেখতে চেয়েছিল, নেড়েচেড়ে দেখেছিল, একবার তার মুখের দিকে, একবার লাইসেন্সটার দিকে তাকিয়ে যেভাবে কৌতুকে হেসেছিল।

কিন্তু আজ পদ্ম নয়, কেবলই লক্ষ্মীমণির কথা মনে পড়ছে তার। বড় রাস্তা ছেড়ে সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে মেঠো পথে বাঁক নিয়েই মনে পড়ল, একদিন লক্ষ্মীমণির বাপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই মোড়েই, কাটোয়ার বাসে উঠে।

বিয়ের পর ধীরে ধীরে লক্ষ্মীমণির ওপর থেকে সব ভালোবাসা কি ভাবে যেন মুছে গেল। যেটুকু ছিল তাও উবে গেল উদাসের জীবনে পদ্ম আসার পর থেকে। তবু ভিতরে ভিতরে একটা অসহ্য অন্যায়বোধে বিমর্ষ হয়ে পড়ে উদাস কখনও-কখনও। মনে হয়, নিজের স্বার্থের জন্যেই বুঝি লক্ষ্মীমণির জীবনটাকে নষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও। তাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতায়—একটা অস্পষ্ট কর্তব্যবোধে মনটা লক্ষ্মীমণির ওপর নরম হয়ে পড়ে।

পুজোর সেই দিনটার কথাও মনে পড়ে। সামান্য একটু আদর সোহাগ পেয়ে লক্ষ্মীমণির শীর্ণ মুখে—দুটি ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে কি অদ্ভুত পুলক জেগে উঠেছিল মুহূর্তের মধ্যে। সারাটা দিন লক্ষ্মীমণির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে উদাস কাজের ফাঁকে ফাঁকে। মনে হয়েছে, বউটা তার মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে।

কিন্তু তারপর পদ্ম এল। পদ্ম ফিরে এসেছে এ-খবর শুনল লক্ষ্মীমণি। কিন্তু কোনও অভিযোগ করল না, অনুযোগ করল না আর। শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল তার মুখে, সেটা দপ করে নিভে গেল।

সবাই আশ্চর্য হল। এ যেন ভিন্ন মানুষ। দিনরাত মুখ বুজে কাজ করে যায়, ডাকলে তবেই সাড়া দেয়, চাইলে খাবার এগিয়ে দেয়। কিন্তু কোনও কথা বলে না, চিৎকার করে না, ঝগড়া করে না, ঘাটের ধারে কিংবা এখানে-ওখানে পদ্মর সঙ্গে উদাসকে হেসে কথা বলতে দেখলেও মুখে তার কোনও ভাবান্তর হয় না।

বংশীও আশ্চর্য না হয়ে পারে না। বলে, বউয়ের অসুখ-বিসুখ কিছু হল নাকি রে উদাস।

তেঁতুলে-বাগদিদের বুড়ি ধাই বলে, বউয়ের তোমার ছেলেপিলে হবে নাকি গো!

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। উদাসের নিজের কাছেও রহস্য মনে হয়। কিন্তু যত রাগরোষই থাকুক, উদাস চাকরি পেয়েছে শুনলে লক্ষ্মীমণি নিশ্চয় খুশি হবে। আনন্দে হেসে উঠবে। হয়তো বলবে, এবার চাকরি নিয়ে চলো কাটোয়ায় ঘর করবে।

নিজের মনেই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছিল উদাস, গাঁয়ের মুখে নতুন গোড়ের সামনে এসে দেখলে, একদল লোক জটলা করছে—হংস, পদ্মে, গোপেন, আরও অনেকে।

বাইক থেকে নেমেই এক হাতে পকেট থেকে কাগজটা বের করে হাত তুলে দেখালে উদাস। চিৎকার করে বললে, এই যে গো পদ্মোদা, চাকরি পেয়ে গেলাম!

ওরা চমকে ফিরে তাকাতেই হাসতে হাসতে বাইক থেকে নামল উদাস। বললে, বাপ বলে দ্বিচক্কর বাহন নইলে বাবুর আমার চলে না! হেঁ হেঁ, এবার আর দ্বিচক্কর নয় গো, চার চক্কর...

ফুর্তিতে আনন্দে চিৎকার করে সগর্বে বলেছিল কথাটা, কিন্তু লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল উদাস। সবারই মুখ এমন থমথমে কেন ?

সপ্রশ্ন চোখ তুলে একে একে সবারই মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে গেল উদাস। সকলেই চোখোচোখি হওয়ার ভয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

শুধু গোপেন ধীরে ধীরে বললে, তুই ঘরে যা উদাস, ঘরে যা তাড়াতাড়ি।

দ্রুত কাছে এগিয়ে এল উদাস। বিস্ময়ে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় উদাস হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ক্যানে, ক্যানে, কি হয়েছে গোপেনদাদা, কি হয়েছে বলো ?

কেউ কোনও কথা বললে না। শুধু হংস চাটুজ্যে বললে, তুই যা তাড়াতাড়ি।

আর অপেক্ষা করল না উদাস। ঝড়ের বেগেই বাইক চালিয়ে বাড়ির পথ ধরল। দূর থেকে দেখলে, তাদের বাড়ির সামনে লোক গিসগিস করছে। বাগদিপাড়া, বাউড়িপাড়ার লোক, কোটালপাড়ার লোক ভিড় করে আছে চতুর্দিকে।

উদাসকে দেখে সবাই সরে গিয়ে পথ করে দিলে। কিন্তু কেউই মুখ ফুটে কিছু বললে না।

প্রতিদিনের মতই দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর লক্ষ্মীমণির সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল পদ্ম।

পুজোর দিনে গাঁয়ে ফিরে আসার পর থেকে কি ভাবে তাকে যেন আপন করে নিয়েছিল লক্ষ্মীমণি। কারণে অকারণে আগের মত পদ্মকে আসতে দেখলে আর বিরক্ত হত না সে, মুখখানা তার চাপা বিদ্রোহে কঠিন হয়ে উঠত না, চিৎকার করে পাড়ার লোককে শুনিয়ে বাঁকা বাঁকা কথা ছুঁড়ে দিত না।

পদ্ম নিজেও তাই বিস্মিত হয়েছিল। এ যেন অন্য মানুষ। রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, আবার হাসি-গল্প-আনন্দে মেতেও ওঠে না আর পাঁচজনের মত। সদাসর্বদাই মুখখানা থমথমে, একটা চাপা দুঃখে ম্লান।

প্রথম যেদিন লক্ষ্মীমণির সঙ্গে দেখা করতে এল, সেদিন উদাসও ছিল। উঠোনে বসে সাইকেলের চাকার ফুটো সারাচ্ছিল।

পদ্ম হাসতে হাসতে ঢুকল বাঁশের বাতার ফটকটা খুলে। বললে, কেমন আছিস গো বুন, দেখতে এলাম তোকে।

অন্যদিন হলে লক্ষ্মীমণি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলত, অত ছুতোনাতার পেয়োজন নাই গো, যাকে দেখতে এয়েছ দেখবে যাও।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি কোনও কথাই বললে না, শুধু চোখ তুলে তাকালে একবার পদ্মর মুখের দিকে।

দু'-একটা সাধারণ প্রশ্ন করলে পদ্ম, লক্ষ্মীমণি কেমন আছে, ধান হয়েছে কেমন, শ্বশুরের শরীর ভাল কিনা।

মৃদু গলায় দু'-একটা উত্তর দিলে লক্ষ্মীমণি। তারপর শুধোলে, তোমার শরীর ভাল তো দিদি। কোথায় ছিলে ?

পদ্ম হাসলে, কোনও উত্তর দিলে না। তারপর দু'-একটা আজেবাজে কথা বলতে বলতে ও গিয়ে দাঁড়াল যেখানে বসে উদাস সাইকেল মেরামত করছিল।

উঠোনের ওপর সাইকেলটা শুইয়ে রেখে রবারের টিউবটায় পাম্প করতে করতে এক বালতি জলে সেটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে দেখছিল উদাস।

পদ্ম গিয়ে ভালমানুষের মত প্রশ্ন করলে, ও কি করছ গো বোনাই।

উদাস হেসে বললে, ছেঁদাটা খুঁজছি রে পদ্ম, জলে ভুরভুরি উঠবে একুনি দেখ ক্যানে।

দেখতে দেখতে জলে বুদবুদ উঠল, আর পদ্ম হেসে উঠে বললে, ওমা তাই গো, পুকুরের মাছের পানা ভুরভুরি উঠছে বটে। কৌতুকে হেসে উঠে লক্ষ্মীমণির দিকে তাকাল পদ্ম। দেখলে লক্ষ্মীমণি একমনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চিঁড়ে কুটছে।

পদ্ম সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে উদাস একটুকরো রবার কাঁচি

দিয়ে গোল করে কেটে রবারের চাকায় তালি মারছে।

সাইকেল মেরামত শেষ হতেই চাকায় হাওয়া ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল উদাস। যাবার সময় বললে, শালার বাবলার কাঁটায় কাঁটায় রাস্তায় সাইকেল চালানো দায়।

পদ্ম হেসে বললে, কাঁটা নইলে কি কমল মেলে গো বোনাই!

ঠিক কি ভেবে বললে বুঝতে পারল না উদাস। শুধু যাবার সময় হেসে ফিরে তাকালে তার মুখের দিকে।

আর উদাস চলে যেতেই পদ্মকে ডেকে বসালে লক্ষ্মীমণি। গল্প জুড়ে দিল। এমন ভাবে কথাবার্তা শুরু করলে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'জনে।

সেই প্রথম নয়। তারপরও বহুবার দেখেছে পদ্ম। উদাস যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই মুখ থমথম করে লক্ষ্মীমণির। মুখেচোখে কি এক বিষণ্ণতা, কিন্তু দুপুরে যখন উদাস থাকে না, উদাসের বাপ বংশী পড়ে পড়ে ঘুমোয়, তখন পদ্মকে কাছে বসিয়ে গল্প করে লক্ষ্মীমণি আপনজনের মত। যেন কোনও অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে, কোনও অভিমান নেই।

কোনও-কোনওদিন বিকেলে বংশী ঘুম থেকে উঠলে দু'-গেলাস চা বানিয়ে একটা কাঁসার গ্লাসে চা ঢেকে রেখে পুকুরপাড়ের বাঁশ ঝাড় থেকে ডাক ছাড়ে লক্ষ্মীমণি, ও পদ্মদিদি! চা খাবে এসো গো!

পদ্ম দাওয়া থেকেই সাড়া দেয়।

তারপর এ-বাড়িতে এলেই লক্ষ্মীমণি গ্লাসটা নিয়ে বলে, নাওসে তোমার চা, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

কখনও দুটি গুগলির চচ্চড়ি পাঠিয়ে দেয় লক্ষ্মীমণি পদ্মর জন্যে, কখনও এটা ওটা। আর পদ্ম মনের অন্ধকার হাতড়ে রহস্যের কিনারা খুঁজে বেড়ায়। লক্ষ্মীমণি এমন ভাবে মানুষ বদলে গেল কি করে, খুঁজে পায় না।

এক এক সময় তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে। মনে হয়, লক্ষ্মীমণির ওপর অবিচার করেছে সে, অন্যায় করেছে। এত ভাল লক্ষ্মীমণি। এত ভাল তার ব্যবহার। যত দেখে, ততই যেন মুগ্ধ হয় পদ্ম। আর দিনে দিনে লক্ষ্মীমণিকে কত অন্তরঙ্গ মনে হয়।

সেদিনও দুপুরে তাই খাওয়াদাওয়ার পর গল্প করতে এল পদ্ম। বাইরে থেকেই ডাকলে, লক্ষ্মী বুন, ঘুমুলি নিকি লো?

অন্য দিন পদ্মর গলার আওয়াজ পেয়েই হাসিমুখে ছুটে আসে সে। কিন্তু দু'-তিনবার ডাক দেওয়ার পরও কোনও সাড়া পেল না পদ্ম।

ভাবলে, লক্ষ্মীমণি হয়তো থালা-বাসন ধুতে ঘাটে গিয়েছে। তাই বেরিয়ে এসে বাইরে উঁকি দিলে। দেখতে পেল না। পিছন দিকের পাঁচিলে হয়তো ঘুঁটে দিচ্ছে ভেবে দেখে এল, না, সেখানেও নেই।

আর ঠিক সেই সময়েই একটা গোঙানি শুনতে পেল পদ্ম ঘরের ভেতর থেকে। কান পেতে শুনলে একমুহূর্ত, তারপর ছুটে গেল।

গিয়ে দেখলে, রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে আছে লক্ষ্মীমণি, গোঙাচ্ছে থেকে থেকে, আর...

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মীমণির দু'কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দিল পদ্ম। —লক্ষ্মী, বুন আ বুন কি হয়েছে তোর!

আচ্ছন্নের মত চোখের ভারী পাতা দুটো একটু ফাঁকা হল, একবার যেন তাকাল্ সে পদ্মর মুখের দিকে, বোধহয় চিনতে পারল না।

আবার বমি করলে লক্ষ্মীমণি।

আর পদ্ম জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে বল। কি হয়েছে তোর!

ধীরে ধীরে এবার একটা হাত এসে পড়ল পদ্মর হাতের ওপর। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল লক্ষ্মীমণির চোখের কোণ বেয়ে।

তারপর লক্ষ্মীমণি ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে, পদ্ম ?

—হ্যাঁ আমি, পদ্ম। ব্যগ্র স্বরে বললে পদ্ম। বললে, কি হয়েছে তোর বল। ডাক্তারকে ডেকে আনব ?

—না। অস্ফুটস্বরে বললে লক্ষ্মীমণি।

তবু শুনল না পদ্ম ছুটে বেরিয়ে আসতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শিলনোড়ায় পা লেগে হোঁচট খেলে।

চমকে উঠল পদ্ম।

শিলের ওপর তখনও খানিকটা পড়ে আছে। এদিকে ওদিকে পড়ে আছে ধুতরোর ।

সারা শরীর যেন মুহূর্তে শিউরে উঠল তার। ঘর থেকে বেরিয়েই কোটালপাড়ার মধ্যেই চিৎকার করে উঠল পদ্ম, লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে গো, লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে!

চতুর্দিক থেকে লোক ছুটে এল। ভিড় করে এল লোক—তেঁতুলে-বাগদিদের পাড়া থেকে, বাউড়িপাড়া থেকে, কোটালপাড়া থেকে।

আর ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির দিকে ছুটল পদ্ম।

লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে। তাকে বাঁচাতে হবে। যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে!

একদিন তার বাপকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে দিয়েছিল এই লক্ষ্মীমণি, সেদিন নিজের মান-সম্মান বাঁচাবার জন্যে, অপবাদ বাঁচাবার জন্যে ডাক্তারের কাছে সব কথা চেপে গিয়েছিল পদ্ম।

কিন্তু আজ মান-অপমান, অপবাদ-দুর্নামের কথা মনে পড়ল না পদ্মর। মনে হল না লক্ষ্মীমণি বিষ খেয়েছে এ-খবর আসলে তার ওপরই অপবাদ ছড়াবে! ওর কেবলই মনে হল, লক্ষ্মী বুনকে বাঁচাতে হবে, লক্ষ্মী বুনকে বাঁচাতে হবে।

যে মানুষটাকে এক সময় সে-ও সহ্য করতে পারত না, যাকে জীবনের কাঁটা মনে হত, আজ তাকেই যেন সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছে। যেন তার জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই পদ্মর কাছে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে কি যেন ভাবল পদ্ম। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

গাঁয়ে ফিরে এসেও অবিনাশ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি পদ্ম। যাবে না ভেবেছিল।

এক-ঠ্যাঙা ওই মানুষটার দিকে তাকালেও কষ্ট হয় তার। একখানা পা নেই, দুটো কাঠের ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ডাক্তার, একখানা খাকি বুশ শার্ট গায়ে, একটা বোতাম ছেঁড়া, চুল উস্কোখুস্কো। তিন কুলে কেউ কোথাও নেই, বিদেশ-বিভুঁই এই গ্রামে এসে ঘর বেঁধেছে, অথচ দু'দিনেই তো গ্রামকে করে নিয়েছে আপন, গাঁয়ের উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায়, নিজের মুনিশ লাগিয়ে অপরের পুকুরের পানা সাফ করাতে যায়—এমন একটা লোককে এ-গাঁয়ের কেউ পছন্দ করে না, বদনাম দেয় পদ্মর নাম জড়িয়ে—এসব দেখে সত্যিই বড় কষ্ট হত পদ্মর। তবু মুখ বুজে সহ্য করেছে সব কথা। ভেবেছে, সে যদি সরে আসে ডাক্তারের কাছ থেকে, তা হলে বড় অসহায় হয়ে পড়বে লোকটা। তেপান্তরের মাঠে একা পড়ে থাকে, কে দেখবে লোকটাকে, কে

তার সুখ-সুবিধের দিকে তাকাবে ! তাই পাড়াপড়শিদের উপহাস উপেক্ষা করেছিল পদ্ম। কিন্তু যেদিন বুঝলে, তাকে জড়িয়েই সারা গাঁয়ে অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে ডাক্তারের, আর তাই অসুখ-বিসুখে তাকে কেউ ডাক দেয় না, বলগাঁর ডাক্তারকে ডেকে আনে, সেইদিন থেকেই মনঃস্থির করে ফেলেছিল পদ্ম। ডাক্তারের ভালর জন্যেই নিজে সরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু সেসব কথা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই তখন, বলার মত মনের অবস্থাও নেই পদ্মর।

জলে-ভেজা দুটি চোখ কচলে পদ্ম বার বার বলে, একটুন তাড়াতাড়ি চলো গো ডাক্তার, লক্ষ্মী বুনটারে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে বুনটারে !

তাড়াতাড়িই হেঁটে চলে ডাক্তার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে। আর পদ্মর মনে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত যেন কত দীর্ঘ সময়। যেন পথ আর ফুরোয় না ! পদ্মর সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত হাঁটিতে চেষ্টা করে অবিনাশ ডাক্তার, পারে না।

যেতে যেতে অবিনাশ ডাক্তার আবার প্রশ্ন করে, তুই কেন চলে গিয়েছিলি পদ্ম, ফিরে এসেও দেখা করিসনি কেন ?

প্রথমটা কোনও জবাব দেয় না পদ্ম। শুধু কাতর গলায় বলে, সব বলব ডাক্তার, সব বলব তোমায়। লক্ষ্মী বুনটারে আগে তুমি বাঁচাবে চলো, ধুতরোর বিচি খেয়েছে বুনটা ! বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে পদ্ম।

চমকে ওঠে অবিনাশ ডাক্তার, বলে, সে কি ! আগে বলিসনি কেন ? বলে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করে ক্রাচে ভর দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত ওরা যখন এসে পৌঁছল, তখন আর কিছুই করবার নেই।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকল অবিনাশ ডাক্তার পদ্মর পিছনে পিছনে। তারপর একটা ক্রাচে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্মীমণির একখানা হাত তুলে নিয়ে খানিক পরেই নামিয়ে রাখল।

উৎসুক চোখ মেলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালে পদ্ম। আর লক্ষ্মীমণির পাশে বসে পড়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে সজোরে মাথা নাড়ল অবিনাশ ডাক্তার। না, না, না।

আর সশব্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠল পদ্ম।

তারপর কখন যে ডাক্তার ক্রাচ দুটো তুলে নিয়ে ভিড় ঠেলে চলে গেছে, কখন গ্রামের চৌকিদার খবর নিতে এসেছে, কিছুই জানে না পদ্ম।

ঘণ্টাখানেক পরে থানার দারোগা আর সিপাই এসেছে, বুড়ো বংশী হাতজোড় করে তাদের কাছে অনুনয় করে কি বলেছে আড়ালে গিয়ে, তারপর তারা এক সময় চলে গেছে—কিছুই লক্ষ করেনি পদ্ম।

ও যখন উঠে এল, দেখল বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে উদাস। তার চোখেও জল।

ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়াল পদ্ম. কাঁধে হাত দিয়ে বললে, ওঠো বোনাই।

তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল উদাস, অর্থহীন চোখ মেলে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গভীর একটা অনুশোচনায় যেন তার সমস্ত বুক দগ্ধ হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল উদাস। বললে, লক্ষ্মী বউ ক্যানে আত্মঘাতী হল রে পদ্ম, ক্যানে আত্মঘাতী হল ? কিছুই বলে গেল না ক্যানে ?

পদ্ম নিজেও সে প্রশ্নের কোনও জবাব পেল না ভেবে ভেবে। কেন আত্মহত্যা করল লক্ষ্মীমণি, কেন ?

আত্মহত্যাই করবারই যদি ইচ্ছে হয়েছিল তার, তবে সেই প্রথম যেদিন পদ্মকে দেখেছিল, উদাসের আলিঙ্গনের মধ্যে, সেদিনই করেনি কেন !

কি আশ্চর্য, যখন সব রাগ বিদ্বেষ ভুলে পদ্মকে আপন করে নিল লক্ষ্মীমণি, যখন সংশয় সন্দেহ জয় করল লক্ষ্মীমণি, তখনই কেন সে বিষ খেল !

পদ্মর হঠাৎ মনে হল, তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ রেখে যাবার জন্য নয়, উদাসের বিরুদ্ধেও কোনও অভিযোগ রেখে যাবার জন্যে নয়, উদাস আর তার মাঝখান থেকে ইচ্ছে করেই হয়তো সরে গেছে লক্ষ্মীমণি। অসীম অতৃপ্তির জ্বালায় ওদের সুখী করতে চেয়েছে।

আর একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর তার শিউরে উঠল। কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল পদ্ম।

সাতাশ

থানার দারোগার হাতে ক'টা টাকা গুনে গুনে দিয়ে রেহাই পাওয়া গেল। বংশীই দিলে টাকা ক'টা। বুদ্ধিটা হয়তো গোপেন মোড়লেরই, এবং টাকা কটাও। গ্রামে থানা-পুলিসের ঝামেলা এড়াতে কে না চায়। টানা-হেঁচড়া কোথায় গিয়ে পৌঁছোবে, এ ভয় সকলেরই।

খবর পেয়ে গিরিজাপ্রসাদ এসেছিলেন। লক্ষ্মীমণির মৃতদেহ সদরের মড়াঘরে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দেবে, ভাবতেও শিউরে ওঠে সকলে।

দারোগা কোন্ ফাঁকে টাকা নিয়েছে, নিয়েছে কিনা, তা জানতেন না গিরিজাপ্রসাদ। দারোগার সঙ্গে বংশীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তাই প্রশ্ন করলেন, ডেড বডি কি নিয়ে যাবেন নাকি ?

দারোগা চুপ করে রইল। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করল গিরিজাপ্রসাদ কোন্ তরফের লোক।

গিরিজাপ্রসাদ এবার স্পষ্ট করেই বললেন, ঘরের বউ আত্মহত্যা করেছে, এমনিতেই কষ্ট, আবার কাটাকুটি করলে...

দারোগা এবার হেসে উঠল। —না, না মাস্টারমশাই, ও নিয়ে টানাটানি করব না। পোড়াতেই বলে দিলাম। আপনাদের ডাক্তারবাবু যখন আপত্তি করছেন না...

একটু থেমে দারোগা আবার বললে, পুলিসে চাকরি করি বটে, কিন্তু আমাদেরও মানুষের প্রাণ, বুঝলেন মাস্টারমশাই !

বলে গোপেন মোড়লের বাড়িতে চা-জলখাবার খেয়ে সিপাইদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল দারোগা। বনপলাশির লোক নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

লক্ষ্মীমণি আত্মঘাতী হয়েছে শুনে গাঁ-সুদ্ধ লোক ভিড় করে এসেছিল। কিন্তু পুলিস দেখেই যে-যার সরে পড়েছিল ভয়ে ভয়ে। কি থেকে কি হয় কেউ কি বলতে পারে। হয়তো বাড়ির বাইরে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলেই চালান করে দেবে থানায়। পুলিসের আতঙ্ক সারা গাঁয়ের মনেই। শুধু ডাক্তার, গিরিজাপ্রসাদ, আর দু'-একজন ভদ্রলোক সাহস করে এগিয়ে এল। গোপেন মোড়ল এল তার বাংলাবাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দারোগাবাবু আর সিপাইদের আপ্যায়ন করতে।

দারোগা-পুলিস আসতে দেখে কোটালপাড়া, বাউড়িপাড়া, তেঁতুলে-বাগদিদের মেয়ে-বউরা ভেবেছিল, জল ঘোলা না করে ছাড়বে না। বাড়ির বউ আত্মঘাতী হলে কে দোষী তা কি আর বলে দিতে হয় ? হয় শাশুড়ি-ননদ, নয়তো স্বামী। শাশুড়ি-ননদ যখন

নেই লক্ষ্মীমণির, তখন উদাসকেই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে, ভেবেছিল সবাই।

কিন্তু কিছুই হল না। দারোগা চলে গেল, আর নিশ্বাস ফেলে বাঁচল গাঁয়ের লোক। কিংবা মনে মনে ক্ষুণ্ন হল, উদাস-বংশীকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করল না বলে।

জনকয়েক লোক মিলে বাঁশ কেটে আনলে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে।

তারপর এক সময় তারা চলে গেল লক্ষ্মীমণির শবদেহ নিয়ে। পিছনে পিছনে বংশী।

উদাস তখনও বাড়ির দাওয়ায় বসে আছে স্থাণুর মত, বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। একে একে সকলেই চলে গেল। সকলের মনেই একটা শোকের ছাপ। কোটালপাড়ায় যেদিন প্রথম বউ হয়ে এসেছিল লক্ষ্মীমণি, সেদিন কেউই তাকে পছন্দ করেনি। উদাসের মত ছেলের কিনা এমন বউ। তারপর দিনে দিনে লক্ষ্মীমণির রুক্ষ স্বভাব আর রুক্ষ কথাবার্তার জন্যে গ্রামের লোকও বহুবার মুখ ফুটে বলেছে, বউটা মলে পাড়া ঠাণ্ডা হয়, উদাস বাঁচে।

কোটালপাড়ার হাজারো অশান্তির মূলে ছিল লক্ষ্মীমণি, যে শুধু নিজের শান্তিই হরণ করেনি, পাড়াপড়শির জীবনেও বার বার অশান্তি ডেকে এনেছে।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি মারা যাওয়ার পর, লক্ষ্মীমণি আত্মঘাতী হওয়ায় তারাও দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এতকাল সবাই দোষ দিত লক্ষ্মীমণিকে। কিন্তু কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে যেন সকলের মনেই সমবেদনা জেগে উঠল। আর সকলের চোখেই যেন একটা সন্দেহ, একটা অভিযোগ—উদাসের বিরুদ্ধে।

যারা উদাসের প্রতি সহানুভূতি দেখাত, বলত এমন বউয়ের সঙ্গে ঘর করার মত অভিশাপ আর নেই, তারাই উদাসকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলে।

মুহূর্তের মধ্যে গাঁয়ের চেহারা বদলে গেল। নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মীমণির আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে।

উদাসকে, বংশীকে সবাই প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ গো, কি হয়েছিল তোমাদের, বিষ খেলে ক্যানে বউটা ?

উদাস আর বংশী, কেউই কোনও উত্তর দিতে পারেনি। উদাস নিজেও কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। সত্যি তো, কেন বিষ খেল লক্ষ্মীমণি, কেন এভাবে মৃত্যুবরণ করলে। আর মৃত্যুর আগে দুটো কথাই বা বলে গেল না কেন, রহস্যের হদিস দিয়ে গেল না কেন উদাসকে!

চুপচাপ একা একা বসে থাকে উদাস, আর ক্ষণে ক্ষণে একটা কথাই মনে পড়ে। কেন বিষ খেল লক্ষ্মীমণি, কেন, কেন। কই, এই একটা মাসের মধ্যে তো কোনওদিনই তার সঙ্গে এমন কিছু হয়নি যার জন্যে মনে আঘাত লাগতে পারে লক্ষ্মীমণির। কোনও কথাই তো বলেনি উদাস। আর পদ্ম ? না, এর আগে অনেক বড় আঘাত পেয়েছিল লক্ষ্মীমণি, অনেক বেশি অপমান কুড়িয়েছে সে। কই, তখন তো আত্মহত্যার কথা তার মনে জাগেনি। তবে ? ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারাই পায় না উদাস। অথচ মনে মনে নিজেকে অপরাধী ঠেকেছে। বেশ বুঝতে পারে, গাঁয়ের লোক তাকেই দোষী ভাবছে। ভাবছে, লক্ষ্মীমণি যখন আত্মহত্যা করেছে, তখন নিশ্চয় কোনও গূঢ় কারণ আছে এর পিছনে।

লোকের সন্দেহের দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই গাঁ ছেড়ে খড়ি নদীর ধারে ধারে বোষ্টমদের পোড়ো কুঞ্জের দিকে চলে যায় উদাস। গোঁসাইদিদির কুঞ্জ। বাবুরি, বনতুলসীর ঝোপ, পুকুর পাড়ে ছড়ানো ডেলু ফুল। ফুলে ফুলে ছাওয়া সজনে গাছ, আর ভেঙে পড়া কুঞ্জ। কেউ কোথাও নেই, সেই কবে গোঁসাইদিদি নবদ্বীপ চলে গেছে তারপর থেকে আগাছায় জঙ্গলে ভরে গেছে চতুর্দিক। নির্জন, নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে দু'-একটা কালকেউটে নয়তো সিঁদুরটুপি সাপ এঁকেবেঁকে চলে যায়। সেইখানে এসে চুপ

করে বসে থাকে উদাস, আর ভাবে। কি যে ভাবে ও নিজেও বুঝতে পারে না।

তারপর এক সময় বিকেলের রোদ পড়ে যায়, সন্ধে হয়ে আসে। আর ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে উদাসের। কেবলই ভয় হয় লক্ষ্মীমণি হয়তো এসে দাঁড়াবে সামনে। যে-কথাটা বলে যায়নি হয়তো সেই কথাটাই বলতে আসবে।

এক-একদিন ভীষণ ভয় পেয়ে যায় উদাস, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। বংশী না থাকলে বাড়ি ঢুকতেও ভয় পায়।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে চলেছিল। আর এমনি ভাবেই গাঁয়ের সকলকে এড়িয়ে চলেছিল উদাস। এমন কি পদ্মকেও। পদ্মর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যেন লজ্জা হত, অস্বস্তি হত। তবু আসত পদ্ম, কোনও-কোনওদিন পাঁচু কোটাল। উদাসকে, বংশীকে দু'বেলা ডেকে নিয়ে যেত, ভাত রেঁধে খেতে ডাকত পদ্ম।

সেদিনও তাই ডাকতে এল পদ্ম। বললে, চলো গো বোনাই, তোমার নেগে বুড়া বাপটাও আমার জলপশ্য করে নাই।

কথাটা শুনে চোখ মেলে তাকাল উদাস পদ্মর মুখের দিকে। তাকিয়েই রইল, যেন কথাটা তার কানে যায়নি।

পদ্ম হাসল। বললে, ফ্যালফেলিয়ে কি দেখছ গো, দেখ নাই নিকি আমায়!

উদাস তবু হাসল না। পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খপ করে তার হাতখানা ধরলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে পদ্ম। —না, না। চিৎকার করে বলে উঠল।

বিস্মিত বিব্রত বোধ করলে উদাস। অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, তুই আমার ঘরে আয় পদ্ম। চোখে জল এসে গেল উদাসের। —লক্ষ্মীকে বড় ভয় নাগে রে আমার, একা মানুষ আমি থাকতে নারব, থাকতে নারব।

পদ্ম কোনও কথা বলল না, শুধু কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল উদাসের মুখের দিকে, তারপর বললে, বুড়া বাপটা বসে আছে, খাবে এসো বোনাই।

বলে তরতর করে বাড়ির পথ ধরলে। আর উদাসের সারা বুক কেঁপে উঠল দুঃসহ ব্যথায়, আশঙ্কায়।

পাঁচু কোটাল আর উদাসকে পাশাপাশি জায়গা করে দিল পদ্ম, এনামেলের দু'খানা থালায় ভাত এনে নামিয়ে দিলে।

কিন্তু খিদে মরে গেছে তখন উদাসের। ওর মনের মধ্যে তখন একটা আলোড়ন উঠেছে। পদ্মর চোখে এমন ভর্ৎসনার দৃষ্টি ও বুঝি কখনও দেখেনি। এমন উপেক্ষার ব্যবহার কখনও পায়নি। কিন্তু কেন? এতদিন অশান্তি আর অসহ্য ক্ষোভ-দুঃখের মধ্যে উদাস ভেবেছে, লক্ষ্মীমণি তার জীবন থেকে সরে গেলেই সে সুখী হবে, শান্তি পাবে। ভেবেছে, পদ্ম আর তার মাঝখানে ওই একটাই পাঁচিল। তাই কখনও-সখনও মনের গোপনে লক্ষ্মীমণির মৃত্যু কামনাও করেছে সে। কিন্তু আজ হঠাৎ পদ্মর উপেক্ষায় নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হল উদাসের।

তবু ধীরে ধীরে পাঁচু কোটালকে বললে, এ গাঁয়ে আর মন বসছে না গো আমার।

পাঁচু কোটাল ভাতের গ্রাস মুখে তুলে একটু অপেক্ষা করলে। তারপর বললে, কি করবে তবে, যাবে কোথায় বলো।

—কাটোয়ায় নয়তো বদ্দমানে। লাইসেন আছে, ডাইভারি করব, ঘর করব সেখানে গিয়ে।

পাঁচু কোটাল চুপ করে রইল, একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল পদ্মর দিকে। মুখ ঘুরিয়ে নিল পদ্ম।

বংশীও একদিন এসে বললে, ছেলেটার বিয়ে দাও গো পদ্মর সাথে, শেষে বিবাগী হয়ে যাবে।

পাঁচু কোটালেরও তাই ইচ্ছে। খুশি হয়ে বললে, সে তো আমারও সাধ তোমারও সাধ, তা পণ্ডিতকে ডেকে বলো ক্যানে দিন দেখে দিতে একটা।

কিন্তু মেয়ে যে তার অমত করে বসবে ভাবতে পারেনি পাঁচু কোটাল। বংশীও ভাবতে পারেনি।

পদ্মর বাপের কাছ থেকে কথাটা শুনল উদাস, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। লক্ষ্মীমণির মৃত্যুর পর থেকেই লক্ষ করেছে উদাস, পদ্ম কেমন যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ঠিক সেই আগের মত হেসে রসিকতা করে কথা বলে না, কাছে এসে সোহাগ করে দাঁড়ায় না গা ছুঁয়ে। লক্ষ্মীমণি বেঁচে থাকতে তাকে মনে হয়েছে দু'জনের মাঝখানে একটা বিভেদের পাঁচিল, লক্ষ্মীমণির মৃত্যু যেন দু'জনের মাঝখানে এনে দিয়েছে একটা গভীর খাদ।

উদ্‌ভ্রান্ত চোখে পদ্মকে দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে উদাস, আর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে।

সেদিনও যথারীতি খেতে ডাকল পদ্ম।—চল বোনাই, ভাত দুটো মুখে দিয়ে আসবে। বলেই চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা শক্ত মুঠিতে ধরে ফেলল উদাস। বললে, কি হয়েছে তোর বল, পদ্ম!

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে পদ্ম হেসে উঠল।—কই, কি আবার হবে গো আমার!

—বিয়ে করবি না তুই আমায়, কাটোয়ায় ঘর করব তোকে নিয়ে গিয়ে, আমার যে কত সাধ ছিল রে পদ্ম। বলতে বলতে চোখ ভিজে এল উদাসের।

পদ্ম হাসল। বিষণ্ণ চোখে উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, না গো বোনাই, তা হয় না।

—ক্যানে? বিস্মিত হল উদাস।

পদ্মও ছলছল চোখে বললে, নক্ষী বুনটারে অনেক কষ্ট দিলাম গো বোনাই, মিত্যু হল তার, তার আত্মাটারে একটু শান্তি দাও গো, একটু শান্তি দাও।

পদ্মকে অনেক বুঝিয়েও রাজি করাতে পারল না উদাস। পদ্মর মুখে সেই এক কথা।—মিত্যু হয়েছে নক্ষী বুনটার, এইবার ওকে একটু শান্তি দাও গো, শান্তি দাও।

লক্ষ্মীমণির মৃত্যুতেও এতখানি আঘাত পায়নি উদাস, এমনকি যেদিন গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল পদ্ম, সেদিনও না। ব্যথায় অপমানে আর একটাও কথা বললে না পদ্মকে।

পরের দিনই সাইকেলটা বের করে চাকা দুটো পরিষ্কার করলে, হাওয়া ভরলে রবারের নলে, তারপর কাটোয়ার পথে বেরিয়ে পড়ল।

পদ্ম ভেবেছিল, সন্ধে হলেই আগের মতই ফিরে আসবে উদাস। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, উদাস ফিরল না আর।

মনে মনে পদ্মও হয়তো ভেবেছিল, সেও চলে যাবে। সেই নিগন ইস্টিশনের ধানকলে গিয়ে কাজ নেবে। তাই ভাবলে, যাবার আগে ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে।

সকাল থেকে ক্ষার দিয়ে কাপড়খানা কাচলে পদ্ম। রোদে শুকিয়ে নিয়ে পরলে সেখানা। চুল বাঁধলে যত্ন করে, ভিজে গামছায় মুখ ঘসে ছোট্ট আরশিখানায় নিজের মুখ দেখলে।

তারপর কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে।

ডাক্তার অনেক করেছে তার জন্যে, যাবার আগে একবার দেখা দিয়ে যাবে পদ্ম। আহা, অসহায় মানুষটা ! গাঁয়ের এক প্রান্তে পড়ে থাকে, কেউ খোঁজ নেয় না। বড় দুঃখ পদ্মর, তার জন্যে।

দূর থেকেই তাকে দেখতে পেল ডাক্তার।

ঘরের সামনে বাঁশের বাতা দিয়ে ঘিরে ছোট্ট একটুকরো বাগান করেছে অবিনাশ ডাক্তার। খুরপি দিয়ে মাটি ঝুরিয়ে ফুলের চারা বসাচ্ছিল, হঠাৎ একটা রোদে ঝলসানো সাদা ফুটফুটে কাপড় চোখে পড়ল।

খুরপিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল অবিনাশ ডাক্তার। তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ, পদ্মই বটে। পদ্ম আসছে তরতর করে এঁকেবেঁকে, দ্রুত পায়ে।

সারা গায়ে তখন ঘাম ঝরছে অবিনাশ ডাক্তারের। ধীরে ধীরে খাকি বুশ সার্টটা খুলে কাঁধে নিল, দুটো হাত ঘসে ঘসে ধুলো মুছল হাত থেকে।

পদ্ম ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে। আর পদ্মর চলন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুগ্ধ হয়ে গেল অবিনাশ ডাক্তার।

স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা নিটোল সুন্দর একটা যৌবনের শিখা যেন। কালো মসৃণ চেহারাটার প্রতি অঙ্গ থেকে যেন একটা সুষম ছন্দ ফুটে উঠছে।

এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে বহুবার পদ্মর দিকে তাকিয়ে দেখেছে অবিনাশ ডাক্তার। আর সেই মুগ্ধতা নিজের মনেই চেপে রেখেছে। চিরদিন একটা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস শুধু কখনও-কখনও তার বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে।

আর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে গেছে আরেকটি সুন্দর মুখ। সুন্দরী, শিক্ষিতা একটি নারীর মুখ। যার জীবনের সঙ্গে অবিনাশ ডাক্তারের জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল একদিন, শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে ঘরে এনেছিল অবিনাশ ডাক্তার।

—তারপর ? পদ্ম জিগ্যেস করেছিল একদিন। ডাক্তারের ব্যথাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করেছিল।

আর অবিনাশ ডাক্তার জীবনের যে দুঃখ কারও কাছে কোনওদিন প্রকাশ করেনি সেই গোপন আঘাতের কথা খুলে বলেছিল অশিক্ষিত গ্রাম্য কোটালদের একটি মেয়ের কাছে।

বলেছিল, তারপর যুদ্ধে গেলাম রে পদ্ম। যুদ্ধে গিয়ে একটা পা রেখে এলাম। ভাবলাম, একটা পা গেছে যাক। আরেকটা পায়ে ভর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

যে-কথা অবিনাশ ডাক্তারের মনের মধ্যে গুমরে মরেছে, ভিতরে ভিতরে তার বুক কুরে কুরে খেয়েছে যে বেদনা, শোনাবার লোক পেয়ে, সেদিন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছিল সে।

বলেছিল, তারপর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম পদ্ম, এসে দেখলাম অন্য পা-টাও আমার খোয়া গেছে। বলে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে কান্না-ভাঙা গলায় অবিনাশ ডাক্তার বলেছিল, তাই শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এলাম রে পদ্ম, পালিয়ে এলাম।

শুনতে শুনতে পদ্মর চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, আঁচলে চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে সে।

আর অবিনাশ ডাক্তার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, আমার এই কাটা পায়ের জন্যে কোনও লজ্জা, কোনও দুঃখ নেই রে পদ্ম। কিন্তু যেদিন জানলাম, যুদ্ধের বোমা-বারুদের মধ্যেও যার স্বপ্ন দেখেছি, যার কাছে ফিরে এসে এই খোঁড়া পায়ের দুঃখ ভুলতে চেয়েছি, সে-ই চলে গেছে, সেদিন...সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। মনে হল, বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শি সবাই আমায় দেখে হাসছে, মনে হল...

সব কথা সেদিন স্পষ্ট করে বলতে পারেনি অবিনাশ ডাক্তার। আর তারপর থেকেই অবিনাশ ডাক্তারকে যেন বড় আপন মনে হত পদ্মর। এই নিঃস্ব অসহায় মানুষটার জন্যে দুঃখ হত তার।

পদ্মর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সেই পুরনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেছে, কখন যে অবিনাশ ডাক্তারের মন চলে গেছে সেই হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির পৃথিবীতে, টের পায়নি ডাক্তার।

তন্ময়তা ভাঙল পদ্মর হাসিতে।

পদ্ম কখন যে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর তার দিকে ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে কি যে ভাবছিল অবিনাশ ডাক্তার, হঠাৎ চমকে উঠল পদ্মর সশব্দ হাসিতে।

রসিকতা করে বললে, কি গো ডাক্তার, পদ্মকে তোমার চিনতে নারছ নিকি!

কথা শুনে চমকে উঠল অবিনাশ ডাক্তার। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আয়, ঘরে আয়।

বলে বাড়ির বারান্দায় গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পদ্মর দিকে।

তারপর হঠাৎ বলে ফেললে, তুই অনেক সুন্দর হয়েছিস পদ্ম!

খিলখিল করে হেসে উঠল পদ্ম। কোনও কথা বললে না। তারপর প্রশ্ন করলে, কই, পাব্বুতী কই গো, টুকুন চা খাব বলে এলাম।

অবিনাশ ডাক্তার হাসল।—পার্বতী নেই রে, তার বাপ নিয়ে গেছে তাকে, বিয়ে ঠিক হয়েছে তার, তাই আর কাজ করবে না।

—পাব্বুতী নেই?

—না।

—তুমি একা মানুষ...

বলতে গিয়েও পারল না পদ্ম, চুপ করে গেল। পুঁটলিটা বুকে চেপে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

অবিনাশ ডাক্তার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, ভেবেছিলাম তুই আর আসবি না পদ্ম।

এবারও সে মুখ নিচু করে রইল।

ডাক্তার একটুখানি চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, কেন গিয়েছিলি তুই পদ্ম, গাঁ ছেড়ে?

পদ্ম হেসে উঠল। বললে, তোমার নেগেই গিয়েছিলাম গো, তোমার নেগেই।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল অবিনাশ ডাক্তার।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ গো, তোমার দুন্নাম, কত কি বলত নোকেরা, অসুখ-বিসুখে তোমায় ডাকত না, বলগাঁর ডাক্তারকে ডেকে আনত...

—আমার দুর্নাম? হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল অবিনাশ ডাক্তার।

পদ্ম আবার বললে, হ্যাঁ গো, তোমার নেগেই। কোটালপাড়ার বাগদিপাড়ার লোক অকথা-কুকথা বললে, তাই রেগে চলে গেলাম ইস্টিশনে...

—তারপর?

—ভাবলাম, ধান সিজোনের কাজ করেছি সেই একটুকুন বেলা থেকে, তা ধানকলে কাজ নোব। তাই টেনে চড়ে বসলাম, গিয়ে কাজ নিলাম ধানকলে। আমি সব সইতে পারি গো ডাক্তার, তোমার দুন্নাম আমার বুকে বজ্জর মত বাজে।

—আমার দুর্নাম? আবার হো হো করে হেসে উঠল অবিনাশ ডাক্তার। তারপর উঠে দাঁড়াল ক্রাচে ভর দিয়ে। বললে, আয়, কাছে আয়।

বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাল পদ্ম। বিভ্রান্তের মত। তারপর এক-পা এক-পা করে কাছে এগিয়ে এল।

ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে ডাক্তারও দু'পা এগিয়ে গেল।

তারপর হাত বাড়িয়ে পদ্মর খাটো কাপড়ের আঁচলটা পদ্মর মাথায় ঘোমটার মত করে টেনে দিলে। সশব্দে হেসে উঠে বললে, বিয়ে করব তোকে আমি, বিয়ে করব। ল'ফুল ম্যারেজ...দুর্নাম ? দেখি কে কত দুর্নাম দিতে পারে।

বলে আবার সশব্দে হেসে উঠল ডাক্তার।

আর পদ্মর বিভ্রান্ত বিস্মিত দৃষ্টিটা হঠাৎ বড় লজ্জিত হয়ে পড়ল। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল সিমেন্টের মেঝের উপর।

অবিনাশ ডাক্তার তখনও হাসছে হা হা করে, সশব্দে। হাসছে পাগলের মত।

আঠাশ

বাংলাবাড়ির দাওয়ায় বসে বসে তামাক টানছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। কাটোয়া থেকে একটা গড়গড়া আনিয়েছেন, নলের গায়ে রুপোলি তারের কাজ করা। নলটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে টানছিলেন, আর আবেশের ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। কম বয়সে সেই কবে দু'-একদিন শখ করে গড়গড়ায় টান দিয়েছিলেন। তারপর সারা জীবন ইস্কুল-মাস্টারি করতে হয়েছে, ছেলে পড়াতে হয়েছে ; অবসরের ফাঁকে ফাঁকে তাই এমন আয়েসের সুযোগ পাননি কোনওদিন। সস্তা সিগারেট খেয়েছেন, তাও হিসেব কষে। গাঁয়ে ফিরে সেই সস্তা সিগারেটের খরচটাও অত্যধিক মনে হয়েছে। তা ছাড়া সিগারেটটাও তেমন সস্তা যে নেই আর, খরচ চালাবেন কি করে। তাই হুঁকো ধরেছিলেন প্রথম প্রথম। কিন্তু নিজের শিক্ষাদীক্ষা, গোপন অহঙ্কারের সঙ্গে হুঁকোটাকে ঠিক যেন মানিয়ে নিতে পারেননি। বিলাস এবং আয়েস দুটোর প্রতিই মনে মনে তাঁর যে আকর্ষণ কম তা নয়। তাই একটা গড়গড়া আনিয়ে নিয়েছিলেন। ধীরেসুস্থে বেশ আয়েস করে টান দেওয়া যায়। ঠিক এই সময়-থেমে-থাকা কর্মহীন জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

দাওয়ায় বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে গোয়ালঘরের ওপরের সজনে গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। চোখের সামনে গাছটাকে ফুলে ফুলে ভরে উঠতে দেখলেন। দিনে দিনে ফুল ঝরে পড়ল, এখন কচি কচি সজনে ডাঁটায় গাছটা ভরে গেছে। পাতা নেই একটাও, নিষ্পত্র শাখা-প্রশাখা থেকে সারি সারি ডাঁটা ঝুলছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে ; শুক্লপক্ষের রাতে আরও সুন্দর দেখায়।

ডালগুলো নড়ছে। কেউ বোধ হয় আঁকশি দিচ্ছে নীচে থেকে।

নিজের মনেই হেসে ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ। ছোট মেয়ে কমলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। গাছভর্তি সজনে ডাঁটা দেখে কমলা একদিন বলেছিল, একটা গাছে এত ডাঁটা হয় বাবা, আর আমরা কিনা আনায় পাঁচটা করে কিনে খেতাম। কৌতুকের কথা অবশ্য নয়। গিরিজাপ্রসাদ নিজেও কিছুদিন থেকেই ভাবছেন। হৃদয় মোড়ল একটা সুপুরি গাছ লাগিয়েছিল, সেই গাছ থেকে গোপেন আশি টাকার সুপুরি বেচেছে এবার। সজনে আর সুপুরি নয়, আরও কত কি তো লাগানো যায়, চালান দেয়া যায় শহরে বাজারে। তাতে তো গ্রামের অবস্থা ফিরত। তা নয়, সারা বছর শুধু ধানের চাষ। আর দু'-চার ঘর আখ করে, গুড়ের শাল বসায়। অন্য কোনও কিছুতে কারও কোনও উৎসাহ নেই।

গিরীনকে একবার বলেছিলেন। হেসেছিল গিরীন। —তুমি গাছ বসাবে, গাঁয়ের লোক

চুরি করে শেষ করে দেবে।

তা করবে ঠিকই। কিন্তু দু'-একটা গাছ লাগাবে কেন। বিঘে দরুনে জমিতে বসালে কত আর চুরি করবে। বরং দেখাদেখি সবাই বসাবে।

গিরীন হেসে বলেছে, তখন আর এই দাম পাবে নাকি ? ধানের মত অবস্থা হবে, চাষের খরচ পোসাবে না। কেউ করে না বলেই তো এত দাম ও-সবের।

চুপ করে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। জবাব খুঁজে পাননি। তবু মনে মনে বুঝেছেন, গ্রামের লোকের কোনও উৎসাহ নেই এ-সবে। মাছের পোনা ফেলতেও তাই গররাজি সবাই। এত বড় বড় পুকুর রয়েছে গাঁয়ে। কিন্তু কারও দু'আনা অংশ, কারও চার আনা। মাছ হল কি না হল, কোনও ভাবনা নেই কারও। অন্য কেউ টাকা খরচ করে পোনা ফেললে তখন শুধু ভাগ নিতে আসবে। অথচ মাছের চাষেই কি কম লাভ হতে পারত।

বংশীকে বলেছিলেন একদিন। সেও হেসেছিল। বলেছিল, গাঁয়ে থাকো গো গিরিদাদা, আর কিছুদিন যাক, তখন বুঝবে গাঁয়ের লোক কেমন। বলে কার বাড়ির কাছে হবে এই ঝগড়া করে আরেকটা টিপকল হতে দিল না !

গিরিজাপ্রসাদ কত লোকের কাছ থেকে যে শুনলেন এ-ধরনের কথা। গাঁয়ের লোক খারাপ, গাঁয়ের লোক খারাপ। সকলেই যদি বোঝে, তবে হয় না কেন উন্নতি। রেষারেষি, ঝগড়াবিবাদ, স্বার্থপরতা—এসবের জন্যেই যে কিছু হবার উপায় নেই, তা সকলেই বোঝে, অথচ কেউই সেটুকু বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে না কেন ? একটা পাপচক্রের মধ্যে যেন সকলেই আবদ্ধ, একটা পাঁকের কুণ্ডতে পড়ে আছে। উঠে আসার উপায় নেই। কেন ? কেন ?

বংশীকে একদিন রেগে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

আর বংশী হেসে বলেছিল, একটাই পাপ গো গিরিদাদা, দারিদ্র। ওই পাপ দূর করো, সব পাপ দূর হয়ে যাবে।

শুনতে ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল, কথাটা ষোল আনা সত্যি। কিন্তু তারপরই সন্দেহ হয়েছে। গাঁয়ের তুলনায় শহর তো অনেক সচ্ছল, তবু পাপচক্র থেকে শহরের লোক তো পরিত্রাণ পায়নি। নিজের মনেই তাই একটা সন্দেহের খটকা রয়ে গেছে।

না, অন্য কেউ টাকা দিক বা না দিক, বেশ কিছু টাকার পোনা ফেলবেন এবার। আর কিছু না হোক, ছেলেমেয়েদের বিয়ের খরচ তো কমবে।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে পড়লেই আতঙ্ক বোধ করেন গিরিজাপ্রসাদ। রাত্রে ঘুম হত না নিভাননীর। মাঝরাত্রে স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে মনে পড়িয়ে দিতেন।

গিরিজাপ্রসাদ প্রথম প্রথম বিচলিত হতেন, এখন আর হন না। অমরেশকে কলকাতার কলেজে পড়াচ্ছেন, সে চলে গেছে। মেয়েদেরও বোর্ডিংয়ে রেখে, নয়তো বড়ছেলের কাছে পাঠিয়ে পড়াবেন ইস্কুলে-কলেজে।

পড়াশুনো করবে মেয়েরা, চাকরি করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। সর্বস্ব খুইয়ে পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সাত-সাতটা মেয়ে গোপেন মোড়লের, সেও শুনে হেসেছে। বলেছে, তাও কখনও হয় গো। মুখে যাই বলো, পড়াতেও হবে, পণ দিয়ে বিয়েও দিতে হবে...

বাধা পেয়ে রেগে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। বলেছেন, তোমার এখন আমের মুকুলের অবস্থা গোপেন, ভাবছ, যত বোল হয়েছে তত আম থাকবে।

—তা কেন ভাবব। না খেয়েদেয়ে টাকা জমাব, আবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফতুরও হব। কিন্তু উপায় কি...মেয়েদের তো তা বলে চাকরি করতে পাঠাতে পারব না।

পঞ্চে চাটুজ্যে হেসে বলেছে, আইন হয়েছে গো। পণ আর এখন নেই।

একধারে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে হুঁকো টানতে টানতে সশব্দে হেসে উঠেছে বংশী। বলেছে, ভাল কথাই বললে। আইন ক্যানে হয়েছে জানো গো তোমরা।

—কেন ?

বংশী হাসতে হাসতে বলেছে, সারা দুনিয়া বেলাক হয়ে গেল, সব্বস্তু বেলাক হবে আর বিয়ের ব্যাপারে হবে না। তাই কত্তাদের বড় বুকে বাজছে গো গিরিদাদা।

সকলেই হেসে উঠেছে সে-কথা শুনে। সত্যিই তাই। আইন তো পণ বন্ধ করেনি, বিয়ের বাজারকেও কালো-বাজার করে দিয়েছে।

গোপেন মোড়ল তাই হাসতে হাসতে বলেছে, যাই বলো পণ আছে তাই রক্ষে। মেয়ে আমার কালো, তবু তো টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি গো।

গিরিজাপ্রসাদ কোনও কথা বলেননি। উঠে চলে এসেছেন ভিতর-বাড়িতে। এ লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতেও যেন সারা শরীর জ্বলে ওঠে।

তবু তো টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি। কিন্তু টাকাপয়সা যাদের নেই! আছে ক'জনের ?

এইসব যুক্তিহীন কথাবার্তার জন্যেই গ্রামের লোকগুলোকে ইদানীং আর সহ্য করতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। এমন কি বংশীকেও না। কথাবার্তায় সব সময়ে যেন বংশীর বুকের ভেতরকার একটা অদৃশ্য জ্বালা ফুটে বেরিয়ে আসতে চায়। সবকিছুর অন্ধকার দিকটাই যেন শুধু দেখতে পায় সে। কেন কে জানে!

গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই এক এক সময় আশ্চর্য লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না ছোটবেলাকার সেই বংশী আর এই বংশী একই মানুষ।

মুখে মুখে বংশী ছড়া বানাতে পারত তখন, সুর করে গান করত। তারপর একবার সেই পুজোর সময় যাত্রা এল অপেরা পার্টির।

অধিকারীর পায়ে পায়ে ঘুরছে তখন বংশী। যাত্রাদলের রাঁধুনি বামুনটারও তোষামোদ করছে ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা বলে। যাত্রাদলের ছোট ছোট ছেলেগুলো রান্নার ঠাকুরকে ঠাকুরদাদা বলত, তাই শুনে প্রথম দিন কি যে হেসেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

একদিন দুপুরে মনে আছে, গুপ্তদের বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছে অপেরা পার্টির সবাই, গিরিজাপ্রসাদ উঁকি মেরে দেখেন, হাতির মত মোটাসোটা কালোকুলো চেহারার অধিকারী শুয়ে আছে মাদুরে, আর বংশী তার পা টিপে দিচ্ছে।

একটা পার্ট পাবার জন্যে কি না করেছে বংশী। তারপর একদিন তিনটে গরুর গাড়িতে মালপত্র তুলে অপেরা পার্টির লোকরা চলে গেল। আর সেই দিন থেকেই বংশীরও খোঁজ মিলল না।

ধূমকেতুর মতই উবে গিয়েছিল, ধূমকেতুর মতই ফিরে এল আবার, বছরখানেক পরেই। তখন একেবারে অন্য মানুষ। গলায় তুলসীর মালা, কপালে গোঁসাইদিদির মত গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, মুখে মৃদু মৃদু গান। মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে।

সন্ধে হলেই খড়ি নদীর ধারে গোঁসাইদিদির কুঞ্জে গিয়ে বসত, কীর্তন গাইত, আখর বুনত।

চারপাশের গাঁয়ে নাম ছড়িয়ে পড়ল। বংশী কোটাল নয়, কেত্তনে বংশী দাস। কত লোক ভিড় করে গিয়ে গান শুনত বংশীর।

সেই মানুষ কি করে যে এমন হয়ে গেল, কেন হল, বুঝতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ।

জিগ্যেস করলে হেসে হেসে বলে, তুমিও হবে গো গিরিদাদা, তুমিও হবে। আলো না থাকলে কি করি বলো, আঁধারটুকুই দেখি।

না, গিরিজাপ্রসাদ তা হবেন না, হতে পারবেন না। সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে তাঁর সত্যি, কত কি আশা ছিল, সব ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু স্মৃতির স্বর্গ যে এখনও তাঁর মনের গোপনে বেঁচে আছে।

শুধু স্মৃতিই হয়তো।

রান্নাঘরের পাশের আমগাছটার দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়। আমের মুকুলে ভরে গেছে গাছটা। পাতা দেখা যায় না, এত বোল এসেছে এবার। মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসের দমকে দমকে। মৌমাছির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে ঘন হয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন একটা জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে গাছটার মাথায়।

শুধু ওই গাছটাতেই নয়। গাঁয়ের সব গাছই এমনি বউলে ভরে গেছে। কিন্তু...

ছোটবেলায় শোনা সেই ছড়াটা মনে পড়ে যায়।—

গেঁয়ো বউয়ের তিনটি গান।
আম, মাছ,আর নবান।

নবান হয়ে গেল। কিন্তু পুরনো দিনের সেই উৎসব নেই আর। পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে নবান্ন হয়ে গেল সারা গাঁয়ে, কিন্তু সে যেন শুধুই রীতরক্ষা। এতটুকু আনন্দফুর্তি নেই, হৈচৈ নেই। তেমনি এই আমের বউল দেখেও মন কারও খুশিতে ভরে ওঠে না আর।

টাকা, টাকা, টাকা। টাকা ছাড়া আর যেন কিছু নেই। সব আনন্দ মরে গেছে, আছে শুধু একটাই। শুধু ধানের দর। ধানের দর উঠলে তবেই গাঁয়ের লোকের মুখে হাসি ফোটে!

কিন্তু টাকাটাই কি তুচ্ছ করবার মত?

নলে বাউড়ির বউ প্রমাণ করে দিলে টাকাটা মোটেই তুচ্ছ করবার মত নয়।

রায়বাড়ির মুনিশের কাজ করত নলে বাউড়ি। জমিতে লাঙ্গল দিত চাষের সময়, মই দিত, ধান রুইত, আর বছরের বাকি সময়টুকুও ঘর ছাওয়াত, কাদা দিত দেয়ালে, ফাই-ফরমাশ খাটত।

শুকনো রোগা চেহারা, চুলগুলো বারো আনা পেকে গেছে, কিন্তু লোকটা মুখ বুজে খাটে। নেহাত অসুখবিসুখে না পড়লে ছুটিছাটা নেয় না। তাও এসে দেখা করে বলে যায়, শরীরে বইছে না গো কত্তা, আজকের দিনটা ছুটি দেন!

সেই নলে বাউড়ি একদিন কাজে এল না।

অনেকখানি বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে গিরিজাপ্রসাদ যতে কোটালকে জিগ্যেস করলেন।

যতে কোটাল হাসল, হাসি চাপল, তারপর চুপ করে রইল।

গিরিজাপ্রসাদ আবার প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে বল না?

লজ্জায় মাথা নিচু করে যতে বললে, সে আজ্ঞে আপনাকে কইতে নজ্জা নাগছে।

তার হাবভাব দেখে গিরিজাপ্রসাদ আর নিভাননী দু'জনেই হেসে ফেললেন।

নিভাননী রসিকতা করে বললেন, আবার একটা বিয়ে করতে গেছে নাকি রে!

যতে মুখ তুলে চাইলে একবার নিভাননী আর গিরিজাপ্রসাদের মুখের দিকে, তারপর মাথা নিচু করে বললে, আজ্ঞে না, একটা দুগ্‌ঘটন হয়ে যেছে ওর ঘরে।

—কি হয়েছে? আতঙ্কিত স্বরেই প্রশ্ন করেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর যতে কোটাল মাথা হেঁট করেই উত্তর দেয়, নলেদাদার বউ মাগি ওকে ছেড়ে পালিয়েছে গো।

—পালিয়েছে? বিস্মিত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। নলে বাউড়ির দুঃখে একটু সমবেদনা

বোধ করলেন।

অট্টামা একদিন বলেছিল, কালোর মত মোষ আর নলের মত মুনিশ হলে তবেই চাষ করে আনন্দ, পেসাদ।

কালো অর্থাৎ মোড়লদের পুরনো মোষটা। আর নলে বাউড়ির মত বিনয়ী অথচ পরিশ্রমী মুনিশ। তা না হলে সত্যিই বুঝি চাষ করা বিরক্তির কাজ।

কিন্তু নলে বাউড়িকে গাঁ-সুদ্ধ সবাই যখন পছন্দ করে, প্রশংসা করে, ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তখন লোকটার এমন কি দোষ থাকতে পারে, যার জন্যে তার বউ পালিয়ে যাবে অন্যের সঙ্গে।

গিরিজাপ্রসাদ কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না। শুধু ভাবলেন, স্ত্রীচরিত্র সত্যিই বোঝা ভার।

একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর যতে কোটালকে বললেন, যা তো, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় নলেকে।

যতে চলে গেল। ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। পিছনে পিছনে নলে বাউড়ি।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, কোথায় গিয়েছে সে, খোঁজ পেয়েছিস ?

নলে বাউড়ি মাটিতে চোখ এঁটে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে করে উঠোনের মাটি তুলতে তুলতে ঘাড় কাত করলে।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, যা, তাকে একবার নিয়ে আয় আমার কাছে।

ছোটবেলায় এমন অনেক বিচার মীমাংসা দিতে দেখেছেন গিরিজাপ্রসাদ, নিজেও বিচার করেছেন বড় হয়ে। আর মাথা হেঁট করে সে বিচার মেনে নিয়েছে বাউড়িপাড়ার, বাগদিপাড়ার সকলেই। তাই ভাবলেন, নলে বাউড়ির বউকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবেন, যার সঙ্গে চলে গেছে সে, তাকেও ধমক-ধামক দেবেন।

কিন্তু নলে বাউড়ি মুখ তুললে না। শুধু বললে, সে আসবে না আজ্ঞে !

—আসবে না !

নলে মাথা নাড়ল।

রেগে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ। রাগের স্বরে যতেকে বললেন, তবে তোরা আছিস কেন, কোটালপাড়া বাউড়িপাড়ায় এত লোক, ধরে নিয়ে আসতে পারিস না তাকে। ঘরের বউ অন্যের সঙ্গে চলে গেল—

কথাটা হয়তো বুকে গিয়ে বিঁধল বাউড়িপাড়ার লোকদের।

দিন কয়েক পরে সকালবেলাতেই গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলেন গিরিজাপ্রসাদ।

গোড়ের পাড় ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলেন, চিৎকার করতে করতে একদল লোক আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছোলো। সকলেই চিৎকার করে উঠল, ধরে এনেছি কত্তা, বিচার দেন গো আপনি।

পাশের গাঁয়ের পরান বাউড়ি। বুড়োসুড়ো মানুষ, চুলগুলো সব পেকে গেছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে লোকটা। তারই সঙ্গে চলে গিয়েছিল নলে বাউড়ির বউ।

গিরিজাপ্রসাদ বউটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। রোগা শীর্ণ কুৎসিত চেহারা, বয়স পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বোঝা দায়। সারা শরীরে কোথাও কোনও যৌবনের রেখামাত্র নেই। না কোনও আকর্ষণ।

গিরিজাপ্রসাদ নিজেই কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করলেন। পরান বাউড়ির মধ্যে কি এমন আকর্ষণ বোধ করছে নলের বউটা বুঝতে পারলেন না। একটা জবুথবু বৃদ্ধ। অবস্থাও এমন কিছু ভাল বলে মনে হল না। আর ওই বুড়োটাই বা এই কুৎসিত রোগজীর্ণ

চেহারার মেয়েটার মধ্যে কি পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে বাংলাবাড়ির উঁচু দাওয়াটায় এসে বসলেন গিরিজাপ্রসাদ। লোকগুলো ভিড় করে বসল নীচে মরাইতলায়।

অনেকক্ষণ কোনও কথা খুঁজে পেলেন না গিরিজাপ্রসাদ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন।

ওদিকে ভিতর-বাড়িতে যাবার সদর দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে মোহনপুরের বউ, নিভাননী, বিমলা আর কমলা। গিরীন হয়তো বাইরে কোথাও গেছে। ক্যানেল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আর্জি করতে। যে-সব জমি এক ফোঁটা জল পায়নি চাষের সময়, তার ওপরেও ট্যাক্স ধরে দিয়েছে, তাই যেতে হয়েছে তাকে।

গিরিজাপ্রসাদ নলে বাউড়ির বউয়ের দিকে তাকালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে, কি রে! ধমক দিলেন তাকে, ভেবেছিস কি?

বউটাকে আর বুড়ো পরানকে সামনে বসিয়ে বাউড়িপাড়ার সবাই পিছনে বসেছিল।

গিরিজাপ্রসাদের ধমকের উত্তরে প্রথমটা কোনও কথাই বললে না বউটা। পরান বাউড়িও মাথা নিচু করে রইল।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল নলে বাউড়ির বউ, ক্রুদ্ধ চোখে সে একবার তাকালে নলে বাউড়ির দিকে, তারপর গিরিজাপ্রসাদের উদ্দেশে বললে, ওর ঘরকে যেতে কয়ো না গো আমায়, যেতে কয়ো না। ও মানুষ লয়, পেটে রাক্ষস আছে ওর।

গিরিজাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন না কিছু।

বউটা আবার চিৎকার করে উঠল। —আমার উপ আছে না যৈবন আছে গো, কিসের নেগে যেছি ওর ঘরে! পেটের নেগে, পেটের নেগে।

ক্রমশই যেন রাগে ফেটে পড়ছিল বউটা। আবার বললে, ঘর নিকোব, গরুকে ছানি দোব গো, ধান সিজাব, ভাত রাঁধব—ওর ঘরেও কাজ করছি, এর ঘরেও কাজ করতে হবে গো, বুঝলেন। কিন্তুক, ওই রাক্ষস খেতে দেয় না গো, খেতে দেয় না। মাঠ থিকে ফিরে এসে সব হাম হাম করে খেয়ে লিবে নিজে। সকাল সনজে কাজ করি, তবু ভাত দেয় না তোমার মুনিশ! সব নিজে খেয়ে লিবে।

ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে যায়। আর গিরিজাপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকেন তার দিকে, দেখেন, রাগে ফুলে ফুলে উঠছে বউটা। যেন বহুদিনের সঞ্চিত রাগটা এতদিনে প্রকাশ করতে পেরে মন হালকা করছে।

ভাত। শুধু ভাতের জন্যে ঘর ছেড়েছে বউটা! এখানেও কাজ করে জীবন কাটে, ওখানেও কাজ করে জীবন কাটবে। কিন্তু নলে বাউড়ি যে ওকে খেতে দেয় না, সব ভাত কটা নিজেই খেয়ে নেয়।

অনেকগুলো কথা অনর্গল বলে গিয়ে বউটা হাঁপাতে লাগল। ধীরে ধীরে বললে, মাঠ থিকে যখন ফিরে আসে মানুষটা, দেখেন নাই আপনারা। সব ভাত কটা না দিলে রাঙাপানা চোখ করে, মনে হয় লাঙলের ফালাটা দিয়ে মানুষকে মেরে দিবে।

শুনলেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু কোনও বিচারই দিতে পারলেন না।

সদর দরজার আড়াল থেকে নিভাননী শুনলেন, মোহনপুরের বউও শুনল, নিভাননীর কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

দুটো পরিবার পৃথক হয়ে গেছে, ঘরবাড়ি, উঠোন, খামারবাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে, মাঝখানে একটা পাঁচিল উঠেছে। কিন্তু তা বলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও কেন বন্ধ করতে হবে মোহনপুরের বউ বুঝতে পারে না। তাই কেমন একটা অস্বস্তি থেকেই, কিংবা হয়তো স্বামীর ভয়েই একটু দূরত্ব রেখে চলে মোহনপুরের বউ। টিয়াকেও ওদের কাছে

যেতে দেয় না। কথা বলতে দেখলে ধমক দেয়।

মোহনপুরের বউ সেজন্যেই হৈচৈ শুনে যদিও সদর দরজার আড়ালে দাঁড়াল, তবু আগের মত নিভাননীর কাছ ঘেঁসে আসতে পারল না। ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়াল এমনভাবে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ।

আড়চোখে পরস্পর পরস্পরকে দেখল, কিন্তু কথা বললে না। এটাই সবচেয়ে কষ্টকর মোহনপুরের বউয়ের কাছে।

বাউড়ি-বউয়ের কথা শুনতে শুনতে সবাই হেসে উঠল। বিমলা, কমলা, টিয়া। নিভাননী আর মোহনপুরের বউও। কিন্তু মোহনপুরের বউ হাসতে হাসতে তাকাল টিয়ার দিকে, দু'-একটা কথাও বললে টিয়াকে লক্ষ করে। আর নিভাননী হেসে ফেলে তাকালেন বিমলার দিকে, দু'-একটা কথাও বললেন বিমলাকে। অথচ দু'জনেই কথাটা শোনাতে চাইল পরস্পরকে।

সেই প্রথম গিরিজাপ্রসাদ খেতে বসলে মোহনপুরের বউ যেমন ঘোমটা টেনে আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাশুরকে শুনিয়ে শুনিয়েই চাপা গলায় বিমলাকে জিগ্যেস করত, আর কিছু লাগবে কিনা—এ যেন তেমনি ভাশুর-ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক বড়জায়ের সঙ্গে।

তারপর এক সময় দু'পক্ষই নিজের নিজের কাজে চলে গেল। ছোট লাইনের ছোট্ট স্টেশনে জমা হওয়া ক'টা মানুষ যেমন কয়েক মিনিট পাশে পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্যে, তারপর নিজের নিজের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমনি।

বিমলাও হাসতে হাসতে পালিয়ে এল নিজের ঘরটিতে। নলে বাউড়ির বউয়ের কথাগুলো তার কাছে হাসির কথা বলেই মনে হল। ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্যও নয়। রাঁধা ভাতগুলো খেয়ে নেয় স্বামী, শুধু এই কারণে নাকি বউ স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য লোকের ঘরে পালিয়ে যায়!

বিমলার মনে হল, সব মিথ্যে, সব মিছে কথা। প্রেম ভালবাসা, রূপ যৌবন এ-সবের চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি? থাকতে পারে না।

ওর মনেও তখন একটাই স্বপ্ন। প্রভাকর।

সেই নির্জন নিঃশব্দ যাত্রার রাতটার কথা মনে পড়লেই সারা শরীরে একটা তীব্র পুলকের শিহরন খেলে যায়। গিরিজাপ্রসাদ যেদিন মরাইগুলো দেখতে কয়েক মিনিটের জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন, আর ক্ষণিকের জন্যে আবছা আলোয় বিমলা আর প্রভাকর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল।

মুহূর্তের লুব্ধতায় বিমলার পিঠের ওপর একখানা হাত রেখেছিল প্রভাকর, আর সেই ক্ষণিক স্পর্শের মোহ একটা চিরন্তন স্বাদ হয়ে বেঁচে আছে। মনে মনে কতবার সেই দিনটির কথা রোমন্থন করেছে বিমলা।

তারপরও কয়েকবার এসেছে প্রভাকর। নতুন ইস্কুলের জন্যে আপিল দরখাস্ত সই করাতে, খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে। আর বিমলা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে প্রভাকরের উৎসাহের মূলে আছে এমনি এক রোমাঞ্চের হাতছানি।

দু'-একটা অতি সাধারণ কথাবার্তা, হাসি আনন্দ, ঈষৎ স্পর্শ, চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। এরই ফাঁকে কি করে যে দু'জন দু'জনের এত কাছে এসে গেছে, পরস্পরের প্রতি একটা অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞার মত।

তারপর সেই একটি দিন।

স্টেশনে যাবার কাঁচা রাস্তার ধারে নতুন গোড়ের পুব পাড়ে ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমি দেখতে এল প্রভাকর আর ব্লক আপিসের আরেকজন ভদ্রলোক।

প্রথম প্রথম গ্রামের কারও বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু অবনীমোহন টাকা দিতে

চাইলেন দেখে এবং ইস্কুলটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত হবে এই ভরসা পেয়ে গাঁয়ের সকলেই এগিয়ে এল।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, গোপেন মোড়ল, যে-কিনা প্রথম থেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটাকে, সে-ই বলে বসল, ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমি যা লাগবে আমি দোব।

নতুন গোড়ের পুব পাড়ে খানিকটা ডাঙা জমি, তারও পরে মোড়লদের আমবাগান। সেখানেই বিঘেখানেক ডাঙা জমি ছেড়ে দিতে চাইলে গোপেন। বললে, জমিজমা সেই তো গরমেন্টেই নেবে গো লুটেপুটে, তার চেয়ে নয় গাঁয়ে একটা ইস্কুলই হোক।

গাঁয়ে ইস্কুল হবে, ইস্কুলের জন্যে পাকা বাড়ি হবে, মাস্টার আসবে, গাঁয়ের ছেলেরা পাশ করে বেরোবে...এর চেয়ে আর আনন্দের কি থাকতে পারে।

শুধু বংশী বললে, পাশ করে লাভ কিছু হবে না গো, লাভ হবে না। ওই উদোসের মত শহুরে হতে চাইবে সব, বাবু হতে চাইবে। চাকরি খুঁজবে শুধু।

গুপ্তদের মেজো ভাই বাধা দিয়ে বললে, তবু তো চাকরি পাবার যোগ্যতা হবে পড়াশুনো করলে। তা নইলে...

কথা শেষ করতে দিলে না বংশী। বললে, লাভ তোমার হবে বৈকি। তিন-তিনটে ছেলে তোমার, পাশ করে বেরুলে পণের দর উঠবে হইহই করে, কি বলো!

সকলে হেসে উঠল তার কথা শুনে। কিন্তু বংশীর কথায় কেউ কান দিলে না। সকলের মনেই তখন একটা নতুন নেশা ঢুকেছে। যে গ্রামটাকে কেউই মনে মনে পছন্দ করত না, এমন গাঁয়ে ভিটেবাড়ি, জমিজমা বলে একটা আত্মধিক্কারে জ্বলত, সেই গ্রামটার গর্বেই যেন রাতারাতি উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তাই যেদিন প্রভাকর এল জমি দেখতে, সেদিন গাঁয়ের সকলেই ভিড় করে এল। বিশেষ করে বাউড়ি বাগদিদের ছেলেরা। ইস্কুলে পড়তে পাবে, শিক্ষিত হতে পাবে এই আশায় ছোট ছোট ছেলেগুলোর চোখমুখ উৎফুল্ল।

প্রভাকর, গিরিজাপ্রসাদ, গোপেন মোড়লের পিছনে পিছনে সকলেই দল বেঁধে চলল। বাপের সঙ্গে সঙ্গে বিমলা-কমলাও।

টিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে কপাটের আড়াল থেকে। তারও যাবার ইচ্ছে ওদের সঙ্গে, কিন্তু সাহসে কুলোল না।

গিরীনও গায়ে জামাটা চড়িয়ে নিয়ে ওদের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে টিয়াকে বললে, মাকে বল, ওদের দু'জনের জন্যে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। ফেরার পথে নিয়ে আসব ওদের।

বলেই গিরীন চলে গেল, আর ফুর্তিতে আনন্দে মা'র কাছে ছুটে এল টিয়া। নিজেই ময়দার টিনটা এনে থালার ওপর ঢালতে শুরু করলে।

প্রভাকরের জন্যে এটুকু ব্যবস্থা করতে পেলে, দুটো লুচি নিজের হাতে ভেজে দিতে পারলে যেন জীবন সার্থক হয়ে যাবে তার।

ময়দা মাখতে মাখতে কখন যে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটেছে, টেরই পায়নি। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙতেই দেখলে মা মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

তা দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল টিয়া। মুখ লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে গেল গ্লাস-বাটি-থালা ধুয়ে আনতে। তারপর পুকুরের এপাড় থেকে ওপাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

এত লোকের সামনেই প্রভাকরের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে বিমলা।

সেদিকে তাকিয়ে টিয়ার মুখ থেকে হাসিটুকু আপনা থেকেই কখন উবে গেল।

উনত্রিশ

খবর শুনে অট্টামা লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির হল। নুয়ে-পড়া শীর্ণ শরীরটা লাঠির ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়াল একবার রায়দের বাড়ির বৈঠকখানার সামনে। ছানিপড়া চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজলে। তারপর টিয়াকে ঘাট থেকে বাসন ধুয়ে আনতে দেখে আন্দাজে আন্দাজে প্রশ্ন করলে, কে রে ? টিয়ে ?

টিয়া মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ গো অট্টামা। এখানে দাঁড়িয়ে কেন তুমি ?

অট্টামা টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ রে, কৌশলী যে বললে, নোকে নোকারণ্য রায়দের বাড়িতে ; ইস্কুল বানাতে এয়েছে পেভাকর...

টিয়া হেসে বললে, তাই ছুটে এলে বুঝি ? ইস্কুলে ভর্তি হবে নাকি অট্টামা ?

অট্টামা গম্ভীর হয়ে বলে, ক্যানে, তাতে তোর অত হিংসের কি হল রে ছুঁড়ি। বলে, 'জোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে,' তোর হয়েছে তাই।

টিয়া হেসে বললে, আমায় কেন দুষছ অট্টামা, আমার কপালে কি আর পড়াশুনো আছে ? বলে গিরিজাপ্রসাদের দিকে আঙুল দেখালে।—ওই দেখো, নতুন গোড়ের ওপাড়ে রয়েছে ওরা।

অট্টামা এবার হেসে হাতটা বাড়িয়ে টিয়ার চিবুকে ঠেকাল, চুমু খাওয়ার শব্দ করে বললে, ক্যানে লো খেপি, ইস্কুল হচ্ছে তো তোদেরই, পড়বিনে ক্যানে। আমারই সাধ যাচ্ছে, বলে, 'একবার হল নুনে ফ্যানে, তারপর হল ছেলের সনে।' বুঝলি, ওই খাওয়াও যা, পড়াও তাই। ভর্তি হবো লো ছুঁড়ি, ভর্তি হবো। এ জম্মে না হয়ে, মরে নতুন জন্ম নিয়ে আসব।

টিয়া হেসে উঠল অট্টামার কথা শুনে, তারপর ভিতর থেকে মা'র ডাক আসতেই ছুটে পালাল। আর অট্টামা ঠুক ঠুক করে গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে নতুন গোড়ের পাড় দিয়ে এঁকেবেঁকে উঁচুনিচু রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে ওপাড়ের ভিড় লক্ষ করে এগিয়ে গেল।

পাড়ের জায়গাটুকু তখন মাপজোক করছে সবাই। অট্টামাকে আসতে দেখে বিমলা ছুটে এল। হাসতে হাসতে বললে, অট্টামা ? অট্টামা, আপনি এখানে কেন ?

দন্তহীন মাড়ি বের করে হাসল অট্টামা। বললে, কই রে, ইঁট পুড়িয়েছিস ? ভাঁটা করেছিস কোথায় ?

গোপেন মোড়ল কাছে এগিয়ে এল। বললে, টাকা দাও কিছু, তবে তো ওসব হবে গো।

অট্টামার চোখ ছলছল করে উঠল।—টাকা কি আছে মানিক ! সব যে খুইয়ে বসেছি, তখন ভাশুরপোদের কত আদর যত্ন, এখন সম্বচ্ছরে একবারটি খবর নিতে আসে না। এখন যে আর কানাকড়িও নাই, আসবে ক্যানে। বলে, 'টাকা টাকা টাকা, গোপলা হল গোপলা জ্যাঠা, মঙ্গলা হল কাকা।' তখন সব কত কাকি কাকি করত, এখন সব ফাঁকি।

বলে হাসল অট্টামা। তারপর গিরিজাপ্রসাদ আর প্রভাকরকে আসতে দেখে বললে, হ্যাঁ রে পেসাদ, তোরা যে সব ইস্কুল বানাচ্ছিস, কে পড়বে শুনি ? গাঁয়ে আর মানুষ রইবে কেউ ? সব তো একে একে চলে যাচ্ছে, কার জন্যে করছ এ সব।

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, সে কি, কে চলে যাচ্ছে গাঁ থেকে ?

—ক্যানে, দামু পাল যাচ্ছে সবাইকে নিয়ে, হংস যাচ্ছে। সেই যে বলে না, 'টোল খুলব পণ্ডিত আন, গাঁ উজাড় মুসলমান।' তাই হবে, কেউ থাকবে না গাঁয়ে, শুধু ইস্কুলই হবে।

কে থাকবে আর কে চলে যাবে তা নিয়ে অবশ্য গোপেন মোড়লের দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু হংস চাটুজ্যে চলে যাবে, এটাই তার কাছে নতুন খবর।

তাই প্রশ্ন করলে, হংস চলে যাবে কোথায় ?

—অবনী যে ওর চাকরি করে দিয়েছে। কত বড় বড় নোকের সঙ্গে চেনাজানা তার, বলে কয়ে কাজ করে দিয়েছে, যেতে নিকেছে ওকে। অবনীর ঘরে থাকবে খাবে, ছেলে পড়াবে, আর কাজ করবে আপিসে। বাবা 'টাকার নাম ভাগ্যধর, আপন হয় পরের পর।'

বিমলা হেসে উঠল অট্টামার কথা শুনে। অট্টামার মুখে ছড়া শুনলেই হাসি পায়। অট্টামা তাই বললে, হাসি দেখ মেয়ের ! হাসিস না লো, হাসিস না। টাকা পরকে আপন করে, আপনকে পর করে, বুঝলি। কেলে শুঁটকি কানা খোঁড়া যে মেয়েদের দেখে সব সোনার টুকরো ছেলেরা নাক সিঁটকোয়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাললে তখন তাদেরই বিয়ে করতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়,...বুঝলে ভাই। এ জীবনে কত দেখলাম, আরও কত দেখব। ও তোমার টাকা দেখতে গোল, থাকলেও গোল, না থাকলেও গোল।

বলে ফোক্‌লা মুখে হেসে উঠল অট্টামা।

ইতিমধ্যে কাজ চুকে গিয়েছিল প্রভাকরের। তাই রায়বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করল সে। পিছনে পিছনে সারা গাঁয়ের ছেলেবুড়ো।

অট্টামা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে গিরীন আছে কিনা কাছেপিঠে। দেখলে, সে আগে আগে চলে যাচ্ছে।' হয়তো প্রভাকরের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে।

অট্টামা ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গিরিজাপ্রসাদকে বললে, পেসাদ, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল বাবা।

গিরিজাপ্রসাদ থেমে দাঁড়ালেন এক পাশে। সকলে একে একে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গিরিজাপ্রসাদ বুঝলেন, কোনও একটা গোপন কথা বলতে চায় অট্টামা।

সকলে একটু দূরে চলে যেতেই অট্টামা বললে, তোমার ওই মেয়ের বিয়ের কিছু করলে ?

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। কি জবাব দেবেন এ-কথার ! স্ত্রী নিভাননীর কাছেও তো এ-কথা বহুবার শুনেছেন। তাই ভুলে থাকতে চান। মনে পড়লেই একটা দুশ্চিন্তা দেখা দেয় শুধু।

অট্টামা খানিক চুপ করে থেকে বললে, একটা ব্যবস্থা করো কিছু। গিরীন তো ওর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করে ফেলেছে, শেষে লোক যে তোমাকেই ছি ছি করবে।

গিরিজাপ্রসাদ চমকে উঠলেন। —টিয়ার ! টিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ, ওই পেভাকরের বাপ যে আসবে মেয়ে দেখতে।

—প্রভাকরের সঙ্গে ? আরও বিস্মিত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর পর মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকাতেই চোখোচোখি হয়ে গেল বিমলার সঙ্গে। চোখ ফেরালে বিমলা, এমন ভাব করলে মুখের, যেন শুনতেই পায়নি সে। তার সারা মুখ যে মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, গিরিজাপ্রসাদ তা লক্ষ করলেন না।

হঠাৎ এমন একটা আঘাত পাবে, বিমলা কল্পনাও করেনি। মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীর জ্বলে উঠল তার। মন বিষিয়ে উঠল প্রভাকরের বিরুদ্ধে।

এতক্ষণ যে ও প্রভাকরের কাছে কাছে ঘুরেছে, কথা বলেছে, হেসেছে, হাসিয়েছে, তার পিছনে একটাই আনন্দ ছিল। কাছে থাকার আনন্দ। এতগুলি লোকের মাঝেও ওরা যেন পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করেছে, এতখানি দূরত্বের মধ্যেও মনে মনে ঘনিষ্ঠ বোধ করেছে।

দিনে দিনে দু'জনে দু'জনের ওপর যে আস্থা আর বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল, মুহূর্তে তা

যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হল বিমলার মাথায়। একবার মনে হল অট্টামার সব কথা মিথ্যা, সব ভুল। পর মুহূর্তেই প্রভাকরের ওপর রাগে জ্বলে উঠল। না, মিথ্যা নয়। সত্যি না হলে অট্টামা এ-কথা বলবে কেন।

কি আশ্চর্য। ভাবতেও বিস্ময় জাগে বিমলার। প্রভাকর সব জেনেশুনেও এমন একটা খেলা খেলছে তার সঙ্গে ? কেন, কেন ? চোখ জ্বালা করে উঠল বিমলার।

ইচ্ছে হল এখনই গিয়ে প্রভাকরকে চিৎকার করে দুটো কথা শুনিয়ে দেয়।

কোনরকমে বাড়ি ফিরে এসেই বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল বিমলা। কিন্তু এমনভাবে তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করল কেন প্রভাকর ? ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পেল না। তবে কি এতদিন ধরে শুধুই সে অভিনয় করে এসেছে বিমলার সঙ্গে ?

একটা দিনের কথা মনে পড়ল।

একটা না একটা ছুতোয় প্রায়ই বনপলাশিতে আসতে শুরু করেছে তখন প্রভাকর। আর তারই ফাঁকে গিরিজাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। বিমলা লক্ষ করে, মুখ টিপে হাসে, বুঝতে পারে কিসের টানে এমন ঘন ঘন আসে প্রভাকর। আর তাই মনে মনে খুশি হলেও বেশ কিছুটা কৌতুক বোধ করে সে। আর তার কৌতুকের হাসিটা প্রভাকরও যেন বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে তাই একটু চটেও যেত সে। মনে হত বিমলার হাসিটা যেন তাকে তাচ্ছিল্য দেখাতে চায়।

সেদিনও এমনি গিরিজাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল প্রভাকর, ইস্কুলের দরখাস্তটা ক-ধাপ এগিয়েছে, কি মন্তব্য করেছেন উপরওয়ালা, সেটুকুই জানাতে এসেছিল।

এক সময় গিরিজাপ্রসাদ ভিতর-বাড়িতে উঠে গেলেন।

আর সেই সুযোগেই চা নিয়ে এসে দাঁড়াল বিমলা। প্রভাকরের চোখে চোখ রেখে ঠোঁটে অন্তরঙ্গতার হাসি দুলিয়ে অপেক্ষা করলে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আপনি শেষে দেখছি বিপদে ফেলবেন আমাকে।

বলে ঠোঁট টিপে হাসলে।

কথাটা দুর্বোধ্য ঠেকল প্রভাকরের কাছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন করলে, কেন ? কিসের বিপদ ?

খিলখিল করে হেসে উঠল বিমলা। —এত ঘন ঘন আসছেন, কেউ যদি...

প্রভাকর লজ্জিত বোধ করলে। তারপর বিমলার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে বললে, না এসে পারি না যে !

আর কোনও কথা বলেনি বিমলা। দ্রুত পায়ে সেখান থেকে সরে এসেছিল। কিন্তু প্রভাকরের ওই ছোট্ট কথাটুকু যেন ওর সারা শরীরে মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের ফুলঝুরি জ্বেলে দিয়েছিল।

ছোট্ট এতটুকু একটা কথা। অথচ গ্রীষ্মের দুপুরে গভীর আর ঠাণ্ডা একটা দিঘিতে ডুব দিয়ে ওঠার মত বিচিত্র এক অনুভূতিতে সমস্ত শরীর যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল বিমলার। এত স্পষ্টভাবে, এত অকপটভাবে প্রভাকর বুঝি কোনওদিন তার কাছে ধরা দেয়নি এর আগে।

সারাটা দিন একটা ফূর্তির হিল্লোলে নেচে নেচে উঠেছিল তার মন।

কি আশ্চর্য। সেদিনও কি এ-কথাটার মধ্যে কোনও সত্য ছিল না ? শুধুই অভিনয় করে গেছে প্রভাকর ?

অট্টামার কথাটা তখনও কানে বাজছে তার। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ কিছুই

ভাবতে পারল না বিমলা। শুধু একটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করল বুকের মধ্যে।

তারপর ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠল। কান পেতে শুনলে। না, কোনও কথা, কোনও শব্দ ভেসে আসছে না তো!

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল বিমলা। এসে দেখলে প্রভাকর আর তার সঙ্গী ভদ্রলোক কখন যেন চলে গেছে। শুধু উচ্ছিষ্ট থালা বাটি গ্লাস পড়ে আছে বারান্দায়।

দেখলে, ডুরে শাড়িটায় সারা গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে করতে জড়োসড়ো হয়ে টিয়া থালা-বাসনগুলো তুলে নিল এক হাতে, আর অন্য হাতে গোবরজল ছিটিয়ে দিল জায়গাটায়।

তারপর হঠাৎ বিমলার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই কেমন যেন অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল টিয়া।

বিমলার মনের মধ্যে কি ঝড় উঠেছে তার খবর রাখেন না গিরিজাপ্রসাদ। তাঁর নিজের মনেই তখন একটা ঘূর্ণি উঠেছে।

ছোটভাই গিরীনের সঙ্গে এর আগে অনেক মন কষাকষি হয়েছে, অনেক বিরোধ ঘটেছে, মনোমালিন্য। কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান বুঝি কখনও কুড়োতে হয়নি গিরিজাপ্রসাদকে। হঠাৎ আজ গিরিজাপ্রসাদের মনে হল, তিনি সম্পূর্ণ হেরে গেছেন গিরীনের কাছে। হেরে গেছেন।

বিমলার বিয়ে দেবেন না, তাকে কলেজে পড়াবেন, নিজের পায়ে দাঁড় করাবেন, কত কি জোর গলায় বলেছেন এর আগে। বলেছেন, বিয়েই তো মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। চাকরি করে স্বাবলম্বী হবে বিমলা—এমন অনেক কথাই বলেছেন। নিজের মনকেই হয়তো প্রবোধ দিয়েছেন সে-কথা বলে।

কিন্তু টিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, তাও প্রভাকরের সঙ্গে—এই একটা ছোট্ট খবরে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্মান সম্ভ্রম যেন মাটিতে মিশে গেল।

সকলে চলে যাওয়ার পর নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে এসে চুপ করে শুয়ে রইলেন। হাতপাখাটা তুলে নিয়ে বার কয়েক বাতাস করলেন রোমশ বুকের ওপর।

তারপর ধীরে ধীরে ডাকলেন, কুমি!

—কি বাবা? কমলা কাছে এসে দাঁড়াল।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, তোর মাকে একবার ডাক তো মা!

একটু পরেই নিভাননী এসে হাজির হলেন। গিরিজাপ্রসাদ উঠে বসলেন তক্তপোশের ওপর। চোখ তুলে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। কথাটা নিভাননীকে বলবেন কি বলবেন না, ভাবলেন এক মুহূর্ত।

শেষে বলেই ফেললেন।—টিয়ার নাকি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে ওরা?

নিভাননী চমকে উঠলেন।—কে, ঠাকুরপো বললে?

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন।—না। ওরা হয়তো বিয়ের দিন বলবে। শুনলাম প্রভাকরের সঙ্গে বিয়ের চেষ্টা করছে, মেয়ে দেখতে আসবে ওর বাবা...

—তবেই বোঝো। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিভাননী। —এত আপন আপন করো, এ খবরটুকুও আমাদের বলতে চায় না। যেন আমাদের বললে আমরা বিয়ে ভাঙিয়ে দেব।

গিরিজাপ্রসাদ বিষণ্ণ হয়ে হাসলেন। বললেন, তাই এত চা-জলখাবার খাওয়ানোর ধুম। তখন তো বুঝিনি।

নিভাননী হঠাৎ যেন রেগে গেলেন।—এখন বলে আর কি হবে। ছি ছি ছি, হাতের সামনে এমন একটা পাত্র ছিল, একটু চেষ্টা করে দেখলেও তো পারতে।

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, চেষ্টা করেও কিছু হত না। দশ হাজার টাকা বের করতে পারতে তুমি ?

নিভাননী চুপ করে রইলেন। সত্যিই তো, এত টাকা কোথায় পেতেন তিনি। সংসার চালানোই দায় যেখানে !

গিরিজাপ্রসাদ সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পাড়াগাঁয়ের লোকদের সঙ্গে কি পারবে আর ? ধানের দর পাচ্ছে সেই যুদ্ধের সময় থেকে...

নিভাননী গুম হয়ে রইলেন। কোনও কথা বললেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, মুখ দেখাতে পারব না লোকের সামনে। কি বলবে বলো তো সবাই ? টিয়ার চেয়ে কত বড় বিমলি, ও পড়ে রইল...

হঠাৎ দপ করে রাগে জ্বলে উঠলেন নিভাননী। নিজের মনেই গজরে উঠলেন, ছোটলোক, ছোটলোক।

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। একটু যেন আঘাত পেলেন নিভাননীর কথায়। ভাবলেন, গিরীনকে দোষ দিয়ে কি হবে, দোষ তো নিজেদেরই। তাঁর নিজের।

বললেন, বাবা কেন যে পড়াশুনো করিয়েছিলেন, অশিক্ষিত হয়ে যদি গাঁয়ে পড়ে থাকতাম চাষবাস নিয়ে ! আজ এত দুশ্চিন্তা থাকত না।

কিন্তু দুশ্চিন্তা তো সেজন্যে নয়। গিরিজাপ্রসাদ আহত হয়েছেন অন্য কারণে। মনোমালিন্য শুরু হয়েছে এখানে আসার পর থেকেই, কলহ-বিবাদ হয়েছে, পৃথক হয়ে গেছে দুটি পরিবার, তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা থেকেই গেছে। দু'বাড়ির ভদ্রাসনের মাঝখানে যে পাঁচিলটা উঠেছে, দু'ভাইয়ের মনের মাঝখানে সে-পাঁচিল নেই বলেই এতদিন ভেবে এসেছেন তিনি।

গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়ল, একদিন দুপুরে হঠাৎ বুকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পড়েছিলেন। বিমলা গিয়ে ডেকে এনেছিল অবিনাশ ডাক্তারকে। আর ডাক্তারকে আসতে দেখে গিরীনও ছুটে এসেছিল সেদিন, দুপুরের ট্রেনে বর্ধমান গিয়ে একটা ওষুধ কিনে এনেছিল।

আবার যেদিন মোহনপুরের বউয়ের কোলের ছেলেটা ঘাট থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেদিন নিভাননী, বিমলা-কমলা সবাই ছুটে গিয়েছিল রাগ দ্বেষ অভিমান ভুলে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স খুলে ওষুধ খাইয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, মাথায় জলপটি দিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিভাননী তাকে কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মাথায় বাতাস করেছিলেন।

দুটো দিনই তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছিল, দুটি পরিবারকে বিপদে আপদে একত্র হতে দেখে। আশা করেছিলেন, পিছনের সব গ্লানি মুছে দিয়ে আবার এক হয়ে যাবে সবাই।

হয়নি। পরের দিন থেকেই একটু একটু করে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেছে। বর্ষায় যে মাটি এক হয়ে গিয়েছিল, মেঘ সরে যেতেই, গ্রীষ্মের প্রখর রোদ ফুটে উঠতেই সেই মাটি ফেটে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। মনে হয়েছে, আর জোড়া লাগানো যাবে না।

সত্যিই তাই। ধীরে ধীরে আবার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে দুটি পরিবারের।

তবু গিরিজাপ্রসাদ আশা করেছিলেন, টিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ করবার আগে তাঁকে একটু আভাস অন্তত দেবে গিরীন, দু-একটা উপদেশ চাইবে। প্রভাকরের সঙ্গে টিয়ার বিয়ে হলে তিনি কি অখুশি হবেন ? নিভাননী অখুশি হবেন ? আজ পৃথক হয়ে গেছেন বলেই কি টিয়া তাঁর কেউ নয় ? বিমলা আর টিয়ার মধ্যে কতটুকু প্রভেদ করেন তিনি ? করেন কি ?

কিন্তু সব ব্যাপারটা এত গোপনে গোপনে করার কি প্রয়োজন ছিল গিরীনের !

প্রয়োজন হয়তো ছিল। তাই গিরীন বার বার সাবধান করে দিয়েছে মোহনপুরের বউকে। বলেছে, টাকাকড়ি আগে জোগাড় হোক, তারপর...

টাকাকড়ি কি করে জোগাড় হবে সেটাই আসল দুশ্চিন্তা গিরীনের। মোহনপুরের বউয়েরও। মাত্র দু-মরাই ধান আছে, তা বেচে আর কত টাকা হবে। জমি বেচবেন বিঘে কয়েক। বেচতে হবেই। কিন্তু সেখানেই আসল লজ্জা গিরীনের।

কোনওরকমে যদি গিরিজাপ্রসাদের কানে যায়, বউঠানের কানে যায়, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

বাউড়িদের একটা ছেলে রেলে চাপরাসির কাজ করে, সে জমি খুঁজছে দু-এক বিঘে, গিরীন শুনেছে, তবু তাকে খবর দিতে চায়নি, শুধু সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে বলে।

গোপনে গোপনে ধীরেন সাঁইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। বলেছে, খবরটা যেন এখন প্রকাশ না পায়। পরে বললেই চলবে যে, অভাবের জন্যে তো বেচিনি, গরমেন্ট নিয়ে নেবে তাই বেশি দাম পেয়ে নিজেই দিয়ে দিয়েছি।

মোহনপুরের বউকে সে-কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে গিরীন। বুকের ভিতর একটা ব্যথার মোচড় দিয়ে উঠেছে। ধীরেন সাঁই, আসানসোলে কার বাড়িতে মাস্টার হয়ে ছিল, কোলিয়ারিতে কোথায় কুলি-খালাসির মুনশি ছিল, সেও টাকা জমিয়ে জমি কিনছে। আর জমি বেচছে কিনা রায়বাড়ির ছেলে!

মোহনপুরের বউ চাপা গলায় হতাশা ফুটিয়ে বলেছে, জমি থেকে আমাদের সংসার চলছে না, তবু তো কিনছে লোকে।

হেসেছে গিরীন। —লাভ তো ওদেরই হবে গো। দিব্যি চাকরি করে চলে যায়, জমির ধানটা উপরি লাভ। আমাদের মত জমির ধানেই তো সারা বছর সংসার চালাতে হয় না।

গিরীন যেন চোখের সামনে দেখতে পায়, গ্রাম থেকে তারা ধীরে ধীরে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। যাবেই। অট্টামা আজকাল কথায় কথায় বলে, গাঁয়ে লোক থাকবে না, শ্মশান হয়ে যাবে সব। শ্মশানই তো হয়ে গেছে। কে আছে গাঁয়ে, ক-ঘর আর থাকবে। বাউড়ি বাগদিদের দু-এক ঘর হয়তো থাকবে শেষ অবধি। তারাও তো একে একে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে, কলকারখানায়—দোকানপাট করছে, দুর্গাপুরে ছুটছে।

সেদিন রাত্রে এমনি ধারার কথাই হচ্ছিল মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে।

হাতপাখা নাড়তে নাড়তে গিরীনের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসে পান চিবোতে চিবোতে গভীর তৃপ্তিতে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে মোহনপুরের বউ বললে, প্রভাকর ছেলেটি কিন্তু খুব ভাল।

গিরীন সায় দিলে। বললে, মেয়ে যদি অপছন্দ না হয়, টিয়ার বিয়ে আমি ওখানেই দোব।

মোহনপুরের বউ ধীরে ধীরে বললে, বটঠাকুরকে বলবে না?

—না, না। ঘাড় নাড়লে গিরীন। —এখন না। বললেই তো ভাববে, এতকাল অনেক জমিয়েছি, তাই এত পণ দিচ্ছি মেয়ের বিয়েতে।

মোহনপুরের বউ ক্ষুণ্ণ মনে বললে, তা কেন, জমি বেচে দিচ্ছি বললেই তো...

হাসল গিরীন। —পাগল হয়েছ! ভাববে, মিছে কথা বলছি, বেনামি করছি ওই বলে। আর যদি বিশ্বাস করেও, না, না, সে ওদের কাছে আমার মাথা কাটা যাবে। এমনিতেই দেখছ না, বড়লোক বলে ছেলেমেয়েগুলোও আমাদের হেলাফেলা করে। জমি বেচতে হচ্ছে জানলে...

মোহনপুরের বউ কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ঘুমোতে ঘুমোতে বার বার পাশ ফিরছে টিয়া, দেখতে পেল। মেয়েটা জেগে আছে নাকি?

তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকে ঠোঁট টিপে হাসল মোহনপুরের বউ

তিরিশ

টিয়া ঘুম থেকে উঠল অদ্ভুত একটা খুশি-খুশি ভাব নিয়ে। হাঁটাচলা, কাজকর্ম, সবকিছুর মধ্যেই একটা ফুর্তির রঙিন শাড়ি যেন তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। তাই কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াল টিয়া। শরীরের সব গ্রন্থিগুলো হঠাৎ বুঝি শিথিল আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এতকাল তবু একটা আশঙ্কা ছিল, শেষ অবধি পণের টাকা জোগাড় হবে কি না! রাত্রে শুয়ে শুয়ে সব কথাবার্তা শুনেছে সে। শুনেছে, বাবা বলেছে, যেমন করে হোক টাকা জোগাড় হবেই। বলেছে, প্রভাকরের বাপকে দেখে যা মনে হল, টাকা পছন্দ হলেই তার মেয়ে পছন্দ।

শুনে একটুও খারাপ লাগেনি টিয়ার। সব ছেলের বাপই তো তাই। সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে কত বিয়েই তো হল এ-গাঁয়ে, কত বিয়েই দেখলে। কই, টাকা নিতে তো কোনও ছেলের বাপই ছাড়েনি। তাই এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই লাগেনি টিয়ার।

বাবা বলেছে, যেমন করে হোক টাকা জোগাড় হবেই। এইটুকু শুনেই ফুর্তিতে মন নেচে উঠেছিল তার, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি। তারপর তৃপ্তিতে আনন্দে নানা রঙিন মুহূর্তের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন রোদ পড়েছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। বেলা হয়েছে।

চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে বিছানাপত্তর তুলে গুছিয়ে রাখলে টিয়া। কাপড় ছাড়লে। তারপর বাইরে এসে দেখলে খণ্ড কোটাল দুধ দুইয়ে অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে।

টিয়াকে দেখে হাঁড়িটা মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। টিয়া সেটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। দেখলে, মা ইতিমধ্যে ডাল চড়িয়ে দিয়েছে।

টুকিটাকি কাজ সেরে এসে মা'র কাছে বসল টিয়া। বলল, তুমি যাও, বিশুকে খাইয়ে দেবে, আমি চাল ক'টা ধুয়ে চাপিয়ে দিচ্ছি।

মোহনপুরের বউ নড়ল না। বললে, তুই বরং একবার পালবউয়ের কাছে যা!

—কেন ?

—ওদের এখানে খেতে বলে আয় রাত্তিরে। আবার কবে দেখা হবে তাই বা কে জানে। মোহনপুরের বউ দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

আর টিয়া চমকে উঠল।—রেণুদি, রাঙাবৌদি সব চলে যাচ্ছে ? কবে ?

মোহনপুরের বউ হাসলে। বললে, তুইও তো একদিন চলে যাবি! এমনি করেই।

টিয়া লজ্জা পেল, মুখ নিচু করলে।

মোহনপুরের বউ তার লজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে। সংসারের নানা ঝামেলার মধ্যে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখতেও মনে পড়ে না, সুযোগ পায় না মোহনপুরের বউ। তাই হঠাৎ মেয়ের ভরাট মুখে, যৌবনসন্ধির উদ্বেলতায় আঁকা স্নিগ্ধ কমনীয় রূপটুকুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল মোহনপুরের বউ। পুজোব সময় কেনা আটপৌরে লাল-নীল চেককাটা শাড়িটায় সুন্দর মানিয়েছে টিয়াকে। ভাবলে, পাশে প্রভাকরের মত একটি ছিমছাম চেহারার ছেলেকে এনে দাঁড় করাতে পারলে আরও সুন্দর মানাবে।

টিয়া মুখ তুলে তাকালে এবার। বললে, কবে যাবে ওরা, বলো না ?

—কাল!

—কাল ? হতাশ দেখাল টিয়াকে। দামুদা চলে যাবে, রেণুদি চলে যাবে, জানত টিয়া। তবু ভাবতে পারেনি, এত শিগগির চলে যাবে তারা।

মোহনপুরের বউ বললে, যা বলে আয়, এখানে ওরা সবাই খাবে রাত্তিরে। বলবি, মা আসত, বাড়িতে অনেক কাজ, তাই...

টিয়া ঘাড় কাত করে সায় দিল, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল। আর তার চলার ছন্দের দিকে তৃপ্তির চোখে তাকিয়ে রইল মোহনপুরের বউ।

অন্য দিন একটু সুযোগ পেলেই ছুটতে ছুটতে উঁচু-নিচু পুকুরের পাড় ঘেঁসে, বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, মশায়দের বাড়ির পাশের গলি দিয়ে রেণুদিদের বাড়িতে এসে হাজির হত টিয়া। ফিরুকে কোলে নিয়ে, কাঁধে তুলে, বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরে দিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁদিয়ে বিরক্ত করে আনন্দ পেত। কিন্তু আজ আর ছুটে যেতে ইচ্ছে হল না তার।

বুকের মধ্যে একটা অভিমান ফুলে ফুলে উঠল। রেণুদি চলে যাচ্ছে, রাঙাবৌদি চলে যাচ্ছে, অথচ একটা খবরও দেয়নি তারা টিয়াকে ?

আজ আর তাই রেণুদিদের বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই যেন।

পাঁজাপুকুরের ধারে এসে দাঁড়াল সে কিছুক্ষণ। জনকয়েক বাগদিবউ পলুই ফেলে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে মাছ ধরছে, গুগলি তুলছে। সেদিকে খানিক তাকিয়ে থেকে টিয়া একটা মাটির চাঙড় তুলে ছুঁড়ে দিলে মাঝপুকুরে। বাগদিবউ একজন চমকে ফিরে তাকাল মাছ ঘাই দিচ্ছে মনে করে। আর তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল টিয়া। টিয়ার দিকে তাকিয়ে বাগদিবউটাও হাসল। তারপর আবার এক কোমর জলে নেমে পলুই ফেলতে শুরু করলে।

একটা বাঁশপাতা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে কাটতে রেণুদিদের বাড়িতে এসে হাজির হল টিয়া। কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

টিয়া ভিতরে ঢুকতেই রেণুদি ফিরে তাকালে। বললে, আয়। তারপর যেমন টুকিটাকি জিনিসগুলো জড়ো করছিল তেমনি করে যেতে লাগল। অন্যদিনের মত খুশি হয়ে ছুটে এল না।

দামুদাও একটা বস্তার মুখ ফাঁক করে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আর রাঙাবৌদি ঘরের ভিতর থেকে দু-একটা জিনিস এনে সেই বস্তার মধ্যে দিতে দিতে একবার টিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে শুধু হাসল।

মরাইতলায় বসে বসে একটা কাঁসার থালা থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছিল ফিরু, টিয়াকে দেখে সে-ই শুধু টলতে টলতে কাছে এগিয়ে এল। কাছে এসে টিয়ার কাপড় ধরে টানলে। তবু তাকে কোলে তুলে নিতে চাইল না টিয়া।

তার সমস্ত শরীরে মনে তখন তোলপাড় চলছে। মনে হল যেন দামুদা, ফিরু সবাই পর হয়ে গেছে, পর হয়ে যাবে। বুকের ভিতর থেকে একটা অসহ্য দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

না, শেষ অবধি অভিমানে ফিরুকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে না টিয়া। তাকে হঠাৎ বুকে তুলে নিয়ে তার গালে মুখ ঘসতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরুর গালে টিয়ার চোখের জলের একটা রেখা ফুটে উঠল।

রেণুদির চোখে পড়ল হয়তো। কাজ রেখে কাছে এগিয়ে এল রেণুদি, টিয়ার পিঠে একটা হাত রেখে বললে, ছিঃ, কাঁদছিস!

একটু থেমে বললে, কাজটুকু সেরে নিই, তারপর চল, আজ অমিত্তে সাঁতার কাটতে যাব, কেমন ?

এইটুকু আদরেই সব অভিমান সরে গেল টিয়ার মন থেকে। ঘাড় নেড়ে সায় দিল ও।

তারপর বললে, মা তোমাদের সকলকে আজ রাত্তিরে আমাদের ওখানে খেতে বলেছে।

দামুদা কথাটা শুনল, তারপর রাঙাবৌদির দিকে তাকিয়ে বললে, কেমন ? বলেছিলাম না ?

রাঙাবৌদিও হাসল।

দামুদা বললে, যাব, নিশ্চয় যাব। গাঁয়ে মানুষ থাকতে পারে না টিয়া, থাকতে পারে না। তবু ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় কেন জানো, এই তোমাদের মত দু-একটা বাড়ি আছে বলে।

টিয়ার মন থেকে এবার সব মেঘ কেটে গেল। আর মাকে তার ভীষণ ভাল লাগল। মনে হল, মা কত ভালো। তার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না এ-গাঁয়ে।

সব কাজ সেরে পিতলের ঘড়া নিয়ে যখন দুপুর রোদে অমৃতের দিকে পা বাড়াল টিয়া, রেণুদি আর রাঙাবৌদির সঙ্গে, তখন একে একে সব কথা শুনল টিয়া।

রেণুদি বললে, চলে যাচ্ছি শুনেও কেউ দেখা করতে এল না রে। শুধু অট্টামা আর মোড়লগিন্নি এসেছিল। চলে গেলে তো সবাই পর করে দেবে জানি, যাবার আগেই পর করে দিলে !

টিয়া কোনও জবাব দিলে না। ওর শুধু দুঃখ হল, সকালে ব্যস্ততার মধ্যে ওকে আগের মত ছুটে এসে কাছে ডাকেনি কেউ, তাই কি অভিমানই না হয়েছিল !

ধীরে ধীরে অমৃতের পাড়ের আমবাগানে এসে ঢুকল ওরা। একটা গাছের তলায় ঘড়া আর কাপড় রেখে বসলে ঘাসের ওপর।

আমের মুকুলে ভরে গিয়েছিল সারা বাগান। এখন অনেক ঝরে গিয়ে ছোট ছোট আম ধরতে শুরু করেছে। অনেক গাছে এখনও মুকুল আছে। তাই মিষ্টি একটা গন্ধে ভরে আছে চতুর্দিক।

দামু পাল হাট থেকে একটা রাঙা গামছা কিনে এনেছিল, রাঙাবৌদি সেটাই বুকে জড়িয়ে চুল খুলে চুড়ো করে বাঁধছিল। টিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রাঙাবৌদিকে। সরষে খেতের মত হলুদ হলুদ রং রোদ্দুরের, আর বুকে জড়ানো রাঙা গামছা—দুটো রঙের আভা পড়ে রাঙাবৌদির মুখখানা বড় সুন্দর লাগছিল। সত্যি, রাঙাবৌদির দিকে তাকিয়ে টিয়া একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। গাঁয়ে এত বউ-ঝি আছে, কিন্তু কারও মুখে এমন একটা তৃপ্তির ভাব ফোটে না। আর-সবাইকে দেখলে মনে হয় যেন সংসার করার মত যন্ত্রণা আর নেই। দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে, ঝগড়াবিবাদ, চিৎকার, হট্টগোল। অথচ দামুদা আর রাঙাবৌদি যেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। রাঙাবৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা মনে হল টিয়ার, আর ফিক করে হেসে ফেলল ও।

—কি, হাসলে যে !

টিয়া জবাব দিলে না। ওর মনে হয়েছে দামুদা রাঙাবৌদিকে খুব ভালবাসে, তাই রাঙাবৌদি এত সুন্দর।

রেণুদিও জিগ্যেস করলে, হাসলি কেন ?

—এমনি।

বলেই উঠে দাঁড়াল টিয়া, ধীরে ধীরে পুকুরঘাটে নেমে গেল।

পায়ের গোছ অবধি জলে ডুবিয়ে শাড়িটা হাঁটু অবধি তুলে ফিরে তাকাল টিয়া।

—আসবে না ?

—ঘড়া নিবি না ? রেণুদি জিগ্যেস করলে।

—না।

ঘড়া বুকে নিয়ে সাঁতার দেওয়ায় আরাম আছে, এতটুকু পরিশ্রম করতে হয় না, বাতাসের দমকে দমকে ভেসে বেড়ানো। কিন্তু ইচ্ছেমত হুটোপুটি করা যায় না, ডুব সাঁতার দিয়ে এখনই এখানে, আবার তখনই ওই শালুক ফুলটার কাছে গিয়ে ওঠা যায় না। অথচ আজ নিজের সঙ্গে নিজেরই লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে টিয়ার।

ও একটু একটু করে এগিয়ে গেল জলের দিকে। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল, তলায় বালি চিকচিক করছে। এই একটা পুকুরেই কাদা নেই, পাঁক নেই, খাবার জল নিয়ে যেত আগে সবাই, স্নান করা বারণ ছিল তখন। টিউবওয়েল হয়ে থেকে আর কেউ আসেও না এদিকে। তাই এক পাশে কলমির ঝোপ হয়েছে, বনকচুর শিস আর মটরলতায় ঢেকে গেছে ওদিকের ঘাট।

রাঙাবৌদি আর রেণুদি জলে নামতেই হাঁসের মত হঠাৎ শরীরটাকে নুইয়ে দিয়ে এককোমর জলেই গলা অবধি ডুবিয়ে দিলে টিয়া। তারপর সাঁইসাঁই করে পুকুরের মাঝ বরাবর চলে গেল।

পাড় থেকে অমিত্তের জল মনে হয় নিকষ কালো। তার মাঝে মাঝে শালুক ফুল ফুটে আছে। কোথাও পানিফলের পাতা চাকা চাকা হয়ে ভাসছে, আর অনেক দূরে—ওপারে কচুরিপানার জঙ্গলের মাঝে মাঝে বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে দু-চারটে। ফুল নয়, যেন গুপ্তদের সেই নতুন বউয়ের মত রূপের গর্বে ঘাড় সোজা করে একপিঠ চুলের খোঁপাটা তুলে দেখাচ্ছে সবাইকে। আর ওই কালো জলের মধ্যে তিনটি সাদা হাঁসের মত সাঁতার কাটছে ওরা তিনজন। কখনও পাশাপাশি, কখনও দল ছেড়ে, কখনও সামনাসামনি দু'দিক থেকে এসে আবার একসারিতে মিশে যাচ্ছে। ঠিক হাঁসের মতই।

সাঁতার কাটতে কাটতে দু-একটা কথা বলে এ ওকে, হাসে। কিন্তু না, ঠিক সেই আগের দিনের মত আনন্দ নেই যেন, উল্লাস নেই।

প্রথম যেদিন দামুদা এসে খবর দিয়েছিল, বটতলায় একটা দোকান পেয়েছে, বর্ধমানে বাসা করে সকলকে নিয়ে যাবে, সেদিন রাঙাবৌদি আর রেণুদির কি আহ্লাদ। অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দ।

অথচ যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে যখন, টিয়ার মনে হল, রাঙাবৌদি আর রেণুদির মনে যেন কোনও আনন্দ নেই। কই, হাসছে না কেন, হুটোপুটি করছে না কেন জল ছুঁড়ে। তবে কি টিয়ার মন যেমন বিষাদে ভরে গেছে, তেমনি ওদের মনেও কষ্ট হচ্ছে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে বলে ?

রেণুদিরা ওকে ছেড়ে যাবে এই দুঃখটুকু ও ভুলতে চেয়েছিল এখানে এসে। কিন্তু এই নির্জন নিঃশব্দতায়, নিস্তরঙ্গ জলের শূন্যতায় সেই দুঃখটাই যেন বার বার টিয়ার বুকে চেপে বসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ক্লান্ত লাগল টিয়ার। জল ছেড়ে উঠে পড়ল ও।

সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌদি আর রেণুদিও। গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে এতদিনের আনন্দস্মৃতির পুকুরে ডুব দিয়ে কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল যেন। পারল না।

কাপড় বদলে ভিজে শাড়িখানা জলে কেচে নিয়ে ফিরে এল ওরা।

রেণুদি বললে, আয় টিয়া, এবেলা এখানে খেয়ে যা।

টিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর সারাটা দুপুর পাশাপাশি মাদুরে শুয়ে কত কি গল্প হল দু'জনে। কত অর্থহীন তুচ্ছ কথার আদানপ্রদান। তবু ভাল লাগল টিয়ার।

তারপর একসময় রেণুদি উঠল। বললে, বাক্স-প্যাঁটরা সব গুছিয়ে নিই।

পুরনো রং-চটা তোরঙটার ডালা খুলে আলনার কাপড় দুটো ভাঁজ করতে শুরু করলে রেণুদি, আর তোরঙের দিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে রইল টিয়া। কেউ বাক্স-প্যাঁটরা খুললেই সেদিকে শিশুর মত কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে টিয়া। যেন তার মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে, কত কি অদেখা জগৎ। মা বকুনি দেয়, অপরের বাড়ির তোরঙ কিংবা আলমারির দিকে ওভাবে তাকাতে নেই, লোকে অসভ্য বলে। তবু না তাকিয়ে পারে না ও। শুধু কি তাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দু-একটা প্রশ্নও করে বসে।

রেণুদির তোরঙের ভিতর সাজানো খানকয়েক রঙিন শাড়ি, আয়না, দু'খানা বই—আরও কত কি। সেগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে ভীষণ লোভ হয় টিয়ার।

লোভের চোখেই তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাপড়ের আড়ালে একটা ছোট্ট পিতলের বাক্স দেখতে পেল টিয়া। অমনি প্রশ্ন করে বসল, ওটা কি রেণুদি ?

—কোনটা ?

—ওই যে পেতলের বাক্সটা ?

হঠাৎ যেন চমকে উঠল রেণুদি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে টিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। না, বিস্ময় নয়। হঠাৎ যেন স্মৃতির তারে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ফেলেছে টিয়া। থমথমে বিষাদ-ভরা চোখে টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাসবার চেষ্টা করলে।

বললে, গয়না।

—তোমার ? প্রশ্ন করলে টিয়া।

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ গলায় উত্তর দিলে রেণু। বললে, দেখবি ?

ঘাড় কাত করে সায় দিল টিয়া। আর রেণু এসে হাঁটু গেড়ে বসলে ট্রাঙ্কের সামনে, বের করলে পিতলের বাক্সটা। টিয়া দেখলে, বাক্সটার ওপর নাম খোদাই করা আছে—রেণুবালা। নামের চারপাশে লতাপাতার নক্সা।

গহনার বাক্সের ডালা খুলতেই উদ্‌গ্রীব লোভী চোখে তাকিয়ে রইল টিয়া। আর কাগজের ছোট ছোট বাক্স থেকে পাতলা কাগজের মোড়ক খুলে খুলে দেখালে রেণু! একটা সরু মফচেন, একটা বিছে হার, ছ'গাছা চুড়ি, কানের মাকড়ি একজোড়া, মিনেকরা তাগা, আর একটা টিকলি। সবগুলোই নতুন ঝকঝকে, যেন ব্যবহার হয়নি কখনও। তবে সব ক'টাই হাল্কা, কম সোনায় তৈরি।

রেণু বললে, পরবি তুই ? পর না ?

টিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল।

আর রেণু হঠাৎ বললে, শোন, তোকে একটা জিনিস দোব, নিতেই হবে।

রেণুদির কথাটা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন চোখে তার মুখের দিকে তাকাল টিয়া।

রেণু কোনও কথা বললে না, কাগজের মোড়ক থেকে টিকলিটা বের করে বললে, দেখি কেমন লাগে তোকে! বলে টিয়াকে পরিয়ে দিলে। তারপর বললে, ওটা তোকে দিলাম টিয়া। তোর বিয়েতে আসতে পারব কিনা তার তো ঠিক নেই, আগে থেকেই দিয়ে রাখলাম।

টিয়া আপত্তি করলে। বললে, মা বকবে। তবু শুনল না রেণু।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমি তো কোনওদিনই পরব না রে।

—পরবে না ?

রেণুর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, বাবা বেঁচে থাকতে ও-সব করানো হয়েছিল। বিয়ের দিনও ঠিক হয়েছিল টিয়া, তারপর...

—তারপর ?

রেণু হাসল, বিষণ্ন হাসি। বললে, শেষ মুহূর্তে ওরা বেশি টাকা পেয়ে বিয়ে ভেঙে দিল।

বিয়ে ভেঙে দিল ! টিয়ার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য মোচড় দিল যেন।

রেণু হাসবার চেষ্টা করলে। —সেই শোকে বাবা মারা গেল তিন মাসের মধ্যে, কিন্তু গয়না গড়ানো হয়ে গিয়েছিল, তাই পড়েই আছে। আর কোনও কাজে তো লাগবে না ভাই !

টিয়া চুপ করে রইল। সান্ত্বনা দেবার কোনও কথাও খুঁজে পাচ্ছে না ও। রেণুদির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, গয়না কাপড় সব কেনা হয়েছিল, তারপর আর বিয়ে হয়নি ? আর কোথাও কি বিয়ে দিতে পারেনি দামুদা ? রেণুদির দিকে চোখ তুলে তাকাল এবার টিয়া। নতুন চোখে দেখলে এই প্রথম।

রেণু কাগজে মুড়ে টিকলিটা টিয়ার হাতে গুঁজে দিল, আর মুঠোর মধ্যেই সেটা চেপে ধরল টিয়া। ফেরত দিতে পারল না। মনে হল, ফেরত দিলে রেণুদি আরও ব্যথা পাবে।

সোনার টিকলিটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল টিয়া। কিন্তু মাকে বলতে সাহস পেল না। লুকিয়ে রেখে দিল নিজের ছোট্ট টিনের স্যুটকেশটার মধ্যে। কিন্তু বার বার রেণুদির দুঃখের কথাটাই ঘুরে বেড়াতে লাগল তার মনের চারপাশে।

কত কি ভেবে রেখেছিল টিয়া, যাবার সময় রেণুদিকে বার বার বলবে, তার বিয়েতে চিঠি দেবে, যেন আসে রেণুদি, তা না হলে তার একটুও আনন্দ হবে না। কিন্তু পরের দিন যখন দু'খানা গরুর গাড়িতে সব মালপত্র তুলে দামুদা, রাঙাবৌদি আর রেণুদি উঠে বসল, তখন গ্রামের সব লোক এসে জড়ো হয়ে কত কি বলল, কত কি অভিযোগ আর অনুরোধ, কিন্তু টিয়া কোনও কথাই বলতে পারল না। ও শুধু ফিরুকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে আদরে আদরে তার মুখে চুমো দিয়ে রাঙাবৌদির কোলে তাকে তুলে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে রেণুদির চোখে চোখ পড়ল। দেখলে রেণুদি কাঁদছে। রেণুদির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রেণুদির চোখে জল দেখে ওর চোখও জলে ভরে এল।

গাড়ি দুটো তখন ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলতে শুরু করেছে। পিছন পানে তাকিয়ে আছে রেণুদি, রাঙাবৌদি, দামুদা। সকলের চোখে-মুখেই একটা ব্যথার ছাপ। শুধু ফিরু হাসছে খিলখিল্ করে। বাচ্চা ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারছে না। কোনও ব্যথা নেই ওর মনে।

গাড়ি দুটোর পিছনে পিছনে গ্রামের অনেকেই এল। একে একে অনেকেই থেমে পড়ল, কেউ বা ফিরে গেল। শুধু টিয়া একা একা চলে এল নতুন গোড়ে পার হয়ে—তালগাছের সারি পার হয়ে, আরও অনেক দূর।

তারপর নিজেরই অজান্তে কখন থেমে পড়ে চেয়ে রইল গাড়ি দুটোর দিকে। ধীরে ধীরে গাড়ি দুটো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেল, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেল কালো বিন্দু দুটি, তারপর এক সময় কাঁদরের খালে নেমে পড়ল গাড়ি দু'খানা। চোখের আড়ালে চলে গেল—রেণুদি, ফিরু, রাঙাবৌদি, দামুদা।

আবার কি কখনও দেখা হবে ওদের সঙ্গে ? কে জানে !

উদাস দৃষ্টিতে সেদিকেই টিয়া তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। হয়তো কিছু ভাবল, কিংবা

কিছুই ভাবল না। তবু ফিরে আসতে ইচ্ছে হল না টিয়ার। শাড়ির পাড়ের মত দূরের রেললাইনের দিকে তাকিয়ে রইল।

একত্রিশ

গোঁসাইদিদির মোহান্ত বড় একটা এ গাঁয়ে আসত না। দূর দূর গাঁ দিয়ে চলে যেত সে, কোনওদিন ফিরত, কোনওদিন ফিরত না। সবাই তাই গোঁসাইদিদির সাহস দেখে বিস্মিত হত।

গিরিজার বাবা বলত, তোমার সাহস বলিহারি, বষ্টুমি। মোহান্ত থাকে না আদ্ধেক দিন, তবু একা একা থাকো কি করে ওই তেপান্তরের মাঠে!

মা ঠোঁট চেপে ফিসফিসিয়ে বলত, সাহস বলে সাহস। এই বয়সে তিনটে বউ এক ঘরে থেকেও রাতে ঘুমুতে পারে না পুরুষমানুষ না থাকলে, আর গোঁসাইদিদি তুমি কিনা...

গোঁসাইদিদি হাসত। মিষ্টি মিষ্টি হাসি, আর মিষ্টি মিষ্টি কথা। বলত, নিতাইগৌরকে আমার সব সমর্পণ করে বসে রইলাম, আর ভয়কে রাখব নিজের বুকে? পুণ্যি দোব, আর পাপ রাখব নিজের কাছে?

বড় সুন্দর কথা বলত গোঁসাইদিদি।

পরীক্ষা দিয়ে সেবার যখন ফিরে এল গিরিজা, মনে মনে ভেবে রেখেছিল গোঁসাইদিদির কুঞ্জে গিয়ে দেখা করে আসবে শেষবারের মত। সেটাই গিরিজার শেষ পরীক্ষা, ফল বেরোয়নি, কিন্তু তার আগেই চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। মাস্টারির চাকরি।

তার বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে গিরিজার।

হঠাৎ সেদিন সকালবেলাতেই এসে হাজির হল গোঁসাইদিদি। খঞ্জনির শব্দ আর গোঁসাইদিদির গানের রেশটুকু ভেসে আসতেই বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু বিস্মিত হল গানের সঙ্গে সঙ্গে গুপিযন্ত্রের আওয়াজ শুনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকল গোঁসাইদিদি। হাতে খঞ্জনি, মুখে হাসি, নাকে কপালে গঙ্গামৃত্তিকার রসকলি। আর পিছনে পিছনে গুপিযন্ত্র বাজাতে বাজাতে ঢুকল মোহান্ত। চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, তেল চুকচুকে কালো রং, কিন্তু চোখেমুখে কেমন একটা স্নিগ্ধ ভাব।

গিরিজাকে দেখতে পেয়েই গোঁসাইদিদি বলে উঠল, ওরে আমার গোপাল ফিরেছে, গিরিগোবর্ধন ফিরেছে!

গিরিজা হাসল।

গোঁসাইদিদি আবার প্রশ্ন করলে, বউ এয়েছে? যাও, নিয়ে এসো তাকে, বাপের বাড়িতেই রইবে নাকি চিরটাকাল?

গিরিজা হেসে বললে, চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছি গো গোঁসাইদিদি।

গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গোঁসাইদিদি বললে, চলে যাবে গাঁ থেকে? গোলামি করতে যাবে চাঁদ? কি লাভ হল তবে পড়েশুনে!

হাসল গিরিজা, আর তখনই গিরিজার মা এসে দাঁড়াল। বললে, তুমিই বলো, ছেলের এতটুকু মায়ামমতা নেই বাপু, মাকে ছেড়ে নয় থাকতে পারবি তুই, মা পারবে কিনা ভেবে দেখ।

গিরিজা কোনও উত্তর দিল না। ওর মনে তখন কত স্বপ্ন, কত আদর্শ।

নানা কথার পর গোঁসাইদিদি বললে, তোমাদের সব গাঁ-সুদ্ধ নেমন্তন্ন করতে এয়েছি

মা। কেত্তন হবে কুঞ্জে, যেতে হবে তোমাদের।

গিরিজার মা হেসে বললে, তাই জোড়ে এয়েছ বুঝি!

মোহান্ত হাসল সে কথা শুনে। বললে, মোহ অন্ত হলে তবে তো মোহান্ত মা, তার কি আর জোড়বিজোড় আছে। জোড় শুধু একজনের সঙ্গে...

বলেই গুপিযন্ত্র বাজিয়ে এক কলি গান গেয়ে উঠল মোহান্ত :

কই গো বৃন্দে সই
আমার বৃন্দাবনচন্দ্র কই।
আমার কই সে নয়নের আনন্দ কই...

গোঁসাইদিদিও মোহান্তের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এক কলি গান গেয়ে উঠেই খঞ্জনি থামাল। তারপর বললে, গোপাল, মাকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে যেও বাবা। সাঁঝবেলাতেই যেও। আমার নিমাইচাঁদের ভোগ পাবে, কেত্তন শুনবে...

গিরিজার মা হেসে বললে, তোমাদের মত স্বাধীন তো নই, আসুক গিরির বাবা, জিগ্যেস করি...

গোঁসাইদিদির ঠাণ্ডা চোখজোড়া হেসে উঠল। বললে, হ্যাঁ গো মেয়ে, কানুর কাছে যেতে কেউ আবার অনুমতি নেয়! পালিয়ে যাবে, লুকিয়ে যাবে...

গিরিজার মা হেসেই কুটিকুটি। বললে, বলো কি, লুকিয়ে যাব?

—হ্যাঁ, লুকিয়ে যাবে, ফিরে এসে গঞ্জনা শুনবে।

বলেই আবার গান ধরল :

গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা,
রাধাকান্ত তুমি একান্ত ভরসা।

গান থামিয়ে বললে, গুরুগঞ্জনা হল আশীর্বাদ, যত গঞ্জনা পাবে কানু-অনুরাগ তত গাঢ় হবে।

গিরিজার মা হেসে উঠে বললে, যাব, যাব, গাঁয়ের আর-সব যায় তো আমিও যাব।

আর গোঁসাইদিদির পিছনে পিছনে মোহান্তও চলে গেল। গুপিযন্ত্রের আওয়াজ খঞ্জনির আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।

গিরিজা তখনও জানত না তার জন্যে এমন একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

বিকেল থেকেই খড়ি নদীর ধার বরাবর আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে গাঁয়ের বউ-ঝির দল যেতে শুরু করল গোঁসাইদিদির কুঞ্জের উদ্দেশে। আর সন্ধের আগেই ভেসে এল খোল-করতালের আওয়াজ।

এক সময় ছোটমা আর তার জা এসে হাজির হল। গিরিজার মাকে বললে, চলো গো দিদি, কেত্তন শুনতে যাবে না?

গিরিজা খুশি হয়ে বললে, যাবে তুমি ছোটমা?

ছোটমা হেসে উত্তর দিলে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি পেসাদ, সেই ভরসায় এয়েছি কিন্তু।

গিরিজা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা বললে, ও মা, তুই আর না যেয়ে পারিস, তোর পরানের বন্ধু হল আমার বংশীধারী! বলে হাসল ছোটমা।

বংশী নয়, বংশীধারী। বাঁশির মত সুরেলা গলা।

কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় মাঝে মাঝে ছুটিতে এসেছে গিরিজা। কখনও দেখা হয়েছে বংশীর সঙ্গে, কখনও হয়নি। তার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক আর গলায় তুলসীকাঠির মালা দেখে ঠাট্টা করেছে গিরিজা। বলেছে, ভেক নিয়েছিস বংশী? কোটালের ছেলে কিনা বোষ্টম হলি?

শুনে একটুও চটেনি বংশী, হেসেছে। বলেছে, বোষ্টম কে লয় গো গিরিদাদা। তুমি আমি সবাই—একবার যে ও রসের সন্ধান পেয়েছে, সে কি চিনির রসে আর ভুলবে কোনওদিন ?

কি সে রস, কোন রসের সন্ধান পেয়েছে বংশী, গিরিজা জানত না। গোঁসাইদিদির কুঞ্জে গিয়ে সেই প্রথম তার সন্ধান পেল।

আশপাশের গাঁয়ের জনকয়েক বোষ্টম আর বোষ্টমি গিয়ে জড়ো হয়েছে তখন কুঞ্জে। আর যত বিধবা বুড়ি। তারই মধ্যে বনপলাশির জনকয়েক। গিরিজার মা, ছোটমা, ছোটমার এক জা।

আর বংশীর শালাবউ।

শ্যামলা রঙের বছর ষোল-সতেরোর একটি ছিমছাম মেয়ে, টানা টানা চোখ, চুলে কিশোরী-কিশোরী ভাব। গাঁয়ের লোক বংশীর এই শালার বউটিকে নিয়ে কত কি কানাকানি করত, কত কি বলত। গিরিজার কানেও এসেছিল সে সব কথা।

একদিন মুখ ফুটে প্রশ্নও করেছিল গিরিজা।

বংশী হেসে বলেছিল, পেনয়ের দাম সে যে-অবধি গোপন থাকে। তার কথা কি কেউ পেকাশ করে বলে গো গিরিদাদা ? সত্যি হলেও বলব না, মিছে হলেও বলব না।

কীর্তনমণ্ডপের সামনে সেই কিশোরী চেহারার শালাবউকে, রূপোকে মুগ্ধ চোখে বসে থাকতে দেখে গিরিজার মনেও কৌতূহল জেগেছিল।

কিন্তু তারপর কখন সব কথা ভুলে গিয়েছিল বংশীর গলার সুর শুনে।

সন্ধে থেকেই খোলের আওয়াজ শুরু হয়েছিল। একে একে আসরও ভরে উঠছিল। আসরে জনকয়েক বুড়ো কীর্তনিয়া এসে বসল। মাঝখানে বিশ-বাইশ বছরের ভরালো চেহারার বংশী। তার সাজ, তার মুখের ভাব, তার চেহারা দেখে মনে হল এ যেন অন্য মানুষ।

একে একে গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল।

বংশী নয়, কীর্তনিয়া বংশীদাস। সুললিত কণ্ঠে চিৎকার করল বংশী ; ভাই সব—

আসরের গুঞ্জন থেমে এল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, মানস চক্ষু দিয়ে ছিরিমাধবকে দেখা যায় গো, আর তেনার ব্রজমণ্ডল কি দেখা যাবে না ? ভেবে লাও এই তোমার বিন্দাবন, ভাবো ছিকৃষ্ণ আছেন, গোপিনীরা আছেন, ভাবো ভোমর আছে, মউরমউরি আছে, আর যমুনার জলের মতন ছিকৃষ্ণের প্রেমলীলা বয়ে চলেছে।

অশিক্ষিত গ্রাম্য উচ্চারণ, অস্পষ্ট বর্ণনা—কিন্তু বংশীর কণ্ঠে যেন কি জাদু ছিল, মুগ্ধ হয়ে গেল সমস্ত আসর।

বংশী আবার বলতে শুরু করে।—হরির নাম লিয়ে মনের পাপ ধুয়ে লাও গো, ধুয়ে লাও, দেহমন পেবিত্ত করে লাও।

গানের মত সুর করে করে বলছিল বংশী, হঠাৎ বজ্রগম্ভীর চিৎকার দিয়ে উঠল।—চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও।

চিৎকার করে উঠেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বংশী, ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখজোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল সকলের চোখেমুখে। নড়েচড়ে বসল সবাই।

যেটুকু বা গুঞ্জন ছিল, স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তারপর আবার বলতে শুরু করলে বংশী : এই অপ্রেকিত লীলাবিলাস শোনার মত মন যদি না থাকে, চলে যাও, চলে যাও। মনে যদি কামগন্ধ থাকে গো, দেহভাব যদি অশুচি থাকে, চলে যাও।

লীলাচন্দনকে যে কামপঙ্ক ভাববে, তাদের জন্যে লয় গো এ লীলাকেত্তন, তাদের জন্যে লয়, তেনারা চলে যাও।

আসর যেন মুহূর্তে স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় একেবারে বদলে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে শুরু হল রূপবর্ণনা, পূর্বরাগ। তারপর কীর্তন।

যবে নব অনুরাগ...

এক একটি পদ শেষ হয় আর সখী রে, সখী রে, সখী রে...গুঞ্জন একতান—মৃদু খোল করতালের আওয়াজ।

তারপর এক একটি পদের ব্যাখ্যা শুরু করে বংশী, আখর বুনে যায়। কোনও পদকর্তার গান নয়, মুখে মুখে অবিশ্রাম অসংখ্য উপমায় একটি পদেরই বর্ণচ্ছটায় যেন নতুন একটি কাব্য রচনা করে বংশী। মূল পদ তার মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়।

মুগ্ধ হয়েই শুনছিল গিরিজা, আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবছিল, কিসের স্পর্শে বংশী কোটাল এমন আখুরিয়া হয়ে উঠেছে!

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে বংশীর শালাবউয়ের দিকে চোখ পড়ছিল গিরিজার! দেখলে, তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

মাঝরাত অবধি কীর্তন শুনে সেদিন ফিরে এল গিরিজা। কিন্তু সারা পথ কেউ কোনও কথা বললে না। যেন সবাই অভিভূত হয়ে গেছে।

তারপর যাবার দিন ঘনিয়ে এল। আর ছোটমার সঙ্গে দেখা করতে গেল গিরিজা।

কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই দেখলে সারা বাড়িতে কেমন থমথমে ভাব। কেউ কোনও কথা বলছে না, ছোটমা নিথর দাঁড়িয়ে আছে খুঁটি ধরে; আর একটা গোঙানি ভেসে আসছে থেকে থেকে।

গিরিজাকে দেখেও কাছে ডাকল না ছোটমা।

গিরিজা নিজেই এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে ছোটমা?

ছোটমা ক্লান্ত বিষণ্ণ একজোড়া চোখ তুলে গিরিজার মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর ইশারায় কালীমোহনের ঘরখানা দেখিয়ে দিল।

গিরিজা ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখলে, বিছানায় পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছেন কালীমোহন, আর পাশে নাড়ি ধরে বসে আছেন বলগাঁর কবিরাজ।

দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল। ভিড় করে এল সবাই। শুনলে।

সেদিন কালীমোহনের বিনা অনুমতিতেই নাকি কীর্তন শুনতে গিয়েছিল ছোটমা আর তার জা। মাঝ রাত্রে আসর থেকে ফিরে আসতেই প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন কালীমোহন। তার পর থেকেই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

কালীমোহনের ছেলেরা ডাক্তার আনাতে চেয়েছিল। রাজি হননি কালীমোহন। মুখে একটি মাত্র কথা, আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

দিন কয়েক ভুগে ভুগে শেষে শান্তিতেই মারা গেলেন কালীমোহন। কান্নার রোল উঠল ভটচাজবাড়িতে।

গ্রামসুদ্ধ সকলে তাঁর শবদেহ নিয়ে দাহ করে এল খড়ি নদীর ধারে শ্মশানে।

আর গিরিজা, একমাত্র গিরিজাই হয়তো খুশি হল তাঁর মৃত্যুতে। ভাবলে, ছোটমা এবার মুক্তি পাবে। এতদিনের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। কালীমোহনের ভয়ে স্বামীকে দূরে ঠেলে রাখতে হবে না আর।

গিরিজার চিঠি পেয়ে দিনকয়েক পরেই গ্রামে এসে হাজির হল ব্রজমোহন। স্টেশনে তাকে নামতে দেখেই কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল। মুহূর্তের মধ্যে আলোড়ন

দেখা দিল বনপলাশির জীবনে। এমন একটা চাঞ্চল্য বুঝি আর কখনও দেখা দেয়নি। কেউ নতুন গোড়ের পাশ দিয়ে আলপথ ধরে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করল, কেউ বা অকারণেই ভয় পেয়ে আড়ালে লুকিয়ে দেখল।

ভটচাজবাড়ির ব্রজমোহন নয়। প্যান্ট কোট ওয়েস্ট-কোট পরা, পায়ে দামি জুতো, গলায় বো করা—একটি অচেনা মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে গিরিজা ছুটে এল ছোটমার কাছে। কিন্তু সেই কৈশোরের উল্লাসে 'ছোটমা' বলে ডাকতে পারল না।

এসে দাঁড়িয়ে রইল দাওয়ার সামনে। আর খানিক পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছোটমা, গিরিজাকে সামনাসামনি দেখেই প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করলে, তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করলে, কে, পেসাদ ? বলছ কিছু ?

গিরিজার সারা মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললে, ছোটমা। ব্রজকাকা আসছে। এইমাত্র দেখে এলাম নতুন গোড়ের পাড় থেকে।

কথাটা শুনেই যেন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল ছোটমা। প্রথমে বিস্ময়, তারপর ক্রোধে।

হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়ল ছোটমা—কে খবর দিল তাকে পেসাদ ?

ভয় পেয়ে গেল গিরিজা। এ কি রূপান্তর ছোটমার ? মনে হল যেন মনের রাগ চাপতে পারছে না। শরীরে প্রৌঢ়ত্বের শিথিলতা নেমেছে তখন—তবু ছোটমার ফর্সা মুখখানা হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠল রাগে।

গম্ভীর কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলে আবার, কে তাকে খবর দিল পেসাদ ?

—জানি না ছোটমা। আতঙ্কের বিস্ময়ের ঘোরে বললে গিরিজা।

আর পর মুহূর্তেই গিরিজার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে ছোটমা বলে উঠল, ওকে ফিরে যেতে বলো পেসাদ, ফিরে যেতে বলো। বটঠাকুরের অপমান হবে, এ বংশের ভিটেতে তার পা পড়লে।

বলেই ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল ছোটমা, গিরিজার মুখের সামনেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে।

বিমূঢ় অভিভূত মুখে বেরিয়ে এল গিরিজা, তারপর দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে পালাল। না, ব্রজমোহনের কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না সে, বলতে পারবে না ছোটমা কি বলেছে, কি বলতে চায়।

বিছানায় মুখ গুঁজে সারাটা দিন পড়ে রইল গিরিজা, কারও সঙ্গে কোনও কথা বলল না। প্রশ্ন করতে সাহস হল না, ব্রজমোহন কোথায়, ছোটমা ঘর থেকে বেরিয়েছে কি না।

সন্ধের দিকে শুনতে পেল, মা বলেছে, বলিহারি মনের জোর, ছোটঠাকুরকে ফিরিয়ে দিলে বাপু, দেখা অবধি করলে না একটিবার !

মনের জোর ! গিরিজার সমস্ত বুক নিঙড়ে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ভাবলে, মিথ্যে অভিমানে একটা মানুষ তার সমস্ত জীবন এমনভাবে নষ্ট করতে পারে !

তার চোখের সামনে ছোটমাকে যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছতে দেখেছে গিরিজা, মনে হয়েছে সব দুঃখের মূলে ওই কালীমোহন, সে মারা গেলেই দু'জনের মাঝখান থেকে সব পাঁচিল সরে যাবে। কিন্তু এ কি হল ? এমন ভাবে ব্রজমোহনকে ফিরিয়ে দিল ছোটমা ? অপমান করে তাড়িয়ে দিল ? ও যে ভেবেছিল, জীবনসায়াহ্নে এইবার বুঝি ছোটমার মুখে হাসি ফুটবে, নতুন করে জীবন শুরু করবে।

ভুল ভেবেছিল গিরিজা। আর ভিতরে ভিতরে ছোটমার বিরুদ্ধে একটা গভীর

আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছিল।

তাই যাবার দিন আবার ছোটমার সঙ্গে দেখা করতে গেল গিরিজা। তারপর এক সময় ছোটমাকে একান্তে পেয়ে বিমূঢ় গলায় প্রশ্ন করলে, এমন কেন করলে ছোটমা ?

ছোটমা শান্ত দুটি চোখ তুলে তাকাল গিরিজার মুখের দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, সে তুমি বুঝবে না পেসাদ।

—বুঝব, নিশ্চয় বুঝব। তুমি বল ছোটমা, কেন এমন করলে ?

ছোটমা বিষণ্ণ হাসি হাসলে। তারপর হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল তার চোখ জোড়া। বলে উঠল, আমি সব ক্ষমা করতে পারি পেসাদ, তা বলে ধর্ম ছাড়বে ? মানুষের শেষ সম্বল যে ধর্ম রে পেসাদ, তাও যে ছাড়তে পারে...

কথা শেষ করতে পারল না ছোটমা। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

খানিক চুপ করে রইল গিরিজা। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সে তোমার জন্যেই ছোটমা, ব্রজকাকা নিজে বলেছে আমাকে...

বাধা দিয়ে উঠল ছোটমা। বললে, আমার সুখটাই বড় হল রে পেসাদ! নয় সতীন নিয়েই ঘর করতাম আমি। কতজনাই তো করে। তা বলে ধর্ম ছাড়বে ? ধর্মের সংসার পাথরের গাঁথনি। সে গাঁথনি যে ভেঙে দেয়, সে সব ভাঙতে পারে, সব!

বত্রিশ

আজ অট্টামার দিকে তাকিয়ে গিরিজাপ্রসাদ বিস্মিত না হয়ে পারেন না। মনে হয় এ যেন অদ্ভুত এক রহস্য। দিনে দিনে মানুষ কত বদলে যায়।

নিজে পড়েছেন, ছাত্রদের পড়িয়েছেন সারা জীবন—সে সব কি তবে মিথ্যে ? শুধুই অবাস্তব কল্পনা ? মানুষের সত্যিকারের চরিত্র তা হলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় ? হয়তো তাই। তা না হলে আজ গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই সন্দেহ হয় কেন ? কেন মনে হয়, সেদিনের সেই বিষণ্ণমধুর অথচ দৃঢ়সঙ্কল্পের সেই ছোটমার সঙ্গে আজকের হাস্যমুখর প্রগল্‌ভতার এই চেহারার কোনও মিল নেই। গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই যেন বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয়নি, প্রথম যখন বড় ছেলের বিয়েতে গ্রামে এসেছিলেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অট্টামাকে দেখে সেদিন যেন নিজের বয়সটাকেও অনুভব করতে পেরেছিলেন।

শুধু অট্টামা নয়। বংশীকে দেখেও বিস্মিত হন গিরিজাপ্রসাদ। গলায় তুলসীকাঠির মালা আর কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক আজ যেন বংশীকে বিদ্রূপ করে। কোথায় সেই শান্তসুন্দর মুখখানা, যৌবনের সেই কমনীয় স্নিগ্ধ রূপ, যা তার শালাবউকে উন্মাদ করে তুলেছিল। যা দেখে গিরিজাপ্রসাদ খুঁজে পেতেন না বংশী কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে এমন তৃপ্তির সুরে আখর বোনে! কি আশ্চর্য, সেই মানুষ কিনা আজ কোনও কিছুর মধ্যেই আশার আলো দেখতে পায় না। শুধু হতাশা আর হতাশা। গানের গলা চলে গেছে। কেউ আর আজ তাকে ডাকে না, আদর করে না বলেই কি সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে সে! নাকি শালাবউ রুপোর কাছে আঘাত পেয়েই এমন হয়ে গেছে বংশী। কে বলতে পারে!

একজন বিষণ্ণতার মধ্যে সারা জীবনের আশা-আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে বুকের ভার লাঘব করল, আরেকজন তার চেয়ে কত কম আঘাত পেয়ে সমস্ত মনটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

চতুর্দিকে এত পরিবর্তন, এত উন্নতির চেষ্টা, অথচ বাঁকা বাঁকা কথার বিদ্রূপে সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় বংশী।

কেন এমন হল খুঁজে পান না গিরিজাপ্রসাদ। শুধু মাঝে মাঝে ভাবেন, তিনি নিজেও কি এদের মতই বদলে গেছেন? হয়তো তাই। নিজে বুঝতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু নিশ্চয়ই বদলে গেছেন। তা না হলে গিরীনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলেন না কেন। যাকে সারা জীবন সমস্ত ছেড়ে দিয়ে থাকতে পেরেছিলেন আজ সামান্য ক'বিঘে জমির ধান কিনা তাকেই আড়াল করে দিল।

অভাব-অনটন, দারিদ্র্যের কত জয়গান করেছেন গিরিজাপ্রসাদ, ছাত্রদের শিখিয়েছেন, কিন্তু আজ মনে হয় সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। মানুষে মানুষে এত বিভেদ, এমন একটা অনড় পাঁচিল তুলে দিতে পারে সামান্য ক'টা টাকা—দু'মরাই ধান—কোনও দিন ভাবতেই পারেননি।

টাকা! ওই টাকার জন্যেই তো যা-কিছু শোক অট্টামার। জীবনটা যার ব্যর্থ হয়ে গেছে তারও দুঃখ, জমিজমা ভাশুরের ছেলেদের লিখে দিয়েছে অথচ তারা খোঁজখবরও নেয় না। টাকার বিনিময়ে এই প্রত্যাশা ছিল বলেই হয়তো গিরিজাপ্রসাদও গিরীনকে ক্ষমা করতে পারেননি। পারেন না।

অবনীমোহনেরও এমনি এক প্রত্যাশা ছিল।

ইস্কুল-বাড়িটা তখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু দরখাস্তর পর দরখাস্ত করেও শুরু করার, মাস্টার নিয়োগ করার কোনও কথাই উঠছে না। বি ডি ও প্রভাকরও লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছে। মাস্টার নয়, ব্ল্যাকবোর্ড নয়, বেঞ্চি আর ডেস্কও নয়, শুধু সান্ত্বনার চিঠি আসছে থেকে থেকে।

এমনি সময় একদিন দু'বগলে দুটো ক্রাচ এঁটে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হল অবিনাশ ডাক্তার। খাকি বুশ সার্টের রং সাদা হয়ে এসেছে তখন। তবু মুখের কথায় খাকি রঙের ছাপ যায়নি।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে গিরিজাপ্রসাদকে দেখেই চিৎকার করে উঠল ডাক্তার। —কামান, একটা কামান চাই মাস্টারমশাই।

গিরিজাপ্রসাদ তার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? কি ঘটল আবার?

ডাক্তার কিন্তু হাসল না। উত্তেজিত হয়েই বললে, উড়িয়ে দেব। একটা কামান পেলে ইস্কুল-বাড়িটা উড়িয়ে দেব আমি।

গোপেন মোড়ল খড়পালুইয়ের এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে অবিনাশ ডাক্তারের ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে বললে, খেপে গেলেন নাকি গো? ইস্কুলের ওপর এত রাগ কেন আপনার!

অবিনাশ ডাক্তার ফিরে তাকালে একবার গোপেনের দিকে, তারপর তার দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে গিরিজাপ্রসাদকে উদ্দেশ করে বললে, সব ভুল, সব ভুল হয়েছিল। বলেছিলাম না আপনাকে, প্রত্যেকটি মানুষের একটা করে ল্যাজ আছে? এভরি ম্যান হ্যাজ এ টেল?

গিরিজাপ্রসাদ হেসে ফেললেন। —হ্যাঁ, তা বলেছিলেন বটে।

—ভুল বলেছিলাম। নেই। না, নেই।

—নেই? ঠোঁটের গোড়ায় কৌতুকের হাসিটা এসে পড়েছিল, চাপা দেবার চেষ্টা করে গিরিজাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, তবে?

অবিনাশ ডাক্তার ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আরও কাছে এগিয়ে এল, তারপর

বললে, ল্যাজ নেই, কিন্তু সকলেই একটা করে ল্যাজ জুড়ে নিতে চায়। এভরি ম্যান ওয়ান্টস্ এ টেল।

গিরিজাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন না।

—বুঝতে পারছেন না তো ? না বোঝবারই কথা মাস্টারমশাই, না বোঝবারই কথা। তখন ভেবেছিলাম, ওই যে অবনীবাবু—অবনীবাবুকে একটু ফ্ল্যাটারি করে বলেছিলাম, আপনারা সাকশেসফুল মানুষ, নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন, গাঁয়ের লোককে আপনারা না দেখলে কে দেখবে...এইসব...তাই খুশি হয়ে, মানে ল্যাজে সুড়সুড়ি পেয়ে ঝনাত করে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন।

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বললেন, ও, অবনীর কথা !

—হ্যাঁ, ওই স্কাউন্ড্রেলটার কথা।

গিরিজাপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করলেন। —আঃ, কি বলছেন যা-তা।

অবিনাশ ডাক্তার চিৎকার করে উঠল। —না মাস্টারমশাই, না। যা-তা বলিনি।

বলেই খানিক চুপ করে রইল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে দাওয়ায় উঠে মাদুরটার ওপর বসল ক্রাচ দুটো পাশে নামিয়ে রেখে। ধোপে ধোপে রং উঠে-যাওয়া খাকি বুশ সার্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল।

তারপর বললে, ল্যাজ সকলেই লাগাতে চায়, দোষ দিই না। এই যে আমি, নামের পিছনে একটা এম-বি জুড়ে দেওয়ার জন্যে কি না করেছি। বি-এ, এম-এ পাশ করে লোকে, কারণ...

গিরিজাপ্রসাদ হেসে ফেললেন ডাক্তারের কথায়। —সেটাও কি অপরাধ নাকি ডাক্তার ?

অবিনাশ ডাক্তারের উত্তেজনা তখন অনেক কমে গেছে। রাগ পড়ে গেছে। তাই সেও হাসল, বললে, তার তবু মানে হয় মাস্টারমশাই। তা বলে অবনীবাবু কি না এম এল এ হবে ? এম এল এ ?

গিরিজাপ্রসাদ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললেন। —সে কি ?

—হ্যাঁ, শুনে রাখুন, চিঠি লিখেছেন আমাকে, ইলেকশনে দাঁড়াবেন। তাঁর মত যোগ্য লোক তো নেই কাছেপিঠে...আর এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলো, বুঝলেন কিনা... আনস্ক্রুপুলাস, আনস্ক্রুপুলাস !

গোপেন মোড়ল কাছে এগিয়ে এসেছিল এমন একটা নতুন খবর পেয়ে। সে বললে, তা টাকার জোর আছে, দাঁড়াবে না ক্যানে।

অবিনাশ ডাক্তার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গোপেন মোড়লের মুখের দিকে। বিদ্রূপ নয়, গোপেন যেন অবনীমোহনের পক্ষেই সাফাই গাইছে।

গিরিজাপ্রসাদ খানিক চুপ করে থেকে বললেন, তাই অত টাকা এককথায় দিয়ে দিলে ইস্কুলের জন্যে ?

অবিনাশ ডাক্তার চুপ করে রইল।

আর গোপেন মোড়ল বললে, তাই যদি দিয়ে থাকে গো, পাঁচটা গাঁয়ের তো উপকার হল।

অবিনাশ ডাক্তার খেপে গেল আবার। —ইলেকশন কি ছেলেখেলা নাকি ? যার টাকা আছে, ফেলে দিয়ে সুনাম কিনবে, ভোট কিনবে ? পাঁচটা দিন গ্রামে থাকে না, গ্রামের দুঃখদুর্দশার ভাগ নেয় না...

গিরিজাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। —ও সবাই সমান ডাক্তার, সবাই সমান। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

গোপেন মোড়ল কিন্তু এ-কথায় সায় দিলে না। বললে, যে গাঁয়ের জন্যে দান করলে, উপকার করতে চাইলে সক্কলের, সে যোগ্য লোক নয় ? কি যে বলেন আপনারা !

বলে হাসলে গোপেন। তারপর হঠাৎ বললে, চললাম গো, পাঁজাপুকুরের পাঁক তোলাতে হবে আবার। পাঁচ আনা অংশ আছে যখন...

বলে, চলে গেল গোপেন মোড়ল।

আর অবিনাশ ডাক্তার নিজের মনেই যেন বললে, ওই গোপেনবাবু, ইস্কুলের জন্যে জমি দিয়েছেন, নির্ঘাত দেখবেন ওই পঞ্চায়েত-টঞ্চায়েত কি সব হবে—তার মধ্যে ঢোকবার জন্যে রাস্তা করে রাখছেন।

খানিক চুপ করে থেকেই ডাক্তার আবার চিৎকার করে উঠল। —ফার্স, ডেমোক্রেসি ইজ এ ফার্স। অবনীবাবু কিনা ইলেকশনে দাঁড়াবেন ? পাঁচ হাজার টাকা ঘুস দিয়ে ডেমোক্রেসির মত এত বড় একটা আইডিয়া ! ছি ছি ছি।

সকাল হতে না হতেই আজকাল ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ওঠে। কেলেদত্যি মোষটা ছাড়া পেয়েই মাঠের পুকুরের দিকে ছোটে, ছুটে গিয়ে গলা অবধি জলে ডুবিয়ে বসে থাকে।

অবিনাশ ডাক্তার, গোপেন মোড়ল চলে যাবার পরেও বাংলাবাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। নিজের মনেই চালাটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। বাঁশ আর বেত দিয়ে বোনা চালায় রং-বেরঙের কত কি কারুকার্য, সুন্দর সুন্দর কত কি নক্সা ছিল। এখন আর সে সব বোঝাও যায় না। রং চটে গেছে, নক্সা খুলে গেছে, ভেঙে গেছে। গ্রামের ক'ঘর ডোম ছিল, তারাই করত এ-সব কারুকার্য, নানু ডোম পাটের তুলিতে করে কত সুন্দর সুন্দর রং খেলাত নক্সার গায়ে। সেই ডোম পল্লীটাই কবে থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ কেউ কাঁপা-জ্বরের ভয়ে পালিয়েছিল, কেউ কেউ মরেছে ওই জ্বরে ভুগে ভুগে। এখন শুধু পাঁজাপুকুরের একটা পাড়ে ধসে-পড়া ভেঙে-পড়া কয়েকটা মাটির দেয়াল বর্ষায় ধুয়ে ধুয়ে একটা ঢিবির মত দেখায়।

কাঁপা-জ্বরের কথাটা মনে পড়তেই নিজের গলায় হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলেন গিরিজাপ্রসাদ। একটু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে যেন। ক'দিন থেকেই বিকেলের দিকে জ্বর আসছে সামান্য। শরীরটাও ম্যাজ ম্যাজ করে। মুখের ভিতর কেমন বিস্বাদ লাগে। এতদিন নিজেই হোমিওপ্যাথির ওষুধের বাক্স খুলে দু-একটা বড়ি খাচ্ছিলেন। কিন্তু জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকে জ্বর বাড়ছে। মাথাও ঘুরছে মাঝে মাঝে। বয়স তো কম হল না। এমন রোদের তাপ সহ্য হবে কেন ! ওষুধ খেয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না দেখে ভিতরে ভিতরে চিন্তিত হচ্ছিলেন। না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে নয়। যুদ্ধের পর থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় দেশছাড়া হয়েছে।

হেলথ আপিস থেকে একদল লোক বছরে একবার করে এসে ওষুধ ছিটিয়ে দিয়ে যায় পচা ডোবায়, সারকুড়ে। ঘরে ঘরে স্প্রে করে দিয়ে যায়।

লোকটাকে শুনিয়েই সেবার গিরিজাপ্রসাদ বলেছিলেন, এত করেও গাঁয়ের লোক খুশি নয়। কি ভীষণ ম্যালেরিয়া যে ছিল আগে, দেখেনি তো এরা।

বংশী দাঁড়িয়েছিল কাছে। সে হেসে টিপ্পনী কাটলে, সে তোমার ওনারা সোমবছরে একবার পিচকারি মেরে যান বলে নয় গো, ও তোমার যুদ্ধের জন্য। মিলিটারি ছাউনি পড়ত এখানে-ওখানে, তাই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে ও-পাপ।

গিরিজাপ্রসাদ এ-কথার কোনও উত্তর দেননি। কি উত্তরই বা দেবেন। কোনও কিছুর ভাল দিকটাই যে দেখতে চায় না বংশী। তাকে আজকাল তাই মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে

তাঁর।

ক'দিন ধরেই ডাক্তার দেখাতে বলেছে বংশী। সেজন্যেই বোধহয় ডাক্তারকে সকালে কাছে পেয়েও দেখাতে চাননি। অবশ্য নেহাত দায়ে না পড়লে ডাক্তার দেখাতে রাজি হন না গিরিজাপ্রসাদ। হোমিওপ্যাথির ওপর বিশ্বাস, না নিজেরই ওপর? ডাক্তার ডাকতে বললেই, তাঁর মনে হয়, তাঁর নিজের চিকিৎসাবিদ্যার ওপরই সন্দেহ করছে কেউ। এ যেন নিজের কাছেই হেরে যাওয়া। তাই হেরে যেতে চান না।

কিন্তু বিকেলের দিকে জ্বরটা বাড়ল। নিভাননী গায়ে হাত দিয়ে বললেন, এ কি, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বিমলাকে ডেকে বললেন, যা তো বিমলি, ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ চলে গেছে কলকাতায়, আর তার ফলে স্বাধীনতা বেড়ে গেছে বিমলার। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাকেই পাঠাতে হয় এর-ওর বাড়ি।

ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্যে তাই বিমলাকেই বললেন নিভাননী।

বিমলা এদিক-ওদিক তাকিয়ে কমলাকে খুঁজলে। কোথাও যেতে হলেই কমলাকে সঙ্গে না নিয়ে বেরোয় না। কিন্তু কমলাকে খুঁজে না পেয়েই একাই বেরিয়ে পড়ল। এইটুকু তো পথ। একাই চলে এল।

কিন্তু কাছাকাছি এসে পড়তেই ডাক্তারের বাড়ির আড়ালে একখানা জিপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পা থেমে গেল বিমলার। এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল ও। অস্বস্তি বোধ করলে।

জিপটা দাঁড়িয়ে আছে এক ধারে। তা হলে নিশ্চয় ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছে প্রভাকর!

ক্রোধে অভিমানে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল বিমলার। একটা ঘৃণ্য বিষাক্ত কীটের মত মনে হল প্রভাকরকে। টিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছে, টিয়াকে তার বাবা দেখতে আসবে—অট্টামার কাছে এ-খবর শোনার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে জ্বলেছে সে এ-ক'দিন। নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে হয়েছে, প্রভাকরের চোখে সে যেন উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিমলা, আর কোনও দিন প্রভাকরের সামনে এসে দাঁড়াবে না, কথা বলবে না। ভুলে যাবে। ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

তাই কিছুক্ষণ ইতস্তত করল বিমলা। ফিরে যাবে কি না, একবার ভাবলে।

না, তার চেয়ে উপেক্ষা করবে সে প্রভাকরকে।

ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে এসে বিমলা ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর উঁকি দিল বিমলা। আর প্রভাকর ডেক-চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বিমলাকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসি দেখা দিল প্রভাকরের মুখে।

বিমলা প্রভাকরের মুখের দিকে তাকাল না। শুধু আর একবার ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

প্রভাকর কাছে এগিয়ে এল। বললে, বোসো, অবিনাশবাবু এখনই আসবেন।

বিমলা চুপ করে রইল।

প্রভাকর আবার বললে, পদ্মর বাপের খুব অসুখ, ডেকে নিয়ে গেল। এখনই আসবেন।

কথাটা যে বিমলা শুনতে পেয়েছে তার মুখের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না।

প্রভাকর উৎকণ্ঠার স্বরে প্রশ্ন করলে, কারও অসুখ নাকি? বাবা কেমন আছেন তোমার?

বিমলা কোনও উত্তর দিলে না। চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে

তার হাতখানা খপ করে ধরে ফেললে প্রভাকর। —কি ব্যাপার ? কথার উত্তর দিচ্ছ না যে !

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল বিমলা।

—ছাড়ুন।

বলেই তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল সে প্রভাকরের দিকে। তারপর দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরলে।

পিছন পিছন খানিকটা ছুটে এসে বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে পড়ল প্রভাকর। চিৎকার করে বললে, বিমলা শোনো, বিমলা শোনো।

বিমলা ফিরেও তাকাল না। দ্রুত পায়ে মেঠো পথে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেল।

প্রভাকর সেদিকে তাকিয়ে রইল দুর্বোধ বিস্ময়ে। বিমলার এই রহস্যময় ব্যবহারের কোনও কারণই খুঁজে পেল না ও। আহত অভিমানে বিস্ময়ের চোখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে দেখলে, দ্রুত পায়ে বিমলা হেঁটে চলেছে।

আশায় আশায় তাকিয়ে রইল প্রভাকর। বিমলা নিশ্চয় একবার ফিরে তাকাবে !

না, একবার ফিরেও তাকাল না বিমলা। ধীরে ধীরে বাঁশবনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখে পড়ল, বাঁশবনের ওপারে দু' বগলে ক্রাচ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অবিনাশ ডাক্তার আসছে। ক্রাচে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে ডাক্তার।

কিন্তু বিমলা অদৃশ্য হয়ে যেতেই প্রভাকরের সারা বুক হঠাৎ যেন খাঁ খাঁ করে উঠল। বিভ্রান্তের মত বিমলার চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল প্রভাকর। চোখে উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টি।

দিনে দিনে অনেক স্বপ্ন গড়েছে প্রভাকর, কিন্তু আজ হঠাৎ বিমলার দুর্বোধ্য ব্যবহারে সব যেন মুহূর্তে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল।

ক'দিন থেকেই গিরিজাপ্রসাদ স্নান করছেন না, বিকেলের দিকে যখন জ্বর আসে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোঙান। গিরীন তা লক্ষ করেনি। কে যেন খবর দিয়েছিল, পাকা বাড়ি বানানোর জন্যে গভর্নমেন্ট থেকে টাকা ধার দিচ্ছে, তারই খোঁজে দিনকয়েক এ-আপিস ও-আপিস ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে এল সেদিন।

বংশী আগেই বলেছিল, ও তোমার খাটাখাটুনিই সার হবে, দেখে নিয়ো। হলও তাই। পাশের গাঁয়ে রাজেন দাসের কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। সে আধখানা পাঁচিল তোলা বাড়িটা দেখিয়ে বললে, খবরদার, খবরদার, এখন বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। ও-পথে পা মাড়াতে যেয়ো না গিরীন।

গিরীন হেসে বললে, কেন ?

রাজেন হাসল। বললে, ইংরেজ আমলে দু-চারটে সাহেব ছিল, এখন যে চৌকিদার অবধি সবাই সাহেব। মেজাজ তো জানো না বাবুদের।

গিরীন হেসে বলেছে, তা দু'পয়সা ধার-দেনা দেবার অধিকার পেয়েছে, মেজাজ একটু দেখাবে না ?

রাজেন হেসে বললে, শুধু মেজাজ হলে তো কথা ছিল। বাবুদের দেখাই পাবে না, আপিস শুধু নামে এখানে, থাকেন সব সদরে। দু'টাকা, আড়াই টাকা যখন মুনিশের দর, সেই চাষের সময় ঢাক পিটিয়ে দিয়ে বলবে, অমুক দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাও তোমার চাষ ফেলে, দশ দিন ছোটাছুটি করো।

রাজেন দাসের ছোট ছেলেটা পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে টিপ্পনী কেটেছে ! তারপর

যা খাতায় কলমে দেবে, তার আদ্দেক তো প্রণামী দিয়ে আসতে হবে। কি বলো বাবা ?

রাজেন সায় দিয়ে বলেছে, হ্যাঁ, যা বলেছিস। তাও টাকাটা একসঙ্গে পেলে নয় কাজ হত। দেবেন আবার নিজেদের মর্জির ওপর, কিস্তিতে কিস্তিতে !

বলে অসম্পূর্ণ বাড়িটাও দেখিয়ে রাজেন হেসেছে।—ওই দেখো না অবস্থা। টাকা আদায় করতে ঘুস দাও, সিমেন্ট আদায় করতে ঘুস দাও। এটা মেলে তো ওটা মেলে না। যা গেছে গেছে, ও-বাড়ি আমি ভেঙে ফেলে দেব, মাটির বাড়িই ভাল আমাদের।

সব দেখেশুনে হতাশ হয়েই তাই বাড়ি ফিরেছিল গিরীন। পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঘরের অসুবিধা হচ্ছে রীতিমত। দু'খানা কুঠুরি ছেড়ে দিতে হয়েছে গিরিজাপ্রসাদকে। তাই আবার দু'খানা ঘর না করে নিলেই নয়। চাষের আলু আর চাল অর্ধেক ইঁদুরে খেয়ে দেয়। তাই স্বপ্ন দেখেছিল গিরীন, একটা পাকা বাড়ির। ইঁদুরের হাত থেকে তা হলে অনেকখানি রক্ষা পাওয়া যাবে। সেই মনে মনে গড়ে তোলা স্বপ্নটুকু শেষ অবধি ভেঙে পড়তে বাড়ি ফিরে এল বিরক্তিতে আর হতাশায়।

রোদ্দুরে রোদ্দুরে দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে এসে সবে জামাটা খুলে মোড়ার ওপর বসেছে, অমনি মোহনপুরের বউ গাড়ু করে জল এনে দাওয়ায় রেখে বললে, বটঠাকুরের জন্যে ডাক্তার ডাকতে গেছে বিমলা।

—ডাক্তার ? বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলল গিরীন। তারপর প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে ?

মোহনপুরের বউ ফিসফিস করে বললে, তা কি করে বলি, আমাদের কি বলে কিছু !

মুহূর্তের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠলে গিরীন।

চিৎকার করে উঠল, বলবে আবার কি ? লোকের অসুখ-বিসুখ হলে সে কি বলে বেড়াবে নাকি ? নিজেরা গিয়ে খোঁজ নিতে পারো না।

টিয়াও সামনে দাঁড়িয়েছিল মুখ কাচুমাচু করে। ক'দিন থেকেই তার ইচ্ছে হচ্ছে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে গিয়ে একটু বসতে, খোঁজখবর নিতে, কিন্তু বাপের ভয়ে যেতে পারেনি।

অথচ টিয়াকে দেখেও গিরীন চটে উঠল। খেঁকিয়ে উঠে বললে, জ্যাঠার খেয়ে তো এত বড়টি হয়েছ, তা অসুখ-বিসুখে তার কাছে গিয়ে একটু বসতে পারো না ?

বলেই গট গট করে গিরিজাপ্রসাদের খবর নিতে চলে গেল গিরীন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মোহনপুরের বউ। আর টিয়া ? রাগে অভিমানে টিয়া সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে গিরীন বেরিয়ে গেল, ডাক্তার আসছে কি না দেখতে। আর টিয়া পা টিপে টিপে পাঁচিলের ওপারে চলে গেল, গিয়ে দাঁড়াল গিরিজাপ্রসাদের পাশে।

গিরিজাপ্রসাদ টিয়াকে দেখে হাসলেন।—আয়, বোস এখানে।

গিরিজাপ্রসাদের পাশে বসল টিয়া। তারপর তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে বললে, উঃ, কি ঘামাচি হয়েছে জ্যাঠা ! গেলে দেব !

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন।—দে।

টিয়া ছুটে চলে এল নিজেদের ঘরে, টিনের কৌটো থেকে খুঁজে খুঁজে একটা ঝিনুক বের করলে। সেবার পাঁজাবউ জগন্নাথের রথ দেখতে গিয়ে ঝিনুক নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, সমুদ্রের ধারে নাকি পড়ে থাকে, কুড়িয়ে নিলেই হল। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। সমুদ্র কেমন, কত বড়, কিছু জানে না টিয়া। শুনে শুনেও বুঝতে পারে না। তার বিশ্বাসই হয় না, তার ধারে এমন ঝিনুক অজস্র পড়ে থাকে, যে কেউ কুড়িয়ে নিতে পারে। ঝিনুকটা নিয়ে ফিরে এল টিয়া, জ্যাঠামশাইয়ের পিঠের ঘামাচি গেলে দিতে দিতে ওর মন চলে গেল অনেক দূরে। একটা কল্পনার সমুদ্রের ধারে ও যেন ঝিনুক

কুড়োচ্ছে। ঝিনুক, ঝিনুক, আঁচলভর্তি ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছে।

তেত্রিশ

মেয়ে দেখতে আসার কথা সেদিন। টিয়াকে দেখতে আসবে প্রভাকরের বাবা। দেনাপাওনার কথাও হবে।

সকালবেলাতেই গিরিজাপ্রসাদ কি যেন ফরমাশ করতে যাচ্ছিলেন বিমলাকে, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কথা বলতে পারলেন না। মেয়েটার চেহারা যেন রাতারাতি পাল্টে গেছে। মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে ক'দিন থেকেই। চোখের নীচে ক্লান্তি না নিদ্রাহীনতার ছাপ!

বিমলার দিকে এক নজর তাকিয়ে গিরিজাপ্রসাদ নিজেই যেন লজ্জা পেলেন। সত্যি তো, বিমলার কি দোষ। টিয়ার চেয়ে কত বড় সে, অথচ টিয়ার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এ-খবরে মন খারাপ হবারই কথা। তারও তো লজ্জা! কিংবা—তারই লজ্জা। অথচ অপরাধ গিরিজাপ্রসাদের। তিনি চেষ্টা করেননি, আর বিয়ে দেবার মত এত টাকাও তাঁর নেই। গিরিজাপ্রসাদ তাই বিমলার কাছেও লজ্জা পেলেন, যেন মেয়ের চোখে তাঁর অক্ষমতা ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু বিমলার মত সকলের দৃষ্টির আড়ালে থেকে ঘরের কোণে তো লুকিয়ে থাকতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ! এমন একটা দায়-দায়িত্বের সময় এগিয়ে না এলে চলবে কেন।

গিরীন সকাল থেকেই ছুটে বেড়াচ্ছে। সকাল থেকে কেন, আগের দিন সন্ধের ট্রেনে বর্ধমান থেকে বাজার করে এনেছে। পটল, ল্যাংড়া আম, আর দই মিষ্টি। জেলেদের খবর দিয়ে এসেছে স্টেশন থেকে ফিরে। একা মানুষ কত দিক আর সামলাবে! তাই গিরিজাপ্রসাদ নিজেই যেচে গিয়ে এটা-ওটা উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, অত ভাবনার কিছু নেই, মাছ ধরানোর ব্যবস্থা আমি দেখব এখন সকালে। আর নিভাননীকে বলেছেন, লোকজন আসবে, রান্নাটান্না বউমা একা হয়তো পেরে উঠবে না...

নিভাননী অবশ্য তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকেননি। নিজে গিয়ে কি কি রান্না হবে তার ফর্দ করে দিয়েছেন, বলেছেন, পটল এনেছে ঠাকুরপো। পটলের দোরমা করে দেব আমি। আর মাছের কালিয়া...

এতখানি চওড়া পাঁচিল ছিল দুটো পরিবারের মাঝে, নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলত না, অথচ রাতারাতি যেন সব এক হয়ে গেছে। গিরিজাপ্রসাদের বড় ভাল লাগে ব্যাপারটা, মনে হয়, সত্যিই বুঝি সব ক্ষতচিহ্ন মুছে গেছে। সব বিভেদ ভুলে গেছেন। এত অন্তরঙ্গভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। এমন আন্তরিক ব্যবহার দেখে গিরিজাপ্রসাদের মন খুশি হয়ে ওঠে। নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেননি, এই দুঃখটুকু যেন একেবারে ভুলে গেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আতঙ্ক বোধ করেন। যে ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে এতখানি মিলেমিশে যেতে পেরেছেন সেটা পার হয়ে গেলেই আবার পুরনো পাঁচিলটা মাথা তুলে দাঁড়াবে না তো!

দেখেশুনে গিরীনের বুক থেকেও ভারী পাথরটা সরে গেছে! মন খুলে গিরিজাপ্রসাদকে দু'-একটা কথা বলতে বাধছে না আর। মোহনপুরের বউ রান্না করতে করতে নিভাননীকে দু'-একবার বলেছে, মেয়ে এখন পছন্দ হলে হয়! আবার টাকাকড়ি কি চেয়ে বসবে কে জানে! মনের মধ্যে তার একদিকে আনন্দ আর আশা, অন্যদিকে আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা।

নিভাননী তা দেখে সান্ত্বনা দিয়েছেন, বলেছেন দেখে পছন্দ হবে না এ-কথা বোলো না ! টিয়াকে দেখে কারও পছন্দ আবার না হয় !

শুনে মোহনপুরের বউ খুশি হয়েছে। নিভাননীকে মনে হয়েছে আপন জন। কিন্তু সব চেয়ে খুশি হয়েছে টিয়া নিজে। অথচ ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি আর ভয়। আর লজ্জা। অন্য দিন হলে এতক্ষণ মাকে রান্নায় কত সাহায্য করত টিয়া, কিন্তু আজ নিজে থেকে কিছু করতে যেতে লজ্জা করে তার। কি জানি, মা কি ভাববে, জেঠিমা কি ঠাট্টা করে বসে। তাই রান্নাঘরের খুঁটি ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে টিয়া, আর মা কিছু ফরমাশ করলে তবেই সেটুকু করে।

বিমলার দিকে তাকিয়ে দেখার সময় নেই নিভাননীর, তাই টিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বললেন, দিদিকে বল ঢাকাই শাড়িটা বের করে রাখতে, কচি কলাপাতা রঙের ওপর সাদা সাদা বুটি, বেশ মানাবে তোকে। বিমলিকে বলিস, ভালো করে সাজিয়ে দিতে...

বলে ঠোঁট টিপে হাসলেন মোহনপুরের বউয়ের দিকে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। আর টিয়া লজ্জায় আরও কুঁকড়ে গেল।

ওদিকে গিরিজাপ্রসাদ পুকুর আর বাড়ি, বাড়ি আর পুকুর করছেন। দুটো শোলা নামিয়েছে জেলেরা। কিন্তু মাছ মেলেনি এখনও।

এরই ফাঁকে ঘাটে বাসন ধুতে আসার নাম করে কখন যে আনমনে দূরের রেললাইনের দিকে তাকিয়েছে টিয়া ! পাড় থেকে একটা খেপ দিয়ে জাল ঝাড়ছে একজন। পানা শামুক, দু-চারটে ছোট পোনা, একটা বোধ হয় ফলুই—রুপোর মত চিকচিক করে উঠল। পোনা দুটোকে আবার পুকুরে ছুঁড়ে দিল জেলেটা। বাগদিদের একটা মেয়ে কোঁচড়ে শামুকগুলো তুলছে। এক পাল ছেলেমেয়ে জটলা পাকিয়েছে এক ধারে, মাছ ধরা দেখছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন ছোট লাইনের দিকে চোখ গেছে টিয়ার ও নিজেও বুঝতে পারেনি।

কাটোয়া থেকে ট্রেনটা আসার সময় হয়েছে, ছায়া দেখেই বুঝতে পারে টিয়া। বিমলারা ঘনঘন ঘড়ি দেখত বলে প্রথম প্রথম মা'র সঙ্গে খুব হাসাহাসি করত টিয়া। বেলা কত হল জানবার জন্যে আবার ঘড়ি দেখতে হয় নাকি ? নিজের ছায়া দেখলেই বুঝতে পারে ও। বাবা ট্রেন ধরে এই ছায়া দেখেই। রোদের তাপ দেখেও।

রেললাইনটা ঠিক যেন বনপলাশিকে বেড় দিয়ে ঘুরে গেছে। অট্টামা বলত ওটা পায়ের বেড়ি এই বনপলাশির। গাঁয়ের লোকগুলোকে পায়ে বেড়ি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যায় দূরে দূরান্তরে। দেশ-ছাড়া, গাঁ-ছাড়া করে মানুষগুলোকে। টিয়ার মনে হল, অট্টামার কথা সত্যি। রেণুদি চলে গেল, রাঙাবৌদি চলে গেল, ফিরু—যাকে একটা দিন না দেখে থাকতে পারত না, তাকেও তো দেশছাড়া করেছে ওই রেলগাড়ি। টিয়াকেও হয়তো এমনি—হয়তো কেন, যেতেই হবে...ওদের মতই।

নানা কথা ভাবছিল টিয়া। হঠাৎ দূরের আকাশে খানিকটা কালো ধোঁয়া বর্ষার মেঘের মত ভেসে উঠল। কাটোয়া থেকে ট্রেনটা আসছে। এত দূর থেকেও কান পেতে একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল টিয়া। বিমলারা শুনতে পায় না, বিশ্বাসও করে না যে টিয়া শুনতে পায়, গাঁয়ের সবাই শুনতে পায়।

বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে চলে এল ও। এসে দেখলে অট্টামা আসছে লাঠি ঠুক ঠুক করে। মুখে একমুখ হাসি।

লাঠির ওপর ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে এল অট্টামা, তারপর দূর থেকেই চিৎকার করলে, কই লো মোনপুরের বউ ! আছিস্ নিকি লা !

মোহনপুরের বউ হেসে সাড়া দিলে। —কি গো অট্টামা, এই যে এখানে।

—ঘটক বিদেয় কর লো, ঘটক বিদেয় কর। ফোকলা মুখের দন্তহীন মাড়ি বের করে হাসল অট্টামা। বললে, 'গোড়ের মালা বিয়ে দিল, গাঁ ষোল-আনা ভোজ পেল! কুকুর খেলো, ছাগল খেলো, গোড়ের মালা শুকিয়ে মলো।' তাই হয় লা মোনপুরের বউ, তাই হয়। সবাইকে ডেকে খাওয়ায়, গোড়ের মালাকে কেউ দু'ফোঁটা জল দেয় না। এখন আর অট্টামাকে মনে রইবে ক্যানে।

মোহনপুরের বউ অট্টামার কথা শুনে হাসিমুখে ছুটে এল, হাত ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসালে পিঁড়ি এনে দিয়ে। তারপর কৌতুকে হেসে বললে, গোড়ের মালাকে কেউ কি ভুলতে পারে গো অট্টামা, সবাই বরং তাকে বুকে করে আগলে রাখে।

নিভাননীও হেসে বললেন, ও হরি, অট্টামার ঘটকালি বুঝি। তা আমার মেয়েটাকেও এবার পার করে দাও। বলে হাসলেন।

অট্টামা সান্ত্বনা দিলে, হবে লা হবে। 'বিয়ে বিয়ে করলে মন, বিয়ে হতে কতক্ষণ!' দোব, বিমলার বিয়ে আমি ঠিক করে দোব।

শুনে সান্ত্বনা পান নিভাননী। আর মোহনপুরের বউও খুশি হয়ে টিয়াকে ডেকে বলে, কাল বদ্দমান থেকে যে মিষ্টি এনেছে, অট্টামাকে এনে দে।

বসে বসে একটু একটু করে লেডিকেনি দুটো খায় অট্টামা, প্লেটের রসটুকু আঙুলে করে তুলে চেটে চেটে নিয়ে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খায়। বলে, সারা দিনমানের ভাত খাওয়ার দফা দিলে মেরে।

তারপর লাঠিটা তুলে উঠে দাঁড়ায়, বলে, যাই, আবার বিকেল হলেই পা দুটো বাতে টাটিয়ে ওঠে, ডাক্তারের কাছে যাব একবার। বলে দাওয়া থেকে নামতে যায় অট্টামা। মোহনপুরের বউ এসে ধরে নামিয়ে দেয় নীচের উঠোনে।

বিড়বিড় করতে করতে লাঠি ঠুকঠুকিয়ে চলে যায় অট্টামা, আর মোহনপুরের বউ খুশির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অট্টামার মনের মধ্যেও একটি আনন্দের সুর গুনগুন করে। গ্রামের কারও বিয়ের কথা শুনলেই অট্টামার ঠাণ্ডা রক্তেও কেমন নেশা লাগে। বিয়ের হইচই বাজনা, উলুর শব্দ শুনলে মনের মধ্যে একটা তীব্র সুখের ঝড় বয়ে যায় যেন। আরও সুখ বউঝিদের কোলে প্রথম যখন কোলজুড়ে একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটে। তেমন আনন্দ বুঝি আর কিছুতেই নেই।

টিয়ার বিয়ের দিনটা কল্পনার চোখে ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হাসে অট্টামা। সঙ্গে সঙ্গে আরও কতজনের বিয়ের রাতটার কথা উঁকি দিয়ে যায়। জীবনে বনপলাশির সবারই বিয়ে দেখেছে অট্টামা, নতুন সংসার গড়তে দেখেছে, ঘর ভাঙতেও দেখেছে অট্টামা, একজনকে ফেলে আরেকজন চলে গেছে জীবনের অপর পারে ; কিন্তু সেসব দুঃখের স্মৃতি মুছে গেছে তার মন থেকে। বেঁচে আছে শুধু সুখের স্বপ্নগুলো।

সেইসব দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতেই কখন আনমনে নতুন গোড়ের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল অট্টামা, যেখান থেকে মেটে রাস্তাটা বাঁক নিয়ে পাকা সরানের দিকে ইস্টিশন অবধি চলে গেছে।

তালগাছের সারি চলে গেছে খানিক দূর অবধি, তারপর ধু ধু মাঠ। কোথাও কোনও জনমানব নেই। শুধু একটা সাঁওতালদের ছেলে একটা তাল পেড়ে এনে তালশাঁস বের করছে কাঁচা তালটা কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে।

অট্টামা বোধহয় একবার কৌশল্যাকে খুঁজলে। এ-সময়ে নতুন গোড়ের ঘাটে কাপড় কাচে সে।

তাই কাউকে দেখতে না পেয়েও ডাকলে। —কৌশলী, অ কৌশলী।

কেউ সাড়া দিল না। নিজের মনেই তাই বিড়বিড় করলে অট্টামা। পরমুহূর্তেই আঁকাবাঁকা মেটে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। কে যেন আসছে! হ্যাঁ, মানুষই।

কিন্তু সে তখন আর মানুষ নেই। দূর থেকে বুঝতে পারেনি অট্টামা। কাছে আসতেই কেমন যেন লাগল। লোকটা অমন হেলেদুলে হাঁটছে কেন। নাকি অট্টামার চোখের ভুল? বয়স তো হয়েছে, তাই হয়তো অমন মনে হচ্ছে।

লোকটা আরও কাছে আসতে অট্টামা প্রশ্ন করলে, কে র‍্যা? চিনতে নারলাম বাবা!

—আমি উদাস বটি গো অটেমা।

—উদোস? উদোস এলি? খুশি হয়ে উঠল অট্টামা। আর উদাস কাছে এগিয়ে এসে দু'হাত আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রেখে বললে, হুঁ এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধে দূরে সরে গেল অট্টামা। —আ মর, সকালবেলাতেই মদ গিলেছিস?

হা হা করে সশব্দে হেসে উঠল উদাস, তারপর টলতে টলতে চলে গেল কোটালপাড়ার দিকে।

অট্টামার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নেই ওর। একটা কিছু ফয়সালা করবার জন্যেই এসেছে ও।

টলতে টলতেই বাউড়িপাড়া পার হয়ে বাঁশঝোপ পার হয়ে গুপ্তদের আখের খেতের ধার দিয়ে পাঁচু কোটালের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল উদাস।

বাউড়িপাড়া কোটালপাড়ার ছেলেগুলো হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল উদাসকে দেখে। আর চিৎকার শুনে চমকে ফিরে তাকাল পদ্ম।

কাঁধের ঘা শুকিয়ে গেছে পাঁচু কোটালের অনেক দিন আগেই, তবু এক-একদিন ভীষণ যন্ত্রণা হয়। শিরায় টান ধরে, আর সারা গা পুড়ে যায় জ্বরে। তাই পদ্ম ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল সেদিন। আর তারপর থেকে ক'টা দিন বাপের কাছেই থেকে গিয়েছিল সে। বাপ তার আরেকটু ভাল হয়ে উঠলেই ডাক্তারের কাছে ফিরে যাবে মনে মনে ভেবে রেখেছিল।

এমন সময় হঠাৎ উদাসকে এ-ভাবে আসতে দেখে, তার দিকে ফিরে তাকিয়ে পদ্মর মুখের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। এ কি চেহারা হয়েছে উদাসের? উসকো-খুসকো চুল, পাকানো দড়ির মত চেহারা, যেন কতকাল স্নান করেনি। আর...আর দূর থেকে দেখেই পদ্ম বুঝতে পারল, এই ভোর সকালেই নেশা করেছে উদাস।

সদ্য পুকুরে ডুব দিয়ে এসে ভিজে কাপড়েই উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামছাটা তার চুলে জড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে চুলের জল নিঙড়ে ফেলছিল পদ্ম, চিৎকার শুনে ফিরে তাকাতেই চোখোচোখি হল।

এক মুহূর্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল পদ্ম, তারপর দ্রুত পায়ে উদাসের কাছে এগিয়ে এল। —বোনাই, তুমি?

উদাস হাসল। —হাঁ পদ্ম, বোনাই বটি!

পদ্মর মুখের চেহারা মুহূর্তে কোমল হয়ে উঠল, সহানুভূতিতে বললে, সক্কাল বেলাতেই লেশা করেছ বোনাই? শরীলটা কি হয়েছে তোমার দ্যাখো নাই?

উদাস হো হো করে হাসলে পদ্মর কথায়। বললে, মদটা না খেলে শরীলটা থাকবে ক্যানে, উঁ? বল ক্যানে। ডাইভার আদমি বটি, ঢকঢকিয়ে মদ যদি না খাব তো তিন টাইম বাস চালাব কেমন করে উঁ। বল ক্যানে।

পদ্ম ধীরে ধীরে বললে, তবে গাঁ ছাড়লে ক্যানে বলো?

উদাস মাতালের মত হেসে উঠল। —ই শালার গাঁয়ে কি আছে? কুছ নেহি, কুছ

নেহি। কাটোয়ায় চ, দেখবি লগদ টাকা আছে, বোতলের মদ আছে...

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল উদাস। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল পদ্মর দিকে। তার উদ্দাম যৌবনের যে শরীরটাকে একদিন কাছে পেয়েছিল উদাস, আজ তা যেন আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। নাকি তার নেশার চোখের বিভ্রম! মোহগ্রস্তের মত পদ্মর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদাস হঠাৎ বলে ওঠে, তোর নেগেই ফিরে এলাম রে পদ্ম।

পদ্ম কৌতুকে হাসল। যেন পাগলের প্রলাপ বকছে উদাস, এমনি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে।

উদাস অতশত লক্ষ করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, শহরে কাঁচা টাকা আছে রে পদ্ম, বোতলের মদ আছে, হাঁ মেয়েমানুষও আছে, কিন্তুক পদ্ম লাই রে!

পদ্ম আবার হাসল ওর কথা শুনে।

আর উদাস অনুনয়ের সুরে বললে, তুই চ পদ্ম, তোকে রাজরানী করে রাখব আমি। তোকে লিশ্চয় বলছি, রাজরানী করে রাখব।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল পদ্ম।

বললে, না গো বোনাই, তা আর হবার লয়। হবার লয়।

—ক্যানে?

কেন? কেন, সে-কথা বলার সাহস হল না এই মাতাল মানুষটাকে! উদাসের চোখের দিকে তাকিয়ে তার রুক্ষ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটা অজানা আতঙ্কে বুক দুরুদুরু করে উঠল তার।

তাই ধীরে ধীরে বললে, না গো বোনাই, তা হবার লয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খেপে গেল উদাস। ভিতরের চাপা আক্রোশটা বুঝি অনেক চেষ্টায় এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। পদ্মর প্রত্যাখ্যানে সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে উঠল তার।

এগিয়ে এসে খপ করে পদ্মর হাতটা ধরতে গেল উদাস, চিৎকার করে বললে, লিজের থিকে যাবি নাই তো জোর করে লিয়ে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে একটা ধাক্কা দিল তাকে পদ্ম। মদের নেশায় টাল সামলাতে পারল না উদাস। বাঁশবাতার বেড়ার গায়ে গিয়ে পড়ল সে।

পদ্ম তখন থরথর করে ভয়ে কাঁপছে। উদাসের চোখের মধ্যে একটা নৃশংসতার ছায়া দেখতে পেয়েছে পদ্ম। তাই সাহস করে আর এগিয়ে যেতে পারল না। হঠাৎ ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল উদাস, খানিক চেয়ে রইল পদ্মর ঘরটার দিকে, তারপর টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে নিজের মনেই বিড়বিড় করে কি যেন বলে শাসাল পদ্মকে, তারপর এঁকেবেঁকে নতুন গোড়ে পার হয়ে পাকা সরানের দিকে চলে গেল।

একটা লোক এল আর চলে গেল। কিন্তু গ্রামের লোক তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। শুধু তোলপাড় করে উঠল একজনের বুকে।

পদ্মর। উদাসের নৃশংস দৃষ্টিটা যখনই মনে পড়ে তখনই ভয়ে শিউরে ওঠে সে! কি আশ্চর্য, সেই পুরনো আকর্ষণটুকু কিভাবে যেন মুছে গেছে তার মন থেকে, নতুন করে বাঁধা পড়েছে সে একটা পাগল মানুষের প্রতি সমবেদনায়।

অবিনাশ ডাক্তারকে দেখে এক-এক সময় পাগলই মনে হয় পদ্মর। হঠাৎ চেঁচিয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ করে ওঠে সব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে। আবার তখনই একেবারে মাটির মানুষ। পদ্ম দেখে আর হাসে। আর ভাবে, গ্রামে এমন একটা

সত্যিকারের মানুষ আর নেই।

যেদিন ডাক্তার হঠাৎ পাগলের মত পদ্মকে কাছে ডেকে তার মাথায় খাটো শাড়ির আঁচলটা তুলে দিয়ে বলে উঠেছিল, 'আমি তোকে বিয়ে করব পদ্ম,' সেদিন বিস্ময়ে, লজ্জায়, আনন্দে আর অস্বস্তিতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ও।

মনে মনে হেসেছিল। ভেবেছিল, লোকটা পাগল নাকি!

কিন্তু তার পর থেকেই কেমন করে যে একটু একটু করে ডাক্তারের ওপর তার সব কৃতজ্ঞতা উজাড় হয়ে পড়েছে, কিভাবে ধীরে ধীরে উদাসকে মুছে ফেলতে চেয়েছে মন থেকে, তা পদ্ম নিজেও বুঝি জানে না।

পদ্মর হঠাৎ মনে হয়েছে, সারা গাঁয়ে এমন একটা ভরসার স্থল আর নেই, এমন একটা আশ্রয় মিলবে না তার জীবনে।

মনে মনে পদ্ম ঠিক করে রেখেছিল উদাসের কথাটা শেষ অবধি প্রকাশ করে বলবে ডাক্তারকে।

কিন্তু অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির কাছে পৌঁছেই সে-কথা ভুলে গেল পদ্ম। দেখলে বাড়ির ধারের রাস্তায় বি ডি ও আপিসের জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রভাকরকে কি যেন চিৎকার করে বলছে ডাক্তার, উত্তেজিত স্বরে।

উত্তেজিত হবারই কথা।

দিন কয়েক আগেই প্রভাকরের বাবা তাঁর এক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে মেয়ে দেখে গেছেন, দেনা-পাওনার কথাও ঠিক করে গেছেন।

সেই খবর পেয়েই ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসছিলেন অবিনাশ ডাক্তার।

প্রভাকর বেশ ক'দিন এদিক দিয়ে আসেনি। আজ হঠাৎ এসে পড়তেই রাগে ফেটে পড়লেন অবিনাশ ডাক্তার।

প্রভাকরকে জিপ থেকে নামতে দেখেই ক্রাচ দুটোয় ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, শেম, শেম!

প্রভাকর প্রথমটা বুঝতে না পেরে সকৌতুকে হেসে বললে, কি ব্যাপার?

অবিনাশ ডাক্তারের রাগ আরও বেড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল, হাতের কাছে একটা রাইফেল থাকলে আপনাকে আজ গুলি করে মারতাম।

অবিনাশ ডাক্তারের ভাবভঙ্গি দেখে প্রভাকর এবার ভয় পেয়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে তাকিয়ে বললে, কি ব্যাপার তা তো বুঝতে পারছি না।

—পারবেন না, পারবার কথা নয়। এইট্টিনথ্ সেনচুরির লোকদের বোঝাতে হলে চাই একখানা মেসিনগান। ছি ছি ছি, আপনার লজ্জা করল না?

প্রভাকর তখনও বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে।

অবিনাশ ডাক্তার এতক্ষণ চিৎকার করে হাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এসে টিনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

প্রভাকরও বসল অন্য চেয়ারটায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার আবার বললে, কিচ্ছু হবে না, এদেশের কিচ্ছু হবে না। উই মাস্ট স্টার্ট অ্যাফ্রেস। কয়েকটা হাইড্রোজেন বোমা ফেলে সব ধ্বংস করে দিয়ে আবার নতুন করে স্টার্ট করতে হবে।

প্রভাকর এতক্ষণে হাসতে পারল। বললে, এ তো আপনার পুরনো থিওরি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

ডাক্তার চুপ করে রইল গম্ভীর মুখে। তারপর হঠাৎ ছিপিখোলা সোডার বোতলের মত গমকে গমকে বলে উঠল, হাসছেন! হাসতে পারছেন আপনি? কনসেন্সে বাধছে না

এতটুকু ? ছি ছি ছি, গর্ব করে বলতাম যে, আপনার মত পিতৃভক্ত ছেলে এ যুগে দেখা যায় না। বাপের ওপর বিয়ের ভার ছেড়ে দেয় এমন ছেলে আজকাল দেখা যায় না। সে কিনা এই জন্যে ? গলায় গামছা দিয়ে মেয়ের বাপের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্যে ? ছি ছি ছি !

প্রভাকর এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে। ধীরে ধীরে বললে, ভুল বুঝবেন না অবিনাশবাবু, সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

—মানে ? হোয়াট ডু ইউ মিন ?

প্রভাকর ভারী গলায় উত্তর দিলে, কিছুই জানতাম না আমি। আজ বাবার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু...

অবিনাশ ডাক্তার বললে, টিয়ার দ্যাট টু পিসেস। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে...

—না।

—না ? মানে টাকাটা না নিলে চলবে না ? বিদ্রূপ করে উঠল ডাক্তার।

প্রভাকর ধীরে ধীরে বললে, না নিলে চলবে না। সত্যিই চলবে না।

ভ্রূ কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রভাকরের মুখের দিকে তাকাল অবিনাশ ডাক্তার।

আর প্রভাকর বললে, আমার একটি বোন আছে। বলেছি বোধহয় আপনাকে ?

—হ্যাঁ। বাট হোয়ের ডাজ সি কাম ইন ?

প্রভাকর হাসলে, বিষণ্ণ হাসি। বললে, পাড়াগাঁয়ে মানুষ, একটা ইস্কুল-কলেজ ছিল না যে পড়াশুনো করে চাকরি করবে। অথচ টাকার জন্যে তার বিয়েও দিতে পারেননি বাবা।

একটু থেমে আবার বললে, তার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে, এই টাকাটা না নিলে বোনের বিয়ে হবে না, বাবা লিখেছেন আজ। আর এই প্রথম জানলাম আমি ব্যাপারটা।

অবিনাশ ডাক্তার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

প্রভাকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আপনার কাছে তাই পরামর্শ চাইতে এসেছি।

অবিনাশ ডাক্তার প্রথমটা কোনও উত্তরই দিলে না। যেন সমস্যার কোনও সমাধানই খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রভাকর বললে, বাবা কথা দিয়ে ফেলেছেন, কথা না রাখলে নাকি তাঁর অসম্মান হবে। আর টাকা না নিলে বোনের বিয়ে হবে না।

অবিনাশ ডাক্তারের সব উত্তেজনা যেন হঠাৎ মিলিয়ে গেল। সশব্দে হেসে উঠে বললে, বিয়ে করবেন এখানেই। আমি বলেছি না, ওসব আদর্শ দিয়ে একটু একটু করে কিচ্ছু মেরামত করা যাবে না। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ইউ মাস্ট বিগিন ফ্রম দি বিগিনিং।

বলেই হো হো করে হেসে উঠল অবিনাশ ডাক্তার।

কিন্তু প্রভাকরের মনের মেঘ তার মুখের ওপর থেকে কেটে গেল না। বেশ বোঝা গেল,তার মনের গভীরে এর পরেও কোনও সমস্যা আছে। অন্য কোনও সমস্যা ! বিমলা ?

চৌত্রিশ

প্রজাপতির নির্বন্ধ, যার যেখানে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে খণ্ডন করে কার সাধ্য ! তবে কিনা লক্ষ কথা না হলে বিয়ে ঠিক হয় না। তাই সরাসরি মত জানিয়ে গেলেন না বরপক্ষ, দেনাপাওনার হিসেব শুনে কন্যাপক্ষও এক কথায় রাজি হতে পারল না।

দু'পক্ষই শেষ সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য কিছু সময় নিল ভিতরে ভিতরে। যদিও গিরীন ও গিরিজাপ্রসাদ দু'জনেই প্রভাকরের বাবাকে এমনভাবে হাত ধরে অনুনয় বিনয় করলেন, যেন টাকার ব্যাপারটা কোনও বাধা নয় এ-বিয়েতে।

কিন্তু প্রভাকরের বাবা চলে যাওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ল গিরীন। মনে মনে সামান্য সন্দেহ থাকলেও বরপক্ষের হাবেভাবে ব্যবহারে গিরীন বুঝতে পেরেছে, টিয়ার সঙ্গে প্রভাকরের বিয়ে দিতে বুড়োর অমত নেই এতটুকু। কিন্তু আরও কিছু আদায়ের জন্যে হয়তো একটু প্যাঁচ কষবে, এই যা।

কিছু জমি বেচবে, ভেবে রেখেছিল গিরীন। কিন্তু না, সামান্য দু-এক বিঘে যদি বা বিক্রি হয়, প্রয়োজনমত জমি বেচবার উপায় নেই। কেনবার লোক কোথায়? কোটালদের বাউড়িদের দু-পাঁচজন যারা বাইরে গিয়ে চাকরি করছে কুলি-মিস্ত্রির, বেয়ারা-চাপরাসির, তারা মাঝে মাঝে কিনতে চায়, তাও দু-এক বিঘে। অবশ্য জমি বেচতে মন ওঠে না গিরীনের। ওর চেয়ে অসম্মান বুঝি আর নেই। রায়বাড়ির ইজ্জতই নয়, গিরিজাপ্রসাদ জানবেন গিরীনকে জমি বেচতে হচ্ছে, সে লজ্জাও কম নয়।

—তার চেয়ে হাস্কিং মেশিনটা গোপেন মোড়লকেই দিয়ে দিই, কি বলো? স্ত্রীর উদ্দেশে বললে গিরীন।

মোহনপুরের বউ কোনও উত্তর দিলে না।

গোপেন এর আগেও একবার বলেছিল। মেশিনের দাম আর লাইসেন্স বের করতে যা খরচ হয়েছিল তার ওপর পাঁচ হাজার টাকা লাভ ধরে দিতে চেয়েছিল। সেই লোভটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না গিরীন। এত বড় একটা ব্যবসা ফেঁদে শেষে লাভ হবে কি লোকসান হবে তার ঠিক নেই। অথচ ঘরে বসে যদি পাঁচটা হাজার টাকা বাড়তি পাওয়া যায়, টিয়ার বিয়ের খানিকটা সুরাহা হয়। খানিকটা কেন, সবটাই।

এতগুলো টাকা ঘর থেকে বের করতে হবে বলে মন খারাপ হয়ে যায় গিরীনের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা রোজগার করতে হয়, সেই টাকা এমনভাবে খরচ করতে হবে বলে নিজের মনের মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব চলে। তবু না খরচ করেও তো উপায় নেই।

টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অবশ্য ভালও লাগে। ভাবে, ছেলেমেয়ের সুখের জন্যেই তো টাকা। তা টিয়া যদি সুখী হয়, টিয়ার যদি ভাল বিয়ে হয়, অতগুলো টাকা খরচ করা সার্থক হবে।

মেয়ে দেখে যাওয়ার পর থেকে টিয়াকে লক্ষ করে গিরীন। হাঁটাচলায় যেন আরও সংযত হয়েছে মেয়েটা। একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখেচোখে।

কারণে-অকারণে আজকাল জ্যাঠামশাইয়ের কাছে, জেঠিমার কাছে গিয়ে বসে টিয়া। গল্প করে, এটা-ওটা করে দেয়। মেয়ে দেখতে আসার দিন থেকে ওর বুকের ওপর চাপানো এতদিনের ভারী পাথরটা সরে গেছে। শুধু নিজের বিয়ের আনন্দ নয়, তার বিয়েকে উপলক্ষ করেই যে দু-বাড়ির মনোমালিন্য দূর হয়ে গেছে, তার জন্যে মনে মনে খুশি হয় টিয়া।

খুশি হয়েই কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু দিনে দিনে কি করে যেন গ্রীষ্মের ফাঁকা মাঠের মত দু'বাড়ি আবার পৃথক হয়ে পড়ল। কোনও অঘটন নয়, কোনও কলহবিবাদ নয়, আপনা থেকেই যেন পরস্পর পরস্পর থেকে আবার দূরে সরে যাচ্ছে, স্পষ্ট বুঝতে পারল টিয়া।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ও প্রতিদিনের মতই এসে বসেছিল জেঠিমার কাছে। বাতের ব্যথায় যখন পড়ে থাকতেন নিভাননী, টিয়া এসে পা টিপে দিত। কোনওদিন বা জ্যাঠামশায়ের পাকাচুল তুলে দিত তাঁর মাথার কাছটিতে চুপচাপ বসে। শুধু ভাল লাগত

না বিমলা আর কমলাকে। ওরা কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলত, যেচে কথা বলত না একটাও, কিছু জিগ্যেস করলে সংক্ষেপে একটা উত্তর দিয়েই সেখান থেকে সরে যেত। ভীষণ খারাপ লাগত টিয়ার।

কিন্তু জেঠিমাও যে হঠাৎ এমন বদলে যাবে, ভাবতে পারেনি। টিয়া লক্ষ করেছে, যতক্ষণ হাত-পা টিপে দেয় ও, ততক্ষণই টিয়ার সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন নিভাননী। আর সে-কথার মধ্যেও যেন আন্তরিকতা নেই।

তবু না এসে পারত না টিয়া। মান-অপমানের কথা গায়ে মাখত না। কিন্তু সেদিন তুচ্ছ একটা কথায় টিয়াও বুঝি ঘা খেল। বিমলা যে এমনভাবে বাবাকে তাচ্ছিল্য দেখাবে ভাবেনি সে।

ক'দিন ধরেই দুপুরে খেতে বসে বাবা আর মা'র মধ্যে যা-কিছু আলোচনা হয়েছে, শুনেছে টিয়া। প্রথম প্রথম মুখ নিচু করে শুনেছে শুধু, কখনও ডাল এনে দিয়েছে আরেক হাতা, কখনও বা কুলের আচার এনে দিয়েছে। আর এমন ভাব করে বসে থেকেছে যেন বাবা-মা'র কথাবার্তা কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। তারপর একটু একটু করে দু-একটা কথায় যোগ দিয়েছে সেও। মা ঠাট্টা করেছে, টিয়া হেসেছে। কখনও বা আপত্তি জানিয়েছে ছোটখাটো কোনও ব্যাপারে।

নিজের বিয়ের সম্পর্কে কথাবার্তা শুনতেও ভাল লাগে টিয়ার। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যা-কিছু কথাবার্তা, কাজকর্ম, সবই চলছে তাকে ঘিরে। নিজেকে যেন অনেক বড় মনে হয় তার। এতকাল সংসারের একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয়ে যে পড়েছিল, আজ যেন হঠাৎ সে-ই সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন দুপুরে রোদে পুড়ে ফিরে এল গিরীন, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এতখানি এসে মাথার চাঁদি জ্বলছে, তাই এসেই স্নান করতে চলে গেল গামছা কাঁধে নিয়ে। টিয়া এসে রান্নাঘরের দাওয়া নিকিয়ে আসন পেতে দিল। জল এনে রাখলে গ্লাসে করে। তারপর মাকে বললে ভাত বাড়তে।

গিরীন ফিরে এল খানিক পরেই। কাঠের আয়নাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উবু হয়ে বসে চুল আঁচড়াল। তারপর এসে খেতে বসল।

টিয়ার মনে তখন উৎকণ্ঠা। প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল গিরীন। না জানি কি খবর নিয়ে এসেছে বাবা।

চুপ করে বসে রইল টিয়া। মা এসে কাছে বসলে তবেই কথাবার্তা শুরু হবে।

একটু পরেই মোহনপুরের বউ পাখা হাতে এসে বসল কাছে।

গিরীন খেতে খেতে হঠাৎ বললে, হাস্কিং মেশিনটা বেচেই দোব ঠিক করলাম।

—বেচে দেবে ? মোহনপুরের বউ একটু আপত্তির সুরেই বললে।

—হ্যাঁ, ও-সব ব্যবসা-ট্যবসা কি আমাদের পোসায় গো ! এর ওপর আবার ওদিকে যদি লোকসান দিতে হয় !

বলে খানিক চুপ করে রইল গিরীন। মোহনপুরের বউও চুপ করে রইল। নিজের গায়ের গহনা খুলে যেদিন বন্ধক দিয়ে হাস্কিং মেশিন কেনার টাকা জোগাড় করতে দিয়েছিল, সেদিন কত স্বপ্নই না দেখেছিল। ভেবেছিল, শেষ অবধি বুঝি দুঃখের দিন তার শেষ হল।

তাই একটু আঘাত পেল মোহনপুরের বউ।

গিরীন থেমে থেমে বললে, ছ'মাস তো হয়ে গেল, লাভের মুখ তো দেখতে পেলাম না। তার চেয়ে...

মোহনপুরের বউ তবু চুপ করে রইল।

গিরীন আবার বললে, তাছাড়া, তোমার গয়নাগুলোও উদ্ধার হবে, টিয়ার বিয়ের টাকাও কিছু ওদিক থেকে হয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখলাম, লাইসেন্সের জন্যে গোপেন মোড়ল যখন পাঁচ হাজার টাকা ধরে দিচ্ছে...

টিয়া এদিকে ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে ওঠে। হাস্কিং মেশিন আর হাস্কিং মেশিন ! বাবা যেন কি ! এইসব শোনার জন্যেই কি বসে আছে নাকি সে ! আর মা ! মা কেন আসলে কথাটা জিগ্যেস করছে না।

না, জিগ্যেস করতে হল না। গিরীন নিজেই বললে, গয়নার ফর্দ নিয়ে এলাম বেয়ানের কাছ থেকে। বলে হাসলে।

তারপর একটু থেমে বললে, আবার মটুক দিতে হবে বলেছে।

অর্থাৎ সোনার মুকুট।

টিয়া আপত্তি করলে,না, মটুক নোব না আমি।

মোহনপুরের বউও সায় দিলে। —বিয়ের রাত ছাড়া আর তো কখনও পরবে না, তার বদলে ওপর হাতের...

টিয়া আপত্তি করলে আবার। —আজকাল ওপর হাতে কেউ পরে নাকি !

একে একে গহনার হিসেব হল। কোনটায় কত ভরি সোনা, কি ডিজাইন হবে।

টিয়া নিজেই বললে, গুপ্তদের নতুন বউয়ের মত দুল নেব মা, মুক্তোর। বলে হাসল।

মোহনপুরের বউও হাসল। —তোর জিনিস, তুই যেমন চাইবি তেমনি তো হবে মা। তবে বেয়াই-বেয়ানরা যা বলে দেবে সেগুলো তো মানতে হবে।

শেষ অবধি ঠিক হল একদিন বর্ধমানে গিয়ে বন্ধু স্যাকরাকে সব ডিজাইন দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে। আর কাপড়-চোপড়ও কিছু কিছু কিনে আনতে হবে। এখন থেকে না করলে, শেষে তাড়াহুড়োয় ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না।

মোহনপুরের বউ খানিক চুপ করে থেকে বললে, দিদিকে বলব, একদিন বর্ধমান যেতে তোমার সঙ্গে...

গিরীন হাসলে। —বৌঠান শুধু গেলে তো হবে না, বিমলাও যদি যায়। আজকালকার শহুরে মেয়ে। ওদের পছন্দ আছে।

মোহনপুরের বউ কি ভেবে বললে, তুমিই বলো দিদিকে !

মেয়ে দেখতে আসার দিন অনেক করেছেন নিভাননী আর গিরিজাপ্রসাদ। নিজেদের মেয়ের বেলাতেও যেমন করতেন। প্রভাকরের বাবাকে একবারটির জন্যেও বুঝতে দেননি যে দুটি পরিবারের মধ্যে কোনও অসদ্ভাব আছে, মন কষাকষি আছে। তাই বিয়ের খবর পাকা হতেই গিরিজাপ্রসাদকে গিয়ে বললে, গয়নার ফর্দ নিয়ে এলাম আজ !

ফর্দটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

এদিকে বিমলাকে সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে কাছে ডাকলে গিরীন। —বিমলা !

বিমলা থেমে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়েছে। ফিরে তাকিয়েছে এমনভাবে যেন গিরীনের ডাক শুনে বিরক্ত হয়েছে সে।

হেসে ফেলেছে গিরীন। বলেছে, ওভাবে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চললে তো হবে না। তোমার এখন অনেক কাজ।

—আমার ? বিস্মিত হবার ভান করেছে বিমলা।

গিরীন হেসে বলেছে, তোর নয়তো কার। বিয়ের বাজার করতে হবে, গয়না, কাপড়, বেনারসি—এসব পছন্দ করে দেবে কে ? আমরা তো সব পাড়াগেঁয়ে মানুষ, মুখ্যুসুখ্যু...

কপাটের পাশে দাঁড়িয়েছিল টিয়া, সেও হেসে ফেলেছে বাবার কথা শুনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসি চুপসে গেছে তার মুখে।

বিমলা বেণী দুলিয়ে ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠেছে, ও-সব আমার দ্বারা হবে না।

বলেই চলে গেছে সে চোখের সামনে থেকে। আর আহত অপমানিত গিরীনের মুখের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ জ্বালা করে উঠেছে টিয়ার।

গিরিজাপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করেছেন। কিন্তু কিছু বলতে পারেননি। শুধু সান্ত্বনা দিয়েছেন, সে ভাবতে হবে না, আমিই নয় যাব।

গিরীন কিন্তু সান্ত্বনা পায়নি। বিমলা আর কমলার হাবভাব কথাবার্তায় প্রথম থেকেই সে একটা তাচ্ছিল্য লক্ষ করে এসেছে। সহ্যও করেছে। কখনও-কখনও ভেবেছে, অপরাধ তো ওদের নয়, গ্রাম্য একটা মানুষকে কাকা বলে সম্মান করবে কি করে ওরা। নিজের মনকে বুঝিয়েছে। কিন্তু বিমলা যে তাকে এভাবে তাচ্ছিল্য দেখাবে, এমন ভাবে মুখের ওপর জবাব দিয়ে যাবে, ভাবতেই পারেনি গিরীন। পাড়াগাঁয়ে কি আর-কারও বিয়ে হচ্ছে না, শহুরে মেয়েরা কাপড়, গয়না পছন্দ করে দিয়ে যাচ্ছে কি তাদের ? শুধু একই বাড়িতে মিলেমিশে থাকতে চায় বলেই না এ-কথাটা মনে এসেছিল তার।

গিরীন মনে মনে ভাবলে, না, বৌঠানকেও বলে কাজ নেই। নিজেই গিয়ে বিয়ের বাজার করে আনবে, হংস চাটুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে।

তাই ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে এল গিরীন, নিঃশব্দে।

আর টিয়া এসে ছলছল চোখে মোহনপুরের বউকে বললে, বিমলাদি যদি কোনও জিনিস পছন্দ করে দেয়, সে জিনিস আমি ছুঁড়ে ফেলে দোব।

মোহনপুরের বউ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল। তারপর একে একে সমস্ত ঘটনাটা শুনে রাগে জ্বলে উঠল হঠাৎ। গিরীনের কাছে গিয়ে বললে, বিয়ে যদি দিতে হয় তো ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে ব্যবস্থা করো। ওদের কোনও সাহায্য চাই না আমি।

এদিকে বাপের চিঠি পেয়ে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল প্রভাকর। ছুটিছাটায় দু-একবার দেশের বাড়িতে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। খেতে বসিয়ে মা পাখা নাড়তে নাড়তে বলেছে, এইবার একটা বিয়ে কর বাবা তুই!

হেসেছে প্রভাকর সে-কথা শুনে, তারপর বলেছে, বেশ তো, তোমরাই ব্যবস্থা কর।

—আমরা যেখানে ঠিক করব, অমত করবি না তো শেষে!

প্রভাকর হেসে বলেছে, তোমরা কি আর জেনেশুনে আমার অনিষ্ট করবে!

মা খুশি হয়েছে, বাবা খুশি হয়েছে সে-কথা শুনে। আর প্রভাকরও যেন একটা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে কোনওদিন কল্পনাও করেনি সে। ভাবেনি, তার অজান্তে বিয়ের কথা পাকা করে ফেলবে বাবা-মা। তাই চিঠিটা পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছিল কন্যাপক্ষের নাম-ঠিকানা দেখে। এমন যে হতে পারে, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয়নি।

বাবার ওপর যত না রাগ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি চটেছে সে গিরিজাপ্রসাদের ওপর, গিরীনের ওপর। ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, অথচ প্রভাকরকে কি তাঁরা একটু আভাসেও জানাতে পারতেন না ?

সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়েছে বিমলার ওপর। অভিমান। দিনে দিনে তার সব স্বপ্নটুকু গড়ে উঠেছে বিমলাকে ঘিরে। ঘর বাঁধার কল্পনায় দু'জনে দু'জনের কাছে এসেছে, অন্তরঙ্গ হয়েছে। তারপর, প্রভাকর বুঝতে পারেনি, কেন হঠাৎ বিমলা তার কাছ থেকে দূরে সরে

গেছে, এড়িয়ে যেতে চেয়েছে তাকে পদে পদে।

কেন, তার হদিস পায়নি প্রভাকর। আর তাই অভিমানে বিমলার বিরুদ্ধে একটা তীব্র আক্রোশে নিজেই দগ্ধ হয়েছে।

টিয়া! টিয়াকে কোনওদিন বুঝি ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি প্রভাকর। কিংবা দেখেছে, শুধু আর-পাঁচজনের দিকে যে চোখে তাকায়, সেই চোখে। স্মৃতির পটে ক্ষীণ ভাসা ভাসা কয়েকটা ছবি ফুটে ওঠে শুধু। আর কিছু নয়।

বিমলার ওপর আক্রোশের বশেই সম্মতি জানিয়ে চিঠির উত্তর লিখে দিল প্রভাকর। আর তারপর থেকেই অসহ্য একটা বেদনায় বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। কেমন একটা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নিঃস্ব ভাব।

মনের মধ্যে অসহ্য অন্যায়বোধের জ্বালাতেই কর্তব্যের ভান করে নিজেকে মনে মনে সমর্থন করতে চাইলে। নিজের মনকে বোঝালে, অন্যায় করেনি সে, অপরাধ করেনি বিমলার প্রতি।

ডাক্তারের সমর্থন পেয়ে আরও খুশি হল। সত্যিই তো, এ ছাড়া কি-ই বা করবার ছিল তার! বৃদ্ধ বাপের সম্মান তো তাকে রাখতে হবে। যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন তিনি। যখন এতদূর এগিয়ে গেছে বিয়ের কথাবার্তা।

নিজের মনকে বোঝাতে চায় প্রভাকর। ছোট বোনের জন্যে এটুকু স্বার্থত্যাগ না করলে মনুষ্যত্ব থাকে কোথায়! ছোট্ট বোনটির জীবনে আর কি স্বপ্ন আছে! আর কোন্ ভবিষ্যৎ! এই একটাই। তার সুখের জন্যে এটুকু স্বার্থত্যাগ না করে উপায়ই বা কি!

বিয়ে। প্রভাকর বিয়ে না করলে তার বোনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

তবু হঠাৎ এক-এক সময় প্রশ্ন জাগে, গিরিজাপ্রসাদ কেন বিমলার বিয়ে দিতে চাইলেন না তার সঙ্গে। গিরিজাপ্রসাদ কি তাঁর মেয়ে শিক্ষিত আর শহুরে বলে আরও ভাল পাত্র আশা করেন? এই টাকা তো তিনিও দিতে পারতেন।

এক-এক সময় সন্দেহ হয়, বিমলা নিজেই হয়তো আরও অনেক কিছু আশা করে। হয়তো প্রভাকরের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে ফেলতে চায় না। আর সেইজন্যেই ধীরে ধীরে সরে যেতে চেয়েছে সে। সরে গেছে প্রভাকরের কাছ থেকে।

কয়েকটা দিন এমনিভাবেই পার হয়ে গেল। সেই নির্দিষ্ট দিনটা যত ঘনিয়ে এল ততই একটা অসহ্য যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠল প্রভাকর।

তারপর হঠাৎ একদিন সকালেই এসে হাজির হয়েছে সে পদ্মর কাছে। বলেছে, আমার একটা কাজ করে দেবে পদ্ম?

প্রভাকরের রুক্ষ চেহারা আর চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে উৎকণ্ঠা বোধ করেছে পদ্ম। রসিকতার সুরে বলেছে, গাঁয়ের জামাই হবে গো তুমি, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে!

প্রভাকর পদ্মর রসিকতায় যোগ দিতে পারেনি। শুধু থমথমে গম্ভীর মুখে বলেছে, একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবি?

—কাকে গো? রসিকতা করে গালে হাত ঠেকিয়ে হেসেছে পদ্ম।

তারপর প্রভাকরের উত্তর শুনে হেসে ফেলেছে পদ্ম। বলেছে, হেই মা গো, আমি ভাবলাম টিয়াদিদিকে চিঠি দেবেন বুঝি।

প্রভাকর গম্ভীর হয়ে গেছে। উত্তর দেয়নি।

আর পদ্ম সত্যি সত্যিই বিস্মিত হয়েছে প্রভাকরের কথা শুনে। তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছে, অবাক করলে গো তুমি, বিয়ার সঙ্গে দেখা নাই, শালির গড়ায় বালা, তাই করলে গো! মুখের সামনে মুঠো করা দুটি হাতে খিলখিল হাসি চেপেছে পদ্ম।

পদ্মর রসিকতা শুনে চটেছে প্রভাকর, তবু ধমক দিতে পারেনি। অনুনয়ের সুরে

বলেছে, চিঠিটা গোপনে পৌঁছে দিতে হবে বিমলার কাছে।

আব প্রভাকরের মুখের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়েছে পদ্ম, কি যেন খুঁজেছে তার চোখের দৃষ্টিতে। কি যেন সন্দেহ হয়েছে তার।

তারপর প্রভাকরের চোখে চোখ রেখে চিঠিটা নিয়েছে সে। তার হাতের ওপর হাত রেখে হঠাৎ বলে উঠেছে, এমন কথাটা আমায় ক্যানে গোপন করলে গো তুমি, ক্যানে গোপন করলে, ছি ছি ছি!

বলেই তড়িৎ পায়ে, মেঠো পথ ধরে আমবাগানের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে বাঁশবনের ধার ঘেঁসে...বাঁশবনের আড়ালে ঢাকা-পড়া রায়বাড়ির উদ্দেশে।

আর পরমুহূর্তেই ডাক্তারের গলার স্বর শুনে চমকে ফিরে তাকিয়েছে প্রভাকর। দেখতে পেয়েছে, আখের খেতের মধ্যে থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসছে অবিনাশ ডাক্তার। হাতে একটা ভাঙা আখের টুকরো।

আখ চিবোতে চিবোতে ক্রাচে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসেছে অবিনাশ ডাক্তার, তারপর প্রভাকরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠেছে, এই যে সান-ইন-ল! কি ব্যাপার, আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না নাকি?

প্রভাকর অন্য দিনের মত হেসে যোগ দিতে পারল না ডাক্তারের কথায়। চুপ করে রইল।

আর ডাক্তার কাছে এগিয়ে এসে প্রভাকরের মুখের দিকে চোখ জোড়া এগিয়ে নিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ভঙ্গিতে বলে উঠল, স্ট্রেন্‌জ্‌!

পঁয়ত্রিশ

পরের উপকার করার স্পৃহা কি মানুষের কমে গেছে, কই না! গিরিজাপ্রসাদ নিজেকে দিয়ে বিচার করে দেখেছেন। মনে হয়েছে, না, কমেনি এতটুকু। কিন্তু গ্রামের মানুষ যেন আরও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে আগের দিনের তুলনায়। কখনও-কখনও মনে হয়েছে, তা নয়। আসলে গ্রামের জীবনও যেন শহরকে অনুসরণ করে চলেছে। ভিতরে ভিতরে কিভাবে যেন গ্রামের মানুষের জীবনও শহুরে মনের মত জটিল হয়ে উঠেছে। স্বার্থপর, লোভী, অকৃতজ্ঞ।

তাই কি? না, উপকারের বিনিময়ে বড় বেশি কৃতজ্ঞতা আশা করি আমরা! সারাজীবনের দাসত্ব চেয়ে বসি উপকৃত মানুষের কাছ থেকে। গিরিজাপ্রসাদ নিজেও কি তাই চাননি গিরীনের কাছ থেকে?

এক-এক সময় নিজের স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের ওপর মনে মনে চটে যান গিরিজাপ্রসাদ, ক্ষমা করতে পারেন না তাদের।

সারাজীবন গ্রামের বিষয়সম্পত্তি থেকে কোনও কিছু নিতে চাননি, নিতে চাননি কিছু গিরীনের কাছ থেকে, কিন্তু কেন? ধানের দর কম ছিল তখন, চাষবাস থেকে একটা সংসার চালানোই দায় ছিল, শুধু এই বোধ থেকেই কি গিরীনের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে রেখেছিলেন। গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই এক-এক সময় সন্দেহ হয়। স্ত্রী বা ছেলেমেয়েরা যখনই এ-কথাটা অভিযোগের সুরে বলে, গিরিজাপ্রসাদের বুকে কাঁটার মত বেঁধে। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়।

নিভাননী বড় ছেলের কাছে কাঁদুনি গেয়ে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। গ্রামের আবহাওয়ায়, গিরীনের ব্যবহারে টিকতে পারছেন না, মেয়ে দুটির পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে,

বিমলার বিয়ে। এতদিনে এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে বড় ছেলে। গিরিজাপ্রসাদ তার জন্যে মনে মনে চটেছেন। তিনি কি সত্যিই বুড়ো বয়সে সকলকে নিয়ে তার ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসতে চান ? তা নয়। তবু একটু সহানুভূতি আশা করেছিলেন। গিরীনকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন। নিজের ছেলেই যখন জীবনের ঋণ ভুলে যেতে চায়, তখন গিরীনকে দোষ দিয়ে কি হবে ! আবার কখনও নিভাননীর অভিযোগের উত্তরে বলেছেন, ছেলে তোমার যা মাইনে পায়, এ-বাজারে নিজের সংসারই চালাতে পারে না, তার ওপর...

নিভাননী বিশ্বাস করেননি, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না তাঁর।

গিরিজাপ্রসাদেরই কি পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। মুখে যাই বলুন, ভিতরে ভিতরে বড় ছেলের বিরুদ্ধে তাঁরও অভিযোগ কম নেই। অভিযোগ আরও বেশি, বড় ছেলে রেলের চাকরিতে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেনি বলে। যেন উন্নতি করতে না পারা, মাইনে না বাড়ার অপরাধ তারই।

তাই বড় ছেলের চিঠি পেয়ে হঠাৎ খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন গিরিজাপ্রসাদ। এতদিনে উন্নতি হয়েছে তার, মাইনে বেড়েছে, আর তাই গিরিজাপ্রসাদকে তার কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে লিখেছে সে। গিরিজাপ্রসাদ চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবেন, তার আরও উন্নতি হলে হয়তো শেষ জীবনটা তার কাছেই কাটাতে পারবেন। এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হবে না। চাকরি-জীবনে ইস্কুল আর বাড়ি, বাড়ি আর ইস্কুল করতে করতে, কখনও ছাত্র পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে এক-এক সময় স্বপ্ন দেখতেন, অর্থপিষ্ট শহর-জীবনের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গ্রামে ফিরে আসবেন, ফিরে পাবেন সেই শৈশবের সুন্দর দিনগুলিকে। ভুল ভেঙে গেছে তাঁর, বুঝতে পেরেছেন, বনপলাশি বদলে গেছে, বনপলাশির মানুষ বদলে গেছে। এর গণ্ডি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আবার পালাতে চান। ভাবেন, এই রুদ্ধ আবহাওয়া থেকে পালাতে পারলেই মুক্তি।

কখনও-কখনও মনে হয়, শৈশবকেই ফিরে পেতে চান তিনি, শৈশবের গ্রামকে নয়। কিন্তু যা চলে গেছে, তা কি আর ফিরে পাওয়া যায় !

বড় ছেলের চিঠিখানা আরেকবার পড়লেন গিরিজাপ্রসাদ। তার ওপর মনটা খুশি হয়ে উঠল, দীর্ঘদিনের অভিযোগ মুহূর্তে মুছে গেল মন থেকে। এমনকি, গিরীনকেও ক্ষমা করতে ইচ্ছে হল।

সত্যিই তো, গিরীনের কি দোষ ? উপকার হয়তো করেছেন, বিষয়সম্পত্তির সব আয় তাকে ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু প্রতিদান কি চাননি ? সারাজীবনের কৃতজ্ঞতা চেয়েছেন তার কাছে। শুধু তিনি নন, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে—সকলেই যেন গিরীন আর গিরীনের স্ত্রীকে, তাদের ছেলেমেয়েদের কেমন একটা হীন চোখে দেখেছে। গিরিজাপ্রসাদ নিজেও তা টের পেয়েছেন। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি। উপকার পেয়েছে বলেই একটা পরিবারের কাছে আরেকটা পরিবার আজীবন দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকবে ?

কিন্তু উপকারই কি তিনি করতে চেয়েছিলেন ! গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই সন্দেহ হয়। উপকার, না নির্বিবাদে থাকতে চেয়েছিলেন ? সেই সস্তার বাজারেও যথেষ্ট রোজগার করেছেন, দিব্যি চলে গেছে সংসার। অথচ জমির আয় থেকে তখন কতই বা হত ! ক্যানেল ছিল না, ক্বচিৎ-কদাচিৎ ভাল ধান হত ! ক'টা টাকা আর পেতে পারতেন তখন ? অথচ তার জন্যে ঝামেলা পোয়াতে হত অনেক। আসলে কি নির্বিবাদে শান্তিতে থাকার জন্যেই সব কিছু ছেড়ে রেখেছিলেন ? গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই সন্দেহ হয়।

তাই বিমলার ব্যবহারে তিনি আহত হয়েছেন। গিরীনকে এভাবে সে অপমান করবে ভাবতে পারেননি। ফাটা দেয়ালটার মাঝখানে কাদা লেপে লেপে জুড়ে দিয়েছিল যতে কোটাল, গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফাটলটা আবার জেগে উঠেছে। সাপের মত কি

যেন একটা উঁকি দিচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন গিরিজাপ্রসাদ। ভাবেন, বিমলা যেন আসলে তাঁকেই অপমান করল।

কি এমন অন্যায় কথা বলেছে গিরীন। টিয়ার বিয়ে। গয়না-গাটির ডিজাইন জামা-কাপড় পছন্দ করে দিতে বলেছে—সে তো বিমলা শহরে মানুষ হয়েছে বলে, টিয়ার চেয়ে সে শিক্ষিত বলেই। তার রুচির মূল্য দিতে চেয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।

গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়ল, দেওঘরে থাকার সময়, পাশের বাড়ির একটি মেয়ের বিয়েতে নিভাননী আর তাঁর মেয়েরা কিভাবে সাহায্য করেছিল। দিনের পর দিন দোকানে দোকানে ঘুরেছে তাদের সঙ্গে। বিয়ের দিনের কাজকর্মের সব ভার নিয়েছিল মাথা পেতে। অথচ...

বিমলার মনের তো খবর রাখেন না তিনি। কি করে বুঝবেন, কেন এমন অশিষ্ট উত্তর দিয়ে বসেছে বিমলা।

রূঢ় স্বরে কথাটা বলে ফেলে একটু অনুশোচনা বোধ করেছে বিমলা, তবু নিজের মনকে বোঝাতে চেয়েছে, কিছুই অন্যায় করেনি। আর যতই ভেবেছে ততই মনে মনে টিয়ার ওপর রাগ হয়েছে। যেন সব দোষ টিয়ার।

বিমলাও তাই বনপলাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে। যেন এ গ্রাম ছেড়ে যেতে পারলেই বুকের গোপন জ্বালাটুকু নিভে যাবে।

অথচ প্রথম প্রথম যখন এসেছিল ওরা, সেই প্রথম লগ্নের রঙিন চোখে বনপলাশিকে ভালবেসে ফেলেছিল সে। উন্নাসিক তাচ্ছিল্যে যদিও তাকিয়ে দেখেছে গ্রামটাকে, গ্রামের মানুষদের, তবু কোথায় যেন নিজেকে এদের চেয়ে এক ধাপ ওপরের মানুষ মনে হয়েছে। বুঝি বা ঈষৎ অহঙ্কার। তাই দু'দিনেই শহুরে সঙ্কোচটুকু ঝেড়ে ফেলে মুক্ত বিহঙ্গের মত মাঠে মাঠে, পুকুরধারে, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর একদিন জীবনের প্রথম রোমাঞ্চের মত এসেছে প্রভাকর। আর সঙ্গে সঙ্গে বনপলাশিকে গভীর অন্তরঙ্গতায় ভালবেসেছে সে।

কিন্তু যে টিয়াকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে, কৃপার দৃষ্টিতে দেখত বিমলা, সেই টিয়াই যেন এনে দিয়েছে সবচেয়ে বড় অপমান। একা নির্জনে বসে থাকতে থাকতে কোনওদিন নিজেকে বড় বেশি অসহায় মনে হয়েছে তার, মনে হয়েছে টিয়া যেন তাকে হারিয়ে দিয়েছে। টিয়ার খুশি-খুশি মুখ, হাসি, কথা, আনন্দের মধ্যে একটা তীব্র তাচ্ছিল্য দেখতে পেয়েছে বিমলা। কিংবা নিজের মনেই গড়ে নিয়েছে। আর টিয়া যতই খুশি হয়েছে, হেসেছে, আগের চেয়ে স্পষ্ট গলায় কথা বলেছে, ততই ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছে বিমলা—টিয়ার বিরুদ্ধে, গিরীনের বিরুদ্ধে, মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে। যেন বিমলার বিরুদ্ধে তারা সকলে মিলে চক্রান্ত করছে।

এই চাপা রাগটাই হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

সেদিন যখন মেয়ে দেখতে এল প্রভাকরের বাবা, নিভাননী বলে বসলেন, তোর সেই সবুজের ওপর সাদা সাদা বুটি—ঢাকাইখানা পরিয়ে দে বিমলা, সাজিয়ে দে টিয়াকে।

কথাটা চাবুকের মত এসে লেগেছিল। তবু কিচ্ছু জানতে দেয়নি বিমলা। মুখ বুজে সত্যিই ভাল করে সাজিয়ে দিয়েছিল টিয়াকে। কুঁচিয়ে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিল, মুখে পাউডার ঘসে দিয়েছিল। আর টিয়াকে অনভ্যস্তের মত সেই পোশাকে প্রসাধনে জবুথবুর মত হাঁটতে দেখে হাসি চাপতে পারেনি। ভেবেছিল, মেয়ে পছন্দ হবে না শেষ অবধি।

মোহনপুরের বউও হেসেছিল। কিন্তু সে-হাসি আদরের, স্নেহের চোখে মেয়েকে দেখে।

বিমলাকে তাই মোহনপুরের বউ বলেছিল, দেখি তোমার সাজানোর পয়া আছে কিনা,

এর আগে দু'বারই তো আমি সাজিয়ে দিয়েছিলাম, দু'বারই হল না। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল মোহনপুরের বউ।

তারপর এক সময় বিমলা শুনল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে। টিয়াকে পছন্দ হয়েছে ওদের।

মোহনপুরের বউ বর্ধমান থেকে আনা একটা রসগোল্লা নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলেছিল, নে, হাঁ কর বিমলা। বলে বিমলার মুখে জোর করে রসগোল্লাটা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, না, সত্যিই তোর সাজানো খুব পয়া।

রসগোল্লাটা খাওয়াতে গিয়ে মোহনপুরের বউয়ের পা ঠেকে গেল বিমলার পায়ে। তাই অভ্যাসবশেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে বিমলা, কিন্তু মুখের মধ্যে রসগোল্লাটা তখন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মোহনপুরের বউ অতশত বুঝল না, তাই বিমলা পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই মোহনপুরের বউ হাসতে হাসতে বিমলার চিবুক ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললে, আশীর্বাদ করি, রাঙা টুকটুকে বর হোক তোরও।

শুনে টিয়া আর কমলা দু'জনেই সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর মনের ভিতরটা যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল বিমলার। ফ্যাকাশে অপ্রতিভ মুখে ও শুধু মোহনপুরের বউয়ের দিকে একবার তাকাল, তারপর সরে গেল সেখান থেকে।

আজ গিরীনকেও রূঢ় স্বরে জবাবটা দিয়েই সরে গেল বিমলা। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা দাহ বোধ করলে।

সেদিন মা যখন টিয়াকে সাজিয়ে দিতে বলেছিল, তখন যতখানি রাগ হয়েছিল, সেই চাপা রাগটাই আজ প্রকাশ হয়ে পড়ল টিয়ার বিয়ের জন্যে বাজার করতে যেতে হবে শুনে।

ধীরে ধীরে খামারবাড়ির পাশ দিয়ে গোয়াল ঘর পার হয়ে গোড়ের ধার ঘেঁসে যেতে যেতে বাঁশঝাড় থেকে একটা কঞ্চি ভেঙে নেবার চেষ্টা করলে বিমলা। পারল না।

রাগটা যেন আরও বেড়ে গেল। কঞ্চিটা নিয়ে সাপাং-সপাং করে মাটির ওপর কিংবা সাদা ফুটফুট বাছুরটার গায়ে বসিয়ে দিতে পারলেও যেন আনন্দ পেত।

দাঁতে দাঁত চেপে একটা অন্ধ আক্রোশে ইস্কুল-বাড়িটার দিকে পা বাড়াল বিমলা।

একটা ঝকঝকে নতুন ইস্কুল-বাড়ি। নতুন টেবিল আর বেঞ্চি দিয়ে সাজানো। তবু নিঃস্ব—ছাত্র নেই, শিক্ষক নেই। ঠিক যেন বিমলার মতনই। বিমলার বুকের ভিতরটার মত, সব থেকেও শূন্যতার গ্লানি।

ইস্কুল-বাড়ির বারান্দায় চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল বিমলা। তারপর নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়িয়ে দূরের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে শুরু করল।

সমস্ত মন যেন বিষিয়ে আছে। গোড়ের পাড় থেকে একটা নালার মত কাটা খাল চলে গিয়েছে মাঠের দিকে। পচা কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরটার দিকে একবার ফিরে তাকাল বিমলা। নালার দুর্গন্ধময় পাঁকের দিকে।

ধান কেটে নেওয়া ন্যাড়া মাঠের নিঃস্বতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে বিমলা। ধানের নাড়াগুলো পায়ে লাগে থেকে থেকে।

তাই আলপথে উঠে এল বিমলা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা মাঠের পুকুরের ধারে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তন্ময়তা ভেঙে গেল।

পুকুরপাড়ে বেশ খানিকটা জায়গা বাবলা কাঁটার বেড়া দিয়ে বেগুন আর ঝিঙে লাগিয়েছে। হলদে রঙের ঝিঙে ফুল ঘিরে ফড়িং উড়ছে। বেগুনের ক্ষেতে বেগুনি রঙের ফুল আর কচি কচি বেগুন ধরেছে।

এর আগে একদিন কমলার সঙ্গে এদিকে এসেছিল বিমলা। ঝিঙে ফুলগুলো কি সুন্দর

লেগেছিল। দু'বোনে হুটোপুটি করে ফড়িং ধরার চেষ্টা করেছিল। আজ কিন্তু খেতটুকুর দিকে তাকিয়ে বিমলা ফুল দেখতে পেল না, ফড়িং দেখতে পেল না, শুধু বাবলা কাঁটাগুলোই চোখে পড়ল।

অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর আবার ধীরে ধীরে ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

ইস্কুল-বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখলে, কে একজন এগিয়ে আসছে।

পদ্ম।

দ্রুত পায়ে পদ্ম কাছে এগিয়ে এল, চোরা চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলে পদ্ম। বললে, কোন্ দিক পানে গেছ্‌লে গো দিদি। তোমার নেগে একটা খপর এনেছি যে!

বলেই প্রভাকরের চিঠিটা বের করে বিমলার হাতে দিয়ে হাসি চাপল পদ্ম। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত পায়ে চলে গেল।

বিমলা প্রথমটা বুঝতে পারেনি কার চিঠি, কে দিয়েছে।

তারপর চিঠিটা পড়ে যেন সারা শরীর জ্বলে উঠল তার। চিঠিটা ছিঁড়ল, আবার ভাঁজ করল, আবার...

চিঠির টুকরোগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল একে একে।

এর আগে টিয়ার নামে কখনও কোনও চিঠি আসেনি। কেউ কখনও চিঠি দেয়নি টিয়াকে।

গ্রামে ডাকপিওন আসে শুধু বুধবার আর শনিবার। কখনও-কখনও গ্রামের লোককে দেখতে পেলে তার হাতেই চিঠি বিলি করে দেয় জনপুরের পোস্টমাস্টার। বিটের দিন অবধি অপেক্ষা করতে হয় না।

চাটুজ্যেদের পশ্বে গিয়েছিল হংসর কোনও চিঠি আছে কিনা খোঁজ নিতে। অবনীমোহনের বাড়িতে থাকে হংস, ছেলে পড়ায় তার, আর চাকরি করে। ধানের দর উঠছে, ধান বেচে দেবে কিনা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে পশ্বে। তাই উত্তরের আশায় জনপুরে গিয়েছিল সে।

ফিরে এল টিয়ার নামে একখানা খামের চিঠি নিয়ে।

এসে হাঁক দিলে, টিয়া, তোর একখানা চিঠি আছে রে। বলে হাসল।

আর মোহনপুরের বউ ছুটে এল সেকথা শুনে। বললে, কে, পশ্বে ঠাকুরপো! কার চিঠি বললে?

—টিয়ার।

—টিয়ার? কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা ভয়ে আবার প্রশ্ন করলে মোহনপুরের বউ। তারপর হাত বাড়িয়ে বললে, কই দাও।

টিয়া পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ও বেচারীও ভয় পেয়ে গেল। তার নামে চিঠি? এতদিনের মধ্যে কই, কেউ তো চিঠি দেয়নি ওকে? তবে!

মোহনপুরের বউ চিঠিখানা নিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল। খামটা খুলে চিঠিটা পড়ল। আর সারাক্ষণ বুক দুরদুর করল টিয়ার।

চিঠি পড়তে পড়তে মুখে হাসি দেখা দিল মোহনপুরের বউয়ের। হাসিমুখে টিয়াকে বললে, তোর চিঠি।

মা'র মুখে হাসি দেখে আতঙ্ক দূর হল টিয়ার, কিন্তু বিস্ময় কাটেনি তখনও।

মোহনপুরের বউও যেন এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। চিঠিটা টিয়ার হাতে

দিয়ে মৃদু হেসে বললে, যাক্‌ বাবা, এখনও বুক টিপটিপ করছে। যা ভয় হয়েছিল।

মা'র কথাটা বুঝি টিয়ার মনেরই প্রতিধ্বনি। ভয় কি ওরই কম হয়েছিল!

টিয়ার চোখ এতক্ষণ চিঠির নীচে লেখা নামটা ছুঁয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। রেণুদি—রেণুদির চিঠি!

মোহনপুরের বউ প্রশ্ন করলে, কি লিখেছে রে রেণু? আসবে লিখেছে?

আসলে মা যে আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়েনি, হরফগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেছে শুধু, আতঙ্কের বা আপত্তিকর কিছু আছে কিনা তারই খোঁজে—কি লিখেছে সেটুকুও ভালভাবে দেখেনি—টিয়া বুঝতে পারল।

ও চিঠিখানা নিয়েই ছুটে পালাল। মা'র ব্যাপার-স্যাপার দেখে, নিজের বুক দুরদুর করার কথা ভেবে ওর ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

রান্নাঘরের পৈঠেতে পা ঝুলিয়ে বসে বার বার চিঠিটা পড়ল টিয়া। খুঁটিনাটি অনেক খবর লিখেছে রেণুদি, ফিরু কথা বলতে শিখেছে, কত নতুন নতুন কথা বলে, দাদার দোকান, রাঙাবৌদির অসুখ—অনেক অনেক কথা।

চিঠি পড়তে পড়তে মুহূর্তে টিয়ার মন চলে যায় দামুদাদার সেই ছোট্ট দু-কুঠরি ঘরখানায়, ফিরুর কথা মনে পড়ে, ফিরুর মুখখানা, রেণুদির সেই চোখ ছলছল দীর্ঘশ্বাস, টিকলিটা তোকেই দিলাম টিয়া, বিয়েতে হয়তো আসা হবে না!

নিজের বিয়ের খবরেও টিয়ার মন এতখানি খুশিতে ভরে ওঠেনি।

মাকে রান্নাঘরের দিকে আসতে দেখে টিয়া বললে, মা, বিয়ের বাজার করতে যাবে যখন বদ্দমানে, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

মা হেসে উঠল।—তুই যাবি না তো কে যাবে। তোকে নিয়ে যাব না, শেষে কি সারাজীবন গালাগালি খাব তোর কাছে। বলবি হয়তো, মা সব বাজে বাজে জিনিস দিয়েছে।

বলে হাসল মোহনপুরের বউ। বললে, আর তো দু-দশটা দিন, তারপর তো মা-বাপের দোষ দেখবি শুধু।

—দেখবে! আপত্তির সুরে বললে টিয়া। তারপর ধীরে ধীরে খিড়কির দরজা পার হয়ে পুকুরঘাটে ফেলে রাখা তালগাছের গুঁড়িটার উপর বসল জলে পা ডুবিয়ে।

কি সুন্দর ঠাণ্ডা ছায়া এখানটায়। রোদ উঠেছে, তাপ বেড়েছে রোদ্দুরের, কিন্তু বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ভিজে আছে পুকুরের ঘাটটুকু। আর পুকুরের ঘোলা জলে ছায়া দুলছে, ফাঁকে ফাঁকে ফালি ফালি রোদ পড়েছে জলের ওপর। ঠিক উল্টো দিকের ঘাটে স্নান করতে নেমেছে বাউড়িপাড়ার ক'টা বউ, গুপ্তদের বড় বউ পাড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কাঁখালে ঘড়া নিয়ে। টিপকলের জল আনতে যাচ্ছে বোধ হয়।

টিয়াকে দেখতে পেয়ে বাউড়িদের মেয়ে ক'টা কি যেন বলাবলি করে হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। আর গুপ্তদের বড় বউ চিৎকার করে কি বললে। কিছু একটা রসিকতা হয়তো। টিয়া শুনতে পেল না, শুধু হাসল। কথাটা বুঝতে না পারলেও এটুকু হাবেভাবে প্রকাশ পেল, গুপ্তদের বড় বউ কিছু একটা ঠাট্টা করেছে।

টিয়া তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, ওধারে রাস্তা দিয়ে গোপেন মোড়লকে যেতে দেখে গুপ্তবউ ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

তারপর ধীরে ধীরে জল আনতে চলে গেল সে।

টিয়ার মনটা আজ ভীষণ খুশি-খুশি লাগছে। কারও সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে কেবল। টিয়া হঠাৎ ঘাট থেকে উঠে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, মা, আসবার সময় একবার রেণুদিদের সঙ্গে দেখা করে আসব, কেমন?

বলেই শব্দ শুনে ফিরে তাকাল জ্যাঠাদের বাড়ির দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখোচোখি হল বিমলার সঙ্গে। টিয়ার দিকে তীব্র একটা জ্বালাময় দৃষ্টি হেনেই পাঁচিলের আড়ালে ঢুকে পড়ল বিমলা।

আর টিয়া উদ্দেশ্যহীন চোখে সেদিকেই তাকিয়ে রইল। উচ্ছে গাছটা লতিয়ে লতিয়ে যেখানে পাঁচিল বেয়ে উঠেছে সেদিকে। একটা কি সুন্দর রঙিন প্রজাপতি পাখা মেলে বসে আছে। নড়ছে না।

মা দেখতে পেলেই সিঁদুর এনে ঠেকাতে চাইবে প্রজাপতিটার গায়ে।

টিয়ার ইচ্ছে হল মাকে ডেকে দেখায়। লজ্জায় বলতে পারল না।

ছত্রিশ

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই গিরীনের মনে। কিছু কিছু বাজার সারা হয়েছে, গয়নাগাটি গড়াতে দেওয়া হয়েছে স্যাকরাবাড়িতে ; নগদ পণও দিয়ে আসা হয়েছে।

তবু মনটা খুঁতখুঁত করে। আগেকার দিন হলে এত দুশ্চিন্তা ছিল না, দু'জন সাক্ষীর সামনে টাকাটা দিলেই চলত। কোনও কারণে যদি বিয়ে ভেঙে যেত তো মামলা করেও টাকা আদায় করা যেত। এখন আর সে উপায় নেই। পণ দেওয়া-নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আইন করে। কিন্তু সে আইন শুধু আইনের কেতাবেই। কাজের কাজ কিছুই হল না, উপরন্তু টাকা মারা যাবার ভয়। পণের টাকা নিয়ে অস্বীকার করলে মামলা করার উপায়টুকুও রইল না।

গিরীনের দুশ্চিন্তা দেখে হাসল মোহনপুরের বউ। বললে, দেশসুদ্ধ লোক তো পণও দিচ্ছে বিয়েও হচ্ছে, তোমারই যত ভয়। তা ছাড়া বেয়াই লোক ভাল, ও মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

গিরীন সান্ত্বনা পেল, কিংবা নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। বললে, তা ঠিক, তা ছাড়া অমন ছেলে যার...

—হীরের টুকরো ছেলে। বলে তৃপ্তিতে হাসল মোহনপুরের বউ।

আর তা শুনে টিয়া মুখ ফেরাল। মা'র মুখ থেকে কথাটা শুনে যেন বুকের ভিতর বেশ খানিকটা গর্ব অনুভব করল সে।

গর্ব হবারই কথা। রেণুদি সেই প্রথম যেদিন প্রভাকরকে দেখিয়ে ঠাট্টা করেছিল, সেদিন এমন সৌভাগ্যের কথা কল্পনাও করতে পারেনি টিয়া।

বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পর থেকে তাই রেণুদির কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে টিয়ার। বর্ধমানে বাজার করতে গিয়ে রেণুদিদের সঙ্গে দেখা করে আসার এত ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পারেনি। তাড়াহুড়োর মধ্যে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরতে ঘুরতে, গয়নাগাটির ডিজাইন পছন্দ করতে করতে কিভাবে যে সারাটা দিন কেটে গিয়েছিল!

রেণুদি আর রাঙাবৌদি আজ থাকলে দেখতে পেত মা কত বদলে গেছে। মা বদলেছে, না সে নিজেই! সত্যিই, এতদিন সে যে আছে, সংসারের এক প্রান্তে পড়ে থেকে মুখ বুজে কাজ করে, এ-সব যেন কারও চোখেই পড়ত না। শুধু মাঝে মাঝে বকুনি খেত টিয়া—শাসন আর শাসন। আর এখন সেই শাসনের গণ্ডি যেন ভেঙে গেছে। এখন সবকিছু তাকে ঘিরেই। তার পছন্দ-অপছন্দই যেন বড়। পুজোর সময় মনোমত একখানা শাড়ি চাইলেও বাবা ধমক দিত, আর এখন তাকে না জিগ্যেস করে এক পাও

এগোতে চায় না কেউ। কাপড়, গয়না, তেল, এসেন্স—সব, সব। শুধু একটা পছন্দের কথা তাকে কেউ প্রশ্ন করেনি—পাত্র পছন্দ হয়েছে কিনা। করেনি তাই রক্ষে। করলে কোন লজ্জায় উত্তর দিত সে ? দিতে পারত ? বাপ-মা'র পছন্দই তো তার পছন্দ। জেনেশুনে কোন বাপ-মা মন্দ পাত্রে মেয়ের বিয়ে দেয় !

ইদানীং তার খাওয়াদাওয়া যত্ন-আত্তির দিকেও যেন মা'র সদাসর্বদা চোখ আছে। সামনে বসিয়ে ঠিক বাবাকে যেভাবে খাওয়ায় মা, তেমনি করেই টিয়াকেও খাওয়ায়। বাটিতে দুধের পরিমাণ বাড়ছে, খেতে পারে না টিয়া, খেতে ইচ্ছে হয় না, তবু মা এমন করে যে, না খেয়ে উপায় নেই। যা কিছু ভাল, মাছের মুড়ো, দুধ, ক্ষীর, সন্দেশ—টিয়াকে খাইয়েই যেন শান্তি।

যত দেখে তত টিয়ার নিজেরই যেন লজ্জা করে। সারা গাঁ যেন ওর বিয়ের খবরে পাগল হয়ে উঠেছে। পাড়ার বউ-ঝিরা আসে, বসে, গল্প করে মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে, ঠাট্টা রসিকতা করে টিয়াকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

টিয়া শোনে আর হাসে। ভাল লাগে।

কেউ কেউ টিয়াকে আদর করে কাছে ডেকে বসায়, চুল বেঁধে দেয়।

কিন্তু খবরটা বোধ হয় একটু দেরিতে অট্টামার কানে গিয়েছিল। তাই ক'টা দিন তার দেখা মেলেনি।

খবরটা ডাক্তারের কাছে শুনেই ছুটতে ছুটতে এল অট্টামা, লাঠি ঠুক ঠুক করে ফোকলা মুখে একমুখ হাসি মেখে ভিতর-বাড়িতে এসে ঢুকল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসা মোহনপুরের বউ আর টিয়ার শাড়ি দুটোই হয়তো ছানিপড়া চোখে সাদা ফতফত করল। আন্দাজে আন্দাজে অট্টামা বললে, কি লা, মোনপুরের বউ নাকি ?

টিয়া নেমে এল দাওয়া থেকে, বললে, এসো গো অট্টামা। আসোনি কেন এ ক'দিন ?

অট্টামা হেসে অঙ্গভঙ্গি করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে, সেজেগুজে রইলাম, খোঁপা টনটনিয়ে মরলাম, তোর হয়েছে সেই দশা, না কি লো টিয়া ! বলি, এত ফুর্তি কিসের অ্যাঁ, বিয়ে কারও হয় না ?

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, বিয়েটা আগে হতে দাও অট্টামা, তারপর বোলো। যা দিনকাল...

অট্টামা টিয়াকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে, তারপর হাসতে হাসতে বলে, তোর ওই ভয়-ভয় রোগ ছাড় মোনপুরের বউ। হরি যার সখা বল, দুশমন তার পায়ের তল। নিজে অনেয্য কাজ করিস নাই কখনও, তোর অত ভয় কিসের ?

মোহনপুরের বউ হাসে। কোনও উত্তর দেয় না। সত্যিই তো, জীবনে জেনেশুনে কোনও অন্যায় করেনি মোহনপুরের বউ, ভগবান তাকে শাস্তি দেবেন কেন ? সেই জন্যেই হয়তো টিয়ার বিয়েটা এত চট করে হয়ে যাচ্ছে, এত ভাল পাত্রে।

অট্টামার মনেও তখন অসীম ফুর্তি। বলে, কই, তোর বেটা কই লো ?

ছোট ছেলে বিশু সামনে এসে দাঁড়ায় !

আর অট্টামা বলে, এইবার তোর বিয়ে। দে মোনপুরের বউ, মেয়ের বিয়ে দিয়েই বউ নিয়ে আয়।

সবাই হেসে ওঠে। আর বিশু লজ্জায় ছুটে পালায়। অট্টামা চিৎকার করে তার উদ্দেশে বলে, খেঁদানাকি বউ আনব তোর দেখিস...

বলেই টিয়াকে আবার বুকে চেপে ধরে বলে, সোনামুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়, খেঁদানাকি বউ এসে বাটায় পান খায়। তাই হবে তোর মোনপুরের বউ। ছেলের বউ

তোর ভাল হবে না, যা খুঁতখুঁতে পছন্দ তোর বেটার !

মোহনপুরের বউ আর টিয়া হেসে ওঠে। মোহনপুরের বউ বলে, ওর বিয়ে অবধি কি আর বেঁচে থাকব গো অট্টামা !

—ষাট। ষাট। অট্টামা বাধা দেয়। বলে, সে দুভ্‌ভাগ্য আমার, যমেও ভুলে গেছে। তা ভাবলাম, শেষ ক'টা দিন সম্পত্তির লোভে কে কি করে, ভাশুরের ছেলেদের বরং দিয়ে দিই...তা ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে, আমি পেলাম কাছে।

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, টিয়ার জামাকাপড় দেখবে না, নিয়ে এলাম বদ্দমান থেকে !

—ওমা, সব কেনাকাটা হয়ে গেছে ? আকাশ থেকে পড়ে অট্টামা। —চ, চ, দেখাবি চ।

বলে মোহনপুরের বউয়ের পিছনে পিছনে তেল সাবান, শাড়ি ব্লাউজ দেখতে ছোটে অট্টামা। আর সে-সব দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন ফুর্তিতে নেচে ওঠে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ছানিপড়া চোখের সামনে মেলে ধরে দেখে প্রত্যেকটি জিনিস, আর সমস্ত মুখে তার একটা আনন্দ ফুটে ওঠে।

তারপর এক সময় ধীরে ধীরে উঠে আসে অট্টামা। বলে, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এলে খবর দিস টিয়ে, তোর বিয়ে আমিই দিলাম, বুঝলি ? বুড়িকে ভুলিস না যেন।

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, কি যে বলো অট্টামা। তুমিই তো গোড়াপত্তন করলে...

—তাই হয় লো, তাই হয়। অট্টামা লাঠি ঠুক ঠুক করে গিরিজাপ্রসাদের ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল। বললে, ভক্ত বড় ভক্তি করে গুরু রইল বসে, গাছের আম গাছে রইল বোঁটা গেল খসে। কত দেখলাম...

টিয়া হেসে উঠল অট্টামার কথায়। মোহনপুরের বউও।

আর অট্টামা গিরিজাপ্রসাদের উদ্দেশে ডাক দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল পাঁচিলের ওপারে।

খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কে ও ? কাছে গিয়ে চিনতে পারল অট্টামা। বিমলে না ?

কিন্তু অমন মুখ থমথম করে একা একা দাঁড়িয়ে আছে কেন বিমলা ?

হেসে বলে, এমন মুখ গোমড়া ক্যানে বিম্‌লের ? হবে লো হবে, তোরও হবে। গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে।

বলে আবার কি বলতে যায় অট্টামা, কিন্তু তার আগেই কোনও উত্তর না দিয়ে অট্টামাকে পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় বিমলা।

বুকের মধ্যে একটা অসহ্য জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিমলা। বার বার প্রভাকরের চিন্তাটা মন থেকে তাড়াতে চায়, পারে না। বার বার ওই একটা কথাই মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—চাকের চারপাশে বোলতার মত। বুকের দীর্ঘশ্বাসটুকুও যেন বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায় না। ঘুম আসে না অনেক রাত অবধি।

প্রথম প্রথম এই জ্বালাটা বুঝতে পারেনি বিমলা। এমন অসহ্য লাগেনি গোপন হতাশাটুকু। তখন প্রভাকরের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশে জ্বলেছে শুধু। পেয়ে হারানোর দুঃসহ ব্যথা চাপা পড়ে গিয়েছিল উন্মত্ত ক্রোধের নীচে। ধীরে ধীরে কখন সেই ক্রোধ ম্লান হয়ে গেছে। তারপর দিনে দিনে ধাপে ধাপে টিয়ার বিয়ের খবর এসেছে। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, দেনা-পাওনা ঠিক হয়েছে, বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে, তারপর—তারপর পণের টাকাও দিয়ে এসেছে গিরীন।

আর তখন দু'চোখ ফেটে জল এসেছে তার। রাগ হয়েছে নিজের ওপর। নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর। বুঝতে পেরেছে, প্রভাকরের ওপর অভিমানে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে

কি ভুল করেছে সে। সেই প্রথম যেদিন ডাক্তারকে ডাকতে গিয়েছিল বিমলা, আর গিয়ে দেখা হয়েছিল প্রভাকরের সঙ্গে, সেদিন হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল প্রভাকর, কিছু বলার ছিল তার। কিন্তু তাকে কথা বলার কোনও সুযোগই না দিয়ে দ্রুত পায়ে পালিয়ে এসেছিল সেদিন। তারপর পদ্ম এসেছে প্রভাকরের চিঠি নিয়ে, তখনও সে-চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে মনের জ্বালা নিবোতে চেয়েছে বিমলা।

পরের দিন পদ্ম আবার এসেছে। অনুরোধ করেছে প্রভাকরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আর তা শুনে ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছে বিমলা, যে পদ্ম আর কোনও কথাই বলতে সাহস পায়নি।

কিন্তু তারপর থেকেই সমস্ত বুক যেন ভেঙে পড়তে চেয়েছে। সব অভিমান, সব ক্রোধ ধুয়ে-মুছে গেছে। ইচ্ছে হয়েছে প্রভাকরের কাছে ছুটে যেতে, ক্ষমা চাইতে, নতুন করে জীবন শুরু করতে। দুর্জয় একটা সাহস হঠাৎ কোত্থেকে যেন তার বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

অট্টামার কাছ থেকে সরে এসে বাইরে মারইতলার নির্জন নিঃশব্দ প্রাঙ্গণে এধার থেকে ওধার অবধি বার কয়েক পায়চারি করেছে বিমলা অধীর পদক্ষেপে। তারপর হঠাৎ অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে—পদ্মর উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে।

না, এখন আর কোনও কিছুকে ভয় পায় না বিমলা। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে নিতে চায়। এভাবে ভাগ্যের হাতে নিজের জীবনকে ছেড়ে দিয়ে থাকতে চায় না। মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে নেয় বিমলা। যাবে সে, পদ্মর সঙ্গে দেখা করবে, তারপর...

হ্যাঁ, পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে বলগাঁ পার হয়ে বি ডি ও আপিসের দিকে। প্রভাকরের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করে আসবে। বোঝাপড়া? নিজের মনেই হাসে বিমলা। না, টিয়ার কাছ থেকে প্রভাকরকে ছিনিয়ে নেবে সে। সে আত্মবিশ্বাস আছে তার। টিয়ার মত বাপ-মা'র মুখ চেয়ে জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাগ্যের হাত থেকে ভিক্ষা পেতে চায় না। অট্টামা তাকে সান্ত্বনা দেয়, পাড়াপড়শিরা করুণার চোখে দেখে...

নিজের মনেই হাসল বিমলা। হঠাৎ যেন অসীম এক দুঃসাহস তার বুকের মধ্যে ভর করেছে।

দুপুরের নির্জন রাস্তা ধরে দ্বিপ্রহরের দুঃসহ রোদ্দুরকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে বিমলা। শান্ত নিস্তব্ধ দুপুর। ছায়া-ভেজা আঁকা-বাঁকা পথ। ঘুঘুর অবিরাম ডাক। নিথর বাতাসে হঠাৎ এক দমকা ঠাণ্ডা বাতাসের স্নিগ্ধ প্রলেপ। রুক্ষ খেজুর গাছের সারি, বাদামি রঙের দেশি খেজুরের থোকা। পুকুরপাড়ে বনফুলের ঝোপ। দু-একটা শালিক ফিঙে উড়ে যায় থেকে থেকে। দুপুরের এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য কতদিন উপভোগ করেছে বিমলা, নতুন দীঘির পাড়ের বকুল গাছটার ছায়ায় বসে বসে। কিন্তু, না, আজ এসবের দিকে দৃষ্টি নেই তার।

উন্মাদের মত অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির পথ ধরে এগিয়ে চলে বিমলা। একটা নেশার আকর্ষণে।

হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে ফিরে তাকায় বিমলা, পিছনে ভারী পায়ের শব্দ শুনে। আর স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে।

টলতে টলতে পাগলের মত এগিয়ে আসছে উদাস। কোটালপাড়ার বংশী দাসের ছেলে উদাস।

বিমলাকে ছাড়িয়ে টলতে টলতে উদাস চলে গেল—ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল বিমলা। কেমন যেন ভয় ভয় করল তার উদাসের দিকে তাকিয়ে।

ভয় পাবারই কথা।

একটা নৃশংস খুনির মত জ্বলছে উদাসের চোখজোড়া। কিন্তু কেন?

চাওয়া-পাওয়ার হিসেবের মধ্যে চিরকালই বুঝি একটা গরমিল থেকে যায়! মানুষ কি চায় নিজেই হয়তো বুঝতে পারে না। গ্রাম্য তুচ্ছতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল উদাস। স্বপ্ন দেখেছিল শহরে যাবার। যেখানে কোটাল বলে কেউ তাকে হেয় করবে না, গুপ্তদের বাড়িতে বাগালের কাজ করাকেই সারা জীবনের একমাত্র ভবিষ্যৎ বলে মেনে নিতে হবে না। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে আজীবন মাঠে লাঙল চালানোকেই একমাত্র সাধনা ভাবতে দেবে না।

সরকারি কৃষি-পুরস্কারের কথা শুনে হেসেছিল উদাস। রাগ হয়েছিল বাবুদের ওপর।

কি ভাবেন সব শহুরে বাবুরা? বাউড়ি বাগদি কোটালের ঘরের ছেলেরা জীবন সার্থক মনে করবে আরও বেশি ধান ফলিয়ে? জেলের ছেলে আরও বেশি মাছ ধরবে? ডোম আরও ঝুড়ি বুনবে?

তবে আর আগের দিনের মানুষ বদলেছে কোথায়! না, আরও বেশি ধান ফলিয়ে কৃষিপণ্ডিত হতে চায় না উদাস। সে চায় শহরে থেকে শিক্ষিত হতে, বাবুদের মত চাকরি করতে। কই কেরানিবাবুর ছেলে আরও ভাল কেরানি হোক, এমন কথা তো বলে না কেউ। তারা তো চায় ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে। তবে?

ইস্কুলে পড়ার সুযোগ পায়নি উদাস, তাই নেশা জেগেছিল তার—ড্রাইভার হবে, বাস চালাবে, সব জাতের মানুষের ভিড়ে নিজের জাত, গ্রাম্য সংস্কার, দারিদ্র্যকে আড়াল করে দেবে।

তাই লক্ষ্মীমণিকে বিয়ে করেছিল উদাস। তার বাপ দশরথকে খুশি করতে চেয়েছিল লক্ষ্মীমণির মত মেয়েকে বিয়ে করে। ভাবেনি পরিবর্তে কি মূল্য দিতে হবে তাকে।

তারপর সেই পদ্ম এল, লক্ষ্মীমণি চলে গেল। কিন্তু লক্ষ্মীমণি এমনভাবে না গেলে হয়তো পদ্মকে হারাত না সে। তার চেয়েও বড় অভিমান তার পদ্মর বিরুদ্ধে। মনে হয় পদ্ম তার জীবনে এ-ভাবে না এলে হয়তো জীবনটা এত অসুখী হত না। হয়তো—হয়তো কেন, লক্ষ্মীমণিকে সত্যিই তো ভাল লেগেছিল উদাসের। হয়তো আবার তাকে নিয়ে শান্তির সংসার গড়ে তুলতে পারত।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর কাটোয়ার অন্ধকূপ ঘরখানায় ফিরে এসে ক্লান্ত জীবনের একাকিত্বে লক্ষ্মীমণিকে মনে পড়ত তার। যত মনে পড়ত ততই রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হত পদ্মর ওপর।

মদের নেশায় সব দুঃখ আর ক্লান্তি দূর করতে চাইত উদাস। এক এক সময় পদ্মর কাছে, বনপলাশি গাঁয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে হত তার।

ছুটে গিয়েছিল একদিন। আর পদ্মর সেই প্রত্যাখ্যান তার বুকে এসে বিঁধেছিল, তর্জনী তুলে শাসিয়ে এসেছিল উদাস।

আজ আবার মদের নেশায় ডুবে থাকতে থাকতে সেই অপমানের কথাটা নতুন করে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর যৌবনদেহের প্রতি একটা মত্ত কামনায় দগ্ধ হল উদাস। তীব্র সে জ্বালা, তীব্র তার উদ্দীপনা।

কল্পনার চোখে পদ্মর সেই ছন্দোময় শরীরকে অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন পেতে চাইল উদাস। যে উদ্দাম কোমলতাকে একদিন স্পর্শের উত্তাপের ঘনিষ্ঠতায় পেয়েছিল সে, তাকে চিরদিনের জন্য হারানোর ব্যর্থতার জ্বালা বুঝি অনেক বেশি।

পদ্মর মন হয়তো তার ওপর থেকে সরে গেছে। হ্যাঁ, যতে কোটালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার, শুনেছে উদাস। শুনেছে, খোঁড়া ডাক্তারের সঙ্গে পদ্মর নাম-জড়ানো

দুর্নাম। আর, তাই মনে মনে রাগে জ্বলে উঠেছে উদাস। পদ্মর মন যেখানে থাকে থাকুক, তার যৌবনের শরীরকে ভেঙে নিঙড়ে গুঁড়ো করে পিষে দিতে ইচ্ছে হয়েছে।

একটা উন্মত্ত লালসা তাকে বনপলাশিতে টেনে নিয়ে গেছে। মদের নেশায় টলতে টলতে অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে সে।

তারপর...

ডাক্তারের ঘরের বারান্দায় মধ্যদুপুরের ফুরফুরে হাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিল পদ্ম। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোর এসেছিল চোখের পাতায়। প্রভাকরের জিপে ডাক্তার বেরিয়ে গেছে কি একটা কাজে। নিঃশব্দ নির্জন মধ্যাহ্নে শুয়ে ছিল পদ্ম।

হঠাৎ ভারী পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকাল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে হেসে উঠল উদাস। পাগলের মত উৎকট হাসি দেখে আতঙ্কে উঠে দাঁড়াল পদ্ম। ভয় ভয় চোখে তাকাল সে উদাসের দিকে।

—বোনাই, তুমি? চোখে আতঙ্কের অশ্রু দেখা দিল। পদ্ম অনুনয়ের স্বরে বললে, আবার ক্যানে এলে বোনাই। এসো না, আমার নেগে আর এসো না বোনাই।

সশব্দে আবার হেসে উঠল উদাস।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ক্রূর নৃশংস দৃষ্টিতে বললে, সে ন্যাংড়া ডাক্তারটা কোথায় আছে দেখিয়ে দে ক্যানে। আর আসব না তোর নেগে।

বলেই কোমর থেকে কি একটা টেনে বের করলে উদাস। পদ্ম ভয়ে কেঁপে উঠল সেদিকে তাকিয়ে।

একটা ধারালো বিঘতখানেক লম্বা ছুরি চকচক করে উঠল উদাসের হাতে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে যেতে লাগল পদ্ম।

উদাস যেন আজ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। একটা নৃশংস খুনির মত জ্বলছে তার চোখ দুটো। রোদের ছটা লেগে উদাসের হাতে ধারালো ছুরিটা ঝকমক করে উঠল।

আবার হেসে উঠল উদাস, বললে, সে ডাক্তারটা কোথায় আছে ডাক ক্যানে তাকে। তোর নেগে আসি নাই রে পদ্ম, তোর নেগে আসি নাই।

ছুরিটা উঁচিয়ে ধরে এক পা এক পা করে পদ্মর দিকে এগিয়ে গেল উদাস। আর ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল পদ্ম।

তা শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল উদাস, তারপর ছুরিটা দূরে ফেলে দিয়ে পদ্মর উদ্দাম লুব্ধতার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা কামার্ত পশুর মত।

অনুনয়ের স্বরে পদ্ম তখনও বলছে, ডাক্তার মানুষটা ভাল গো বোনাই, আমার নেগে ওকে মেরে ফেলবে ক্যানে, বলো, বলো তুমি।

উদাসের মুখে তবু কোনও উত্তর নেই।

পদ্ম আবার বললে, কি চাও তুমি বলো ক্যানে বোনাই। তুমি যা কইবে আমায়, ডাক্তারকে তুমি মেরো না গো। অনুনয়ের স্বরে বলতে বলতে চোখ বেয়ে জল নামল পদ্মর!

উদাস মৃদু হেসে বললে, চ তবে আমার সাথে কাটোয়ায় চ, যাবি?

—চলো। তোমার সাথেই যাবো আমি, চলো বোনাই।

বলে অনুরোধের উত্তাপ দিয়ে উদাসের হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরল পদ্ম। ধীরে ধীরে বললে, ডাক্তার মানুষ ভালো গো বোনাই। মানুষ ভাল বটে।

সাঁইত্রিশ

সেদিন দূর থেকে উদাসকে টলতে টলতে ডাক্তারের বাড়ির দিকে যেতে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল বিমলা। আর সঙ্গে সঙ্গে তার গোপন মনের ক্ষীণ আশাটুকুও উবে গিয়েছিল।

সেই বিমলাকে আজ যেন চেনাই যায় না। কুমির সঙ্গে হাসাহাসি, ঝগড়া, খুনসুটি করে যে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত নির্ভয়ে, লাজলজ্জা ভয়ডর জানত না, তার মুখ-চোখ দেখে নিভাননীও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গিরিজাপ্রসাদ ভাবলেন, কোনও একটা কঠিন অসুখ বাধিয়ে বসেনি তো!

হ্যাঁ, অসুখ। তবে মনের অসুখ। ক্রমে ক্রমে টিয়ার বিয়ের দিনটা এগিয়ে এসেছে। একটার পর একটা খবর এসেছে, এমন কি গিরীন টিয়া আর মোহনপুরের বউকে নিয়ে যেদিন বিয়ের বাজার করতে গেছে, সেদিনও একটা ক্ষীণ আশা পুষে রেখেছিল বিমলা। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়েছে একটা অভাবনীয় কিছু ঘটে যাবে। হয়তো প্রভাকরের সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে যাবে তার। যদি সত্যিই দেখা হয়! বার বার প্রভাকর তার কাছে এগিয়ে আসতে চেয়েছে, পদ্মর হাতে চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে চেয়েছে। কিন্তু অন্ধ অভিমানে প্রভাকরকে তার জীবন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে বিমলা।

তারপর হঠাৎ এক সময় ভুল বুঝতে পেরেছে সে, দু'চোখ ঠেলে জল এসেছে তার। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে বিমলা। বুঝতে পেরেছে, ভিতরে ভিতরে কখন তার সমস্ত বুক ব্যথায় ব্যর্থতায় নিঃস্ব হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছে, প্রভাকরকে বাদ দিয়ে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

অধীর আবেগে তাই পদ্মর কাছে ছুটে গিয়েছিল বিমলা। কিন্তু পারল না, উদাসকে দেখে ভয়ে ফিরে এল।

ভাবলে, একাই পালিয়ে গিয়ে দেখা করবে প্রভাকরের সঙ্গে। তারপর প্রভাকরের সঙ্গেই জীবনের পথে পাড়ি দেবে, সব দুর্নাম তুচ্ছ করে। বাবা-মা ভাইবোন সকলকে মুছে ফেলে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই হতাশায় আশঙ্কায় মুসড়ে পড়ে বিমলা। যদি প্রভাকর তাকে ফিরিয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে একদিন প্রভাকরকে ও ফিরিয়ে দিয়েছে?

সমস্তক্ষণ ওর মনের মধ্যে একটা বোলতা গুনগুন করে, একটা অসহ্য জ্বালা। একটা চাপা ব্যথা গুমরে মরে।

সকলেই লক্ষ করে। নিভাননী ভাবেন, টিয়ার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বলেই হয়তো মেয়েটা এমন মুসড়ে পড়েছে। পাঁচজনে কি বলবে, কি ভাববে, তাই ভয়।

গিরিজাপ্রসাদ ভাবেন, বড় ছেলে তাঁদের যেতে বলেছে, বিমলাকেই পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। সেখানে কেউ তাকে বার বার মনে পড়িয়ে দেবে না তার বিয়ের কথা। শহরে বাজারে এর চেয়ে অনেক বেশি বয়স অবধি তো বিয়ে হয় না। পড়াশুনো বন্ধুবান্ধব নিয়ে ভুলে থাকতে পারে তারা।

মোহনপুরের বউ দেখে দূর থেকে, বিমলার জন্যে একটু দুঃখও হয়। আহা বেচারী, মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে, ছোট বোন টিয়া, তার সামনেও মুখ তুলে তাকাতে লজ্জা। অথচ বিমলার কি দোষ; বাপ-মা যদি উঠে পড়ে বিয়ের জন্যে না চেষ্টা করে, পণের টাকা না বের করতে চায়!

প্রথম প্রথম মোহনপুরের বউও ভেবেছিল, টিয়ার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, বিমলার বিয়ে হল

না, এই দুঃখেই মেয়েটার এমন চেহারা হয়েছে। কিন্তু ক্রমশই যেন সন্দেহ ঘনীভূত হতে শুরু করল।

বাজার করতে যাওয়ার কথায় সেই যে গিরীনকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল বিমলা, তার থেকেই দুটি পরিবার ধীরে ধীরে আবার পরস্পর থেকে সরে গেছে। কেউ কাউকে সুখদুঃখের কথাটুকুও বলে না। পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলে।

প্রথমটা তাই মোহনপুরের বউ প্রতিহিংসার আনন্দ উপভোগ করেছিল। গিরীনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, মেয়ের তেজ এবার কোথায় থাকে দেখি। টিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে তো আর মুখ দেখাতে পারবে না।

গিরীনও যেন খুশি হয়েছিল। খুশি হতে পারেনি শুধু টিয়া। এত ফুর্তি এত আনন্দের মধ্যেও ওর বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করেছে কেবল। তার বিয়েতে এত হৈচৈ আনন্দ হবে, অথচ বিমলা-কমলা মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকবে, কাছে এসে বসবে না, হাসি গল্পে যোগ দেবে না, ঠাট্টা রসিকতা করবে না, ভাবতেও কষ্ট হয় টিয়ার। তা ছাড়া জ্যাঠামশাই আর জেঠিমা দূরে দূরে থাকবে। বড়জোর টিয়া প্রণাম করতে গেলে একটা অস্ফুট আশীর্বাদ করবে—ভাবতেও পারে না টিয়া। ও শুধু মনে মনে ভাবে, এমন কিছু ঘটে না, যাতে আবার সকলে মিলেমিশে এক হয়ে যায়, ঠিক সেদিনের মত—যেদিন প্রভাকরের বাবা ওকে দেখতে এসেছিল।

প্রভাকরের বাবা! কথাটা মনের গোপনে উচ্চারণ করেই হেসে ফেলল টিয়া। শ্বশুর কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তেই কৌতুকের হাসি দুলল ঠোঁটে। না, ও শব্দটা উচ্চারণ করতেও হাসি পায়, লজ্জা হয়, অথচ...সত্যি বিয়ের পর কি করে মেয়েরা বলে? নিজেরই বিস্ময় লাগে টিয়ার।

তারপর হঠাৎ রেণুদির আর রাঙাবৌদির কথা মনে পড়ে যায়। ফিরুর কথা। রেণুদিদের আসতে বলে চিঠি দেবার কথা কি মনে আছে বাবার?

টিয়া ধীরে ধীরে এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় মা'র কাছে চুপটি করে বসে রইল কিছুক্ষণ। মা রুটি বেলছে একমনে।

টিয়া ধীরে ধীরে বললে, মা, রেণুদিদের চিঠি দেবে না?

—উঁ! কি যেন ভাবছিল মোহনপুরের বউ। হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙে গেল।

টিয়া আবার বললে।

মোহনপুরের বউ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। তার মনে তখন একটা রহস্য ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিমলা। বিমলার দিকে তাকালেই মোহনপুরের বউয়ের বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁত করে ওঠে। একটা আতঙ্ক যেন।

কয়েকদিন থেকেই বিমলাকে লক্ষ করছে মোহনপুরের বউ। আর দিনে দিনে সন্দেহ বাড়ছে। টিয়ার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, শুধু এই কারণে এতখানি মুসড়ে পড়া কি সম্ভব? স্বাভাবিক?

অনেক টুকরো টুকরো কথা, টুকরো টুকরো দৃশ্য মনে পড়ে যায় মোহনপুরের বউয়ের। কেমন একটা সন্দেহের প্রশ্ন সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়ায় চোখের সামনে।

প্রভাকর এলেই বিমলা-কমলা ছুটে যেত, হেসে হেসে গল্প করত...তারপর সেই উদাসের কথা...কবে যেন বেড়াতে গিয়েছিল বিমলা প্রভাকরের জিপে। নেহাতই শহুরে মেয়ে, ভব্যতা জানে না পাড়াগাঁয়ের, তাই এত মেলামেশা করে, ভাবত মোহনপুরের বউ। কিন্তু ক্রমেই সন্দেহ হয়।

আজকাল ঘর থেকেও বড় একটা বের হয় না বিমলা। চুপচাপ একা একা বসে থাকে। বাপ-মা'র সঙ্গেও ভাল করে কথা বলে না। কিংবা কথা বলতে গেলেই অকারণে

রেগে ওঠে। পাঁচিলের এপার থেকে লক্ষ করেছে মোহনপুরের বউ।

গায়ে হলুদের আগের দিন। পাড়াপড়শি অনেক এসেছে। গল্পগুজব করে চলে গেছে তারা। এমনকি নিভাননীও একবার এসে দু-একটা কথা বলে গেছেন।

মোহনপুরের বউ দেখল, শুধু বিমলা আসেনি। তেমনি চুপচাপ বসে আছে দক্ষিণ-দুয়োরির চৌকাঠে। মুখ থমথম করছে।

হঠাৎ কি হল, মোহনপুরের বউ রান্নাঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপারে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ বিমলার দিকে। তারপর হঠাৎ ডাকলে, বিমলা!

ভাশুর শুনতে পাবে বলে ফিসফিস করে কথা বলে মোহনপুরের বউ, ছেলেমেয়েদের ধমক দিতেও বাধে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে সে-কথা ভুলে গেল সে।

জোর গলায় ডাকলে, বিমলা!

বিমলা চমকে ফিরে তাকাল।

মোহনপুরের বউ গম্ভীর গলায় বললে, শুনে যা।

বিস্ময়ের বিভ্রান্ত চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বিমলা, যেন কতদিন, কতকাল কাকিমার কণ্ঠস্বর শোনেনি, ডাক শোনেনি, তাই প্রথমটা চমকে উঠেছিল।

তারপর ধীর পায়ে উঠে এসে দাঁড়াল সে মোহনপুরের বউয়ের সামনে।

দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে নেমে এসে বিমলার একখানা হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরটিতে তাকে নিয়ে গেল মোহনপুরের বউ। তারপর চাপা গলায় বললে, শোন!

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল বিমলা। ও যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

মোহনপুরের বউ বিমলার পিঠে হাল্কা করে একখানা হাত রাখলে। বললে, কি হয়েছে তোর, বল। বল আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনপুরের বউকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল বিমলা। কান্নায় ভেঙে পড়ে মোহনপুরের বউয়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকোল।

কাঁদল, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল বিমলা।

তার মাথাটা তুলে ধরল মোহনপুরের বউ। ধীরে ধীরে বললে, বোকা মেয়ে। মোহনপুরের বউয়ের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল।—হ্যাঁ রে তুই না শহুরে মেয়ে, শহর বাজারে মানুষ হয়েছিস? এ-কথাটা তুই মুখ ফুটে বলতে পারলি না!

বিমলা কোনও কথা বললে না, মোহনপুরের বউকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল শুধু।

সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। এত উল্লাস হইচই আনন্দ যেন মুহূর্তে শ্মশান হয়ে গেছে।

নিভাননী হতাশার সুরে বললেন, তা হয় না মোহনপুরের বউ, তা হয় না। টিয়ার কথাটা তুমি ভেবে দেখো।

সংসারের অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে কাজ আর কাজের অবিরাম চাকায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে যে মানুষটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে ভুলে গেছে, স্বামীকে, ভাশুরকে বড়-জাকে যে শুধু ভয় পেতে শিখেছে, কোনওদিন সাহস করে মুখ তুলে একটা কথাও বলতে পারেনি, সেই মোহনপুরের বউ আজ যেন মানুষ বদলে গেছে। যেন তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর আর কারও কথা খাটে না, তার কথাই শেষ কথা।

অদ্ভুত কঠিন স্বরে মোহনপুরের বউ বললে, আজই বটঠাকুরকে যেতে বলুন টিয়ার

বাবার সঙ্গে।

ঘরের ভিতরে গিরিজাপ্রসাদ আছেন, গলার স্বর শুনতে পাবেন। তবু গলার স্বর নামাল না মোহনপুরের বউ।

গিরিজাপ্রসাদ বেরিয়ে এলেন চটি টানতে টানতে।

মোহনপুরের বউ ঘোমটা টেনে দিল ঈষৎ, তবু দাঁড়িয়ে রইল। সরে গেল না।

গিরিজাপ্রসাদও যেন সম্পর্ক ভুলে গেছেন।

অনুনয়ের কণ্ঠে বলে উঠলেন, না, না, বউমা, তা হয় না।

একটু থেমে বললেন, তা ছাড়া, তা ছাড়া অত টাকাই যে আমার নেই। আমার কিছু নেই মোহনপুরের বউ। আমার কিছু নেই। যা ছিল, সব ফুরিয়ে গেছে এ ক'মাসে। তোমাদের মুখ ফুটে বলতে পারিনি, আমার...

মোহনপুরের বউ ঘোমটার আড়াল থেকে বললে, টাকাটাই বড় হল! আপনাদের সম্পত্তি খেয়েপরেই তো এতদিন চালিয়েছি। কপালে থাকলে...

নিভাননী দেখলেন ঘোমটার ভিতর থেকে কয়েক ফোঁটা জল টপ-টপ করে মোহনপুরের বউয়ের পায়ের কাছে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তা হয় না বউমা, তা হয় না।

বার বার বাধা দিতে চাইলেন গিরিজাপ্রসাদ, নিভাননী। গিরীন বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মোহনপুরের বউ অনড়।

এমন দৃঢ়তা বুঝি মোহনপুরের বউয়ের মধ্যে দেখেনি গিরীন।

মোহনপুরের বউ গিরীনকেও এসে বললে, ভাববার সময় নেই আর, বটঠাকুরকে নিয়ে চলে যাও আজই। একটা দিনও হাতে নেই আর, কালই গায়ে হলুদ এসে পড়বে...

গিরীন প্রতিবাদ করার জন্যে কিন্তু-কিন্তু করল। এমন মূর্খতার কোনও অর্থই পায় না সে। প্রেম-ভালবাসার মত তুচ্ছ ব্যাপারের জন্যে এত হইচই করার কোনও কারণই খুঁজে পায় না। দু'দিন সময় দিলেই সব মুছে যাবে মন থেকে। এমন তো কতই হয়। তা ছাড়া, এতগুলো টাকা পণ দেওয়া হয়েছে। গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে ফিরে পাবে কি? টিয়ার বিয়ে দিতে হবে না?

গিরীন ধীরে ধীরে বললে, কি ছেলেমানুষি করছ?

ক্রুদ্ধ দুটি চোখ চকিতে আগুনের হলকার মত গিরীনের সর্বশরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে সরে গেল। দৃঢ় স্পষ্ট গলায় মোহনপুরের বউ বললে, ছেলেমানুষি!

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে এক-একটি শব্দ উচ্চারণ করল যেন। বললে, সারাজীবন ধরে তোমাদের কথাই শুনে এসেছি, আজ আমার কথাই তোমাদের শুনতে হবে!

এমনভাবে বললে, গিরীন প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। মোহনপুরের বউয়ের এ-পরিচয় কোনওদিন বুঝি জানতে চায়নি সে।

স্বামীকে কথা কটা বলেই তার সামনে থেকে সরে এল মোহনপুরের বউ। এসে দেখলে রান্নাঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে টিয়া। উদাস উদ্‌ভ্রান্ত চোখে হারিয়ে যাওয়া দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কিংবা কোনও দিকেই হয়তো তাকিয়ে নেই। থমথম করছে তার মুখ, আসন্ন বর্ষণের থমকে থাকা মেঘের মত।

মোহনপুরের বউ তার দিকে এক পলক তাকিয়েই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের মধ্যে।

কোনও কথা বললে না টিয়াকে, কোনও সান্ত্বনা নয়।

সমস্ত ব্যাপারটা টিয়ার চোখের সামনে ঘটে গেল। ছাড়া ছাড়া কথা, টুকরো টুকরো

দৃশ্য, মা আর বাবার বাদ-প্রতিবাদ—সবই কানে এল টিয়ার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নের স্বর্গ থেকে হঠাৎ নেমে আসতে হল টিয়াকে। এমন যে হবে, এমন যে হতে পারে ভাবতেও পারেনি টিয়া। সমস্ত বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চোখ ঠেলে জল এল মার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমানে। সমস্ত ব্যাপারটা টিয়াকে নিয়েই, টিয়ার জীবন, তার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে যে ঘটনার সঙ্গে, যে স্বপ্নের মধ্যে ডুব দিয়ে এতগুলো দিন কেটে গেছে, হঠাৎ যেন তা থেকে টিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মোহনপুরের বউ। এ-ক'টা দিন বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা—সকলেই যে যা বলেছে, যে যা করেছে সবই টিয়াকে ঘিরে। প্রতিটি কথায় আর কাজে টিয়ার দিকে স্নেহের চোখে তাকিয়েছে সকলে। আর, এই মুহূর্তে সে যেন কেউ নয়। তার কথা কেউই ভাবছে না। কেউ কিছু বলছে না। অপরিচিত বাইরের মানুষের মত একা একা দাঁড়িয়ে আছে সে, কেউ তার দিকে ফিরেও দেখছে না।

বুকের মধ্যে একটা উদ্দাম ঝড় চেপে রেখে অপেক্ষা করল টিয়া। কেউ হয়তো কিছু বলবে, মা সান্ত্বনা দেবে।

না, কেউ কিছু বলল না। টিয়ার চোখের সামনে দিয়ে গিরিজাপ্রসাদ বেরিয়ে গেলেন গিরীনকে সঙ্গে নিয়ে। বিকেলের ট্রেন ক্ষীণ সুরের বাঁশি বাজিয়ে এল, চলে গেল।

আর গভীর অভিমানে নিজের বিছানাটিতে এসে লুটিয়ে পড়ল টিয়া। পড়ে পড়ে কাঁদলে অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। তারপর কখন যেন তন্দ্রার মত এসেছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎ পিঠের ওপর একখানা ভারী নরম হাতের স্পর্শে চোখ মেলে চাইল টিয়া।

অন্ধকার ঘর। বিশুকে দেখা যাচ্ছে না, ভাইবোনদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার। গভীর অন্ধকার। তবু ভারী আর নরম হাতখানার স্পর্শে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এল।

—টিয়া!

মা ডাকলে চাপা গলায়।

সাড়া দিল না টিয়া। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। অসহ্য, অসহ্য লাগছে মা'র এই স্নেহের সান্ত্বনার স্পর্শ।

মা'র গোলগাল মুখখানা টিয়ার মাথার কাছে এগিয়ে এল। স্পষ্ট বুঝতে পারল ও। টিয়ার গালের ওপর মা'র গাল। ভিজে ভিজে ঠেকল। মা কি কাঁদছে?

—টিয়া! আবার ডাকলে মোহনপুরের বউ। ধীরে ধীরে বললে, তোর আমি অনেক...অনেক ভাল বিয়ে দোব টিয়া। এর চেয়ে অনেক ভাল পাত্রে।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল মোহনপুরের বউ।

আবার বললে, তুই...তুই এখানে সুখী হতে পারতিস না টিয়া, পারতিস না।

বলেই আবেগের সঙ্গে টিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইল মোহনপুরের বউ। টিয়ার গালের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরল। ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল টিয়ার গালে।

সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠে টিয়া মাকে জড়িয়ে ধরল।—মা। তুমি কাঁদছ, তুমি কাঁদছ!

কান্নার স্বর মুছে মুছে হাসি আনবার চেষ্টা করলে টিয়া।—দেখ, আমি কাঁদিনি, দেখ তুমি, আমি কাঁদিনি।

পরের দিন সকালেই ফিরে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। ফিরে এল গিরীন। আর তাদের

মুখের দিকে তাকিয়েই মোহনপুরের বউয়ের আতঙ্ক কেটে গেল।

গিরীন হাসল মোহনপুরের বউয়ের দিকে চোখ পড়তেই। বললে, বুড়োর কাছে টাকাই সব, কোন্ মেয়ের বিয়ে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

মোহনপুরের বউ কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, প্রভাকর ছিল ?

—হ্যাঁ। সেজন্যেই তো বেশি বেগ পেতে হল না বুড়োকে বোঝাতে।

বলে হেসে উঠল গিরীন আর মোহনপুরের বউ।

কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ আর নিভাননীর মুখ থেকে হাসি উবে গেছে। এ-বিয়েতে তাঁরা খুশি হয়েছেন কিনা বোঝা দায়।

আর টিয়া ? তার ম্লান বিষণ্ণ মুখের ওপর থেকে ব্যথার ছাপটা কিছুতেই সরে যাচ্ছে না। কুমির মত—কমলার মত হেসে খেলে বেড়াতে পারছে না। একটা ভার যেন এখনও চেপে আছে তার বুকের ওপর।

একে একে গ্রামের সকলেই শুনল। গাঁ-সুদ্ধ সকলের মুখেই ওই এক আলোচনা। এমন মজার ব্যাপার বুঝি কখনও ঘটেনি, কখনও শোনেনি তারা।

পরের দিন সকাল থেকেই দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। পাঁজাবউ, গুপ্তদের মেয়েরা, অট্টামা।

সকলেই বিস্মিত হয়েছে খবর শুনে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। পাঁজাবউ এসে ফিসফিস করে বলেছে, হ্যাঁ রে মোহনপুরের বউ, কি শুনছি। বড়-জা পাত্র ভাঙিয়ে নিল বিয়ের ক্ষণে!

মোহনপুরের বউ হেসেছে—ভাঙিয়ে নেবে কেন! কি যা-তা বলছ।

অট্টামা এসেছে লাঠি ঠুক ঠুক করে। লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজিয়ে কুঁজিয়ে হেঁটে এসে ডাক দিয়েছে, কই লো মোনপুরের বউ, কোতায় গেলি লো!

বলে এক-মুখ হাসি হেসেছে মোহনপুরের বউকে দেখে। লাঠি তুলে মাড়ি বের করে হাসতে হাসতে বলেছে, খেটে খেটে শুকিয়ে ম'লি মোনপুরের বউ, তবু বুক আছে তোর লো, এমনি চওড়া বুক। দু'খানা হাত প্রসারিত করে মোহনপুরের বউয়ের হৃদয় কতখানি বড়, দেখিয়েছে অট্টামা। তারপর হাসতে হাসতে ছড়া কেটেছে, কালে কালে কত কাল, ছাতু ভিজে এত ঝাল ? ওই বিমলি, ওই-টুকুন মেয়ে, তার পেটে পেটে এত ?

মোহনপুরের বউ দ্রুত পায়ে নেমে এসেছে উঠোনে। চাপা গলায় বলেছে, আঃ, শুনতে পাবে। ও সব বোলো না, কি বলতে কি হয়। শেষে...

অট্টামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবু হেসেছে আর ছড়া কেটেছে। তা দেখে কাছে আসতে অস্বস্তি বোধ করেছে টিয়া। কি জানি কি বলে বসে অট্টামা। তাই ঘরের কোণে বসে বসে একা একাই সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিয়েছে টিয়া।

এক-একবার শাঁখ বেজে উঠেছে, কেউ রসিকতা করেছে বিমলাকে, ঝগড়া বেঁধেছে মুনিশদের মধ্যে—সব কানে এসেছে টিয়ার। কিন্তু এত ফুর্তি এত আনন্দের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়নি।

কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব, অস্বস্তি। হতাশার ছায়াটুকুও মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে। বার বার মা'র কথাটা মনে পড়েছে।—তুই ওখানে বিয়ে হলে সুখী হতিস না টিয়া—এর চেয়ে অনেক, অনেক ভাল পাত্রে বিয়ে দোব আমি।

এক-একবার মা'র কথাটা সরল মনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে তার। আর তার মধ্যেই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে চেয়েছে।

এক-একবার শুধু ওর ইচ্ছে হয়েছে বিমলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। পাড়ার বউ-ঝিরা এসেছে, জেঠিমা বিমলাকে সাজাবার ব্যবস্থা করছে। ওর সামনে দিয়েই ছুটতে ছুটতে

চন্দনের রেকাবিটা নিয়ে গেল কুমি।

ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এল টিয়া। দেখলে, উঠোনে বসে বসে দু'খানা পিঁড়িতে আলপনা আঁকছে মা।

ধীর পায়ে মা'র কাছে এগিয়ে গেল টিয়া।

মোহনপুরের বউ মুখ তুলে তাকালে, তারপর আলপনা আঁকতে আঁকতে বললে, বোস।

টিয়া বসল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি দিয়ে দোব মা? আলপনা?

মা তাকাল আবার। —দিবি? দে। আমি তা হলে...

ছাদনাতলার ব্যবস্থা করতে চলে গেল মোহনপুরের বউ।

পিঁড়ি দুটোয় সুন্দর করে আলপনা আঁকলে টিয়া, মুগ্ধ চোখে নিজেই তাকিয়ে দেখলে।

বিমলাকে সাজানো হচ্ছে বোধ হয়। হাসাহাসি চিৎকার ভেসে আসছে ওদিকের ঘর থেকে। টিয়ার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে একবার গিয়ে দেখে আসে বিমলাকে। কেমন মানিয়েছে তাকে!

শেষ পর্যন্ত আর দূরে সরে থাকতে পারল না ও। নিজের ঘরটিতে এসে টিনের স্যুটকেসটা খুললে। একরাশ ভাঙা পুতুল, একটা কৌটোতে ঝিনুক, যেটা দিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের পিঠের ঘামাচি গেলে দিয়েছিল, লাল নীল সুতো, আরও কত কি। খুঁজে খুঁজে একটা কাগজের মোড়ক বের করে টিয়া খুঁটে বেঁধে রাখলে।

তারপর ছাদনাতলায় এসে দাঁড়াল। মা গোবরজলের ছিটে দিচ্ছে আবার। কি সুন্দর ছিমছাম পরিষ্কার দেখাচ্ছে জায়গাটা। বার-বাড়িতে কারা যেন এসেছে। কয়েকটা কারবাইডের আলো—এখনও জ্বালা হয়নি।

দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে পায়চারি করছে অবিনাশ ডাক্তার, আর মুনিশদের কি যেন হুকুম দিচ্ছে।

যে আসছে, যাচ্ছে একবার করে তাকাচ্ছে টিয়ার দিকে। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। ওরা কি ভাবছে, টিয়ার খুব কষ্ট, খুব দুঃখ? না, মোটেই না। এই তো আমি হাসছি, টিয়া নিজের মনেই ভাবলে।

মা বলেছে, এখানে বিয়ে হলে তুই সুখী হতিস না টিয়া।

মা বলেছে, এর চেয়ে অনেক ভাল পাত্রে তোর বিয়ে দোব আমি।

সরল মনে বিশ্বাস করেছে টিয়া। ওর নিশ্চয় আরও অনেক ভাল বিয়ে হবে। অনেক বেশি সুখী হবে ও। মা বলেছে যে।

ধীরে ধীরে বিমলাদের ঘরখানার দিকে পা বাড়াল টিয়া। জেঠিমা দেখতে পেয়ে ছুটে এল, টিয়ার পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে গিয়ে বসাল বিমলার কাছে। —বিমলি একা আছে, তুই বোস তো মা একটু।

টিয়া বেশ বুঝতে পারলে জেঠিমা তাকে আদর করতে চাইছে। ভালবাসতে চাইছে। সেই প্রথম যেদিন ওরা এখানে এসেছিল টিয়াদের বাড়িতে, ঠিক সেই দিনের মত।

বাইরে হট্টগোল। সকলেই সেখানে জটলা পাকিয়েছে।

বিমলা স্নান করে এসে কনে বউটি হয়ে একা বসে আছে একখানা ডুরে শাড়ি পরে। এখনই হয়তো জেঠিমা এসে সাজাতে শুরু করবে। টিয়া চুপচাপ অপেক্ষা করলে। না, বিমলা চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারছে না। কথা বলতে পারছে না।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে টিয়া হঠাৎ কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলে, বিমলাদি!

বিমলা মুখ নিচু করেই অস্ফুটে সাড়া দিল।

টিয়া হাসবার চেষ্টা করলে। বললে, তোমাকে একটা জিনিস দোব, নেবে বিমলাদি?

—কি ? বিমলা এবার মুখ তুলে তাকাল। হাসল।

টিয়া খুঁট থেকে কাগজের মোড়কটা বের করলে, মোড়ক থেকে সোনার টিকলিটা। তারপর হাসি-হাসি মুখে বিমলার সিঁথিতে পরিয়ে দিলে।

আর তার হাসি-হাসি মুখের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল বিমলা। পরমুহূর্তেই বিমলার চোখের কোণ বেয়েও দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

টিয়া তখনও হাসি-হাসি মুখে বলছে, টিকলিটায় তোমাকে কি সুন্দর মানিয়েছে বিমলাদি ! কি সুন্দর মানিয়েছে !

আটত্রিশ

বিয়ের পরদিন সকালে বর-কনে বিদায় নিতেই টিয়ার সমস্ত বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল। ঠিক সেই রেণুদি, রাঙাবৌদি, ফিরু চলে যাবার দিনও এমনি বুকের ভিতরটা কেমন-কেমন করে উঠেছিল। কিংবা ঠিক সে-ধরনের নয়, এ যেন অন্য আরেক ধরনের কষ্ট।

অথচ বিয়ের দিনটা কেমন এক স্বপ্নের মত কেটে গেছে। সমস্ত মন সারাটা দিন ধরে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

দু-বাড়ির মাঝখানে গোবর-জল নিকোনো তকতকে পরিচ্ছন্ন উঠোনটা রোদে শুকিয়ে হাল্কা সবুজ আভা ফুটেছে, তার ওপর আলপনার রেখাগুলো ক্রমশ খড়ির মত সাদা হয়ে ফুটে উঠেছে। চারদিকে চারটে কঞ্চি পুঁতে ছাদনাতলা তৈরি হয়েছে। মা, জেঠিমা, পাড়ার সবাই ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

টিয়া একসময় দেখলে, নতুন কেনা পাথরের শিলটা এনে মা রাখল একপাশে। বর এসে দাঁড়াবে ওর ওপর। হাত বাঁধতে হবে...না, টিয়া তখন কাছেপিঠে কোথাও থাকবে না। কেউ যদি ঠাট্টা করে ওকেই বলে বসে গলার হার দিয়ে বরের হাত দুটো বাঁধতে ! কি লজ্জা কি লজ্জা। নিজের মনেই লজ্জিত হয়ে পড়ল টিয়া। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে মা আর জেঠিমাকে।

হঠাৎ এক-এক সময় ক্ষণিকের জন্যে টুকরো টুকরো দু-একটা স্বপ্ন ভেসে আসে চোখের সামনে। যেন টিয়ার নিজেরই বিয়ে হচ্ছে ; হবে একদিন—মা বলেছে, আরও অনেক ভাল পাত্রে।

কনের বেশে নিজেকে কেমন দেখাবে ভাবতে চেষ্টা করে টিয়া। গালে কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় লাল চেলির ঘোমটা, বাবা বুঝি টিয়ার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে কন্যাসম্প্রদানের মন্ত্র পড়ছে...

ভাবতে ভাবতে তীব্র একটা আনন্দের পুলকে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে টিয়ার। পরক্ষণেই তন্ময়তা ভেঙে যায়। স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখছিল টিয়া। একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক নিঙড়ে।

কিন্তু ব্যথাটুকুও মুছে যায় ক্রমে ক্রমে। সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, চতুর্দিকে কারবাইডের হ্যাজাকের আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টিয়ার মনেও এক অদ্ভুত উত্তেজনা, একটা নেশা যেন চেপে বসে।

তারপর একটা স্বপ্নের ঘোরেই যেন কেটে গেছে রাতটা। কখন সবাই উলু দিয়ে উঠেছে, শাঁখ বাজাতে ডেকেছে মা, কুমি ফুঁ দিয়ে দিয়েও শাঁখ বাজাতে পারেনি, আর দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে টিয়া ছুটে এসে তার হাত থেকে শাঁখটা কেড়ে নিয়ে জোরে জোরে বাজিয়েছে, অট্টামা আর গুপ্তবউ তা দেখে কি বলাবলি করেছে হেসে হেসে।

কোনও কিছুই লক্ষ করেনি টিয়া, আর কিছুই তার মনে নেই।

তারপর সকালে বিমলা আর প্রভাকর চলে গেছে, আর সেই প্রথম নিজেকে কেমন নিঃস্ব মনে হয়েছে টিয়ার। অবোধ্য একটা কষ্ট। কেন, তা টিয়া নিজেও বুঝতে পারেনি।

ও শুধু দেখেছে, কারণে অকারণে জেঠিমা ওকে কাছে ডাকে, আদর করে ওর পিঠে হাত রাখে, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। জেঠিমা জ্যাঠামশাই কোনওদিন বুঝি ওকে এত ভালবাসেনি।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে গেছে। শেষে একদিন খেতে বসে গল্প করতে করতে মা বলেছে, হ্যাঁ রে, তোর জেঠিমারা নাকি চলে যাবে এখান থেকে, জানিস তুই ?

—চলে যাবে ? চমকে উঠেছে টিয়া। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু না জেনেও শান্তি নেই। এক-একবার ইচ্ছে হয়েছে জ্যাঠামশাইকে গিয়ে জিগ্যেস করতে।

দুপুরে সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দাওয়ায় বসে বসে লেস বুনতে বুনতে কত কি ভাবে টিয়া, মাঝে মাঝে তাকায় আকাশের দিকে। মেঘ আসছে। একটু একটু করে কালো কালো মেঘ এগিয়ে আসছে। রোদ নিভে গেছে, ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া হাতছানি দিচ্ছে টিয়াকে।

লেস-বোনার সুতো আর ক্রুশ রেখে দিয়ে দুপুরের নিস্তব্ধতায় নতুন গোড়ের পাড়ে এসে দাঁড়াল টিয়া। মেঘ আসছে, মেঘ। মেঘ আর রোদ্দুরের ছায়া দূরের কয়েকটা মাঠে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল ওপারে। নতুন গোড়ের ওপারে, ইস্কুল-বাড়ি পার হয়ে, ওদিকের মাঠগুলোয় বৃষ্টি নেমেছে, এদিকে শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া, নরম রোদ্দুর।

আঃ, বৃষ্টিটা এদিকে নামলে খুব ভিজত টিয়া। মনের সুখে বৃষ্টিতে ভিজত। কতদিন নেচে নেচে জলে ভিজতে পায়নি। সেই একবার বৃষ্টিতে ভিজে রেণুদির সঙ্গে আম কুড়িয়েছিল। তারপর কতদিন যেন কেটে গেছে।

দেখতে দেখতে ওপারে এক পশলা বৃষ্টি হয়েই মেঘটা সরে গেল।

টিয়া ফিরে এল ধীরে ধীরে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। দাওয়ার ওপর থেকে দেখলে, দক্ষিণ-দুয়োরির বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে আছেন জ্যাঠামশাই। হোমিওপ্যাথির সেই মোটা বইখানা পড়ছেন। আর চওড়া পিঠখানা দেখা যাচ্ছে। সারা পিঠে ঘামাচি।

স্যুটকেস খুলে কৌটোর ভিতরে সযত্নে তুলে রাখা ঝিনুকটা বের করে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল টিয়া।

চোখ তুলে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। চোখ নামালেন। —আয়, বোস।

গিরিজাপ্রসাদের পিঠের কাছে গিয়ে বসল টিয়া। ঝিনুক দিয়ে ঘামাচি গেলে দিতে দিতে বললে, জ্যাঠামশাই।

—কি রে। বই থেকে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

টিয়া একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ বললে, আপনারা, আপনারা চলে যাবেন জ্যাঠামশাই ?

কান্নার মত শোনাল টিয়ার গলার স্বর। চমকে তার মুখের দিকে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ, কোনও উত্তর দিলেন না। দিতে পারলেন না, টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে।

টিয়া শুধু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। আর কিছু নয়।

বিমলা চলে গেছে। বিমলা আর প্রভাকর।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা স্বপ্নের মত মনে হয় গিরিজাপ্রসাদের। এই ক'টা দিন সত্যিই বুঝি স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেছে। বাংলাবাড়িতে বসে নিজের মনেই কি যেন ভাবছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন সামনের দিকে। জ্যোৎস্নার রাত্রে সজনে গাছটা কি সুন্দর লাগত দু'দিন আগেও, ঝালরের মত কচি কচি সজনের রাশি ঝুলত নিস্পত্র গাছটা থেকে। ডাঁটাগুলো কেটে নেওয়ার পর এখন শুধুই ন্যাড়া গাছটার শাখা-প্রশাখা দাঁড়িয়ে আছে নিঃস্বতার প্রতীক হয়ে। গিরিজাপ্রসাদের বুকের মতই।

বন্যার জল শুকিয়ে গেলে যেমন শস্যহীন মাঠ, ধসে-পড়া বাড়িঘর, দু'একটা মরা গরুর কঙ্কাল নিয়ে একটা ক্লান্ত নিঃস্ব চেহারা জেগে ওঠে, গিরিজাপ্রসাদের মনের অবস্থাও যেন তেমনি। বর-কনে চলে যাওয়ার পর বিয়েবাড়ির রূপটা যেমন ক্লান্ত বিষণ্ণ খাপছাড়া লাগে, বিমলা আর প্রভাকর চলে যাওয়ার পর যেমন লেগেছিল তাঁর, সমস্ত জীবনটাই যেন তেমনই নিঃস্ব হয়ে গেছে।

বিয়ের পর মেয়ে তাঁর এতদিনের মমতার বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছে বলেই কি এতখানি মুসড়ে পড়েছেন তিনি ?

না। মনের গোপনে একটা অসহ্য জ্বালা চেপে রাখতে হয়েছে তাঁকে, চেপে রাখতে পারছেন না। গ্রামের কারও সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলতেও বাধছে। এই একটা আকস্মিক ঘটনায় হঠাৎ যেন সকলের কাছে গিরীনের চেয়ে, মোহনপুরের বউয়ের চেয়ে খাটো হয়ে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। এমনকি স্ত্রীর কাছে, ছেলেমেয়েদের কাছেও।

এতদিন একটাই সান্ত্বনা ছিল তাঁর। গিরীনের চেয়ে নিজেকে অনেক উঁচু আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন। ভাবতেন, তিনি কত মহৎ, কত নিঃস্বার্থ। সামান্য ঝগড়া-বিবাদেও গ্রামের লোক বলত, গিরীনের এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই ! যার সম্পত্তি খেয়ে-পরে থাকলি এতদিন...

শুনে অদ্ভুত একটা অহঙ্কার বোধ করতেন তিনি।

আর তাঁর সব অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেও নিজের সম্মান বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কৃতজ্ঞতা। চিরজীবনের জন্যে গিরীন আর মোহনপুরের বউ আর তার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দাসত্বের দাসখত আদায় করতে চেয়েছিলেন।

আজ ঘুঁটি উল্টে গেছে। গিরিজাপ্রসাদ বেশ বুঝতে পারেন প্রতিটি মানুষ যেন আঙুল দিয়ে গিরীনকে দেখাচ্ছে, মোহনপুরের বউকে দেখাচ্ছে। বলছে, ওরা কত মহৎ, কত নিঃস্বার্থ, কতখানি কৃতজ্ঞতাবোধ !

যতই ভাবেন ততই অসহ্য লাগে গিরিজাপ্রসাদের। সত্যি, এমন যে হবে, এমন যে হতে পারে ভাবতে পারেননি তিনি। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল !

একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। ঘড়ি দেখার অভ্যাসটা চলে গিয়েছিল যেন কবে। বন্ধ হয়ে পড়েছিল এতদিন। সেদিন প্রভাকরের ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে দম দেওয়ার পর আবার চলতে শুরু করেছে। তাই ঘড়িটা বের করে দেখলেন একবার। তারপর সামনে চোখ যেতেই হঠাৎ দেখতে পেলেন মরাইয়ের পাশ দিয়ে, গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে পুকুরের ঘাটে চলে গেল মোহনপুরের বউ—হাতে একরাশ থালাবাসন নিয়ে যেতে যেতে ঘোমটা টেনে দিল একটু।

অন্যদিন হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিতেন গিরিজাপ্রসাদ। আজ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল মোহনপুরের বউয়ের মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখতে। কি আছে সে

মুখের মধ্যে, সেই লজ্জানম্র চোখ দুটিতে।

তাঁরা বিয়ে ভাঙিয়ে দিতে পারেন এই ভয়ে যে মেয়ে-দেখতে-আসার দিন অবধি সবটুকুই গোপন রেখেছিল, মেয়ের বিয়ে ছাড়া আর কোনও সাধ-আহ্লাদই নেই যার জীবনে, সেই মানুষ কি করে এমন দুর্জয় সাহস নিয়ে এসে দাঁড়াল, ভেবে পান না গিরিজাপ্রসাদ। নিজের মেয়ের সুখসচ্ছল সুন্দর ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করে, এতগুলি টাকার মোহ ছেড়ে মোহনপুরের বউ তাঁকে যেন আজ কৃতজ্ঞতার পাশে বেঁধে ফেলেছে। তা থেকে মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুঠোর মধ্যে মুড়ে রাখা চিঠিখানা আবার খুলে পড়লেন গিরিজাপ্রসাদ। চাকরিতে আরও উন্নতি হয়েছে বড় ছেলের, চিঠি লিখে জানিয়েছে। আর জানিয়েছে, ভাল কোয়ার্টার পেয়েছে সে। গিরিজাপ্রসাদ-নিভাননী যেন সেখানে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন।

কিছুদিন নয়। গিরিজাপ্রসাদ ভাবছেন, বাকি জীবনটাই সেখানে গিয়ে থাকবেন। পালাতে চান তিনি এই বনপলাশি গাঁ থেকে, এই অসহ্য হীনতা থেকে।

স্ত্রী নিভাননীকে বলেছেন, সেখানে বরং দু-পাঁচটা ছেলে পড়াব, তা হলেও তো কিছু পাব...দিব্যি চলে যাবে। কি বলো ?

নিভাননী কোনও উত্তর দেননি, কিন্তু মনে মনে সায় দিয়েছেন। তিনিও যেন বনপলাশি থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন।

মোহনপুরের বউয়ের কাছে এমন ছোট হয়ে যাবেন কোনওদিন ভাবতে পারেননি নিভাননী। কথায় কথায় কৃতজ্ঞতার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন তাদের। কিন্তু এভাবে তারা সে-ঋণ পরিশোধ করবে তা তো তিনি চাননি। চেয়েছিলেন সারাজীবন ধরে, প্রতি পদে পদে, তিলে তিলে তা শোধ করবে মোহনপুরের বউ।

আজ তাই নিভাননী মুখ তুলে কথা বলতে পারেন না। একটা কাঁটা যেন প্রতি নিয়ত খচখচ করে বুকে এসে বেঁধে, মনে পড়িয়ে দেয় মোহনপুরের বউ কত বড়। কত মহৎ, কত নিঃস্বার্থ।

এত ভাল পাত্রে বিয়ে হল বিমলার, যেখানে বিয়ে না হলে বিমলার জীবনটাই হয়তো অসুখী হয়ে যেত—তবু সুখ নেই নিভাননীর মনে।

একমনে রান্না করতে করতে নিভাননী তাই ভাবছিলেন স্বামীর কথাটা।—সেখানে নয় দু-পাঁচটা ছেলে পড়াব, তাতেও তো কিছু পাব...

চটির শব্দে মুখ তুলে তাকালেন নিভাননী। কিন্তু স্বামীর চোখে চোখ রাখতেও অস্বস্তি বোধ করলেন।

গিরিজাপ্রসাদ এসে খানিক দাঁড়ালেন চুপচাপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই লিখে দিলাম।

নিভাননী চুপ করে রইলেন। চোখ তুললেন না। উঠোনের দিকে ফিরে তাকালেন কে আসছে মনে হওয়ায়।

গিরিজাপ্রসাদ আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন। বলতে পারলেন না, হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এল, পেসাদ, অ পেসাদ।

অট্টামার ডাক শুনে আজ প্রথম মনে মনে বিরক্ত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। তবু বিরক্তি চেপে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

লাঠি ঠুক ঠুক করে, লাঠির ডগায় শীর্ণ দেহটার ভার দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল অট্টামা। মাড়ি বের করে একমুখ হাসল গিরিজাপ্রসাদকে দেখতে পেয়ে। তারপর হাসি-হাসি মুখেই প্রশ্ন করলে, বিমলি চিঠি দিয়েছে রে পেসাদ ? নাতজামাই কবে আসবে

নিকেছে ? ভাবলাম, অষ্টমঙ্গলার পর আবার একবার আসবে। আসবে, চিঠি দিয়েছে ?

গিরিজাপ্রসাদ অস্ফুটে বললেন, না।

গিরিজাপ্রসাদ যে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হচ্ছেন, তার উপস্থিতি ভাল লাগছে না, বুঝতে পারল না অট্টামা। একমুখ হেসে তাই বললে, দ্যাখো কাণ্ড, ঘোষপুকুরের পাড়ে এই এমনি বড় একটা তাল পড়ল, তা কুড়িয়ে নিলাম, যে নাতজামাই এলে তালের বড়া করে খাওয়াব! সেই সেবার মশায়দের মিনার বর এল বিদেশ থেকে, বললে, সরুচিকুলি খাওয়াও অট্টামা। তখন এমন সরুচিকুলি করে দিয়েছিলাম...খেয়ে ভুলতে পারেনি, হুঁহুঁ, বলে না, 'কে রাঁধে গো কয়লা কড়াই খুন্তি ; না রাঁধেন তোমার মনটি'...

বলেই নিভাননীর মুখের দিকে ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি ফেলে কি যেন খুঁজলে অট্টামা। —হ্যাঁ লা, আসবে না মেয়ে-জামাই ?

নিভাননীও এড়িয়ে গেলেন। —কি জানি!

অট্টামা ততক্ষণে হাসতে হাসতে লাঠিটা নামিয়ে রেখে মেঝের ওপরই বসে পড়েছে। তারপর কমলাকে দেখতে পেয়ে ডাকলে, অ কুমি, কুমি লো, শোন!

কমলা এসে দাঁড়াল, কিন্তু আজ আর অট্টামাকে দেখে হাসতে পারল না। দিদি চলে যাবার পর থেকেই সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন শূন্য শূন্য মনে হয় কমলার। সবাই আছে, নেই শুধু বিমলা। কিন্তু মনে হয়, যেন কেউই নেই এ-বাড়িতে, শুধু কমলা একা আছে। সদাসর্বদা একজোট হয়ে থাকত দু'জনে, একসঙ্গে ঘুরত ফিরত, হাসাহাসি রসিকতা, একে-ওকে নিয়ে টিপ্পনী কেটে বিদ্রূপ করে নিজেদের মধ্যে সব আনন্দটুকু ভাগ করে না নিলে যেন শান্তি ছিল না। এখন বিমলা নেই, আর তাই মনে হয় যেন কেউ নেই। চুপচাপ তাই একা একা মুখ বুজে থাকে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এ-ঘর থেকে ও-ঘর। কিচ্ছু ভাল লাগে না।

তাই গম্ভীর মুখেই এসে দাঁড়াল কুমি অট্টামার সামনে।

অট্টামা অতশত বোঝে না। তাই কুমিকে দেখে ঠাট্টা করলে, তা তুই আবার কোথায় সিঁদ দিচ্ছিস লো ?

বলে মাড়ি বের করে ফোকলা মুখে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল অট্টামা।

আর নিভাননী একটা তির্যক দৃষ্টি হানলেন অট্টামার দিকে। রাগত স্বরে বললেন, আঃ ছেলেমানুষের কাছে ও কি কথা!

অট্টামা তবু হাসল। —ছেলেমানুষ আর নেই লো, ছেলেমানুষ আর নেই। তলে তলে এত কাণ্ড...তা বাপু, বিমলিকে দোষ দিই না, ও তোমার সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা, সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা। দামু পালের সেই যে আইবুড়ি বোন রেণু, তার কথা শুনেছ তোমরা ?

বলেই সেখান থেকে চিৎকার করে ডাক দেয় অট্টামা।

—অ টিয়ে, টিয়ে!

পাঁচিলের ওপার থেকে টিয়া সাড়া দেয়। তারপর ধীর স্থির পায়ে জড়সড় হয়ে এসে দাঁড়ায় টিয়া অট্টামার সামনে। অট্টামা হেসে হেসে বলে, তোর পরানের বন্ধু রেণুর যে বিয়ে লো! নেমন্তন্নর চিঠি এয়েছে ?

—বিয়ে ? খুশি-খুশি মুখে তাকায় টিয়া—রেণুদির বিয়ে! সত্যি ?

এত আনন্দের খবর বুঝি কখনও শোনেনি টিয়া।

অট্টামা হেসে বলে, হ্যাঁ, গোপেন শুনে এয়েছে। অন্য জাতের ছেলের সঙ্গে...

বলেই একটু থেমে অট্টামা আবার বলে, তা আজকাল তো আকচ্ছার হচ্ছে। দেখা হলে আমি বলতাম, দে দামু, দিয়ে দে, ওতে দোষ নাই। দোষ কিছুতেই নাই রে। কোনও

কিছুতেই নাই। কত দেখলাম, আরও কত দেখব...

টিয়া কিন্তু ততক্ষণে এক ছুটে চলে গেছে মা'র কাছে। রেণুদির বিয়ে, শেষ পর্যন্ত রেণুদির বিয়ে হচ্ছে...এতবড় খবরটা মাকে না জানিয়ে থাকবে কি করে!

টিয়া চলে যেতেই অট্টামা নিজের মনেই যেন বললে, বেশ মেয়ে, কি ঠাণ্ডা বলো দিকিনি। ওর এইবার একটা ভাল বিয়ে হলেই নিশ্চিন্তি।

বলে নিভাননীর মুখের দিকে তাকায় অট্টামা। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামিয়ে নেন নিভাননী। টিয়াকে দেখলেই একটা অসীম অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নেন।

তাই মুখ ফিরিয়ে রইলেন অট্টামার কথা শুনে।

অট্টামা সায় পাবার জন্যে গিরিজাপ্রসাদের দিকে তাকালেন। হেসে বললেন, 'লোক দেখানো ভালবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা'...সব তাই, বুঝলে পেসাদ। কিন্তু তোমার মোনপুরের বউ বাপু দেখালে, হুঁ, এমন দরাজ বুক দেখিনি কখনও...

বলে দু'হাত প্রসারিত করে বললে, এই এমনি। এমনি চওড়া বুক মোনপুরের বউয়ের। পারে কেউ! বলো? বলে না 'সব ধন দিতে পারি, ভাতার কেউকে দিতে নারি', তা তার চেয়েও বড় গো, পাত্র ছেড়ে দেয়া এ-বাজারে! মোনপুরের বউ দেখালে বটে...

গিরিজাপ্রসাদ ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে গেলেন। অসহ্য, অসহ্য। এই একটা কথাই তিনি ভুলে থাকতে চান। একটা অনুশোচনায় দিনরাত তিনি দগ্ধ হচ্ছেন। বার বার মনে হয়, এমনটাই যদি হবে তো প্রথম থেকে কেন মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে, গিরীনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি। কেন বার বার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন, কেন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিবাদ পাকিয়ে তুলেছেন।

অসহ্য যন্ত্রণায় বাইরে বেরিয়ে আসেন গিরিজাপ্রসাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টামাও উঠে আসে। লাঠি ঠুক ঠুক করে দ্রুত পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে ডাকে, ও পেসাদ, পেসাদ শোন। তোর সঙ্গে যে আমার একটু কথা আছে বাবা, গোপন পরামশ্য আছে তোর সঙ্গে।

সেই যেদিন গিরিজাপ্রসাদ প্রথম ফিরে এলেন এ গাঁয়ে, সেদিনও অট্টামা এমনিভাবেই তাঁর কাছে এসে বলেছিল, তোর সঙ্গে আমার যে একটা গোপন পরামশ্য আছে বাবা।

অনুনয়ের স্বরে বলেছিল, একবার যাবি বাবা আমার ঘরে। তোর সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে পেসাদ!

গিরিজাপ্রসাদ তখন অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা নিয়ে ফিরে এসেছেন। শৈশবের সেই মধুর দিনগুলিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন নিয়ে। তাই বুড়ি অট্টামাকে বড় ভাল লেগেছিল সেদিন। অট্টামার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে দেখা করেছিলেন তার সঙ্গে, একান্তে. নির্জনে।

আর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন অট্টামার কথা শুনে। অনুনয়ে গিরিজাপ্রসাদের দুটি হাত চেপে ধরে অট্টামা বলেছিল, আমি ম'লে আমায় গোর দিবি পেসাদ, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমার গোর দিবি বাবা!

শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, সারা শরীরে তাঁর শিহরন খেলে গিয়েছিল। কোনওদিন বুঝি অট্টামার কাছে এমন কথা শুনতে হবে কল্পনাও করেননি গিরিজাপ্রসাদ। সেই কৈশোরের চোখে দেখা ছোটমার চরিত্রের একটা গোপন অজ্ঞাত দিকের কপাট যেন হঠাৎ খুলে গিয়েছিল তাঁর চোখের সামনে।

সেই ছোটমা, যে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছে তার স্বামীকে, খ্রিস্টান হওয়ার অপরাধে যে তার স্বামীকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারেনি, তারই মুখ থেকে এমন একটা অনুরোধ

আসবে কোনওদিন, ভাবতেও পারেননি গিরিজাপ্রসাদ।

মনে পড়ে তাঁর, ব্রজকাকার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর প্রথম যেবার গ্রামে এসেছিলেন দিনকয়েকের জন্যে, অট্টামার কানের পাশে সব চুল তখন সাদা হয়ে গেছে, প্রৌঢ়ত্বের ছাপ তখন তার সর্বাঙ্গে। আর সেই প্রথম গিরিজাপ্রসাদ লক্ষ করেছিলেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে অট্টামা। পরনে সাদা থান, দু'খানি ফর্সা হাত নিরাভরণ।

দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল গিরিজাপ্রসাদের। অট্টামার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু কোনও কথা বলতে পারেননি, কোনও সান্ত্বনা নয়।

তারপর যখন উঠে আসতে গেছেন, তখন ফিসফিস করে অট্টামা বলেছে, হ্যাঁ মানিক, ওকে নাকি গোর দিয়েছে কলকাতায়?

গিরিজাপ্রসাদ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছেন, হ্যাঁ ছোটমা, খ্রিস্টানদের যে গোর দেওয়াই নিয়ম।

—ও! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল অট্টামা। আর কোনও কথা বলেনি।

কেন বলেনি, গোপন মনে কি দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা লালন করে এসেছে ছোটমা, গিরিজাপ্রসাদ ভাবতে পারেননি। তাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন জীবনসায়াহ্নে অট্টামার কথা শুনে।

ছোট্ট একটা অনুরোধ।—হ্যাঁ রে পেসাদ, আমি ম'লে আমায় গোর দিবি বাবা, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে গোর দিবি?

কি আশ্চর্য। ধর্ম পরিবর্তনের জন্যে যাকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারলে না অট্টামা, শুধু চোখের দেখা দিতে চায়নি যাকে, মুখের ওপর কপাট বন্ধ করে দিয়েছে কালীমোহনের মৃত্যুর পর, সারা জীবন ধরে যার অস্তিত্বটুকু শুধু সিঁথির সিঁদুরেই টিকে ছিল, তারই ছেলেবেলার বইগুলোকে এমন দুর্মূল্য সম্পদ ভেবে আঁকড়ে ছিল কেন অট্টামা? কেন মৃত্যুর পর তার পাশে এতটুকু স্থান পাবার জন্যে এতখানি লালায়িত?

বুঝতে পারেননি গিরিজাপ্রসাদ। তবু শ্রদ্ধা করেছেন অট্টামার এই বিচিত্র বাসনাকে।

কিন্তু আজ যেন অট্টামার ওপর থেকেও তাঁর সমস্ত আকর্ষণ অন্তর্হিত হয়েছে। এই বনপলাশি গাঁ, এই মাটি-জল-বাতাস, গ্রামের মানুষগুলো—কেউই বুঝি আজ আর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারছে না।

তাই অট্টামার অনুনয়ও তাঁর কানে গেল না।

লাঠি ঠুক ঠুক করে দ্রুত পায়ে গিরিজাপ্রসাদের পিছনে পিছনে উঠে এল অট্টামা, তারপর ফিসফিস করে বললে, আমার ঘরে একবার যাবি মানিক, তোর সঙ্গে যে আমার অনেক গোপন পরামশ্য আছে বাবা!

গোপন পরামর্শ আর গোপন পরামর্শ। মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন গিরিজাপ্রসাদ।

গিরিজাপ্রসাদ জানেন, সেই পুরনো অনুরোধটাই হয়তো আবার মনে পড়িয়ে দেবে অট্টামা। বলবে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার মৃতদেহকে গোর দিতে হবে ব্রজকাকার দেহ যেখানে মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। জীবনে যার পাশে স্থান নিতে চায়নি কোনওদিন, মৃত্যুর পর তার পাশে পৌঁছানোর জন্যে, তার পাশে একটু স্থান পাবার জন্যে কি অন্ধ মোহ মানুষের!

গিরিজাপ্রসাদ তাই ভেবেছিলেন, যাবেন না তিনি অট্টামার সঙ্গে দেখা করতে। কি হবে ওই উদ্ভট অনুরোধ শুনে। মন স্থির করে ফেলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, চলে যাবেন এই গ্রাম ছেড়ে, বনপলাশি ছেড়ে। অট্টামাকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে কি লাভ! তার চেয়ে...

না। শেষ পর্যন্ত অট্টামার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না।

বাংলাবাড়িতে চুপচাপ সেদিন একা একা বসে ছিলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু প্রতিদিনের মত কেউ এসে হাজির হল না মারোয়াড়ি অংশীদারের সঙ্গে গোপেন মোড়ল নতুন হাস্কিং মেশিন নিয়ে মেতে উঠেছে। অবনীমোহনের মত বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছে সে।

হংস আর পদ্মে দু'জনেই চলে গেছে কলকাতায়। একজন চাকরি নিয়ে, আর একজন চাকরির আশায়। আর বংশী ?

—হ্যাঁ রে যতে ? যতে কোটালকে প্রশ্ন করলেন গিরিজাপ্রসাদ। বললেন, বংশী আসে না কেন রে ?

গোয়ালে গরু দুটোকে বাঁধতে নিয়ে যেতে যেতে থেমে দাঁড়াল যতে কোটাল। হেসে বললে, সে আজ্ঞে কেত্তন গাইছে যে !

—কেত্তন ? বুঝতে না পেরে গিরিজাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

যতে কোটাল থেমে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বললে, সে আজ্ঞে লতুন কেত্তন, লতুন ধারায় আখর তুলছেন তিনি গো।

গিরিজাপ্রসাদ সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলেন।

যতে কোটাল হাসল। বললে, ভোটাভুটি হবে, তার মিটিং হচ্ছে গো গাঁয়ে গাঁয়ে। তার গান বেঁধেছেন উনি, গাইবেন ভোটের মিটিঙে।

গিরিজাপ্রসাদ আর কোনও কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। সেই বংশী, অত সুন্দর কীর্তন গাইত যে, আখর বুনত, সে কিনা ভোটের গান গায় !

যতে কোটাল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, সে আজ্ঞে ভালো গান !

বলেই বিচিত্র সুর দিয়ে দু'কলি গান গেয়ে উঠল :

শোন বন্ধু শোন বলি
এ যে গো ঘোর কলি...
হেথা চোখের কাছে পাকা সরান,
তবু সবাই খোঁজে অলিগলি

গান শেষ না করে সশব্দে হাসতে হাসতে গরু দুটো নিয়ে চলে গেল যতে কোটাল।

গিরিজাপ্রসাদ হাসতে পারলেন না। মনে হল গানটা যেন তাঁকে উদ্দেশ করেই বেঁধেছে বংশী। নাকি অবনীমোহন, গোপেন মোড়লকে...

ধীরে ধীরে বাংলাবাড়ির দাওয়া থেকে চটি টানতে টানতে নেমে এলেন গিরিজাপ্রসাদ, এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর অট্টামার বাড়ির পথ ধরলেন।

না, চলেই যাবেন গিরিজাপ্রসাদ। সব স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেছে, বনপলাশি বদলে গেছে, সেই ফেলে আসা দিনের জীবন নেই, মানুষ নেই, সব—সব বদলে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও অসহ্য লাগে যখন বুঝতে পারেন, তিনি নিজেই বদলে গেছেন।

তা না হলে গিরীন আর মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে এমন ক্ষুদ্র ব্যবহার কি করে করেছিলেন তিনি। সেই প্রথম আসার দিন থেকে। ক'বিঘে জমির মূল্যকে এত বড় মনে হয়েছিল কেন ?

ধীরে ধীরে অট্টামার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন গিরিজাপ্রসাদ। একবার ভাবলেন, ছেলেবেলার মত 'ছোটমা' বলে ডাকবেন কি না !

মিথ্যে স্তোক দিয়ে লাভ নেই, ভাবলেন এক মুহূর্ত। তার চেয়ে অট্টামাকে বলে যাবেন যে, তার অনুরোধ রাখতে পারবেন না তিনি। বলবেন, গ্রাম ছেড়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। গিরীনের কাছে, মোহনপুরের বউয়ের কাছে বাকি জীবনটা কৃতজ্ঞ হয়ে চলতে পারবেন না, কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারবেন না সারা জীবন ধরে। তাই পালাতে চান তিনি এখান থেকে।

চৌকাঠ পার হয়ে অট্টামাকে ডাকতে যাচ্ছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। বাগদিবউ কৌশল্যা তাঁকে দেখতে পেয়ে ঘোমটা টেনে ছুটে গেল অট্টামাকে খবর দিতে।

অট্টামা বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ফোকলা মুখে একমুখ হাসি নিয়ে—আয় পেসাদ, আয়। তুই এয়েছিস আমার ঘরে, কি ভাগ্যিরে আমার, পেসাদ।

বলে এগিয়ে এল অট্টামা। তারপর গিরিজাপ্রসাদকে নিয়ে গিয়ে বসালে অন্ধকূপ গুমোট ঘরখানায়। একটা দুর্গন্ধ এসে লাগল গিরিজাপ্রসাদের নাকে। নোংরা শতচ্ছিন্ন তোশকটার দিকে তাকিয়ে গা গুলিয়ে উঠল তাঁর।

অট্টামা ব্যস্ত হয়ে উঠল গিরিজাপ্রসাদকে আপ্যায়ন করার জন্যে। যেন খুঁজে পাচ্ছে না কোথায় তার পেসাদকে বসাবে, কি খেতে দেবে...

অট্টামার হাড়-জিলজিলে চেহারাটা ছটফট করে বেড়ায়। তখনই ঘরে, তখনই বাইরে। বোধ হয় দেখলে, কৌশল্যা কাছেপিঠে আছে কি না।

তারপর গিরিজাপ্রসাদের কাছে এসে বসে চাপা গলায় বললে, হ্যাঁ রে পেসাদ, সেই কথাটা কেউকে বলিস নাই তো বাবা ?

গিরিজাপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে বলেন, কোন্ কথা ?

অট্টামা মুখ থমথম করে বললে, ওই যে বলেছিলাম গোর দেবার কথা ?

গিরিজাপ্রসাদ উত্তর দেন, না বলিনি।

অট্টামা যেন নিশ্চিন্ত হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, না পেসাদ, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে গোর দিস না বাবা আমায়। খড়ি নদীর ধারে ওই শ্মশানেই, আমি ম'লে, আমার সৎকার করিস বাবা।

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না গিরিজাপ্রসাদ। তাই চমকে ওঠেন অট্টামার কথা শুনে।

কথা বলতে বলতে অট্টামার চোখ-মুখ যেন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বলে, না বাবা, বনপলাশি ছেড়ে কোথাও গিয়ে মন টিকবে না রে আমার, কোথাও না। এই গাঁয়ে জন্মেছি, বিয়ে হয়েছে এখানেই, তারপর ভাশুরের ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছি কোলেপিঠে করে, কত কি দেখলাম পেসাদ, কত কি ঘটল আমার চোখের সামনে, বনপলাশি ছেড়ে কি আমি যেতে পারি বাবা !

একটু থেমে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল অট্টামা। যেন চোখের সামনে সেই পুরনো দিনের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে এমনি উত্তেজনায় আবার বললে, না পেসাদ, আমি ম'লে এখানেই সৎকার করিস বাবা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে। তবু তো আত্মাটা শান্তি পাবে পেসাদ, এ গাঁয়েই থাকতে পাবে।

উত্তেজনায় অনর্গল কথা বলে যায় অট্টামা। আর তার উদ্দীপ্ত চোখমুখের দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন গিরিজাপ্রসাদ !

খবর রটে গেল ক্রমে ক্রমে। সকলেই শুনল, গিরিজাপ্রসাদ গাঁ ছেড়ে চলে যাবেন আবার। বড় চাকরি হয়েছে ছেলের, সেখানেই চলে যাবেন সব ছেড়েছুড়ে।

গোপেন মোড়ল আর নিত্য মল্লিক নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করল সে-খবর শুনে। বললে, আসল ব্যাপারটা জানা গেল না হে।

নিত্য মল্লিক হাসল। তা বটে। পণের টাকা আর গয়নার বদলে জমি ক'বিঘে লিখিয়ে নিলে না তো গিরীন ?

সত্যি, জল্পনাকল্পনার শেষ নেই গাঁয়ে। মোহনপুরের বউ স্বেচ্ছায় নিজের মেয়ের বদলে বিমলার বিয়ে দিয়েছে প্রভাকরের সঙ্গে—এ কথাটা কারও বিশ্বাস হয় না। সকলেই ভাবে, ভিতরে কোনও একটা রহস্য আছে। কেউ ভাবে গিরিজাপ্রসাদই পাত্র ভাঙিয়ে

নিয়েছেন বেশি পণ দিয়ে।

কিন্তু এ সবের কোনও খবর রাখতে চায় না অবিনাশ ডাক্তার। গ্রামের এক প্রান্তে যেমন পড়ে থাকে সে, তেমনি পড়ে ছিল। কোনও খোঁজ-খবরই নিতে আসেনি।

পদ্ম চলে যাওয়ার পর ক'টা দিন যেন মুসড়ে পড়েছিল অবিনাশ ডাক্তার।

সেদিন বাড়ি ফিরে পদ্মকে দেখতে না পেয়ে মোটেই বিস্মিত হয়নি ডাক্তার। ভেবেছিল, পদ্ম কোথায় বেরিয়ে গেছে। হয়তো কোটালপাড়ায় বাপের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

কিন্তু পদ্ম ফেরেনি। আর হঠাৎ অবিনাশ ডাক্তার বারান্দায় পড়ে থাকা ধারালো ছুরিটা কুড়িয়ে পেয়েছে একসময়। ধারালো ছুরির ফলাটা রোদ লেগে চিকচিক করে উঠেছে। তা দেখে ব্যাপারটাকে একটা রহস্যের মত মনে হয়েছে।

তারপর একদিন পাঁচু কোটাল এসেছে দেখা করতে।

বলেছে, পদ্মর খপর পেয়েই এলাম গো ডাক্তারবাবু।

অবিনাশ ডাক্তার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে খবর শোনবার জন্যে।

আর পাঁচু কোটাল হেসে বলেছে, পাগলি মেয়ে গো আমার, বলা নাই কওয়া নাই চলে গেছে উদাসের সঙ্গে।

একটু থেমে বলেছে, কাঁটোয়ায় বাসা করেছে। পাগলি না পাগলি। আমায় বলে গেলে কি মানা করতাম রে বাপু!

শুনে সান্ত্বনা পেয়েছে অবিনাশ ডাক্তার। একটা অজানা রহস্যের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছে।

তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, গুড, পরিত্রাণ পাবে মেয়েটা এ গ্রাম থেকে। উদাস পরিত্রাণ পেয়েছে, পদ্মও পাবে। কিন্তু...

পাঁচু কোটাল কিছু বুঝতে পারেনি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে।

আর সশব্দে হেসে উঠেছে অবিনাশ ডাক্তার। —গ্রামের এই কণ্টকযন্ত্রণা থেকে পালাতে চেয়েছে উদাস, পালাতে চেয়েছে পদ্ম...

হা হা করে সশব্দে হেসে উঠেছে অবিনাশ ডাক্তার। হাসতে হাসতে বলেছে, ভুল, সব ভুল। কোথায় পালাবে? সেও যে কাঁটোয়া—যার নাম কণ্টকনগর। সব নগরই কণ্টকনগর, এভরি সিটি ইজ...

হঠাৎ পাঁচু কোটালের দিকে চোখ পড়তে ইংরেজি কথাটা অসমাপ্ত থেকে গেছে অবিনাশ ডাক্তারের মুখে।

তার বুকের বক্তব্য যেমন বার বার অসমাপ্ত থেকে গেছে। স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছে অবিনাশ ডাক্তার। একটা ব্যথার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। যে কথাটা একদিন পদ্মর কাছে প্রকাশ করে বলতে গিয়ে চোখের কোলে অশ্রু জমে উঠেছিল।—লড়াই থেকে ফিরলাম রে পদ্ম, ভাবলাম, একটা পা গেছে যাক, আরেকটা পা তো আছে। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম, সেই পা-টাও নেই রে, সেই পা-টাও নেই!

বলতে বলতে শিশুর মত কেঁদে ফেলেছিল ডাক্তার। মনে পড়ে গিয়েছিল স্ত্রীর কথা, যে তার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। আর সেই দুঃখেই নগরজীবনের কণ্টকযন্ত্রণা থেকে পালিয়ে এসেছিল ডাক্তার।

তাই পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠে অবিনাশ ডাক্তার বলেছে, কোথায় পালাবি রে উদাস, কোথায় পালাবি পদ্ম, সেও যে কাঁটোয়া, কণ্টকনগর। সব নগরই কণ্টকনগর।

কয়েকটা দিন বিমর্ষ হয়ে কাটিয়ে দিল ডাক্তার। তারপর হঠাৎ যেন নতুন উত্তেজনায় জেগে উঠল। ছোট্ট টাইপরাইটারখানা বের করে খটাখট টাইপ করতে শুরু করলে, চিঠির পর চিঠি।

না, এ গ্রামকে বদলে দেবে অবিনাশ ডাক্তার। এ গ্রামকে ভাঙতে দেবে না।

ইস্কুল-বাড়িটার মত নিঃস্ব হয়ে থাকতে দেবে না বনপলাশি গ্রামকে, মানুষগুলোকে।

কয়েকটা দিন গ্রামের কোনও খবরই রাখেনি সে। বি ডি ও আপিসে, বর্ধমানে ছোটাছুটি করেছে ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে। ইস্কুল-বাড়ি হয়েছে ; এবার মাস্টার চাই, ছাত্রছাত্রী চাই, নতুন জীবন চাই।

তারপর একদিন সেই সুখবরের চিঠিখানা এসেছে।

মাস্টার আসছে, হেডমাস্টার। নতুন হেডমাস্টার এসে নতুন করে গড়ে তুলবে ইস্কুলটা।

চিঠিখানা পেয়েই খাকি বুশ শার্টখানায় হাত দুটো গলিয়ে দিয়ে বোতাম আঁটতে আঁটতে কাঠের ক্রাচ দুটো তুলে নিল অবিনাশ ডাক্তার।

সব ব্যথা-বেদনা ডুবিয়ে দেবার মত একটা সমুদ্র পেয়েছে সে, কাজের সমুদ্র।

ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করে অবিনাশ ডাক্তার, গিরিজাপ্রসাদের উদ্দেশে। এমন একটা সুখবর—গিরিজাপ্রসাদ নিশ্চয় খুশি হবেন। নতুন করে স্বপ্ন দেখবেন বনপলাশির।

ক্রাচে ভর দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বুশ শার্টটার দিকে চোখ পড়ে অবিনাশ ডাক্তারের। কি আশ্চর্য ! ধোপ খেয়ে খেয়ে কখন খাকি রংটা ধুয়ে মুছে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। ফর্সা ধপধপে সাদা !

অবিনাশ ডাক্তারের মনের ভিতরের খাকি রংটাও কখনও বুঝি সাদা হয়ে গেছে।

চিঠিখানা এক হাতে ধরে দ্রুত খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিরিজাপ্রসাদের বাংলাবাড়ির সরু গলিটায় ঢুকলেন অবিনাশ ডাক্তার। সারা শরীরে তার অদ্ভুত এক উত্তেজনা।

বাংলাবাড়ির সামনে দু'খানা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন গিরিজাপ্রসাদ।

অবিনাশ ডাক্তার চিঠিখানা দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল। —গুড নিউজ, মাস্টারমশাই, ভেরি ভেরি গুড নিউজ। মেশিনগান নয়, এই দেখুন, কি অসাধ্য সাধন করেছি।

গিরিজাপ্রসাদ এগিয়ে এলেন।

অবিনাশ ডাক্তার তখনও বলে চলেছে, রাইট আদায় করে না নিলে কে দেবে বলুন, দান তো নয়, ইট ইজ আওয়ার রাইট...এই দেখুন।

বলে চিঠিখানা গিরিজাপ্রসাদকে দিল অবিনাশ ডাক্তার।

গিরিজাপ্রসাদ পড়লেন চিঠিখানা, তারপর ধীরে ধীরে ফেরত দিলেন অবিনাশ ডাক্তারের হাতে।

বললেন, আমি, আমি চলে যাচ্ছি ডাক্তার, গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছেন ? চমকে উঠল অবিনাশ ডাক্তার। —অ্যাঁ ? চলে যাচ্ছেন ? এসকেপ ? এসকেপিং ফ্রম দিস ভিলেজ ?

গিরিজাপ্রসাদ জবাব দিলেন না, মাথা নিচু করে রইলেন।

উনচল্লিশ

গিরীনকেও প্রথমটা মুখ ফুটে বলতে পারেননি গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু একে একে সকলেই শুনল। সকলেই জানল, গিরিজাপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

অথচ এবার আর কোথাও কোনও চাঞ্চল্য নেই। গিরিজাপ্রসাদ আসছেন শুনে সকলের মনেই যে আশা-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, গিরিজাপ্রসাদ এসে পৌঁছনোর আগে যাদের আলাপ-আলোচনায় একটা অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠেছিল, বিদায়লগ্নে তাদের মনে এতটুকু ব্যথার ছাপও বুঝি রেখে যেতে পারলেন না।

গোপেন মোড়ল আর নিত্য মল্লিক এল। অবিনাশ ডাক্তার দাঁড়িয়ে রইল উদ্‌ভ্রান্তের মত। এল না শুধু বংশী।

যতে কোটাল গাড়ি জুততে হবে কি না জিগ্যেস করলে।

আর গিরিজাপ্রসাদ জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, বংশী গাঁয়ে নেই না কি রে?

যতে কোটাল হাসল। বললে, সে পাগল মানুষ গো, ঠিকঠিকানা আছে নাকি তাঁর। দেখবেন যান গিয়ে, মাথায় পাগ বেঁধে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন ভোটাভুটির মিটিঙে। নিজেই গান বাঁধছেন গো, শোনেন ক্যানে। বলেই হাতের পাঁচন তুলে সুর টেনে টেনে এক কলি গান গেয়ে উঠল যতে :

হেথা চোখের কাছে পাকা সরান
তবু সবাই খোঁজে অলিগলি,
হেথা সোনার খাঁড়ায় নারীরা হয়গো বলি,
এ যে গো ঘোর কলি...

বলেই হা হা করে সশব্দে হেসে উঠল যতে কোটাল। গোপেন মোড়ল আর নিত্য মল্লিকও হেসে উঠল।

অবিনাশ ডাক্তারের এসব দিকে কান নেই। গিরিজাপ্রসাদ চলে যাচ্ছেন এ-খবরে মানুষটা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বলছে, চলে যাচ্ছেন? এসকেপ?

গিরিজাপ্রসাদ ফিরে তাকালেন মোহনপুরের বউয়ের দিকে। টিয়ার দিকে। মোহনপুরের বউয়ের মুখটা ঘোমটায় ঢাকা। টিয়ার চোখে জল। তাকাতে পারলেন না গিরিজাপ্রসাদ। মুখ ফেরালেন।

নিভাননী গাড়িতে উঠলেন। গিরীন এগিয়ে এসে খড়ের ওপর বিছোনো কম্বলটা ঠিক করে পেতে দিল। কমলা উঠল।

গিরিজাপ্রসাদও উঠে পড়বেন কিনা ভাবছিলেন। অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ইতস্তত করছিলেন।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাক এল। —পেসাদ, অ পেসাদ। চললি নিকি বাবা!

সকলেই ফিরে তাকাল। দেখলে, ওদিকের তেঁতুলতলার পাশ দিয়ে জল-কাদার রাস্তা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে অট্টামা আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াল অট্টামা, ছানিপড়া চোখে এদিক ওদিক তাকাল, তারপর বললে, হ্যাঁ রে পেসাদ, চুপিচুপি পালাচ্ছিস; অট্টামাকে একটু খপর দিতে নাই? বলে না, 'আমার আমার মুখে বড়াই, তামার গড়ায় বালা', সেই বিত্তান্ত।

বলেই গাড়ির ভেতরে উঁকি দেয় অট্টামা। তারপর কাপড়ের আড়াল থেকে একটা হাত বের করে। হাতে একতাল তেঁতুল।

নিভাননীকে সেটা দিয়ে বললে, নে বউ, বলছিলি পুরনো তেঁতুল পাস না সেখানে,

তাই নিয়ে এলাম।

বলে কুমির গালটা টিপে চিবুকে হাত ছুঁইয়ে হাতটা নিজের মুখে ঠেকিয়ে চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করে। তারপর ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায় গিরিজাপ্রসাদের সামনে।

গোপেন মোড়ল অট্টামাকে দেখে ঠাট্টা করে বলে, তুমিও চলে যাও গো ওদের সঙ্গে, কত কি দেখে আসবে...কখনও গাঁ ছেড়ে গেলে না।

অট্টামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। গোপেন মোড়লের মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে, ক্যানে, ক্যানে যাব রে গাঁ ছেড়ে ?

তারপরই মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে, এ গাঁ ছেড়ে কোথায় যাব রে ? এ গাঁ ছেড়ে যেতে মন সরে কারও ? এই গাঁয়ে জন্মেছি, এই গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে, তারপর... কত কি দেখলাম বাবা, ভাশুরের ছেলেমেয়েদের মানুষ করলাম কোলে নিয়ে, বিয়ে দিলাম... নাতি-নাতনি...এ গাঁয়ের সঙ্গে যে সব মাখামাখি হয়ে আছে রে আমার। সব, সব। ভাশুরপোরা আজ আর খপর নেয় না, কিন্তু তারা সেই ছোট্টটি হয়ে আমার কোলে হাসছে, আমি যে দেখতে পাই রে। এ গাঁ ছেড়ে মন সরে, তোরাই বল ?

এতখানি একটানা কথা বলে হাঁপাতে থাকে অট্টামা। একটু থেমে আবার বলে, যারা যাবার তারা যাবেই, তবু বনপলাশি থাকবে রে, থাকবে। কত নতুন মানুষ আসবে, ইস্কুল হবে, ডাক্তারখানা হবে, কত কি দেখলাম, বাকিটা দেখব না রে !

কথা বলতে বলতে সারা মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর গিরিজাপ্রসাদ সেদিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করেন। বুঝতে পারেন না, অট্টামার হৃদয়ের গভীর থেকে সব ব্যথা বেদনা বিষণ্ণতা মুছে গিয়ে কি অবোধ্য আনন্দে তার ফোকলা মুখখানা হেসে উঠছে।

অট্টামাকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসেন গিরিজাপ্রসাদ। অসহ্য, অসহ্য লাগছে তাঁর।

গরু দু'জোড়া নিয়ে এসে যতে কোটাল আর নলে বাউড়ি গাড়ি জুতে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

সকলেই পিছনে পিছনে গেল খানিকদূর অবধি। তারপর একে একে থেমে পড়ল গোপেন মোড়ল, নিত্য মল্লিক, অবিনাশ ডাক্তার। মোহনপুরের বউ ঘোমটার দু'আঙুল ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল চলন্ত গাড়ি দুটোর দিকে।

শুধু টিয়া আর অট্টামা গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত এল, যেখানে তালগাছের সারির পাশ দিয়ে পথটা বাঁক নিয়েছে।

গাড়ির ছাউনির ভিতর থেকে একদৃষ্টে পিছন পানে তাকিয়ে আছেন গিরিজাপ্রসাদ। অট্টামাকে দেখতে পাচ্ছেন, টিয়াকেও।

একটু একটু করে গাড়ি দু'খানা এগিয়ে চলেছে। আর একটু পরেই কাঁদরে নামবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টামা আর টিয়াকে দেখা যাবে না, রায়বাড়ির চালাটা দেখা যাবে না, বনপলাশি—তাও হয়তো মুছে যাবে।

মুছে গেল। আর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গিরিজাপ্রসাদের বুক নিঙড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা মুক্তি অনুভব করলেন গিরিজাপ্রসাদ। বন্ধন থেকে মুক্তি।

আশ্চর্য! এতকাল ভেবেছিলেন, বনপলাশি বদলে গেছে, শৈশবের সেই গ্রাম আর নেই। আছে, সব আছে। ঠিক তেমনি।

বদলে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ নিজেই। তিনি নিজেই শুধু বদলে গেছেন। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, তন্ময়তা ভাঙল যতে কোটালের কথায়।

—মটর বাসের সময় হয়ে গেছে আজ্ঞে।

—হুঁ। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ, তারপর কালো 'কারে' বাঁধা পকেটঘড়িটা বের করে সময় দেখলেন। বহুদিন থেমে ছিল ঘড়িটা, এখন আবার চলতে শুরু করেছে। বললেন, তাড়াতাড়ি চালা একটু। বাস পেলে আর ট্রেনে যাব না।

যতে গরু দুটোর পিঠে পাঁচন বসিয়ে বললে, হুঁ আজ্ঞে, মটর বাস অনেক আগে যেয়ে পৌঁছুবে।

কাঁদর পার হয়েই সামনের দিকে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। সেই বাজে-পোড়া গাছটা, সেই সাঁওতাল পাড়া, একটা বাচ্চা মেয়ে পুকুরের ঘাটে বসে বাসন মাজছে, একটা চার বছরের ন্যাংটো ছেলে, কোমরের ঘুনসিতে তাবিজ...একটা কঞ্চি নিয়ে হাঁসগুলোর পিছনে ধাওয়া করছে টলতে টলতে...

সেই প্রথম যেবার কলকাতা গিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, একটা মাদুলি এনে দিয়েছিল বংশী। সাঁওতাল ছেলেটার কোমরে বাঁধা তাবিজটা দেখে মনে পড়ে গেল।

গিরিজাপ্রসাদ ক্ষোভের স্বরে বললেন, বংশী এল না রে!

—তাঁর কি সময় আছে গো এখন। তা আপনার বড় ভালো গাইছেন গো, গলা ফিরে পেয়েছেন। আর কি ভিড় যে হচ্ছে তাঁর গান শুনতে!

বলেই গলা ছেড়ে সুর টেনে গাইলে যতে কোটাল:

হেথা বামুনকায়েত চাষীবাসী
সবাই করে দলাদলি,
তাই দেখে রাজা ঘুমায়
প্যায়দাগুলো যায় গো মোদের
পায়ে দলি।

গান থামিয়েই সামনে বাবু মতন কাকে আসতে দেখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, কোথায় যাবেন গো?

গিরিজাপ্রসাদ ফিরে তাকান। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়সের ছিমছাম চেহারার এক ছোকরা, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি।

উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন আসে, বনপলাশি এই পথে?

—হ্যাঁ গো বাবু, কার বাড়িতে যাবেন?

কোনও উত্তর না দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যায় সে।

গিরিজাপ্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। জুতো মচমচ করে বনপলাশির দিকে চলেছে লোকটি। হঠাৎ গিরিজাপ্রসাদের সন্দেহ হয়, ওই হয়তো ইস্কুলের নতুন হেডমাস্টার। কে জানে!

বুকের কোণে একটা খোঁচা লাগে। কত স্বপ্ন, কত আদর্শ নিয়ে একদিন মাস্টারি করতে গিয়েছিলেন। কত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর হেডমাস্টার হয়েছিলেন। আর এখন? এই বয়সে কি শিখেছে এরা, কতটুকু জানে ছেলেদের মন!

এদিকে গাড়িটা ছুটতে শুরু করেছে পাকা সরান পেয়ে।

যতে কোটালও গান ধরেছে আবার:

হেথা চোখের কাছে পাকা সরান
তবু সবাই খোঁজে অলিগলি,
হেথা গরিব হয়গো আরও গরিব
ধনীরা হয় ধনী কেবলি।

বলেই পাঁচন তুলে দূরের বলগাঁ স্টেশনের দিকে দেখালে। তারপর বললে, ওই যে আজ্ঞে, ধানকলের চিমনিতে ধোঁয়া ছাড়ছে। বলে, নিজের মনেই বলে উঠল, লাও গো

মোড়লের পো, করে লাও, দু-চার দিন বই তো লয় !

গিরিজাপ্রসাদ কল্পনার চোখে ওই ছিমছাম চেহারার তরুণটির পাশে টিয়াকে দাঁড় করিয়ে নিজের মনেই হাসছিলেন। যতে কোটালের কথায় তন্ময়তা ভেঙে গেল। আশ্চর্য, বংশীর সেই জ্বালাটা যেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, এই যতে কোটালের মধ্যেও।

পাশাপাশি অবিনাশ ডাক্তারের কথা মনে পড়ে যায়। সান্ত্বনা পান। এখনও আছে, অবিনাশ ডাক্তারের মত লোক আছে।—রাইট আদায় করে না নিলে কে দেবে বলুন। দান তো নয়, ইট ইজ আওয়ার রাইট।

গাড়িটা ততক্ষণে বাজে-পোড়া গাছটার কাছে বাস রাস্তার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকে মোটর বাস আসছে। দেখতে পাচ্ছেন গিরিজাপ্রসাদ। পিছনে ধুলো উড়ছে।

রাস্তার ধারে ধারে খোয়া পড়ে আছে, রাশি রাশি কালো পাথরের টুকরো। রাস্তা মেরামত হবে। তারও ধারে ধারে বাবুরি বনতুলসী, বনকুলের ঝোপ, আকন্দের ঝোপ।

মোটর বাসটা এসে দাঁড়াতেই যতে কোটাল আর নলে বাউড়ি বাসের মাথায় মালপত্র তুলে দিতে গেল। সেদিকেই তাকিয়ে দেখছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, মালপত্র ঠিকঠাক করে তোলা হচ্ছে কি না।

হঠাৎ ড্রাইভারের আসন থেকে লোকটা নেমে এল। পরনে নীল রঙের ফুলপ্যান্ট, গলায় একটা রঙিন সিল্কের রুমাল। এগিয়ে এসে সে হঠাৎ বললে, গড় হইগো রায়জ্যাঠা। বলে গিরিজাপ্রসাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

গিরিজাপ্রসাদ প্রথমটা চিনতে পারেননি। চিনতে পেরে বিস্ময়ে তাকালেন তার মুখের দিকে।—উদাস ?

বিনয়ে ঘাড় নেড়ে হাসল উদাস। তারপর ঠিক তার পিছনের আসনের খাঁচাটার মধ্যে তুলে নিল সবাইকে।—ফাস্ট কেলাশে বসুন গো আপনারা।

গিরিজাপ্রসাদ, নিভাননী ও কমলাকে ফার্স্ট ক্লাশের খাঁচাটায় বসাতে পেরে যেন খুব খুশি হয়েছে উদাস। চিরকাল যাদের কাছ থেকে শুধু চেয়েই এসেছে, আজ প্রথম যেন তাদের একজনকে কিছু দিতে পেরে কিছুটা অহঙ্কার বোধ করছে সে।

মোটর বাস ধুলো উড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে।

বাজে-পোড়া গাছটা, সাঁওতাল পাড়া, বনপলাশির আঁকাবাঁকা মেঠো পথ সব একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে।

গিরিজাপ্রসাদ তখনও তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছেন। ভাবছেন হয়তো, বংশীর ছেলে উদাস—সেই উদাস, যে কি না প্রথম দিন তাঁর কাছ থেকে হ্যাজাক কেনার টাকা নিতে এসে রায়জ্যাঠা বলে ডাকতে চায়নি, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়নি, শুধু সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে ডেকেছিল তাঁকে, কাঁধের চুল ঝাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল টাকা ক'টা নিয়েই—আজ ড্রাইভারির চাকরির মধ্যে ও নিশ্চয় কোনও সার্থকতা পেয়েছে জীবনের, নিজের হীনতা ভুলতে পেরেছে। তা না হলে পা ছুঁয়ে গড় করল কেন ?

কিংবা অন্য কিছু হয়তো ভাবছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

পিছনে পিছনে আসছে বৃত্তাকারে বেঁকে যাওয়া রেলের লাইন। ছোট লাইন—আর একটু পরেই দৈত্যের মত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসবে ডি ভি সি-র ইলেকট্রিকের থামগুলো...মনে হবে রণ-পা ফেলে সেগুলো এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে।

নিভাননী বসে আছেন চুপচাপ, কমলা জানলায় মুখ রেখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, গিরিজাপ্রসাদও নির্বাক।

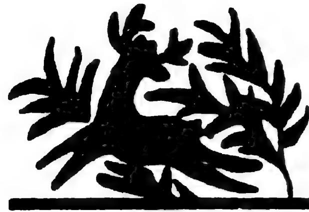
গিরিজাপ্রসাদের ইচ্ছে হচ্ছিল, পদ্মর কথা জিগ্যেস করেন উদাসকে। পারলেন না। সঙ্কোচ বোধ করলেন। জিগ্যেস করলেও কি উত্তর দেবে উদাস ? সব প্রশ্নের কি উত্তর

মেলে জীবনে ?

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গিরিজাপ্রসাদের বুক নিঙড়ে।

পিছন ফিরে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। দূরে এতক্ষণ বনপলাশির তালগাছের সারি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, খড়ি নদীর আঁকাবাঁকা রেখাটা এক-একবার দেখা দিচ্ছিল, ওই বাঁকটার পাড়েই ছিল গোঁসাইদিদির কুঞ্জ...বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে সেটা মাটিতে মিশে গেছে, সেই আঁকাবাঁকা মেঠো পথ—যে পথ দিয়ে পালকি চেপে কোঙারদের মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল—গায়ে লাল বেনারসি, সিঁথিতে সিঁদুর, গালে কপালে চন্দনের টিপ—তারপর আবার ফিরে এসেছিল—সেই পথ...বনপলাশির মেটে বাড়ির খড়ের চাল—সব দেখা দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। এখন সব, সব মুছে গেছে চোখের সামনে থেকে।

কালো 'কারে' বাঁধা পকেট-ঘড়িটা বের করে আবার একবার সময় দেখলেন গিরিজাপ্রসাদ। সময়ের রাজ্যে প্রবেশ করলেন।



ছাদ



তুচ্ছ একটি খবর পরিবারের সকলকে চমকে দিয়ে গেল। খবরটা সত্যি না মিথ্যে তা কেউ যাচাই করে দেখার কথা ভাবল না। যাচাই করার উপায়ও অবশ্য ছিল না।

সোমনাথবাবুর মুখ দেখে স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হল তিনি ঈষৎ খুশি হয়েছেন। কিংবা উচ্ছ্বাস চাপা দেওয়ার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী ভিতরের আনন্দটুকু ওঁর অবসরপ্রাপ্ত মুখের টানাপোড়েনে তেমন স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল না।

সোমনাথবাবু অনেকদিন হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। আগেকার দিন হলে কাশীবাস করতেন। সস্তার বাজারে আরও সস্তার জায়গা ছিল কাশী, কাব্য করে বলা হত বারাণসী। সোমনাথবাবুর বাবা ওখানেই শেষ জীবন কাটিয়েছেন, মারা গেছেন। ধর্মের টান, বাবা বিশ্বনাথের আকর্ষণ, নাকি ওখানকার সস্তাগণ্ডার বাজার, কোনটা যে সেকালের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওখানে টেনে নিয়ে যেত, সোমনাথবাবু এতকাল নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। আজকাল একটু একটু করে বুঝতে পারছেন, কিন্তু খবর নিয়ে দেখেছেন এখন আর কোথাও অল্প পুঁজির স্বর্গরাজ্য নেই। না মফস্বল শহরে, না গ্রামে-গঞ্জে। সোমনাথবাবুর বাবার নাম ছিল হংসনারায়ণ। কিন্তু পরমহংস হওয়ার সাধ তাঁর আদৌ ছিল না। ডাকবিভাগে চাকরি করতেন, আজ এ ডাকঘর, কাল ও ডাকঘর, ঘুরতে ঘুরতে শেষ অবধি মাঝারি ধাপ অবধি উঠেছিলেন। পেনশন যৎসামান্য, মাসে মাসে যেটুকু জমাতে পেরেছিলেন মেয়েদের বিয়ে দিতেই খরচ হয়ে গিয়েছিল। ছোট মেয়ের বিয়ের জন্যে পেনশনের কিছুটা বিক্রিও করে দিয়েছিলেন। পেনশন কমিউট করাকে বলত বিক্রি করে দেওয়া, তাতে হাতে কিছু নগদ টাকা আসত। নগদ উড়ে যেত দুদিনেই, পরে মাসে মাসে পেনশনের ভাঙচুর টাকাটা নিতে গিয়ে আক্ষেপের অন্ত থাকত না। সোমনাথের চাকরি এবং সংসার হওয়ার পর হংসনারায়ণ হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, ভাবছি তোর মাকে নিয়ে কাশীতে গিয়ে থাকব। মা বলেছিল, ধর্মকর্ম করার তো সুযোগ কখনও হল না, শেষজীবনটা বাবা বিশ্বনাথের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব।

সোমনাথ বিশ্বাস করেছিলেন।

এখন বুঝতে পারেন।

কিন্তু সোমনাথ এখন কোথায় যাবেন। এখন আর অভাবী মানুষদের জন্যে কোন বাবা বিশ্বনাথ নেই, কোন কাশীধাম নেই। দশাশ্বমেধ ঘাটের সেই প্রকাণ্ড ছাতাগুলো গঙ্গামৃত্তিকার তিলক কেটে দিয়ে এখন আর দারিদ্র্যকে আড়াল করতে পারে না। মফস্বলেও বাড়িভাড়া প্রচণ্ড বেড়ে গেছে, জিনিসপত্রের দাম আগুন। গ্রামে শান্তি নেই, জমিজমা যেটুকু ছিল তাও রাখতে পারেননি। এখন আক্ষেপ হয়, সময় থাকতে থাকতে বেচে দিয়ে যদি কোথাও একটা ছোটখাটো বাড়ি করে নিতেন। এখন সে-সব জমি বেদখল, বর্গা, কিংবা সরকারের গর্ভে। ক্ষতিপূরণের নামমাত্র টাকা, তাও আদায় করা দুঃসাধ্য।

এদিকে সোমনাথের পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। একটা সেকেলে আধা-সাহেব কোম্পানিতে চাকরি করেছেন, অনেক উঁচু অবধি উঠেছিলেন, এবং সেটাই এখন কাল হয়েছে। মানুষ যেখানে গিয়ে পৌঁছয় সেখানেই থাকতে চায়। সেখানে থাকতে পারলে, থাকতে পেলে,

তার মানমর্যাদা। নেমে আসতে হলেই কি লজ্জা!

হংসনারায়ণের সময়ে এ-সব ছিল না। তখন পুঁজি ফুরিয়ে এলেই বলা যেত, বাবা বিশ্বনাথ ডাকছেন। কিংবা কেউ কেউ বলত, এই ঘিঞ্জি শহর আর ভাল লাগে না, দেশ-গাঁয়ে চলে যাচ্ছি। পুকুরের মাছ, আমবাগান, শান্ত নিস্তব্ধ দুপুর, খোলা আকাশ। আরও কত সব কাব্য। সোমনাথ জানেন, এ সবই বানানো অজুহাত। গ্রামে সেই শান্তি থাকলে কেউ গ্রাম ছেড়ে আসত না। এই কলকাতা শহরটা তো গ্রামের মানুষরাই গড়ে তুলেছে! রুজি-রোজগারের ধান্দায়।

তবু মানমর্যাদা বাঁচাবার একটা উপায় ছিল। চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে সটান গ্রামে চলে যেত অনেকেই। লোকে বিশ্বাস করত সত্যি সত্যি গ্রামের নিসর্গ সৌন্দর্যের টানেই লোকটা বানপ্রস্থ নিয়েছে। কিংবা শৈশবস্মৃতির টানে।

একালে তা হবার উপায় নেই। সকলেই বুঝে ফেলবে ব্যাপারটা কি। আসলে পুঁজি ফুরিয়ে গেছে।

অথচ ওই টাকাটার দিকে তাকিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন সোমনাথ। ওটাকেই ভেবেছিলেন নিরাপত্তা, ওটাকেই ভেবেছিলেন ভবিষ্যৎ। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের স্বাস্থ্যবান ঋজু শরীরের মধ্যে তখন একটা আত্মবিশ্বাস ছিল। সে আত্মবিশ্বাস টাকা দিয়ে কেনা যায় না, টাকার জন্যে গড়ে ওঠে না। একটা আদর্শের পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন সোমনাথ। সেই সব আদর্শের বর্ম পরে এতদিন কাটিয়ে এসেছেন। এখন সেই গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে পড়ছে বলে এক একসময় বড় বিচলিত হয়ে ওঠেন।

সোমনাথের চেহারায় একটা ব্যক্তিত্ব আছে, চশমার ফ্রেমে পদমর্যাদা। সেই পদ ছেড়ে এসেছেন বহুকাল আগেই, পোশাক পরিচ্ছদে অতিব্যবহারের চিহ্ন, কিন্তু চশমার ফ্রেমেই যেন অতীত গৌরবের সাক্ষ্য। তবে এ-সব ছাড়িয়ে সোমনাথের চেহারায় চরিত্রে আরেকটা জিনিস ফুটে ওঠে। আত্মমর্যাদা। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকব না, ছেলেদের রোজগারে ভাগ বসাব না। গর্ব করেই বলতেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, মৃত্যুর দিন অবধি নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকব।

রিটায়ারমেন্টের সময় কোন এক সহকর্মী ওঁকে স্তোক দিতে এসেছিল। আপনার আর চিন্তা কিসের, দু-দুটো উপযুক্ত ছেলে রয়েছে···

সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, এক্সকিউজ মি, ছেলেকে যারা লাইফ ইনসিওরেন্স ভাবে আমি তাদের দলে নেই।

স্ত্রীকে একদিন বলেছিলেন, ছেলেদের জন্যে স্নেহ-ভালবাসা থাকবে, মায়া-মমতা থাকবে, ছেলে যখন, ওদের জন্যে দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ভালবাসতে গিয়ে তোষামোদ ক'রো না। আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আছে, গ্র্যাচুইটি আছে, তোমার এত ভাবনা কিসের।

অথচ ছেলে তো দূর কথা, বৌমাদের কারও সামান্য কোন অসুখবিসুখ হলে এই মানুষটারই উদ্বেগের শেষ থাকে না। টেলিফোন তো এখন যন্ত্র নয়, যন্ত্রণা। ডায়েল করে করে না পেলে এই বৃদ্ধ বয়সে নিজেই দুপুর রোদ্দুরে চলে যাবেন ডাক্তারের কাছে। ছেলেরা কেউ ফিরে এসে বকাবকি করলে সোমনাথ বলবেন, তা বাড়িতে আর কেউ পুরুষ মানুষ নেই, আমি না গেলে কে যাবে?

পুত্রবধূরা আড়ালে হেসে গড়াগড়ি দেয়। পুরুষ মানুষ! আসলে ওদের চোখে সোমনাথ এখন শিশু। স্বামীর কাছে অভিযোগ করে, বাবা তো দপদপিয়ে চলে গেলেন, আমরা ভেবে মরি, কোথায় রোদ্দুরে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন, কোথায় গাড়ি চাপা পড়বেন···

সোমনাথের তা মনে হয় না। ওঁর ধারণা, আগের মতই শক্তসমর্থ আছেন। এই তো দিব্যি হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন, সিঁড়ি ভেঙে ছাদেও উঠছেন। শুধু বাসে উঠলে, দাঁড়িয়ে থাকতে হলে, একটু ব্যালেন্সের অভাব বোধ করেন। সে এমন কিছু নয়।

ওঁর চিন্তা এখন শুধু ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স নিয়ে। কারণ পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। কেন এবং কি-ভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারেন না।

সংসার চলছে এখন ছেলেদের টাকায়। কিন্তু সোমনাথ নিজেকে নিজেই চালান। কোন্ ছেলে কত দেয় কিছুই খবর রাখেন না। বছর পনেরো আগে, তখন চাকরি করেন, দুম্ করে একটা ভালো মত প্রোমোশন হ'ল, মাইনে বাড়ল। সোমনাথের নিজের ইচ্ছেয় যত-না, ছেলেমেয়েদের চাপে পড়ে ডোভার লেনের এই সুন্দর তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে আসতে হ'ল। বড় ছেলে নিরঞ্জন তখন বিয়ে করেছে, একটা বাচ্চা ছেলে আছে, সে প্রায়ই ঘরের অভাব নিয়ে অনুযোগ করত। সোমনাথ ভাবতেন, ওটা আসলে হয়তো বউ-ছেলে নিয়ে পৃথক ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার ইচ্ছে। ভাবতে খারাপ লাগত। এক সঙ্গে থাকার একটা আনন্দ আছে না! কিন্তু একালের ছেলেরা কি আর ও-সব বুঝবে। সোমনাথ জানতেন একদিন না একদিন ছেলেরা আলাদা হয়ে যাবে। তার জন্যে নিজেকে তৈরি করেও রেখেছিলেন।

কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ সোমনাথ অবশ্য নিজেও বুঝতে পারেন না।

অফিসের অমিয়ভূষণ একদিন জয়েন্ট ফ্যামিলির খুব গুণগান করছিল। যাই বলুন, এক ছাদের তলায় একটা বিরাট পরিবার, হাসি আনন্দ হৈচৈ, কারও কিছু হ'লে সব্বাই ছুটে আসবে, তাছাড়া খরচের দিক থেকেও...

সোমনাথ হেসে বলেছিলেন, বাজে কথা। জয়েন্ট ফ্যামিলি তো আমি দেখেছি, কেবল হিংসে, রেষারেষি, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষি।

অমিয়ভূষণ বাধা দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী দুটি প্রাণী ঘরের দু'দিকে দুজন মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে, সেটাই কি মনে করেন খুব শান্তি?

সোমনাথ হেসেছিলেন।—হ্যাঁ, কারণ তাদের স্বাধীনতা আছে, অন্তত তারা মনে করে। তাদের রোজগার তারা কিভাবে খরচ করবে, নাইট শোয়ে সিনেমা দেখবে কিনা, ছেলের অসুখে অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি...

সোমনাথ এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন, যেন তিনি ওই ছোট্ট পরিবার সুখী পরিবারের পক্ষে, জয়েন্ট ফ্যামিলি আদৌ পছন্দ করেন না।

অমিয়ভূষণ তাই বলে বসল, বুঝবেন বুঝবেন, ছেলে যখন আলাদা হতে চাইবে বুঝতে পারবেন।

গলার স্বরে এবং কথার সুরে অমিয়ভূষণ যেন তার বার্ধক্যের ইতিহাস প্রকাশ করে ফেলল।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন সোমনাথ। যেন বুকের ওপর একটা ঘা খেলেন।

থমকে গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর থমথমে গলায় বললেন, আই এগ্রি। ব্যথা পাব, কষ্ট হবে। কিন্তু কোনটা ভালো, আর কোনটা মন্দ, কে ডিসাইড করে জানেন? দ্য ইকনমিক ফ্যাক্টর।

অমিয়ভূষণ অবাক হয়ে তাকাল সোমনাথের মুখের দিকে। অস্ফুটে বলল, মানে?

সোমনাথ এ ধরনের তর্ক পেলে আর কিছু চান না।

হাসতে হাসতে বললেন, জয়েন্ট ফ্যামিলি ভাল বলে লোকে তাকে ডেকে নিয়ে আসেনি। সোর্স অফ ইনকাম ছিল জমি কিংবা জমিদারি, কিংবা ব্যবসা, সেটা সারা পরিবারের, সেজন্যেই সমস্ত পরিবার ছিল একান্নবর্তী। কারও কোন ভয়েস ছিল না, হেড

অফ দি ফ্যামিলিই সব।

অমিয়ভূষণ বললে, সে তো জানি। একজনের রোজগার বেশি, আর একজনের কম হলেই ভাঙন শুরু হয়।

সোমনাথ বললেন, একজনের স্বাধীনতা বেশি, একজনের স্বাধীনতা কম হলেও। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে কারও কোনও স্বাধীনতা ছিল না।

অমিয়ভূষণ ঠাট্টার স্বরে বললে, স্বাধীনতা বলতে ওরা কি বোঝে জানি না।

সোমনাথ চুপ করে রইলেন, কি যেন ভাবলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, টাকার বিনিময়ে যা বিসর্জন দেওয়া যেত।

এ-সব অনেক আগেকার কথা, এখন সোমনাথের হঠাৎ এক-একদিন মনে পড়ে যায়। রিটায়ার করার এতকাল পরে।

বড় ছেলে শুধুই ঘরের অভাব নিয়ে অনুযোগ করত। সোমনাথের বিরাট একটা লিফ্‌ট হয়েছে তখন। আধা-সাহেব কোম্পানিতে উঁচু ধাপের চাকরি, মোটা মাইনে। 'তুমি তো এবার বাড়িভাড়া পাবে অনেক বেশি, এই ভাঙা বাড়িতে আর থাকা উচিত নয়।' ছোটছেলে সুরঞ্জন বলেছিল।

এ-সব দিকে সোমনাথের কখনও কোনও কামনা-বাসনা ছিল না। ছিমছাম ছাদওয়ালা একটা বাড়ি হলেই হল। তার বেশি কিছু চাননি। স্যুটবুট পরতেন, দামি জুতোও। আপিসের স্টেশন ওয়াগন নিয়ে যেত, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। বাড়ি ফিরেই সে-সব আদবকায়দা গা থেকে খুলে ফেলতে পারলেই সোমনাথ আসল মানুষ।

সোমনাথের নিজের মধ্যেও একটা সুপ্ত ইচ্ছে ছিল কিনা কে জানে, হঠাৎ একদিন বললেন, তোরা সবাই যখন বলছিস, দ্যাখ তা হলে।

অর্থাৎ ভাল একখানা বাড়ি বা ফ্ল্যাট।

বাড়ি কোথায় জুটবে, শেষ অবধি ডোভার লেনের এই নতুন বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটখানাই পছন্দ হল। বেশ স্পেশাস। তিনঘরের দুখানা পাশাপাশি ফ্ল্যাট জুড়ে রীতিমত রাজসিক ব্যাপার। সে প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনা। তখনকার বাজারে ভাড়াটা বেশিই মনে হয়েছিল। ছশো টাকা।

ইতিমধ্যে কলকাতায় বাড়িভাড়া বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সোমনাথ নিশ্চিন্ত, তাঁর ছেলেরা কেউ তাঁকে ছেড়ে যাবে না। দ্য ইকনমিক ফ্যাক্টর। মনে পড়ে যায় একদিন অমিয়ভূষণের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু কি চরম সত্য। যখন বলেছিলেন, তখনও তার সত্যতা সম্পর্কে এমন নিঃসন্দেহ ছিলেন না।

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিরঞ্জন কিংবা সুরঞ্জন আলাদা হবে, কিংবা অন্য কোথাও উঠে যাবে, এই আশঙ্কা এখন আর নেই। সে ভয় উবে গেছে। এক যদি না কেউ অফিসের ফ্ল্যাট পেয়ে যায়।

এক এক সময় সোমনাথের নিজেকে বড় বেশি স্বার্থপর মনে হয়। যেন ছেলেদের উন্নতি চান না। অর্থাৎ ছেলেদের উন্নতিকে ভয় পান। অথচ ছেলেদের মানুষ করার জন্যে একসময় কি না করেছেন। তখন মাইনে কম, নীচের ধাপের চাকরি, আপিসে খাটাখাটুনি, তবু নিজেই দুবেলা ছেলেদের পড়াতেন। অফিসে একটু একটু করে ওপরে উঠেছেন, মাইনে বেড়েছে, আর নিজেদের সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে খরচ করেছেন ছেলেদের জন্যে। ভাল স্কুল, ভাল কলেজ, বাড়িতে ভাল টিউটর। ছেলেদের নিয়ে কত কি স্বপ্ন দেখতেন। তারা বড় হবে, বড় চাকরি করবে। সুখী হবে। নিজেদের উন্নতি, নিজের বড় হওয়া শুধু ছেলেদের একটা স্টার্টিং পয়েন্ট। আমি যেখানে পৌঁছেছি তোদের সেখান থেকে শুরু করতে হবে। হংসনারায়ণের পর সোমনাথ যেভাবে শুরু

করেছিলেন।

ছেলেরা কেউ তাঁকে এখনও হতাশ করেনি। কিন্তু ইদানীং উনি একটু বিচলিত। যত বুড়ো হচ্ছেন ততই আত্মবিশ্বাস কমছে। মায়া বাড়ছে ছেলেমেয়েদের ওপর, নাতিনাতনীর ওপর। ছেড়ে থাকার বা দূরে থাকার কথা ভাবতেই পারছেন না। অথচ বাড়িওয়ালা একটু একটু করে অসুবিধে ঘটাচ্ছে। ফ্ল্যাট ছাড়তে বলছে। এই একটা কথায় সোমনাথ বড় বিভ্রান্ত বোধ করেন। নিজেকে নিরাশ্রয় মনে হয়, অসহায় ঠেকে। এই বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি ছাড়তে হলে কোথায় গিয়ে উঠবেন!

ছেলেরা সাহস জোগায়, ছাড়তে বললেই তো ছাড়া যায় না।

কিন্তু সোমনাথ কোনও সাহস পান না। ঐ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথাটা ওঁর সমস্ত শান্তি কেড়ে নেয়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন খুঁজতে খুঁজতে হতচকিত হয়ে যান। হাজার, দেড় হাজার, দু হাজার। তার ওপর একটা রহস্যজনক শব্দ টার্মস্। অর্থাৎ বিশ তিরিশ হাজার সেলামি কিংবা অগ্রিম।

চোখের সামনে ফ্ল্যাটের দাম হু হু করে বেড়ে আড়াই লাখ তিন লাখে গিয়ে পৌঁছেছে। এখন আর উপায়ও নেই। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনতে হলেও মন্ত্রী ধরতে হয়। একটা ভাড়ার ফ্ল্যাট পেতেও।

সোমনাথ বুঝতে পারেন না, কয়েক বছরের মধ্যে দিনকাল কিভাবে পাল্টে গেল। ওঁর ছিল আধা-সাহেব কোম্পানি, এদের দিশি কোম্পানি পুরো সাহেব। আর এক ধাপ উঠলেই নিরঞ্জন নাকি কোম্পানি-ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে। তখন বাবা মাকে নিশ্চয় ফেলে রেখে যাবে না। কিন্তু ওঁরাই কি সেই সাহেবিয়ানার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন। তাছাড়া সুরঞ্জনের কি হবে? সুরঞ্জনকে অসহায় ফেলে রেখে উনি যাবেন কি করে। অথচ সমস্ত পরিবারটার ওই ফ্ল্যাটে স্থান হবে না তাও জানেন। সুরঞ্জন তখন কোথায় যাবে?

নিজের চাকরি, পি এফ, গ্র্যাচুইটি, বড় ছেলের উন্নতি, সব অর্থহীন মনে হয়। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত পরিবার মনে হয় কাগজের নৌকো। ভাসতে ভাসতে যে-কোনও মুহূর্তে জলে ডুবে যাবে।

এক একসময় বড় হতাশ হয়ে পড়েন। কি লাভ হল এতকাল চাকরি করে। ছেলেদের মানুষ করে। যেদিন সুরঞ্জনেরও চাকরি হল, ভাবলেন জীবন সার্থক। এখন মনে হয় শৈশবের দিনগুলোই ভাল ছিল। সামান্য চাকরি, কিন্তু কম ভাড়ায় বাসস্থান জুটত। সস্তার বাজার।

সামান্য পেনশন তাও সম্বল। হংসনারায়ণ বলছেন, ভাবছি তোর মাকে নিয়ে কাশীতে গিয়ে থাকব।

হংসনারায়ণ হয়তো এমন নিরাশ্রয় বোধ করেননি। মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সোমনাথ জানেন, বাবা বুঝতে পেরেছিলেন ছেলের সামান্য রোজগারে ভাগ বসিয়ে তাঁর নিজেরও শান্তি থাকবে না, ছেলেরও শান্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

বাবার কাছ থেকেই ওই শিক্ষা পেয়েছিলেন সোমনাথ। এক ধরনের অহঙ্কার। কারও কাছে হাত পাতব না, কারও সাহায্য নেব না। সারা জীবন নিজের পায়ে দাঁড়াব। কিংবা কে জানে, হয়তো সেই ছেলেবেলার আদর্শের দিনগুলো। যখন সব স্বার্থ ভুলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মাত্র কয়েকটা বছর, যৌবনের একটা পর্ব। সে-সব কথা এখন ভুলে গেছেন সোমনাথ, কিন্তু রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে।

—ছেলেকে যারা লাইফ ইনসিওরেন্স ভাবে আমি তাদের দলে নেই। গর্বের সঙ্গে একদিন বলেছিলেন।

এই গর্ব কি শুধুই পি এফ গ্র্যাচুইটির টাকাটা চোখের সামনে ঝুলছে বলে? অথবা

পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আত্মমর্যাদা। সেন্স অফ প্রেস্টিজ!

কিন্তু তার পরই ধাক্কা খেলেন।

অবসর নেবার পর একদিন রাস্তায় এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রীতিমত বুড়ো হয়ে গেছে, মাথাভরা টাক। সরকারি কলেজের অধ্যাপক ছিল।

সোমনাথ চিনতে পারেননি, সে-ই সামনে এসে বললে, সোমনাথ না!

বোধ হয় গলার স্বরেই চিনতে পারলেন। বললেন, কোথায় চলেছ?

বিষণ্ণ মুখে সে বললে, ঘুরছি আর ঘুরছি আর ঘুরছি। দেড় বছর হয়ে গেল ভাই, পেনশন আর আদায় করতে পারছি না।

দুঃখের সঙ্গে বলেছিল, রাতারাতি সমস্ত মানুষগুলো কেমন অমানুষ হয়ে গেল। জমাতে তো কিছু পারিনি, কি করে যে সংসার চলছে। একটু থেমে বলেছিল, বুড়োদের জন্যে এখন আর কারও কোনও সিমপ্যাথি নেই।

সোমনাথ সমবেদনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার কষ্ট কিংবা উৎকণ্ঠা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। শুধু মনে হয়েছিল, অন্যায়, ঘোর অন্যায়। এ কেমন ক্ষুদ্রতার রাজ্যে আমরা বাস করছি যেখানে এক বৃদ্ধ মানুষকে অসহায়ের মত ঘুরতে হয় জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, তার প্রাপ্য পেনশনের জন্যে।

আশায় আশায় ছিলেন, পি এফের টাকাটা নিয়মমত ঠিক পেয়ে যাবেন। যথাসময়ে। তবু উৎকণ্ঠা ছিল। যদি হঠাৎ মারা যাই, স্ত্রী কি সরকারি গর্ভ থেকে আদায় করতে পারবে টাকাটা। তখন তো আইনের আরও ঘোরপ্যাঁচ।

লোডশেডিংয়ের জন্যে লিফ্‌ট বন্ধ। হেঁটে হেঁটে উঠছিলেন। আটতলায় উঠতে হবে। পাশাপাশি আরেকজন বৃদ্ধ, একই উদ্দেশ্য। পি এফের টাকা তুলবেন।

ভদ্রলোক হাসছিলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। বললেন, শালার গরমেন্ট আটতলায় অফিস করেছে কেন জানেন? অর্ধেক লোক যাতে হার্ট ফেল করে মারা যায়। এই নিয়ে আটবার এলাম। পাঁচ মাস হয়ে গেল।

সোমনাথের সেটা প্রথমবার। কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, অরাজক অবস্থা মশাই, অরাজক অবস্থা। গরমেন্ট ইচ্ছে করে এমন অব্যবস্থা করে রেখেছে। সরকারের সব ব্যবসাতেই তো লোকসান, এই একটা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি লাভ। ভেবে দেখুন, ব্যাঙ্কে তিন বছর রাখলে ইলেভন পার্সেন্ট, আর এখানে তিরিশ বছর রেখে এইট অ্যান্ড এ হাফ। দিব্যি বসে বসে টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট প্রফিট, সেই টাকায় মন্ত্রীরা প্লেনে চড়ে, বিলেত আমেরিকা যায়, দামি হোটেলে থাকে। বর্বর দেশ মশাই, বর্বর দেশ।

ভদ্রলোকের রাগ দেখে সোমনাথ হেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা যায়নি। একটা চাপা উদ্বেগ। ওই টাকাই তো এখন সম্বল। নিজের হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তি নেই।

আর তখনই আটতলায় পৌঁছে দেখতে পেলেন সেই বিধবা ভদ্রমহিলাকে। বাচ্চা একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুহূর্তে যেন নিজের স্ত্রীর ছবিটা দেখতে পেলেন সোমনাথ। এমন কত বিধবাই তো দরজায় দরজায় ঘুরছে। ভিক্ষের হাত পেতে স্বামীর নিজেরই প্রাপ্য টাকা ফেরত চাইছে। কোনও সভ্য দেশে এমন হয় নাকি?

অথচ অফিসের লোকজন একজনকেও অমানুষ মনে হল না। সহানুভূতি আছে। সমবেদনা আছে। কিন্তু অদ্ভুত সব আইন আর নিয়মের জালে আবদ্ধ। সকলের মনেই ভয়-ভয়। কখন কি ভুল করে ফেলি। চাকরি বাঁচাতে ব্যস্ত সকলে। দি সিস্টেম। ওই

আইনগুলোই ভালো মানুষগুলোকেও অমানুষ করে তোলে। কাজ না করলে কোনও রিস্ক নেই, কাজ করলেই ভয়। যদি ভুল করে ফেলি বিপদে পড়ব।

উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অনেকগুলো মাস কেটেছে তখন। তারপর সত্যি সত্যি টাকাটা পেয়ে গেলেন।

টাকাটা পেয়ে মনে হয়েছিল, নিশ্চিন্ত। এখন আর মারা গেলেও কোনও অনুতাপ হবে না। স্ত্রীকে বাকি জীবন ছেলেদের ওপর নির্ভর করে কাটাতে হবে না।

কিন্তু এতগুলো টাকা, তবু এখন আর কোনও দামই নেই তার। শহরতলিতেও একটা ফ্ল্যাট কেনা যায় না সারাজীবনের সঞ্চয়ে।

কে যেন বলছিল, টাকার এমন মূল্যহ্রাস ঘটেছে...

সোমনাথ হেসেছিলেন কথাটা শুনে। টাকার মূল্যহ্রাস ঘটেনি, ঘটেছে মানুষের।

উনি বেশ বুঝতে পারেন ওঁর নিজেরও মূল্যহ্রাস ঘটে যাচ্ছে। এখন আর সেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অহঙ্কার নেই।

সংসার ওঁকে টানতে হয় না, কিন্তু বাড়িভাড়া নিজেই দেন। আরো কিছু টাকা ধরে দেন বড়বৌমার হাতে। সংসার খরচ দেয় নিরঞ্জন আর সুরঞ্জন। ওরা কে কি দেয় না দেয় উনি ভাল করে জানেনও না। তবু পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। ওঁদের নিজেদের খরচখরচা তো আর হাত পেতে নিতে পারেন না। তাছাড়া সংসার খরচ নিতে চায়নি বলেই অন্যভাবে পুষিয়ে দেন সোমনাথ। নাতিনাতনীর জন্যে পোশাকপরিচ্ছদ, কিংবা বৌমাদের জন্যে সিল্কের শাড়ি কিংবা কাশ্মীরি শাল।

আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব এলে সে খরচ সোমনাথের। চা মিষ্টি।

সোমনাথ নিজেই দেখতে পান সেই আত্মবিশ্বাসী কিংবা অহঙ্কারী মানুষটা ধীরে ধীরে কেমন নুয়ে পড়ছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কিংবা পাড়াপড়শির চোখেও যেন আর সেই সমীহ নেই। তাতে সোমনাথের কিছু আসে যায় না।

তবে পুঁজি ফুরিয়ে আসছে এই খবরটা সকলের কাছ থেকে যথাসম্ভব চাপা রাখেন। বুঝতে পারেন শরীরে কিছু মেদ আর মাংসের মত ওই টাকা জিনিসটাও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে।

পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ঋজু সবল স্বাস্থ্যের স্মৃতিচিহ্ন এখনও ওঁর শরীরে স্পষ্ট। কিন্তু চোখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা দুশ্চিন্তা।

তবু এই নতুন খবরটা শুনে সত্তর বছরের সেই চোখ দুটিতে একটা খুশির আভাস উপচে পড়তে চাইল। চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী সেটা চাপা দিতে চাইলেন।

কিন্তু খবরটা বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

তুচ্ছ একটা খবর। সত্যি না মিথ্যে তাও জানেন না সোমনাথ। যাচাই করে দেখার উপায়ও নেই।

অনেককাল রিটায়ার করেছেন, দেখতে দেখতে সত্তর পার হয়ে এলেন। পুরনো দিনের বন্ধুবান্ধবরা কমই আসে। কয়েকজন তো পৃথিবী থেকেই বিদায় নিয়েছে।

এক শুধু মুস্তফি আসে মাঝে মাঝে। বালিগঞ্জ প্লেসে বাড়ি করেছিল অনেক আগেই। সে এসে শুধু অনুশোচনা দিয়ে যায়, সময় থাকতে একটা বাড়ি করলেন না সোমনাথবাবু। এখন তো ওসব ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ভায়রাভাই শক্তিপদ এসে বলে, আমার মত সল্ট লেকে একটা প্লট কিনে রাখলেও পারতে। ছেলেরা ভবিষ্যতে বাড়ি করে নেবে।

এসব শুনলে সোমনাথ ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হন, ভেঙে পড়েন। যেন সমস্ত জীবনটাই তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিজের শিক্ষাদীক্ষা, বড় চাকরি, ছেলেদের মানুষের মত

মানুষ করা, মেয়েদের ভাল বিয়ে দেওয়া, এসব যেন কিছুই নয়।

দেখতে দেখতে দেশটা কেমন বদলে গেল। আগেকার দিনে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। সারাজীবন ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে দিয়ে এসেছেন কত বিখ্যাত মানুষ। তখন মানুষের পরিচয় ছিল অন্যত্র।

অথচ, কয়েক বছরের মধ্যে সব পাল্টে গেল। লোকে বলে, ইনফ্লেশন।

ইনফ্লেশন যেন এই প্রথম, আগে কখনও হয়নি। আসলে মানুষগুলোই বদলে গেছে, মানুষের লোভ। আর সেই লোভ সমস্ত মানুষকে করে দিয়েছে নিরাশ্রয়।

জমি বাড়ি ফ্ল্যাটের দাম তরতর করে বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িভাড়া বাড়ছে। হাজার, দেড় হাজার, দু-হাজারেও থামতে চায় না।

সকালে সামনের ফুটপাথে পায়চারি করে আসেন সোমনাথ। একটু ঠাণ্ডা বাতাস মেখে আসেন। একটা বাড়ির পাঁচিলের ওপাশ থেকে ঝুঁকে পড়া শিউলি গাছটা ফুল ঝরিয়ে রাখে, সেখানে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শৈশবদিনের মত ফুলের আঘ্রাণ নেন।

আর যেদিন বেড়াতে যাওয়ার সময় শিবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, কেমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এখনই হয়তো সারাটা দিন নষ্ট করে দেবে।

—এই যে সোমনাথবাবু, কেমন আছেন ? সহাস্যমুখের প্রশ্ন।

সোমনাথ কোনরকমে উত্তর দেন, ভালই।

ভয়-ভয় করে। শিবেনবাবুকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচেন। কিন্তু তার আগেই। —কি করলেন, করলেন কিছু ? ছেলে তো দিল্লি থেকে চিঠি দিয়েছে, বউ-ছেলে নিয়ে চলে আসছে।

সোমনাথ উত্তর দেন, চেষ্টা তো করছি।

কোনরকমে তাকে এড়িয়ে চলে আসেন।

কোনও মানুষের এখন আর কোনও পরিচয় নেই। নিজস্ব বাড়ি আছে কিনা, ফ্ল্যাট আছে কিনা। তা না হলেই তুমি নিরাশ্রয়, তুমি উদ্বাস্তু। সর্বস্ব দিয়ে তোমার শুধু একখানা ফ্ল্যাট চাই। তা হলেই তুমি মানুষের মত মানুষ। তুমি মন্ত্রী ধরতে পারো কিনা, তার কাছ থেকে মাথা নিচু করে একটা ফ্ল্যাট ভিক্ষে পেলেই তোমার মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার জন্মে যাবে।

তুমি শুধু মাথা নিচু করে চলো, মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে।

ছেলেকে ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্যে একে ওকে ধরো, পরিবর্তে দাম দাও। একটু অন্যায় অবিচার, তোমার হাতে যেটুকু শক্তি আছে। কলেজে ঢোকাতে হলে, চাকরি পেতে হলে, প্রোমোশন, ট্র্যান্সফার, একখানা ভাড়ার ফ্ল্যাট, কিংবা নিজস্ব। সব জায়গায় মাথা নিচু করে করে, সব জায়গায় কিছু না কিছু দাম দিতে দিতে যদি উঠতে পারো, তবেই তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পাবে। জীবনের কোনও একটা ক্ষেত্রে যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাও তা হলে অনেক দেবতা কিংবা অপদেবতার কাছে মাথা নোয়াতে হবে।

সোমনাথ এই সব কথাই ভাবতেন।

আর মাঝে মাঝে মেরুদণ্ড সোজা করে ভাবতেন, আমি মাথা নোয়াব না।

তার মাঝখানে একটা তুচ্ছ খবর এসে পৌঁছোল। সারা পরিবারকে যেন চমকে দিয়ে গেল সেই খবরটা। ছোট্ট একটা খবরে যেন সমস্ত পরিবারের মাথা উঁচু হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়য়াদাওয়ার পর বিছানায় একটু গড়িয়ে নেন সোমনাথ। টানা ঘুম দেন চারটে অবধি। সে-সময় নিরঞ্জনের ছোট মেয়ে স্কুল থেকে ফেরে, করর্ করর্ একটানা বেল্ বাজায়। ঠিক এই সময় স্কুলবাস ওকে নামিয়ে দিয়ে যায়। বেলু দুষ্টুমি করে, কিংবা অধৈর্য হয়ে একটু বেশিক্ষণ কলিং বেল টিপে রাখে। ধমক দিলেও শোনে না। হাসে।

সোমনাথকেই উঠতে হয়, কপাট খুলে দিতে হয়। বৌমা দুজনই তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে নিজের নিজের ঘরে। ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই ফেরে পাঁচটার পর। শুধু বেলুই এ-সময়।

সোমনাথের ঘুম ভেঙে গেল কলিং বেল্-এর আওয়াজে। ভাবলেন, বেলু ফিরেছে।

কিন্তু না। কলিং বেল-এর আওয়াজগুলো ওঁর চেনা হয়ে গেছে। কোনটা নিরঞ্জন, আর কোনটা সুরঞ্জন। নাতিনাতনীদের কে কখন আসছে কলিং বেল্-এর আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারেন। এমনকি সকালে জমাদার যখন বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে তখনও।

যেন বুকের মধ্যে বাড়ির সকলের নামগুলো সাজানো আছে পর পর, এক একটা আওয়াজ শোনেন আর পাশে টিক্ দিয়ে দেন। চোখেও সকলকে দেখতে পান না, যে যার নিজের ঘরে চলে যায়। বড়জোর জুতোর শব্দ শোনেন।

তারপর একসময় ডাক দেন। —বড় বৌমা, সন্তু ফিরল না এখনও ?

বড় বৌমা এসে বলে যায়, ওর কলেজে কি একটা ফাংশন আছে।

—ও।

হিসেব মিলিয়ে নিয়ে সোমনাথ নিশ্চিন্ত।

তাই কলিং বেল-এর আওয়াজ শুনেই বুঝলেন বাড়ির কেউ নয়। কে হতে পারে ?

ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। অপরিচিত কেউ হলে ঝট্ করে দরজা খোলেন না। এ সময় ছেলেরা সব অফিসে।

বলা যায় না, যা দিনকাল।

এসে দরজার ফোকরে চোখ রেখে দেখলেন। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলেন। — আরে রামেশ্বর। এসো, এসো। কাম ইন।

বসার ঘরখানা নিরঞ্জন চমৎকারভাবে সাজিয়েছে। এই ঘর-সাজানোর পিছনে নিরঞ্জনের কৃতিত্ব কতখানি, আর কতখানি পুত্রবধূ অরুণার, তা অবশ্য সোমনাথ জানেন না।

এই ফ্ল্যাটে উঠে আসার সময়ে, সোমনাথ তখনও চাকরি করেন, সেই পুরনো দিনের আসবাবপত্রই নিয়ে এসেছিলেন। অযথা কিছু টাকা নষ্ট করার তিনি কোনও অর্থ খুঁজে পাননি। সে-সব আসবাবের ধরনধারণ একটু প্রাচীন ঘেঁষা বলেই যে বরবাদ করে দিতে হবে, আধুনিক ডিজাইনে কেন যে ঘর সাজাতে হবে, বুঝতে পারেন না সোমনাথ।

ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছেন, আর অনেক কষ্টে বাঁচানো টাকা দিয়ে বেতে-বোনা কাঠের চেয়ার, আরাম কেদারা, খাট, আলমারি কিনেছিলেন। রিয়েল বার্মা টিক। যেমন পালিশ ধরে, তেমনি টেকসই। ঘর জুড়ে এগুলো শোভা পেত।

হঠাৎ একদিন অরুণা আর নিরঞ্জন একখানা মোটা ছবির বই নিয়ে এসে দেখাল। অরুণা বললে, দেখুন তো বাবা, এই ডিজাইনটা ওটার চেয়ে ভাল নয় ?

প্রথমটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। বুঝতেই পারেননি ব্যাপারখানা কি !

বইটা হাতে নিলেন। নেড়েচেড়ে দেখলেন। একখানা বিদেশি বই, নানারকম ডিজাইনের। পাতা উল্টে দেখতে দেখতে একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। পাতার পর পাতা রঙিন ছবিতে ড্রইং রুম, ড্রইং রুমের নানা ডিজাইন, খাট, আলমারি, ওয়ার্ডরোব, বুককেস। কোথাও ফ্রক কিংবা গাউন, বেশ কয়েকখানা পাতা জুড়ে মেমসাহেবদের উলঙ্গ শরীর দেখানো ব্রা কর্সেট আরও কত কি। তাড়াতাড়ি উল্টে গিয়েছিলেন পাতাগুলো।

অরুণা হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে পেজ মার্ক দেওয়া দুটো পাতা আবার দেখাল। দু ডিজাইনের সোফা-কৌচ, টিপয় ডিভান, কার্পেটে সাজানো বসার ঘর।

ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন সোমনাথ। আসলে একটা ডিজাইন পছন্দ নিরঞ্জনের, আরেকটা অরুণার। কোনটা ভালো ওঁকেই বিচার করতে হবে।

উনি অরুণার দিকে তাকালেন হাসি-হাসি মুখে।

আর তখনই নিরঞ্জন বললে, অফিসের লোকজন আসে, সাজানো ড্রইংরুম সবারই, তাই…

কথা শেষ করল না।

সোমনাথ ভেবেছিলেন কোনও একখানা ঘর, হয়তো বেলুদের পড়ার ঘরখানাই সাজাবে। তবু মনে মনে বললেন, তোর কাছেই লোকজন আসে। আমার কাছে যারা আসত তারা কেউ কিছু নয়! মুখে কিছু বলেননি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলেন বসার ঘর থেকে ওঁর এতদিনের মায়া মাখানো সেরা বার্মা টিকের সেই চেয়ার টেবিল সরিয়ে পিছনের বারান্দার এক কোণে রাখা হচ্ছে।

চোখের সামনে ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলে উঠলেন, কি হবে, ওগুলো কি হবে?

নিরঞ্জন কাচুমাচু মুখে বললে, নতুন সোফাকৌচ টিপয় আজকেই এসে যাবে।

সোমনাথের বুকে বড় লেগেছিল। ধীরে ধীরে বলেছিলেন, বারান্দা জুড়ে ওগুলো রেখে কি লাভ, কুড়ুল দিয়ে কেটে জ্বালানি করে দে।

তারপর সেগুলো একে একে কাজের লোককে দিয়ে নিজের শোবার ঘরেই ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন।

ভেতরটা থরথর করে কাঁপছিল। কাকে আর শোনাবেন, স্ত্রীকেই উদ্দেশ করে বললেন, পুরনো মডেল বলে বাপ-মাকেও বোধহয় খারিজ করে দেবে।

তারপর বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বলেছিলেন, এই চেয়ারে একসময় কারা এসে বসত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেত তা যদি জানতিস।

স্ত্রী বলে উঠেছিল, চুপ করো চুপ করো। আসলে স্বামীর রাগ উনি চেনেন, বহুবার দেখেছেন। তা থেকে বাড়িতে না একটা অশান্তি ঘটে যায়।

সোমনাথ দাঁতে দাঁত চেপে ঠাট্টার ছলে বললেন, আপিসের লোকজন!

এই জিনিসগুলোর ওপর ওঁর খুব মায়া। রক্তের সম্পর্ক। এক এক বিন্দু রক্ত দিয়েই তো কত কষ্টের মধ্যে কিনেছিলেন। খাঁটি বার্মা টিক। ভাল মিস্ত্রিকে দিয়ে করিয়েছিলেন। এদের অশ্রদ্ধা করা মানে ওঁকেই অশ্রদ্ধা করা।

বুকে লেগেছিল।

চাপা রাগটা তাই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, যখন নতুন সোফাকৌচ এল, ডিভান এল।

দেখে বললেন, এ তো সি পি টিক। বাজে, যত সব ফাঁকিবাজি। শুধু ওপরচালাকি।

ওঁদের যুগটাই ছিল খাঁটির। এযুগটা শুধু সেকেন্ড রেট জিনিসের ওপরের শোভা।

তবু মেনে নিতে হয়েছিল। এখন ভালই লাগে। শুধু নিজেকে এ-ঘরে বেমানান মনে হয়। ফোমের গদিতে বসতেও কেমন অস্বস্তি। ওঁর কাছে বেতে-বোনা চেয়ারটাই সবচেয়ে আরামপ্রদ।

রামেশ্বরকে নিয়ে এসে ঢুকলেন বসার ঘরে।

—ওঃ, এক যুগ পরে তোমার দেখা মিলল। কেমন আছ বলো।

রামেশ্বর বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরখানা দেখতে লাগল।

সোমনাথ নিজেও।

খুব কমই আসেন উনি এ-ঘরে। বিশেষ ঘনিষ্ঠ যারা তাদের নিয়ে যান নিজের শোবার

ঘরেই। অবশ্য রামেশ্বরও এককালে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই আদর্শের যুগে। যখন সমস্ত দেশ, দেশের মানুষ, সমাজ, সবকিছু রাতারাতি বদলে দেবেন বলে স্বপ্ন দেখতেন। শেষ পর্যন্ত সব স্বপ্ন এসে জমা হয়েছিল এই সংসারের মধ্যে। সমস্ত আদর্শ বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন ঘরের চারদেয়ালের ভিতর। রামেশ্বরও তাই।

সোমনাথ এবার রামেশ্বরের দিকে ভাল করে তাকালেন। হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন, রিয়েল না ফল্‌স ? দাঁতগুলো ?

রামেশ্বর হেসে উঠল—বাঁধিয়েছি, বাঁধিয়েছি।

সোমনাথ বললেন, আমার কিন্তু রিয়েল, মাত্র তিনটে তুলেছি।

আশ্চর্য ! তুমি কিন্তু আমার চেয়ে দুবছরের বড়।

সোমনাথ হাসলেন। চোখ গেল দেওয়ালে। একটা বিশাল ছবি টাঙিয়েছে নিরঞ্জন, মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। হয়তো মডার্ন আর্ট, মনে মনে ভাবেন। কবে এনেছে কে জানে। জানতেও পারেননি। মডার্ন। আজকাল গরুকে গরু বলে চেনা গেলে আর আর্ট বলে না।

—তারপর, কি খবর ? আছ কেমন ? সোমনাথ প্রশ্ন করলেন।

উঠে দাঁড়ালেন। —বোসো, আসছি।

এই ফাঁকে রামেশ্বরের নাম করে যদি এক কাপ চা পাওয়া যায়। এমনিতে বেলু ফেরার পরে চা বরাদ্দ।

ছোট বৌমা দীপাকে দেখতে পেয়ে চায়ের কথা বললেন। সে তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে।

দীপা রামেশ্বরকে চেনে, বছর পাঁচেক আগে যখন এসেছিল দীপার ছেলের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বাতলে দিয়ে গিয়েছিল। সত্যি ছেলেটা সেরে উঠেছিল ওঁর চিকিৎসায়। তাই দীপা ওঁকে সমীহ করে। তবে সেও অন্য সকলের মত ওঁর নাম দিয়েছে বেলেডোনা থার্টি।

সোমনাথ ফিরে আসতেই রামেশ্বর বললে, একটা দারুণ গুড নিউজ আছে। জানাতে এলাম।

সোমনাথ হেসে বললেন, এ বয়সে আর কি গুড নিউজ হবে ? নতুন চাকরি ? বলে হো হো করে হাসলেন।

আজকাল সোমনাথকে কোনও খবরই আনন্দ দিতে পারে না। সব সময়েই কেমন একটা উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ। পরিবারের সকলকে নিয়ে। কারও অসুখবিসুখ, সামান্য দুর্ঘটনা, কিংবা বেলু বা মানু এখনও ফিরল না কেন।

তবু রামেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, যে খবরই হোক সে যেন ভিতরে ভিতরে বিষম খুশি হয়ে আছে।

প্রশ্ন করতে হল না, রামেশ্বরের সারা মুখ আনন্দে ঝলসে উঠল।

দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে এলাম।

সোমনাথ প্রথমটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না।

আজকাল বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ওঁর কোনও যোগাযোগ নেই বললেই চলে। খবরের কাগজ পড়েন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, তা না হলে সময় কাটবে কি করে। কিন্তু কোনও কিছুই যেন মনের ওপর ছাপ রেখে যায় না। সমস্ত পৃথিবী এখন এই ঘরের মধ্যে। আর কোনও কিছু সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই, কৌতূহল নেই।

বুঝতে পারেননি দেখে রামেশ্বর বললে, মেয়ে অনেকদিন থেকে চিঠি লিখছে যাবার জন্যে। গিয়েছিলাম। হাসল রামেশ্বর। বললে, ভাবলাম এসেছি যখন একবার

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে যাই।

বলে মনের আনন্দে হাসল।

সোমনাথ এতক্ষণে বুঝতে পারলেন। সব মনে পড়ে গেল। বিস্মৃতির মধ্যে চাপা পড়া এক ঝলক দৃশ্য মুহূর্তে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

রামেশ্বর তখনও আনন্দে অনর্গল। বললে, চল্লিশ বছর আগেকার কথা, কি বলো, নাকি আরও বেশি ? সব তো ভুলে যাবারই কথা। তবু কপাল ঠুকে একখানা চিঠি লিখে ফেললাম ; সেসব দিনের অনেক কথা মনে পড়িয়ে...

রামেশ্বরের সমস্ত শরীরে যেন আনন্দ উপছে পড়ছিল।

হাসতে হাসতে বললে, সব মনে আছে, সোমনাথ, সব। কত গল্প হল, এত ব্যস্ত, তবু অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলেন। কত কি খোঁজ নিলেন।

তারপর হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল। যেন পরীক্ষা করে দেখছে, সোমনাথের কোনও কৌতূহল হয় কিনা, কিছু প্রশ্ন করেন কিনা।

সোমনাথ কোনও প্রশ্নই করলেন না। যেন বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসেছেন। কোথাও কোন চাওয়াপাওয়া নেই। সেই সব স্মৃতিও মুছে ফেলেছেন মন থেকে।

শুধুই রামেশ্বরের আনন্দে উনিও আনন্দ পেয়েছেন দেখানোর জন্যে মুখে ঈষৎ হাসি আনলেন।—তা হলে তো একটা কাজের মত কাজ করেছ। ঠিকই বলেছ, গুড নিউজ।

রামেশ্বর বললে, আরে না না, আরও খবর আছে। রিয়েল গুড নিউজ অন্য।

বলে থামল, সোমনাথের মুখের দিকে তাকাল। —তুমি বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ ছিলাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু তোমার কথা। তেমনি ছিপছিপে আছ, নাকি মোটা হয়ে গেছ, ছেলেরা কি করে, কোন পোস্টে রিটায়ার করেছ, আগের মতই বাগী আর আইডিয়েলিস্ট আছ কিনা। কত কথা।

এবার সোমনাথের মুখেও একটু একটু হাসি দেখা দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যে যতই বড় হোক, পুরনো দিনগুলো কেউ কি আর ভুলতে পারে !

রামেশ্বর বললে, শোনো শোনো, তারপর উঠে আসছি, তোমার ঠিকানাটা চাইলেন।

বলেই হাসতে হাসতে পকেট থেকে ছোট্ট একটা ডাইরি বের করল রামেশ্বর। দেখিয়ে বললে, ভাগ্যিস এটা পকেটে ছিল। লিখে নিলেন।

ডায়েরির পাতাটা বের করে দেখাল রামেশ্বর। —এই ঠিকানাটা।

ঠিকানাটা যে ডাইরির পাতায় সত্যি লেখা আছে, দেখাল রামেশ্বর।

তারপর বললে, ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বললেন, কলকাতায় এলে দেখা করবেন তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে ? কেমন বিচলিত দেখাল সোমনাথকে। যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না, কিংবা বিব্রত বোধ করছেন।

রামেশ্বর বললে, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে।

ঠিক তখনই দীপা চা নিয়ে এল।

আর রামেশ্বর বললে, বোসো বৌমা, বোসো।

দীপা সঙ্কোচের সঙ্গে ডিভানের একপাশে বসল।

রামেশ্বর আবার কথাগুলো বলতে শুরু করল দীপাকে।

এতক্ষণে সোমনাথের মুখ বেশ খুশি-খুশি। —একবার কথা উঠেছিল, সুরঞ্জনকে

বলেছিলাম, একসময় ওঁকে চিনতাম···

রামেশ্বর বলে উঠল, চিনতাম কি হে? তুমিই তো স্টার্টিং পয়েন্ট। কে ভেবেছিল ওখানে গিয়ে পৌঁছবেন!

সোমনাথ বললেন, না না তা নয়। কিন্তু কাছাকাছি তো ছিলাম, আমি জানি, সুরঞ্জন সেদিন বিশ্বাসই করেনি। বিশ্বাস করার কথাই নয়, তাই কাউকে বলি না। দেখলে তো বৌমা!

দীপা আর বসে থাকেনি। দ্রুত বেরিয়ে চলে এসেছে। সোমনাথ বুঝতে পারেননি বিশ্বাস করল, নাকি হাসি চাপতে উঠে গেল।

কিন্তু ততক্ষণে, এই প্রথম হয়তো, সোমনাথ বসার ঘরখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন।

॥ দুই ॥

নিরঞ্জন ছাত্র খুবই ভাল ছিল। হবে না কেন, ও তো সোমনাথের বড় ছেলে। যুবক বয়সের পুত্র। তখন সোমনাথের সাধারণ চাকরি, মাইনে কম। টানাটানির সংসার।

আর কেউ না জানুক সোমনাথ জানেন, তাঁর সেই উদ্দাম যৌবনের স্বপ্ন আর আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে কেন সরে এসেছিলেন। কে সরিয়ে এনেছিল। স্ত্রী সারদা নয়। এই নিরঞ্জন।

রামেশ্বর একদিন অনুযোগ করেছিল, তুমি ক্রমশ সরে যাচ্ছ সোমনাথ। অথচ তোমার ওপর সকলের কত ভরসা।

সোমনাথ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, দশের জন্যে যৌবনটা দিয়েছি, জীবনটা দিতে পারব না। চ্যারিটি বিগিন্‌স অ্যাট হোম, বুঝলে রামেশ্বর। দেখি ছোট্ট একটা সংসারকে গড়ে তুলতে পারি কিনা, তবে তো দেশ কিংবা পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন।

রামেশ্বর তখনও উদ্দীপ্ত হত। উত্তেজিত হত। বলেছিল ওটা স্বার্থপরদের কথা।

সোমনাথ হেসে বলেছিলেন, হতেও পারে, ঠিক জানি না। কিন্তু নিজের সংসারের প্রতি যার কর্তব্য নেই, স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব যে উপেক্ষা করে, আরও বড় দায়িত্ব সে নেবে কি করে?

সোমনাথ জানেন যুক্তিটা বোধহয় ঠিক নয়। আসলে উনি হয়তো পালিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু কেন, কার জন্যে।

স্ত্রী সারদা, নাকি চার বছরের শিশু নিরঞ্জনের জন্যে।

সারদা অতশত বোঝেন না। একদিন শুধু অভিমান করে নিরঞ্জনকে বলেছিলেন, তোরা তো জানিস না, কি কষ্টের মধ্যে তোদের মানুষ করেছে। অথচ লোকটার দিকে তোরা তাকিয়েও দেখিস না।

আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, জানো বৌমা, প্রাইভেট টিউটর রাখার পয়সা ছিল না, আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনি, তবু দুবেলা নিজেই পড়াত নিরঞ্জনকে। এখন তোদের একটুও সময় হয় না, তোরা সবাই ব্যস্ত।

সোমনাথের মধ্যে একটা চাপা অভিমান আছে। এক কথা দুবার বলতে চান না। কোনও কথা স্পষ্ট করে বলেনও না।

শুধু একদিন বলেছিলেন, দাঁতের ব্যথায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি রে। দুটো দাঁত বোধহয় তুলে ফেলতে হবে। কাছাকাছি ডেন্টিস্ট কেউ আছে, জানিস?

নিরঞ্জন সদাই ব্যস্ত, কথাটা কানেও তোলেনি।

শুধু কি একটা লোশনের নাম বলে অরুণাকে বলেছিল, আনিয়ে দিয়ো।

ওষুধটা আনিয়েও দিয়েছিল অরুণা। বলেছিল, গরম জলে দুফোঁটা দিয়ে গার্গল করুন, সেরে যাবে।

সারেনি। এবং সারেনি যে সে খবরও আর কেউ নেয়নি। সোমনাথও বলেননি।

সত্তর বছর বয়সের সেই বৃদ্ধ অভিমান একা একাই বেরিয়ে গিয়েছিল। কোত্থেকে ডেন্টিস্টের খবর নিয়ে একা একাই ট্রামের ভিড় ঠেলে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেও স্ত্রী সারদাকে ছাড়া আর কাউকে বলেননি যে দাঁত তুলিয়ে এসেছেন।

তখনও ব্লিডিং হচ্ছে।

সারদা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমায় বললে না কেন, আমি সঙ্গে যেতাম।

নিরঞ্জনের তো দেখাই মেলে না, তাই সব রাগ গিয়ে পড়েছিল অরুণার ওপর। —এই বুড়ো মানুষটা একা একা গিয়ে দাঁত তুলিয়ে এল···

অরুণার খুব খারাপ লেগেছিল, নিরঞ্জনেরও। তবু যেন নিজের দোষ স্খালনের জন্যে বলেছিল, বাবা তো বলবে সে-কথা, আমরা জানব কি করে। আমি তো জানি ওষুধে সেরে গেছে।

সোমনাথ থামিয়ে দিয়েছিলেন। —আমাকে তোমরাই বুড়ো বানিয়ে দিচ্ছ, দিব্যি তো গেলাম, দাঁত তুলিয়ে এলাম। আমি কি একা একা যেতে পারি না নাকি।

সত্যি তাই, সোমনাথ বয়সের তুলনায় এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। তবু ভিতরে ভিতরে একটু ভয়-ভয় করে, যদি ভিড়ের বাসে না উঠতে পারি, হঠাৎ যদি মাথা ঘুরে পড়ে যাই। একজন কেউ সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। কিন্তু সে-কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। অভিমান।

আসলে কি-ভাবে যেন একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে সোমনাথের। সোমনাথ নিজেও বুঝতে পারেন।

অথচ হংসনারায়ণের সঙ্গে সোমনাথের কোনও দূরত্ব ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে বুঝত।

তার কারণ কি এই যে ওঁরা দুজনেই ছিলেন অভাবী মানুষ। নাকি ওঁদের দুজনের মধ্যে সময় কোনও ব্যবধান সৃষ্টি করেনি।

বাবার জন্যে নিরঞ্জনের মধ্যে একটা দুর্বলতা আছেই। তবু নিরঞ্জন কাছে আসতে পারে না। মানিয়ে নিতে পারে না।

বাবার সব কিছুই যেন ওর অপছন্দ। ওই পুরনো দিনের খাট-আলমারি বেতের চেয়ার আরাম কেদারা টেবিলের মত।

ওরা শুধু কাঠ চেনে, বর্মা টিক।

সোমনাথের শোবার ঘরের দেয়ালে একটা কার্পেটে বোনা কালীমূর্তি বাঁধিয়ে টাঙানো আছে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে নিরঞ্জন। সেটার তলায় এক কোণে লেখা আছে 'সারদা'। মার হাতে বোনা। আরেক দেয়ালে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার, অমাবস্যা পূর্ণিমা দেখার জন্যে।

নিরঞ্জনের চোখে সেটা কুৎসিত লাগে। যে-কেউ এলে দেখতে পায়। পুরনো দিনের আসবাবের মতই ওই কালীর ছবিটাও যেন বলে দিচ্ছে এ-বাড়ির লোকজনেদের কারও কোনও রুচি নেই।

নিরঞ্জনের এক সহকর্মীর স্ত্রী একবার এসেছিল, বেশ আধুনিকা, বব করা চুল, কিন্তু বসার ঘরে বসে গল্পটল্প করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চলুন, আপনার বাবা-মার সঙ্গে

দেখা করে আসি।

মা তখন বাতের ব্যথায় পঙ্গু। না নিয়ে এসে উপায় ছিল না।

নিরঞ্জনের সেদিন যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেছে।

ও যে তার আগেই বেশ গর্ব করে বলেছে, বাবা কত বড় চাকরি করতেন, কোন্ পোস্ট থেকে রিটায়ার করেছেন। সেকালের লোকদের ধরনধারণই অন্য রকম। বাড়িঘর সাজানোয় অন্যদের ঈর্ষা কিংবা সমীহ আদায় করতে জানত না। জীবনধারণ মানে যেন কোনরকমে জীবনটাকে ধরে রাখা। একটা গাড়িও রাখত না।

সেই বন্ধু-স্ত্রী চলে যাবার পর নিরঞ্জন যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। লজ্জায় সঙ্কোচে নিরঞ্জন আর অরুণা তার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারেনি আর। যেন ওর সমস্ত মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে গেছে।

অরুণার ওপরই রেগে গিয়ে বলেছিল, ওই ঘরখানাকে একটু সভ্যভব্য করে রাখতে পার না।

অরুণাও রেগে গিয়েছিল। —তোমারই তো মা। পুজোয় অত ভাল ভাল কাপড় দিই, পরতে দেখেছ? অত সুন্দর চাদরটা এনে দিলাম, সেটা আলমারির মধ্যে।

নিরঞ্জন চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু আবার কোনদিন এ-রকম একটু অঘটন ঘটে যেতে পারে এই আশঙ্কায় একদিন বলেছিল, মা, ওই কালীমূর্তিটা তোমার ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব? তা হলে এখানে একটা ভাল ছবি টাঙানো যায়। আর ওই বাংলা ক্যালেন্ডারটা···

সোমনাথ শুয়েছিলেন। উঠে বসলেন। অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বেশ রাশভারী গলায় বললেন, না।

ছোট্ট একটি কথা। আর কিছুই বলেননি সোমনাথ। কিন্তু নিরঞ্জনের বুঝতে বাকি থাকেনি এরপর আর কোনও কথা বলা চলে না। শুধু মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতে হয়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল অরুণা। ও জানত এ-রকমই কিছু ঘটবে। ওর শিক্ষা হয়ে গেছে একদিন, সেজন্যেই আর কিছু বলে না।

নিজেদের ঘরে ফিরে এসে অরুণা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললে, দেখলে তো। পর্দার কথা বলতে গিয়ে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে···

আসলে অরুণার নিজেরও খারাপ লাগে। ওদের ঘরগুলোয় দিব্যি দামি পর্দা দরজায় দরজায়, রঙিন পর্দা জানালায়। সুরঞ্জন আর দীপাদেরও।

শুধু সোমনাথের ঘরে পর্দা নেই। পর্দা দিলে নাকি আলো ঢোকে না, বাতাস খেলে না। কিন্তু এ-ঘরে পর্দা না থাকলে দেখায় খারাপ। আত্মীয়স্বজনরা এলে কি ভাববে। নিজেদের ঘরে পর্দা দিয়েছিস, বুড়োবুড়ির ঘরে নেই কেন?

তাই অরুণা একদিন গিয়ে জানালার মাপ নিচ্ছিল।

সারদা প্রশ্ন করলেন, কি হবে বৌমা?

—ভাবছি পর্দা টাঙাব।

সারদা হেসে ফেললেন,—এই বুড়োবুড়ির আবার পর্দা কি হবে?

অরুণা বললে, সব ঘরেই তো পর্দা আছে, বিশ্রী দেখায় তা না হলে।

সারদা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেশ রাগত স্বরে বললেন, শরীরে-গায়ে যারা পর্দা রাখে না, সে-ভাবেই ঘুরে বেড়ায়, তারাই জানালায় পর্দা দেয়। আমাদের সময়ে তো তা ছিল না, আমাদের চোখেরও পর্দা ছিল, গায়েও। তাই জানালায় পর্দা লাগত না।

রাগে ক্ষোভে বেরিয়ে এসেছিল অরুণা। দরকার নেই, দরকার নেই। আস্তাকুড়েই

ওরা পড়ে থাক। কি কথা। ভাগ্যিস বাবা তখন ঘরে ছিল না। তাঁর সামনে হলে আরও লজ্জা পেত অরুণা।

এই বাড়িটায় যেন কোনও শান্তি নেই। নিজের রুচি মত সাজানো যায় না। নিজের মত করে থাকা যায় না। ছেলেমেয়েদের আমরা নাকি সাহেব করে তুলছি। ভাল স্কুলে পড়ানো যেন অপরাধ। বড় মেয়ে মঞ্জুশ্রী জিন্‌স পরে, টেবল টেনিস খেলতে যায়, সেটা যেন বেলেল্লাপনা। সময় যে পাল্টে গেছে তার খবরই রাখেন না।

—এখান থেকে পালাতে না পারলে কেউ মানুষ হবে না, দেখে নিয়ো। অরুণা বলেছিল।

নিরঞ্জনও জানে। বিশ্বাস করে। কিন্তু উপায়ও নেই।

এই কম ভাড়ার ডোভার লেনের ফ্ল্যাট। ছখানা ঘর ছশো। যে শোনে সেই বলে ড্যাম চিপ্। এ বাজারে ভাবাই যায় না।

এই একটা জিনিসই ওদের সকলকে বেঁধে রেখেছে। ওরা বন্দি হয়ে আছে।

সোমনাথ সে জন্যেই খুশি। যত অভিমানই থাক, যত রাগ আর ক্ষোভ, বুকের মধ্যে যে এখনও টনটন করে ওঠে। ছেলেরা দূরে দূরে থাকবে, ভাবতেই পারেন না। তবু তো চোখের সামনে আছে। ছেলেরা, অরুণা, দীপা, মঞ্জুশ্রীকে খোঁটা দিয়ে ঠাট্টা করেন, কিন্তু ভালও লাগে। সন্দীপ···সন্তু যখন ইংরেজি রাইম আওড়ায়। বেলু স্কুল থেকে ফিরে কলিং বেল বাজাবে, অপেক্ষায় অপেক্ষায় থাকেন।

ফ্ল্যাটখানা গেলেই এই মায়ার জগৎ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

নিরঞ্জন অবশ্য শুনিয়ে রেখেছে আরেকটা লিফট হলেই কোম্পানি ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে। সে ফ্ল্যাট কত বড়, সকলে যেতে পারবে কি! সকলকে নিয়ে যেতে চাইবে নিরঞ্জন?

সে-সব কথা মনে পড়লেই বড় অসহায় লাগে। কেমন নিরাশ্রয় নিরাশ্রয় মনে হয়।

নিরঞ্জন সে-সব কথা ভাবে না। ওর চোখের সামনে শুধু কোম্পানি ফ্ল্যাট, নিজের সংসার।

—তার চেয়ে একটা ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টা করলেও তো পারো। অরুণা বলেছিল।

নিরঞ্জন মুখ-ফসকে বেরিয়ে এল, সিলি।

তারপরই, অরুণা পাছে একটা কড়া কথা বলে বসে, নিরঞ্জন অক্ষমতার আঙুলে চুল টানতে টানতে শ্রাগ করে বলেছিল, আমরা তো বড়লোক।

—তোমার চেয়ে কত কম মাইনে, তবু অলোকবাবু তো কিনেছেন।

নিরঞ্জন বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, সেটাই তো সুবিধে তার। কো-অপারেটিভের লোন পেয়েছে। যেমন স্টুপিড আইডিয়া সব, যেন মাইনে একটু বেশি হলেই তার জমানো টাকা থাকবে। আমি তো গাভমেন্টের চোখে বড়লোক, লোনই পাব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, লোন পেলেই বা কি হত। বাকি টাকাটা তো প্রথমেই দিয়ে দিতে হবে, পাব কোথায়?

অরুণাও চুপ করে রইল, তারপর বললে, বাবা তো দিতে পারতেন।

বাবা, অর্থাৎ নিরঞ্জনের বাবা।

নিরঞ্জন হাসল। —অসম্ভব। ওটা তো বাবার বুড়ো বয়েসের যক্ষের ধন। হাতছাড়া করতে পারবে না। তা হলে তো অনেক আগেই একটা কিছু করে ফেলত। তখন কত কমে পাওয়া যেত। এখন তো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

হতাশ ভাবে বললে, আমাদের বড় জোর ওই কোম্পানি-ফ্ল্যাট।

অরুণা এখন থেকেই এ-সব ব্যাপারে প্রাকটিক্যাল। ও এখন থেকেই ভবিষ্যতের জন্যে কিছু একটা করে ফেলার পক্ষপাতী। মাঝে মাঝেই খোঁটা দেয়, মাঝে মাঝেই মনে

পড়ায়। ও তাই হাসতে হাসতে বললে, কোম্পানি-ফ্ল্যাট কোম্পানি-ফ্ল্যাট করছ, রিটায়ার করার পরই কিন্তু গেট আউট।

একথা যে নিরঞ্জন একেবারে ভাবে না তা নয়। কিন্তু সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। উপস্থিত ও তাকিয়ে আছে একটা লিফটের দিকে। এক ধাপ উঠলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান। যা কিছু স্বপ্ন দেখে এসেছে।

কিন্তু ওই প্রোমোশনটা পাবে কিনা জানে না। এ সব পোস্টে তো যোগ্যতার বিচার হয় না। আসল বিচার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড। কোন ফ্যামিলি থেকে এসেছে, গর্ব করার মত কিছু আছে কিনা, পরিবারের পরিচয় দিলেই সারা কলকাতা চিনে ফেলে কিনা।

অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, এক্সপার্টাইজ, অভিজ্ঞতা সবই আছে নিরঞ্জনের। চমৎকার চেহারা, স্বাস্থ্য, স্মার্টনেস। কি নেই ? নেই শুধু একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড। বাবা বড় চাকরি করত ? এমন কি বড় ? ঠাকুর্দা তো পোস্ট-অফিসের মাঝারি মাপের বড়কর্তা।

কোনটাই বলার মত নয়।

নিরঞ্জন বেশ বুঝতে পারে এখনই এখনই গুছিয়ে নিতে হবে। অরুণা ঠিক কথাই বলে, ওরা খুব প্রাকটিক্যাল হয়। বাবার মত অল্পে সন্তুষ্ট আদর্শবাদী হওয়ার কোনও মানে হয় না। যদি সংসারী হতে চাও ঘোর সংসারী হতে হবে, আর যদি দেশ কিংবা দশের কথা ভাবার মিশন নাও, মিশন কেন বলছি, প্রফেশন—তাহলে তোমাকে অন্তত একটা মন্ত্রী হতে হবে।

বিষয়ী মানুষ ছাড়া এখন আর কেউ টিকে থাকতে পারবে না। যৌবনকালেই, যখন জীবনটা উপভোগ করার কথা, নিজেকে পৃথিবীর মানুষ মনে করার কথা, বই পড়ো, সিনেমা থিয়েটার, রবিশঙ্কর, শাঁওলি, সবকিছু দেখব, উপভোগ করব, পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করব, তখনই তোমাকে সব ভুলে ছুটতে হবে শহর বা শহরতলির এক টুকরো ফাঁকা জমির কাছে, ঘুরে ফিরে দেখবে, বিশ্বাস এবং স্বপ্নের চোখে, এখানেই একটা তের তলা বাড়ি উঠবে ; তার এক প্রান্তে ক্ষুদ্র বিন্দুর মত একটা জানালা, তোমার সারা জীবনের জানালা। তাও গড়ে তুলতে হবে তোমার সর্বস্ব দিয়ে, বউয়ের গয়না বেচে। তবেই শান্তি।

বাবা ঠিকই বলে।

গভর্নমেন্টের সবচেয়ে প্রফিটেবল ব্যবসা প্রভিডেন্ট ফান্ড। মানুষকে গরিব করে দেওয়ার কল। গরিবকে শোষণ করার এর চেয়ে ভাল পদ্ধতি আর নেই। তিন বছরের ফিক্সড ডিপজিটে ইলেভন, ন্যাশনাল সেভিংস তো আরও বেশি, তিরিশ বছরের পি এফ তোমায় দেবে এইট অর নাইন ! সোমনাথ একদিন হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, ঠিক অর্ধেক। ইনফ্লেশনের দাপটে, তুমি যখন হাতে পাবে, দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটও কেনা যাবে না।

সোমনাথ বলেছিলেন, যারা অল্প মাইনের চাকুরে, যারা গরিব, তাদের কথা তো ভাবাই যায় না।

কথাটা বলেছিলেন সত্যি সত্যি গরিবদের কথা ভেবে নয়, অল্প মাইনের চাকুরেদের কথা ভেবে নয়। ছোটছেলে সুরঞ্জনের কথা ভেবে।

কালীর ছবি টাঙানো বাবার ঘরখানার মত নিরঞ্জনের আরেক লজ্জা ছোটভাই। লেখাপড়ায় সেও ভাল ছিল, ভাল রেজাল্ট। কিন্তু একটা ভাল চাকরি আজ অবধি জোটাতে পারল না। নেহাতই একটা চাকরি ওর, বেকার নয় এটুকুই বলা যায়। অথচ ও দাঁড়িয়ে গেলে বিবেকের কাছ থেকে মুক্তি পেত নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই অরুণা সুযোগ খুঁজছিল, কখন কথাটা বলে ফেলবে।

নিরঞ্জন এল, পোশাক ছেড়ে স্নান করতে চলে গেল।

তোয়ালে কাঁধে ফিরে এল নিরঞ্জন।

কানের পাশে খানিকটা সাবানের ফেনা লেগে আছে দেখে অরুণা গিয়ে তোয়ালের কোনাটা দিয়ে মুছে দিল। বেশ খুশি খুশি মুখ।

নিরঞ্জন লক্ষও করল না। ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে নিয়ে চুল আঁচড়াল, কাঁধে পিঠে ট্যালকাম পাউডার ঝরিয়ে বেশ আয়েশ করে সামনের ব্যালকনিতে গিয়ে বসল।

চা-খাবার নিয়ে এসে সামনে নামিয়ে রেখে অরুণা অপেক্ষা করল।

নিরঞ্জন বার কয়েক চায়ে চুমুক দিতেই অরুণা বললে, এই শোনো, সেই যে বাবা একবার গল্প করে বলেছিলেন-না, সব সত্যি।

নিরঞ্জন ঘাড় ফিরিয়ে অরুণার দিকে তাকাল, দেখল অরুণার মুখ বেশ হাসি-হাসি। কিন্তু বাবা কি গল্প করেছিল তা মনে পড়ল না।

অরুণা আবার বললে, মনে নেই তোমার ? সেই যে সকালে একদিন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বলেছিলেন···সেই যে সুরঞ্জন এসে তোমাকে বললে, যত সব বানানো গল্প···তুমি রেগে গিয়েছিলে···

নিরঞ্জনের মনে পড়ে গেল। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

অরুণা চাপা গলায় বললে, সব সত্যি। দীপা বললে।

নিরঞ্জন অবাক হল। —দীপা ? দীপা জানবে কি করে, সত্যি না মিথ্যে। আমারই জন্ম হয়নি তখন।

অরুণা বললে, না, তা নয়। দুপুরে আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম, ডাকেনি আমাকে। সেই যে রামেশ্বরবাবু, আগে আসতেন, খুব হোমিওপ্যাথির গুণগান করেন, তিনি এসেছিলেন আজ।

নিরঞ্জন তখনও তো খবরটা জানে না। তাই বিশেষ কৌতূহল হল না। সত্যি না মিথ্যে জেনেই বা কি লাভ। তাছাড়া টুকরো-টুকরো ওই ধরনের দু-একটা কথা ও ছেলেবেলায় বাবার বন্ধুদের মুখেও দু-একবার শুনেছে। গুরুত্ব দেয়নি।

গুরুত্ব দেবার মত কিছু ছিলও না। কম বয়সে গায়ে একটু আদর্শ কিংবা পলিটিক্সের গন্ধ কার না লাগে। আজকাল যেমন কবিতা লেখা, কবিতা শোনা। মঞ্জুশ্রী একবার বায়না ধরেছিল কবিতার কি একটা ফাংশনে যাবে। কবিতা ভাল লাগে, বই এনে বাড়িতে পড়তে পারে। আমরাও পড়তাম। তা নয়, ফাংশন। তবু যেতে দিয়েছিল মঞ্জুশ্রীকে। মডার্ন হতে হলে সবকিছুর একটু একটু খবর রাখা ভাল।

মা আপত্তি করেছিলেন, সন্ধেবেলার ফাংশন, একা যেতে দিলি ? তোর বাবা বলছিল, ফেরার সময় ও জায়গাটা নির্জন হয়ে যায়।

নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে বলে উঠেছিল, হাত ধরে ধরে নিয়ে গেলে তো সারাজীবনই তাই করতে হবে।

বলেছিল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে উদ্বেগ ছিল। মঞ্জু ফিরে না আসা অবধি নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

অরুণা হাসতে হাসতে বললে, শুনে তো দীপা একেবারে তাজ্জব। আমরা তো তবু কিছুটা শুনেছি, জানি। ও বিশ্বাসই করত না। ওর দোষ কি, সুরঞ্জনই তো বলত সব বানানো গল্প।

তারপর অরুণা বললে, আসল খবরটাই তো বলিনি। রামেশ্বরবাবু বলে গেলেন, প্রেসিডেন্ট নাকি আসবেন, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

—অ্যাঁ। ঘাড় তুলে তাকাল নিরঞ্জন। যেন চমকে উঠেছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, প্যাকেট থেকে সিগারেট। সিগারেটটা প্যাকেটের ওপর দুবার ঠুকে ধরাল।

ঘন ঘন দুবার টান দিল। তারপর কেমন অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে, আসবেন, মানে ?

অরুণা বললে, হ্যাঁ, এরপর কলকাতায় যখন আসবেন।

নিরঞ্জন হেসে উঠল। —যত সব বাজে কথা।

অরুণা বললে, সত্যি, সত্যি। আমারও তো প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

নিরঞ্জন ঘন ঘন সিগারেট টানল। কেমন যেন উত্তেজিত।

তারপর বললে, দীপাকে ডাকো তো একবার।

দীপা নিরঞ্জনকে দাদা বলে। নিরঞ্জনের সামনেও জোরে কথা বলে, শব্দ করে হাসে। এক টেবিলে বসে খেতে দ্বিধা নেই, নিরঞ্জনের কোনও রসিকতার জবাবে দীপাও রসিকতা করে, কখনও সখনও ওরা একসঙ্গে দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যায়, কিংবা চিনে রেস্তরাঁয় খেতে।

দীপা সব দিক থেকেই আধুনিকা, কিন্তু সিঁথিতে ডগডগে করে সিঁদুর দেয়, কখনও-বা পায়ে টকটকে আলতা পরে। দীপার গায়ে রং খুবই ফর্সা, সেজন্যে সিঁদুর আলতায় ওকে রীতিমত সুন্দরী দেখায়। দীপা তা জানেও।

কখনও হয়তো হুড়ুমদুড়ুম করে ছুটে বেড়ায়, সদা ব্যস্ত ভাব, চেঁচিয়ে কথা বলে, আবার কখনও, বিশেষ করে বাইরের লোকের সামনে একেবারে শান্তশিষ্ট, গায়ে কাপড় জড়িয়ে ধীরেসুস্থে আসে, বসে, কথা বলে।

অরুণা হাসতে হাসতে প্রথম দিকেই একবার বলেছিল, নাটক করতে জানিস ভাই ছোটো। আমরাই কিছু শিখলাম না।

নতুন বউ, ছ মাসও যায়নি, হঠাৎ নিরঞ্জনকে এসে বললে, দাদা, আমাকে একটা নেল কাটার এনে দেবেন তো।

অরুণা সামনেই ছিল, সেও হকচকিয়ে গিয়েছিল। হেসে ফেলেছিল ওর ভাবভঙ্গি দেখে। নেল কাটার কিনে আনতে হবে, সে-কথা তো অরুণাকে বললেই চলত।

অরুণা হেসে বলেছিল, তোর কর্তাকে বললেই তো পারিস, এনে দিতে পারে না।

দীপা নিরঞ্জনের সামনেই বলেছিল, ওকে রোজ রোজ অত তোষামোদের কি দরকার। হেসে ফেলে পরক্ষণেই বলেছে, তাছাড়া দাদা তো আর টাকাটা চেয়ে নিতে পারবে না।

নিরঞ্জনও অট্টহাস করে হেসে উঠেছিল ওর কথায়।

আর অরুণা বলেছিল, বাব্বা কি বুদ্ধি।

তখন থেকেই সব জড়তা কেটে গিয়েছিল।

নিরঞ্জনের মা অবশ্য তেমন পৌরাণিক নন। ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ে কথা বলবে না, দূরে দূরে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে, কড়া নেড়ে অরুণাকে ডাকবে, এসব সারদাও পছন্দ করেন না। কিন্তু একটু লাজুক লাজুক হবে, মাথায় সামান্য ঘোমটা দেবে, এ-সবই পছন্দ ছিল তাঁর। কিন্তু আপত্তি করেননি, করলেও টিকত কিনা সন্দেহ।

অরুণা গিয়ে দীপার ঘরের কড়া নাড়ল। দরজা বন্ধ।

কপাট খুলে দীপা বেরোতেই অরুণা হেসে বললে, ধন্যি মেয়ে বাবা, আসতে না আসতেই খিল দিয়েছিস ?

দীপা রেগে গেল। চাপা গলায় বললে, আজেবাজে কথা বলবে না বলছি। জানো, ওর সঙ্গে আমার তিনদিন কথা বন্ধ !

অরুণা হেসে ফেলে বললে, খিল দিলেই তো কথা বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর বললে, যা, তোর দাদা ডাকছে একবার।

অরুণার স্বভাবটাই এই রকম। সুযোগ পেলেই কথাগুলো শালীনতার সীমা ঘেঁসে চলে। এ-ধরনের কথাবার্তায় ও বোধহয় নিজেই বেশ আনন্দ পায়।

দীপা কিন্তু এ-সব পছন্দ করে না, কথাবার্তায় কখনও বেচাল হয় না। ওর রুচিতে বাধে।

দাদা ডাকছে শুনেই দীপা চলে এল নিরঞ্জনের কাছে। —ডেকেছেন আমাকে ?

নিরঞ্জন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। তারপর বললে, বেলেডোনা থার্টি কি নাকি বলে গেছেন ?

—হ্যাঁ দাদা। সত্যি বলছি।

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দীপা বলতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছিল, খালি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। কথা বলতে বলতে দুটো পা গুটিয়ে তুলে ফেলল চেয়ারে।

বললে, আমি তো জানিই না কখন এসেছেন। বাবা এসে হঠাৎ বললেন, দু কাপ চা করে দাও, রামেশ্বর এসেছে।

অরুণা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। দীপা তার দিকে তাকাতেই অরুণা ইশারা করে পা নামাতে বললে দীপাকে। ওই এক বদস্বভাব দীপার। কার সামনে বসেছে, কার সঙ্গে কথা বলছে, সে-সব খেয়ালই নেই, চেয়ারে পা গুটিয়ে বসবে। মেয়েদের যে এ-সব অভ্যাস শোভা পায় না সে বুদ্ধিও নেই।

দীপা জানে, কিন্তু খেয়াল থাকে না। ও পা নামাল।

তারপর হেসে উঠে বললে, রামেশ্বরবাবু, ওই যে বেলেডোনা থার্টি, উনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, কফিটফি খাইয়ে নাকি অনেক গল্প করেছেন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি, প্রেসিডেন্ট আসবেন।

দীপার কাছ থেকে সমস্ত কথা খুঁটিয়ে বের করা খুব শক্ত। এক এক লাফে এক এক জায়গায় পৌঁছে যাবে, সেগুলো সব ঠিকঠাক সাজিয়ে নিয়ে গোটা ব্যাপারটা জানতে হয়।

নিরঞ্জনের মনে তখনও কিছুটা অবিশ্বাস।

প্রশ্ন করল, কিন্তু রামেশ্বরবাবু জানলেন কি করে ?

দীপা হাত পা নেড়ে বলে উঠল, বাঃ, রামেশ্বরবাবুই তো বললেন, আমি তো ভেবেছি, সেই হোমিওপ্যাথির কথা তুলবেন। উনি তো আবার অ্যালোপ্যাথির ওপর ভীষণ খাপ্পা। বলেন, বাচ্চা ছেলেদের একেবারে খাওয়ানো উচিত নয়। একটা সারাতে গিয়ে আরেকটা…

নিরঞ্জন হেসে ফেলল।

অরুণা ধমক দিল দীপাকে। —আসল কথাটা বল না।

দীপা বললে, সে-কথাই তো বলছি। আমি চা নিয়ে গেলাম তো ? আমাকে দুম করে বললেন, বোসো এখানে।

নিরঞ্জন ততক্ষণে মোটামুটি বুঝে গেছে রামেশ্বরবাবু দেখা করতে গিয়ে খবরটা নিয়ে এসেছেন।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল নিরঞ্জনের। তা ছাড়া রামেশ্বরবাবুকে ও খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। হোমিওপ্যাথির কথা উঠলেই শুধু কথাবার্তায় ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া অন্য সব ব্যাপারেই খুব বিশ্বাসযোগ্য। বাবার আন্ডারে চাকরি করতেন। খুব অল্প বয়েস থেকে বন্ধুত্ব। তখনকার দিনে চাকরিতে দু-এক ধাপ নীচে বা ওপরে হলেও সমান বন্ধুত্ব হতে কোনও বাধা ছিল না।

নিরঞ্জন শুনেছে সেই আদর্শ টাদর্শ যুগে রামেশ্বরবাবুও ছিলেন বাবার সঙ্গে। বাবাই ওঁর

চাকরি করে দেন। তখন চাকরি দেওয়া কত সহজ ছিল।

রামেশ্বরবাবুকে এর আগের বার যখন দেখেছে নিরঞ্জন, তখনই তাঁকে বাবার চেয়েও অনেক বৃদ্ধ মনে হয়েছে। শরীরের মেদমাংস ঝরে গিয়ে কাঠির মত চেহারা, চোখে রোলগোল্ডের চশমা, চশমার কাচ বাইফোকাল বলেই দুটো টুকরো জুড়ে দেওয়া। আগেকার দিনে বোধহয় একসঙ্গে হত না, কিংবা একসঙ্গে হলে দাম বেশি হত। নিরঞ্জন ঠিক জানে না।

ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই বেলুড় মঠে যান। বলেন, ওখানে যতক্ষণ থাকি কি শান্তি।

সোমনাথকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সোমনাথ কোনও আগ্রহ দেখাননি। মঠ কিংবা গুরু এ-সব ওঁর পছন্দ নয়।

নিরঞ্জনও ওসবে বিশ্বাস করে না। ঠাকুরদেবতায় কোনও আস্থা নেই। আর সুযোগ পেলেই রামেশ্বরবাবুর হোমিওপ্যাথিকে ঠাট্টা করে। বলে, ওসব আনসায়েন্টিফিক।

কিন্তু ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে নিরঞ্জনের অবিচল আস্থা। রত্নধারণেও। ওর হাতে একটা গোমেদের, একটা পোখরাজের আংটি আছে। অনেক টাকা দিয়ে কেনা।

সোমনাথ দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন। দেখে নয়, শুনে। কারও সখ থাকলে যে-কোনও পাথরের আংটি পরুক না। আপত্তির কি আছে।

নিরঞ্জন একদিন ওর মাকে বোঝাচ্ছিল, পোখরাজ আংটি পরে ও নাকি খুব ভাল রেজাল্ট পাচ্ছে।

শুনে সোমনাথ হতচকিত। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন নিরঞ্জনের মুখের দিকে। কিচ্ছু বলেননি। কারও বিশ্বাসে ঘা দিতে চান না। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের উনি একটুও বুঝতে পারেন না। যার ঠাকুরদেবতায় ভক্তি নেই, হোমিওপ্যাথিকে বলে আনসায়েন্টিফিক, পুরনো আসবাব ফেলে দিয়ে নতুন ফার্নিচার আনে, একটু-আধটু কমিউনিজম-কমিউনিজম কথাবার্তা বলে, তারা গ্রহচক্রে কি করে বিশ্বাস করে, রত্নটত্নর অলৌকিক শক্তিটক্তিতে কি করে বিশ্বাস করে? এদের বুঝে ওঠা দায়।

সোমনাথদের সময়ে এ-সব এত ছিল না। দলে পড়ে দু-একবার যদিও কুষ্ঠি দেখিয়েছেন, গোমেদ ধারণ করে অর্শ সারানো যায় বিশ্বাস করতেন না।

মনে মনে ভাবেন, আমরা অনেকদিক থেকে প্রাচীনপন্থী ছিলাম, কিন্তু মনটা ছিল বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। এরা বিজ্ঞান পড়ে কিন্তু মনের দিক থেকে প্রাচীনপন্থী।

এ নিয়ে একদিন নিরঞ্জনের সঙ্গে ঘোর তর্ক হয়েছিল। সোমনাথ শেষে রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তোর টাকা তুই জলে দিতে চাস দিবি, আমার বলার কি আছে।

নিরঞ্জন উঠে চলে এসেছিল। কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস এমনই জিনিস, শুধু নিজে বিশ্বাস করে শান্তি নেই। অপরকেও সেই কুসংস্কারের মধ্যে নিয়ে না যেতে পারলে তৃপ্তি হয় না। নিজের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে চুপচাপ থাকলে তো আর বিরোধ হয় না।

সোমনাথের সঙ্গে কোনও দিক থেকেই যেন নিরঞ্জন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। পারে না বলেই পিতাপুত্রের মধ্যে এত দূরত্ব। দূরত্ব আছে বলেই বাবাকে খুব একটা মূল্য দিতে পারে না। ভালবাসা আছে, এক একসময় বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে। কিন্তু শ্রদ্ধার উঁচু আসনে বসাতে পারে না।

হঠাৎ সেই সত্তর বছরের বৃদ্ধ নিরঞ্জনের চোখে মূল্যবান হয়ে উঠল।

দীপার কাছে প্রশ্ন করে করে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে গেল নিরঞ্জন। বিশ্বাস হল। এ যেন একটা দারুণ খবর।

নিরঞ্জন জিগ্যেস করল, রামেশ্বরবাবু আবার কবে আসবেন? বলেছেন কিছু?

এবার ও 'বেলেডোনা থার্টি বলল না। ওই হাড়-জিরজিরে বৃদ্ধ লোকটি প্রেসিডেন্টের

সঙ্গে দেখা করে এসেছে বলেই হয়তো নিরঞ্জন তাকে সমীহ্ করতে শুরু করেছে। কিংবা এমন একটা দারুণ খুশির খবর এনেছে বলে।

দীপা উত্তর দিল, না দাদা, তা কিছু বলে যাননি। এতদিন বাদে হঠাৎ এসেছিলেন আজ।

প্রথমটা বিশ্বাস করলেও, দীপা চলে যাবার পর নিরঞ্জনের মনে একটা সংশয় দেখা দিল।

রামেশ্বরবাবু যা বলে গেছেন সব কি সত্যি। বানিয়ে বানিয়ে বলে যাননি তো ?

মানুষ যত বুড়ো হয় ততই বুঝতে পারে সে সকলের চোখেই ক্রমশ খারিজ হয়ে যাচ্ছে। যতদিন উপার্জন করতে সক্ষম ততদিনই তার মূল্য। রামেশ্বরবাবু নিজেই তো একদিন বলেছিলেন ওঁর গৃহে শান্তি নেই। ছেলেরা কেউ ওঁর কথা শোনে না, এমন কি কথাই বলে না। একপ্রান্তে পড়ে থাকেন উনি। সকালে মর্নিং ওয়াক আর বিকেলে ইভনিং ওয়াক করে সময় কাটান। দুপুরটা ঘুমিয়ে।

—খুব ট্র্যাজিক লাইফ হে, নিরঞ্জন। নাতিনাতনীদের কাছে এনে ভালবাসারও জো নেই। ছেলেমেয়ে খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের ইংরিজি উচ্চারণ ভাল নয়, আমসত্ত্ব খেতে দিলে বাচ্চাদের অ্যাসিড হয় তাও জানি না, দশ বছরের নাতিকে সামনের দোকান থেকে বিস্কুট আনতে বললে পড়াশোনায় বিঘ্ন হয়। আরও কত কি।

রামেশ্বরবাবুর কথাগুলো শুনে সত্যিই দুঃখ হয়েছিল বেচারির জন্যে। কিন্তু উপায় কি। ভদ্রলোক সত্যিই তো ব্যাক ডেটেড। ছেলেরা কিছু অন্যায় বলেনি। এইসব বুড়োরা অনেক বয়েস অবধি বাঁচে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি জানে না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বলতে আজকাল যে কি বোঝায় তাও জানে না। ওরা তো নেসফিল্ডের গ্রামার আর হেলপ্‌স্ টু দি স্টাডি অফ স্যান্সক্রিট পড়েই পাশ করেছে।

সেবার রামেশ্বরবাবু যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, বুড়ো বাপটার দিকে একটু লক্ষ রেখো নিরঞ্জন। তোমার মা তো বাতে পঙ্গু, উনি সুস্থ থাকলে এত চিন্তা হত না।

এইসব উপদেশ নিরঞ্জনের একটুও ভাল লাগে না। এর মধ্যে যেন একটা লুকোনো অভিযোগ আছে। 'ছেলেরা আমার সঙ্গে কথাও বলে না', রামেশ্বরবাবু বলেছিলেন। কেন বলবে ? নিরঞ্জন নিজেও তো দেখেছে, বাবার সঙ্গে বসে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। ওঁর যে-সব বিষয়ে আগ্রহ, যা নিয়ে আলোচনা জুড়ে দেন, নিরঞ্জনের সে সব বিষয়ে কোনও কৌতূহলই নেই। তাছাড়া কোনও ব্যাপারেই তো ও বাবার সঙ্গে একমত হতে পারে না।

নিরঞ্জনের সন্দেহ হল, রামেশ্বরবাবু কোথাও কোনও সমীহ্ আদায় করতে পারেন না, না ঘরে না বাইরে, সেজন্যে দিব্যি একটা গল্প ফেঁদে বসেননি তো। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে এলাম।' দীপার কাছে ঠিক এই কথাটাই শুনেছে। রামেশ্বরবাবুর মত একজন নগণ্য লোকের পক্ষে সত্যি কি সম্ভব সেটা ? কি পরিচয় নিয়ে যাবেন ? কবে সেই চল্লিশ বছর আগে কাছাকাছি আসতে পেয়েছিলেন, সে-কথা কি মনে করে রাখে কেউ ? তাছাড়া ওঁদের জীবন তো ব্যস্ততায় মোড়া, নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না, তার ফাঁকে রামেশ্বরবাবুকে সময় দেওয়া কি সম্ভব নাকি।

উনি হয়তো এই সব গল্প বানিয়ে নিজের ইম্পর্ট্যান্স বাড়াতে চাইছেন। বাবা হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিংবা আমরা হাসাহাসি করব, তাই বাবাকেও স্তোক দিয়ে গেছেন। খুব অন্যায়। বাবা যদি সত্যি বিশ্বাস করে, পরে খুব হতাশ হবে। আঘাত পাবে। বাবাকে এই বয়সে এ-ভাবে আঘাত দেওয়া উচিত হবে না।

নিরঞ্জন ভাবল বাবাকে আগে থেকে একটু শুনিয়ে রাখলে হয়। 'কোথাও হয়তো

এখন আর পাত্তা পাচ্ছেন না, ওই সব গল্প বানাচ্ছেন।' তা হলে আর পরে আঘাত পাবেন না।

কিন্তু বাবার তো রামেশ্বরবাবুর ওপর অগাধ বিশ্বাস। একদিন বলেছিলেন, বড় হওয়াটাই বড় নয়, ওর মত খাঁটি লোক কম দেখেছি।

সত্যি, অদ্ভুত মানুষ এই রামেশ্বরবাবু। জীবনে কোনদিন কোনও অ্যাম্বিশন ছিল না। কিন্তু যখন যে-কাজ ধরেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। যে কোনও দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেই হল। সেটাকে সম্পূর্ণ না করে ছাড়বেন না।

একটা কি ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিলেই নাকি প্রোমোশন হত, দেননি। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, কি হবে আর-কটা টাকা মাইনে বেড়ে? আরেক টুকরো মাছ? তা হলেই সুখ?

এ-সবই বাবার কাছে শোনা। বেশ বোঝা যায় বাবা ভেতরে ভেতরে রামেশ্বরবাবুকে শ্রদ্ধা করে। যেন অ্যাম্বিশন জিনিসটা খারাপ।

'আমাদের কারও যা নেই, ওর মধ্যে নিষ্ঠা আছে। যখন যেটা ধরে, শেষ না করে ছাড়ে না।'

এখন হোমিওপ্যাথি। সোমনাথ নাকি একদিন গিয়েছিলেন ওঁর বাড়িতে। গিয়ে দেখেন হোমিওপ্যাথির ওপর দামি দামি সব বিদেশি বই কিনেছেন। ঘর বোঝাই। সোমনাথ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, প্র্যাকটিস শুরু করে দাও রামেশ্বর।

রামেশ্বরবাবু নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, সারা জীবন তো টাকা রোজগারের জন্যে অপব্যয়, এই কটা বছর অন্তত লোকের উপকার করি।

লোকের উপকার মানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করা কারও কোনও অসুখ আছে কি না।

এই সবের জন্যেই হয়তো বাবা রামেশ্বরবাবুর কথা বিশ্বাস করেছেন, নিরঞ্জন ভাবল।

পরক্ষণেই মনে হল, কি জানি, সত্যি হতেও পারে। যদি সত্যি হয়...

কল্পনায় অনেকগুলো ছবি যেন পরপর দেখে নিল নিরঞ্জন।

আগে থেকে খবর পেলে সি সি-কে নিয়ে আসবে। চিফ কন্ট্রোলার। বললে নিশ্চয়ই আসবেন। এ-রকম সুযোগ কি কেউ ছাড়তে চায়। শুনে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন।

নিরঞ্জনের কল্পনা করতেও ভাল লাগল। ও যেন গটগট করে অফিসের করিডর দিয়ে হেঁটে চলেছে, কোনেও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আর অফিসসুদ্ধ লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। বলছে, এখানে নেহাত একজন জুনিয়র অফিসার হলে কি হবে। হি হ্যাজ কানেকশনস। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওঁর বাড়িতে আসেন, থিঙ্ক অফ ইট।

ঈগল পাখির দুখানা ডানায় ভর দিয়ে যেন উড়তে উড়তে চলেছে নিরঞ্জন।

'ওঁকে একটা ম্যানেজিরিয়াল পোস্ট দেওয়া উচিত। আফটার অল কখন কি কাজে লাগবে বলা তো যায় না।'

সি সি বলছেন, 'হি শুড হ্যাভ আ কার।'

'অ্যান্ড আ কমফর্টেবল ফ্ল্যাট।'

সি এম এম দুঃখ করে বলছেন, ওর ওপর বড় ইনজাসটিস করা হয়েছে। তবে, ওরও তো কোনভাবে জানানো উচিত ছিল। এমন সব কানেকশন্‌স আছে জানতে পেরে অন্য কোম্পানি না বেটার অফার দিয়ে বসে।

নিরঞ্জন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দেয়। স্বপ্ন নয়, ও জানে এটাই ভারতবর্ষ।

কানেকশন্‌স্।

তোমার পরিচয় কেউ জানতে চায় না, তোমার যোগ্যতা কেউ দেখতে চায় না। তুমি কার ছেলে, কার নাতি ? নিদেনপক্ষে শ্বশুর, কিংবা খুড়শ্বশুর। কোনও বিখ্যাত লোক ?

তা হলে তুমি পার্টি ফার্টি না করেও মন্ত্রী হয়ে যেতে পার।

চিরন্তন ফিউড্যালিজমের দেশ। হাজার বছর ধরে একই ভাবে চলছে। আগে ছিল বংশপরিচয়। ভরদ্বাজ গোত্রের মেধাতিথি ভট্টর অষ্টবিংশতি পুরুষ বৃন্দাবন ঠাকুরের···

এখন ? মাতামহ কোথাকার অ্যামবাসাডার ছিলেন, অথবা পিতৃদেব কোথায় ফার্স্ট সেক্রেটারি ? কিংবা হায়ার এশেলানের কার কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

সোমনাথ বলেছিলেন, তা কেন বলছিস ? এখন তো সর্বক্ষেত্রে একজন করে চেনা লোক দরকার। র‍্যাশন অফিসে, ব্যাঙ্কে, টেলিফোনে, ইনসিওরেন্সে, থানায়, রেলের রিজার্ভেশনে, কোথায় নয় ? স্কুলে ভর্তি হতে হলে, চাকরি পেতে হলে, ট্র্যান্সফারে, প্রোমোশনে। সব জায়গায় একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কেউ থাকা চাই। পি এফের টাকা তুলতে গিয়ে নেহাত একজন চেনা লোক পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই।

সোমনাথ কথাটা মিথ্যে বলেননি। নিরঞ্জন নিজেও তো ব্যাঙ্কের পাশ বই আপ-টু-ডেট করাতে গিয়ে একজন চেনা লোক ধরে।

নিরঞ্জনের মনে হল এতদিনে সুযোগ এসেছে, এবার আমিও নিজেকে এই সিস্টেমের মধ্যে মানিয়ে নিতে পারব। অবশ্য যদি রামেশ্বরবাবুর কথাটা সত্যি হয়।

নিরঞ্জন যেন দেখতে পাচ্ছে, সমস্ত পাড়া সচকিত, বিস্মিত। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের ডোভার লেনের ফ্ল্যাটের দিকে।

বাড়িওয়ালা শিবেনবাবুর বাড়ির মেয়েরা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে। শিবেনবাবু নেমে আসতে ভরসা পাচ্ছেন না।

সবাই ভাবছে আমাদের পাড়ায় এমন একজন মানুষ বাস করেন, আমরা এতদিন খবরই রাখিনি। কি আশ্চর্য !

॥ তিন ॥

সুরঞ্জন বললে, তবে আর কি, জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

দীপা আসলে একটা সুযোগ খুঁজছিল। তা না হলে ও খবরটা দিতই না।

দিন তিনেক হল ওদের কথা বন্ধ। কি নিয়ে মানোমালিন্য তা এখন আর মনেও নেই। কোন কথার পিঠে কে কি বলেছিল, সব ভুলে গেছে। শুধু মনে আছে সকালে অফিসে যাবার আগে কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হতে হতে সুরঞ্জন রেগে গিয়েছিল, তারপর অফিস চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে লোকটা আর কথাই বলে না। বাধ্য হলে শুধু হুঁ হ্যাঁ কিংবা না। ব্যস। দীপাও কম জেদি নয়। অপমান লেগেছিল, কিংবা অভিমান। রেগে গিয়ে দীপাও কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন রাগ পড়ে গেছে, কিন্তু যেচে কথা বলতেও লজ্জা। আর নিজেকে এত সস্তা করবেই বা কেন।

সুরঞ্জনের প্রকৃতিটা একটু খিটখিটে। সব ব্যাপারেই যেন অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট হবার কারণও আছে। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে ও কারও কোনও সাহায্য পায়নি। না বাবার, না দাদার। বাবা রিটায়ার্ড মানুষ, তাঁর কথা এখন কেই বা রাখবে। কিন্তু দাদা চেষ্টা করলে তার অফিসে নিশ্চয় একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারত। অন্তত এই চাকরিটার চেয়ে ভাল কিছু।

যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে তখন দাদাকে একবার বলেছিল।

দাদা উত্তর দিয়েছিল, আজকাল তো সব ইউনিয়নটিউনিয়নের ব্যাপার। আর বিশ্বাস কর আমার সে ক্ষমতাও নেই।

ব্যস। যেন দাদার আর কোনও দায়িত্ব ছিল না। নিজের ক্ষমতায় না থাক, পাঁচজনকে বলতে তো পারত। দু-একটা ইন্টারভিউ পেলেও বুঝতাম।

কেউ কিচ্ছু করেনি, শেষে এক বন্ধুর চেষ্টায় এই চাকরিটা। সব মিলিয়ে হাতে পায় নশো ছত্রিশ টাকা।

বৌদির হাতে সংসার খরচের টাকা তুলে দিয়ে ওর নিজের হাতে আর বিশেষ কিছু থাকে না। কারণ বিল্টুর দুধের টাকা, ইস্কুল টিফিন সে-সবও আছে। তবু বাবা আছেন, বাবার পি এফের টাকা আছে। সে-সব রাখা আছে কোম্পানি ডিবেঞ্চার কিংবা ফিকসড ডিপোজিটে। ফোর্টিন অ্যাণ্ড হাফ, ফিফটিন পার্সেন্টে। কিছু ন্যাশনাল সেভিংসে, কিছু ব্যাঙ্কে এফ ডি। সে সবই সুরঞ্জন জানে। বাবা সবই সুরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেন। বেশির ভাগই মার সঙ্গে জয়েন্ট, আইদার অর সারভাইভার। দু-চারটেতে সুরঞ্জনকেও সই করতে হয়েছে ; যদি বাবা মা দুজনই একসঙ্গে অসুখে পড়ে, তখন টাকা তুলবে কে।

সোমনাথ যে সুরঞ্জনকে বেশি বিশ্বাস করেন, অথবা বেশি ভালবাসেন তা নয়। মূল কথা হল নিরঞ্জনের এ-সব ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ করার সময় নেই। অর্থাৎ আগ্রহ নেই। নিরঞ্জন একটু অধৈর্য ধরনের, পার্সেন্টেজের অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়।

যখনই বুঝেছে জমি কিংবা ফ্ল্যাটের জন্যে বাবা ওই টাকার অর্ধেকও হাতছাড়া করতে রাজি নয়, তখনই নিরঞ্জনের ওসব বিষয়ে উৎসাহ চলে গেছে। সব সময়েই বলে, আমার সময় কোথায় ?

সময় সুরঞ্জনেরও নেই। ওদের সমস্ত সময় তো ওই বাইরের জগৎটাই নিয়ে নিচ্ছে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু। ছেলেমেয়েদের কেউই নিজেরা পড়ায় না, বাবার কাছেও পড়তে দেয় না। আজকাল পরীক্ষার ধরনধারণ অন্যরকম, উত্তর দিতে হয় অন্যভাবে। মান্ধাতা আমলের রীতির সঙ্গে মেলে না। শেষে বাবার কাছে পড়ে ফেল করুক আর কি। নিরঞ্জন মঞ্জুশ্রীর জন্যে দু-দুজন টিউটর রেখেছে। আজকাল তো আবার একজন টিউটর দিয়ে হয় না। এক একটা সাবজেক্টে এক একজন। তাও হপ্তায় দুদিন কি তিন দিন এক ঘন্টা করে।

সোমনাথ প্রথমে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের সময়ে নাকি সপ্তাহে সাতদিনই পড়াত, দেড়-ঘন্টা দু-ঘন্টা করে, সব সাবজেক্ট। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

নিরঞ্জন শুনে বলেছিল, তোমরা তো টিচারদের চিট করতে। স্কুলেই বা কি মাইনে দিত।

সোমনাথ হেসে বলেছেন, চিট করতাম ? হবে হয়তো। কিন্তু ভাল ভাল ছেলে তখনই বেরিয়েছে। এখন ভাল স্কুল থেকে শুধু ভাল অফিসার বেরোয়।

নিরঞ্জন কোনও তর্ক করেনি।

ছোট ছেলে সুরঞ্জনের এখনও ওসব সমস্যা দেখা দেয়নি। বিল্টু নেহাতই ছোট। দীপাই তাকে পড়ায়। স্কুলে পৌঁছে দেয়, নিয়ে আসে।

পৌঁছে দিতে গিয়ে সকালে ঘন্টা দেড়েক কাটিয়ে আসে।

অনেক ছেলেমেয়ের মা স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সামনের বাড়ির রকে বসে গল্পগুজব করে। তারপর হন্তদন্ত হয়ে ফেরে। স্বামীর অফিস যাওয়ার আগে।

সুরঞ্জন একদিন দেখে বলেছিল, সব শাশুড়িকে ফাঁকি দিচ্ছে। ফিরে গেলেই তো সংসারের কাজ, যতক্ষণ ফাঁকি দেওয়া যায়।

দীপা রেগে গিয়েছিল।

অরুণাও একদিন বলেছিল, তুই তো দিব্যি আছিস, সকাল হলেই ছেলেকে নিয়ে কেটে পড়িস। যত ছোটাছুটি আমার।

কারণ, অরুণার ছেলে-মেয়েরা সকলেই স্কুলবাসে যায়-আসে। স্কুলবাস একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিল্টুকে নিয়েই সুরঞ্জনের সঙ্গে দীপার কথা কাটাকাটি। তারপর কথা বন্ধ।

দীপা সুযোগ খুঁজছিল।

এ কদিন জরুরি প্রয়োজনে বিল্টুকে মধ্যস্থ রেখে কথা বলতে হয়েছে। 'বিল্টু তোর মাকে বল...', কিংবা 'বিল্টুসোনা, বাবার পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে আনো।' অর্থাৎ কথা যখন বন্ধ, শার্ট-প্যান্টও ছোঁবে না। অথবা ছুঁলে, অর্থাৎ টাকা বের করলে, যদি রেগে যায়।

সুরঞ্জন অফিস থেকে ফিরে খাটের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে।

দীপা বললে, জানিস বিল্টু, আমাদের বাড়িতে প্রেসিডেন্ট আসবেন।

পরক্ষণেই একটা চিনা পটকা ফাটল। —তবে আর কি, জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

এ-রকম একটা খবরে কোথায় চমকে ওঠার কথা, শুনে খুশি হয়ে উঠে বসবে, অবাক অবাক চোখ করে জিগ্যেস করবে, সত্যি কিনা, কে বলল, জানলে কি করে, তা নয়, সমস্ত ব্যাপারটাকে তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা।

আলনায় গুছিয়ে রাখা কাপড়গুলো আবার একবার গুছিয়ে রাখতে রাখতে অন্যদিকে চোখ রেখে দীপা ধীরে ধীরে বললে, যারা এর দাম বোঝে, তারা সত্যি ধন্য হবে। রামেশ্বরবাবু যখন বলছিলেন তখন ওঁর চোখেমুখে আনন্দ উপচে পড়ছিল।

—বেলেডোনা থার্টি ! ফুঃ।

মানুষটাকে, নাকি দীপাকে ফুঃ করে উড়িয়ে দিতে চাইল বোঝা গেল না।

দীপা একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, বাবাকে আজ অনেকদিন বাদে বেশ খুশি খুশি লাগছিল।

এতক্ষণ একটা কথাও সুরঞ্জনকে সরাসরি বলেনি। সবই যেন স্বগতোক্তি।

এবার সরাসরি বললে, বাবাকে আবার যেন জীবন ধন্যটন্য বোলো না। মনে আঘাত পাবেন।

তারপর যেন নিজের মনেই দীপা বললে, এক একটি রত্ন।

বলেই অবশ্য খারাপ লাগল। সুরঞ্জনকে বলার জন্যে নয়, এর মধ্যে নিরঞ্জনও এসে গেছে বলে।

এ বাড়িতে আসার পর এই একটা জিনিস দীপার রীতিমত অপছন্দ।

দীপা একটা বড় জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে এসেছে।

ওর নিজেরই ভাই বোন অনেক। তাছাড়া জেঠতুতো দাদারাও একই বাড়িতে থাকে। পাইকপাড়ার দিকে বেশ বড়সড় বাড়ি, তবে পুরনো আমলের। দেয়াল থেকে পলস্তারা খসে পড়লেও একটা বনেদিয়ানার গন্ধ আছে। জ্যাঠামশাই জেঠিমারা পৃথগন্ন, কিন্তু এক ছাদের নীচে। এক সময় ছোটখাটো জমিদারি ছিল। এখন জেঠতুতো দাদারা ইলেকট্রনিকসের ব্যবসা করে অবস্থা খানিকটা ফিরিয়েছে। দীপাদের ভাগে পড়া দারোয়ান চাকরবাকরের ঘরগুলো এখন দোকান ভাড়া দেওয়া হয়। দীপার এক দাদা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। এক দিদি, খুবই সুন্দরী বলে বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে, আমেরিকায় থাকে। সেজন্যেই বোধহয় সুরঞ্জনের মধ্যে একটু হীনমন্যতা আছে। দীপার কিন্তু কোনও ক্ষোভ নেই। বিলেত আমেরিকার নামেও ওর আতঙ্ক। কথায় কথায় বলে, বেশ আছি বাবা

কলকাতায়, বাসে চড়লেই বাপের বাড়ি।

দীপার বাপের বাড়ির সঙ্গে জ্যাঠামশাইদের শরিকি ঝগড়া লেগেই আছে। মন কষাকষি চলছেই। কিন্তু বাইরের কারও সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ হলেই ওরা সকলে একজোট হয়ে যায়। আপদেবিপদে, কিংবা কারও অসুখ হলে তখন ওরা অন্য মানুষ। কাকা কিংবা জ্যাঠামশাইকে সবাই মান্য করে।

আর এ-বাড়িতে বাবার জন্যে, মানে সুরঞ্জনদের বাবার জন্যে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

—বাবার চশমার পাওয়ার বেড়েছে, বলছিলেন।

দীপা ধীরে ধীরে বললে।

যেন ঘুরিয়ে বলতে চাইল তোমরা কত অমানুষ।•একটা চাপা রাগ থেকেই বললে। রামেশ্বরবাবু যে খবরটা জানিয়ে গেছেন সুরঞ্জন সেটাকে 'ফুঃ' করে উড়িয়ে দিতে চাইছে, কিংবা জীবন ধন্যটন্য বলে ঠাট্টা করেছে বলেই।

খবরটা শুনে থেকেই দীপার বেশ ভাল লাগছিল। ও তো রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, কবে পাইকপাড়ায় গিয়ে সবাইকে জানিয়ে আসবে।

দীপার বেশ গর্ব হচ্ছে। বাবা নিশ্চয় খুব খুশি হবে, ভাববে যাক্ দীপাকে গর্ব করার মত পরিবারে বিয়ে দিয়েছি।

শ্বশুরকে দীপা সমীহ করে, ভালও বাসে। এ বাড়িতে ওঁকে কেমন অসহায় লাগে বলেও খানিকটা মায়া হয়। কিন্তু রামেশ্বরবাবু খবরটা জানিয়ে যাওয়ার পর থেকে সত্তর বছরের অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষটা ওর চোখে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।

সেজন্যেই চশমার কথাটা তুলল।

সোমনাথ একবার একা-একাই ট্রামে করে গিয়ে দাঁত তুলিয়ে এসেছিলেন।

বাসে উঠতে পারেন না, বসতে না পেলে আরও কষ্ট। তবু দিনের বেলায় যাওয়া-আসা সম্ভব।

কিছুদিন থেকে চোখে পরিষ্কার দেখতে পান না, খবরের কাগজ পড়তে অসুবিধে হয়। তাই দুচারবার ছেলেদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছেন, চশমার পাওয়ার বাড়াতে হবে মনে হচ্ছে, কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগে।

ব্যস, অভিমানী এই বুড়ো মানুষটি বোধহয় কাউকে কিছু বলবে না।

একদিন হঠাৎ একা একাই চলে যাবেন সোমনাথ। একে ভাল দেখতে পান না, তার ওপর চোখের ডাক্তাররা সবাই তো সন্ধের পর চেম্বারে বসেন। তার ওপর লোডশেডিংয়ের ভয়। অন্ধকার রাস্তায় কুকুরের ভয়। কলকাতা তো এখন কুকুরের শহর।

সেজন্যেই দীপা বললে, বাবার চশমার পাওয়ার বেড়েছে বলছিলেন। অর্থাৎ মনে পড়াল।

সুরঞ্জন সাড়া দিল না। এইসব কর্তব্যের কথা উঠলেই ও বিরক্ত হয়।

দীপা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আলনায় কাপড় গুছিয়ে রাখতে রাখতেই বললে, কাল একবার পাইকপাড়া যাব।

এবারও সুরঞ্জন কথা বলল না। ও বোধহয় ভাবল দীপা রাগ দেখাচ্ছে। কিন্তু তা নয়। পাইকপাড়ায় বাপের বাড়িতে গিয়ে খবরটা না জানিয়ে এলে যেন শান্তি নেই দীপার।

সুরঞ্জন উত্তর দিল কি না দিল দীপার কিছু যায় আসে না। এখন ও এ বাড়িতে আর নতুন বউ নয়।

সুরঞ্জন উঠে পড়ল। সন্ধের সময় ওদের একটা আড্ডা আছে। কিন্তু আজ আর আড্ডার কথা ভাবল না।

বাবার কাছ থেকে খবরটা ভাল করে জানতে হবে। দীপাকে কোনও বিশ্বাস নেই। সব ব্যাপারেই ওর এত উচ্ছ্বাস! তাছাড়া কি শুনতে কি শুনেছে, কে জানে।

একটা কৌতূহল অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সুরঞ্জন তেমন কোনও উৎসাহ বোধ করছে না।

বছর তিনেক আগে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বাবা শুধু বলেছিল, হি ইজ অনেস্ট। ভেরি অনেস্ট। একসময় আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমি রামেশ্বর...এক সঙ্গে কাজ করেছি।

কাজ মানে ফালতু দেশের কাজ।

সুরঞ্জনের ওসব বিষয়ে কোনও মোহ নেই। কলেজে পড়ার সময় পলিটিক্স ওরাও করেছে, চেয়ার টেবিল ভেঙেছে, বিপক্ষের ছেলেদের মারধোর! এখন সব জানা হয়ে গেছে।

এখন ও রীতিমত প্রাকটিক্যাল। যে-কোনও বিষয়কে বিচার করে কোনও লাভ হবে কিনা দেখে। পুরোপুরি স্বার্থপর বলা চলে। কারণ ও দেখেছে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই তৈরি করতে হয়। সামান্য উপকার করার জন্যেও কেউ এগিয়ে আসে না।

অবশ্য তাও ঠিক নয়। সুব্রত সাহায্য না করলে চাকরিটা হত না।

'প্রেসিডেন্ট আসবেন।'

এর চেয়ে চুনোপুঁটি কোনও মন্ত্রী, কিংবা ওদের অফিসের জি এমের সঙ্গে বাবার আলাপ থাকলে অনেক লাভ হত। মন্ত্রীরা, ও শুনেছে, যা খুশি করতে পারে।

অথচ সুরঞ্জনরা একজন এম এল এ-কেও চেনে না, আলাপ নেই।

যাদের কেউ নেই, তাদের অবশ্য টাকা থাকলে হয়। আর মজা এই, টাকা থাকলে তখন অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়। তারাও খাতির করে।

সুরঞ্জনের এখন অনেক কিছু চাই। দাদার ভাই বলে পরিচয় দেবার মত আরও কিছুটা বেশি মাইনের চাকরি। এখন মাইনেটা এতই কম যে বাবার কাছে বলতেই লজ্জা। তা ছাড়া দাদার পটাপট কয়েকটা প্রোমোশনে ও খুশি না হয়ে বরং একটু অপমান বোধ করেছে।

বাবার হয়তো ধারণা, অন্তত দাদা-বৌদির তো নিশ্চয়ই, যে ও ইচ্ছে করে সংসার খরচের টাকা এত কম দেয়। হয়তো ভাবে ও টাকা জমাচ্ছে। অথচ স্পষ্ট করে বলতেও সঙ্কোচ হয়।

বিল্টু বড় হচ্ছে, এরপর তো আরও খরচ বাড়বে।

তার ওপর এই বাড়ির সমস্যা।

দাদার কোন ভাবনা নেই, ও কোথাও না কোথাও বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাটে উঠে যেতে পারবে। হয়তো অফিস থেকেই পেয়ে যাবে। সুরঞ্জন ঠিক জানে না, হয়তো জমিয়েও ফেলেছে অনেক, দুম্ করে একদিন একটা ফ্ল্যাট কিনেও ফেলবে।

দাদা তো একদিন বলেই ফেলেছিল, 'বাড়ি ছাড়ো' 'বাড়ি ছাড়ো' এই অশান্তি নিয়ে থাকা যায় না। ওর হয়তো উপায় আছে বলেই এ-কথা বলে।

যাদের উপায় নেই তারা দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে, সব অসুবিধে সহ্য করে, বছরের পর বছর মামলা লড়ে। নিরুপায় হয়েই করে। তার'ও এমন কিছু খারাপ লোক নয়। আসলে তো স্বার্থের দ্বন্দ্ব। যে যার নিজের স্বার্থ দেখে।

সুরঞ্জনের এক একসময় লোভ হয়। বাবার এখনও যা ফিকসড ডিপোজিট আছে,

আর ও নিজে তো কো-অপারেটিভের সামান্য লোন পাবে, বোধহয় একটা ফ্ল্যাট হয়ে যেতেও পারে। খুবই ছোট ফ্ল্যাট। অবশ্য তখন একেবারে শহরতলিতে চলে যেতে হবে। তা হলেও শান্তি। কিন্তু বাবার ঐ এফ-ডি থেকে পাওয়া সুদের টাকাটা বন্ধ হয়ে যাবে। সংসার চালানোই দায় হবে। তাছাড়া বড় একটা অসুখবিসুখ হলে···

বাবার অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে ওই অসুখে। অপারেশনের সময় নার্সিংহোম আর ডাক্তারে। সেজন্যেই বাবার এত ভয়।

—বাবা, তুমি চোখ দেখাতে যাবে বলছিলে।

সুরঞ্জন এসে দাঁড়াল।

সোমনাথের অবাক হবার কথা। চশমার পাওয়ার বাড়াতে হবে সে-কথা বলেছেন মাস দুই আগে। কেউ মনে রেখেছে ভাবেননি। নিজের গাফিলিতিতেই একা একা চলে যাননি। তবে ঝট্ করে একদিন চলে যেতেন।

সুরঞ্জনকে ভীষণ ভাল লাগল সোমনাথের। বুকের ভেতরটা কেঁদে-কেঁদে উঠল। বাড়ির এক প্রান্তে পড়ে আছেন, ওঁর অনেক কষ্টে তৈরি বর্মা টিকের আসবাবের মত। ওঁর জন্যে কারও কোনও চিন্তাভাবনা আছে, বুকের মধ্যে একটু মমতা, বিশ্বাস করতেই পারেন না।

বললেন, হুঁ।

একটু থেমে বললেন, কাকে দেখানো যায় বল তো।

আজকালকার কোনও খবরই জানেন না সোমনাথ। সেই প্রাচীন আমলের ডাক্তারদেরই চিনতেন, জানতেন।

নিজেই বললেন, ডাক্তার ভাদুড়ি তো মারা গেছেন। ওঁকেই দেখাতাম।

—তাহলে দেখি খোঁজ করে। সুরঞ্জন বললে।

অর্থাৎ ও একদিক থেকে বেঁচে গেল। আজকেই, এখনই, নিয়ে যেতে হচ্ছে না। পরে কোনও একদিন গেলেই হবে। এমন কি বাবা যদি রাগ করে কোনও দিন একা-একাই চলে যায়, তখনও ওর তেমন অনুশোচনা হবে না। আমি তো বলেই ছিলাম, নিয়ে যাব, ভাল ডাক্তারের খোঁজ করছিলাম।

সেবার দাঁত তোলাতে গেলে ডেন্টিস্ট নাকি জিগ্যেস করেছিল, সঙ্গে কাউকে এনেছেন ?

পরে মার কাছে শোনা। আসলে মা ওদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেই কথাগুলো বলেছিলেন। সুরঞ্জন জানে, এই অবহেলা মাকেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ দেয়।

—মানুষটা কি ছিল, আর এখন কিভাবে আছে। মা বলেছিল।

বার্ধক্য সত্যি এক ধরনের শাস্তি।

রাঙামাসি একদিন এসে বলেছিল, তোদের তো মনে থাকার কথা, নেহাত ছোট ছিলি না। তখন কি খাতির। তেমনি বড় চাকরি।

সুরঞ্জন জানে আসলে বড় চাকরি বলেই খাতির।

এই কথার পিঠেই মা বলেছিল, কি ছিল, আর কি ভাবে আছে।

তারপর মা সেই দাঁতের ডাক্তারের কথাটা তোলে।

সেই ডেন্টিস্ট ভদ্রলোক নাকি বলেছিলেন, কেউ আসেনি কেন, ছেলে নেই বুঝি ? সব মেয়ে ? না তাও নেই ?

—লজ্জাও করে না তোদের, অথচ ওর বলতে লজ্জা।

বাবা নাকি বলেছিল, ছেলেরা এখানে থাকে না, বাইরে।

মা বলেছিল, কত কষ্টে যে একটা বুড়ো বাপকে এমন মিথ্যে কথা বলতে হয় তোরা

বুঝবি না।

সুরঞ্জনের সত্যি খুব বুকে লেগেছিল সেদিন। চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপরও সেই একই ব্যাপার। স্বভাব বদলাতে পারেনি।

কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই সুরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, এবার চোখ দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও গাফিলতি করবে না।

কিন্তু এখন তো ও অন্য কথা জানতে এসেছে।

বাবা খাটের ওপর খবরের কাগজখানা পড়ছেন। সারাদিনই এই দুখানা কাগজ নিয়ে কাটিয়ে দেন। একটা বাবা নিজেই নেন, নিজের টাকায়। আসলে যে-কাগজখানা সারা জীবন পড়ে এসেছেন, সেটা ছাড়তে পারেন না। দুপুরবেলা খাওয়ার পর বৌদির পড়া হয়ে গেলে দাদার কাগজখানা চেয়ে নেন। ওটার টাকা দাদাই দেয়। সুরঞ্জন সকালে দাদার কাগজেই একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

বাবা অবশ্য কিছুদিন থেকে নিজের কাগজখানা ছেড়ে দেবার কথা বলছেন। পারবেন না, এতদিনের অভ্যাস ছাড়া কি সহজ নাকি, যতই টাকার টানাটানি হোক।

—রামেশ্বরবাবু এসে আজ নাকি কিসব বলে গেছেন ?

সুরঞ্জন এই কথাটাই এতক্ষণ বলতে চাইছিল। সেজন্যেই এ-ঘরে আসা।

সোমনাথ সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন।

বললেন, হ্যাঁ। বুড়ো হয়েছে, কাজ নেই, তার ওপর বাড়িতে অশান্তি। কি আর করবে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

সুরঞ্জন হেসে একটু অবিশ্বাসের সুরে বললে, দেখা করতে পেলেন ?

—বললে তো, আগে থেকে চিঠি লিখেছিল।

সুরঞ্জন বললে, ও।

কিন্তু বাবা নিজের কথাটা কেন বলছে না। সেটাই তো ও জানতে চায়।

সোমনাথ হঠাৎ বললেন, একসময় তো ওর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। তাছাড়া রামেশ্বরকে দেখে তোরা এখন বুঝতে পারবি না, ওকে উনি ঠাট্টা করে ফায়ার-বল্ বলতেন।

সুরঞ্জন বললে, এখানে আসার কথা, কি যেন বলছিলেন !

সোমনাথ চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, হ্যাঁ, সেরকম একটা সদিচ্ছা নাকি আছে। মনে রেখেছেন, খোঁজ নিয়েছেন, সেই যথেষ্ট। সে-সব দিন—

কথাটা আর শেষ করলেন না সোমনাথ। সামনের জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন ভাবছেন। কিংবা সেই সব দিনের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

—তোমার সেই মনে আছে ? স্ত্রী সারদার দিকে তাকালেন। —সেই যে হাওড়া স্টেশনে দেখা হয়ে গেল। বুকে জড়িয়ে ধরে...

সারদা খুশিতে হাসলেন। —সব মনে আছে, সব মনে আছে।

সোমনাথ আর কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। হয়তো বা অতীত দিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেলেন।

সুরঞ্জন উঠে পড়ল। এই সব অতীতের টুকরো-টুকরো ঘটনার কথা হঠাৎ হঠাৎ এক একবার শুনেছে। কখনও ভাল লেগেছে, কখনও ওকে স্পর্শই করেনি।

সুরঞ্জন শুধু বর্তমানকে চেনে। তবু মনে হল, এলে মন্দ হয় না। এও তো এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লাহিড়িদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে টের পেয়েছে। লাহিড়ির বোনের বিয়ে।

হিন্দুস্থান রোডে। এলাহি কাণ্ড, আলো সানাই, প্রচুর লোক, অনেক বড় বড় লোকও ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একজন মন্ত্রী, আর তাকে নিয়েই সকলে ব্যস্ত। কি খোশামোদ, কি তোয়াজ। যেন আর সকলে অনাহূত বরাহূত।

ওর বন্ধু সুকুমারের বাবা মারা গেল। নামী প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু বাবা মারা যাওয়াটা যেন খবরই নয়, প্রথমেই বললে, অমুক মন্ত্রী এসেছিলেন।

দাদা যখন বলে, আজকাল ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের খুব কদর, তখন বোধহয় এগুলিই বোঝায়।

দীপার কাছ থেকে শুনে সুরঞ্জন বলে উঠেছিল, তবে আর কি, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সত্যি তাই।

সমস্ত পাড়া নিশ্চয় সচকিত হয়ে উঠবে। পাড়ার লোক সমীহ করে কথা বলবে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে, অফিসে, আড্ডায় ও বলতে পারবে। তখন আর এই নগণ্য চাকরিটার কোনও গ্লানি থাকবে না। তবে এখন অবশ্য বলবে না। আসুন আগে, তারপর। তা না হলে সবাই হাসাহাসি করবে। ভাববে বানিয়ে বানিয়ে বলেছি।

কিন্তু কাউকে না বলেও যেন তৃপ্তি নেই। এরকম একটা খবর কি মনের মধ্যে চেপে রাখা যায়। সুরঞ্জনের মনে হল বাবা যেন ওর চোখে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক বড়।

আশ্চর্য। যে মানুষটাকে আজীবন দেখে এল, স্নেহ-ভালবাসা মেখে বড় হল, মনে পড়ে, সেবার পরীক্ষার আগে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া, বেহুঁস জ্বর, বাবা সারা রাত মাথার কাছে জেগে বসে আছে। মা আইসব্যাগ ধরে।

জ্বরটা বোধহয় কমে এসেছিল, একটু জ্ঞান আছে, মা আর বাবাকে দেখে ঝরঝর করে চোখ বেয়ে জল পড়েছিল।

এই মানুষটার মধ্যে ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠা দেখে আসছে সারা জীবন। কি নির্লোভ। শুধু নিজের সংসারটাকে ঠিক মত গড়ে তোলা ছাড়া আর যেন জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নেই। সকলে ভাল থাক, সুখে থাক।

যেটুকু পার্থক্য সে শুধু কালের, সময়ের। যা ভাল বলে জেনে এসেছেন, দেখে এসেছেন, সেটাকেই মেনে চলা। অথচ ওঁর ভাল লাগা মন্দ লাগার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি না বলে মানুষটাকেই এড়িয়ে চলি।

সুরঞ্জন ভাবল আমরাও তো একই রকম বন্দি। কালের কাছে, সময়ের কাছে।

যে যার কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ। সেজন্যেই পরস্পর পরস্পরের পছন্দ অপছন্দকে দাম দেয় না, অস্বীকার করতে চায়।

একটা মানুষের সব গুণ কি খারিজ হয়ে যাবে একালের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না বলেই ? অথবা আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিশ্বাস মেলে না বলে ?

রামেশ্বরবাবুকে নিয়ে আমরা সকলেই তো হাসাহাসি করে এসেছি। কারণ, ভদ্রলোকের হোমিওপ্যাথিতে অন্ধ ভক্তি। আর এ বাড়িতে কেউই হোমিওপ্যাথিতে আস্থা রাখতে পারে না। বিল্টুর অসুখ সেরেছিল ওঁর ওষুধে। তা সত্ত্বেও কেমন একটা সন্দেহ, হয়তো অসুখটা এমনিতেই সেরে যেত। তাই সুরঞ্জনও ওঁকে ঠাট্টা করে বলে বেলেডোনা থার্টি। ওদের কাছে শুনে শুনে একদিন বিল্টুও বলেছিল, ধমক দিয়েছিল দীপা। ওর ভয় কখন রামেশ্বরবাবুর সামনেই বলে ফেলবে।

কিন্তু এই মানুষটাকে কোনদিন সুরঞ্জন অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করেনি।

বাবা বলেছিল, রামেশ্বরকে দেখে তোরা এখন বুঝতে পারবি না। ওঁকে উনি ঠাট্টা করে ফায়ার বল্ বলতেন।

সত্যি তাই। এখন তো রামেশ্বরবাবু শুধু উপহাসের বিষয়।

সাকশেসফুল মানুষ ছাড়া আর কাউকেই বোধহয় আমরা দাম দিই না। চাকরি কিংবা ব্যবসা কিংবা প্রফেশন কিংবা পলিটিক্স। পলিটিক্সও এখন একটা প্রফেশন। পাঁচ বছরে যা পারো গুছিয়ে নাও। কিন্তু যে লাইনেই যাও তোমাকে সাকসেসফুল হতে হবে, ওপরে উঠতে হবে। তা না হলে তুমি শুধুই একটা বিস্মৃত সিঁড়ির ধাপ। শুধু অপরকে ওপরে ওঠার পথ করে দিয়েছ। আর সেজন্যেই কারও কাছে তোমার কোনও দাম নেই। ফায়ার বল্ তখন নিতান্তই ভিজে বারুদ।

যে সাকসেসফুল সেই তাকে কখনও কখনও মূল্য দেয়। সেটুকুই তার জীবনের একমাত্র স্বীকৃতি।

বাবা বলেছে, মনে রেখেছেন, খোঁজ নিয়েছেন, সেটুকুই যথেষ্ট।

কত অল্পে সন্তুষ্ট।

সুরঞ্জন হঠাৎ যেন বাবাকে নতুন ভাবে দেখতে শুরু করেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও আর গোলপার্কের আড্ডায় গেল না।

হঠাৎ সামনে একটা বাস পেয়েই উঠে পড়ল। একেবারে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে যোধপুর পার্কে এসে নামল।

বছর কয়েক হল ছোটকুপিসিরা যোধপুর পার্কে সুন্দর একটা বাড়ি করে উঠে এসেছে।

পাঁচ কাঠা জমির ওপর চমৎকার বাড়ি। দোতলায় গ্রিল দেওয়া ব্যালকনি। নীচের তলাটা ভাড়া দিয়েছে। কোম্পানি লিজ।

পিসেমশাই সেল ট্যাক্সের উকিল। খুব ভাল প্রাকটিস। একদিন মক্কেলদের সঙ্গে বসে আলোচনা করছিলেন। অনবরত ট্যাক্সকে ট্যাক্সো বলছিলেন। হয়তো ব্যবসাদার মক্কেলরা ট্যাক্সো বলে, তাই উনিও ট্যাক্সো বলছিলেন।

পিসেমশাইয়ের বসার ঘরের এক কোণে বেশ বড়সড় পেটমোটা গণেশের মূর্তি। পুজুরি এসে রোজ ঘণ্টা নেড়ে পুজো করে যায়।

সিঁড়ির মাথাতেই পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হাইট, কিন্তু গায়ে অপরিমিত চর্বি আর মাংস, প্যাণ্ট পরলে মনে হয় ভুঁড়িটা আগে আগে চলছে।

প্রচুর টাকা করেছেন, দু মেয়ের খুব ভাল বিয়ে দিয়েছেন, এক কথায় সাকশেসফুল মানুষ। তাই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হাইটের মানুষটা সাত ফুট ওপর থেকে কথা বলে ।

ছোটকুপিসি ভোলেভালা ভাল মানুষ, সেজন্যেই মাঝে মাঝে আসে সুরঞ্জন। কিন্তু পিসেমশাইকে একেবারে পছন্দ করে না।

ভেবেছিল ছোটকুপিসির সঙ্গে, ছোটকুপিসির ছোট মেয়ে মলির সঙ্গে গল্পগুজব করে একসময় খবরটা দিয়ে যাবে। তা হলেই পিসেমশাইয়ের কানে যাবে।

কিন্তু সিঁড়ির মাথায় দেখা হয়ে গেল পিসেমশাইয়ের সঙ্গে।

—কে সুরঞ্জন, এসো এসো।

তারপরই, বাবা কেমন আছে? যাবো যাবো ভাবি, সময়ই পাই না।

পিসেমশাই গ্রিল দেওয়া ব্যালকনিতে গিয়ে বসলেন, সুরঞ্জনকেও ডাকলেন।

তারপরই বিরক্তির সঙ্গে বললেন, এই এক নুইসেন্স হয়েছে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো।

সামনেই রাস্তার ওপারে বেশ উঁচু একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি, ওনারশিপ ফ্ল্যাট হিসেবে বিক্রি হয়েছে। সুরঞ্জন আগেও দেখেছে। একবার খোঁজ খবরও নিয়েছিল।

পিসেমশাই বললেন, আগে কতদূর পর্যন্ত দেখা যেত, এখন চোখ আটকে যায়, শীতকালে এক ফোঁটা রোদ্দুর পাই না। আরেক ঝামেলা হয়েছে এই কাজের লোক নিয়ে। ওদের জ্বালায় ঝি চাকর পাওয়া যায় না হে। পাবে কি করে, এক একখানা

বাড়িতে ডজন ডজন ঝি-চাকর দরকার।

বেশ রাগত ভাবে পিসেমশাই বললেন, এভাবে যেখানে সেখানে এই যে মডার্ন বস্তি গজিয়ে উঠছে, দেখে নিয়ো শহরটার দফা রফা হয়ে যাবে।

সুরঞ্জন বেশ মজা পাচ্ছিল। বললে, লোকের তো মাথাগোঁজার ঠাঁই দরকার পিসেমশাই।

সুরঞ্জন যেন বোকার মত একটা কথা বলে ফেলেছে এমন ভাবেই হাসলেন পিসেমশাই। বললেন, গাভমেণ্টের এটাই তো রং পলিসি। সব লোক কলকাতায় থাকবে কেন, সব্বাই যদি বলে কলকাতায় থাকব তা হলে তো হয় না। সুবার্বে যাও, শহরতলিতে গিয়ে মাল্টিস্টোরিড বানাও। আমরা যে এত টাকা খরচ করে বাড়ি বানালাম, কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দিচ্ছি, আর তুমি আমার সাউথের রোদ্দুর মেরে দেবে।

—তা ঠিক।

পিসেমশাইয়ের কথায় সায় দিয়ে সুরঞ্জন উঠে পড়ল। —যাই দেখি ছোটকুপিসি কোথায়।

বলে সটান চলে এল মলির পড়ার ঘরে।

পিসেমশাইয়ের একজন গুরুদেব আছেন। বেশ নামী গুরুদেব। প্রত্যেকটি ঘরে তাঁর নানা পোজের ছবি, বেশ বড় মাপের। কোনটার আশেপাশে পিসেমশাই ছোটকুপিসি, আরও সব শিষ্যশিষ্যা, ছবিটা যত বড় হবে মানুষটাও যেন তত বড় মাপের হয়ে যাবে। অন্তত পিসেমশাই বোধহয় তাই ভাবেন। তার ওপর ছবিগুলো অনেক টাকা খরচ করে বাঁধানো। দামি ফ্রেমে।

এ-সব দিকে সুরঞ্জন কোনদিন ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি। মনে মনে হেসেছে।

মলির চুল বব করে কাটা। বছর সতেরো বয়েস। একটা খুব সুন্দর ম্যাক্সি পরে সামনে আয়না রেখে পড়ছিল মলি। ওর এই রোগ। সব সময় আয়নায় মুখ দেখা, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানো, থেকে থেকেই আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নেওয়া চাই।

সুরঞ্জনের পায়ের শব্দে মলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। —ও তুমি।

সুরঞ্জন হাসল।

মলিও উঠে দাঁড়াল। —বাবার সঙ্গে তুমি গল্প করছিলে? আমি তখন থেকে ভাবছি কে হতে পারে।

মলি চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল সুরঞ্জনের দিকে, বসল। ওর গলার হার থেকে ঝুলছে একটা লকেট। হাত বাড়িয়ে লকেটটা তুলে দেখল, গুরুদেবের ছবি। হেসে বললে, তুইও দীক্ষা নিয়েছিস নাকি? তারপর সুরঞ্জন বললে, ছোটকুপিসি কোথায় রে?

মলি বললে, ছাদে, পুজোর ঘরে। কাল সত্যনারায়ণ দেবে, জোগাড়যন্তর করছে। তারপর আদুরে গলায় বললে, কাল এসো না-গো, সিন্নি খাবে।

সুরঞ্জন কোনও কথা বলল না, শুধু হাসল।

মলিকে বললে, চল।

বলে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এল, পিছনে পিছনে মলি।

ছোটকুপিসি পরের দিন সকালের জন্যে সত্যনারায়ণের ব্যবস্থা করে রাখছিলেন। সুরঞ্জনকে দেখে বললেন, আয়।

একটা কম্বলের আসন এগিয়ে দিলেন।

সুরঞ্জন সেটা সরিয়ে দিয়ে ঠাকুরঘরে ওঠার সিঁড়ির ধাপিতে বসে পড়ল।

ছোট নয়। ফুল বেলপাতা চন্দনে ধূপে একটা ঠাকুরঘর ঠাকুরঘর গন্ধ।

সুরঞ্জনের বেশ ভালই লাগছিল।

আর তখনই ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সিংহাসনের ওপরেই গুরুদেবের ছবিটায় চোখ পড়ল। মুখ বাড়িয়ে ভাল করে দেখল সুরঞ্জন।

গুরুদেবের পাশে একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

ছবিটা সুরঞ্জন দেখছে দেখে মলি বললে, তুমি তো কিছুই বিশ্বাস করো না, দেখছ অতবড় একজন মানুষ, গুরুদেবের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলিয়েছেন।

সুরঞ্জন হাসল, কোনও কথা বলল না। মনে মনে বললে, ছবিটা গুরুদেব তুলিয়েছেন। উনি নন। একটা বড় মাপের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতে পারলেই লোকে তাকেও বড় ভাবে। মনে মনে ভাবলে, তোদের গুরুদেব ভগবান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কি হবে, এটুকু প্রাকটিক্যাল সেন্স তার আছে।

এতক্ষণ আসল কথাটা বলার জন্যে সুরঞ্জন হাঁসফাঁস করছিল। কোনও একজনকে না বলে যেন তৃপ্তি নেই।

ও হঠাৎ বললে, জানিস মলি, জানো ছোটকুপিসি, প্রেসিডেন্ট বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আমাদের বাড়িতে।

মলি অবাক হয়ে বললে, কে ?

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমন ভাবে সুরঞ্জন বললে, প্রেসিডেন্ট।

মলি বোধহয় কিছুই বুঝতে পারল না।

ছোটকুপিসির কোনও কৌতূহলই হল না। অনেক কাকুতিমিনতি অনুনয় বিনয় করে একবার গুরুদেবকে বাড়িতে এনেছিলেন। সেদিন কি আনন্দ ছোটকুপিসির।

গুরুদেব বাড়িতে আসবেন এর চেয়ে বড় খবর আর যেন কিছুই নেই।

॥ চার ॥

শনিবার বিল্টুদের স্কুল বন্ধ থাকে। তাই পরের দিনই দীপা বিল্টুকে সঙ্গে নিয়ে পাইকপাড়া চলে এল। এভাবে ও মাঝে মাঝেই আসে। সুরঞ্জনকে বলে রেখেছে, সেই যথেষ্ট। এখন আর শ্বশুর-শাশুড়ির মত নিতে হয় না, এমনকি অনেক সময় বলেও আসে না। একা দীপাই নয়, ও বাড়ির কেউই কোনও বিষয়ে ওঁদের মতামত নেয় না। জানানো প্রয়োজন বোধ করে না। সোমনাথ যেন শুধুই র‍্যাশন কার্ডের হেড অফ দি ফ্যামিলি। একটা নিরবয়ব সই।

দীপাদের পাইকপাড়ার বাড়িটাও তো তাই। এখানে তবু সোমনাথ আছেন মাথার ওপর, পাইকপাড়ায় বাড়িটাই শুধু মাথার ওপর। দাদু মারা গেছেন অনেককাল। এখন পুরনো পলেস্তারা খসা বাড়িটার একদিকে দীপারা, অন্যদিকে জ্যাঠামশাইরা। পুরনো আমলের বাড়ি, বিশাল চওড়া চওড়া দেয়াল, ঘরগুলো আধো-অন্ধকার, লোহার ফটকে, বারান্দাররেলিঙে মরচে ধরেছে। দোতলার ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ে দেয়ালে দেয়ালে ছোপ পড়েছে জলের, বিচিত্র সব মানচিত্র আঁকা হয়ে আছে। চুনকাম করালেও দুদিন বাদেই দাগগুলো ফুটে ওঠে। ছাদ সারানোর সামর্থ্য নেই কারও।

দীপার দাদা অমলেশ প্রায়ই ক্ষোভের সঙ্গে বলে, এই বাড়িটাই হয়েছে কাল। কিছু না থাকলে তবু একটা কিছু করার চেষ্টা হত, শান্তিতে থাকা যেত।

অর্থাৎ জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে নিত্যদিন বিরোধ হত না, ঝগড়া হত না। দুপক্ষেরই ধারণা বিরোধের মূল কারণ ঈর্ষা। কেউ কারও ভালো দেখতে পারে না, অপরের অবস্থার

সামান্য উন্নতিও সহ্য করতে পারে না। এই সব ভবিষ্যতে হতে পারে ভেবেই দাদু বেঁচে থাকতে থাকতেই পার্টিশন করে দিয়ে গেছেন। তবু শরিকি ঝগড়া লেগেই থাকে।

দীপা সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে বেড়াতে এলেও ঝগড়াঝাঁটির সমস্ত ইতিহাস শুনতে পায়। এই বাড়িটা যেন দুটি অসুখী স্বামী স্ত্রীর বিবাহবন্ধনের মত, যে স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইলেই তার উইল করে দিয়ে যাওয়া পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

অথচ এ-সব নিয়েই ওরা দিব্যি সুখে মানুষ হয়েছে।

দীপার বিয়ে ঠিক হওয়ার পর যখন শুনল সুরঞ্জনের নিজের বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে থাকে, তখন কি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাড়া বাড়িতে আবার কেউ থাকে নাকি! অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওদের চাকরবাকর দারোয়ানদের ঘরগুলো দোকানঘর হিসেবে ভাড়া দেওয়া আছে, সুরঞ্জনদের তাদের সমগোত্র মনে হয়েছিল।

এখন অবশ্য ভুল ভেঙে গেছে। এখন বুঝে গেছে কলকাতার বেশির ভাগ লোকই ভাড়াটে।

পাইকপাড়ার এই বাড়িখানার প্লিনথ অনেকখানি উঁচু, ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে, সিঁড়ির ইঁট খসে খসে পড়ছে। সামনে এককালে বাগান ছিল, এখন শুকনো খটখটে। কোথাও কোনও গাছ নেই। বাইরের গরু ঢোকে, কুকুর ঘুরে বেড়ায়। লোহার ফটক খোলাই পড়ে থাকে।

দীপার মা দূর থেকেই দেখতে পেলেন।

হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন, বিল্টু ওঁকে প্রণাম করতেই জড়িয়ে ধরলেন। দীপাও প্রণাম করল।

মা জিগ্যেস করল, সব ভাল তো রে।

দীপার মুখে তখন অনর্গল কথা। এখানে এলেই ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, যেখানে যত কথা জমা হয়ে আছে, না বলে শান্তি নেই।

মা জিগ্যেস করল, সুরঞ্জন এল না? অনেক দিন আসেনি।

দীপা হাসল। —ওর কথা ছেড়ে দাও, বাবুর সময় হয় না। সব সময়েই কাজ।

মা একে একে শ্বশুরের কথা, শাশুড়ির কথা, নিরঞ্জন অরুণার কথা, মঞ্জুশ্রীর কথা জিগ্যেস করলেন।

দীপা উত্তর দিতে দিতে, উত্তরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে আরও নানান খবর দিতে দিতে ভিতরে ঢুকল।

দীপার বাবা তখন ভিতরের উঠোনের একটা জায়গায় চুন-বালি-সিমেন্ট নিয়ে বসে ভাঙা উঠোনের একটা গর্ত মেরামত করছেন কর্নিক হাতে।

দেখে দীপার খুব খারাপ লাগল।

বাবাকে গিয়ে প্রণাম করে ধমক দিল, আবার তুমি নিজেই সব করতে বসেছ?

দীপার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার নির্মল হাসি উপছে পড়ল ধবধবে ফর্সা মুখে। হেসে বললেন, কই, আমার দাদু কই।

দীপার মা তখনও আঁকড়ে ধরে আছেন নাতিকে।

সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে এসে অবিনাশকে প্রণাম করল।

অবিনাশের এক হাতে কর্নিক, অন্য হাতে একখানা ভাঙা ইঁট। দু-হাত দুদিকে প্রশস্ত করলেন, যাতে বিল্টুর জামাকাপড়ে না লাগে, কিন্তু কনুই দুটো দিয়ে তাকে কাছে টানলেন।

দীপার গলার স্বর শুনে ছোট বোন সীমা ওপরের বারান্দা থেকে উঁকি দিয়েই উল্লাসে চিৎকার করল, দিদি তুই!

দুড়দাড় করে নেমে এল। চিৎকার করে ডাকল, ছোটদা, কে এসেছে দ্যাখ।

ছোটভাই কমলেশও এল। সকলে গিয়ে দোতলায় বাবার শোবার ঘরে বসল। ঘরগুলোর যেমন উঁচু সিলিং, তেমনি বড় ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মাঝখানে দেয়াল দিতে দিতে ছোট হয়ে গিয়েছিল। সবাই একসঙ্গে বসে সাংসারিক গল্পে মশগুল হয়ে গেল। অমলেশ, দীপার দাদা, তখনও ফেরেনি।

দীপা দিদির কথা জিগ্যেস করল।

মা বললে, কালই তো চিঠি এসেছে। সীমাকে বললে, দেখা না।

সীমা ছুটে গেল, চিঠিটা বাবার তোশকের তলা থেকে নিয়ে এল।

সুন্দর খামখানা ছুরি দিয়ে সুন্দর করে কাটা, যাতে নষ্ট না হয়।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খামখানা দেখল দীপা, ওপরের নাম ঠিকানা দেখে বললে, দিদির হাতের লেখাটাও কত সুন্দর হয়ে গেছে, না মা ?

অমলেশ হেসে বললে, হবেই তো, দিনরাত তো ইংরেজিতেই লিখতে হচ্ছে।

মা হাসতে হাসতে বললে, নীপাও নাকি কি একটা চাকরি করছে, জানিস ?

—তাই ? খুব অবাক হল দীপা।

আর কমলেশ বললে, পড়ে দ্যাখ না, ফ্ল্যাট কিনেছে।

দীপার খুব মজা লাগল, পড়তে পড়তে কেবলই মৃদু মৃদু হাসছে।

তারপর হঠাৎ বললে, হ্যাঁ মা, দিদি জামাইবাবু কি ওখানেই চিরকাল থাকবে নাকি ?

মা হাসল। —কি জানি।

তারপরই কমলেশ বললে, দিদি আমেরিকায় গিয়ে ফ্ল্যাট কিনছে, আর জ্যাঠামশাই এখানে আমাদের উচ্ছেদ করতে চাইছে। লোকটা এক নম্বরের হারামি।

মা রাগত চোখ করে তাকাল কমলেশের দিকে।

অর্থাৎ জ্যাঠামশাই সম্পর্কে এ ধরনের কথা শুনে রেগে গেলেন। রেগে যান।

হাজার হোক, ওঁর ভাসুর সম্পর্কে এ রকম কথা উনি কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেন না। অথচ ছেলেরা রেগে গেলেই এই ধরনের কথা বলে।

দীপার মা এখনও ওঁর সামনে ঘোমটা দেন, সরাসরি কথা বলেন না, সম্মান করেন। ওঁর সম্পর্কে আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, বটঠাকুর তো বলেন···বটঠাকুর মানে বড়ঠাকুর। ওঁর ধারণা বটঠাকুরের দোষ নেই, বুড়োমানুষ, তাঁর কথা কে শোনে, ছেলেরাই এ-সব ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসছে। ছেলেদের কথায় সায় দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

দীপা বললে, কি হয়েছে কি ?

মা বললে, জানি না বাপু, একদিন দুপুরে দেখি এক দল লোক এসেছে, সঙ্গে এক পাঞ্জাবি না সিন্ধি, বাগান বাড়ি সব মাপজোক করছে, তোর জ্যাঠামশাইরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে কি-সব কথা বলছেন।

কমলেশ বললে, পার্টিশন হয়ে গেলেই যেন বাড়িটা আলাদা হয়ে গেল। যা খুশি করা যায়। আসলে ভিত একই, ছাদ তো একটাই। অথচ আমাদের ঘুণাক্ষরে জানতেও দেয়নি।

মা বললে, হঠাৎ এসে একদিন তোর বাবাকে বললে, ওদের অংশটা নাকি বেচে দেবে। অনেক দাম পাচ্ছে।

মাকে খুব চিন্তিত দেখাল। অসহায় কান্না-কান্না মুখ করে বললে, তোর বাবাকেও বেচে দিতে বললে, তা হলে নাকি আরও বেশি দাম দেবে।

কমলেশ রেগে গিয়ে বললে, সব ওই বুড়োটার প্ল্যান। আমাদের উচ্ছেদ করা। এতকালের বাড়ি, ভেঙে ফেলে এখানে নাকি একটা বারো তলা বাড়ি হবে। আশিটা

ফ্ল্যাট।

মা দুঃখের হাসি হেসে বললে, বলে কি জানিস ? আমাদের ইচ্ছে হলে একটা ফ্ল্যাট নিতে পারি। লোভ দেখাবার জন্যে বললে, টাকাও পাবে। ফ্ল্যাটও পাবে।

দীপা শঙ্কিত হয়ে বলে উঠল, সে কি ! আমাদের এই এত বড় বাড়ি ছেড়ে একটা ঘুপচির মধ্যে ঢুকতে যাব কেন ? লোকে বলবে কি ?

সীমা স্কুলে পড়ে, এখনও ফ্রক পরে। ও চুপচাপ ছিল, হঠাৎ বললে, জানিস দিদি, ওরা নাকি নাকতলার দিকে চলে যাবে, জমি কিনে বাড়ি করবে। কি যেন ব্যবসা করবে, তার জন্যে টাকা চাই।

সবারই মুখ থমথম করছিল, দীপারও।

কমলেশ বললে, এমনিতে এত টাকাপয়সার অভাব, তার ওপর আবার মামলার খরচ লেগে গেল। দাদা অবশ্য একটা ইনজাংশন নিয়েছে।

দীপার খুব খারাপ লাগল।

ও বেশ খুশি খুশি মন নিয়ে এসেছিল। একটা দারুণ খবর ওদের জানিয়ে যাবে বলে। দিদি নীপাকেও আমেরিকায় একখানা চিঠি দিয়ে জানাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। তার বদলে এই সব কথা শুনে একেবারে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

সুরঞ্জনরা ভাড়া বাড়িতে থাকে। ভাড়ার ফ্ল্যাটে। দিনরাত দুশ্চিন্তা। দু ছেলেই সোমনাথকে দোষ দেয়, বাবা কেন সময় থাকতে থাকতে, যখন সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল, একটা বাড়ি করেনি।

আসলে কার যে কি অসুবিধে তা তো কেউ জানতে চায় না।

দীপা রেগে গিয়ে একদিন বলেছিল, বাবা ভুল করেছে মেনে নিলাম, তোমরাই এবার করে দেখিয়ে দাও না।

সুরঞ্জন চুপ করে গিয়েছিল। কোনও কথা বলেনি। আসলে ও যে অক্ষম তা দীপা জানে। জানে বলেই আঘাতটা দিয়েছিল।

সুরঞ্জন অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, এখন তো চরচর করে দাম উঠে গেছে আড়াই লাখ তিন লাখ। বাবার সময়ে তো এত দাম ছিল না।

দীপা হেসে ফেলে বলেছিল, বিল্টুও তাই বলবে। বিল্টুর সময়ে হয়তো আড়াই লাখ তিন লাখকে টাকা বলেই মনে হবে না।

সুরঞ্জন তর্কে হেরে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। বিল্টুকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, ওসব বিল্টু বড় হয়ে করবে। কি বল বিল্টু ?

তখন মনে হয়েছিল, একটা বাড়ি কিংবা একটা ফ্ল্যাট মানুষের একমাত্র আশ্রয়। মাথার ওপর ছাদ থাকলে আর কোনও চিন্তা থাকে না।

মার কাছে সব শুনে দীপার নিজেকেই কেমন নিরাশ্রয় লাগছিল।

অথচ এই বাড়িটার বিরুদ্ধে ছেলেবেলা থেকে ওদের কত অভিযোগ। বাবার, ঠাকুর্দার হুগলিতে কোথায় যেন একটা জমিদারি ছিল, দাদু তা কম বয়সেই বেচে। বাবা বলে, ঋণের দায়ে।

সত্যি মিথ্যে জানে না ও। কিন্তু ওরা সবাই বলত, এরকম একখানা বাড়ি করার কোনও অর্থই হয় না। প্রচুর ঝি-চাকর না থাকলে পরিষ্কার রাখা যায় না। দরজা জানালাগুলো পেল্লায় সাইজের, মেরামত চলে না, খুলতে বন্ধ করতে দম আটকে যায়। বেশির ভাগ জানালা তাই খোলাই হত না, এখন আর খোলা যায়ও না। একবার ছাদ সারাতে গিয়ে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাড়িটার কোনও শ্রীছাঁদ নেই। শুধু বাইরে থেকে যারা দেখে তাদের তাক লেগে

যায়।

একবার মনে আছে ; প্রথম যখন স্কুলবাস এসে ওকে তুলে নিয়ে গেল। ওর ক্লাশের মেয়েরা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, কি বিরাট বাড়ি রে তোদের ?

পরের দিন একজন জিগ্যেস করেছিল, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়িতে নাচঘর আছে, নাচ হয় ?

শুধু একজন বলেছিল, পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়ির কাছে তোদেরটা কিছুই নয়।

এই সব কথা শুনে একদিকে যেমন দীপার ভাল লাগত, তেমনি লজ্জাও করত। ভয় পেত, যদি কেউ ওদের বাড়িতে যেতে চায়, দেখতে চায। তখন তো ইঁট খসে পড়া দেয়াল, শ্যাওলা ধরা সিঁড়ি, পলেস্তারা খসে পড়া ঘর। চেয়ার টেবিলগুলোও ভাঙাচোরা, বহুকাল পালিশ পড়েনি, ধুলো জমে জমে চোরাবাজারের আসবাব হয়ে গেছে। খাট-পালঙ্ক এখনও ব্যবহার হয়, কিন্তু নকশাগুলো সব ভাঙা। ওরাই ছেলেবেলায় দুষ্টুমি করে ভেঙেছে। কি বোকা ছিল তখন, পালঙ্কের একটা নকশার মধ্যে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে একদিকে দাদা, অন্যদিকে ও চাড় দিতেই সেটা দু-টুকরো হয়ে ছিটকে পড়েছিল। আর বাবা দুজনকেই বেদম মেরেছিল। মনে পড়লে দীপার হাসি পায়, দুঃখও হয়। আহা, অত সুন্দর নকশাটা !

দীপার মনে হল এখন লাঠিটার একদিকে জ্যাঠামশাই, অন্যদিকে বাবা। এই বাড়িখানাই সেই নক্‌শা। কিংবা একদিকে জেঠতুতো দাদারা, অন্যদিকে দাদা, আর কমলেশ।

হয়তো বাবা তার অংশটাও শেষ পর্যন্ত বেচে দিতে বাধ্য হবে। দাদা ইনজাংশন নিয়েছে। তার মানেই কোর্টঘর। যা আছে তাও যাবে। জ্যাঠামশাইরা যদি ওদের অংশ বেচে দেয়, ওই সব বড় বড় সিন্ধি পাঞ্জাবি মাড়োয়ারিদের সঙ্গে মামলা লড়তে যাওয়া বৃথা। ওদের কত টাকা।

দীপা বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, জানো মা, আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই ভাবে একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট যাদের আছে, তাদের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। মানুষের একটা আশ্রয় থাকলে আর কিছু চাই না। আর আমাদের বাড়ি থেকেও…

সীমা ঠাট্টা করে বললে, 'আমাদের' কি রে ? হেসে উঠল। 'বল 'তোমাদের'।' মা, কমলেশ দুজনেই হাসল।

বিয়ের পর বাপের বাড়িকে 'আমাদের বাড়ি' বলার কথা নয়। দীপা এখন স্বামীর ঘরকেই নিজের ভাবে, ওরাই এখন আপন হয়ে উঠেছে, তবু এ বাড়ির সঙ্গেই যেন অন্তরের টান। এখানে এলেই মনে হয় বদ্ধঘরের বন্দি জীবন থেকে স্বাধীন মুক্ত আকাশে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই বাড়ির তুলনায় শ্বশুরবাড়ির ফ্ল্যাটটা ছোট বলে নয়।

আসলে শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে মনটা বাঁধা পড়ে আছে বলে।

আইনত আমাদের বাড়ি বলা যায়। হাসতে হাসতে সে-কথা দীপা মনে পড়িয়ে দিতে পারত। আজকাল পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সম্পূর্ণ অধিকার। অমলেশ কমলেশের মত ওরা ক-বোনও সমান অংশ দাবি করতে পারে। দীপা জানে ও তা করবে না। ওরা কেউই তা করবে না। দাদা আর কমলেশের এই তো অবস্থা। তবু রসিকতা করেও সে-কথা বলতে পারত দীপা। বলল না। কারণ মুখে উচ্চারণ করলেও ব্যাপারটা ওর নিজেরই কানে নোংরা লাগবে। তাছাড়া ও-কথা রসিকতা করে বললেও তার মধ্যে বাবার মৃত্যুর কথাটা এসে যায়। বাবার মৃত্যুর কথা ও ভাবতেও পারে না।

একদিন সুরঞ্জন ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিল। দাদা যদি অন্যত্র চলে যায়, অন্য ফ্ল্যাটে। কিংবা নিজেই ফ্ল্যাট কেনে। তা হলে বাবা মাকে নিয়ে ও কি এই ফ্ল্যাটে থাকতে

পারবে। সংসার চালাতে ? তাছাড়া এই এত ভাড়া দিয়ে ! বাবা মারা গেলেই বা কি হবে ?

দীপা হেসে বলেছিল, এখন থেকে এত ভাবছ কেন, তখন কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।

সুরঞ্জন হেসে বলেছিল, তা ঠিক, কোথাও কিছু না পাই, তোমাদের বাড়ি তো রয়েছে। ওই বিশাল বাড়ি, দুখানা ঘর নিয়ে...

দীপা অবশ্য ভেবেছিল এটা নেহাতই রসিকতা। কিন্তু মনের কোথায় একটু খচ্ করে লেগেছিল।

ওই বাড়িখানা নিয়ে যারা বসে আছে তারা নিজেদের ভাবছে অভাবী মানুষ, কোনরকমে দিন কাটছে। একটা ছাদ সারাতে পারে না, দরজা জানালা মেরামত করাতে পারে না। এক মাসের মধ্যে দুটো বাল্‌ব খারাপ হলে, কিংবা জলের পাইপ বা কলের মুখ বদলাতে হলে মনমেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওদের। অথচ সুরঞ্জন ভাবছে বিশাল বাড়ি, অনেক ঘর, হয়তো ভিতরে ভিতরে বাড়িটার দামও হিসেব করে ফেলেছে।

জ্যাঠামশাই যেমন হিসেব করছেন।

ওরা বাবার শোবার ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসে গল্প করছিল।

মা একদিন গল্প করে বলেছিল, যখন প্রথম এ-বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলাম, বারো বছর বয়েস, তখন রোজ দুপুরে গালিচা বিছিয়ে বসত সবাই, পানের বাটা...

আরও কত কি। এখন ভাবলেও হাসি পায়।

সেই শতচ্ছিন্ন গালিচাগুলো বহুকাল আগেই বেচে দিয়ে মা স্টেনলেস বাসন কিনেছিল।

দীপা হঠাৎ বললে, জ্যাঠামশাই ভাবছেন বাড়িটা বেচে দিলে বড়লোক হয়ে যাবেন। কিন্তু লাভ হবে শুধু অনেক দূরে, শহরতলিতে ছোট্ট একটা বাড়ি। দেখে নিয়ো।

বিল্টু অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল। এই সব সাংসারিক কথাবার্তা, ঘরবাড়ির কথায় ও বিরক্ত হচ্ছিল। কিংবা ওর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে।

বিল্টু হঠাৎ বললে, দিদা, লুচি করবে না ?

সকলে হেসে উঠল।

ওর দোষ নেই। দীপা যখনই এর আগে এ-ভাবে এসেছে, দুপুর কাটিয়ে সন্ধের সময় যাবার আগে মা ওকে লুচি ভেজে জলখাবার খাইয়ে ছেড়েছে। আদর করে বিল্টুকে খাইয়েছে।

মা উঠে পড়ল। পিছনে পিছনে বিল্টু। ও রান্নাঘরে গিয়ে লুচি ভাজা দেখবে।

নিজেদের বাড়িতে এ-সব দেখার উপায় নেই। সেখানে রান্নার লোক আছে, অরুণা কিংবা দীপা রান্নাঘরে বড় একটা ঢোকেও না। এক ঠাকুমার যখন বাতের ব্যথা থাকে না, শরীর ভাল থাকে, তখন তিনি মাঝে মাঝে যান। কিন্তু বিল্টু সে-সময়েও রান্নাঘরে ঢুকতে পায় না, গ্যাসে রান্না হয় বলে। সকলেরই ভয় কখন গিয়ে বিল্টু সিলিণ্ডারের চাবিতে হাত দেবে। এখানে ওসব ঝামেলা নেই। উনোনে রান্না হয়। ঘুঁটে, কয়লা, কেরোসিন।

দীপা প্রথমবার এসে বলেছিল, মা, ওদের ওখানে সব গ্যাসে রান্না হয়।

মার মুখে খুশি উপচে উঠেছিল। মেয়েরা ভাল থাকবে, সুখে থাকবে, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে।

দীপা তাই খবরটা জানাবে বলে এসেছিল। এরকম একটা খবর শুনে বাবা-মা ভাইবোন সকলেই খুব খুশি হবে। ও জানে। এখানে ঈর্ষা নেই, প্রতিযোগিতা নেই। দীপাদের যে কোনও ভাল খবর, সুরঞ্জনের উন্নতি, কিংবা সোমনাথের কোনও সম্মানে এরা সবাই আনন্দ পায়। কারণ সমস্ত কিছু তো দীপাকে ঘিরেই।

এত যে বাড়ি নিয়ে নিজেদের সমস্যা, তবু নীপা সেখানে ফ্ল্যাট কিনেছে শুনে সবারই কি আনন্দ।

শেষ অবধি না বলে পারল না দীপা। চলে আসার আগে বলেই ফেলল।

—বাবা, আমাদের বাড়িতে প্রেসিডেন্ট আসবেন।

এবার আর 'আমাদের বাড়ি' বলতে ভুল হল না।

অবিনাশ দীপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতেই পারলেন না।

কমলেশ বললে, কি বলছিস ? প্রেসিডেন্ট ?

দীপা হাসল। —হ্যাঁ, সত্যি। শ্বশুরের খুব বন্ধু ছিলেন তো।

আরও অনেক কথা বলে গেল দীপা। একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে। ওটুকু ওর স্বভাব।

এমনভাবে বলল, যেন সবারই মনে হবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ওর শ্বশুরের নিত্যদিন দেখা হয়, কিংবা চিঠি লেখালিখি। খুব বন্ধু।

অবিনাশ শুধু বললে, বলিস কি রে ! কই শুনিনি তো কখনও, এতবার গিয়েছি কখনও বলেনওনি।

দীপা হাসল। বললে, চাপা স্বভাব। কোনও কথাই তো বলেন না। আমরাই কি জানতাম নাকি।

অবিনাশ হাসলেন, তা ঠিক। নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন না, কোনও অহঙ্কার নেই। এত বড় চাকরি করতেন, দেখে বোঝাই যায় না।

দীপা হেসে বললে, কিন্তু খুব একগুঁয়ে। একটি পয়সা ছেলেদের কাছে নেবেন না, সব খরচ নিজের। সব কাজ নিজে নিজে করবেন।

শুধু অমলেশ হেসে উঠে বললে, তোদের কত সুবিধে রে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ, ভাবা যায়।

সন্ধে হতে না হতেই দীপা ফিরে এল। দীপা আর বিল্টু। বেশ ক্লান্ত দীপা। দুপুরে একবার গড়িয়ে নেওয়া অভ্যাস ওর। আজ আর সেটুকু হয়ে ওঠেনি। তার ওপর এতখানি রাস্তা ভিড়ের বাসে যাওয়া-আসা রীতিমত কষ্টকর।

ফিরে দেখল সুরঞ্জন আগেই এসে গেছে।

চোখোচোখি হতেই সুরঞ্জন হাসল। হাসিটা দেখেই বুঝল, অনেকক্ষণ থেকে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। দীপা বেশ বুঝতে পারল, রাগ পড়ে গেছে। এখন আবার স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসার চেষ্টা। কদিন আর কথা বন্ধ করে থাকবে। তাছাড়া গতকাল তো ও নিজেই সুযোগ করে দিয়েছিল।

দীপা সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, হাসছ যে !

—না, দেখছি। বাপের বাড়ির আদর খেয়ে এলে মুখচোখ কেমন হয় দেখছি।

দীপাও হেসে ফেলল।

আসলে দুর্ভাবনা চেপে রাখার জন্যে। দুর্ভাবনা বাবা-মার কথা ভেবে। এই বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি নিয়ে দুশ্চিন্তা। জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে শরিকি বিরোধ। তার ওপর ওই টাকাওয়ালা ধনী মাড়োয়ারি না সিন্ধি ব্যবসাদারের লোভ। কিনে নিয়ে ওই পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে বিশাল বারো তলা বাড়ি উঠছে। ফ্ল্যাট বাড়ি।

দীপার কাছে এর চেয়ে বড় অপমান যেন আর নেই। বাড়ি নয়,একটা বংশ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ওদের আর গর্ব করার মত কিছুই থাকবে না।

সুরঞ্জনদের চোখে ওরা ছোট হয়ে যাবে। সুরঞ্জনদের তবু গর্ব করার মত অনেক কিছু আছে। বড় চাকরি করতেন সোমনাথ, সুরঞ্জনের দাদাও করেন। তার ওপর 'প্রেসিডেন্ট আসবেন'। একটা সম্মানের ছাদ আছে, মর্যাদার ছাদ আছে ওদের।

সেজন্যেই দুঃসংবাদটা চেপে রাখতে হবে। যতদিন পারা যায়। হয়তো শেষ অবধি বাড়িটা বিক্রি করতে হবে না। কি দরকার আগে থেকে বলে।

দীপা কাপড় বদলাতে চলে গেল।

ফিরে আসতেই সুরঞ্জন বললে, কে এসেছে দেখবে যাও বাবার ঘরে।

—কে ? দীপা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

আর সুরঞ্জন বললে, ছোটকুপিসি আর পিসেমশাই। বলে অট্টহাসে হেসে উঠল।

—হাসছ কেন ? দীপা জিগ্যেস করল।

সুরঞ্জন কোনও উত্তর দিল না। দীপা তো জানে না, সুরঞ্জন গতকাল গিয়ে শুনিয়ে এসেছে।

ও নিজের মনেই হাসছিল।

দীপা ভাবল, পিসেমশাই তো আসেন না। কেমন একটা বড়লোক বড়লোক ভাব। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন। কথায় কথায় উপদেশ দেন।

হয়তো সেজন্যেই সুরঞ্জন হাসছে।

সুরঞ্জন তো হাসবেই। ও যে এই বয়েসেই পৃথিবীটাকে বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছে। কারও ওপর কোনও শ্রদ্ধা নেই, মানুষের মধ্যে কোথাও কিছু ভাল আছে ও যেন বিশ্বাস করতেই রাজি নয়।

সকলেই অনুযোগ করে, একালের মানুষ সিনিক হয়ে উঠছে।

যেন অপরাধ তাদেরই। কেন সিনিক হয়ে উঠছে, কেউ খোঁজ নেয় না।

সুরঞ্জন নিজের মনেই যেন বললে, বাবা হয়তো রেগে যাবে, খবরটা ফাঁস করে দিয়েছি বলে। একটু থেমে বললে, আর মজা দেখো, পিসেমশাই এমনিতে আসে না কোনদিন. টাকা করেছে বাড়ি করেছে তাই ভীষণ বিজি, সময় হয় না। আর আজ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে।

হাসতে হাসতে বললে, কি তাল আছে কে জানে।

গুরুকে নিয়ে এসে পাশে দাঁড় করিয়ে ক্লিক ক্লিক, ফ্ল্যাশ বাল্‌বে একটা ছবি ? নাকি নিজেই সেদিন এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাবে, বিরাট সাইজে এনলার্জ করিয়ে সোনালি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে, নিজের বসার ঘরে টাঙাবে ? সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখে লোকটার হাইট দু-ফুট বেড়ে যাবে।

দীপা অস্বস্তির সঙ্গে বললে, আত্মীয়স্বজন কি সেজন্যেই আসে নাকি ? একটা ভাল খবর শুনেছেন, খুশি হয়েছেন, তাই।

দীপার অস্বস্তি লাগছিল সুরঞ্জনের কথা শুনে। বাপের বাড়িতে গিয়েও তো খবরটা দিয়ে এসেছে। ওরা শুনে সবাই খুব খুশি হয়েছে।

দাদা অমলেশ ছিল না। ফিরে এসে শুনবে।

তারপর একদিন বাবা কিংবা দাদা এসে পড়তে পারে। ওরা তো কোনও স্বার্থের জন্যে আসবে না। শুনে খুশি হয়েছে বলেই আসবে।

অথচ সুরঞ্জন, কিংবা অন্য সকলে, হয়তো সুরঞ্জনের মতই ভেবে বসবে. কোনও উদ্দেশ্য আছে।

দীপার তা হলে ভীষণ, ভীষণ খারাপ লাগবে।

সুরঞ্জন কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ বললে, অবশ্য তা নাও হতে পারে।

মনে মনে ভাবল, হয়তো পিসেমশাইয়ের চোখে বাবা এতদিনে একজন মানুষ হয়ে উঠেছেন। কারণ প্রেসিডেণ্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

॥ পাঁচ ॥

কয়েকটা দিন, কয়েকটা সপ্তাহ চাপা উত্তেজনার মধ্যে কেটে গিয়েছিল।

সকলের সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই একটা কথাই উঁকি দিত, কবে আসবেন?

কবে আসবেন, কেউ জানে না। আসবেন কিনা, তাও না। তবু সকলেই আশায় আশায় থাকত। যেন তিনি এলেই সব দৈন্য এবং হীনতা মুছে যাবে।

তারপর অপেক্ষা করতে করতে সকলেই ভুলে গেল।

সোমনাথ অনেক আগেই ভুলে গিয়েছিলেন। প্রথমদিন রামেশ্বরের কাছে শুনে একটু ভাল লেগেছিল, খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

একদিন রামেশ্বর এসেছিল, রামেশ্বরের সঙ্গেই বিকেলের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সকলে ভেবেছিল বেড়াতে গেছেন। কাছেই কোথাও।

ফিরে এলেন সন্ধের অনেক পরে। একাই।

স্ত্রী সারদাকে বললেন, রামেশ্বরকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম। অনেক দূরে থাকে, সেই শিবপুরে, ওর পৌঁছতে বোধহয় অনেক রাত হবে।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, চোখ দেখিয়ে এলাম।

সোমনাথের বেশ খারাপ লাগছিল।

উনি যে এ-সংসারে রামেশ্বরের মতই একা হয়ে গেছেন তা কাউকে প্রকাশ করে বলেন না। কারও বিরুদ্ধে ওঁর কোনও অভিযোগ নেই। রামেশ্বরের তো নিত্যদিন ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। সকলের বিরুদ্ধে। ওর যে খুব অশান্তির মধ্যে দিন কাটে তা জানতে আর কারও বাকি নেই।

শুনে সকলেই হাসাহাসি করে, অরুণা এবং দীপাও। সোমনাথ মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে এসেছেন।

কিন্তু আজ বোধহয় ধরা পড়ে গেলেন।

না, ধরা পড়ে যাওয়ার কি আছে। আসলে সেই দাঁতের ডাক্তারের মত রামেশ্বরও হয়তো ভুল বুঝবে।

সোমনাথের মনে পড়ল, সুরঞ্জন একদিন বলেছিল, চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। উনি নিজেই আর বলেননি তাকে।

রামেশ্বর আসতেই সোমনাথ জিগ্যেস করেছিলেন, কাকে চোখ দেখাই বলো তো? আমাদের সেই ভাদুড়ি তো মারা গেছেন অনেককাল।

রামেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, খুব ভাল ডাক্তার আছে, চলো চলো, আজই নিয়ে যাচ্ছি।

সোমনাথ ভাবলেন, মন্দ কি। গাফিলতি করে করে এখন আর খবরের কাগজটা ভাল করে পড়তেই পারেন না। মাথা ধরে।

বললেন, তাই চলো।

গেলেন: ভদ্রলোক খুব যত্ন করে দেখলেন। বেশ বোঝা গেল রামেশ্বরের খুবই পরিচিত।

কিন্তু রামেশ্বরের যদি কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

ওই চোখের ডাক্তারের কাছেও সব গল্প করেছে।

বলে বসল, সেই যে বলেছিলাম, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার কথা। মনে আছে?

ডাক্তার সেন অবহেলার হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে আছে।

রামেশ্বর বললে, এই ইনি, এঁর কথাই বলেছিলাম আপনাকে। প্রেসিডেন্ট দেখা করতে

আসবেন এঁর সঙ্গে।

সোমনাথের তখন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছি ছি, এসব কথা কি বাইরের লোককে শোনাতে আছে ?

ছোট হয়ে যেতে হয়।

তবু সোমনাথ নিরুপায় ভাবে হাসলেন।

টাকা দিতে গেলেন। ডাক্তার সেন নিলেন না। সেজন্যে ওঁর আরও খারাপ লাগল। যেন রামেশ্বরের বন্ধু বলেই নিচ্ছেন না।

সোমনাথের কেমন একটা সন্দেহ হল, রামেশ্বরকে ডাক্তার রীতিমত অভাবী মানুষ বলে মনে করেছেন। হয়তো ওঁর কাছেও নিজের দুঃখের কথা সব বলেছে।

সোমনাথকেও তাই ভাবল নাকি ? হয়তো ভেবেছে, রামেশ্বর ওইসব প্রেসিডেন্টের গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলছে দারিদ্র্য চাপা দেওয়ার জন্যে।

সোমনাথের সারা মন বিস্বাদ হয়ে গেল।

বেরিয়ে এসে বললেন, তোমার কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না রামেশ্বর।

—কেন কেন ? কি করলাম ?

—তুমি ওইসব প্রেসিডেন্টের গল্প করতে গেছ ওঁর কাছে ?

রামেশ্বর হাসল।

—কেন করব না।

রামেশ্বরকে বোঝানো যাবে না। সোমনাথ আর কোনও কথা বললেন না।

কাকে বোঝাবেন ?

কি অস্বস্তির মধ্যে যে দিনগুলো কাটছিল।

একদিন মঞ্জুশ্রীর দুই কলেজের বন্ধু এসে হাজির। বেশ স্মার্ট চটপটে দুটি মেয়ে।

মঞ্জু এসে বললে, দাদু, তোমাকে দেখতে এসেছে এরা, আমার বন্ধু।

মেয়ে দুটি এসে চুপচাপ দাঁড়াল। প্রণাম করল। সোমনাথ দু-চারটে কথা বললেন। তারপর ওরা হাসতে হাসতে চলে গেল।

সোমনাথ প্রথমটা বুঝতে পারেননি। ভেবেছেন এমনি বেড়াতে এসেছে, তাই বন্ধুর দাদুকে দেখতে চাওয়া।

মেয়ে দুটি চলে যাওয়ার পর অরুণা এসে বলে গেল, কেন এসেছিল। —ওর কাণ্ড, গিয়ে গল্প করেছে, সেই রামেশ্বরবাবুর কথা।

সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে একটা লজ্জা আর অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন।

এইভাবেই চলছিল।

একদিন ছোট শালি এসে হাজির। বছর কয়েক হল বিধবা হয়েছে। ছোট ছেলেটা বেকার। বহুদিন ধরে তার চাকরির জন্যে নিরঞ্জনকে বলছে। এসে প্রায়ই বলে।

মুখের ওপর নিরঞ্জন তাকে কিছু বলতে পারে না। হাজার হোক তার মাসি।

এসে মাঝে মাঝে রাগ দেখায় তার মার কাছে, সোমনাথের কাছে। —ছোটমাসি তো আমার জীবন দুর্বিষহ করে দিল। ওই ওর ছেলের চাকরি করে দিতে হবে। চাকরি যেন হাতের মোয়া।

সারদা ধীরে ধীরে বলেছেন, পারলে করে দে না। বেচারী আর কার কাছেই বা যাবে বল।

নিরঞ্জন হয়তো কারও চাকরি করে দিতে পারে না। পারবে না বলেই অক্ষমতার রাগে দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

মার কথা শুনে আরও রেগে গিয়ে বলেছে, চাকরি করে দে বললেই চাকরি হয় না, কি

যোগ্যতা আছে ওর ?

সোমনাথ অনেকক্ষণ সহ্য করেছেন। তারপর কড়া ভাবেই বলেছেন, তুই তো বলে দিলেই পারিস যে পারবি না। যার চাকরি নেই সে তো আসবেই। তার কি দোষ।

নিরঞ্জন রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেছে। আসলে ও যে পারবে না, সে-কথা বলতেও যেন লজ্জা। অকারণ ওই তো আশা দিয়ে দিয়ে ঘুরিয়েছে।

সোমনাথ স্পষ্ট কথার মানুষ। অক্ষমতার কথা কখনও লুকোননি। মিথ্যে আশা দেননি কাউকে। আবার যখন যেটুকু পেরেছেন করতে চেষ্টা করেছেন।

রিটায়ার করার পর থেকে বেঁচে গেছেন। এখন আর কেউ আসে না, অস্বস্তিতে ফেলে না। সকলেই জেনে গেছে এখন ওঁর কোনও ক্ষমতা নেই।

অনেক কাল ওঁর কাছে কেউ কোনও প্রার্থনা নিয়ে আসেনি।

এখন উনি সকলের কাছে একজন অক্ষম মানুষ।

তাই চমকে উঠেছিলেন।

—আমি ? হেসে ফেলে বলেছিলেন, শেষে আমাকে ধরলে ?

সত্তর বছরের বৃদ্ধ মুখে অবাক হওয়ার হাসি ফুটে উঠল।

ছোট শালির দু-হাতের মুঠো থেকে শিরা ওঠা হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন।

সেবার নিরঞ্জন রাগারাগি করার পর বহুদিন আসেনি। সন্দেহ হয়েছিল নিরঞ্জন হয়তো রূঢ়ভাবে কিছু বলেছে, সেজন্যেই আর আসে না।

কিন্তু এবার হঠাৎ এতদিন পরে এসে একেবারে সোমনাথের কাছে সে দরবার করবে ভাবতে পারেননি।

—জামাইবাবু, আপনি পারেন। আপনার একটা মুখের কথাতেই হয়ে যাবে !

এমন উদ্ভট কথা শুনে না হেসে কি করবেন।

শব্দ করে হেসে উঠেছেন। —তুমি কি পাগল হলে নাকি ?

—করে দেবেন না তাই বলুন। অভিমান দেখা দিল তার মুখে।

তারপর একটু থেমে বললে, আমি সব খবর রাখি, আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই হয়ে যাবে।

সোমনাথ তখন বুঝতেই পারছেন না। কাকে চিঠি লিখে দেবেন ?

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন যদি একটু বলে দেন, তা হলেই…উনি একটা চিঠি দিলেই…

সোমনাথ অট্টহাসে হেসে উঠেছেন তার কথা শুনে।

কিন্তু ভীষণ খারাপ লেগেছে।

রামেশ্বর সেই প্রথম যেদিন এসে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল, কি ভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছে, কি কথা হয়েছে, তখন বলতে বলতে ওর সারা মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, এটা তো একটা রীতিমত সম্মান, কি বলো, আমাদের মত চুনোপুঁটির পক্ষে দেখা করতে পাওয়া। তার ওপর তিনি আবার আমাদের মনে রেখেছেন।

সব সময়ে বিষাদে ক্লিষ্ট রামেশ্বরের মুখে সেদিনই চরম আনন্দের হাসি দেখেছিলেন সোমনাথ।

রামেশ্বর বলেছিল, বাড়িতে অশান্তি, জীবনটা ভাই কিরকম এলোমেলো ভাবে কেটে গেল। কিছুই তো হল না। তবু দেখো, এটা তো একটা বড় পুরস্কার !

সোমনাথ সায় দিয়েছিলেন, তা তো বটেই। দেখে ভাল লেগেছিল, যে এই মানুষটা জীবনে অন্তত একবার নিজেকে মূল্যবান মনে করতে পারছে। জীবনে অন্তত একবার

সত্যি খুশি হয়েছে।

অন্য কেউ শুনলে হয়তো শুধুই হাসবে। যে-ভাবে সেই চোখের ডাক্তার হেসেছিলেন। কেমন একটা চাপা হাসি। যার মধ্যে সোমনাথ অবিশ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন।

এক ধরনের লোক আছে না, যারা জীবনে কিছুই করতে পারল না, পারল না বলেই, কেবল বড় বড় লোকের কথা বলে, যেন কত আলাপ আছে।

এরকম লোকদের দেখে সোমনাথ নিজেও একসময় হেসেছে।

কিন্তু, এই একটা তুচ্ছ ব্যাপার যে সকলের কাছে এভাবে দামি হয়ে উঠবে, ভাবতেই পারেননি।

অল্প বয়সের কয়েকটা দিন আবার মূল্য ফিরে পেয়েছে, স্মৃতির মধ্যে ডুবতে পেরেছেন, এটুকুই সান্ত্বনা ছিল। পুরো জীবনটা তাহলে অর্থহীন নয়।

রামেশ্বর বলেছে, পুরস্কার। সোমনাথ অতটা ভাবেননি।

তবু ভাল লেগেছে শুনতে, 'তুমিই তো স্টার্টিং পয়েন্ট, উনি বলছিলেন।'

এ যেন একটা বিশেষ মর্যাদা। একটা সম্মান।

কিন্তু এ-সবের বোধহয় এখন আর সত্যি কোনও দাম নেই।

লোকে সমস্ত জিনিসকে যাচাই করতে শিখেছে শুধু টাকা-পয়সার হিসেবে।

নিরঞ্জন একদিন বলেছিল, কবে আসছেন জানতে পারলে বোলো, আমাদের সি সি-কে নিমন্ত্রণ করব।

শুনে বোকার মত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সোমনাথ।

ছোটশালির দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বোধের দৃষ্টিতে।

—আপনার সঙ্গে তো দেখা করতে আসবেন, তখন···উনি একটা চিঠি দিলেই···

ছোটকু আর প্রিয়তোষ এসেছিল হঠাৎ। প্রথমে বুঝতেই পারেননি কেন।

তারপর প্রিয়তোষ বলেছিল, আমাকে খবর দেবেন যেন, আসব।

কেন আসবে? কেন আসতে চায়। এমনিতে কোনদিন তো এ-বাড়ির ছায়া মাড়াতে চাইত না। বিজয়ার প্রণাম করতে আসত ছোটকু একাই, প্রিয়তোষের সময় হয় না, ও ব্যস্ত মানুষ।

সেই ব্যস্ত মানুষটাও ছুটে এসেছিল।

সোমনাথ কিছুই বুঝতে পারেন না। সমস্ত কেমন যেন বদলে গেছে।

এ যুগের মানুষ সব কিছু শুধু ব্যবহার করে। আলাপ, পরিচয়, সম্মান, পুরস্কার। সেটা ব্যবহার করে কিছু আদায় করা যায় কিনা।

শুধু নিজের মূল্যে কোনও জিনিসই যেন মূল্যবান নয়।

সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল সোমনাথের। তারপর একসময় ভুলে গিয়েছিলেন।

লোডশেডিংয়ের দুপুর, গরমে সোমনাথের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তবু বিছানায় পড়েছিলেন। পাশ থেকে হাতপাখাটা তুলে নিয়ে নিজেকে বাতাস করলেন কয়েকবার।

ঘুমন্ত সারদার দিকে চোখ গেল। অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

হাতপাখাটা নিয়ে বার কয়েক স্ত্রীর দিকে বাতাস করলেন। তারপর পাখাটা এমন ভাবে নাড়তে শুরু করলেন যাতে স্ত্রীও হাওয়া পায়।

বাকি জীবনটা এই রকমই। সোমনাথ জানেন। একা। সারাজীবনই তো একা ছিলেন। এখনও একা। স্ত্রী পাশে থাকতেও।

সারাজীবন ধরে বোধহয় এই একাকিত্বের অভিমানই বয়ে চলেছেন।

চশমাটা একদিন একা একা গিয়েই নিয়ে এসেছিলেন।

আঃ, আমি তো বললাম নিয়ে যাব, তুমি আবার নিজে নিজেই গিয়েছিলে! নতুন চশমা দেখে সুরঞ্জন বলেছিল।

সোমনাথ কোনও জবাব দেননি।

এখন আর ওঁর কোনও কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

আগে ভয় পেতেন, ছেলেরা দূরে সরে যাবে। এক ছাদের তলায় থাকবে না। এখন তাও নেই।

ছাদ কি আর মানুষকে এক করতে পারে।

দীপার বাবা একদিন এসেছিলেন। ওঁদের পাইকপাড়ার বাড়ি নিয়ে নাকি কি-সব গণ্ডগোল। শরিকি ঝামেলা।

হঠাৎ সোমনাথ সচকিত হয়ে উঠলেন। কে যেন কড়া নাড়ছে। কান পেতে শুনলেন, হ্যাঁ ঠিকই তো।

সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকালেন, অকারণেই। লোডশেডিং।

উঠলেন বিছানা থেকে। যাচ্ছি রে, যাচ্ছি।

ভেবেছিলেন বেলু বোধহয়। এ-সময় স্কুল থেকে ফেরে।

না। বেলু নয়। রামেশ্বর।

দরজা খুলে দেখলেন। ও তুমি? আমি ভাবছিলাম ছোট নাতনীটা ফিরল বুঝি।

বসার ঘরের পর্দা সরিয়ে বললেন, কারেন্ট নেই।'

রামেশ্বর হাসল।—হাতপাখার যুগে ফিরে যেতে পেলেও তো শান্তি ছিল। তখন আলো ছিল না, পাখা ছিল না, কিন্তু আরও অনেক কিছু ছিল। কি বলো।

রামেশ্বরের হাতে একখানা খবরের কাগজ।

সেটা পাশে রেখে রামেশ্বর বসল।

সোমনাথও বসলেন জানালাগুলো খুলে দিয়ে। আলো আসুক।

রামেশ্বর বললে, দেখেছ?

—কি? সোমনাথ বুঝতে পারলেন না।

রামেশ্বরের মুখ হেসে উঠল। —এই দ্যাখো।

কাগজখানা মেলে ধরলেন। লাল দাগ দেওয়া।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, আসছেন, আসছেন। কলকাতায়।

রামেশ্বর কাগজখানা এগিয়ে দিল।

সোমনাথ পড়লেন। মনে পড়ল। ও হ্যাঁ, পড়েছি। পড়েছিলেন। কিন্তু কোথাও কোনও দাগ কাটেনি। খেয়ালও করেননি।

আসলে উনি সমস্ত ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলেন।

রামেশ্বর বললে, আমি তো কাগজ পড়েই সকাল থেকে ভাবছি কখন আসব। আশ্চর্য, তুমি লক্ষই করোনি?

রামেশ্বরের কথায় সোমনাথ কোনও স্বাদ পেলেন না।

—ঠিক আসবেন, তুমি দেখে নিয়ো। উনি এক কথার মানুষ।

সোমনাথ বিহ্বল হাসি হাসলেন।

তারপর বললেন, রামেশ্বর, তুমি পাগল হয়ে গেছ।

রামেশ্বর রেগে গেল। পাগল আমি হইনি, তুমি হয়েছ।

সোমনাথ উঠলেন।

এখন ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা চাই। আর কিছু নয়।

রামেশ্বর ঘামছে দরদর করে। সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকাল।
—একটু জল আনতে বলো। চা পরে।
তারপর নিজের মনেই বললে, দেশটার কি যে হাল হল। এরা কিছুই ম্যানেজ করতে পারছে না।
সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের মতই। একটা ছোট্ট পরিবার, ভেবে দেখো, যে-ভাবে গড়তে চেয়েছিলাম···
কথা শেষ করলেন না। বেরিয়ে গেলেন।
এ-সময় বাড়ির কাজের লোক, রান্নার লোক বেরিয়ে যায়। কেউ নেই। একমাত্র অরুণা আর দীপাই ভরসা।
লম্বা বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি পায়চারি করলেন। কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছেন না। কাউকে ডাকতেও সঙ্কোচ।
একবার রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দিলেন। নিজেই চা বানিয়ে নিতে পারবেন কিনা ভাবলেন।
এক একদিন, বাতের ব্যথা না থাকলে, সারদা করে দেয়। কিন্তু কাল সারা রাত্তির বেচারা ঘুমোতে পারেনি। যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। এখন ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক।
কেটলিটা নিয়ে কলসী থেকে জল গড়াতে গেলেন। শব্দ হল।
গ্যাস-স্টোভটা জ্বালবার জন্যে সবে রান্নাঘরে ঢুকতে যাবেন, বাধা পেলেন।
অরুণা এসে দাঁড়িয়েছে ঘুম চোখে।
ঘুম চোখেও রাগ।
অরুণা এগিয়ে এল। আশ্চর্য, আমরা কি নেই নাকি ?
ধরা পড়ার হাসি হাসলেন সোমনাথ।
বললেন, রামেশ্বর এসেছে। আগে এক গ্লাস জল দিয়ো।
চলে এলেন।
এসে দেখলেন রামেশ্বর আবার সেই খবরটা পড়ছে।
সোমনাথের খুব বিরক্তিকর লাগল। রামেশ্বরের ওপর কেমন একটা রাগ।
ওঁর নিজের কোনও আগ্রহ নেই, কোনও কৌতূহল নেই। অথচ এই মানুষটাই ওঁকে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
সোমনাথ কোনদিন তো কিছু আশা করেননি। জীবনে কোনও চাওয়া-পাওয়া ছিল না।
এখন একটা সম্মানের প্রশ্ন।
প্রেসিডেন্ট যদি না আসেন, সোমনাথের কিছু যায় আসে না।
কিন্তু এরা কি ভাববে ? নিরঞ্জন সুরঞ্জন। অরুণা দীপা। মঞ্জুশ্রীর কলেজের সেই দু বন্ধু। সোমনাথ বেশ বুঝতে পারেন, ওরা কেন এসেছিল। মঞ্জুশ্রী হাসতে হাসতে বলেছিল, দাদু, তোমাকে দেখতে চাইছে। তখন বোঝেননি, এখন বুঝতে পারেন।
ছোটকুর সঙ্গে প্রিয়তোষও আসবে। হয়তো ঠাট্টা করে বলবে, কই, এলেন না তোমার সঙ্গে দেখা করতে ?
সোমনাথের ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। সবাই ওঁর মত ভুলে গেলেই যেন ভাল ছিল।
রামেশ্বর আবার সেটা মনে পড়িয়ে দিল।
রামেশ্বরই বা কি ভাববে ?
এতকাল মনের মধ্যে একটা গোপন গর্ব পুষে রেখেছিলেন। চাপা গর্ব। এক রামেশ্বর, কিংবা সেই যৌবনকালের কোনও বৃদ্ধ সহকর্মীর সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে

কখনও হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে ফিরে যেতেন। কতকগুলি হারিয়ে যাওয়া নিষ্প্রভ নাম মনে পড়ে যেত।

ছেলেরা কেউ কাছে থাকলে শুনে ফেলত।

তারপর চল্লিশ বছর ধরে নির্লিপ্ত দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে থেকে একটি নামকেই ধীরে ধীরে একটু একটু করে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছেন।

কোনও বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কৌতূহল ছিল না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে জীবন থেকে অবসর নেবার দিন গুনছেন তখন।

এই রামেশ্বরই সেদিন এসেছিল। চোখেমুখে বেশ আনন্দ।

—কে প্রেসিডেন্ট হলেন দেখেছ সোমনাথ? খবরের কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। যেন সোমনাথের বাড়িতে কাগজ নেই। যেন সোমনাথ পড়েননি।

রামেশ্বর বলে উঠেছে, আমার কিন্তু বেশ গর্ব হচ্ছে। তোমার হয় না?

কে বিশ্বাস করবে এই রামেশ্বর একদিন আগুনের গোলা ছিল। ফায়ার বল। বার্ধক্যে পৌঁছে, ব্যর্থতায় পৌঁছে, তখন শুধুই অন্যের মধ্যে নিজের গর্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সে জন্যেই হয়তো ছুটে গিয়েছিল। দেখা করতে। দেখা করতে, না মনে পড়াতে?

অরুণা চা নিয়ে এল।

রামেশ্বর হাসতে হাসতে বললে, তৈরি হয়ে থাকো বউমা। প্রেসিডেন্ট আসবেন।

অরুণা জানে। কাগজে দেখেছে। তিনি কলকাতায় আসছেন।

নিরঞ্জনের সঙ্গে ওর কথাও হয়েছে সকালেই। নিরঞ্জন সন্দিগ্ধ ভাবে বলেছে, আসবেন কিনা কে জানে। যা ব্যস্ত ওঁরা, সময় পাবেন কি?

শুধু সোমনাথ বিমর্ষ। কোনও আনন্দ নেই। যেন লজ্জা লুকোবার জায়গা খুঁজছেন। ভিতরে ভিতরে রামেশ্বরের ওপর চটে যাচ্ছেন। কি প্রয়োজন ছিল যা ভুলে গিয়েছিলেন তা মনে পড়াবার।

ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে দীপাও এসে দাঁড়াল। শুনল।

দীপা বিশ্বাস করে বসে আছে উনি নিশ্চয় আসবেন। ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই।

রামেশ্বর এক সময় গল্পগুজব করে চলে গেল।

কিন্তু পরের দিনই এসে হাজির। খবর দিয়েছেন কিছু?

সোমনাথ তখন নিজের ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন। রামেশ্বরের দোষ কি।

সুরঞ্জন এসে একসময় বলেছে, উনি এলে তো আগে বোধহয় খবর দেবেন, তাই না?

সোমনাথ হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারেন না।

কিন্তু না, তিনি এলেন না।

একটা দিন, দুটো দিন পার হয়ে গেল। শুধু তাঁর ব্যস্ততার খবর খবরের কাগজের পাতায়।

রামেশ্বর সেদিনও এসেছে। এখন বিমর্ষ। দুঃখ-দুঃখ মুখ।

বললে, কালই তো ফিরে যাচ্ছেন। এবার বোধহয় সময় পেলেন না।

সোমনাথ হাসলেন। নির্লিপ্ত হাসি। কোনও কথা বললেন না।

সকলেই হতাশ হয়েছে যেন। নিরঞ্জন, সুরঞ্জন, অরুণা, দীপা। নিরঞ্জনের বড় মেয়ে মঞ্জুশ্রী। সকলের মুখেই কেমন একটা অপমানের ছাপ।

সকলের রাগ ওই রামেশ্বরের ওপর। ওই লোকটাই দায়ী।

রামেশ্বর চলে যাবার পর নিরঞ্জন বললে। —ওই বেলেডোনা থার্টি। ওই লোকটাই দায়ী।

অরুণা বললে, এই সত্তর বছর বয়সে আশা দিয়ে এই রকম একটা আঘাত! কি

দরকার ছিল রামেশ্বরবাবুর।

সুরঞ্জন রেগে গিয়ে বললে, এলেই কি জীবন ধন্য হয়ে যেত নাকি।

সমস্ত বাড়িটা থমথম করছে। নিস্তব্ধ। যে যার নিজের ঘরে।

জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেছে।

আবার নতুন করে শুরু। সেই ফ্ল্যাটের চিন্তা। সোমনাথের পুঁজি ফুরিয়ে আসা বাকি জীবনের চিন্তা। এর পর এক ছাদের তলায় সকলে থাকবে তো! চোখের সামনে অন্তত।

সোমনাথ জানেন তিনি এ-বাড়িতে একা। চারপাশে এত মানুষ থাকতেও। তা হোক, তবু তো কাছাকাছি আছে সকলে। এরপর সত্যি সত্যি না একা হয়ে যান।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই সব কথাই ভাবলেন সোমনাথ। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জানেন না।

প্রতিদিনের মতই সকালে উঠেই সকলের ব্যস্ততা। নিরঞ্জন সুরঞ্জন অফিসে বের হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

ছেলেমেয়েদের স্নান করিয়ে খাইয়ে স্কুলে পাঠানোর জন্যে অরুণা ছোটাছুটি করছে।

দীপা বিল্টুকে নিয়ে বের হবে। ওকে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে।

হঠাৎ সামনের রাস্তার দিকের বারান্দা থেকে মঞ্জুশ্রী ছুটতে ছুটতে এল।

নিরঞ্জনকে এসে বলল, বাবা, দেখবে এসো, শিগগির।

—কি হয়েছে?

মঞ্জুশ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, একটা গাড়ি। ইয়া বড়।

নিরঞ্জন দেখতে গেল।

সকলেই ছুটে এল বারান্দায়।

হ্যাঁ, ঠিক বাড়ির সামনে। বিশাল একখানা গাড়ি। দেখেই চেনা যায়।

সুরঞ্জন, দীপা, অরুণা, নিরঞ্জন, মঞ্জুশ্রী—সকলেই বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

তখনও যেন নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

গাড়ি থেকে নেমে ইউনিফর্ম পরা লোকটি কি যেন খুঁজছে। বাড়ির নম্বর?

কাকে যেন জিগ্যেস করল। পাড়ার লোক।

সে নিরঞ্জনদের ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল দেখাল।

সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন আর সুরঞ্জন দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে শুরু করেছে। সিঁড়ির মাথায় অরুণা দীপা দাঁড়িয়ে।

মাঝামাঝি এসে ইউনিফর্ম-পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, বাবার নাম। নিরঞ্জন বললে।

ভদ্রলোক চিঠিটা দিলেন। বললেন, প্রেসিডেন্ট গাড়ি পাঠিয়েছেন, ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। ...না, না, আমি অপেক্ষা করব।

ওরা ছুটে এল সোমনাথের ঘরে।

—বাবা, তোমার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন।

মাকে দেখতে পেয়ে নিরঞ্জন বলে উঠল, বাবা কোথায়?

সারদা বললেন, সে তো সেই সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। বেড়াতে গেছে।

—কি আশ্চর্য, কোথায় গেল এ-সময়। সুরঞ্জনও বিরক্ত।

ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে রাস্তার দিকে গেল। উনি অনেক সময় এখানেই পায়চারি করেন। ওই শিউলি গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে শিউলি ফুলের ঘ্রাণ নেন। ঝরে পড়া শিউলি

কুড়িয়ে বাড়ি ফেরেন।

তন্ন তন্ন করে চতুর্দিকে খুঁজল ওরা সোমনাথকে। পেল না।

বললে, পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও গেছেন হয়তো।

নিরঞ্জন চিঠিটা পড়ল। দেখা করার অনুরোধ, চলে যাবার আগে।

সেই ইউনিফর্ম-পরা ভদ্রলোক বললেন, আর তো সময় নেই। ওঁর ফ্লাইটের সময় হয়ে যাবে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেই বিশাল গাড়িটা চলে গেল।

গাড়ির চলে যাওয়ার আওয়াজটা সারা বাড়ির—নিরঞ্জন, সুরঞ্জনের, অরুণা, দীপার, মঞ্জুশ্রীর ঐকতান দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

সোমনাথ ফিরে এলেন অনেক দেরিতে।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলেন। আজ অনেক দূর পর্যন্ত লেকে বেড়িয়ে এসেছেন। এখন ক্লান্ত।

ওঁর পামশুর মচমচ শব্দ শুনে সকলেই ছুটে এল। সোমনাথ নিজে প্রত্যেকটি কলিংবেলের আওয়াজ চিনতে পারেন। কে, বেলু এলি ? দাঁড়া যাচ্ছি। কিংবা সব নামগুলোর পাশে টিক্ দিতে দিতে শেষ প্রশ্ন, কই বউমা, সুরঞ্জন ফিরল না এখনও ? তেমনি, ঠিক তেমনি এই জুতোর মচমচ আওয়াজটা সকলেরই চেনা।

নিরঞ্জন সুরঞ্জন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল।

অরুণা দীপা মঞ্জুশ্রী।

সকলেই যেন রুষ্ট। সোমনাথের ওপর সকলেই প্রচণ্ড রেগে গেছে।

—না বলে-কয়ে কোথায় গিয়েছিলে ! নিরঞ্জনের গলা বেশ কর্কশ।

সুরঞ্জন বললে, চতুর্দিকে খুঁজে এলাম।

অরুণা দীপা কোনও কথা বলল না। যেন পরম বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মানুষটাকে তারা দেখছে।

মঞ্জুশ্রী শুধু বলে উঠল, দাদু তুমি কি !

যেন একটা পরম গর্ব থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করেছে নির্বোধের মত।

সোমনাথ বুঝতেই পারছেন না, কি অন্যায় করেছেন, কিংবা বাড়িতে কিছু কি অঘটন ঘটে গেছে।

শুধু সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ওদের দিকে।

নিরঞ্জন বললে, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ! প্রেসিডেন্ট গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠি...

সুরঞ্জন বললে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল।

সোমনাথের মুখে হাসি দেখা দিল।

সেই নির্লিপ্ত হাসি। বললেন, বাঁচা গেছে।

যেন কিছুই নয় ব্যাপারটা।

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

তারপর হাতে ধরা রুমালের থলির গিঁট খুলে বললেন, এই নাও বউমা, ছোট বউমা তুমিও নাও। গন্ধরাজ ফুল কয়েকটা। বেড়াতে গিয়ে তুলে আনলাম। কি চমৎকার গন্ধ। বলে নিজেই নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলেন।

রুমালের রাখা ফুলগুলো এগিয়ে দিলেন।



বাহিরি



কেউ এসেছে। এখন সকলেই গড়িমসি করবে। কারণ এ-সময় কারও আসার কথা নয়, কাউকে আশা করা হচ্ছে না।

কেউ আসার কথা থাকলেও একই অবস্থা। ওদিকে কান থাকবে ঠিকই, কোলাপসিবল গ্যেট টানার শব্দ হল কিনা। হলেই নিশ্চিন্ত। তা হলে আর নিজেকেই দোতলার ঝুল বারান্দায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হবে না কে এসেছে, সিঁড়ি ভেঙে নীচে গিয়ে তালা খুলতে হবে না, গ্যেট টানতে হবে না।

এই এক যন্ত্রণা এ-বাড়ির। অথচ যে দেখে সেই বাহবা দেয়। প্রথম প্রথম সকলে সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে দেখত, প্রশ্ন করত, কি করে খোঁজ পেলে এমন বাড়ির? তিরিশ বছর পরে, এখন কেউ কেউ স্পষ্ট বলে বসে, আপনাদের বাড়িটা দেখে সত্যি ঈর্ষা হয়। সেও এক ধরনের প্রশংসা।

কিন্তু পরিবারের সকলেই এই কম ভাড়ার ভাল বাড়িখানার ওপরই বীতশ্রদ্ধ। সকলেরই সবকিছু অসুবিধে এখানে। তার মধ্যে একটা হ'ল এই কলিং বেল্।

একখানা গোটা বাড়ি, বিশাল, ওপরে নীচে অনেকগুলো ঘর, বড় বড় বারান্দা ও ঝুল বারান্দা, মোজেক মেঝে, দামি কাঠের-কাচের কপাট, জানালা, সুন্দর ডিজাইনের গ্রিল, উদার ছাদ, আলসে দেওয়া। ভাড়া দেবার জন্যে কেউ এমন বাড়ি বানায় না। তবু ভাগ্য তো মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা করে না, সুতরাং দিতে হয়। আর সেই সুবাদে সঞ্জয়রা এ-বাড়ির ভাড়াটে। অথচ সদাই অতৃপ্ত।

ঝুমা প্রায়ই বলে, এর চেয়ে তিন ঘরের একটা কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাট অনেক ভাল।

কারণ এই বিরাট বাড়িখানার এতগুলো ঘরে ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্যে লোক পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও প্রচুর মাইনে হাঁকে। টাকা দিতে পারলে, এবং দিলেও, টেকে না। দু-একমাস অন্তর, কখনও-কখনও দু-চারদিন অন্তর ঠিকে ঝি খোঁজে। একজন তো এসে এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখল, যেন বাড়ি কিনবে কিংবা ভাড়া নেবে, জানালার নীচের ধাপিতে হাত বুলিয়ে দেখল, তারপর বললে, না গো বৌদি, এ বাড়িতে আমার পোসাবেনি।

কেন পোসাবেনি তা জানা গেল দুদিন পরেই। অনেক বেশি মাইনে কবুল করে যে ঠিকে-ঝি শেষ অবধি আনা হল, সে একবেলা কাজ করেই শাড়ির আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বললে, না মা, আগের বাড়িই আমার ভাল ছেল, একটুকুন একটুকুন দুখানা ঘর, বাক্স-প্যাঁটরা ঠাসা, এই হাত বুলিয়ে দিনু, ঘর মোছা শেষ। এই পাসাদ বাড়ি। আমার কাঁখাল ধরে যায়।

এমনি ধারা আরও কত অসুবিধে। এক-একজনের মুখে এক-একরকম। অবশ্য সবচেয়ে বড় বিরক্তি ওই কলিং বেল্।

মানুষ দোতলায় বাস করতে চাইলে, একটা নীচের তলা তো থাকতেই হয়। তার ওপরই তো দোতলাকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে দোতলা জুটে গেলে তার অসুবিধে অনেক। তখন কদাচিৎ নীচের তলায় নামতে হলে বড় কষ্ট।

এই যেমন কলিং বেল্।

বাড়ির সকলেই দোতলায়, সবারই নিজের নিজের ঘর আছে। দোতলায় একটা

বাথরুমও। রান্না ঘর আর ভাঁড়ারই শুধু নীচে, বসার ঘর, ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর নীচে, প্রয়োজনের সময়টুকু ছাড়া নীচের তলা অস্পৃশ্য, পরিত্যক্ত। সারাদিন খাঁ খাঁ করে। সুতরাং কেউ এলে-গেলে কোলাপসিব্‌ল্‌ গ্যেটের তালা খোলো, তালা লাগাও।

ঝুমা ঠাট্টা করে বলে, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ।

শুভা স্কুলে পড়ার সময় বলত, পি টি ক্লাশ।

আসলে পুরনো হয়ে যাওয়ায় কোলাপসিব্‌ল্‌ গ্যেটটা খুলতে বন্ধ করতে রীতিমত কসরত লাগে, সে আর এক বিরক্তি। নতুন কেউ এলে, কি লজ্জা। ভদ্রলোক ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন, এদিকে ঝুমা কিংবা শুভা টানাহেঁচড় করছে, গ্যেট খুলছে না। তখন উপায় না দেখে ভদ্রলোকও হাত লাগান।

রাগে বিরক্তিতে ফিরে এসে ঝুমা বলে, বাড়ি তো নয়, রেড ফোর্ট। কি এমন সোনাদানা আছে রে বাপু, একটা কপাট লাগালেই তো পারত।

সঞ্জয়কে তখন বলতে হয়, এটা ভাড়া বাড়ি, আমাদের কথা ভেবে বানানো হয়নি। এমন বাড়ি যে করেছিল, তার সোনাদানাও ছিল।

কিন্তু বিরক্তি শুধু ওই কারণেই নয়।

সঞ্জয় আর ঝুমা শুনতে পেল, আবার বেল্‌ বাজছে। কর্কশ রুক্ষ কণ্ঠে, অনেকক্ষণ ধরে।

কেউ এসেছে। কিন্তু কে? বাইরের কেউ হলে এতক্ষণ সুইচ টিপে থাকে না। ভদ্রতায় বাধে।

আসলে বাড়িসুদ্ধ সকলেই শুনেছে, শুনতে পাচ্ছে। সকলেই ভাবছে, কেউ না কেউ উঠবে, দেখবে কে এসেছে, গ্যেট খুলে দেবে। ঘুমের ভান করে চুপ-চাপ পড়ে থাকলে কেউ না কেউ যাবে।

বিরক্তি শুধু গ্যেট খোলার জন্যে নয়। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে হবে।

বাড়িটা বেশ উঁচু, তিরিশ চল্লিশ বছর আগেকার ধাঁচে। তার ওপর সিঁড়ির ধাপ উঠেছে খাড়া হয়ে। উঠতে নামতে রীতিমত কষ্ট হয়। অথচ সকাল থেকে ওঠা নামার বিরাম নেই। ভাঁড়ার দিয়ে এসো রান্নার ঠাকুরকে, তার চিৎকার করা ফরমায়েস এটা-ওটা, দুধ গরম করার সময় দাঁড়িয়ে পাহারা দাও, তার পর লোক আসা-যাওয়া তো আছেই। বাসনমাজার ঠিকে ঝি কাজ সেরে যাবার সময় ডাক দিলে একজন কাউকে গিয়ে গ্যেটের তালা খুলে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে শাড়ির আড়ালে কিছু নিয়ে যাচ্ছে কিনা। এটা শাশুড়ির হুকুম, কিন্তু ঝুমা তো দূরের কথা, তাঁর মেয়েরাও মান্য করে না।

আবার বেল্‌ বাজল। আরও দীর্ঘক্ষণ। এবার আর না উঠে উপায় নেই। কারণ ঝুমাদের ঘর থেকেই ঝুল্‌ বারান্দায় যাওয়া যায়, উঁকি মেরে দেখা যায় কে এসেছে।

বিরক্তির চোখে সঞ্জয় ঝুমার দিকে তাকাল, ঝুমা সঞ্জয়ের দিকে। এতক্ষণ ওরা দুজনে এক দলে ছিল, বাড়ির অন্য সকলে আরেক দলে। কেউ গেল না দেখে, কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে নিজেদের মধ্যে আলসেমির প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল। কারণ দুজনেই মনে মনে ভাবছে, যে এসেছে সে আমাদের কেউ নয়, আমাদের কাছে আসেনি। কারণ আমাদের কাছে কারও আসার কথা নেই। একই ছাদের তলায়, একই পরিবারে বাস করলেও সকলেই কেমন আলাদা আলাদা হয়ে গেছে।

একবার এই রকম একটা কাণ্ড ঘটেছিল। তার জন্যে ঝুমার কি লজ্জা, কি লজ্জা। অনুশোচনার শেষ নেই।

সঞ্জয় আপিসে। ঝুমা দুপুরের বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছে। তন্দ্রা মত এসেছে। কর‍র্‌ কর‍র্‌ সংক্ষিপ্ত ভীরু-ভীরু বেল্‌ বাজছে অনেক পরে পরে। ঝুমার আলসেমি, কেউ না

কেউ যাবে, দেখবে, খুলে দেবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন গ্যেট টানার শব্দ শুনতে পেল না, আবার বেল, নিরুপায় বিরক্তিতে উঠে গিয়ে ঝুল বারান্দা থেকে উঁকি মেরেই 'ও মা তুমি ? যাচ্ছি যাচ্ছি,' পড়ি কি মরি ছুটতে ছুটতে নেমে গিয়েছিল।

বাবা। ঝুমার বাবা। প্রচণ্ড রোদ্দুরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে, হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এসেই ধপ্ করে বসে পড়েছিলেন।

ঝুমার তখন কি অনুশোচনা। ফুল ফোর্সে পাখা চালিয়ে দিয়েও হাতপাখা নিয়ে এসেছে, জল, শরবত, ছোটাছুটি।

নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে বাবাকে খুব কড়া শাসন করেছিল। এই রোদ্দুরে, দুপুরে, তুমি কখনও আসবে না। কবে সান্-স্ট্রোক হয়ে যাবে। যেন দোষ বাবার, দোষ রোদ্দুরেব .

কিন্তু এমন ঘটনা ওই একবারই। বাবা এখন আর দুপুরে আসেও না। তাছাড়া বাবা এমন একটানা রুক্ষভাবে করর্ করর্ করে বেল্ টিপবে না। এটা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুর শাশুড়ি আছে, জা ছিল, ননদ আছে। বাবা এলে কেমন ভীরু-ভীরুভাবে বেল্ টেপে। অথচ তার আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই। ঝুমা এখানে রীমিমত সুখী। বাবাকে এরা সবাই খুব সমীহ করে। কিন্তু বাবা কিংবা মার হাসি কথা হৈ হল্লার আড়ালে লুকোনো একটা ভয়-ভয় ভাব যে আছে ঝুমা তা দিব্যি টের পায়। পায় বলেই ওর আত্মসম্মানে লাগে। [আমরা ভারতীয়, এবং বাঙালি।]

আবার বেল্ বাজল। আরও বেশিক্ষণ ধরে। যেন ধমকের স্বরে।

সঞ্জয় এবার বলেই ফেললে, যাও গিয়ে দ্যাখো। তারপর অস্ফুটে বললে, জ্বালাতন।

এই রবিবার দুপুরটা সঞ্জয়ের কাছে খুব মূল্যবান। সপ্তাহে এই একটাই তো কপাট-বন্ধ দুপুর ! নির্ঝঞ্ঝাট দুপুরের ঘুম।

ছুটির দিনে সঞ্জয়ের একটাই কাজ বাড়ে। বাজার যাওয়া। কাজটা ওর খুব পছন্দসই নয়, অন্যদিন যেতেও হয় না। পৌনে নটার মধ্যে দু-কাপ চা, প্রাতঃকৃত্য, খবরের কাগজ, তারপর গালের আগাছা সাফ করে তড়িঘড়ি স্নান এবং খাওয়া, দৌড়তে দৌড়তে ভিড়ের মিনিবাস, চুলের পাট শার্টের ইস্ত্রি ঠিক রাখার কসরত করতে করতে অফিসের সামনে নেমে পড়া। [পকেটে একটা ছোট চিরুনি আছে] সাড়ে নটায় অ্যাটেনডেন্স। রেসের ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে ছুটতে হয়, ছুটতে ছুটতে লাফাতে হয়, সময় কোথায় বাজারে যাওয়ার। পুঁইশাক কিংবা পটল ঝিঙে কেনা, মাছের কানকো দেখা এবং দাঁড়িপাল্লার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভবও নয় ওর পক্ষে, ভালও লাগে না।

যদিবা সম্ভব হত, মা অথবা ঝুমার লিস্টি মনে রাখার জন্যে চাই ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তি। ওদের ফরমায়েসে আদার পাশে পেঁয়াজ থাকে না, কলমি শাকের সঙ্গে জুড়ে দেবে জামা-কাপড় টাঙানোর জন্যে কাঠের ক্লিপ কিংবা জিভ-ছোলা, প্লাস্টিকের দড়ির সঙ্গে আড়াইশো মাখন, এবং এ-দোকান ও-দোকান ঘুরতে ঘুরতে যদি শ্বেতশুভ্র সাধের লাউয়ের ফালি স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে কুমড়োর ফালির সোনালি মুখ নিয়ে গৃহপ্রবেশ করে তা হলে ঝুমা অবিলম্বে ফ্রিজ খুলে বাঁ হাতে পক্ব কুষ্মাণ্ডটি বের করে এনে ডান হাতে সদ্য আনা কাঁচা কুমড়োর ফালিটির সরব প্রদর্শনী শুরু করে দেবে। একবার মার সামনে : দেখুন মা দেখুন, আপনার ছেলের কাণ্ড। একবার বাবার সামনে : সারা হপ্তা কুমড়ো খেতে হবে, বাবা। ''এই দেখুন' ব'লে দুহাত এগিয়ে দিয়ে দুহাতে ধরা কুমড়োর ফালি দুটি না দেখিয়ে ক্ষান্ত হবে না।

সেজন্যেই রেগে গিয়ে একদিন ও-সব পাট চুকিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়।

আবার বেল্ বাজল। বাজতে শুরু করল করর্ করর্ করর্। কমা ফুলস্টপ নেই এবার।

সঞ্জয় ঝুমার দিকে তাকিয়ে বললে, কি হল ? অর্থাৎ তোমাকে তো গিয়ে দেখতে বললাম।

এই প্রচণ্ড গরমে দুপুরের আহারের পর টুকিটাকি কাজ সেরে এসে সবে ফুলফোর্সে চালানো পাখার নীচে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, এ-সময় কার আর উঠতে ইচ্ছে করে। সঞ্জয়ও শুয়েই ছিল, বিছানায়। তন্দ্রামত আসছিল। ঝুমা বালিশে মাথা দিয়ে ঠাণ্ডা মোজেক মেঝেতে। মাদুর পাতলেও ওর গরম লাগে।

সঞ্জয়ের কথায় ঝুমা উঠতে যাচ্ছিল, আর তখনই একটা কপাট খোলার আওয়াজ শোনা গেল। তা হ'লে কেউ উঠেছে। ঝুমা আবার শুয়ে পড়ল।

বিরক্তিকর এই কাজটার বেলায় আলসেমির একটা প্রতিযোগিতা চলে।

কারণ এই ভরপেট ক্লান্তি ও অবসাদে ভারী হয়ে আসা শরীরকে টেনে তুলতে কারও ইচ্ছে হয় না, উপরন্তু বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে যে দেখতে যাবে, দায়িত্ব তারই। ওই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নামো, গ্যেট খোলো, বন্ধ করো, তাকে নীচের ঘরে দরজা খুলে বসাও অথবা ওপরে নিয়ে এসো, মা কিংবা বাবাকে ডেকে তোলো, এখন অবশ্য ঝুমারও মা এবং বাবা ; তারপর নির্ঘাত এক গ্লাস জল এনে দিতে হবে, তেমন তেমন কেউ হলে মিষ্টির প্লেট, বেরসিক হলে বলে বসবে, চা খাব !

সুতরাং যতক্ষণ না-শুনে থাকা যায়।

সঞ্জয়ের বিরক্তি লাগছিল বারবার বেল্ বাজছে বলে। সারা সপ্তাহে এই একটা দুপুর নির্বিবাদে ঘুমোনো কিংবা ঘুম না এলে ঘুমে জড়ানো ঝুমাকে বলবে, আরে এসো গল্পটল্প করি, রোজই তো ঘুমোও।

ঝুমা একদিন হাতটা ঠেলে দিয়ে বলেছিল, তোমার তো শুধুই টল্প !

মনে পড়ে গেলে সঞ্জয়ের হাসি পায়। তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। তখন কপাট বন্ধ করার সময় শব্দ হলে ঝুমা রেগে যেত।

না, ওদিকের কোনও ঘরে কপাট খোলার শব্দ হল বটে, কিন্তু কেউই বোধহয় যায়নি। কলিং বেল্ আবার বেজে চলেছে।

অগত্যা ঝুমাই উঠল। উঠে ঝুল বারান্দায় দেখতে গেল কে এসেছে। তারপর বিরক্তির সঙ্গে বেরিয়ে গেল গ্যেট খুলতে।

সঞ্জয় প্রশ্ন করল, কে ?

ঝুমা উত্তর দিল না। ওর রাগী মুখ দেখে সঞ্জয় হেসে ফেলল।

রাগ হবারই কথা। এই ছুটির দিনের ভরদুপুরে কি কারও দেখা করতে আসার সময়। নির্ঘাত কোনও আত্মীয়টাত্মিয়।

রবিবার এমনিতেই বেশ দেরিতে খাওয়া হয়, তার ওপর ধীরেসুস্থে পেট ভরে মাংস-ভাত খেয়ে সঞ্জয়ের শরীরে এখন আয়েসি অবসাদ। সারা সপ্তাহ নাকেমুখে গুঁজে ছুটতে হয় বলেই রবিবারের আহার ওর একমাত্র বিলাস। রবিবারের বাজারটাও।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই কোলাপসিব্ল্ গ্যেট টানার শব্দ শুনতে পেল সঞ্জয়। এবার ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে পারলেই ভাল হয়। তা না হলে উঠে পড়তে হবে, ভদ্রতা দেখাতে হবে, অনর্গল কথা বলতে হবে কিংবা শুনতে হবে।

কে আসতে পারে ? সঞ্জয় কিংবা ঝুমার কাছে নয়। হয়তো বাবার কাছে বাবার মতই অবসরপ্রাপ্ত কোনও বন্ধু। দুপুরে ঘুম আসে না কিংবা গল্পগুজব করার লোক পায় না বলে

যারা সময় কাটাতে আসে। সেই হৃষীকাকা নয় তো ? হৃষীকেশবাবু, বাবার আণ্ডারে কাজ করত, এখন সেও রিটায়ার্ড। আসে মাঝে মাঝে। বদ্ধকালা। আজকাল কতরকম ভাল ভাল যন্ত্র বেরিয়েছে কানে লাগাবার। তার বদলে একটা ছোট্ট নল নিয়ে ঘোরেন। গ্রামোফোনের সেই বিখ্যাত চোঙার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। কেউ কথা বললেই কানে লাগিয়ে শোনেন। তাও চিৎকার করে না বললে কিছুই শুনতে পান না। অথচ নিজে কথা বলেন ফিসফিস করে। বারবার জিগ্যেস করতে হয়, কি বললেন ? কি বললেন ? যেন সঞ্জয়ই কানে শুনতে পায় না। আর উনি একবার এলে আর উঠতে চান না। অবশ্য সঞ্জয়ের বাবাও তো তাকে উঠতে দেন না। চাকরি থেকে রিটায়ার করে উনিও তো একা হয়ে গেছেন। কোনও বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই, খবরের কাগজ পড়েন, কিংবা চুপচাপ বসে থাকেন। কোনওদিকে চোখ দিতে গেলেই সকলে বিরক্ত হয়। তার চেয়ে কোনওদিকে চোখ না দেওয়াই ভাল। তবে, যত বয়েস হচ্ছে, আগ্রহ শুধু একটা দিকে। খাওয়া। উদ্ভট উদ্ভট বায়না সব। যা রাঁধতে হ'লে সঞ্জয়ের মাকে কিংবা ঝুমাকেই হাতাখুন্তি ধরতে হয়। রান্নার ঠাকুরকে দিয়ে হয় না। মা রেগে যায়, ঝুমা রেগে যায়, অথচ না করে দিয়েও পারে না। আহা, বুড়ো মানুষটা, ইচ্ছে হয়েছে যখন ! সঞ্জয় অবশ্য বুঝতে পারে, বাবা শৈশব আর যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বকে নতুন করে ঝালিয়ে নিতে চান। ওটা আসলে জিভের স্বাদ নয়, স্মৃতির স্বাদ ফিরিয়ে আনা যায় কিনা, তার চেষ্টা। —আঃ তোর মায়ের রান্না কচুর শাক যা হত না...

অতএব রবিবারের বাজার সঞ্জয়কেই করতে হয়। বিশেষ করে ওর নিজেরও দু-একটা নিজস্ব শখ আছে বলেই। যেমন মাংস কেনা। নিজের চোখে দেখে না কিনলে তৃপ্তি নেই।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনতে পেল সঞ্জয়। বেশ ভারী জুতোর ভারিক্কি চালের হাঁটা। জুতোর শব্দ শুনে এতক্ষণে কৌতূহলী হয়ে উঠল ও।

কে আসছে ? কে হতে পারে ?

সঞ্জয় ভেবেছিল, মামার বাড়ির কেউ, কিংবা মাসীমাদের বাড়ি থেকে। দূর আত্মীয়দের কেউ গঙ্গাস্নান করতে এসেছে মফস্বল থেকে, মাঝপথে এটাকেই ওয়েটিং রুম ভেবে বসে। মুখে অবশ্য বলে, কতদিন দেখিনি তোমাদের, দেখা করতে এলুম। কিংবা বরানগর থেকে জ্যাঠামশাইয়ের ছেলেরা। কিংবা সেই কানে খাটো হৃষীকেশবাবু। হাতে নল।

কিন্তু এই জুতো মশমশ করে আসার ঢঙ চেনা নয়। যেন গাড়ির আগে সাইরেন বাজিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, কে আসছি দ্যাখো। এই জুতোর আওয়াজ ও পা ফেলার ধরনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কিংবা অহঙ্কার থাকে। অফিসের কেউ নয়, কারণ ওপরে উঠে আসছে সরাসরি। ঝুমা ওপরে নিয়ে আসছে। ওপরে নিয়ে আসার মতই কেউ। কিন্তু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না।

সঞ্জয় উঠে বসবে কি শুয়েই থাকবে, ভাবছিল। একটু ভদ্রস্থ হতে হবে কিনা। আর তখনই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল ঝুমা।

বিরক্তি মাখানো মুখ, চাপা গলায় বললে, বংশী।

বলেই চট্ করে বেরিয়ে গেল, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাসিমুখে বললে, কে এসেছে দ্যাখো।

সঞ্জয়ও হাসি-হাসি মুখ করে বললে, সে কি রে, তুই ?

ঝুমাও হাসল। বলল, আমি তো ওপর থেকে দেখে চিনতেই পারিনি।

বংশী দোরগোড়ায় নিচু হয়ে জুতো খুলতে খুলতে বললে, কদ্দিন থেকে আসব আসব

ভাবছি, আজকাল সময়ই পাই না।

বংশীকে বেশ খুশি খুশি দেখাল।

সঞ্জয় তখনও অবাক হয়ে দেখছে। উঠে বসেছে, খাটের বাজুতে পিঠ দিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সত্যি, চেনাই যায় না।

—তারপর কেমন আছেন বলুন। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল বংশী, দাঁড়িয়ে রইল।

ঝুমা চেয়ার এগিয়ে দিল না, বসতেও বলল না।

সঞ্জয় শুধু বললে, তুই কেমন আছিস তাই বল।

বংশী ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল, তারপর সপ্রতিভ ভাবেই খাটের ওপর গিয়ে বসল। —আমি ভালই। চাকরি করছি আর-কি—

বলেই ঝুমার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি কিন্তু একটু রোগা হয়ে গেছেন বউদি।

ঝুমা প্রতিবাদ করল, না না, দু-পাউন্ড বেড়েছি।

সঞ্জয় বংশীর জুতো দেখে নিয়েছে আগেই। দেখাবার জন্যেই হয়তো দরজার সামনে এসে খুলেছে। এবার ওর দামি প্যান্ট, টি-শার্ট; হাতের ঘড়ি দেখে নিল।

—সেখানেই কাজ করছিস ? সঞ্জয় প্রশ্ন করল, যদিও ওর স্পষ্ট মনে পড়ল না এর আগের বার এসে কোন্ অফিসের কথা বলেছিল।

বংশী বলে উঠল, না না, সে তো কবেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন গশ অ্যাণ্ড মেটা, বেটার প্রসপেক্ট দেখলাম,...হঠাৎ বলে উঠল, ছোটদা, ম্যানেজমেন্ট পড়ছি। আজকাল তো ব্রাইট ফিউচার ওই একটা লাইনেই, তাই না ? আর চাকরিতে উন্নতি করতে হলে একটা ছেড়ে আরেকটা। বলে হাসল।

এ-সব কথা বলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ওর জুতোর শব্দ, হাঁটা, টানটান হয়ে ভারিক্কি চালে দাঁড়ানো, বসতে না বলা সত্ত্বেও এতটুকু অপ্রতিভ না হওয়া এবং পোশাক-আশাকের ছাঁটকাট দেখেই সঞ্জয় বুঝতে পারছে, বংশী একেবারে বদলে গেছে।

অনেকদিন থেকেই বদলে যাচ্ছিল, কিন্তু এতখানি বদলে যাবে কোনদিন ভাবেনি। এখন ওকে দেখে অহঙ্কারের প্রতিমূর্তি মনে হচ্ছে।

বংশী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, হেসে বললে, যাই মার সঙ্গে দেখা করে আসি। ঝুমার দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন বউদি, ঘুমোচ্ছেন হয়তো, ডেকে দেবেন চলুন।

এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল, গোড়ালিতে ভর দিয়ে দুলল, কথা বলল, যে সমস্ত ব্যাপারটাই সঞ্জয়ের কাছে রীতিমত অস্বস্তিকর।

ওর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই হয়তো ঝুমা বললে, চলো।

অর্থাৎ ওদের কাছে লোকটাকে গছিয়ে দিয়ে আসতে পারলেই শান্তি। হ্যাঁ, সেই বোকা বোকা ছেলেটা এখন লোক হয়ে গেছে। এর মধ্যেই ওর যেন একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে, যে-ব্যক্তিত্ব, সঞ্জয় জানে, ওর নিজের নেই। কিংবা ওটা ব্যক্তিত্ব নয়, ওটাই অহঙ্কার।

এমন যে হবে ওরা কোনদিন কল্পনাও করেনি। এখন অনুশোচনা হয়। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ওর মধ্যে যদি একটুও কৃতজ্ঞতা বলে কিছু থাকত, এভাবে আসত না, এভাবে বসত না, কথা বলত না। ও চিরকাল মাথা নিচু করে ছোট হয়ে থাকত।

বংশী ওঘরে চলে যেতেই সঞ্জয়ের মন বিস্বাদ হয়ে গেল।

ওর খুলে রাখা দামি জুতোটার দিকে আরেকবার তাকাল সঞ্জয়।

আর তখনই ছোটবোন শুভা এসে ফিসফিস করে বললে, মায়ের পোষ্যপুত্তুর কি বলছিল ছোড়দা ?

—কি আবার বলবে, বড় বড় কথা সব। বিরক্তির স্বরে সঞ্জয় বললে। বিরক্তি বংশীর

ওপর। শুভার দিকে তাকিয়ে বললে, যা, গিয়ে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিয়ে আয়।

শুভা রাগত স্বরে জবাব দিল, যাবে নাকি ? সকলকে জ্বালিয়ে যাবে। মা আবার না মিষ্টিফিস্টি দিতে বলে।

মূল কথা হল, আজকাল ওরা কেউই বংশীকে সহ্য করতে পারে না। ওর সবকিছু আজকাল খারাপ লাগে। সঞ্জয় শুনতে পেল, ওঘরে বংশী গল্প জুড়ে দিয়েছে। শব্দ করে হাসছে, উঁচু গলায় কথা বলছে। এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে ওর কথা। সঞ্জয়ের মনে পড়ল না, বংশী এর আগে এত জোরে হাসত কিনা, এত উঁচু গলায় কথা বলত কিনা। অনেকদিন পরে পরে হলেও ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু শুধুই কি সেই পুরনো দিনের টানে ? সত্যি, কোথাও কি ওর মধ্যে একটা মায়া-মমতার বন্ধন আছে ? সঞ্জয়ের কখনও কখনও ভাবতে ভাল লাগে, আর কারও প্রতি না হোক্, বাবা-মার ওপর ওর এখনও কিছুটা শ্রদ্ধাভক্তি আছে, হয়তো চাপা কৃতজ্ঞতা। এখনও প্রণাম করে। কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনলে, দাঁড়ানোর কায়দা দেখলে, কেবলই সন্দেহ হয়, ও যেন গোটা বাড়িটাকে ঠাট্টা করতেই আসে। যতক্ষণ কথা বলে যেন ভিতরে ভিতরে কুলকুল করে হাসে। কিংবা এ-সব কিছুই নয়, সবই সঞ্জয়ের নিজের কমপ্লেক্স। হয়তো সারা পরিবারেরই।

কি এত গল্প করছে ও, মা শুনছেই বা কেন। ওকে বুঝিয়ে দিলেই তো পারে এ-বাড়িতে ও অনাহূত, ওকে সকলেরই অপছন্দ, ওর উপস্থিতিও।

শুভা হাসল। শুনতে না পায় এমন চাপা গলায় বললে, কি চালিয়াত হয়েছে বাবা !

ঝুমা কৌতুকে ওর চোখ বড় বড় করে বললে, সত্যি। কি ভাবে বলো তো ? ও কি আমাদের সমান ভাবছে নিজেকে ?

ওরা তিনজনই হেসে উঠল।

কিন্তু কেউই কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। কি এত কথা বলছে ? কত মাইনে পায়, সে-কথা ? সঞ্জয় তো সে-সব কথা জিগ্যেস করেনি, কোনও আগ্রহই দেখায়নি ওর চাকরি সম্পর্কে, সেই সবই হয়তো এখন মাকে শোনাচ্ছে। বাবা রিটায়ার করার পর মা তো এমনিতেই মুসড়ে পড়েছিল, তার ওপর বড় মেয়ে বিধবা হওয়ার পর আরও ভেঙে পড়েছে।

ঝুমা যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই, মার ডাক শোনা গেল, বউমা। তারপরই, শুভা কোথায় গেলি।

ঝুমা সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বোঝো !

অর্থাৎ এবার হুকুম হবে, বংশীকে মিষ্টিফিস্টি দাও, কিংবা শরবত।

নিজেদের ব্যবহারে সঞ্জয়ের অবশ্য একটু খারাপও লাগল। এই প্রচণ্ড গরমে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, বেল্ টিপছে তো টিপছেই, আর গ্যেটের সামনে যা কড়া রোদ্দুর, যখন এল বংশী, সারা মুখ ঘামে জ্যাবজ্যাব করছিল। ও অবশ্য পরিপাটি করে রুমালে মুখ মুছল। কিন্তু ওরা একটুও খুশি ভাব দেখায়নি, দূরত্ব রেখে কথা বলেছে, সেজন্যই হয়তো এক গ্লাস জলও চাইতে পারেনি। চাইলে নিশ্চয়ই ঝুমা ছুটে গিয়ে এনে দিত, ফ্রিজের ঠাণ্ডা জলও মিশিয়ে দিত। ঝুমার হয়তো খেয়াল হয়নি, কিন্তু তুই তো আর একেবারে অচেনা অজানা বাইরের লোক আসিসনি, নিজেই তো চাইতে পারতিস। বাইরের লোকও তো তেষ্টা পেলে এসেই জল চায়।

শুভা মজা করে বললে, ছোড়দা চলো চলো, কি বলছে সব মাকে, গিয়ে শুনি।

সঞ্জয়ও সে-কথাই এতক্ষণ ভাবছিল। কৌতূহলই নয়। এ-সময় ওর উপস্থিতি দরকার। ভদ্রভাবেই দু-একটা কথাও অন্তত বলতে পারবে।

আসলে এর আগেও এ-রকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বাবা কিংবা মার কাছে বসে গল্প

করে, গল্পের ফাঁকে নানা কথা বলে, যা শুনে সঞ্জয়ের কিংবা শুভার মনে জ্বালা ধরে যায়। অথচ মা নির্বিবাদে বলে, বংশী বলছিল...

মা আসলে কিছুই বোঝে না।

সঞ্জয় কিংবা শুভা কিংবা ঝুমাকে তখন বলতেই হয়, তুমি বলতে পারলে না...

শুনে সঞ্জয়ের মা চুপ করে থাকে, অথবা বলে বসে, ওসব আমার মাথায় আসে না, আর মুখের ওপর কি বলা যায় নাকি ?

সে-রকমই কিছু শোনাচ্ছে কিনা কে জানে। সঞ্জয়ের সামনে বললে ও মুখের ওপরই জুতসই জবাব দিতে পারবে। মার ওপরও সেজন্যেই মাঝে মাঝে রেগে যায় সঞ্জয়। ও কি শুনিয়ে গেছে, দুঃখ করে সে-সব কথা শোনায় মা, অথচ সে-কথা শুনে যা বলা উচিত ছিল, তা বলতে পারে না। ছেলেটাও, ওই বংশী, ধূর্ত কম নয়, এমনভাবে বলে, যেন সহানুভূতি দেখাচ্ছে।

মা আবার ডাক দিল, শুভা !

শুভা আর ঝুমা দুজনেই চলে গেল।

সঞ্জয় এক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল। ভিতরে একটা বিরক্তি আর চাপা রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করলে। না, এরপর আর ঘুম হবে না।

উঠে পড়ে ধীরে ধীরে মার ঘরেই চলে গেল।

বাঃ, বেশ জাঁকিয়ে বসে গল্প করছে তো ? খাট থেকে পা ঝুলিয়ে বসে মা চুপচাপ শুনছে। শুনছে কি শুনছে না বোঝাও যাচ্ছে না। বাবা মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে।

সঞ্জয় গিয়ে দাঁড়াতেই বংশী চুপ করল। তারপর হাসি-হাসি মুখে বললে, বাপ্পাকে দেখছি না ! হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, প্রশ্ন করলে, ছোটদা, বাপ্পা কি করছে এখন ?

শুভা মিষ্টির প্লেট আর গ্লাস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠকাস করে শব্দ হল, ও প্লেট আর গ্লাস নামিয়ে রেখে চলে গেল।

সবাই চুপচাপ। একটা কথাও বললে না কেউ।

সঞ্জয় মনে মনে ঠিক করে এসেছিল, বাহাদুরি দেখিয়ে তেমন কোনও কথা বললে ও একটা বাঁকা কথা বলে ওর মুখ বন্ধ করে দেবে। কিন্তু তার বদলে ও যে এ ধরনের একটা প্রশ্ন করে বসবে ভাবতেই পারেনি।

বাপ্পা কি করছে এখন ?

সঞ্জয়ের মুখে কোনও কথা জোগাল না।

সঞ্জয় দেখল মার মাথা আরও ঝুঁকে পড়েছে। বাবা পাশ ফিরে শুয়েছিল, জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল না। চকিতে একবার মাথা ঘুরিয়ে বাবা ইতিমধ্যে এক পলক বংশীকে দেখে নিয়ে আবার পাশ ফিরে শুয়েই রইল।

এতক্ষণ বংশীর উপস্থিতি বিস্বাদ লাগছিল সকলের কাছে। এই একটা কথায় সমস্ত পরিবেশ যেন তিক্ততায় ভরে গেল। অস্বস্তিতে মুখ কালো হয়ে গেল সঞ্জয়ের।

বংশী আবার বললে, বাপ্পা আছে বাড়িতে ?

সঞ্জয় একটু বোধহয় বেশি জোর দিয়ে বললে, না।

বংশী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, চেষ্টায় আছি আমি। একটা কিছু সুযোগ পেলেই...

কথা শেষ করল না।

আর সঞ্জয়ের মনে হল যেন গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল বংশী।

॥ ২ ॥

এতক্ষণ সকলেই কেমন একটা দম বন্ধ হওয়া অস্বস্তির মধ্যে ছিল। বংশী চলে গেছে, কিন্তু অস্বস্তি কাটছে না। রবিবার দুপুরের সেই আলসেমি জড়ানো শান্তিটুকুও সে যেন বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেছে।

ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। একটা চাপা রাগ, তার ওপর এই দুঃসহ গরম। বলে উঠেছে, ওটাকে আর এরপর ঢুকতে দিয়ো না।

বংশী নামটা উচ্চারণ করতে আপত্তি। 'বংশীকে' না বলে বলেছে 'ওটাকে'।

দয়াময়ীর এখনও বংশীর ওপর বোধহয় লুকোনো দয়া এবং মায়া আছে। হয়তো ছেলে মেয়েদের ভয়েই প্রকাশ করতে পারেন না। মৃদু গলায় বললেন, আসলে ছেলেটা খুবই বোকা, বুঝলি। ও ইচ্ছে করে ও-সব করে না।

সঞ্জয় ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, তখন তো বলতে ও খুব বুদ্ধিমান। এখন বোকা, সরল, আরও কত কি বলবে। ইচ্ছে করে ওসব করে না, হুঃ।

দয়াময়ী চুপ করে গেলেন।

আর সঞ্জয় স্বগতোক্তির স্বরে বললে, রবিবারের দুপুরটাই নষ্ট করে দিয়ে গেল।

নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল সঞ্জয় আর ঝুমা। শুভাও এল পিছনে পিছনে।

দয়াময়ী চলে গেলেন নিজের ঘরটিতে। কোথায় যাবেন, কোথাও তাঁর শান্তি নেই। তার ওপর এই ছেলেটা এলেই অশান্তি বাড়ে। আজকাল অবশ্য বড় একটা আসে না, অনেক পরে পরে আসে। অনেক পরে পরে আসা, তাও আবার এদের চোখে অকৃতজ্ঞতা। কোন্ দিকে যাবেন। এদিকে ছেলেমেয়েরা ধারালো কথায় ওঁকে ছিড়ে কেটে টুকরো-টুকরো করবে, ওদিকে গেলে মুখ বুজে পড়ে থাকা বুড়ো মানুষটা ওঁকে কাছে পেলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

দয়াময়ী ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকলেন, ভাবলেন এখনও তো বেলা আছে, তক্তপোশের ওপর একটু গড়িয়ে নেবেন, কিন্তু সুধাময় ওদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থেকে পায়ের শব্দে বা দেয়ালে আলো আড়াল পড়তেই টের পেলেন। শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করলেন, গেছে তোমার পুষ্যিপুত্তুর ?

এই একটা কথায়, বংশী যখন খুব ছোট ছিল, মজা পেতেন দয়াময়ী। এখন রসিকতা নয়, শব্দটা এখন ওঁকে কুরে কুরে খায়।

ও যে গেছে তা না জানার কথা নয়। গ্যেট টানার শব্দেই সুধাময় বুঝতে পেরেছেন।

এমনিতে কেউ গ্যেট খুলতে যেতে চায় না। ওপর-নীচে করার কথা দিন-রাত শুনতে হয়। যেন এই বাড়িটার যাবতীয় অসুবিধের জন্যে ওঁরাই দায়ী। সঞ্জয় তো যেতেই চায় না, অথচ বংশী যেই উঠল, সঞ্জয় ওর আগে আগে গ্যেটের চাবি হাতে দোলাতে দোলাতে এমন তাড়াহুড়ো করে নামল, যেন গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারলেই বাঁচে।

বংশী ওদের হাবেভাবে হয়তো কিছু টের পেয়েছে। ও যে অনাহূত, ওকে যে কেউ পছন্দ করছে না, তা বুঝতে পেরেই হয়তো তাড়াতাড়ি চলে গেল। বছরখানেক আগে যেদিন এসেছিল, সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে গেছে।

কিন্তু ছেলেটাকে দয়াময়ী নিজেও যেন ইদানীং পছন্দ করতে পারছেন না।

বংশী এখন এ বাড়ির অশান্তি।

ঘরের একপাশে দেয়াল ঘেঁসে একটা পুরনো দিনের নক্সা-কাটা খাট, পালিশ পড়েনি বহুকাল। সুধাময় সেটাতেই শুয়ে থাকেন, কখনও বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন পা দুটো লম্বা হাতলের ওপর তুলে দিয়ে, আধ-শোয়া। শোয়া আর বসা, বসা আর শোয়া।

রিটায়ারমেণ্টের পর ক্রমশই গুটিয়ে আসছেন। অনুশোচনা ছাড়া বুড়োদের আর কিই বা করার থাকে !

দয়াময়ী শুয়ে থাকেন এদিকের তক্তপোশে। ওঁর এখনও পুজো আছে, ঠাকুরবাড়ি আছে, হরিসভা আছে। তার ওপর ছেলে মেয়েদের অসুখ-বিসুখ, দুশ্চিন্তা, শুভা এখনও ফিরল না কেন, আরও কত কি।

হ্যাঁ, আরেকটা কাজ আছে। ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতির আয়না মুছে মুছে পরিষ্কার করার চেষ্টা। কখনও সমবয়সী কোনও আত্মীয়স্বজন এলে, কখনও কমবয়েসীদের কাছেই। ফেলে আসা দিনগুলির কথা ফিরিয়ে আনতে পারলে বড় আনন্দ হয়।

—বড় মাসি, মনে আছে তোমার, সেই যে সাক্ষীগোপাল গিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে ? অণিমা, ওঁর মেজবোনের মেয়ে, একদিন মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। আর অনর্গল সেইসব দিনের কথা বলতে বলতে হাসি আর আনন্দে যেন সেই দিনটিতেই ফিরে গিয়েছিলেন দয়াময়ী।

রাতে কি শান্তিতে ঘুমিয়েছিলেন।

—সে সব কবেকার কথা, তুই তো তখন ফ্রক পরিস। দয়াময়ীও হাসতে হাসতে বলেছিলেন অণিমাকে।

ঝুমা তখন কোথায় ! এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে তার কত বছর বাদে। তবু সে-সব দিনের কথা উঠলে ও কাছে বসে আগ্রহ নিয়ে শোনে। শুনছিল সেদিন।

আরেকবার যেতে ইচ্ছে করে দয়াময়ীর। পুরীর রথযাত্রা দেখতে। সাক্ষীগোপালে পুজো দিতে। ওঁর বিশ্বাস, ঠাকুর দেবতা সত্যি, সাক্ষীগোপাল সত্যি, জগন্নাথ সত্যি।

ঝুমাও পুরী বেড়িয়ে এসেছে দু-দুবার। কিন্তু হোটেলে থেকেছে, সমুদ্রে স্নান করেছে, সানরাইজ দেখেছে। পুরীর মন্দিরে গিয়েছিল একবার, দুমিনিটও থাকেনি। মন্দির বলতে ও বোঝে কোনারকের মন্দির।

তাই বলে বসেছিল, সাক্ষীগোপালে কি আছে মা ?

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে আপ্লুত দুটি চোখ বুজে এসেছে দয়াময়ীর।

বলেছেন, এবার যখন যাবে, দেখে এসো। তারপরই বলেছেন, সঞ্জয়কে বলো না। সবাই একসঙ্গে যাই আরেকবার।

ঝুমা হেসে উঠে বলেছে, তবেই হয়েছে ! গড় গড় করে সেই গল্পটা বলে গেছেন দয়াময়ী। —ওখানে গেলে তবেই তো বোঝা যায়, ভগবান আছেন কি নেই। যার ভক্তি আছে তার ভগবানও আছে। বলে চোখ বুজেছেন।

অণিমা আর ঝুমা সেই ফাঁকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে ঠোঁট টিপে হেসেছে।

দয়াময়ী লক্ষও করেননি। বলে গেছেন, শুধু বালি আর বালি, বুঝলে বউমা, সে যদি দেখতে....

একটু বাড়িয়ে বাড়িয়েই বলে ফেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অণিমা হেসে ফেলে বলে, না বড় মাসি, অত বালি কোথায় ? তার চেয়ে....

দয়াময়ী থেমে পড়েন। বলেন, কি জানি, আমার তো মনে হচ্ছে, যতদূর চোখ যায় শুধু বালি...তা একজন গোপালের ভক্ত, কি যেন নাম, গোপালকে সাক্ষী রেখে একজনের কাছে টাকাকড়ি গচ্ছিত রেখে তীর্থ করতে গিয়েছিল।

ঝুমা হাসতে হাসতে বলেছে, তা সেকালে তো লকার ছিল না, তাই বোধহয় অন্য লোকের কাছে রেখে গিয়েছিল, না মা ?

দয়াময়ী কৌতুক হলেও সেটুকু উপভোগ করেছেন। হেসেছেন ঝুমার রসিকতায়। তারপর হাসতে হাসতে বলেছেন, তোমাদের মত আমরা তো আর সবাইকে অবিশ্বাস

করতাম না। পাড়াপড়শির কাছে আমরাও তো বাড়ির চাবি দিয়ে যেতাম, গয়নাগাঁটিও রেখে যেতাম। তারাও কখনও অবিশ্বাসীর কাজ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুমা বলে উঠেছে, তা হলে লক্ষ্মীর মা যখন বাসন মেজে বাড়ি যায়, লক্ষ রাখতে বলেন কেন ?

দয়াময়ী অবাক হয়ে বলেছেন, সে হল অন্য কথা, ভদ্রলোক তো নয়। ওদের ধর্মই হল ...

অণিমা আর ঝুমা শব্দ করে হেসে উঠেছে।

দয়াময়ী অস্বস্তি বোধ করেছেন। ওঁর কথার মধ্যে গলদ কোথায়, মানুষকে বিশ্বাস করতে হলে লক্ষ্মীর মাকেও কেন বিশ্বাস করতে হবে, বুঝতে পারেন না।

ঝুমা জানে, ওঁকে বোঝানোও যাবে না। তাই ওঁর অস্বস্তি কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে বলে, গল্পটাই বলুন মা, শুনি।

এ-গল্প বহুবার শুনেছে ও, তবু শোনার ভান করে। জানে এ-সব বলতে পেলে মা খুশি হন। মন দিয়ে শুনলে ওঁর কাছে প্রিয় হওয়া যায়।

দয়ময়ী অতশত বোঝেন না। সরল প্রকৃতির মানুষ। ধর্মে বিশ্বাস, দেবতায় বিশ্বাস নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাই আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে বলতে শুরু করেন, তা সে লোকটা ফিরে এসে সোনাদানা ফেরত চাইলে পড়শির কাছে। সে বললে, মিথ্যে কথা, কিছু রেখে যাওনি আমার কাছে।

বলে উদাস চোখে চেয়ে রইলেন সামনের জানলার ফাঁক দিয়ে, আকাশের দিকে।

দয়ময়ী যেন দেখতে পাচ্ছেন সব।

পড়শি বলছে, কে সাক্ষী আছে ? লোকটি বলছে, গোপাল সাক্ষী।

—তারপর কি হল জানো বৌমা। পড়শি বলে বসল, কে গোপাল, নিয়ে এসো তাকে।

—তারপর ? যেন কতই কৌতূহল ঝুমার। অণিমার চোখে চাপা হাসি।

দয়ামযীর মুখে কিন্তু তৃপ্তির হাসি। বললেন, গেল সে, পাথরের গোপালের কাছেই গেল। ভক্তিতে কি না হয়, গোপাল সত্যি সত্যি দেখা দিল তার ডাকে।

শুভাও এসে বসেছে তখন। হাসতে হাসতে বললে, তখন ঠাকুর দেবতারা বেশ চটপট এসে হাজির হত, না অণিমাদি। আজকাল হাজার ডাকো, পরীক্ষার খাতায় দুচারটে নম্বর, তাও বাড়াতে চায় না।

অণিমা বললে, চুপ কর, ইয়ার্কি হচ্ছে। বলো বড়মাসি, তুমি বলো গল্পটা।

দয়ামযী টেনে টেনে যেন সুর করে করে বলতে শুরু করেন।

বলেন, সব শুনে গোপাল রাজি হল। বললেন, ঠিক আছে, আমার ওপর যখন এত বিশ্বাস, চলো তোমার সাক্ষি দিয়ে আসব। তুমি যাবে আগে আগে, আমি পিছনে পিছনে। কিন্তু যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে একবারও ফিরে তাকাও, ফিরে তাকিয়ে দেখতে যাও আমি আসছি কিনা, তাহলে আর আমাকে দেখতে পাবে না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে আমি আছি, আমার ওপর বিশ্বাস না রাখলে আমি নেই।

দয়ামযী একটানা অনেকখানি বলে এসে থামলেন। চুপ করে রইলেন। যেন কানে শুনতে পাচ্ছেন। লোকটির পিছনে পিছনে গোপালের পায়ের নূপুর বাজছে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। হয়তো দেখতেও পাচ্ছেন, লোকটি চলেছে, চলেছে, চলেছে। পিছনে নূপুরের শব্দ উঠছে। নূপুর বাজছে, বাজছে।

—তারপর কি হল জানো, ওই যে বললাম, চতুর্দিকে শুধু বালি আর বালি বালি আর বালি। তা নূপুরের মধ্যে বালি ঢুকে গেল, আর নপুরের ঝুমঝুম ঝুমঝুম আওয়াজ গেল

থেমে।

শুভা বলে উঠল, জানি, জানি। সেই তো পুরনো গল্প।

অণিমা ধমক দিল। — চুপ কর। বলো তুমি বড়মাসি।

দয়াময়ী ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বললেন, এ-সব গল্প কি আর পুরনো হয় রে। ঠাকুরদেবতা কখনও পুরনো হয় না।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, নূপুরের আওয়াজ নেই। বালি ঢুকে গিয়েছে নূপুরের মধ্যে। তখন সেই ভক্ত মানুষটাও ভেবে বসল গোপাল আসছে তো ঠিক পিছনে পিছনে ? যেই না সন্দেহ ঢুকল মনে, সে ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেল গোপাল আছে কিনা। ব্যস, অমনি তার চোখের সামনে থেকেই উবে গেল গোপলাঠাকুর।

দয়ময়ী চুপ করে রইলেন, চেয়ে রইলেন উদাস চোখে, যেন নিজের চোখেই দেখছেন দৃশ্যটা।

অণিমা বললে, জানো ঝুমাবউদি, তখন থেকেই ওর নাম সাক্ষীগোপাল।

আর শুভা হেসে উঠে বললে, মা ওখান থেকেই গোপালকে নিয়ে এসেছিল।

সবাই হাসল, দয়াময়ী নিজেও।

প্রথমে গোপাল নামই দিতে চেয়েছিলেন দয়াময়ী।

সকলে এমন ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করল পুষ্যিপুত্তুর পুষ্যিপুত্তর বলে, ওই নাম দিতে আর সাহস পাননি।

বড় আনন্দের দিন ছিল তখন। সুধাময় তখনও চাকরি থেকে অবসর নেননি। দামি স্যুট পরে অফিস যান, ভাল মাইনের সচ্ছল সংসার, লোকে সমীহ করে, বাড়ি রমরম করে নিত্যদিন।

দেয়ালে টাঙানো সুধাময়ের সেই ছবিটা আছে। কিন্তু ধুলো পড়ে পড়ে কাচ ঝাপসা, ফটোখানাও লাল হয়ে গেছে। বহুকাল ওটার দিকে কারও চোখই পড়েনি। এখন আর দামি কোট-প্যান্ট বলে মনেই হয় না, রং উঠে গিয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি হয়ে গেছে।

অনেকগুলো খুচরো পয়সা নিয়ে গিয়েছিলেন দয়াময়ী। যেখানেই ঠাকুর দেবতা সেখানেই তো ভিখিরি। পুজো দিয়ে সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেই সকলে ছেঁকে ধরল। একদিকে সুধাময়ের বিরক্তি, অন্যদিকে দয়াময়ী ছোঁয়া বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে ভিক্ষে দিচ্ছেন। ঝুমা তখনও এ বাড়ির বউ হয়ে আসেনি। সঞ্জয় কলেজে পড়ে, শুভা ফ্রক পরে। ইস্কুলে। ওদের তখন বয়েস কম, খুব রাগারাগি করছিল।

ওদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে অনেকখানি এসে একটা গাছতলায় দেখেন, একটা ভিখিরি বসে আছে। নুলো। দুটো হাতই নেই। গায়ে ঘা। একটা গামছা পাতা আছে তার সামনে, তার ওপর কিছু পয়সা ছড়ানো। আর ভিখিরিটা কাকে যেন চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে।

সুধাময় তাড়া দিলেন, চলে এসো, চলে এসো, এই রোদ্দুরে আর দাঁড়ানো যায় না।

দয়মযী ভিখিরিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখে ঘেন্না হয়, গা রি-রি করে, অথচ দুঃখও হয়। দূর থেকে কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেন গামছার ওপর।

. লোকটার সে-সব দিকে খেয়ালই নেই। অনর্গল গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। কাকে কে জানে।

বাসের কাছে এসে উঠতে যাবেন, আবার একটা ভিখিরি। দয়াময়ী প্রথমে তাই ভেবেছিলেন।

বাঃ, বেশ কলাপাতা কলাপাতা কচি মুখ। সরল আর দুঃখী। গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন

জামা। ভয়-জড়ানো দুটি চোখ।

দয়াময়ীর শাড়ির খুঁটে তখনও কয়েকটা খুচরো পয়সা বাকি আছে।

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে হাত পাতল। সঞ্জয় ধমক দিয়ে বললে, এই, ভিক্ষে করছিস কেন, খেটে খেতে পারিস না ?

ছেলেটা মুখ কাচুমাচু করে বললে, কে দিবে।

সঞ্জয়ের মুখে কোনও কথা জোগাল না। সুধাময় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, তুই বাঙালি ?

—হুঁ। ব্যস, ছেলেটা আর কোনও কথা বলল না।

শুভা তাড়া দিল, ওঠো ওঠো। অর্থাৎ বাসে উঠে পড়ো।

দয়াময়ীর কি হল কে জানে, বলে বসলেন, আমাদের সঙ্গে যাবি ?

ছেলেটা সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

দয়াময়ী প্রশ্ন করলেন, তোর বাবা কোথায় ?

ছেলেটা মাথা হেঁট করে বললে, নাই।

—তোর মা আছে ?

ছেলেটা মাথা তুলল না, মাথা নাড়ল। অর্থাৎ নেই।

—সে কি রে ? বাবা মা নেই। তো কে আছে ?

ছেলেটা এবার মুখ তুলল, দুচোখে জল।

সুধাময় বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তুমি সত্যি ওকে নিয়ে যাবে নাকি ? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ?

দয়াময়ীর কানেও গেল না সে-কথা। বললেন, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে ?

ছেলেটা আশায় আনন্দে অবাক হয়ে তাকাল দয়াময়ীর মুখের দিকে।

হঠাৎ দয়াময়ীর দিকে তাকিয়ে, সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে কান্নার গলায় বললে, আমায় নিয়া চলেন বাবু, চাকর রাখবেন আমায়।

বাসের ভিতর থেকে কে একজন বললে, নিয়ে নিন. নিয়ে নিন, আফটার অল বাঙালির ছেলে।

বাসের কণ্ডাক্টর বললে, নিয়ে নিন মা, নিয়ে নিন। ব্যাটা বেঁচে যাবে।

সুধাময় ইতস্তত করে বললেন, কার ছেলে কিছু জানি না. শেষে ...

বাসের এক ছোকরা যাত্রী হেসে উঠল ওঁর কথায়। বললে, ভিখিরির ছেলেকে ধরে নিয়ে গেলেও কিডন্যাপিং হয় না, কিডন্যাপিং শুধু বড়লোকদের জন্যে।

বাসসুদ্ধ সকলে হাসল।

বাসের কণ্ডাক্টর বললে, রোজ আসি বাবু বাস নিয়ে, সব জানি ওর। ওই ব্যাটা নুলো ভিখিরিটা ওর অধিকারী।

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল, হুঁ, উ আমার অদিকারী।

অধিকারী কথাটার কোনও মানে বুঝলেন না সুধাময়। প্রশ্ন করলেন, ও তোর কে হয় ?

—কেউ না, অদিকারী।

বাসের কণ্ডাক্টর বললে, কেউ না বাবু, কেউ না। খুব গালাগালি দেয় আর দিনরাত খাটায় ছেলেটাকে।

দয়াময়ী ছেলেটাকে বললেন, ওঠ।

সুধাময় অক্ষম রাগে দয়াময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কিন্তু বলে রাখছি, আমার কোনও রেসপনসিবিলিটি নেই। নিয়ে যাচ্ছ, নিজেই ভুগবে।

ছেলেটা সত্যি কথা বলত, না মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল, কেউ জানে না।

সুধাময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করলেন। ওঁর মনে একটা সন্দেহ খিচ খিচ করে বিঁধছিল। খোঁজ খবর না নিয়ে এ-ভাবে ছেলেটাকে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। অথচ না এনে উপায়ও ছিল না। এত বছরের সংসারজীবনে অন্তত এটুকু বুঝেছেন, স্ত্রী জিদ ধরলে তাকে টলানো যায় না। কোনও যুক্তিই তখন আর কাজে লাগে না।

বাচ্চা ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাময়ের নিজেরও মায়া হয়েছিল। কিন্তু মায়া হলেই কি তার জন্যে কিছু করতে হবে? সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। তার জন্যে কোনও ঝুঁকি নেওয়া নিছক বোকামি।

পৃথিবীতে মায়া দয়া দেখানোর মত মানুষই তো বেশি। কত লোককে তুমি দয়া দেখাবে?

একটু একটু করে সব জেনে নিলেন সুধাময়। সত্যি বাপ-মা নেই ছেলেটার, না কি মিথ্যে কথা বলল। একটা খটকা লাগছিল। সকলেই মন্দিরের সামনে ভিক্ষে করছিল, ও কেন তাদের দলে না থেকে, বাসের কাছে একা দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে। নিশ্চয়ই মন্দিরের কাছে ভিখিরিদের ভিড়ে ওর বাবা কিংবা মা ছিল।

তাই সুধাময় জিগ্যেস করলেন, মন্দিরের সামনে সবাই ভিক্ষে করে, তুই সেখানে ভিক্ষে না করে বাসের কাছে এসেছিলি কেন?

সন্ধেবেলা পুরীর সমুদ্রের ধারে ওরা সকলে বসে ছিল। সামনে মাথা নিচু করে ছেলেটা। ওকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। প্রশ্ন শুনে ছেলেটা হাসল। হেসে উঠে বললে, সেথা গেলে মার লাগাবে আমায়, জানো আপনি?

—মার লাগাবে? কেন রে? সঞ্জয় হেসে ফেলে প্রশ্ন করল।

ছেলেটা উত্তর দিল, আমারে ওরা বলে বাহিরি।

ছেলেটা মাথা হেঁট করে লাজুক লাজুক গলায় যা বলল, শুনে অবাক হয়ে গেলেন সুধাময়। ও নাকি বাহিরি। মানে বাইরের লোক।

তাই মন্দিরের সামনের ভিখিরিরা ওকে ওখানে ভিক্ষে করতে দেয় না।

শুনে প্রথমটা সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল, পরক্ষণেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুধাময়। এতদিন জেনে এসেছেন সচ্ছল মানুষদের মধ্যে, চাকরি-বাকরিতেই দেশ আর বিদেশ আছে। ঘর আর বাহির আছে। বহিরাগতদের সম্পর্কে সকলেরই আক্রোশ। কেন বাইরের লোক এসে লুটেপুটে খাবে। কিন্তু জানতেন না, ভিক্ষের এলাকাও এভাবে ভাগ হয়ে আছে। যেখানে দাঁড়ালে বেশি ভিক্ষে পাওয়া যায়, বাইরের ভিখিরির সেখানে দাঁড়ানোর অধিকার নেই, ভিক্ষের জায়গাটাও জমিবাড়ির মতো একটা সম্পত্তি, যাদের কিছুই নেই তাদের কাছেও ওটা বিষয় আশয়।

বাচ্চা ছেলেটা সুমদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। কোনও কথা বলছিল না। হঠাৎ কি মনে হতে হেসে ফেলে বললে, নুলাটা খুব মুখ করবে। বলে হি হি করে হাসল।

নুলো? সেই নুলো ভিখিরির কথা বলছিস? সেই গামছা পেতে বসেছিল।

—হুঁ। মা তো উয়ার কাছেই বিকিয়ে দিয়েছিল আমায়।

চমকে উঠেছেন সুধাময়—বিকিয়ে দিয়েছিল?

একে একে সমস্ত ব্যাপারখানা জেনে নিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শুনে বিশ্বাসই হল না। দয়াময়ীর তো আরও অবিশ্বাস। মা কখনও ছেলেকে বিক্রি করে দিতে পারে!

ছেলেটা অবশ্য নিজেও জানে। নুলোর কাছেই শুনেছে। তার মার কাছ থেকে নাকি কিনে নিয়েছিল। নুলোর তো হাত নেই। হাত নেই বলেই লোকে ভিক্ষে দেয়। কিন্তু

কে তার পয়সা গুনবে, খাবার কিনে আনবে, কেউ পয়সা ছিনিয়ে নিতে এলে পয়সা লুকিয়ে রাখবে। তাই ছেলেটাকে সে নাকি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল তার মার কাছ থেকে। কিন্তু নুলোকে ওর একটুও ভাল লাগত না। সে কেবল গালাগালি দিত। আর ও কেবলই পালিয়ে পালিয়ে যেত।

সুধাময় সব শুনলেন অবাক হয়ে। এমন যে হয়, হতে পারে, জানতেন না। ছেলেটার ওপর এবার সত্যি সত্যি মায়া হল সুধাময়ের। বেদনার গলায় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভালই করেছ তা হলে। ওকে না নিয়ে এলে বেচারা সারা জীবন হয়তো একটা ভিখিরির চাকর হয়ে থাকত।

দয়াময়ী বললেন, আমি যা করি ঠিকই করি।

শুভা হেসে উঠল মার কথায়।

শুধু সঞ্জয়, বোধহয় মাকে রাগাবার জন্যেই, বললে, একজনের উপকার করতে গিয়ে কিন্তু আরেকজনের অপকার করলে।

—হোক অপকার। দয়াময়ী বললেন।

কিন্তু কথাটা শুনে সুধাময়ের সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কে জানে। সুধাময়ের মনে হল পৃথিবী যেন বড় বেশি জটিল। একটার সঙ্গে আরেকটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে। জট ছাড়ানো যায় না।

ওর মা সত্যি ওকে বিক্রি করে দিয়ে গেছে? কিন্তু কেন? হয়তো ভেবেছে ভিক্ষে করে দু-বেলা খেতে পাবে। নুলোকে দেখে লোকে দয়া দেখাবে, ভিক্ষে দেবে। আর সেই ভিক্ষের পয়সায় ছেলেটা খেতে পাবে। কিন্তু সেখানেও ও বাহিরি, মানে বাইরের লোক। মন্দিরের সামনে গিয়ে ভিক্ষে করতে পারবে না। কিন্তু এখন ওই নুলো ভিখিরিটা কি করবে? ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে তো নুলোকে ওরা আরও অসহায় করে দিয়ে এসেছে।

একটা ছোট্ট ঘটনা, তুচ্ছ ঘটনা। অথচ, সুধাময়ের মনে হল, কি সাংঘাতিক জটিল। কি দুর্বিষহ। দুটো হাত না থাকলে কৃপার পাত্র হয়েই তাকে বাঁচতে হবে। তার ওপরই একটা সবল সুস্থ ছেলেকে নির্ভর করতে হবে দুবেলা দু-মুঠো অন্নের জন্যে, যার মা টাকার লোভে কিংবা নিস্তার পাবার জন্যে তাকে বিক্রি করে দিয়ে যায়। মন্দিরের সামনে ভিক্ষের জায়গাও হয়ে ওঠে বিষয়সম্পত্তি। আর সেই ভিক্ষুকদের মধ্যেও ভাষার দ্বন্দ্ব, স্ববাসী আর প্রবাসী, ঘরোয়া আর বাহিরি। সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ছেলেটা বাঙালি বলেই কি এত দয়ামায়া? নাকি যে-কোনও ছেলের ওই রকম করুণ মুখ দেখলে সমান দুঃখ হত? তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন?

কিন্তু সঞ্জয়ের কথায় একটা হাল্কা ভাব থাকলেও ওঁকে ভাবিয়ে তুলল।—একজনের উপকার করতে গিয়ে তো আরেকজনের অপকার করলে। সত্যি। ওই নুলো ভিক্ষুক এখন কার ওপর নির্ভর করবে? পরস্পরের ওপর নির্ভর করে ওরা নিশ্চিন্ত ছিল। একজন কৃপা আদায় করতে পারে, উপার্জন করতে পারে। আর ওই ছেলেটা একা একা ভিক্ষে করতে গেলে হয়তো দয়া পেত না, কিংবা ওই ভিক্ষুকের দল ওকে তাড়িয়ে বেড়াত। বাহিরি! বাহিরি।

সুধাময়ের মনে হল, তবু ছেলেটাকে নিয়ে এসে ভালই করেছেন। জীবনে একটা ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেছেন। হঠাৎ কেমন একটা আদর্শের স্পন্দন অনুভব করলেন বুকের মধ্যে।

—নিয়ে নিন মশাই, নিয়ে নিন। আজকাল কাজের লোক পাওয়া যা ঝামেলা। বাসের একজন যাত্রী হাসতে হাসতে বলেছিল।

কথাটা একটুও ভালো লাগেনি সুধাময়ের। মানুষ স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই যেন ভাবতে

পারে না। এই রকম করুণ কোমল মুখের একটি বাচ্চা ছেলে, সমুদ্রতীরের ভিজে বালির মত গায়ের রং। বড় বড় ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ।

ছেলেটার নামটা বড় অদ্ভুত।

সবাই একবার করে জিগ্যেস করেছে। বলে না, শুধু লাজুক লাজুক হাসে। যেন নামটা উচ্চারণ করতেও অস্বস্তি।

শুভা আবার জিগ্যেস করল, কি নাম তোর বল্ না ?

ছেলেটা দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বললে, কি জানি।

দয়াময়ী এবার কড়া সুরে বললেন, নাম বল্, তা না হলে কিন্তু নিয়ে যাব না।

ছেলেটার এর মধ্যেই একটু অধিকারবোধ জন্মে গেছে। মাথা তুলে, মাথা দুলিয়ে বললে, উঁ, আমি পিছু ছাড়বনি।

দয়াময়ীও হেসে ফেললেন। আদর করে বললেন, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব, নাম বল আগে।

ছেলেটা সঙ্কোচের সঙ্গে লাজুক হেসে বললে. সব্বাই ডাকে হাতুয়া, জগন্নাথের হাতুয়া।

সকলে হেসে উঠল নাম শুনে। ছেলেটা আরও লজ্জা পেল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, নাম লয়। উই নুলার নাম জগন্নাথ। উয়োর হাত নাই, তাই আমায় ডাকে হাতুয়া। উয়ার হাত। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

সুধাময়ও হেসে ফেললেন। বাঃ বাঃ, দিব্যি নাম। ঠুঁটো জগন্নাথের হাত। ঠিকই তো, ওই হাত তার খাবার এনে দেয়, পয়সা গোনে, আবার ওই হাত নিজের খাবার পায় ওই ঠুঁটোর দৌলতেই।

সঞ্জয় বললে, একজন কিছুছু না করে একসপ্লয়েট করছে, আরেকজন তার প্যারাসাইট।

সুধাময় ছেলের কলেজে পড়া এই সব খোঁচা দেওয়া কথাকে কোনও পাত্তা দেন না।

চুপ করে রইলেন।

আর দয়াময়ী বললেন, না না, ওই সব হাতুয়াটাতুয়া চলবে না। ওর একটা ভালো নাম দাও। ওকে আমি মানুষ করে তুলব।

—তুমি তো বিশ্বসুদ্ধ সবারই নাম বদলে দিচ্ছ। শুভা হাসতে হাসতে বললে।

—আবার কার নাম বদলে দিলাম ? দয়াময়ী বুঝতে পারলেন না।

সঞ্জয় মনে পড়িয়ে দিল। —কেন মধুসূদনের ?

সুধাময় বললেন, আবার সূদন জুড়ছিস কেন, ও তো শুধুই মধু।

সবাই হাসল।

আসলে এর একটা ইতিহাস আছে।

বাড়িতে যে নতুন চাকরটা এসেছে তখন, তার নাম জিগ্যেস করতে বলেছিল, মধুসূদন।

দয়াময়ী তাকে ডাকতে শুরু করেছিলেন মধু বলে।

সে একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়েছিল, মা, আমার নাম মধুসূদন। তার কথাবার্তা বেশ পরিষ্কার, কাজকর্মও বেশ পরিচ্ছন্ন।

অতবড় নাম দয়াময়ীর মুখে আসেনি। কিংবা ও-নামে ডাকতে ইচ্ছে হয়নি।

সঞ্জয়ের সামনে রসিকতা করে বলেছিলেন, চাকরবাকরকে মধুসূদন বলে ডাকা যায় নাকি।

সঞ্জয়ের আবার অন্য আপত্তি। —চাকর বলছ কেন ? কাজের লোক বললেই তো

পারো।

অথচ ওই সঞ্জয়ই ওর মধু নামটাও বদলে দিয়েছিল। মধুও নয়, মধু থেকে হয়ে গিয়েছিল মাধো। চাকরকে কাজের লোক বলে একদিকে তার মর্যাদা বাড়াতে চেয়েছে, অন্যদিকে চাকরের নাম মধু রাখতেও আপত্তি। মাধো হলেই যেন মানায়।

কিন্তু এই কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চা ছেলে হাতুয়াকে তো দয়াময়ী বাড়ির চাকর করে রাখতে চান না। সুধাময় বলেছেন, ওকে মানুষ করতে হবে।

সারা জীবন শুধু চাকরি করে চলেছেন সুধাময়, আয় আর ব্যয়ের হিসেব মেলাতেই অস্থির থেকেছেন সারা জীবন। হয়তো মনে হয়েছে, জীবনে একটা কিছু করা দরকার। একটা অনাথ অসহায় বালককে বড় করে তুলতে পারলে, মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে নিজের জীবনই সার্থক মনে হবে।

ওঁরই ওপরওয়ালা এক অফিসার, চাকরিতে অনেক ওপরের পোস্টে উঠেছিলেন, অনেক মাইনে। রিটায়ারমেন্টের বছর কয়েক পরে হঠাৎ একদিন এসে হাজির, হাতে একখানা বই, ছাপিয়ে বের করেছেন। বললেন, সারাজীবন শুধুই তো চাকরি করেছি, ভাবলাম জীবনে একটা কিছু করে যাই। বইটা দিয়েছিলেন সুধাময়কে। আর সুধাময়ের মনে হয়েছিল জীবনে কোনদিন ওঁকে এত সুখী দেখেননি।

একটা কিছু করে যাই। এক একজন মানুষের হয়তো এ-রকম ইচ্ছে হয়।

যেমন সুধাময়েরও ইচ্ছে হয়, হল।

দয়াময়ী তো নিছক হাতুয়ার মুখ দেখে, কিংবা ওর অসহায় দুঃখ দেখে কষ্ট পেয়েছেন। ওর কষ্ট কমাতে পারলেই সুখী। কিন্তু সুধাময় চান, জীবনে একটা কিছু করতে। অন্তত এই ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে। তা হলে যেন নিজের জীবনই সার্থক হয়ে উঠবে।

না, দয়াময়ীও বোধহয় ওকে মানুষ করতে চান।

বললেন, না না, হাতুয়া নয়। অন্য ভাল নাম দিতে হবে।

তারপর নিজেই বলে উঠলেন, বংশী। সাক্ষীগোপাল গিয়ে পেয়েছি ওকে, গোপালের নামে নাম দেব বংশীধর।

সঞ্জয় শব্দ করে হেসে উঠল।

দয়াময়ী লজ্জা পেলেন।

সেই বংশী আজ এসেছিল। এখন বংশী এ-বাড়িতে এলেই এক অস্বস্তি।

॥ ৩ ॥

সুধাময় ভেবেছিলেন বংশীকে গড়েপিটে মানুষ করে তুলবেন।

ওকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এই বাড়িতে। আর দু-দিনের মধ্যেই বাড়িসুদ্ধ সকলের কাছে বংশী হয়ে উঠল যেন একটা মজার খেলা। ওর কথা, ওর বোকামি, ওর অবাক চোখে সবকিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা, সবই যেন কৌতুকের বিষয়।

সঞ্জয়েরও মায়া পড়ে গেল ছেলেটার ওপর। যেন বংশীর দায়দায়িত্ব সঞ্জয়েরও।

বাসের একজন যাত্রী ঠাট্টা করে বলেছিল, নিয়ে যান মশাই, নিয়ে যান, আজকাল চাকরবাকরের যা অভাব।

ঠাট্টা করে বলেছিল, না সরলভাবে, তা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু কথাটা বিদ্রূপ হয়েই

এসে লেগেছিল। তাই সঞ্জয় প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল, ও যেন সত্যি সত্যি গৃহভৃত্য হয়ে না যায়।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই ও যা-কিছু দেখেছে অবাক হয়েছে।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে শুভা দেখিয়েছে। এই দ্যাখ গঙ্গা!

গঙ্গা! ড্রাইভারের পাশে বসে ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে। তাকিয়ে দেখেছে দুপাশের বাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকাতা শহর, ট্রামগাড়ি, বাস, লোকের ভিড়।

দু-চোখ মেলে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠেছে, নুলা জেবনভর ওইখানে, কলকেতা দেখে নাই।

ওরা হেসে উঠেছে। সঞ্জয় প্রশ্ন করেছে, কি রে, নুলোর জন্যে তোর মন কেমন করছে নাকি?

বংশী লজ্জা পেয়ে মিটমিট করে হেসেছে। তারপর বিড়বিড় করে বলেছে, দিনভর গালি দিত আমারে, বুঝ অখন। আমারে চোর বলত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, হাতুয়া নাই, খাতে পাবে না।

সঞ্জয় বুঝতে পারল, ছেলেটার এক একবার নুলো ভিখিরিটার কথা মনে পড়ছে। তার কথা ভেবে মায়া হচ্ছে, আবার তার বিরুদ্ধে একটা চাপা রাগও আছে।

শুভা সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, ওর জন্যে দু-দুটো লাইফবয় সাবান দরকার বাবা। একটা ওকে পরিষ্কার করার জন্যে। আরেকটা ওই নুলোফুলোর কথা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্যে।

সুধাময় সায় দিলেন, ঠিক বলেছিস।

সত্যি সত্যি ওকে সাবান ঘসে ভদ্র করে তোলার ব্যবস্থা হল পরের দিনই। যেন খড় আর কাদা থেকে একটা মূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা।

এল সাবান, এল হাফ-হাতা কামিজ, গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট।

দয়াময়ী সাবানটা মাধোকে দিয়ে বললেন, ওকে ভালো করে ঘসে মেজে পরিষ্কার করে দে মাধো।

শুভা হেসে বললে, সাবান কি হবে, আগে ছাই দিয়ে মাজতে বলো।

এমনিতেই ধুলোকালি মাখা চেহারা, তার ওপর ট্রেনে এসেছে। হয়তো সেই ক্লান্তির জন্যেও ওকে আরও বেশি নোংরা লাগছিল। তার ওপর রুক্ষ জট পাকানো চুলে কান ঢাকা পড়ে গেছে।

দয়াময়ী বললেন, চুল তো নয় কাকের বাসা। নাপিত ডেকে চুলগুলো কাটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল মাধোকে নিয়ে। ওর ছেঁড়া নোংরা জামা কাপড় দেখে মাধো ভেবে নিয়েছিল বাবুরা ওকে নিয়ে এসেছেন বাচ্চা চাকর হিসেবে। দয়াময়ী সাবান ঘসে ওকে পরিষ্কার করে দিতে বলতেই মাধো বলে বসল, ওকে ছুঁতে ঘেন্না, সাবান ঘসবে! যা ব্যাটা নিজে চান করে নিবি যা।

ওদিকের বারান্দায় বসেছিলেন সুধাময়। শুনতে পেলেন ওর কথা।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় রেগে গেলেন। চিৎকার করে ডাকলেন, মাধো!

মাধো শুনেও না শোনার ভান করল। ডাক শুনেও ওদিকে গেল না।

আর সুধাময় ও প্রান্ত থেকেই চিৎকার করে বললেন, ওকে বলে দাও, বংশী এ-বাড়ির চাকর নয়। মাধো যেন ওকে ওভাবে কোনদিন কথা না বলে।

ধমক শুনে মাধো বিড়বিড় করল। কিন্তু ওকে স্নান করিয়ে দিতে রাজি হল না।

মাধো যতই তাচ্ছিল্য দেখাক, আর যতই না ওর আপত্তি থাক, দুদিনেই বংশীর

চেহারাটা বদলে গেল।

নাপিত ডেকে চুল কাটানো হল, চুলে তেল পড়ল। গায়ে জামা, প্যান্ট।

সঞ্জয় ওর দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেল।—শুভা দ্যাখ দ্যাখ, বংশীকে দেখে একেবারে ভদ্রঘরের ছেলে মনে হচ্ছে।

ওর কথা শুনে বংশী নিজেও হেসে ফেলল। বললে, ধুস, আমি তো হাতুয়া, নুলা অদিকারীর হাতুয়া!

আসলে ও নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বোধহয় সবই ওর কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। যেন যে-কোনও মুহূর্তে স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

সঞ্জয়ের কাছেও। স্বপ্নই তো।

সেই জট পড়ে যাওয়া রুক্ষ চুল, নোংরা ইজের আর শতচ্ছিন্ন ময়লা জামা গায়ে ছেলেটা যেন রাতারাতি বদলে গেছে। এতদিন ও ছিল একজন নুলো ভিখিরির হাতুয়া চাকর, ওর মা ওকে বেচে দিয়ে গেছে...আর এখন ও যেন অন্য মানুষ। সঞ্জয়ের কিনে আনা সস্তা ছিটের চেক-চেক একটা নতুন হাফ-হাতা শার্টে ওর এখন অন্য চেহারা।

সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে সকৌতুকে দেখল ওকে। সকলের চোখে তৃপ্তির হাসি।

শুধু সঞ্জয় বললে, দ্যাখ শুভা দ্যাখ। তুই তো বিশ্বাস করতিস না। মাত্র ক'টা টাকায় একটা মানুষ কত বদলে যায়।

শুভাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবু বিদ্রূপের স্বরে বললে, হ্যাঁ রে দাদা, ঠিকই। কিন্তু যতক্ষণ না কথা বলছে ততক্ষণ, একবার মুখ খুললেই ...

আর সত্যি সত্যি কথা বলে বসল ও। সেই গ্রাম্য টান। —বাবুদের পারা নাগছে আমারে, না দাদাবাবু?

শুভা হেসে উঠল। —দেখলি তো?

সঞ্জয় ধমক দিল বংশীকে। বললে, শুধু জামাকাপড় পরলেই বাবুদের পারা হয় না, বুঝলি? ওইসব কথা ছাড়তে হবে তোকে।

বংশী বুঝতে পারল না। বোকা বোকা চোখ মেলে প্রশ্ন করলে, কথা কইবনি? কি গোঙা হই থাকব নিকি?

শুভা চোখ পাকিয়ে বললে, আমাদের কথা বলবি বুঝলি? 'পারা' 'নিকি' ওসব চলবে না।

বংশী হাসল। একবার তাকাল শুভার মুখের দিকে, একবার সঞ্জয়ের মুখের দিকে। তারপর লাজুক লাজুক মুখ করে বললে, হায় কপাল, ইখানেও আমি বাহিরি হলাম দাদাবাবু! হেসে উঠল।

সঞ্জয় ওর কথা শুনে থমকে গেল। বাহিরি, বাহিরি। বাইরে থেকে এসেছে। বাইরের লোক। কিংবা বিদেশি। কি মানে কে জানে। কোথাও যেন তাদের ঠাঁই নেই। সেই সাক্ষীগোপালের ভিক্ষুকের দল মন্দিরের সামনে ওকে ভিক্ষে করতে দেয়নি। আবার সঞ্জয়রাও ওকে ওর ভাষা বলতে দেবে না। কারণ ওকে ওরা মানুষ করে তুলতে চায়। কারণ ওর ওপর ওদের প্রচণ্ড মায়া। ওই সরল গ্রাম্য মুখের উপর।

সুধাময় বোধহয় ওদিকের বারান্দায় বেতের আর্মচেয়ারে শরীর এলিয়ে ওদের কথা শুনছিলেন।

সেখান থেকেই বললেন, সব হবে, সব হবে। এখনই ওর পিছনে লাগছিস কেন।

অর্থাৎ এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। একটা ছেলেকে রাতারাতি বদলে দেওয়া যায় না। পোশাক বদলে দিয়ে তার চেহারাটাই বদলে দেওয়া যায়। তার কথার টানে পালিশ চড়িয়ে বড়জোর তাকে শহুরে করা যায়। কিন্তু একটা ছেলেকে মানুষ করে

তোলার জন্যে যে কত ধৈর্য আর অধ্যবসায় লাগে সুধাময়ই জানেন, ওরা কি করে জানবে।

কিন্তু সমস্যা মাধোকে নিয়ে। মধুসূদন এ-বাড়ির মাধো হয়ে গেছে, এবাড়িতে না হলে অন্য বাড়িতেও হত। তাই বোধহয় তার মনের মধ্যে একটা চাপা রাগ, কিংবা ঈর্ষা, কিংবা বিদ্বেষ। ও তো দেখেছে বংশীর আসল চেহারা। কালিঝুলি মাখানো শতচ্ছিন্ন জামা আর ইজের, জটপাকানো রুক্ষ চুলের মুখ।

মাধো কথা বলত যেন হুকুমের স্বরে। যেন নুলোর কাছ থেকে এসে এখন বংশী ওর জিম্মায়। মাধোই যেন এখন ওর অধিকারী।

কথাটা একদিন বংশীই বলে বসল।

ছেলেটা এ-বাড়ির ভালবাসা পেয়েছে, স্নেহ পেয়েছে। তার জন্যে ওর চোখে সদাসর্বদা একটা কৃতজ্ঞতার আভা। কিন্তু এটুকুও বোঝে, এ-সব যেন ওর পাওনা নয়। ও তো নেহাতই একজন হাতুয়া। তাই সব সময়ে চেষ্টা, কিছু কাজে লাগা, ফাই ফরমাস খেটে দেওয়া।

বাড়িতে থাকলে দু-একটা কাজ তো বাড়ির ছেলেকেও করতে হয়। সুধাময় তাই আপত্তি করতেন না।

সিগারেট আনার জন্যে মাধোকে ডাকলেই বংশী হাসিহাসি মুখে এসে বলত, দিন বাবু, আমি এনে দিচ্ছি।

এনে দিত।

কিন্তু তা বলে মাধো ওকে হুকুম করবে এটা কেউ সহ্য করবে কেন।

একদিন সিঁড়ির তলায় চেঁচামিচি শুনে দয়াময়ী ছুটে গেলেন।

—কি রে, কি হয়েছে ?

সঙ্গে সঙ্গে বংশী বলে উঠল, উ কি আমার অধিকারী বটে, হুকুম করতিছে, কয়লা ভাঙতি হবে।

এর আগেও একদিন এই কাণ্ড ঘটেছিল।

দয়াময়ী নীচে গিয়ে দেখেন রান্নাঘরের পাশে যেখানে কয়লা রাখা থাকে, সেখানে বসে হাতুড়ি মেরে বড় বড় পাথুরে কয়লাগুলো ভাঙছে বংশী।

—মাধো আমারে ভাঙতি বললে।

দয়াময়ী সেদিন মাধোকে ধমক দিয়েছিলেন, বংশীকে টেনে তুলে এনেছিলেন। বলেছিলেন, আর কোনদিন এ-সব করবি না। এ-সব তো মাধোর কাজ।

তাই সর্বক্ষণ ওকে পাহারা দিতেন।

দয়াময়ীকে দেখতে পেয়ে বংশীর গলার জোর বাড়ল। চিৎকার করে বললে, দ্যাখেন আপনি, ফের কয়লা ভাঙতি বলছে।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন দয়াময়ী, ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় ডাকলেন, মাধো।

মাধো সিঁড়ির নীচে থেকে মাথা বের করে তাকাল হাসি-হাসি মুখে।

দয়াময়ী বললেন, তোকে বলেছি না, ও এ-বাড়ির চাকর নয়।

মাধো জবাব দিল, চাকর নয় তো কি বাবু ? বলে হাসল।

দয়াময়ী কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। এরপর রাগারাগি করে কিছু একটা বললে মাধো হয়তো কাজ ছেড়ে চলে যাবে। সে এক সমস্যা।

তাই বংশীকে বললেন, চলে আয়, তুই ওপরে চলে আয়।

বংশী ওপরে চলে এল।

কিন্তু তাকে নিয়ে যে এতরকম সমস্যা হবে জানতেন না।

সকলেরই যেন বংশীর ওপর লোভ, বংশীর ওপর রাগ। তার ফলে দয়াময়ী কিংবা সুধাময়ের ওপরও।

একদিন দয়াময়ীর ছোটবোন বেড়াতে এসেছে। বেড়াতে আসার কারণও জানা গেল।

এসেই বললে, কাজের লোক পাচ্ছি না রে দিদি। মিনুকে ইস্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা, ওর আপিসের রান্না, আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই বংশী এসে দাঁড়াল, অবাক চোখ মেলে দেখল।

দয়াময়ী হেসে বংশীকে বললেন, তোর ছোটমাসি।

শেখানো হয়েছিল বলেই বংশী টিপ করে প্রণাম করল। এক মুখ হাসল।

দয়াময়ীর ছোট বোন বিনু, বিনতা অবাক হয়ে বললে, ওমা, এ সেই ছেলেটা? সাক্ষীগোপাল থেকে এনেছিলি?

দয়াময়ী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ। তাকিয়ে দেখলেন বংশীকে। ফিটফাট জামাকাপড়ে ও তখন রীতিমত ভদ্রঘরের ছেলে হয়ে উঠেছে। কথার টান অনেক বদলে গেছে।

বিনু বলে বসল, ওকে দে দিদি, তোর তো মাধো রয়েছে, ঠিকে ঝি রয়েছে।

দয়াময়ী হেসে উঠলেন। বললেন, তোর জামাইবাবু ওকে রোজ পড়ায়, ওকে মানুষ করে তুলবে।

বিনতা বলে বসল, বেশ তো, আমিও পড়ার ব্যবস্থা করে দেব, ফাইফরমাস খাটবে। ভাল মাইনেও দেব।

দয়াময়ী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, না না, তা হয় না।

বিনতার ভুরু কুঁচকে গেল। অসন্তুষ্ট হল সে। তবু সেটুকু গোপন রেখে বংশীকে বললে, এই, তুই যা তো এখান থেকে।

বংশী চলে গেল।

আর বিনতা প্রশ্ন করে বসল, তুই ওকে কত মাইনে দিস রে দিদি?

—মাইনে? দয়াময়ী অবাক হয়ে গেলেন।

বিনতা বললে, অ। বলে হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল।

বিনতা চলে যেতেই দয়াময়ী কেমন বিভ্রান্ত বোধ করলেন। নিজেকে অসহায় লাগল। মনে মনে ভাবলেন, কি আশ্চর্য, বিনুও আমাকে এত স্বার্থপর ভাবছে, এত ছোট মনে করছে। তা হলে তো সকলেই তা মনে করবে।

একটা বাচ্চা ছেলে, শ্যামলা রঙের একটা মোলায়েম মুখ, দুটো বড় বড় সরল চোখ, দেখে মায়া হয়েছিল, সেজন্যেই তো নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। ওকে বাঁচাতে ইচ্ছে হয়েছিল, ওকে বাঁচতে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ এই সহজ ব্যাপারটা বিনুও বুঝল না। বিশ্বাস করল না।

সুধাময় আর্ম-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আর মেঝেতে বসে জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে দয়াময়ী বললেন, বংশীকে নিয়ে যত সমস্যা।

—কেন? কেন? মুখের ওপর থেকে ডানা মেলা কাগজখানা সরিয়ে সুধাময় প্রশ্ন করলেন।

আর দয়াময়ী বললেন, বিনুও ভেবেছে আমরা একটা বিনা মাইনের চাকর পেয়েছি। ওকে চাইছিল, বলে কিনা ভাল মাইনে দেব।

একটু থেমে বললেন, সবারই এত ছোট মন কেন বলো তো?

সুধাময় হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, মানুষ যে ভিতরে ভিতরে সত্যিই খুব ছোট। কখনও-কখনও হঠাৎ একটা ভাল কাজ যখন তার করতে ইচ্ছে হয়, সবাই ভাবে স্বার্থের জন্যে করছে।

চুপ করে রইলেন সুধাময়। দয়াময়ী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন মানুষটা ভিতরে ভিতরে অপমানিত বোধ করছে, রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে। ভাবলেন, না বললেই ভাল ছিল।

সুধাময় শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, নীচ স্বভাবটাই বোধহয় মানুষের কাছে স্বাভাবিক। স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না বলেই সব জায়গায় স্বার্থ দেখে। তুমি তো জান, সেই যে আমাদের আপিসের নবেন্দু, সে বেকার বন্ধুকে নিয়ে একটা দোকান করেছিল। আমি দু-একবার গিয়েছি তার দোকানে, দু-একটা উপদেশ-টুপদেশ দিতাম, সকলে কি ভেবে বসল জান, আমি নাকি তার ব্যবসার পার্টনার।

বলে সশব্দে হাসলেন সুধাময়। আসলে ওদের তো দোষ নয়। স্বার্থ ছাড়া এক পাও যারা এগোয় না, তারা কি করে ভাববে কেউ নিঃস্বার্থ হতে পারে। কিন্তু সেই সব মানুষ তো কখনও-কখনও পরের উপকারও করে।

কথাগুলো সুধাময় হয়তো মনের ক্ষোভ থেকেই বললেন, কিন্তু দয়াময়ীর মনে হল যেন বিনুর সম্পর্কেই বলছেন। হাজার হোক বিনু তো ওর ছোট বোন। একটা কথা হয়তো বলেই ফেলেছে সে, আঘাত পেয়েছেন দয়াময়ী, কিন্তু স্বামীকে সে-কথা না বললেই ভাল করতেন। মনে মনে ভাবলেন দয়াময়ী।

তাই ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্য বললেন, না না, বিনু অবশ্য সে-ভাবে বলেনি। আমার ভয় হচ্ছে বংশীকে নিয়ে।

সে ভয় সুধাময়েরও।

উনি তো ভাবছেন ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবেন। বড় হয়ে ও যেন ভদ্র জীবন তৈরি করতে পারে। কিন্তু পদে পদে বাধা। পাখি হলে তবু খাঁচায় আটকে রাখা যায়, শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাঁচানো যায়। বংশীকে উনি বেড়া দিয়ে দিয়ে কতদিন রাখবেন!

বাড়ির মধ্যেই তো ওর সবচেয়ে বড় শত্রু মাধো। আসলে এটা কি ওর ঈর্ষা? অথবা মাধোও ভাবছে আমাদের কোনও স্বার্থ আছে।

একদিন বংশী বলে বসল দয়াময়ীকে, মা, ইখানে চায়ের দোকানে নাকি বিশ-তিরিশ টাকা মাইনা দেয়?

সুধাময় শুনতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, কে বলেছে?

বংশী হেসে বললে, মাধোদাদা।

শুভাও বসেছিল। কানে লাগল তার। বললে, মাধোদাদা আবার কবে থেকে শুরু করলি। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, দেখছ তো, যত খারাপ বুদ্ধি ও-ই দিচ্ছে।

আরেকদিন সুধাময় ওকে পড়াচ্ছিলেন, একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে ইস্কুলে ভরতি করে দেবেন ভেবেছেন, সুধাময়ের ভাই বেড়াতে এসে বলে গেলেন, কেন পণ্ডশ্রম করছ ওর পিছনে, দেখবে দুদিন বাদেই ভেগে যাবে।

বংশী শুনল, লজ্জায় কিংবা লাঞ্ছনায় মাথাটা নুয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বললে, না বাবু, আমি কুত্থাও যাব না।

সঞ্জয় রসিকতা করে বলত, বাবার পিগম্যালিয়ন।

শুভা ঠাট্টার ছলে বলত, মায়ের পোষ্যপুত্তুর।

কিন্তু ওরা সকলেই উঠে পড়ে লেগেছিল বংশীকে একেবারে বদলে ফেলতে। তবে

বদলে ফেলব বললেই তো বদলে ফেলা যায় না।

প্রথমেই একটা- সমস্যা দাঁড়িয়েছিল ওর শোয়ার জায়গা নিয়ে। প্রথম প্রথম ওর শোয়ার জায়গা হয়েছিল সিঁড়ির তলায়, মাধোর কাছে। একটা পুরনো তোশক আর বালিশ দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বংশী একদিন বলে বসল, আমি মাধোর কাছে শোবনি।

শুভা ধমক দিয়ে বললে, শোবনি নয়, বল শোব না।

সঞ্জয় টিপ্পনী কাটল, বোঝো এবার।

না, এ-বাড়িতে শোয়ার জায়গার কোন অভাব নেই। নীচের তলার ঘরগুলো তো তালাবন্ধ পড়ে থাকে। একটা ছোট্ট কুঠরি-মত আছে রান্নাঘরের পাশে, সেখানেও শুতে দেওয়া যায়। কিন্তু ছেলেটার ভীষণ ভূতের ভয়। ওকে বুঝিয়েও কোনও ফল হয়নি। ওর ধারণা ভূত আছে, আর তার হাত দুটো এত এত লোকের মধ্যে ওই বংশীর গলা টিপে ধরার জন্যেই নিসপিস করে।

শেষ অবধি দয়াময়ী বললেন, বেশ, তাহলে তুই ভিতরের বারান্দাতেই শুবি।

সুধাময় ও দয়াময়ী যে ঘরে থাকেন তার পাশেই একফালি বারান্দা আছে। ব্যবহার করা জামাকাপড় রাখার একটা আলনা রাখা আছে সেখানে। দিব্যি শুতে পারে, ভয়ও পাবে না। পাশের ঘরেই তো ওঁরা রয়েছেন। এখন গরমকাল. শীত পড়লে তখন অন্য উপায় ভাবা যাবে।

এভাবেই ও দোতলায় উঠে এল।

সুধাময় বললেন, ভালই। ও ভয় পেলে আমাদের ডাকতে পারবে, আমাদের দরকার পড়লে ওকে ডাকতে পারব।

বংশী অবশ্য অনেক সময় ডাকার অপেক্ষা রাখত না। ফাইফরমাস দু-একটা খেটে দিতে পারলেই যেন ওর তৃপ্তি। দোকান থেকে কিছু একটা আনতে হবে, মাধোকে ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না, বংশী হাত বাড়িয়ে বলত, দিন মা, আমি একছুটে এনে দিচ্ছি। বাড়ির টুকিটাকি কাজও করে দিতে চাইত।

করতে দিতেনও দয়াময়ী। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও তো করে। বিনুর মত কেউ যদি ভেবে বসে বিনা মাইনের কাজ করাচ্ছি, তা ভাবুক।

নতুন শোয়ার ব্যবস্থা শুনে সঞ্জয় বললে, একদিক থেকে ভালই, মাধো রাত্তিরে ওর কানে কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না। তা না হলে কোথায় কত মাইনে সে-কথাই শোনাবে।

তারপর হেসে ফেলে বললে, ক্লাশ-ইন্টারেস্ট, না রে শুভা ? মাধো ভাবছে আমরা ওকে নষ্ট করছি, ভবিষ্যতে সেই তো খেটে খেতে হবে, তাই রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

শুভা বললে, তা না হতেও পারে, ও হয়তো চায় না একটা গরিবের ছেলে লেখাপড়া শিখে ওর চেয়ে উপরে উঠে যাক।

এভাবেই চলছিল।

সকালের দিকে সুধাময় ওর দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না। অফিসের তাড়া থাকে সে-সময়। স্নান খাওয়া সেরে নিয়ে নটার সময় রাস্তার মোড়ে গিয়ে হাজির হতে হয়। সেখানে অফিসের বাস আসে, তুলে নিয়ে যায়।

সে-সময় বংশী ওঁর হাতের কাছে এটা-ওটা জুগিয়ে দেয়। সুধাময়ের খুব বশম্বদ ও। একদিন জুতোজোড়া টেনে নিয়ে পালিশ করে দিল।

সুধাময় ঠাট্টা করে বললেন, কি রে বংশী, মাস্টারের মাইনে দিচ্ছিস ?

বংশী হি হি করে হেসে উঠল।

সকালে সময় পান না সুধাময়। কিন্তু সন্ধেবেলায় ফিরে এসে মাঝেমাঝেই ওকে নিয়ে

'ড়াতে বসান। যেদিন নেহাত ক্লান্ত লাগে, অথবা কাজ থাকে, সেদিন অবশ্য বলেন, তুই বাবা নিজে নিজে পড়, না বুঝতে পারলে জিগ্যেস করে নিবি।

বয়েস হচ্ছে বলে এখন আর সে-ভাবে পড়াতে পারেন না। কিন্তু একসময় সঞ্জয়কে নিজেই পড়িয়েছেন, টিউটর রাখেননি। সঞ্জয় তখন ইস্কুলে।

কিন্তু বংশীকে পড়াতে বসে এক একদিন আনন্দ পান। উচ্ছ্বসিত হয়ে একদিন সঞ্জয়কে বলেই ফেললেন, ছেলেটা বেশ ইনটেলিজেন্ট, শার্প মেমারি।

সঞ্জয় হেসে উত্তর দিল, পাওনাগণ্ডাও বেশ বুঝে নিতে জানে।

সুধাময় বিস্ময়ের চোখে তাকালেন, মানে ? পাওনাগণ্ডা কিসের।

শুভা আর সঞ্জয় হাসাহাসি করল।

—এ-বাড়িতে একটু একটু করে ওর রাইট জন্মে যাচ্ছে। আমাদেরই না শেষে তাড়িয়ে দেয়।

ব্যাপারটা শুনলেন সুধাময়। সব শুনে হেসে ফেললেন।

ঘটনা এক টুকরো মাছ নিয়ে।

সকলের মত এক টুকরো মাছ ওর জন্যেও বরাদ্দ হয়ে আছে। কিন্তু বংশী তা জানত না।

দয়াময়ী ছেলেমেয়েদের খাবার সময়ে হাজির থাকেন না। তিনি তখন পুজোর ঘরে। সারাটা সকাল পুজো আর্চা করেই কেটে যায়। সন্ধেবেলায় কাছে কোথায় কীর্তন হয় হরিসভায়, প্রায়ই শুনতে যান।

দয়াময়ীও জানতেন না।

সুধাময় বংশীকে অঙ্ক শেখাবার সময় বলেছেন, ধর বাড়িতে আমরা সাতজন লোক, আর তার জন্যে সাত টুকরো মাছ আনা হয়, তা হলে...

বংশী খাবর সময় রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে চিৎকার করে ঝগড়া করছে শুনে দয়াময়ী সিঁড়ির ওপর থেকেই জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে ঠাকুর, বংশী চেঁচামেচি করছে কেন ?

বংশী সঙ্গে সঙ্গে ভাতের থালা হাতে ওপরে ছুটে এসেছে, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলছে, ঠাকুর আমাকে মাছ দেয় না মা, আর বাবু বললেন....

সব শুনে দয়াময়ী রেগে গেলেন।

ডাকলেন রান্নার ঠাকুরকে। কিন্তু ধরা পড়ে গিয়ে সে আর ওপরে এল না।

বংশীর কাছে শুনলেন, কোনদিনই ওকে মাছ দেয় না। একদিন নাকি জিগ্যেস করেছিল, ঠাকুর উত্তর দিয়েছে, ব্যাটা নুলা ভিখারির হাতুয়া, মাছ খাবে !

একে একে সকলেই শুনল দয়াময়ীর কাছে। শুনে অবাক হল।

সঞ্জয় রেগে গিয়ে বললে, ঠাকুরকে এখনই বিদেয় করে দাও।

কিন্তু দয়াময়ী জানেন তাতে দুর্ভোগ বাড়বে। বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে যে কি অশান্তি তা একমাত্র দয়াময়ীই জানেন।

সুতরাং নিয়ম হল, বংশী ওপরের খাবার ঘরে বসে খাবে, ঠাকুর ওর খাবার ওপরে দিয়ে যাবে।

সেই তখন থেকেই ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে শুরু করেছে বংশী।

আজ সত্যি সত্যি ওপরে উঠে গেছে।

॥ ৪ ॥

বাপ্পা এ-বাড়ির সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন। এ-বাড়ির লজ্জা। আর সেই জায়গাতেই আঘাত দিয়ে গেল বংশী।

গেটে খুলতে বন্ধ করতে সঞ্জয় সাধারণত নীচে নামে না। মাধো কিংবা রান্নার ঠাকুর নীচে থাকলে ওরাই খুলে দেয়, বন্ধ করে। কখনও কখনও খোলাই পড়ে থাকে। দেখতে পেলে দয়াময়ী রাগারাগি করেন। নীচের তলায় কেউ থাকে না বলেই ওই সাবধানতা। তা সত্ত্বেও একবার সমস্ত বাসনপত্তর চুরি হয়ে গিয়েছিল। বাসন মাজার ঠিকে-ঝি কাঁসার বাসনগুলো মেজেধুয়ে ডাঁই করে রেখে গিয়েছিল ভাঁড়ার ঘরের চৌকির ওপর। মাধোকে সুধাময় ওপরে ডেকেছেন, ঠাকুর রাস্তার দোকানে পান খেতে গেছে, ফিরে এসে দেখে একখানা বাটিও পড়ে নেই। হইচই, খোঁজাখুঁজি, সন্দেহ। কেউ বললে ঠিকে-ঝি নিজেই সরিয়েছে, কেউ থলে-কাঁধে পুরনো কাগজ-বিক্রি লোকটাকে সন্দেহ করল, কেউ বললে গয়লা দুধ দিতে এসেছিল। তখন থেকেই এ-বাড়িতে স্টেনলেস-স্টিলের বাসন ঢুকতে শুরু করে। তখন থেকে গেটে বন্ধ করার কড়াকড়ি।

কিন্তু রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মাধো আর ঠাকুর দুজনেই চলে যায়। এ-সময় ওদের ছুটি। কাছেই কোথাও আড্ডা দিতে যায়।

অন্য কেউ হলে ঝুমা কিংবা শুভা সঙ্গে যেত, কিন্তু ওরা গেলেই বংশী হয়তো আরও কথা জুড়বে এই আশঙ্কায় সঞ্জয় নিজেই গেল। এমনভাবে আগে আগে গেল যে বংশীকেও তাড়াতাড়ি নামতে হল সিঁড়ি বেয়ে।

ওকে বের করে দিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে তবে যেন নিশ্চিন্তি।

ওপরে উঠে এসে বললে, রবিবার দুপুরটাই নষ্ট করে দিয়ে গেল।

এখন বংশী চলে গেছে, সকলের মুখেই হাসি। সঞ্জয়ের রাগ দেখে ঝুমা আরও হাসতে শুরু করল। শুভাও। বললে, ছোটদার ঘুম নষ্ট হল। কি নামই রেখেছিলে, বংশী। বাঁশির সুর শুনলেই আতঙ্ক।

সঞ্জয়ও এবার হেসে ফেলল।

এতক্ষণ এই হাসিটা কারও মুখে ছিল না। সেই যে সন্ধেবেলায় একদিন ঘরে একটা চামচিকে ঢুকে পড়েছিল, ঠিক যেন সেই অবস্থা। সবাই চেষ্টা করছে চামচিকে তাড়াবার, তালপাতার পাখা, ঝুল ঝাড়ার লাঠি, চলন্ত পাখায় লেগে মরে পড়বে এই ভয়ে পাখা বন্ধ করা, কত চেষ্টা। সকলেই ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই তাড়াতে পারছে না! চামচিকে ভদ্রলোকও যে খুব আদর আপ্যায়ন পাচ্ছে বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাও নয়। কিন্তু এসে পড়েছে। বেরিয়ে যাওয়ার পথ পাচ্ছে না। শেষে একসময় ফুড়ুত করে জানালা গলে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝুমা জানালাটা বন্ধ করে দিল।

কি হাসাহাসি তখন।

চামচিকেটা যতক্ষণ ছিল, ভয়, বিরক্তি, ঘৃণা। চলে যেতেই কৌতুক।

বংশীকে নিয়েও ঠিক যেন সেই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

এখন আর ঘুম আসবে না, ঘুমোলেও উঠতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বিকেলবেলা অবধি ঘুমোলে শরীর ম্যাজম্যাজ করে। তবু এখন আর তো কিছু করার নেই। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল সঞ্জয়।

পশ্চিমের এই ঘরখানা প্রচণ্ড গরম। দেয়ালে রোদ পড়ে বারোটার পর থেকে। দোতলার ওপর আরেকতলা থাকলে ছাদ এত গরম হত না। তাই ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্যে সব জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ঘর ঠাণ্ডা করেও লাভ নেই, মাথার

ভিতরটা গরম হয়ে আছে।

স্বগতোক্তির মত করে সঞ্জয় বললে, মার এখনও ধারণা ছেলেটা আসলে খুব বোকা, ইচ্ছে করে ওসব করে না।

ঝুমা মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে আবার, ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে শুভা গল্প করছিল।

সঞ্জয়ের কথা শুনতে পেয়ে ঝুমা বললে, হতেও পারে।

শুভা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল, তুমি ওকে আর কতটুকু দেখেছ বউদি!

সঞ্জয় সায় দিল। —কিছুই তো দেখেনি।

ঝুমা সত্যিই কিছু দেখেনি। বংশী চলে যাওয়ার পরে ঝুমা এসেছে। কিন্তু সেজন্যেই কি ঝুমা সমস্ত ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না? ওদের কাছে শুনে শুনেই হাসাহাসি করে, কিংবা বিরক্ত হয়। নাকি সঞ্জয়দেরই দোষ, ওরা শুরু থেকে সব চোখের সামনে দেখেছে বলেই বংশীকে কোনও মূল্য দিতে পারেনি।

অফিসে একদিন এই ধরনের ব্যাপার নিয়েই তর্ক হয়েছিল হীরেনের সঙ্গে। আরও কে কে যেন ছিল।

আর এম হয়ে নতুন একজন জয়েন করেছে, বুড়ো আড্ডিসাহেবকে ট্রান্সফার করে দিয়েছে।

কে একজন বললে, যাই বলো, আড্ডি ছিল গুড ফর নাথিং, নতুন আর এম বেশ চটপটে।

হীরেন হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু যুদ্ধ করতে হলে ভাই চটপটি দিয়ে কাজ হয় না, বোমার দরকার হয়। আড্ডি কিন্তু বিজনেস ভালই দেখিয়েছে... আসলে গলদ কোথায় জানো? আড্ডি আমাদের চোখের সামনে নীচে থেকে ওপরে উঠেছে। ওকে আমরা বড় ভাবতে পারি না। যাকে বড় হয়েই আসতে দেখি তাকেই সমীহ করি।

বংশীর বেলায় কি সে-রকমই কোনও ভুল হচ্ছে! কে জানে।

সঞ্জয়ের মনে পড়ে, জ্যাঠামশাই একদিন বেড়াতে এসে সাবধান করেছিলেন।

উনি প্রাচীনপন্থী মানুষ। যে যেখানে আছে, যাকে যেখানে দেখে আসছেন, সে সেখানে থাকলেই ভাবেন সব ঠিকঠাক আছে।

বাবাকে বলেছিলেন, ভস্মে ঘি ঢালছিস সুধা, ওদের কি লেখাপড়া হয় নাকি।

তারপর হেসেছিলেন। যদি বা হয়, দেখবি আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে।

এখন মনে পড়ে। মনে হয় জ্যাঠামশাই ঠিকই বলেছিলেন।

বাবার কথাই কিন্তু তখন ভাল লেগেছিল সঞ্জয়ের।

সুধাময় হাসতে হাসতে প্রতিবাদ করেছিলেন, তুমি তো, দাদা, সেকালের সাহেবদের মত কথা বলছ। ওরাও ভেবেছিল ইন্ডিয়ানদের শিক্ষিত করা যাবে না, বড়জোর কেরানি করা যাবে।

সঞ্জয় ওর বাবার পক্ষ নিয়েই হেসে বলেছিল, ও একটা কেরানি হতে পারলেই আমরা ধন্য।

এর বেশি কিছু ওরা কেউই চায়নি। কিংবা সেটুকুও চেয়েছিল কিনা এখন আর মনে নেই।

একটা ভিখিরির চাকর। একটা নুলো ভিখিরির হাতুয়া, দেখে মায়া হয়েছিল, দয়াময়ী তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। সুধাময় তাকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। হয়তো এ-বাড়ির চাকরই হয়ে যেত। তা হলেও বেঁচে যেত ছেলেটা। আসলে বাড়ির চাকরেরও একটা স্ট্যাটাস আছে। কার চাকর, কোন বাড়ির চাকর। সঞ্জয় নিজের মনেই হেসে

ফেলল। চাকরির বেলাও তাই বোধহয়। সেন্ট্রাল না স্টেট। কিংবা কোন নামী প্রতিষ্ঠান। ইংরেজি রীতিতে সত্যি কথাটাই বলত, ইওর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। পাবলিক সার্ভেন্ট। এখন আর ওসব নেই, পাবলিকই সার্ভেন্ট হয়ে গেছে। একটা খুদে কেরানির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কি দাপট তার।

পাড়ায় একটা স্কুল আছে, খুবই বাজে ইস্কুল। সঞ্জয় গিয়েছে খোঁজ নিতে, দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে, কথা কানে যাচ্ছে না। দাঁত খুঁটতে খুঁটতে গল্প করছে পাশের লোকের সঙ্গে।

রাগারাগি করে বললে, কি মশাই, শুনতে পাচ্ছেন না? তখন থেকে বলছি...

লোকটা নির্বিকার ভাবে মুখ ফিরিয়ে বললে, সময় হলেই উত্তর দেব।

বলেই আবার গল্প শুরু করল।

সুধাময় বলেছিলেন, বংশীকে এবছর একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দে। খোঁজ নিয়ে দেখ, কোথাও ঢোকানো যায় কিনা।

সেজন্যেই গিয়েছিল সঞ্জয়। তাও সুধাময় বার কয়েক তাগাদা দেবার পর।

কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি করে দে বললেই তো ভর্তি করা যায় না।

কোনও ভাল স্কুলের কথা ওরা ভাবেওনি। সঞ্জয় নিজেই তো তেমন ভাল স্কুলে পড়তে পায়নি। সুধাময় তখন যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন না। তারপর মাইনে বেড়েছে, খরচও। সঞ্জয়ের কলেজ, শুভার নামী স্কুল।

সুধাময় বলেছিলেন, ছেলেটা বেশ ইনটেলিজেন্ট। অত ভাল ইস্কুল না হলেও চলবে। একটু থেমে বলেছিলেন, কত কি ফি ইস্কুলের খবর নিবি।

সঞ্জয়ের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। একটা ছেলে, আমাদের কেউ নয়, ভিখিরি হয়ে যেত, তার উপকার করছি। দানছত্র খুলে বসিনি।

পাড়ার ব্রজবাবুকে গিয়ে প্রথমে ধরেছিল সঞ্জয়। দিব্যি ভাল চাকরি করেন ভদ্রলোক, গাড়ি আছে। লোকের উপকার করতে চান। বহু লোকের সঙ্গে চেনাজানা। একটাই নেশা ওঁর, কমিটি। কত রকমের কমিটিতে যে উনি আছেন তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও সেক্রেটারি, কোথাও প্রেসিডেন্ট, কোথাও বা একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার। কেউ আপদবিপদে পড়লে, অথবা কোনও সমস্যায় ওঁর শরণ নেয় অনেকেই।

ব্রজবাবু বেশ অমায়িক ভদ্রলোক, আপন লোকের মত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলেন, সমস্যার কথা শুনলেই অনেকসময় অযাচিত ভাবে নিজেই বলে বসেন, আরে ও তো ডি কে চ্যাটার্জিকে বলে দিলেই হবে... তারপর ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সামনেই টেলিফোন করে দেন।

টেলিফোনে ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয় খুবই চেনা, অনেক দিনের আলাপ।

অবশ্য কখনও কাজ হয়, কখনও হয় না। উল্টো বিপত্তিও ঘটে। কিন্তু ব্রজবাবু তা নিয়ে আদৌ চিন্তিত হন না। আবার আরেকজনকে ফোন করে বসেন।

কেউ কেউ সেইজন্যেই ওঁকে ভয় পায়। বলে, ওঁর উপকার মানে অপকার।

তবু, কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে সঞ্জয় ওঁর কাছেই গিয়েছিল।

ব্রজবাবুর বসার ঘরখানা বিশাল, শোফাকৌচ দিয়ে বেশ ছিমছাম সাজানো। দেয়ালে ছবি আছে, রুচি নেই।

দাড়ি কামাতে কামাতেই সেফটি রেজার হাতে নিয়ে আধখানা কামানো গালে এসে উপস্থিত হলেন।

সঞ্জয় বললে, আপনি দাড়িটা বরং কামিয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি। কিংবা যদি বলেন, পরে আসব।

ব্রজবাবু সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে বলে উঠলেন, না না না না, সে কি কথা। তুমি বলো, আমি শুনছি।

সঞ্জয় বললে, বংশীকে তো আপনি দেখেছেন, সবই জানেন ....

খুব মনোযোগ দিয়ে ব্রজবাবু শুনলেন, কোনও উত্তর দিলেন না, যেন চিন্তা করছেন, তারপর বললেন, আমি দাড়িটা কামিয়েই আসি।

দাড়িটাড়ি কামিয়ে অনেকক্ষণ পরে মুখে তোয়ালে ঘসতে ঘসতে এলেন। সঙ্গে এল একটা ফুরফুরে সুগন্ধ—শেভিং লোশনের।

বললেন, দ্যাখো সঞ্জয়, তোমরা কিন্তু ছেলেটার ক্ষতি করছ।

সঞ্জয় একটা আচমকা আঘাত পেল। —ক্ষতি ?

ও ভেবেছিল পরোপকারী ব্রজবাবু ওদের খুব প্রশংসা করবেন। আসলে সঞ্জয় ভিতরে ভিতরে বেশ একটা গর্ব বোধ করত। ভিখিরির হাত থেকে একটা ছেলেকে ছিনিয়ে এনেছে, এবং এখানে এনে তাকে চাকর বানিয়ে দেয়নি।

সঞ্জয় লক্ষ করেছে বাবা কি অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে অফিস থেকে ফিরেও বংশীকে পড়াতে বসত।

সঞ্জয় একদিন ঠাট্টা করে শুভাকে বলেছিল, বাবা যদি আমাকে এভাবে পড়াত, নির্ঘাত লেটার পেতাম।

শুভাও হেসেছে। —লেটার কি রে, স্ট্যাণ্ড করতাম।

শুভা সঙ্গে সঙ্গে সে-কথা বাবাকেও বলেছে, আর উনি লজ্জা পেয়ে হেসেছেন। বলেছেন, না রে, ছেলেটার মেমারি খুব শার্প। বেশ ইনটেলিজেন্ট।

আর দয়াময়ী বলেছেন, ও বয়েসে তোদেরও পড়িয়েছে।

খুব শার্প মেমারি। বেশ ইনটেলিজেন্ট। কথাটা বারবার শুনতে সঞ্জয়ের ভাল লাগে না। যেন ঘুরিয়ে বলা হয়, তোরা এত ইনটেলিজেন্ট ছিলি না।

তবু একটা গর্বও হয়। বংশী যেন ওদের অন্য সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। কই, আর তো কেউ করে না। ওরা একটা ছেলেকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে এসে মানুষ করে তুলছে।

ও সেজন্যেই ব্রজবাবুর কথায় চমকে উঠে বললে, ক্ষতি করছি ?

ব্রজবাবু হাসলেন, হ্যাঁ সঞ্জয়, আমি বলব ক্ষতি। তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলো, এ-সবের কোনও মানে হয় না। সকলেই শিক্ষিত হয়ে উঠলে এত চাকরি কোথায় পাবে ? ভদ্রলোকের ছেলেরাই তো চাকরি পাচ্ছে না। ওকে বরং করে খেতে দাও কিছু একটা কাজ শিখুক...

সঞ্জয় ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছিল, তবু রাগ চেপে রেখে মুখে হাসি আনল। বললে, সকলের শিক্ষিত হয়ে ওঠার সত্যি মানে হয় না। হাতের কাজ শেখাই উচিত। তবে, ব্যাপার কি জানেন কাকাবাবু, শিক্ষিত ভদ্রলোকরাই তা বুঝছে না।

ব্রজবাবু আঁতকে ওঠার ভাব গোপন করে বললেন, মানে ?

সঞ্জয় আবার হাসল। —ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়াশুনোয় খারাপ হলেও একগাদা টিউটর-ফিউটর রেখে পাশ করাতে চায়, অথচ টেকনিক্যাল কিছু শেখালে করে খেতে পারত।

ব্রজবাবু উঠে দাঁড়ালেন, ব্যস্ততা দেখালেন, বললেন, যাই বলো ভদ্রলোক ইজ ভদ্রলোক, তাদের বাড়ির ছেলেরা খেটে খেতে যাবে কেন !

চলে যেতে যেতে বললেন, স্কুল-টুলে আমার তেমন চেনা নেই।

বলেই ভিতর যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

সঞ্জয়ও বেরিয়ে এল, মনে মনে হাসল। কারণ ব্রজবাবুর মেজ ছেলে গড়ে দুবছরে এক-একটা ক্লাশ পার হয়, বাড়িতে এক-একটা সাবজেক্টে এক একজন প্রাইভেট টিউটর।

সুধাময় সব শুনলেন ছেলের কাছ থেকে। শুনে বললেন, ও সব কেউ করে দেয় না, নিজে চেষ্টা করতে হয়।

তারপর বিড়বিড় করে বললেন, ভদ্রলোক ইজ ভদ্রলোক। ডেভিড হেয়ারের পাল্কির পিছনে পিছনে ছুটে তো সব ভদ্রলোক হয়েছিস।

সুধাময়ের কাছে ইতিহাস একটা নেশা। ইতিহাসের বই পেলেই পড়েন। আর মাঝে মাঝে এই ধরনের দু-একটা কথা বলে বসেন। কিন্তু সঞ্জয়ের কাছে তা ঠিক বোধগম্য হয় না। ওর ধারণা আজকের এই শিক্ষিত সমাজ চিরকালই শিক্ষিত ছিল।

একদিন প্রতিবাদ করে বলেছিল, ইংরেজরা এসে ডাক্তার বানিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার আগে তো কবিরাজ ছিল।

সুধাময় হেসে বলেছেন, কবিরাজের ছেলেরা কিন্তু ডাক্তার হয়নি। গ্রামের মানুষ শহরে এসে ইংরেজি শিখেছে, চাকরি করেছে। তাই ভদ্রলোক।

সঞ্জয়ের এ-সব কথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সঞ্জয়ও মনে করে অশিক্ষিত গরিব মানুষগুলোর সামনে শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। ওরাও তো মানুষ। এই রকম একটা সদিচ্ছাই শুধু ছিল, কলেজে তর্কেবিতর্কে এরকম গরম গরম কথাও ও বলেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতই কঠিন তা জানত না।

একে প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকলে স্কুলে ভর্তি করাই দুরূহ, তার ওপর ভাল স্কুল মানেই খরচের ব্যাপার। আবার কাছাকাছি স্কুল না হলে যাতায়াতের সমস্যা। সে আরেক খরচের ধাক্কা।

সঞ্জয় যখন নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন সুধাময় একদিন নিজেই গিয়ে হাজিব হলেন পাড়ার স্কুলেরই হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

বংশীকে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন, একেবারে ফর্ম নিয়ে ফিরে এলেন।

সঞ্জয়ের মনে আছে, কি উল্লাস সেদিন।

সুধাময়কে দেখে মনে হয়েছিল বিশ্বজয় করে ফিরলেন। সম্ভাবনা তো ছিল না, প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন বলেই এত আনন্দ। যেন এতদিনের অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেলেন।

ধীরে ধীরে বললেন, প্রথমে একেবারে হাঁকিয়ে দিয়েছিল, বুঝলি শুভা, আসলে ওর বয়সটা তো বেশি হয়ে গেছে একটু, ক্লাশ ওয়ানে তো সব বাচ্চা বাচ্চা...

হাসতে হাসতে বললেন, হেডমাস্টার হঠাৎ ওকে বয়েস জিগ্যেস করলেন, ও এমন বোকার মত তাকিয়ে রইল, তারপর আমাকেই জিগ্যেস করলে বংশী।

সকলেই হেসে উঠল। আর তা দেখে বংশী লজ্জা পেল। কিন্তু ওর কি দোষ। ওর বয়েস তো ওকে কেউ বলে দেয়নি। সুধাময়ও জানেন না।

সুধাময় বললেন, হেডমাস্টার মশাই লোক ভাল। যখন সব শুনলেন, প্রথমে বিশ্বাসই করেন না। শেষে রাজি হয়ে গেলেন।

সঞ্জয় বললে, ও ইস্কুলে তো শুধু ফেল করা ছেলেগুলো যায়, তার আবার এত দাপট।

সুধাময়ের কোথাও হয়তো বিবেকে লাগছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের তো উনি এর তুলনায় অনেক ভাল স্কুলেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে তো আর সব ব্যাপারে নিক্তির ওজনে তাদের সঙ্গে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন, এমন কোনও প্রতিজ্ঞা করেননি।

তাছাড়া সে-সব ইস্কুলে পরীক্ষা আছে, ইন্টারভিউ আছে। শুধু ছেলেমেয়ের নয়, তাদের বাবা মারও। তার চেয়ে বড় কথা—টাকা।

সুতরাং ওর পক্ষে এই স্কুলই ভাল।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ফর্ম ফিল্-আপ করতে গিয়ে।

সুধাময় ফর্ম ভর্তি করছেন, আর সব কটা মাথা ঝুঁকে পড়েছে তার ওপর। বংশীও দেখছে হাসি হাসি মুখে। স্কুলে ভর্তি হবে ও, স্কুলে ভর্তি হবে। খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া একটা পাখির মত ওর স্বপ্ন যেন ডানা মেলেছে। উড়ছে, উড়ছে। উড়ে উড়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। শুধু একটা মুক্তির আনন্দ। এই স্কুল যেন একটা ক্রীতদাসের পায়ের বেড়ি খুলে দেবে।

সুধাময় ফর্ম ভর্তি করতে গিয়ে থেমে পড়লেন। বিভ্রান্তের মত সকলের মুখের দিকে তাকার্লেন।

—কি হ'ল ? প্রশ্ন করলেন দয়াময়ী।

সঞ্জয় আর শুভার চোখেও সেই প্রশ্ন।

সুধাময় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের মুখের দিকে।

বললেন, কি লিখব।

তারপর বংশীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোর বাবার নাম কি রে ? বংশী ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নামাল। বললে, জানি না। সঞ্জয় বললে যা হোক্ একটা কিছু লিখে দাও না।

সুধাময় এতদিন এ-সব কথা ভাবেননি। একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। নিজের হাতে একটা মিথ্যে কথা লিখতে হবে। না লিখে উপায়ও নেই। কিন্তু ফর্ম ভর্তি করতে গিয়ে বাধা পেলেন বলেই ভিতরে ভিতরে রেগে গেলেন।

উদ্ভ্রান্ত বিরক্তিতে বলে উঠলেন, ওর নামই বা কি ! কি নাম লিখব ?

দয়াময়ী বললেন, কেন, বংশী—বংশীধর। আমিই তো ওর নাম দিয়েছিলাম।

শুভা হেসে উঠে বললে, হাতুয়া দিয়ে দাও, কি বল্ বংশী ?

বংশী তখনও সঙ্কোচে মাথা নিচু করে আছে। ও বুঝতে পারছে ওকে নিয়েই সমস্যা। একটু আগের সব আনন্দ ওর মুখ থেকে মুছে গেছে।

ওর গলা অবধি উঠে আসা কষ্টের ভিতর দিয়ে একটা কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠস্বর হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এল। —আমি ইস্কুলে যাবনি দাদাবাবু, আমি ইস্কুলে যাবনি।

বলেই ছুটে চলে গেল।

সঞ্জয় ডাকল, শোন বংশী, শোন।

আর সুধাময় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বংশী, বংশীধর লিখে দিলেই চলবে ? একটা পদবী চাই না ?

সকলে সকলের মুখের দিকে তাকাল। ছেলেটার বাবার নাম জানা নেই। একটা বানানো নাম সারাজীবন ওর পিতৃপরিচয় হয়ে থাকবে। তা হোক্, কি যায় আসে। তবু একটা পরিচয় তো হবে। পিতৃপরিচয়। একটা নাম শুধুই তো প্রতীক।

কিন্তু একটা পদবীও তো চাই।

সুধাময় বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেরাই তো পড়ে ওখানে, হেডমাস্টার সেজন্যেই একটু কিন্তু কিন্তু করছিলেন। এখন যদি শোনেন পদবী নেই...

সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলে উঠল, অধিকারী। ও তো বলেছিল সেই নুলো ভিখিরিটা ওর অধিকারী। জগন্নাথ না কি নাম, বলেছিল জগন্নাথ ওর অধিকারী।

শুভা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল।

সুধাময়ের মুখেও হাসি দেখা দিল। একটা বিরাট সমস্যার সুরাহা হয়েছে। ডাকলেন, বংশী, আয় এদিকে, শুনে যা।

সঞ্জয় ওকে খুঁজে আনতে গেল।

আর সুধাময় হাসতে হাসতে বললেন, বাবার নাম ওই থাক—জগন্নাথ অধিকারী, আর নাম বংশীধর অধিকারী।

গোটা গোটা অক্ষরে নাম দুটো লিখলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, কে জানে, হয়তো ওই নুলো জগন্নাথেরই ছেলে, সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল, মা বেচে দিয়ে গেছে...

দয়াময়ী প্রতিবাদ করলেন না। চুপ করে রইলেন। মা ছেলেকে বেচে দেয় নুলো ভিখিরির কাছে, বিশ্বাস হয় না তাঁর। শুনলেও গা রি-রি করে ওঠে। হোক্ অভাব, মানুষ এত নৃশংস হতে পারে নাকি!

সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।

ওই কথাগুলো মনে পড়লেই যেন বংশীর ওপর আরও মায়া হয়।

সে-জন্যেই হয়তো ওকে কাছে টেনে নিলেন দয়াময়ী, সঞ্জয় ওকে নিয়ে আসতেই। গায়ে মাথায় হাত বোলালেন। —ইস্কুলে পড়বি, বইখাতা কিনে দেব। মন দিয়ে পড়বি কিন্তু।

বংশীর মুখে হাসি দেখা গেল। আদুরে গলায় বললে, একটা স্যুটকেশ কিনে দিতে হবে কিন্তুক। ছেলেরা নিয়ে যায় দেখেছি।

এখন আর কথায় বেশি জড়তা নেই। শুভা ওকে অনেকটা শহুরে বানিয়ে দিয়েছে।

স্কুলে যাবার দিনে নতুন পোশাক, স্কুল ড্রেস। কাঁধে নতুন ব্যাগ, নতুন বই-খাতা।

প্রথম দিন স্কুলে যাবার সময় দয়াময়ী ওর কপালে একটা দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন।

ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সঞ্জয়ের পিছনে পিছনে চলেছে বংশী।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে সঞ্জয় আর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে খুশির মুকুলে ভরা গাছের মত হাওয়ায় নাচতে নাচতে বংশী চলেছে তার পিছনে পিছনে।

চোখ বুজলে এখনও এই দৃশ্যটা দয়াময়ীর চোখের সামনে ভাসে। নাকি সাক্ষীগোপালের ছবিটা ? নূপুর পায়ে গোপাল চলেছে পিছনে পিছনে।

ব্রজবাবু তাঁর বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, বংশী ফিটফাট স্কুলের পোশাক পরে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, সঞ্জয়ের সেদিন সেটুকুই সবচেয়ে বড় আনন্দ।

সঞ্জয় ভাবল, আজ বংশী হয়তো সেসব দিনের কথা ভুলে গেছে। নাকি ভুলে যায়নি বলেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চায় এ-ভাবেই। কিন্তু সে ঋণ কি শোধ হয় নাকি। মা যে তোর উপর এত দয়ামায়া দেখিয়েছিল!

হঠাৎ সঞ্জয়ের মনে একটা খটকা লাগল। দয়ামায়া। দয়ামায়া কি তোমার গুণ ? না, ছেলেটার কৃতিত্ব ? কই, আর দশটা কালোকুলো ভিখিরির ছেলেকে দেখে তো তোমার দয়া হয়নি। আমরা বড়জোর তাকে কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিই। গাড়ি চাপা পড়তে পারে দেখেও একজন কানাখোঁড়া মানুষের হাত ধরে সরিয়ে আনি না। আসলে বংশীর সেই সরল অসহায় চাউনি, ভিজে বালির মত মোলায়েম মুখে কেমন একটা মায়া জড়ানো, ওর মা ওকে বেচে দিয়ে গেছে, হাতুয়া বলে সকলে, নুলো ভিখিরির হাতুয়া, এই সব শুনেই তো দয়ামায়া হয়েছিল।

সঞ্জয় নিজের মনেই হাসল। এ-ভাবেই তো হয়। ও যেটুকু পেয়েছিল তার জন্যেই তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। চিরকাল এ-বাড়ির কাছে মাথা নিচু করে থাকা উচিত।

কিন্তু আমরা ওর কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করছি কেন ? তা হলে তো আমরাও নিচু হয়ে

যাব।

বাবার কথা মনে পড়ল। —আমাদের পূর্বপুরুষ কেউ সুযোগ পেয়েছিল একশো কি দুশো বছর আগে, কিংবা তারও আগে। ও সুযোগ পেল দুশো বছর পরে। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমরাই ওর ডেভিড হেয়ার।

কথাটা মনে আছে, কিন্তু সঞ্জয় স্পষ্ট বুঝতে পারে না। ওর সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে আছে, অনন্তকাল ধরে ওরা এই রকমই ছিল। সমাজের ওপর তলায়, শিক্ষিত, সচ্ছল। যুক্তি দিয়ে কেউ তা টলাতে পারবে না।

সুধাময় বলতেন, ইওরোপ আমাদের তাচ্ছিল্য করলে আমাদের গায়ে লাগে। অথচ একদিন তো ওদের কাছে আমরাও এই বংশী ছিলাম।

একদিন জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এই নিয়ে ঘোর তর্ক। জ্যাঠামশাইয়ের বিশ্বাস সব ঠিকঠাক আছে, ঠিকঠাক চলছে। যে যেখানে ছিল, যে যেখানে আছে, সেভাবে থাকলেই শান্তি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যদি ভিক্ষের হাত তোমাকে বিরক্ত করে তাদের শহরের বাইরে বের করে দাও। উনি সৌখিন মানুষ, সুখী মানুষ। নিজের আপিসেই ছেলেকে একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে দিতে পেরেছেন।

এখন মনে হয়, জ্যাঠমশাই ঠিকই বলতেন। 'দেখবি, আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে।'

সঞ্জয়ের মনে হল, আরও বেশি বদলে গেছে বংশী। ও এখন নিজেকে কি ভাবছে কে জানে। হয়তো ভাবে আমাদের সমান হয়ে গেছে। কিংবা ওপরে উঠে গেছে, আমাদের চেয়েও ওপরে।

নির্বোধ!

এসে জিগ্যেস করল, বাপ্পা কি করছে এখন?

সবই জানে, তবু।

বাপ্পার জন্যেই যেটুকু লজ্জা, যেটুকু দুশ্চিন্তা। বংশী হয়তো ভাবছে বাপ্পাকে হারিয়ে দিয়ে ও আমাদের চেয়েও ওপরে উঠে যাবে। সঞ্জয়ের এক একসময় মনে হয়, বংশী যেন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কিসের প্রতিশোধ? ওর তো বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

॥ ৫ ॥

তারপর পাঁচ-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেছে। সিঁড়ির তলা থেকে বংশী দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছিল। সেখান থেকে দোতলার উত্তরের ঘরটিতে। এই ঘরখানা তালাবন্ধ পড়ে থাকত, একটা আলমারি আর কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র।

কোনও এক প্রচণ্ড শীতের রাতে দয়াময়ী বলেছিলেন, আহা, বারান্দায় বেচারির বড় কষ্ট হয়, ওই ঘরেই ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

আর কে যেন বেড়াতে এসে এ-ঘর ও-ঘর দেখতে দেখতে হঠাৎ ওই উত্তরের ঘরখানা দেখিয়ে শুভাকে প্রশ্ন করেছিল, ওখানে কে থাকে শুভা?

শুভা হাসতে হাসতে বলেছিল, মায়ের পোষ্যপুত্র।

দয়াময়ী লজ্জা পেয়েছিলেন, তবু বেশ জেদের সঙ্গে বলেছিলেন, হ্যাঁ, পোষ্যপুত্রই। তোদের দিয়ে তো কোন কাজই হয় না, ও আমার কত কাজ করে দেয় জানিস? নিজের ছেলেও ওরকম করে না।

দেখতে দেখতে একদিন ঘরখানার নাম হয়ে গেল বংশীর ঘর। ছোট্ট একটা পড়ার টেবিল, কাঠের চেয়ার, তক্তপোশ...একে একে সবই এসেছে। এমন কি নীচের কোণের

ঘরের পুরনো পাখা খুলে এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সবই একে একে আদায় করে নিয়েছে বংশী। নিজেই অভিযোগ করেছে, টেবিল না হলে পড়ব কোথায়। কিংবা গরমের দিনে বলে বসেছে, রাত্তিরে এক মিনিটও ঘুমোতে পারিনি ছোটদা। কি গরম।

সঞ্জয় আর শুভা আড়ালে হাসাহাসি করেছে, সুধাময়ও বলেছেন ছোঁড়ার এখন গরমও লাগে রে, পাখা না হলে চলে না।

শুভা হেসে বলেছে, ও কি আর এখন সেই হাতুয়া আছে নাকি ! কত ফর্সা ফর্সা কথা বলে দেখেছো ?

কথাটা বংশীর। শুভা যখন ওর কথার গ্রাম্যতা ছাড়াবার চেষ্টা করছে, তখন একদিন কুলকুল করে হেসে উঠে বংশী বলেছিল, শহরে সবাই ফর্সা ফর্সা কথা কয়, না দিদি।

সত্যি, সকলের চোখের সামনে একটু একটু করে কেমন বদলে যাচ্ছিল। ওর পোশাক-আশাক, ওর হাঁটাচলা, ওর কথাবার্তা। কে বলবে ও এবাড়ির ছেলে নয়।

কিন্তু সব থেকে অবাক করে দিলে লেখাপড়ায়। প্রথম দুটো-তিনটে বছর ও একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছিল, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। সুধাময়ও সময় দিতে পারতেন না, ওঁর তখন অফিসে কাজ বেড়েছে, সংসারে নানা চিন্তা। কিংবা ওকে পড়াতে বসার জন্যে আর সেই উৎসাহ ছিল না। ভেবেছেন, এখন তো ও নিজেই নিজেকে গড়ে নিতে পারবে।

তবু বংশীর বুকের ভিতরে একটা ক্ষত ছিলই। কিন্তু এই সমাজে বাস করে সেই ক্ষত তো কেউ সারিয়ে দিতে পারে না। ওকে তা সহ্য করতেই হবে।

ওকে স্কুলে ভর্তি করার পর একদিন সেই হেডমাস্টার ভদ্রলোক, রামজীবনবাবু এসেছিলেন। —গার্জেনরা কিসব কানাঘুসো করছে, আমাকে একজন বলতে এসেছিলেন, আমি অবশ্য পাত্তা দিইনি। হয়তো স্কুল কমিটির কাছে অভিযোগ করবে।

সুধাময় বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করেছেন, কেন, কি হয়েছে।

রামজীবনবাবু চিন্তিতভাবে বলেছেন, ওঁদের আপত্তি চাকরবাকরের সঙ্গে পড়লে ওঁদের ছেলেরাও খারাপ হয়ে যাবে।

সুধাময় বলেছেন, না না, ও আমাদের চাকর নয়। ওকে আমরা সে-ভাবে দেখি না।

রামজীবনবাবু বলেছেন, তা হলেও ব্যাপারটা তো সকলেই জানে, ভদ্রঘরের ছেলে তো নয়। ওই আপনাদের পাড়ার ব্রজবাবুই তো একজন গার্জেনকে বলেছেন।

ব্রজবাবু ! শুনে অসহায় বোধ করেছেন সুধাময়। রামজীবনবাবুর হাত দুটো ধরে বলেছেন, ছেলেটার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে, আপনি ওকে তাড়াবেন না। কোথায় যাবে বেচারা।

রামজীবনবাবু বলেছেন, না না, তেমন কিছু হলে আমি ফাইট করব। সে-রকম কোনও আইন নেই। কিন্তু জানেন তো, সব আইন কাগজেকলমে লেখা থাকে না। আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে গেলাম।

রামজীবনবাবুরও স্নেহ মমতা ছিল বংশীর ওপর। এটা ওঁর কাছেও যেন একটা চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু উনি ঠিকই বলেছিলেন, সব আইন কাগজেকলমে লেখা থাকে না।

কখনও কখনও দু-একটা কথায় সুধাময় বেশ বুঝতে পারতেন, ওর ক্লাশের অনেকেই ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। দু-একজন শিক্ষকও নাকি ওকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে।

দুঃখ করে বলেছিলেন, ও বোধহয় বাহিরিই রয়ে গেল, একদিন বলেছিল না, মন্দিরের সামনের ভিখিরিরা ওকে সেখানে ভিক্ষেও করতে দেয় না। কারণ ও নাকি বাহিরি।

বাইরে থেকে এসেছে।

সঞ্জয়কে বলেছেন, আমরা শিক্ষিত সচ্ছল মানুষগুলো সকলে মিলে কেমন দিব্যি নিশ্চিন্ত একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছি। তার ভেতরে কাউকে ঢুকতে দিতে চাই না। আবার অনেক কষ্টে, অনেক সময় পার করে, কেউ যখন শেষ পর্যন্ত ঢুকে যায়, তখন সেও আর কাউকে ঢুকতে দেয় না।

সঞ্জয় হেসে উঠে বলেছে, ট্রেনের কামরার মত। ভিড় ঠেলে যে উঠে পড়তে পারে পরের স্টেশন থেকে সেও সকলকে বাধা দেয়।

ঠিক তাই। পাঁচ-পাঁচটা বছরে বংশী ওদের সঙ্গে মিশে গেছে। এখন আর কোনও বাধা নেই, অভিযোগ নেই। বরং রামজীবনবাবু এখন গর্বিত।

একদিন দেখা করার জন্যে সুধাময়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্যে অপেক্ষা না করে সেদিনই এসে হাজির হলেন। বললেন, স্কুলে সকলের সামনে আর বলতে চাই না, সুসংবাদ আছে। বংশী থার্ড হয়েছে এবার। ছেলেটা সত্যি খুব ব্রাইট, যদি ভাল কোচিং পেত....

সুধাময় জানেন, রামজীবনও জানেন, সেটা সম্ভব নয়। ও যেটুকু সুযোগ পেয়েছে সেটাই ওর ভাগ্য।

সুধাময় বললেন, ওরা শিক্ষিত নয় সে-কথাই আমরা বলি, গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলে দিয়েই দায়িত্ব সারি, কিন্তু স্কুলে শিখে আসার অক্ষরটা ভুলে গেলে যে তার বাবা-মা সেটুকুও বলে দিতে পারে না এমনই নিরক্ষর, সে-কথা মনে থাকে না। আমাদের ধারণা ওরা অযোগ্য। ওদের সেই বুদ্ধি নেই। কারণ আমরা শিক্ষিতরা অনেক আগে সুযোগ পেয়ে গেছি। বংশীর মতই একদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই তারাও লেখাপড়া শুরু করেছিল।

এ-সব কথা সঞ্জয় অনেক শুনেছে। মাত্র দুজন নাকি গ্রেস নম্বর পেয়ে প্রথম বি এ পাশ করেছিল। এখন কয়েক লক্ষ। চলন্ত ট্রেনের কামরায় এখন তারাই যাত্রী। আর অন্য সকলেই বাহিরি, বাহিরি।

তবু সঞ্জয়ও খুশি হয়ে উঠল।

রামজীবনবাবু বিদায় নিতেই ও চিৎকার করে ডাকল, মা শোনো, শুভা শুনে যা, বংশী থার্ড হয়েছে।

আসলে আনন্দটা বংশীর জন্যে, না ব্রজবাবুর গালে একটা অদৃশ্য চড় কষিয়ে দিতে পেরেছে বলে এত উল্লাস, সঞ্জয় নিজেও বুঝতে পারল না। খুশির খবরে চঞ্চল হয়ে উঠল ও, ঝুলবারান্দায় গিয়ে একবার ব্রজবাবুর বাড়ির দিকে তাকাল, ফিরে এল।

বংশী খেলতে গেছে, তখনও ফেরেনি।

সঞ্জয় ধীরে ধীরে ঢুকল বংশীর ঘরে। বংশীর ঘর। বংশীর সাফল্য যেন সঞ্জয়ের নিজেরই সাফল্য। এই বাড়ির সকলের।

মুহূর্তের জন্যে একটু অনুশোচনা হল সঞ্জয়ের।

ওকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার পর প্রথম দু-তিনটে বছর বংশী বাড়ির সবাইকে হতাশ করেছিল।

একবার রেগে গিয়ে বলেছিল, তোমার ইনটেলিজেন্ট ছেলে, শার্প মেমারি, দেখো তার কাণ্ড!

প্রগ্রেস রিপোর্টখানা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

সুধাময় তার ওপর চোখ বুলিয়ে মাথা নিচু করেছিলেন, রিপোর্টটা ফেরত দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে।

আর সঞ্জয় বলেছিল, ও সব হয় না, হয় না। একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড না থাকলে,

একটা বংশ...তা হলে সকলেই তো শিক্ষিত হয়ে যেত, সকলেই উন্নতি করত।

সুধাময় কোনও কথা বলেননি। আসলে যেন উনি নিজেই হেরে গেছেন।

তবু নিজেকে স্তোক দেবার মত করেই বলেছেন, পাশ তো করেছে!

কিন্তু সঞ্জয় যেন একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করে নিয়েছিল। ব্রজবাবুকে। ওই ব্রজবাবুর মত, কিংবা জ্যাঠামশায়ের মত, যারা মনে করে সবই ঠিকঠাক আছে, ঠিকঠাক চলছে। যে যেখানে আছে সেখানে থাকলেই নিশ্চিন্ত।

ওর মধ্যে একটা জিদ্ ছিল, বংশী ওদের ধারণা বদলে দেবে। পারেনি বলেই সঞ্জয়ের এত ক্ষোভ। মুখ ফসকে ওই কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল সে-জন্যেই। আসলে নিজেও হয়তো কথাগুলো বিশ্বাস করে, রক্তের মধ্যে ওই বিশ্বাস আছে, শুধু যুক্তি দিয়ে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

সুধাময় হতাশ সুরে বললেন, দেখা যাক্।

একটু থেমে হেসে উঠে বললেন, প্রথম যে-দুজন বি এ পাশ করেছিল তারা তো গ্রেস মার্ক পেয়েই পাশ করেছিল। ওকে সেটুকু গ্রেস তো দিতে হবে।

সঞ্জয় চুপ করে গিয়েছিল। ওর মন বলছিল, হবে না, হবে না। বংশী বড়জোর আরও দু-এক ক্লাশ উপরে উঠবে, তারপর ওদের সকলকে হতাশ করে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে।

সুধাময় ওকেই স্বান্ত্বনা দিলেন, না নিজেকে, বোঝা গেল না। বললেন, দোষ তো আমারই। ওর পড়া দেখিয়ে দেওয়ার সময় পাই না, আজকাল এত ক্লান্ত লাগে, বয়স তো হচ্ছে।

সুধাময় সত্যি পারতেন না। নিত্য অসুখবিসুখ। অফিসে কাজের চাপ। সেজন্যেই শুভার জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়েছে।

সেই বংশী কখন থেকে একটু একটু করে ভাল নম্বর পেতে শুরু করেছে ওরা তেমন লক্ষও করেনি। তাই অবাক হয়ে গেল। উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

রামজীবনবাবু বলে গেছেন, থার্ড হয়েছে। বংশী থার্ড হয়েছে।

সঞ্জয় গিয়ে ঢুকল বংশীর ঘরে। টেবিলের ওপর থেকে ওর বইগুলো নিয়ে মমতার হাতে নাড়াচাড়া করল। বইয়ের মলাট খুলতেই দেখল গোটা গোটা সুন্দর হাতের লেখায় বংশীর নাম। বংশীধর অধিকারী।

শুধু একটা নাম। ওরাই দিয়েছে। ঠিক মনে নেই কে। হ্যাঁ, মা বোধহয় বলেছিল বংশীধর। বংশীধর অধিকারী। নামটার ওপর এখন ওর কি মায়া। কত সুন্দর করে লিখেছে। ওই নামটা এখন ওর পরিচয়। শুধু একটা নাম ওকে সেই নুলো ভিখিরির হাতুয়া থেকে একেবারে পৃথক করে দিয়েছে। কিংবা এই শহর, এই বাড়ি, এই স্কুল। ওর থার্ড হওয়া।

অথচ কত সামান্য সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগই বা কে দিতে পারে, দিতে চায়।

সঞ্জয়ের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বংশীর মনে হয়তো বা কোনও ক্ষোভ আছে। ওদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ। আসলে মানুষ বোধহয় কৃতজ্ঞ থাকতে চায় না। যা পায় তা তার দাবি হয়ে ওঠে। অনুকম্পা কিংবা সাহায্যের হাতখানা ধরে সে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই হাতখানা দূরে ঠেলে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে চায়। স্বাধীন হতে চায়। অথবা যার হাত ধরে উঠেছিল, তার সমান হয়ে দাঁড়াতে চায়।

সেটাই তো হবার কথা। আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে চাই কেন? বার বার সে-কথা মনে পড়িয়ে দিতে চাই কেন! ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তো তার মুক্তি।

হয়তো ভুলতে পারেনি বলেই বংশীর মধ্যেও একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে।

সঞ্জয়ের মনে আছে, সেই বছরই একটা পারিবারিক দুর্যোগ ঘটে গেল।

বিভা, সঞ্জয়ের দিদি, বিধবা হয়ে ফিরে এল। সমস্ত বাড়িটার ওপর একটা শোকের ছায়া নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে বংশীর অস্তিত্বই ভুলে গেল ওরা।

প্রদীপদা চাকরি করত পাটনায়। মাত্র কদিনের অসুখে হঠাৎ মারা গেল। আর একটা বিরাট দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে এল ঘাড়ের ওপর।

বিভা আর তার ছেলে বাপ্পাকে নিয়ে এল সঞ্জয়।

সুধাময় চুপচাপ বসে থাকেন, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। দয়াময়ী একা থাকলেই চোখে জল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। বিভা তখন পাথর।

কটা দিন বিভা আর বাপ্পা সঞ্জয়ের এই পশ্চিমের ঘরখানাতেই কাটাল। দয়াময়ী ওদের কাছে এসে শুতেন। বিভার পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখতেন।

তারপর একদিন বংশীর ঘরে এসে বললেন, বংশী, তুই নীচের কোণের ঘরে তোর সব নিয়ে যা। দিদি এঘরে থাকবে।

কি এমন অন্যায় কথা।

বংশীর মুখ দেখে সঞ্জয়ের মনে হয়েছিল ওকে যেন অপমান করা হয়েছে। সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, মুখ তুলে কথা বলতে পারছে না।

দয়াময়ী অতশত লক্ষ করেননি। মাধোকে ডেকে বললেন, ঠাকুরকে ডাক, দুজনে মিলে ওর টেবিল খাট নীচের কোনার ঘরে নামিয়ে দিয়ে আয়।

'নামিয়ে দিয়ে আয়'। মা কিছু ভেবে বলেনি। কিন্তু কথাটা খট্ করে কানে লেগেছিল সঞ্জয়ের। হয়তো বংশীরও।

মাধোর মধ্যে একটা উল্লাস দেখতে পেয়েছিল। ফাই ফরমাস করলে গড়িমসি করে কাজ করত ও, যত পুরনো হচ্ছিল ততই অবাধ্য হয়ে উঠছিল মাধো।

অথচ দয়াময়ীর কথা শোনামাত্র হাঁকডাক করে ঠাকুরকে এনে হাজির করল। দুজনে মিলে টেবিল চেয়ার নামিয়ে নিয়ে এল। তক্তপোশ বের করতে করতে বংশীকে বললে, চল বংশী, বইপত্তর নিয়ে নীচে নেমে চল।

বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে বংশী নেমে গেল। মুখ নিচু করে।

ফাঁকা ঘরখানার এদিকওদিক তাকিয়ে দয়াময়ী সিলিঙের পাখাটা দেখলেন, বললেন, ওটা থাক।

বিভা আর বাপ্পার জন্যে নতুন খাট একটা আনা হয়েছিল।

দয়াময়ী বললেন, ওটা এঘরে লাগিয়ে দে।

তখন বিভার শোকসন্তপ্ত চেহারা সকলের চোখের সামনে। বিভা আর বাপ্পা। বংশীর কথা কারও মনেও ছিল না। মনে থাকার কথাও নয়।

তাছাড়া, আর তো কোনও উপায়ও ছিল না। ওকে তো আর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়নি। সঞ্জয় নিজেও তো একসময় ওই কোনার ঘরেই ছিল। প্রয়োজন পড়লেই ব্যবহার হত। কত লোকই তো থাকে। নেহাত এ-বাড়িতে প্রয়োজন ছিল না বলেই নীচের তলা ফাঁকা পড়ে থাকে।

অথচ মাধো যেন নৃশংসভাবেই বললে, নীচে নেমে চল বংশী।

মাধোর মুখে কি হাসি সেদিন।

সঞ্জয় ভেবেছিল, বংশী এসে পাখা খুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলবে। তাহলে অস্বস্তিতে পড়তে হত। এমনিতেই বাপ্পার জন্যে পড়ার টেবিল কিনতে হবে। আরেকটা চেয়ার অবশ্য আছে।

না, বংশী কিছুই বলল না।
বংশীর কথা ওরা ভুলেও গিয়েছিল।

এর পরের কয়েকটা মাস সঞ্জয়ের স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে আছে। সে ছবিতে বংশীর মুখ একেবারে আবছা, জলে আঁকা ছবির মত।

সমস্ত গাছপালা উপড়ে দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বাড়িটার ওপর দিয়ে। ঘরের চাল উড়ে গেছে। তারপর কান্নাচাপা গৃহস্থের মত আবার সংসারকে নতুন করে সাজানোর তোড়জোড়।

একটা বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে সুধাময়ের ঘাড়ে।

বিভা। বিভার ছেলে বাপ্পা।

সুধাময় ভেঙে পড়েছেন। দয়াময়ী বড় মেয়ের চোখের আড়ালে পুজোর ঘরে বসে বসে কাঁদেন।

সবচেয়ে বড় সমস্যা বাপ্পা।

বিভা বিষণ্ণ ক্লান্তিতে বললে, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না সঞ্জয়, বাপ্পার যা-হোক ব্যবস্থা তোরাই করে দে।

বিভার বলার প্রয়োজন ছিল না। সুধাময় আগেই ভেবেছেন।

সঞ্জয়কে বলেছেন একদিন, বাপ্পার কি দোষ, প্রদীপ তো নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, একটা ভাল স্কুলও ছিল না ওখানে।

বাপ্পা সেজন্যেই লেখাপড়ায় ভাল হতে পারেনি। এখন সমস্যা, ওকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করতে হবে। ওর নিজের ভবিষ্যৎ, বিভার ভবিষ্যৎ।

সঞ্জয় বললে, জ্যাঠামশাইকে একবার বলে দেখি।

সুধাময় বললেন, আমাদের অফিসের হরেনবাবু একদিন বলছিলেন, কোন একটা মিশনারি স্কুলে যেন চেনা আছে।

এটা জীবনমরণের প্রশ্ন, মর্যাদার প্রশ্ন।

বাপ্পা আমাদেরই একজন। পিতৃহারা ছেলে, অসহায় এক বিধবা মার সন্তান।

জ্যাঠামশাই এলেন। একটা কিছু করতেই হবে, আমাদের বাড়ির একটা ছেলেকে আমরা তো তলিয়ে যেতে দিতে পারি না। এ তো তোদের ওই বংশী নয়, যে লেখাপড়া হল কি হল না তাতে কিছু যায় আসবে না।

অন্যসময় হলে সঞ্জয় বলে বসত, জ্যাঠামশাই, বংশী থার্ড হয়েছে।

কিন্তু ওঁর কথা শুনে কিছু বলল না। বরং বংশীর কথাটা মনে আসার জন্যে ওর নিজেরও যেন খারাপ লাগল। কার সঙ্গে তুলনা।

অফিসের হরেনবাবু একদিন এলেন। সমবেদনায় চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বিভাকে সান্ত্বনা দিলেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, ব্যবস্থা একটা হবেই।

সুধাময়কে বললেন, আফটার অল ভদ্রঘরের একটা ছেলে, সদ্য বাবা মারা গেছে, তার জন্যে কিছু না করতে পারলে তো মহাপাতক হবে।

একটা চিঠি লিখে দিতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। না, এসব চিঠিফিটির কাজ নয়। সঞ্জয়, তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমিও যাব।

তারপর কি ভেবে বললেন, বিভা, তুমিও চলো।

সঞ্জয়ের নিজেরও তাই মনে হয়েছিল। সদ্য বিধবা বিভাকে দেখলে নিশ্চয় একটা সহানুভূতি জাগবে।

সব দিক থেকে চেষ্টা শুরু হয়ে গেল।

জ্যাঠামশাই খুঁজে খুঁজে বের করলেন কোন এক বড় স্কুলের সেক্রেটারির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুব পরিচিত এক হোমড়াচোমড়া পুলিশ অফিসারকে, তাঁকে ফোন করে দিলেন জ্যাঠামশাইয়ের অফিসের চিফ অ্যাকাউন্টেন্টের পরিচিত আই টি ও।

আমাদের সুস্থির মধ্যবিত্ত সমাজের একটি পরিবার তলিয়ে যেতে বসেছে। একটি ছেলের ভবিষ্যৎ। অনেকেই তো তলিয়ে যায়। কেউ সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয় না। কিন্তু তারা নিতান্তই মধ্যবিত্ত। নামেই শুধু। কিন্তু এই পারস্পরিক গ্রন্থিবদ্ধ প্রভাবের জালের মধ্যে তো তারা নেই। সুধাময়ের পরিবার থেকে তারা ভিন্ন। সুধাময় নিজে বিরাট কেউ নন। কিন্তু আত্মীয় বন্ধু সহকর্মী নিয়ে তিনিও সেই প্রভাবশালীদের অংশীদার।

টেলিফোন, চিঠি, ছোটাছুটি, দেখা করা। একটি সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার, একটি পিতৃহারা ছেলে, তার অসহায় বিধবা মা। নিতান্তই ভাল স্কুল পায়নি, বাবা আজ এখানে, কাল সেখানে, ছেলের পড়াশুনোর দিকে চোখ দিতে পারেনি, তার ওপর এই দুর্দৈব।

একটা ঝড় বয়ে গেল বাড়িটার ওপর দিয়ে। কিন্তু শেষ অবধি একটা ভাল স্কুলেই ভর্তি হল বাপ্পা। ভর্তি করা গেল।

সুধাময় বিভাকে বললেন, স্কুলের মাইনে যতই হোক, তুই অত ভাবছিস কেন। আমি তো মরে যাইনি।

সঞ্জয়ের মনে হল জ্যাঠামশাই ঠিকই বলতেন, যে যেখানে আছে সেখানেই তার থাকার কথা। তাকে আমরা নেমে যেতে দিতে পারি না। সে তো আমাদেরই একজন।

ভাগ্যদোষে বাপ্পা একটু পিছিয়ে পড়া ছেলে। বাবা-মা তার দিকে ঠিকমত মনোযোগ দিতে পারেনি বলেই। কিন্তু সঞ্জয় তাকে পিছিয়ে পড়তে দেবে না। এবাড়ির সম্মান-অসম্মান তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এবাড়ির মর্যাদা।

জ্যাঠাইমা একদিন এসে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার কোন ক্লাশ হল বাপ্পা ?

আরেকজন কে যেন সঙ্গে সঙ্গে বয়েস জিগ্যেস করেছিল।

ওরা সকলেই অস্বস্তি বোধ করেছিল। পাশ করো, ভাল রেজাল্ট, একটা চাকরি, তারপর ভাল চাকরি। ব্যাস্, তা হলেই তুমি নিশ্চিন্ত। তাহলেই সকলে নিশ্চিন্ত। তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই রয়ে গেলে। সেই নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততায়। কি ভাবে স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হয়েছিলে, কি ভাবে পাশ করেছো, কে প্রভাব খাটিয়ে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল, কার সুনজরে পড়ে উন্নতি, এ-সব কেউ জানতে চাইবে না। তুমি বংশপরম্পরায় যোগ্যতমদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেলে। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে এই জায়গাটিতে থাকার অধিকার ছিল তোমার জন্মগত।

সঞ্জয়ও ব্যস্ত ছিল বিভা আর বাপ্পাকে নিয়ে। প্রদীপের ইনসিওরেন্স-প্রভিডেন্ট ফান্ড আদায় করা, বিভার জন্যে সেই আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কাজে। বাপ্পার জন্যে দায়িত্বশীল টিউটর জোগাড় করা।

ওরা বংশীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কখন স্কুলে যায়, কখন ফেরে, খবরও রাখত না। নীচের তলার কোনার ঘরটিতে থাকত, নিঃশব্দে পড়াশুনো করত।

হঠাৎ তাই রামজীবনবাবুকে আসতে দেখে বিচলিত হয়েছিলেন সুধাময়। বংশীদের স্কুলের হেডমাস্টার রামজীবনবাবু।

সঞ্জয় বললে, আসুন, আসুন।

নেহাতই ভদ্রতা। রামজীবনবাবু বা বংশী সম্পর্কে তখন আর কোনও কৌতূহল নেই। কিন্তু এসেছেন যখন, নিশ্চয় কোনও খবর আছে।

দোতলায় নিয়ে গেল তাঁকে। সুধাময় আজকাল আর নীচে নামতে চান না।

সুধাময়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, বসতে বললেন।

দু-একটা কথার পর রামজীবনবাবু বললেন, সে কি, আপনারা জানেন না ? আমি তো এ স্কুলে এখন নেই।

—সে কি ! তাই নাকি ? কই বংশী তো বলেনি।

রামজীবনবাবু কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ও।

একটু থেমে বললেন, খুব ভাল স্কুলে চলে গিয়েছি, হেডমাস্টার হয়েই।

স্কুলের নামটা বললেন।

—কলকাতার বাইরে, তা হোক্। বিরাট স্কুল। বড় বোর্ডিং হাউস আছে। অনেক দূর-দূর জায়গা থেকে ছাত্ররা এসে থাকে।

বিদ্যুতের মত দু-একটা ভাবনা সুধাময়ের মাথায় খেলে গেল। বাপ্পাকে ওখানে ওঁর কাছে দিলে কেমন হত। না তার চেয়ে মিশনারি স্কুলটাই ভাল।

ওঁরা কিছু বলার আগেই রামজীবনবাবু বলে বসলেন, আপনার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে।

—বলুন, বলুন।

রামজীবনবাবু একটু ইতস্তত হয়ে বললেন, বংশীকে আমি আমার স্কুলে নিয়ে যেতে চাই। বোর্ডিংয়ে থাকবে। ওর কোনও খরচ লাগবে না। স্কুল ওকে সব ফ্রি করে দিতে রাজি হয়েছে।

সঞ্জয় যেন একটা ধাক্কা খেল। সুধাময় চুপ করে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন, বংশী কি রাজি হবে ?

রামজীবনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, না, ওর সঙ্গে তো কথা হয়েছেই। ও যেতেই চায়। একটা ব্রাইট ছেলে, সুযোগ পেলে ও কিন্তু ভাল রেজাল্ট করবে।

সঞ্জয় ক্ষুণ্ণভাবে বললে, কেন, এ-স্কুলে কি সুযোগ পাচ্ছে না ?

রামজীবনবাবু বললেন, আফটার অল এখানে সকলেই তো ওর পাস্ট হিস্ট্রি জানে। তার ফলে কেউ কেউ যেমন বেশি ইন্টারেস্ট নেয়, তেমনি কেউ কেউ ওকে ঠিক পছন্দ করে না। একজন নাকি ঠাট্টা করে ওকে অনধিকারী বলে ডাকে। তাছাড়া একটা ভাল স্কুলে পড়লে ...এ স্কুলকে তো সকলে টি সি স্কুল বলে। অন্য স্কুলে ফেল করে এসে এখানে প্রোমোশন পেয়ে ভর্তি হয়।

হাসলেন রামজীবনবাবু।

দুদিন আগে এ-সব কথা শুনলে উনি নিজেই হয়তো চটে যেতেন। এখন নিজেই বলছেন।

রামজীবনবাবু আবার বললেন, দেখুন, ভেবে দেখুন। ছেলেটার ভবিষ্যৎ...

সুধাময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ও যখন নিজেই যেতে চায়, যাক না। আমরা কেন আটকাতে যাব।

কিন্তু সুধাময় খুব আঘাত পেয়েছেন।

রামজীবনবাবু চলে যেতেই সঞ্জয় বললে, ও ভালই হয়েছে। আব্দার পেয়ে পেয়ে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিল।

সঞ্জয়ের কথা বোধহয় সুধাময়ের কানে গেল না।

কি যেন চিন্তা করতে করতে বললেন, বংশী নিজেই চলে যেতে চায়।

—যাক্ না। কত সুখে থাকতে পায় দেখা যাবে। বোর্ডিয়ের খাওয়া তো জানে না, তার ওপর বিনা টাকায়।

বংশী এভাবে চলে যেতে চাইবে, চলে যাবে, কেউ ভাবেওনি। অথচ ভেতরে ভেতরে ওরা বোধহয় তাই চেয়েছিল।

দয়াময়ী একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, একেই ভাগ্য বলে। বংশী দিব্যি লেখাপড়ার সুযোগ পেল, আর বাপ্পা আমাদের ঘরের ছেলে...

সঞ্জয় রেগে গিয়েছিল সেদিন।—তুমি কথায় কথায় ওই বংশী বংশী কোরো না তো। ওর সঙ্গে বাপ্পাকে তুলনা করা, বিভার কাছে বাপ্পার কাছে, ওটা ইনসাল্টিং। আমাদের কাছেও।

তবু সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল।

দয়াময়ী দুঃখের হাসি হেসে বললেন, সে জন্যেই বলে পরের সোনা, কানে দিতে নেই।

সুধাময়ের গলায় একটা আবেগ আটকে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যেতে চায়, যাক্।

রামজীবনবাবু ওকে নিতে এলেন একদিন। তাঁকে নীচের বসার ঘরে বসতে বলা হল।

দয়াময়ী বংশীকে কাছে বসিয়ে খাওয়ালেন। যাবার সময় ওর কপালে আবার সেই প্রথম স্কুলে যাবার দিনের মত দইয়ের ফোঁটা এঁকে দিলেন।

বংশী ওঁকে প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে জল এসে গেল বংশীর। দয়াময়ীর চোখ তখন একেবারে ঝাপসা।

বললেন, কত বড় হয়ে গেছিস বংশী। সেই কত ছোট ছিলি।

সত্যি, বংশী তখন দয়াময়ীর কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে।

ও চুপচাপ এসে সুধাময়ের সামনে দাঁড়াল। —বাবু।

বাবু! এ-বাড়ির সকলেই ওর দিদি দাদা, দয়াময়ী তো মা। কিন্তু এই বাবু ডাক ও বদলাতে পারেনি। কেউ বদলাতে বলেওনি কোনদিন।

সুধাময় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে কাগজ পড়ছিলেন, মুখের সামনে থেকে কাগজ সরালেন, এক মুহূর্তের জন্যে তাকালেন বংশীর মুখের দিকে।

বংশী ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সুধাময় সোজা হয়ে বসলেন। কোনও কথা বললেন না।

বংশী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর দয়াময়ীর দিকে ফিরে বললে, আসি মা।

চলে গেল। সঞ্জয় ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। রামজীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। ওটা ভদ্রতা।

দয়াময়ী ঝুল বারান্দায় বংশীর চলে যাওয়া দেখলেন। ওঁরই কিনে দেওয়া সেই টিনের স্যুটকেশ, সতরঞ্চি-মোড়া বিছানা। বইপত্তর। বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা।

সেখান থেকে সরে এসে নিজের মনেই বললেন, এতদিনের মায়া। ওরও খুব কষ্ট হবে, জানিস শুভা।

শুভার কাছে সবটাই কেমন অপমান মনে হচ্ছিল। আমরা তোকে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। ইস্কুলে ভর্তি করলাম, এত বড় হলি। সে তো আমাদের জন্যেই। আজ সুযোগ পেয়েই দিব্যি চলে যেতে পারলি।

ভিতরে ভিতরে একটা রাগ। রামজীবনবাবুর ওপর, বংশীর ওপর।

—ওই হেডমাস্টার লোকটাই...

সঞ্জয় হাসলে। বললে, না। ওঁর কোনও দোষ নেই। বলছিলেন সব...উনি নিজেও

নাকি এভাবেই মানুষ হয়েছিলেন।

তারপর একটু থেমে বললে, ও গেছে বাঁচা গেছে।

আসলে সঞ্জয়েরও বোধহয় অপমান লাগছিল। রাগ হচ্ছিল বংশীর ওপর।

সুধাময়কে শুনিয়ে বললে, ও সেদিন যে-কাণ্ড করেছে, তারপর ওকে তাড়িয়েই দেওয়া উচিত ছিল।

সুধাময় জানতেন না, প্রশ্ন করলেন, কি করেছে ?

সব কথা তো সুধাময়কে বলা হয় না। তাই বলা হয়নি।

বিভা বুঝি একদিন ও স্কুল থেকে ফেরার পর কি একটা কিনে আনতে বলেছিল দোকান থেকে।

বংশী বলেছে, আমার এখন অনেক টাস্ক করতে হবে, আপনি মাধোকে বলুন।

বিভা হাসতে হাসতে বললে, আমি অত বুঝিনি, বাড়িতে রয়েছে, ভাবলাম, ওকেই বলি। ও যে মার পুষ্যিপুত্তুর আমি কি করে জানব।

সুধাময় শুনে বললেন, হুঁ।

সঞ্জয় বললে, সেদিনই ওকে আমি তাড়িয়ে দিতাম।

আসলে এটা অভিমান না রাগ, সঞ্জয় নিজেও বুঝতে পারছে না।

ওরা ধরেই নিয়েছিল বংশী থাকবে, ওদের ওপর নির্ভর করে। ওদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করবে ওর ভবিষ্যৎ।

সুধাময় ধীরে ধীরে বললেন, কার যে কোথায় লাগে, কোথায় কষ্ট, আমরা তো সব বুঝি না। তাছাড়া মানুষ হওয়ার নেশা তো আমরাই ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

শুভা হেসে উঠে বলল, আমরা কি ওকে বুঝিয়েছি ও আমাদের সমান হয়ে যাবে ?

॥ ৬ ॥

সঞ্জয় পাশ করে বেরিয়ে এল, বেকার হয়ে পড়ল। তারপর একদিন চাকরি পেয়ে গেল। যারা চাকরি পায়, তারা যে-ভাবে পায়। হয়তো ভাগ্য। হয়তো যোগাযোগ, হয়তো যোগ্যতা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেছে, দরখাস্ত পাঠিয়েছে। কখনও ইন্টারভিউ পেয়েছে, কখনও পায়নি। ইন্টারভিউ দিয়েও কখনও কখনও খবর নেই। চেনা-জানা বা আত্মীয়স্বজনদের কাছে ধর্না দিয়েছে। সুধাময় চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছেন, সে চিঠি নিয়ে সঞ্জয় এর ওর সঙ্গে দেখা করেছে। তারপর একদিন কিভাবে যেন চাকরি হয়ে গেছে। যারা অযোগ্য তাদের হয়নি। তাদের হয় না।

আমরা চাকরি পাই ? না, ওরা চাকুরে পায় ?

ওর এক বন্ধু রসিকতা করে বলেছিল, আমরা ঝাঁক ঝাঁক ইলিশ হয়ে ছুটছি, ওরা জাল টাঙিয়ে রেখেছে। জালে যে-কটা ধরে, টেনে তুলে নেয়।

না, সঞ্জয় ওর যোগ্যতার জন্যেই চাকরি পেয়েছে। উন্নতি করেছে। ও স্মার্ট। চটপট কথা বলতে পারে, ইংরিজি—হ্যাঁ, পরীক্ষার রেজাল্ট ভালই। এগুলোই কি যোগ্যতা নয় ? ওর মত যোগ্য আরও অনেকে ছিল, পায়নি। একেই কি ভাগ্য বলে ? এ অফিসে একজন চেনা লোক ছিল, সে-ই বলেছিল চেষ্টা করতে। সেও তো যোগাযোগ।

জ্যাঠামশাই ঠিকই বলতেন, যে যেখানে আছে সেখানেই থাকলে শান্তি। সঞ্জয় যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। অন্যেরা ভিড় করে এলে আরও অনিশ্চয়তা।

চাকরি পাওয়ার পর একটাই কাজ। বিয়ে করা। সঞ্জয় বিয়ে করল। তার পর থেকে

এই পশ্চিমের ঘরখানা ওর। ওর আর ঝুমার।

ঝুমা একদিন নীচের তলার ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে। তখন নতুন বউ।

এটা-ওটা দেখতে দেখতে চোখ পড়ল বারান্দার এক কোণে ফেলে রাখা ছোট্ট টেবিলটার দিকে।

মৃদু হেসে কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করল, তোমার ছেলেবেলার পড়ার টেবিল, তাই না?

সঞ্জয় বলে উঠল, না না। ওটা বংশীর।

—বংশী?

সেই প্রথম বংশীর নাম শুনল ঝুমা।

সঞ্জয় বললে, কোণের ঘরে ছিল, রাখার তো জায়গা নেই, তাই।

বলতে গিয়েও একটু অস্বস্তি।

আপিসে একদিন ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দিতে দিতে মধ্যবিত্তদের কথা উঠেছিল। আজকাল প্রায়ই ওঠে।

একজন রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলে, মধ্যবিত্ত মানে কি?

হীরেন বললে, একটা ডিগ্রি, অন্তত পাশ কোর্সে বি এ, একটা চাকরি, বিয়ে করা, ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে পড়ানো, রিটায়ারমেন্ট, মরার পর শ্বেতপদ্মের মালা।

যে প্রশ্ন করেছিল, সে বললে, ব্যাচেলাররা মধ্যবিত্ত নয়?

হীরেনের উত্তর, একসেপশন প্রুভস্ দ্য রুল।

কিন্তু সঞ্জয় বুঝতে পারে, ওসব নয়। আসলে মধ্যবিত্ত বলতে বোঝায় এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, যার মধ্যে কিছুটা উচ্চবিত্তরাও আছে। এই সাম্প্রদায়িকতার বাইরের চেহারাটা মানবিকতা। বিধবা হওয়ার পর কত সহজে বিভা একটা চাকরি পেয়ে গেল।

সমস্যা শুধু বাপ্পাকে নিয়ে। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না।

সেজন্যে ওকে নিয়েই যত লজ্জা।

বংশী চলে যাবার পর ছুটিছাটায় দু-একবার এসেছে। আসত। তারপর আসা-যাওয়া কমতে শুরু করল।

একদিন এল। বেশ হাসিখুশি। আরও লম্বা হয়েছে। হাতে একটা ড্রয়িং খাতা।

সুধাময়ের সামনে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললে, মেসোমশাই, ভাল আছেন?

সুধাময় চমকে চোখ তুললেন।—ও, বংশী। কেমন আছিস? মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো?

'মেসোমশাই' ডাকটা কিন্তু খট্ করে কানে লেগেছে সঞ্জয়ের।

শুভাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছে, ও বাবাকে আগে বাবু বলত না?

—হ্যাঁ রে দাদা। বলে হেসেছে শুভা।

তারপর আবার ফিরে এসেছে বংশীর কাছে।

সরলভাবে প্রশ্ন করেছে, কোন ক্লাস হল তোর!

বংশী একমুখ হেসে বললে, টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, এবারই তা দেব।

—সে কি রে? সুধাময়ও আশ্চর্য হয়েছেন।

আসলে এত বছর পার হয়ে গেছে, ওঁদের নিজেদেরই খেয়াল ছিল না। এর আগে মাঝে মাঝে এসেছে, সব সময় জিজ্ঞেস করা হয়নি।

শুনতে খারাপও লাগে। বাপ্পার কিছু হল না। হয়তো কিছু হবেও না। তাই ও এলে পড়াশুনোর প্রসঙ্গে কেউ যেতে চাইত না। কোথায় যেন ছোট হয়ে যেত সকলে।

খবর পেয়ে দয়াময়ী এলেন।—কত বড় হয়ে গেছিস রে।

হাসলেন, বসতে বললেন।
হঠাৎ সুধাময় প্রশ্ন করলেন, ওটা কি ? অর্থাৎ ওই হাতের খাতাটা।
বংশী হাসতে হাসতে বললে, আপনাকে দেখাতেই তো আনলাম।
বলে খাতাখানার পাতা উল্টে দেখাতে লাগল।
ছবি।
—তোর আঁকা ?
বংশী ঘাড় নাড়ল। —হ্যাঁ।
পাতা উল্টে উল্টে সুধাময় দেখলেন, দয়াময়ী দেখলেন।
সঞ্জয় তেমন কোনও আগ্রহ দেখাল না।
—কেমন হয়েছে মেসোমশাই ?
উদগ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল বংশী। যেন প্রশংসা শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।
সুধাময় পাতা উল্টে সব দেখে খাতাটা বন্ধ করলেন। ফেরত দিলেন। বললেন, ভাল। খুব ভাল।
বংশীর মুখখানা ম্লান দেখাল। ও বুঝেছে, ওই কথার মধ্যে কোনও প্রাণ নেই। তাই নিজেকেই বোধহয় স্তোক দিল, বলল, সবে তো শিখছি। এখন এত পড়ার চাপ, আঁকতে সময়ই পাই না।
তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, বড়দি কই ? দেখছি না।
বড়দি মানে বিভা। সঞ্জয় বললে, বড়দি এখন অন্য বাড়িতে।
একটু থেমে বললে, চাকরি করে। এখান থেকে ওর অফিস অনেক দূর হয়।
এরপরই সেই মারাত্মক প্রশ্ন। ওরাও আতঙ্কিত হয়ে ছিল এতক্ষণ।
বংশী বললে, আর বাপ্পা ? ও এখন কি পড়ছে ?
দয়াময়ী বললেন, কি যেন পড়ছে, জানি না বাপু।
সঞ্জয় আর শুভা সরে গেল।
সুধাময় হাতের খবরের কাগজে মন দিলেন।
দয়াময়ী উঠে গিয়ে প্লেটে করে দুটো মিষ্টি নিয়ে এলেন।
বসে বসে সন্দেশ দুটো খেল বংশী।
তারপর উঠে দাঁড়াল।
সুধাময়ের ঘরে ঢুকল। দেখল। —ঠিক তেমনি আছে, না মাসিমা ? শুধু ক্যালেণ্ডারটা বদলেছে।
দয়াময়ী ওর পিছনে পিছনে এলেন।
বংশী যেন কোনও কথা, কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছে না।
দয়াময়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরের ঘরখানার দিকে গেল। 'বংশীর ঘর'। একসময় সবাই বলত বংশীর ঘর। তারপর থেকে বিভার। এখন টুকিটাকি জিনিসপত্তর আছে, ঘরখানা ফাঁকা।
বংশী এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। একবার বোধহয় সিলিঙের দিকে তাকাল।
তারপর সঞ্জয়ের ঘরে এল।
ঝুমাকে দেখে হাসল, দুহাত জোড় করে বললে, নমস্কার বউদি। একটু থেমে বললে, এর আগের বার এসে শুধু ছবি দেখেছি। আপনি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন।
ঝুমা হেসে বললে, ছবি দেখেই চিনে ফেললে ?
বংশী হাসল। —আমাকে বোধহয় চেনেন না। আমি বংশী।

ঝুমা বললে, চিনি চিনি, ওদের কাছে কত শুনেছি।

বংশী হঠাৎ শুভার দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার বিয়েতে যেন ফাঁকি দিয়ো না শুভাদি।

শুভা হাসতে পারল না। ও তো আগে ছোড়দি বলত। এখন শুভাদি! মেসোমশাই!

সঞ্জয় একটু অস্বস্তি বোধ করল। ওর বিয়েতে বংশীকে একটা কার্ড পাঠানোও হয়নি। ভুলে গিয়েছিল, নাকি ইচ্ছে করেই করেনি এখন আর মনে নেই। কিংবা ঠিকানা কোথায় লিখে রেখেছিল খুঁজে পায়নি।

বংশী হঠাৎ একদিন এসে প্রথম যখন শুনল, খুব লেগেছিল ওর।

বারবার দয়াময়ীকে বলছিল, ছোড়দার বিয়েতে আমি একটু হই হই করতে পেলাম না।

বারবার জিজ্ঞেস করছিল, বউদি কবে আসবেন?

তারপর এই এতদিন বাদে এল। ঝুমাকে দেখল। কিন্তু ও যেন বুঝতে পারছিল, ও এখনও বাহিরি, বাহিরি। কোথায় যেন একটা কাচের দেয়াল রয়েছে। সবই স্পষ্ট দেখা যায়, মনে হয় কাছেই, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। কিন্তু হাত বাড়ানো যায় না। শব্দ শোনা যায়, কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট কোনও কথা বলে না।

বংশী চলে গেল।

আর ঝুমা অবাক হয়ে বললে, ও তো দিব্যি ভদ্রলোকের ছেলে, তবে যে তোমরা কি-সব বলতে!

শুভা আর সঞ্জয় শব্দ করে হেসে উঠল।

ওরা কেন হাসছে ঝুমা বুঝতে পারল না। সঞ্জয় জানে ও বুঝতে পারবেও না। কারণ ও তো চোখের সামনে কিছু দেখেনি। ওর অতীত শুধু শুনেছে। হয়তো বিশ্বাসও হয়নি।

শুধু শুনে বোধহয় বিশ্বাস হয় না। কি করে হবে? বংশী যে এখন একেবারে বদলে গেছে। ওর কথাবার্তা। ওর পোশাকআশাক। হাঁটাচলা, ব্যবহার, নমস্কার করার ভঙ্গি।

শুভা ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে, কত চেষ্টা করে ওর গেঁয়ো কথাবার্তা ছাড়িয়েছি জানো! কিন্তু হলে হবে কি, বাবাকে ওর এখন বাবু বলতেও লজ্জা, অথচ এই সেদিনও বলত।

সঞ্জয় ঠাট্টার ভঙ্গিতে টেনে টেনে বললে, মেসোমশাই।

—আর আমাকে শুভাদি বলছে। শুভা হেসে উঠল।

কিছুক্ষণের জন্যে বংশী একটা ঠাট্টার বস্তু হয়ে উঠল। কারণ ওরা সকলেই তার অতীত জানে। ওরাই ওকে গড়ে তুলেছে।

ঝুমার খুব খারাপ লাগছিল। —কি জানি ভাই, আমার বিশ্বাস হয় না।

সঞ্জয় ভাবল, আসলে আমরা চোখে যা দেখি সেটুকুই বিশ্বাস করি।

একসময় সুধাময় বলতেন, আমরা দুদিন আগে ভদ্রলোক হয়েছি, শিক্ষিত হয়েছি, ওরা দুদিন পরে। সুযোগ দিলে ওরাও হত।

—আমাদের কে সুযোগ দিয়েছিল? সঞ্জয় অবিশ্বাসের সুরে বলত।

সুধাময়ের উত্তর—কাকে কে কোথায় সুযোগ দিয়েছিল তা কি আর আজ জানার উপায় আছে! কেউ দিয়েছিল। অন্তত একটা ইস্কুল খুলে, কিংবা একটা চাকরি দিয়ে।

একটু পরে কি যেন চিন্তা করতে করতে বলেছিলেন, যারা ইস্কুল খুলেছিল, কিংবা অন্য কোনও সুযোগ দিয়েছিল, তারা কিন্তু ভেবেছিল আমরা সকলকে সুযোগ দিতে চাইব, শিক্ষিত করে তুলব। কিন্তু আমরা কি করলাম? আমরা, মানে আমাদের পূর্বপুরুষরাও

সুযোগ পেয়েই আলাদা হয়ে গেলাম, ওদের দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম।

হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, আমরা ওদের বাহিরি করে দিলাম।

সঞ্জয় প্রতিবাদ করে বলেছে, কারণ ওরা অযোগ্য।

সুধাময় হাসলেন। —অযোগ্যদের দিয়েই তো ইংরেজ দেশটা চালাতে শুরু করেছিল।

একটা চটকদার কথা মনে পড়তেই প্রতিবাদ ভুলে গেল সঞ্জয়, হাসতে হাসতে বলেছে, সেজন্যেই বোধহয় অযোগ্যরাই চালাচ্ছে আজও।

সুধাময় এখন কিন্তু ওসব কথা বলেন না।

বাড়ির মধ্যে একটা বাপ্পা এসে ওঁর সমস্ত মত বদলে দিয়েছে। কিংবা সুধাময় নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ে গেছেন।

সঞ্জয়েরও এক একসময় তাই মনে হয়। আমরা দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে পারি, কাছে টেনে নিতে পারি না। আমরা ওদের ভাল চাই, সমান হতে দিতে চাই না।

কারণ ওই দূরত্ব না থাকলে আমরা নিরাপদ থাকব না। নিরাপত্তা থাকবে না। সেজন্যেই তো জ্যাঠামশাই বলেন, যে যেখানে আছে সেখানেই থাক। ব্রজবাবু বলেন, ওদের বরং রোজগারের পথ করে দাও, হাতের কাজ শেখাও।

আমরা যারা যোগ্য তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নয়। তারা যোগ্যতা দিয়েই জয় করবে,—ভোগ, ঐশ্বর্য, মানসম্মান, প্রতিপত্তি। আশি ভাগ যাদের হাতে আছে তারাই পাবে। ভয় আমাদের মধ্যে যারা অযোগ্য তাদের নিয়ে। ওই বাইরের অযোগ্যরা এসে আমাদের মধ্যে যারা অযোগ্য তাদের হটিয়ে দেবে। তখন তো আমাদেরই মানসম্মান থাকবে না।

বাপ্পাকে নিয়ে সেজন্যেই তো এত চিন্তা।

এত ভাল স্কুলে দেওয়া হল, কত চেষ্টাচরিত্র করে, ধরাধরি করে ভর্তি করা হল। খুঁজে খুঁজে কত ভাল টিউটর রাখা হল। কিন্তু বাপ্পা সেই কোনরকমে পাশ করল। শুধুই পাশ।

তাও গোপন রাখতে হয়, কাউকে বলা যায় না। জ্যাঠামশাইয়ের আপিসের সুখেনবাবু, তাঁর দাদা ছিলেন ট্যাবুলেটর, তাঁকে ধরে একটা বিষয়ে তিন নম্বরের জন্যে ফেল ছিল...

সুখেনবাবু বলেছিলেন, ওই তিনটে নম্বর আপনা থেকে দিয়ে দেবারই কথা, কে আর দেয় বলুন...

শেষ অবধি বাপ্পা পাশ করল। কিন্তু বি-এ পর্যন্ত যদি এভাবে উতরে যেত, তা হলে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারত। তখন যাই করুক, ও একজন শিক্ষিত সভ্য ভদ্রলোক। তখন আর বাপ্পা এবাড়ির লজ্জা নয়।

এখন বংশী এসে জিজ্ঞেস করে, বাপ্পা কি করছে মাসিমা।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথা নিচু হয়ে যায়।

শুভা বললে, ওটা ওর অহঙ্কার। ও ভুলে যায় আমরাই তো ওকে নিয়ে এসে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। নেহাত ওই হেডমাস্টারের সুনজরে পড়েছিল, তাই...

সঞ্জয় বললে, হেডমাস্টারের ফেবারিট বলেই ওর ওইসব থার্ড হওয়া, ফার্স্ট হওয়া। বোর্ডের পরীক্ষায় বোঝা যাবে।

যেন মনে মনে ওরা চাইছিল বংশীর অহঙ্কার চূর্ণ হোক।

শুধু ঝুমা বললে, অহঙ্কার বলছ কেন? ও হয়তো ভাবছে, তোমরা শুনে খুশি হবে। দেখলে না, ওর আঁকা ছবিগুলো দেখাতে এসেছিল। মায়া না থাকলে, কৃতজ্ঞতা না থাকলে কি আসে বারবার।

শুভা মুখ বাঁকাল। —তুমি ওকে কতটুকুই বা জানো বউদি।

সত্যি, মানুষ মানুষকে কতটুকুই বা জানে। জানতে পারে।

বংশীর সম্পর্কে ওদের কোনও আগ্রহও ছিল না। ওরা ব্যস্ত ছিল নিজেদের নিয়েই। বাপ্পাকে নিয়ে।

প্রথম প্রথম বাপ্পার কথা আপিসের কারও কাছে বলতে পারেনি সঞ্জয়, গোপন রেখেছিল। এ-কথা কি বলা যায় নাকি। কিন্তু শেষ অবধি না বলেও পারল না। যদি কেউ কিছু পথ বাতলে দিতে পারে।

—কি করা যায় বলো তো হীরেন ?

হীরেন সান্ত্বনা দিল।—সকলেই কি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে নাকি ? না হলেই সে আর মানুষ নয় !

—না না, মানে একটা ডিগ্রিও যদি থাকত। অন্তত বি এ ডিগ্রিটা।

হীরেন বললে, একটা কোনও বিজনেস করে দিলেই তো হয়, কিংবা কোনও টেকনিক্যাল কিছু পড়াও। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

সঞ্জয় বিভ্রান্তের মত বললে, হাতের কাজ !

হীরেন বলে উঠল, না না, টেকনিক্যাল কিছু।

সঞ্জয় এসে বিভাকে বললে।

বিভা প্রথমে অবাক হল। তারপর ক্ষোভ আর অভিমানে বলে উঠল, শেষ অবধি তাই করবে, উপায় কি। তোদের কাছে নিয়ে এলাম, ভেবেছিলাম তোরা কিছু একটা করবি...

সঞ্জয় আহত বোধ করল। নিজেকে ওর ভীষণ অক্ষম আর অসহায় মনে হল। এই ছেলেটার কথা কারও কাছে গিয়ে বলা যায় না। বললেও কেউ কিছু করে দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। হয়তো পারবে না। মাঝ থেকে গোপন ক্ষতস্থানটা প্রকাশ হয়ে যাবে। একটা লুকোনো পারিবারিক কলঙ্কের মত ওটা তাই চেপে রাখতে হয়।

'টেকনিক্যাল কিছু পড়াও'। সঞ্জয়ের অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল, ব্রজবাবু বলেছিলেন, বংশীকে হাতের কাজ কিছু শেখাও। করে খেতে পারবে।

নিজের মনেই সঞ্জয় ভাবল, আমাদের মুখের ভাষার শব্দের মধ্যেও কেমন অদ্ভুত একটা শ্রেণীবিন্যাস আছে। আছে বলেই তো আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকতে পাই।

এই সময়েই একদিন রামজীবনবাবু এসে সুধাময়ের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। উৎফুল্ল মুখে বললেন, প্রথমেই আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমি তো জানি, শুনে আপনিই আজ সবচেয়ে সুখী হবেন।

সুধাময় প্রথমে রামজীবনবাবুকে চিনতেই পারেননি।

রামজীবনবাবু নিজেই মনে পড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আপনার বংশীধর দু-দুটো লেটার পেয়েছে। টু ডে আই অ্যাম দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, না, ভুল বললাম। আজ হ্যাপিয়েস্ট ম্যান বোধহয় আপনি। তারপরই অবশ্য আমি। আপনার কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, দায়িত্ব পালন করেছি। অবশ্য আরও ভাল রেজাল্ট করা উচিত ছিল ওর।

সুধাময় হাসবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

শুধু দয়াময়ী বললেন, বেঁচে থাকুক, বড় হোক্।

বংশীও এসেছিল। ওকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। কিন্তু কেউই জিগ্যেস করল না ও এখন কি পড়বে, কোথায় পড়বে।

রামজীবনবাবুকে দেখেই সুধাময় একটু আতঙ্কিত হয়েছিলেন।

বংশীকে আসতে দেখেই সাবধান হয়ে গেলেন। কোনও প্রশ্নই করলেন না।

প্রশ্ন করলেই টাকার কথা না তুলে বসে বংশী। সাহায্যের কথা। রামজীবনবাবু যতক্ষণ ছিলেন সুধাময় ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছেন। সাহায্যের কথা না বলে বসেন।

বললেও দিতে পারবেন না। এখন আর সেই সঙ্গতিও নেই। রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে। শুভার বিয়ে দিতে হবে।

বংশীকে দেখেও তাই শঙ্কিত হলেন। ও বোধহয় সেজন্যেই এসেছে।

সঙ্গতি থাকলেও দিতেন কিনা সন্দেহ। ওদের জন্যে কিছু করে কোনও লাভ হয় না। শুধু অহঙ্কার বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ওরা উল্টে আমাদেরই অপমান করে বসে।

—বাপ্পা ঢুকেছে কোথাও ? কি করছে ও ?

আবার প্রশ্ন করল বংশী।

সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল সঞ্জয়ের। রাগ চাপা দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বললে, একটা কিছু তো করবেই, ভদ্র ঘরের ছেলে যখন, ভিক্ষে তো আর করবে না।

বংশী কিন্তু খোঁচাটা টের পেল না। কিংবা বুঝতে পারল না।

সরল ভাবেই বললে, আজকাল তো কত রকম সব হয়েছে। পড়া মুখস্থ করে পাশ করাই তো সব নয়।

এমনভাবে বলল, যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ও চলে যাবার পর সঞ্জয়ের মনে হল আমরা আমদের পাপেই আবদ্ধ হয়ে গিয়েছি। এখন পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছি হাতের কাজকে সম্মান জানিয়ে। যতদিন আমরা আলাদা হয়ে থাকতে পেরেছিলাম, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেছি। এখন নিজেরাও বাধ্য হচ্ছি বলেই হাতের কাজকে সম্মান দিতে চাইছি। অথচ সত্যি ওর মধ্যে তো কোনও অসম্মান নেই, অসম্মান ছিল না। আমরাই তো সমাজটাকে এইভাবে গড়ে তুলেছি। এখন নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ছি।

কিন্তু বংশী কোনও সাহায্য চাইল না বলে খারাপ লাগছে। ওর গায়ে তো একটা সস্তা ছিটের জামা, রামজীবনবাবুর অবস্থা খুব সচ্ছল বলে তো মনে হয়নি।

ওরা ধরেই নিয়েছিল কলেজে পড়ার খরচ চালানোর জন্যে সাহায্য চাইবে। কি পড়বে কে জানে। ও যা অ্যাম্বিশাস, ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়তে পারে। হয়তো চান্সও পেয়ে যাবে।

ও যদি সাহায্য চাইত, সাহায্য করা যেত না ঠিকই। কিন্তু সাহায্য চাইবে না কেন !

মনে মনে ভাবল, হয়তো রামজীবনবাবু ওকে আশ্বাস দিয়েছেন।

সঞ্জয় ক্ষোভের সঙ্গে বললে, ওর এখন সাহায্য চাইতেও অপমান লাগে। ও তো এখন আর নুলো ভিখিরির হাতুয়া নেই।

ঝুমা সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাল।—ও কথা বলছ কেন, ওর হয়তো প্রয়োজন নেই। আর চাইলেও তো তোমরা দিতে পারতে না।

শুভা বললে,পারতাম না নয়, দিতাম না। ওর কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা আছে নাকি। ও ভাবছে আমাদের সমান হয়ে গেছে। কিংবা স্বপ্ন দেখছে আমাদের চেয়েও ওপরে উঠে যাবে।

ও ভাবছে, আমাদের সমান হয়ে গেছে।

সঞ্জয় বললে, ওকে আমরা সমান ভাবতাম, বাড়ির লোক করে নিয়েছিলাম, সেটা আমদের মহানুভবতা। 'মহানুভবতা' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে সঞ্জয় হেসে ফেলল। তারপর শুভার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, তা বলে ও নিজেও সমান ভাববে নাকি। ব্যাটা চিরকাল বাবু বলে এসেছে, এখন বাবু বলতেও লজ্জা।

শুভা হেসে বললে, দিব্যি চাঁদপানা মুখ করে বলে 'মেসোমশাই'।

সঞ্জয়ও হেসে উঠল।

ঝুমা ক্ষীণ প্রতিবাদ করল। —তাতে অন্যায় কি করেছে। ও তো আমাদের সমানই হয়ে গেছে।

শুভা বললে, তুমি ওর পাস্ট জানো না বলেই একথা বলছ। ওর পাস্ট তো তুমি দেখোনি। নোংরা শতচ্ছিন্ন জামা গায়ে কাদা মাখা একটা ভিখিরির ছেলে, ওর মা ওকে বেচে দিয়ে গিয়েছিল, মাকে বলে কিনা মাসিমা। হেসে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, সে-কথা ভাবলেও আমার গা ঘিন ঘিন করে।

হয়তো সত্যি। সত্যিই হয়তো ওই দৃশ্যটা শুভা চোখের আড়াল করতে পারে না।

অনেকদিন পরের কথা।

শুভা একদিন বাড়ি ফিরেই রাগারাগি শুরু করে দিল।

দয়াময়ীকে দেখতে পেয়েই বললে,জানো তোমার পোষ্যপুত্রের কি কাণ্ড।

দয়াময়ী বুঝতে না পেরে চোখ তুলে তাকালেন। —কি হয়েছে?

—কি হয়নি তাই বলো।

ধীরে ধীরে সকলেই শুনল।

বংশী কলেজে পড়ছে তা জানত। আজকাল আসা-যাওয়া খুবই কমে গেছে ওর।

শুভা একটা বাসে উঠেছে। উঠে বসার সিট আছে কিনা খুঁজছে, দেখে বংশী বসে আছে। গায়ে সেই সস্তা ছিটের শার্ট, প্যান্ট। ও উঠে দাঁড়াল না পর্যন্ত, পাশের খালি সিটটা দেখিয়ে বললে, এখানে বসুন শুভাদি, সিট আছে।

শুভার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠেছে।

ঝুমা বললে, বা রে তাতে কি দোষ হল?

শুভা আরও রেগে গেল। বললে, বাসেট্রামে একটা অচেনা বাজে লোকের পাশে বসা যায়। কিন্তু চেনা...একটু থেমে বললে, বাড়ির একটা চাকরকে ছাড়িয়ে দিয়েছ তুমি, সে এখন অন্য কাজ করে, তুমি তার পাশে বসবে? ঘেন্না করবে না?

ঝুমা কোনও কথা খুঁজে পেল না। শুধু বললে, তোমরা তো বলো ও চাকর ছিল না, বাড়ির লোকের মত ভাবতে।

সঞ্জয় ঝুমার কথায় রেগে গেল। বেশ উত্তেজিতভাবে বলল, বাড়ির লোকের মত ভাবতাম, বাড়ির লোক ভাবতাম না। ভুলে যাচ্ছ কেন, ও একটা ভিখিরির বাচ্চা।

সঞ্জয় নিজের মনেই বললে, কি অড্যাসিটি!

শুভা বললে, আমি পরের স্টপেই নেমে পড়েছি। ওকে বললাম, ভুলে অন্য বাসে উঠেছি।

॥ ৭ ॥

দেখতে দেখতে সেই বংশী কত ওপরে উঠে গেছে।

সঞ্জয়ের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। দয়াময়ী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন, ওখানে দাঁড়িয়ে নীচে উঁকি দিয়ে দেখছেন বংশীকে। সিঁড়ির তলায় খেতে বসে বংশী ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করছে। এক টুকরো মাছ নিয়ে ঝগড়া।

সেদিন ছেলেটাকে লোভী মনে হয়েছিল।

আপিসে একদিন মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছিল সঞ্জয়। —দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটত না, একটু দয়া ভালবাসা পেতে না পেতে ওদের দাবি শুরু হয়ে যায়। মাছ

চাই, মাথার ওপর পাখা চাই, আরও কত কি !

শুনে হীরেন হেসে বলেছে, লোভী তো আমরা সকলেই। ওকে দোষ দিয়ে লাভ কি। বেকার ছিলাম যখন, একটা চাকরি পেলেই বর্তে যাই, কিন্তু তারপর দাবি তো আমাদের বাড়তেই থাকে। শুধু একটা চাকরি পেয়েছি বলেই আমরা কি কেউ কৃতজ্ঞ থাকি।

হীরেন হাসতে হাসতে বলে, মানুষ অসন্তুষ্ট অতৃপ্ত বলেই তো উন্নতি করে। একদিক থেকে তো ভাই মানুষের এই সভ্যতা অতৃপ্তির দান।

সঞ্জয় আর কথা বাড়ায়নি। এদের বোঝানো যাবে না কোথায় ওর ব্যথা, কোথায় ওর সেই গোপন ক্ষত।

আসলে ও হয়তো নিজের সঙ্গেই প্রবঞ্চনা করছে। বাপ্পা, বাপ্পাই আমাদের লজ্জা, আমাদের অপমান।

কিন্তু সত্যি কি তাই ? সঞ্জয়ের এক একসময় মনে হয় বংশীর এই উন্নতি, এই দ্রুত ওপরে উঠে যাওয়া, বোধহয় সঞ্জয়কেও নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। ওদের সকলকে।

সুধাময় অবসর নিয়েছেন। শুভার বিয়ের ভাবনা। সঞ্জয়ের একার রোজগারে এত বড় সংসারের ভার। সঞ্জয় ওপরে উঠেছে, ভাল মাইনে পায়, তবু এত বড় একটা সংসার।

দয়াময়ী একদিন দুঃখ করে বলছিলেন, সবই ভাগ্য। বংশী চরচর করে কোথায় উঠে গেল !

আসলে বলতে চাইলেন, আমরা কত নেমে যাচ্ছি।

এ-সব কথা শুনলে সঞ্জয়ের মনে হয় যেন দয়াময়ী ওকেই অযোগ্য বলতে চাইছেন। যেন ওর সঙ্গে বংশীকে তুলনা করা হচ্ছে।

যেন বংশী ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য পিছন ফিরে তাকালে সঞ্জয় দেখতে পায় ও নিজেও তো অনেক ওপরে উঠে গেছে। অনেক। এবং তার জন্যে ও মনে মনে বেশ তৃপ্ত ছিল। আর সামান্য মাইনে বাড়লেই সংসারের চাকা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ না করেই চলবে।

কিন্তু এখন একটা দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেন বংশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে ওকে। অথচ কেন, তা নিজেই বুঝতে পারছে না।

জ্যাঠামশাই ঠিকই বলতেন, যে যেখানে আছে সেখানেই থাকলে কত শান্তি। কিন্তু আমরাও কি সেখানেই থাকতে চাই ? জ্যাঠামশাই চেয়েছিলেন ?

বাহিরি !

কথাটা মনে পড়ল সঞ্জয়ের। শুধু ওদের বেলাই আমরা এসব কথা বলি। বংশী তো এখনও আমাদের কাছে বাইরের লোকই রয়ে গেছে। বাসে ট্রামে হাজার অচেনা-বংশীর পাশে বসতে লজ্জা নেই শুভার, যত লজ্জা বংশীর পাশে বসতে। কারণ ও বংশীর অতীতটা জানে। সেটা কিছুতেই যেন বংশীকে ছেড়ে যাচ্ছে না।

ও কি বুঝতে পেরেছিল, শুভা ওর পাশে বসতে চায়নি বলেই চটপট পরের স্টপে নেমে গেছে ?

ছি ছি, তুমি তা বলে ওর পাশে বসলে না ? ঝুমা বলে উঠেছিল।

—ও কি ভাবল বলো তো ? অপমান লাগবে না ওর ?

সঞ্জয় রেগে গিয়ে বলেছিল, তুমি তো দেখছি ওর ভক্ত হয়ে গেছ ! পরীক্ষায় দুটো নম্বর বেশি পেয়েছিল বলে ও কি সকলের মাথা কিনে নিয়েছে নাকি ?

ঝুমা মজা করে হেসেছে। — রেগে যাচ্ছ কেন ? ওদের মত কেউ যখন শুধু পাশ

করে, নম্বর নাই বা বেশি পেল, সে কিন্তু আমাদের শুধু পাশ করা যোগ্যতার চেয়ে বেশি যোগ্য।

হাসতে হাসতে বললে, আমাদের বাড়ির একটা জমাদার, তার ছেলেকে ইস্কুলে দিয়েছিল। এসে একদিন কি বললে জানো, ছেলে এসে নাকি ওকে বই দেখিয়ে পড়ে দিতে বললে, ইস্কুলে শুনে ভুলে গেছে। জমাদারটা বলেছিল, বহুত শরম লাগে দিদি।

ঝুমা হাসতে হাসতে বললে, সেই ছেলেও পাশ করল। তুমিই বলো, তার চেয়ে কিছু বেশি নম্বর পাওয়া ছেলের চেয়ে সে কি বেশি যোগ্য নয়?

সঞ্জয় কোনও উত্তরই দেয়নি। এটা কি কোনও যুক্তি নাকি? মেয়েদের মাথাতেই এ-সব উদ্ভট কথা আসে। এত লেখাপড়া শিখিয়েও ওরা সেজন্যেই উপযুক্ত হল না। শুধু ডিগ্রি পায়, ফার্স্ট হয়, তবু প্রাকটিক্যাল ফিল্ডে ওদের দিয়ে কোনও কাজ হয় না।

সঞ্জয়ের হঠাৎ মনে হল, মেয়েরাও তো বাহিরি ছিল, এই সেদিন অবধি। ওরা এখন সমান হয়ে গেছে, সমান হতে চাইছে। তা হোক, আপত্তি নেই। ওরা তো আমাদেরই লোক।

কিন্তু ওই বংশী। তার এই অহঙ্কার সহ্য করা যায় না।

একবার এসে বলে গিয়েছিল, চাকরি পেয়ে গেছি মেসোমশাই।

বোধহয় বলার প্রয়োজন ছিল না। ওরা নিজেরাই বংশীকে দেখে চমকে গিয়েছিল। বুকের ভিতরে কুলকুল করে হেসেছে।

দামি ট্রাউজার্স, চেক চেক শার্ট, পায়ে দামি জুতো। হাঁটার ধরনটাই বদলে গেছে। বসার কায়দা। কথাবার্তায় কেমন একটা আত্মবিশ্বাস।

তারপরই সেই পুরনো কথা।—ছোড়দা, বাপ্পার কিছু একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেন?

সঞ্জয় অনেক কষ্টে রাগ চেপেছে। ওর নিজেরই ভয় হয়েছে, বোমা হয়ে ফেটে পড়বে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে, একটা কিছু হবেই। আমাদের বাড়ির ছেলে কি আর বসে থাকবে।

বংশী মাথা নেড়ে বলেছে, হুঁ।

তারপর কি ভেবে বলেছে, বিভাদির ঠিকানাটা দিন না, গিয়ে একদিন দেখা করব। কতদিন দেখিনি।

ওরা এড়িয়ে গেছে। সুধাময় বলেছেন, ঠিকানা তো জানি না, বাড়িটাই চিনি।

ঠিকানা দেননি।

অকারণ তাকে গিয়ে জ্বালাবে। বিব্রত করবে। আমাদের কাছে বাপ্পাকে নিয়ে যা বলছে বলুক, বিভার কাছে আরও বেশি অপমান লাগবে।

হাবেভাবে সঞ্জয় বুঝিয়ে দিয়েছে, এ-বাড়িতে বংশী অবাঞ্ছিত। তবু কেন যে আসে।

জীবনে একটা ভুল করলে যেন সে ভুলের আর প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তারপর এই এতদিন বাদে, আবার এসেছিল। রবিবারের দুপুরটাই নষ্ট করে দিয়ে গেল।

কলিং বেল বাজছিল অনেকক্ষণ থেকে। কেউ গেল না দেখে শেষ অবধি ঝুমাকেই যেতে হয়েছিল।

নেহাত সঞ্জয়কে রাগাবার জন্যেই হয়তো ও বংশীর পক্ষ নিয়ে কথা বলত। অথবা বংশীর অতীতটা দেখেনি বলেই। কিন্তু ওদের কাছে শুনে শুনে এখন ঝুমাও আর বংশীকে সহ্য করতে পারে না।

বংশীর পোশাক-আশাক, হাঁটাচলা, কথাবার্তা সবেতেই যেন একটা দম্ভ দেখতে পায়। যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছে, আমি কোথায় উঠে গেছি দেখো।

নিজের অজান্তে সঞ্জয়ের সঙ্গেই তুলনা করে ফেলে। খারাপ লাগে।

বংশী চলে যাবার পর দয়াময়ী বলে ফেলেছিলেন, আসলে ছেলেটা খুবই বোকা, বুঝলি, ইচ্ছে করে ও-সব করে না।

কি যে করে ও, স্পষ্ট করে কেউ বলেও না। বলার মত নয়ও। অথচ বুকে এসে লাগে।

ছেলের কাছে ধমক খেয়ে দয়াময়ী নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কোথায় আর যাবেন। কোথাও তো তাঁর শান্তি নেই।

সুধাময় তো মুখ ফিরিয়ে শুয়েই রইলেন, ছেলেটার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

দয়াময়ীর একবার মুখেও এসে গিয়েছিল, হ্যাঁ রে ও অহঙ্কার দেখাচ্ছে, না তোদের অহঙ্কারে লাগছে।

বলে ফেললে একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে যেত। ভাগ্যিস বলেননি।

তবু ওঁর মনের মধ্যে একটা লোভ জাগছিল। একটা ক্ষীণ আশা।

বাপ্পার জন্যে তো চিন্তার শেষ নেই। সুধাময়েরও।

প্রদীপ, ওঁর জামাই, বেঁচে থাকলে এত চিন্তা ছিল না। বিভা বিধবা মানুষ, চাকরি একটা পেয়েছে, কিন্তু চাকরি নিয়েই ব্যস্ত। বাপ্পার জন্যে কিই বা করবে।

দয়াময়ী আবার এলেন সঞ্জয়ের ঘরে। ইতস্তত করে শেষ অবধি বলেই ফেললেন, তুইও তো বাপ্পার জন্যে কিছু করতে পারলি না।

সঞ্জয় রেগে গেল।—পারলে কি করতাম না তোমার ধারণা? বারবার ও-কথা কেন বলো।

দয়াময়ী বললেন, ওর জন্যে যে আমার রাতে ঘুমিয়েও শান্তি নেই। একটাই তো নাতি।

সঞ্জয় বললে, সে-কথা তো আপিস শুনবে না। বড় সাহেবকে যে বলব, বলতেও লজ্জা। তাছাড়া একটা মিনিমাম যোগ্যতা তো থাকবে!

এ-সব কথা সঞ্জয় বহুবার বলেছে। দয়াময়ী বোঝেন না। বিভাও হয়তো বোঝে না। সেজন্যেই সঞ্জয়ের আরও কষ্ট। এ-সব কথা যখন শোনে, সঞ্জয়ের নিজেকে বড় অক্ষম মনে হয়। অসহায় মনে হয়।

দয়াময়ী ইতস্তত করে বললেন, সেজন্যেই তো বলছিলাম....

বলে থেমে গেলেন।

অপেক্ষা করে থেকে সঞ্জয় প্রশ্ন করল, কি বলছিলে?

দয়াময়ী থেমে থেমে বললেন, ওর সঙ্গে যদি তোরা একটু ভাল ব্যবহার করিস।

—কার সঙ্গে আবার খারাপ ব্যবহার করলাম!

দয়াময়ী মৃদুভাবে বললেন, বংশীর কথা বলছি। ও তো নিজেই বলছিল, চেষ্টা করছে, তোদের বলতে হবে না, ধর্ আমিই যদি ওকে বলি একটা কিছু করে দিতে...

সঞ্জয় বেগে ফেটে পড়ল।—তোমার কি মানসম্মান বলে কিছু নেই? বংশীকে বলবে? তুমি নিজের মুখে বংশীকে বলবে?

দয়াময়ী চুপ করে গেলেন। ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

কেন বলা যায় না, কি হয় সে-কথা বললে, কিছুই বুঝলেন না। মনে মনে ভাবলেন, ও তো ছেলের মতই ছিল, তোরা তো পুষ্যিপুত্তুর বলতিস।

দয়াময়ী চলে যেতেই ঝুমাও ছি ছি করে উঠল। এখন ঝুমাও বংশীর পক্ষ নিয়ে একটা

কথাও বলে না। বলতে পারে না।

একজন অসহায় মানুষের উপকার করা যায়। অক্ষমকে হাত ধরে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে সাহায্যের হাত বাড়ানো যায়। কিন্তু সেই মানুষই যখন সবল আর সক্ষম হয়ে ওঠে, সমান হয়ে দাঁড়াতে চায়, কিংবা তাকেও ছাড়িয়ে যায়, তখন সে অসহ্য, অসহ্য। তার ওপর বংশীর হাবেভাবে তো রীতিমত একটা দম্ভ। সম্ভব হলে এখনও তার ওপর কৃপাবৃষ্টি করা যায়, তার কাছে কৃপার জন্যে প্রার্থী হওয়া যায় না। সেটা অপমান।

দয়াময়ী কেন যে বোঝেন না!

সঞ্জয় শুভাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, ভাগ্যে থাকলে আমারই আর-এম হবার কথা, যদি হই, তখন হয়তো জি এমকে বলেকয়ে একটা ব্যবস্থা করতে পারব।

আর-এম হবার জন্যে ওর মনের মধ্যে খুব যে একটা তাগিদ ছিল তা নয়। দিব্যি সুখেই ছিল ও। তৃপ্ত। কিন্তু আর-এম রেজিগনেশন দিয়েছে শোনার পর থেকেই একটা দুর্ভাবনা। ওকে ডিঙিয়ে অন্য কেউ না হয়ে যায়। বিশেষ করে হীরেনকেই ভয়। ও জি এমের খুব প্রিয়। এ-সব আপিসে সিনিয়রিটির কোনও দাম নেই।

যেদিন শুনেছে সেদিন থেকে মনে শান্তি নেই। অথচ ঝুমাকে বলতেও পারেনি, বলতে চায়নি। যদি শেষ অবধি না হয়, এই ভয়ে।

রাগের মাথায় বলে ফেলল। বলে ফেলেই মনে হল না বললেই ভাল ছিল।

বাপ্পার একটা ভদ্র গোছের চাকরি জুটিয়ে দেওয়া, এটাই যেন একটা শক্তির পরীক্ষা। বাপ্পাকে কেন্দ্র করেই এখন বংশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে। কি লজ্জা!

ভিতরে ভিতরে সঞ্জয়ের একটু ভয়ও হয়। দম্ভের তো শেষ নেই, বংশী সত্যি সত্যি না একটা চাকরি করে দেয় বাপ্পাকে।

মা যেমন লোভী, বাপ্পার চিন্তায় যেমন অস্থির, বিভা তো এ-সবকে কোনও দামই দেয় না। হয়তো চাকরিটা নিয়েই বসবে।

তবু এক-এক সময় বংশীর জন্যে গর্বও হয়। ও তো আমদেরই হাতে গড়া মানুষ। দয়াময়ীর স্নেহমমতা না থাকলে ও আজ কোথায় পড়ে থাকত! সেই প্রথম দিকে সুধাময়ের চেষ্টা, সঞ্জয়ের চেষ্টা। সঞ্জয় তো এখনও দেখতে পায়, শুভা ওকে ধমক দিচ্ছে, পেলিয়ে নয় রে, পেলিয়ে নয়, পালিয়ে। বংশীর কৃতজ্ঞতা না থাকতে পারে, কিন্তু ওরা তো ভুলে যায়নি।

সঞ্জয়ের পর মুহূর্তে মনে হল কারই বা থাকে। কৃতজ্ঞতা জিনিসটাই এখন উবে গেছে। স্কুলের মাস্টারমশাইকে দেখে সঞ্জয় নিজেও তো সেদিন ফুটপাথ বদলাল। প্রণাম তো দূরের কথা।

কিন্তু দেখা হয়ে গেলে নিশ্চয় অহঙ্কার দেখাত না।

দয়াময়ী অবশ্য ওটাকে দম্ভ বলে মনেই করেন না। সে জন্যেই তো আরও রাগ হয়, আরও অভিমান।

বলে বসলেন, তুইও তো বাপ্পার জন্যে কিছুই করতে পারলি না।

এ ধরনের কথা শুনলেই অক্ষম রাগে সঞ্জয়ের সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে। বড় অসহায় লাগে।

বংশী এমনিতেই তো রবিবারের দুপুরটা নষ্ট করে দিয়ে গেল। তার ওপর মার এই সব কথা। যেন সঞ্জয় ইচ্ছে করেই কিছু করছে না। তাও সহ্য করা যেত। কিন্তু বলে বসল কিনা, বংশীকে বলবে। বাবা রিটায়ার করার পর থেকে মার আত্মসম্মান জ্ঞানটাও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যার কাছে ওদের সবচেয়ে বড় পরাজয় তার কাছেই হাত পাতা। কি লজ্জা কি লজ্জা। মা কি করে যে ভাবতে পারল।

বাড়ির মধ্যে থাকতেই ইচ্ছে করছিল না সঞ্জয়ের। চার দেয়াল, এই পরিচিত মুখগুলো, মার কথা, কল্পনায় দেখা বিভার অভিযোগের চাউনি, সব মিলে মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়ে গেল।

বিকেলটা কোনও রকমে মুখ বুজে কাটিয়ে সন্ধেবেলা বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে ভিতরটা ছটফট করে উঠল। বাইরে বেরিয়ে গেলেই যেন এসব থেকে পরিত্রাণ পাবে। এখানে, ঘরের মধ্যে আবহাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

আলনা থেকে শার্ট নিতে গিয়ে পেল না।

ঝুমার দিকে তাকিয়ে বললে, শার্ট ?

ঝুমা নির্বিকার ভাবে বললে, সে তো ডাইং ক্লিনিঙে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাধো সকালেই দিয়ে এসেছে।

আর তখনই সঞ্জয়ের মনে পড়ে গেল। বললে পকেটে টাকা ছিল, রেখেছ ?

ঝুমা চমকে উঠে বলল, কই না তো। টাকা ছিল ?

সঞ্জয় রাগে ফেটে পড়ল। —দু-দুখানা দশ টাকার নোট। হাজার বার বলেছি, পকেট না দেখে পাঠাবে না।

ঝুমা চিৎকার করে ডাকল, মাধো ! মাধো !

সঞ্জয় ধমক দিল। —এখন আর মাধো মাধো কোরো না। ও কি এখন আর দেবে নাকি।

কথার মধ্যে বেশ একটা ঝাঁজ ছিল।

ঝুমাও চটে গেল। বললে, পকেটে টাকা রাখোই বা কেন। তুলে রাখতে পারো না। যত দোষ আমার !

সঞ্জয় চুপ করে গেল। তবু বুকের মধ্যে খিচখিচ করল। কুড়িটা টাকা। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মাধোকে একবার জিগ্যেস করল। ঠিক প্রশ্ন নয়। —এই মাধো, পকেটে কুড়িটা টাকা ছিল ...

মাধো এমন ভাবভঙ্গি করল, যেন কিছুই জানে না। বললে, জিগ্যেস করে আসব ? অর্থাৎ ডাইং ক্লিনিঙে।

একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে সঞ্জয় বললে, যা।

তারপর বেরিয়ে গেল।

মাথার মধ্যে ঘুরছে তখন অফিসের চিন্তা। আঃ, এই সারা জীবন ধরে দৌড়তে দৌড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে সঞ্জয়। মানুষ কত দৌড়তে পারে। অথচ সেই দৌড়নোর কোনও মানে হয় না। জীবনটাই তো অর্থহীন।

ইস্কুলে, কলেজে, চাকরির জন্যে শুধু দৌড়ে চলো। অকারণ একটা প্রতিযোগিতা।

এখন মনে মনে দৌড়চ্ছে ওই আর এমের চেয়ারটার দিকে। না পেলেই যেন সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আবছা অস্পষ্ট একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বহুকাল আগে, বংশী থার্ড হয়েছে, রামজীবনবাবু সেদিনই বলে গেছেন। সুধাময় খুব খুশি।

হাসতে হাসতে বললেন, যাক, জীবনে তবু তো একটা ভাল কাজ করলাম।

অর্থাৎ বংশীকে নিয়ে আসা, মানুষ করা।

বলেছিলেন, মানুষের জীবন বড় ঝট করে ফুরিয়ে যায়, কিছুই করা হয় না। অর্ধেক জীবন কেটে যায় ভাল রেজাল্টের পিছনে ছুটে ছুটে। তার পরের জীবন প্রোমোশনের পিছনে।

এখন অবসর জীবন। চুপচাপ বসে থাকা শুয়ে থাকা। একা থাকা।

সেদিন বললেন, সব ইউজলেস। হিসেব করলে এখন দেখি, সাম টোটাল মাইনে এনেছি আর খরচ করেছি। কাজের মতো কাজ তো কিছুই হল না।

দয়াময়ী বললেন, সেজন্যেই তো বলি, হরিসভায় গেলেও তো পারো। একটু ঠাকুর দেবতার নাম ... কই আমার তো মনে হয় না কিছুই করিনি।

সঞ্জয় হেসে ফেলেছিল। কি অদ্ভুত প্রশান্তি। কি সান্ত্বনা। যেন বাবা ওই সবকেই কাজের মত কাজ বলছে।

কি অদ্ভুত জীবন। বাবার আজ মনে হয়, শুধু মাইনে এনেছি আর খরচ করেছি। সঞ্জয়েরও একদিন হয়তো মনে হবে। অথচ, পরিত্রাণ নেই। পালাবার পথ নেই, বাঁচবার পথ নেই। তোমাকে শুধু মাসের শেষে মাইনের জন্যে ছুটতে হবে। ছুটতে হবে ওপরের চেয়ারটার জন্যে। কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মান, সম্মান, মর্যাদা।

আর এমের চেয়ারটাই যে এখন জীবনের একমাত্র অর্থ।

সঞ্জয় জানে, সেটা পাওয়ার পরও বাবার মত একা একা বারান্দায় বসে থাকা। খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সন্ধে অবধি পড়া। অকারণ, তবু।

এখন প্রমোশন পাওয়াটাই বড় কথা। ওটা না পেলে মর্যাদা থাকবে না। কিসের মর্যাদা, কার কাছে মর্যাদা ? সঞ্জয় হেসে ফেলল।

অংশুমানের বাড়িতে গিয়ে কলিং বেল টিপল।

বললে, ভাল লাগছিল না, চলে এলাম।

অংশুমান আপিসের অনেক খবর রাখে। ও ডিরেক্টরস বোর্ডের সেক্রেটারি।

—চা খাবেন তো ?

সঞ্জয় ঘাড় নাড়ল।

কথাবার্তা নানা দিকে ঘুরতে ঘুরতে আপিসের ব্যাপারেই ফিরে এল।

না, অংশুমান কিছুই জানে না। কিংবা গোপন করল। ওর চাকরিই তো সব কিছু গোপন রাখার।

—কিন্তু হঠাৎ রেজিগনেশন দিলেন কেন ?

সঞ্জয় জানতে চাইছিল, ওঁর রেজিগনেশন অ্যাকসেপটেড হয়েছে কিনা।

অংশুমান বললে, উনি অন্য কোথায় অনেক ভাল চাকরি পেয়েছেন। হাসতে হাসতে বললে, আমরাই কিছু করতে পারলাম না। আজকাল কেউ এক জায়গায় পড়ে থাকে না সঞ্জয়বাবু। উন্নতি করতে হলে নিজেকে নিলামে তুলতে হয়।

সঞ্জয় হেসে বললে, আমরা সেজন্যে কিছু করতে পারলাম না।

অংশুমান সান্ত্বনা দিল, না কি সত্যিই কিছু জানে ? বললে, বাঃ, আর এম চলে গেলে এখন তো আপনিই। অন্তত আমার তো তাই ধারণা।

স্পষ্ট কিছু জানা গেল না। তবু সঞ্জয়ের ভিতরটা আনন্দে নেচে উঠল। ও নিজেও তো মনে মনে সে-কথাই ভেবে রেখেছে। ওকে ডিঙিয়ে হীরেনের উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অংশুমান কি ও-ভাবে বলত। আশা দিত ?

কি অদ্ভুত একটা সিসটেমের মধ্যে আমরা আছি। সারা পৃথিবীর মানুষ। সঞ্জয় মনে মনে ভাবল, বাবা ঠিকই বলত। দৌড়নো। সারা জীবন ধরে দৌড়নো। ও তো বেশ সুখীই ছিল। ধাপে ধাপে উঠেছে, আর না উঠলেও চলত। কিন্তু হঠাৎ আর এম রেজিগনেশন দেওয়ার ফলে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে, না দৌড়তে পারলেই অসম্মান। ওকে এখন ওই চেয়ার পেতেই হবে। না পেলে আপিসসুদ্ধ লোক ভাববে ও পেল না। ও অযোগ্য। চুপচাপ সেই অপমান হজম করতে হবে।

সেই ছেলেটির মুখ মনে পড়ছে সঞ্জয়ের।

রামজীবনবাবু এসে বলে গিয়েছিলেন, আপনারা কেউ একজন যাবেন, বংশীর ভাল লাগবে , উৎসাহ পাবে।

সেই প্রথম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে বংশী পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে।

প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনের দিন যাবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিলেন রামজীবনবাবু।

সুধাময় যেতে পারেননি, অফিসে কাজের চাপ, ও-সময় ছুটি পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সঞ্জয়কে বলেছিলেন, তুই পারলে যাস একবার। হেডমাস্টার এত করে বলে গেলেন।

গিয়েছিল।

তখন সত্যি সঞ্জয়ের বুকের মধ্যে একটা গর্ব ছিল। এই ছেলেটিকে আমরা শিক্ষিত করে তুলছি, মানুষ করে তুলছি। সকলেরই তো মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার আছে, ও কেন হবে না।

সঞ্জয়ের খুব মজা লাগছিল। প্রাইজ-পাওয়া ছেলেগুলোর মুখে কি আনন্দের ছটা।

ধোপদুরস্ত জামা আর প্যান্ট পরে বসেছিল বংশী। অন্য সকলের সঙ্গে এক সারিতে। সঞ্জয়ের অবাক লাগছিল। কে বলবে অন্য সমাজের মানুষ। কে ভাববে একদিন ও এক নুলো ভিখিরির হাতুয়া ছিল।

সঞ্জয় ভাবছিল কি এক ভুল ধারণার মধ্যে আমরা বাস করি। আমরা ধরে নিই ওরা আলাদা। ওরা বাহিরি। বাইরের লোক। ওদের কোনও যোগ্যতা নেই। সুযোগ পেলেও ওরা আমাদের মত হতে পারে না।

ব্রজবাবু বলেছিলেন, ওকে হাতের কাজ শেখাও, করে খেতে পারবে।

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, আরে বাবা, যে যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দাও। তা হ'লেই শান্তি। বলেছিলেন, দেশসুদ্ধ অশিক্ষিত লোকগুলো যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে, অত চাকরি পাবে কোথায়!

ঠাট্টা করে বলেছিলেন, যারা শিক্ষিত, তারাই তো চাকরি পাচ্ছে না।

সঞ্জয়ও ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছিল। চাপতে পারেনি। খোঁচা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, শিক্ষিত পরিরারের ছেলেদের এবার কিছু অশিক্ষিত করে তোলা দরকার। তা হলে আর বেকার-সমস্যা থাকবে না।

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, বুঝবি বুঝবি, পাশ করে বেরিয়ে যখন চাকরি খুঁজবি তখন বুঝবি।

আসলে তখন তো সঞ্জয়ের মধ্যে কলেজে পড়া উদারতা। কত বড় বড় আদর্শ। স্বার্থের সংঘাতে তখনও মনটাকে সঙ্কীর্ণ করে তুলতে পারেনি।

তাই বংশী আর তার আশেপাশে বসে থাকা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের মুখের দিখে তাকিয়ে ভাল লাগছিল। যেন সাফল্য নামক অদৃশ্য একটা হীরের দ্যুতি এসে পড়েছে ওদের মুখের ওপর।

বংশীর নাম ডাকল।

ও উঠে গেল, প্রাইজ নিল। হাসতে হাসতে ফিরে এল। নিজের আসনে বসল। তারপর কি মনে হতে উঠে এসে সঞ্জয়কে প্রাইজের বইগুলো দেখাল। লাল রিবনে বাঁধা। ফিরে গেল নিজের আসনে।

আর তখনই ওর পাশের ভদ্রলোক, বোধহয় শিক্ষক, আঙুল দিয়ে একটি ছেলের দিকে দেখালেন। বললেন, বেচারা। ওই এতদিন থার্ড হত। একবার সেকেণ্ডও হয়েছিল।

সঞ্জয় তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল

তার থমথমে মুখখানার দিকে তাকিয়ে। যেন একটু নাড়া দিলেই চোখ থেকে জল ঝরে পড়বে।

খুব খারাপ লেগেছিল সঞ্জয়ের। এত আনন্দের মধ্যেও।

আমরা তো শুধু সাফল্যের দিকে তাকাই। সাফল্যকে হাততালি দিই। ওদের দিকে তাকাবার অবসর কোথায়। বরং প্রশ্ন করি, অন্তত মনে মনে, বংশীর প্রাইজ পাওয়ার সময় ও হাততালি দিয়েছিল কিনা। মানুষকে ভণ্ডামি শেখাই, কারণ এর নাম ভদ্রতা।

অফিসে আর-এম রেজিগনেশন দিয়েছেন শুনে সঞ্জয়ও খুব ভদ্র বিষণ্ণতার সঙ্গে হীরেনকে বলেছে, স্যাড। এমন একজন এফিসিয়েন্ট লোক ...

॥ ৮ ॥

অফিসের বাস রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনের গলিটা তেমন চওড়া নয়, প্রথম প্রথম গলির মোড়ের টিউবওয়েল ঘিরে লোকের ভিড় জমত বলে বাস এ পথে ঢুকলে বের করতে অসুবিধে হত, তাই এখন আর ভিতরে ঢোকে না। দেরি হলে বাস চলে যায় , কারণ অন্যেরা তাড়া দেয়।

সঞ্জয় যথারীতি এসে অপেক্ষা করছিল। বাস এল, উঠে পড়ল।

নানা ডিপার্টমেন্টের অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তিদের জন্যেই এই অফিস বাস। সকলেই চেনাজানা।

সঞ্জয় গিয়ে হীরেনের পাশের আসনে বসল। ওই আসনটা ওর জন্যে রাখাই থাকে।

ও গিয়ে বসতেই হীরেন ফিসফিস করে বললে, আর তো কটা দিন। তারপর তো অফিস থেকে গাড়ি পাবে।

সঞ্জয় লজ্জা পেল, সঙ্কোচ বোধ করল। হেসে বললে, কি যে বলো।

সঞ্জয়ের মনের মধ্যে আশা উঁকি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ও নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। হীরেন সেল্‌সের লোক, ওদের খাতির বেশি। এর আগে তেমন ঘটনাও ঘটেছে। জি-এম নিজেই তো একসময় সেল্‌সে ছিলেন।

বাসে আর কোনও আলোচনা হল না।

আর-এম রেজিগনেশন দিয়েছেন, এ-খবর কারও অজানা থাকবার কথা নয়। যে-কোনও ছোট্ট ঘটনাও মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে যায়, লতায় পাতায় পল্লবিত হয়ে তার কত রকমের ব্যাখ্যা শুরু হয়ে যায়, ইতিহাস খুঁজে বের করে ফেলে সকলে।

অথচ এ-ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করল না, কেউ কিছু জানতেও চাইল না। কারণ, এখানে সব ডিপার্টমেন্টের লোকই আছে। তার ওপর আর-এম রেজিগনেশন দিলেই তিনি শেষ অবধি থেকে যাবেন কিনা, কেউ জানে না।

হীরেন বাস থেকে নেমে অফিসে ঢোকার আগে বললে, কথা আছে, লাঞ্চ ব্রেকের সময় কথা হবে।

হীরেনদের অন্য গ্যেট, অন্য লিফ্‌ট। ও চলে গেল সেদিকে।

আর সঞ্জয় এসে দেখল লোডশেডিং চলছে। লিফ্‌ট বন্ধ।

প্রথমে ভাবল নীচেই বসে থাকবে, নিরুপায় অপেক্ষায়। তারপর কি মনে হতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করল।

দিনকয়েক আগে জেনারেটর পুড়ে গিয়েছিল, এখনও ঠিক হয়নি। অতএব হেঁটে ওপরে ওঠা ছাড়া উপায় নেই।

সঞ্জয় এ-ভাবেই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠেছে। অথচ এ অফিসে কত লোকই তো সিঁড়ির মুখই দেখল না। টপাটপ লিফ্‌টে উঠে গেল। হীরেন একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল। কথাটা সত্যি।

হীরেন বলে গেছে, কথা আছে। কি কথা, তা জানার জন্যে সঞ্জয়ের ভিতরটা উদগ্রীব হয়ে আছে। আর-এম রেজিগনেশন দিয়েছে শুনেই সেদিন ও অবাক হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা লোভ উঁকি দিয়েছিল।

এত তাড়াতাড়ি ওর সামনে এমন সুযোগের দরজা খুলে যাবে ভাবেনি। ভাবেনি বলেই এতদিন তৃপ্ত ছিল। এখন একটা অতৃপ্তি। একটা ক্ষীণ আশা। তার চেয়েও বেশি, একটা ভয়।

সকলেই ধরে নিয়েছে আর-এমের পোস্টে সঞ্জয়ই গিয়ে বসবে। হীরেনও সে-কথাই তো বলল। হীরেন কি কিছু জানে ? অথবা হীরেনই আর-এম হবার চেষ্টা করছে ভিতরে ভিতরে ? ও যাতে চেষ্টা না করে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, সেজন্যে হয়তো ওভাবে বলল।

অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সঞ্জয় একটু স্বপ্ন দেখে নিল। মাসের শেষে আরও কিছু বাড়তি টাকা। আরেকটু সচ্ছলতা। গাড়ি। আরেকটু মর্যাদা, লোকের চোখে সমীহ।

বাড়ির ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দু-এক-বছর অন্তর বাবা নানা জায়গায় বেড়াতে যেত। অবসর নেবার পর এখন আর যায় না। মা কাশী বৃন্দাবন তীর্থে যাবার কথা বলত। এখন আর বলে না। কেন, তা সঞ্জয় জানে। এখন ওদের কাছে শুভার বিয়ের ভাবনাই সবচেয়ে বড়।

প্রমোশন পেয়ে ওই পোস্টে পৌঁছতে পারলে বাবা-মা'র কোন ইচ্ছেই ও অপূর্ণ রাখবে না। সঞ্জয় মনে মনে ভাবল।

সঞ্জয় মনে মনে আওড়াল, আর-এমের চেয়ারটা 'আমার চাই-ই চাই। কারণ, আমি ঝুমাকে ওই চেয়ারের কথা বলে ফেলেছি। কারণ, ওই চেয়ারে হীরেন গিয়ে বসলে আপিসের সকলের চোখে উপহাস ঝিলিক দেবে। কেউ-বা হয়তো কৃত্রিম সমবেদনা জানাবে, বলবে এটা অন্যায়, অবিচার। সে আরও দুঃসহ।

লাঞ্চ ব্রেকের সময় হীরেনের সঙ্গে দেখা হল।

হীরেনের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। বললে, এক্ষুনি একটা গুজব শুনলাম, জানি না, সত্যি না মিথ্যে।

—কি গুজব ?

হীরেন বললে, আমরা তো সকলেই জানি, তুমিই ওই পোস্টে গিয়ে বসবে।

সঞ্জয় ভাব দেখাবার চেষ্টা করল, যেন ও ব্যাপারে ও নির্বিকার। অন্তত হীরেনের কাছে সম্মান বাঁচিয়ে রাখতে হলে এটুকু অভিনয় প্রয়োজন। তাই বলে বসল, তুমি আর-এম হলেও আমার কোনও আপত্তি নেই। কিংবা যেই হোক।

হীরেন, মনে হল, রীতিমত রুষ্ট। বললে, না না, আমার কথাই ওঠে না।

সঞ্জয় অবাক হয়ে বললে, তা হলে আর কে ?

হীরেন ধীরে ধীরে বললে, বোর্ড নাকি বাইরে থেকে যোগ্য লোক আনবে। উপহাসের স্বরে বললে, আমরা সব অযোগ্য। আর-এমের পোস্ট নাকি আমাদের দেওয়া যায় না।

সঞ্জয় অবাক হয়ে গেল, অপমানিত বোধ করল। আর যে-হীরেনকে ও ভিতরে ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছিল, মুহূর্তের মধ্যে তাকে পরম বন্ধু মনে হল।

বললে, হীরেন, আমরা যেটুকু পেয়েছি সেটুকুই বা পেলাম কি করে ভেবে পাই না। ওরা তো আমাদের কোনওদিনই দাম দেয়নি, দিতে চায় না। কারণ, ওরা যে আমাদের

অতীতটা জানে, কিভাবে একটু একটু করে উঠেছি।

হীরেন হেসে বললে, আর-এম কিন্তু সে-কথাই একদিন বলেছিলেন। যে তোমাকে নীচে থেকে উঠতে দেখেছে তার কাছে তোমার কোনও দাম নেই। সে ভাবে তোমাকে সে কৃপা করছে। আর-এম বলেছিলেন, যে তোমার অতীত জানে না, তার কাছেই নিজেকে বেশি দামে বিক্রি করা যায়।

সঞ্জয় বললে, সে-কথা তো একালের সকলেই জেনে গেছে। আমরাই শুধু জানতাম না।

হীরেন হাসল। —জানতাম না বোলো না সঞ্জয়। আমরা বোধহয় সত্যি অযোগ্য। যাদের যোগ্যতা আছে তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে না।

একটু থেমে বললে, তুমি আর-এম হয়ে গেলে তোমার পোস্টে চলে আসব ভেবেছিলাম। সেল্‌স আর ভাল লাগে না। জি-এমকে বলেও ছিলাম একদিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে হীরেন।

সঞ্জয় কোনও কথাই বললে না। একটা আশা পেয়েছিল ও, একটা স্বপ্ন দেখেছিল। সামান্য একটা খবরে সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আপিসের ছুটির পর হীরেন আর সঞ্জয় গিয়ে বসল একটা কাছাকাছি চায়ের দোকানে।

—কার কাছে শুনলে খবরটা ?

হীরেন বললে, তাহলে বলেই ফেলি। খোদ জি-এম বলেছেন। ওঁরও ইচ্ছে নয় বাইরে থেকে কেউ আসুক। কিন্তু নিরুপায়।

একটা ভারী মন নিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল সঞ্জয়। এখন ঝুমার কাছেও ওর সঙ্কোচ।

পোশাক ছাড়তে ছাড়তে চাপা ক্ষোভ বিষণ্ণ হাসির নীচে চাপা দিয়ে বললে, আর-এম হওয়া হল না। ভেবেছিলাম আমিই পাব...

ঝুমা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে সমবেদনা।

সঞ্জয় হাসল। —এটা শাট্‌ল কক্‌দের যুগ। কে কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে কে জানে। হেসে বললে, ডিরেকটরদের কোনও পেয়ারের লোক হয়তো।

ঝুমা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আর তাই, আজকাল ব্যাকিং না হলে কিছুই হয় না।

সঞ্জয় হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না।

কয়েকটা দিন। ভিতরের বিক্ষোভ শান্ত করে নিয়েছিল সঞ্জয়। মনের মধ্যে আর কোনও অভিযোগ ছিল না। কি যায় আসে, ওই উঁচু চেয়ারটায় পৌঁছতে পারল আর না পারল।

সুধাময় বলতেন, দৌড়নো। বলতেন, সারা জীবন শুধু পয়লা তারিখের দিকে তাকিয়ে কেটে গেল। বছরের শেষে ইনক্রিমেন্ট। জীবনের সাম টোটাল তো এটুকুই।

সঞ্জয়ের মধ্যেও সেই বৈরাগ্য এসেছে। একটা কোনও জায়গায় ধাক্কা খেলেই বোধহয় পৃথিবীর রং গেরুয়া হয়ে যায়। সঞ্জয়ের এখন সেই অবস্থা।

জি-এমের সঙ্গে কয়েকদিনই দেখা হয়েছে, সঞ্জয় কোনও প্রশ্ন করেনি। কিছুই জানতে চায়নি। জি-এম নিজেও কিছু বলেননি। এখন আর জানার কিছু নেইও। সঞ্জয় অন্তত তাই ভেবেছিল।

হঠাৎ অংশুমানের সঙ্গে দেখা। বোর্ডের সেক্রেটারি।

বললে, একেবারে আশা ছাড়বেন না। অনেক বেশি অফার দিয়ে যাঁকে আনতে চায়, তিনি এখনও আসবেন কিনা ঠিক করেননি। বোধহয় এদের টার্মসে রাজি নন।

সঞ্জয় একটু আশা পেল। —কে ? কোত্থেকে আসছেন ?

অংশুমান বললে, সে-সব বলতে পারব না।

বলতে হলও না।

দিনকয়েক পরেই, সঞ্জয় সদ্য অফিসে এসে তার চেয়ারটিতে বসেছে। জি-এম ফোন করলেন, একবার আসুন।

তাঁর ঘরে ঢুকতেই দুহাত প্রসারিত করে সহাস্য মুখে জি-এম বললেন, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই।

এতক্ষণে ওঁর সামনে বসা ভদ্রলোককে দেখতে পেল সঞ্জয়। তিনি মুখ ফেরালেন। মুখে অমায়িক হাসি।

কিন্তু এ-সব কিছুই দেখতে পেল না সঞ্জয়।

শুধু জি-এমের কথা শুনতে পেল।—ইনি মিস্টার অধিকারী। মিস্টার বি ডি অধিকারী। ইনি আমাদের নতুন আর-এম হয়ে আসছেন।

সঞ্জয় তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বংশীর মুখের দিকে। আর বংশী অবাক বিস্ময়ে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে।

কেউ কোনও কথা বলল না। না সঞ্জয়, না বংশী।

জি এম বোধহয় কিছুই বুঝলেন না। বললেন, উনি নেক্সট মান্থে জয়েন করবেন। তাই আলাপ করিয়ে দিলাম।

সঞ্জয় একটুক্ষণ অপেক্ষা করে বললে, আমি চলি।

চলে এল।

সঞ্জয় তখন ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছে। লজ্জায় অপমানে ওর সারা মুখ কালো হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত। বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা। দুচোখ ঠেলে জল আসতে চাইছে। পায়ের তলার পৃথিবী টলতে শুরু করেছে।

কি করবে সঞ্জয়, ভেবে পাচ্ছে না। এতদিন ভেবে এসেছে, ও একটা অসীম নিরাপত্তার মধ্যে আছে। আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছে, ওর পায়ের তলায় মাটি নেই।

যারা শুধু উন্নতির পিছনে ছোটে, আরও সম্মান, আরও উঁচু পদ, আরও মাইনে, এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়ায়, তাদের বিদ্রূপ করে বলেছে শাট্‌ল কক্‌। এখন এখান থেকে ছিটকে কোথায় যাবে নিজেই খুঁজে পাচ্ছে না। অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে কোথায় গিয়ে লুকোবে?

চোখের সামনে সুধাময়ের মুখখানা ভেসে উঠল। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের মুখ। হিসেব করে করে পয়সা খরচ করেন। সারাদিন বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ে কাটিয়ে দেন। তবু সুখী মুখ।

জ্যাঠামশাইকে হাসতে হাসতে বলছেন, আমার আর কি চিন্তা। পেনশন আছে। ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে, দিব্যি ভাল চাকরি করে, শুধু শুভার বিয়েটা হয়ে গেলেই... ঘোমটা টানা দয়াময়ীর দিকে তাকিয়ে বলছেন, একেই তো বলে স্বর্গবাস।

দয়াময়ীও একদিন বলেছিলেন, আমার আর কি ভাবনা, ছেলে ভাল চাকরি করে, শুভা তো আমার দেখতে খারাপ নয়, চোখ জুড়োনো নাতি...

সঞ্জয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠছে বাচ্চা ছেলে কুটকুটের মুখ, ঝুমার মুখ, শুভা, মা, বাবা।

কি করবে সঞ্জয়, কি করবে!

একটাই পথ, রেজিগনেশন। সম্মান বাঁচাবার রাস্তা। অপমান থেকে বাঁচার রাস্তা। আমি তো ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ, আমার সামনে এছাড়া আর কি পথ আছে! আবার

একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে, প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এখন আর কারও দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না ও। মনে হচ্ছে সবাই যেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। উপভোগ করছে।

সমস্ত অফিস যেন এতদিন ওকে শত্রু ভেবে এসেছিল, গোপনে গোপনে। এখন নিঃশব্দ অট্টহাসে হেসে উঠেছে।

হীরেন সমবেদনা জানাতে এল।—শুনলাম নতুন আর-এম মিস্টার অধিকারী এসেছিলেন। একেবারে ইয়াং ছেলে। সদ্য ম্যানেজমেন্ট পাশ করেছে।

সঞ্জয় চুপ করে রইল। ভিতরের বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে ফেলে। রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করল। বংশীর বিরুদ্ধে রাগ। ওর মনে হল বংশী যেন ইচ্ছে করেই ওকে অপমান করতে চেয়েছে। ওকে হারিয়ে দিতে চাইছে।

সঞ্জয়ের মনে পড়ল, বিভা আর বাপ্পা আসার পর ওরা ওকে দোতলা থেকে নীচের তলায় নামিয়ে দিয়েছিল। তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে যেন আজ সঞ্জয়কে নীচে নামিয়ে দিয়ে।

হীরেন বললে, মিস্টার অধিকারী নাকি ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিলেন...

আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই সঞ্জয় ফেটে পড়ল।

প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলে বসল, শালা অচ্ছুতের বাচ্চা। ওর হিস্ট্রি জানে কেউ?

হীরেন অবাক হয়ে তাকাল সঞ্জয়ের মুখের দিকে।

সঞ্জয় তখনও রাগে কাঁপছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ছুঁতে ঘেন্না, একটা নোংরা ভিখিরির ছেলে, নুলো ভিখিরির চাকর ছিল। ওর মা ওকে বেচে দিয়ে গিয়েছিল।

সঞ্জয় হেসে ফেলল।—যারা ছোট থেকে বড় হয়, বুঝলে হীরেন...

হঠাৎ চুপ করে গেল। মনে পড়ে গেল, অত ছোট না হলেও, আমরা সকলেই তো ছোট থেকেই বড় হয়েছি।

সুধাময়ের ইতিহাস আউড়ে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়ে গেল। যদিও বিশ্বাস হয় না, তবু তো সত্যি।

বুকের মধ্যে একটা বিশাল পাথর বয়ে বয়ে বাড়ি ফিরে এল সঞ্জয়। ওর কেবলই ভয় করছিল, ঝুমা ওকে দেখেই ভাববে কোনও কঠিন অসুখ। অথবা ঝুমার দিকে তাকাতে গিয়ে ওর দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়বে। ওর বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কষ্ট, দুচোখের আড়ালে আকস্মিক শোকের মত একটা প্রবল কান্না।

কাকে বলবে ও, এই দুঃখের কথা, এই কষ্টের কথা। এই অপমানের কথা। কাকে বলবে?

শেষ অবধি ঝুমার কাছেই বলতে হল।

—ছি ছি। আত্মগ্লানিতে ঝুমা বলে উঠল, ছি ছি।

আর সঞ্জয় কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, অন্য যে-কেউ ওখানে এলে আমার কোনও চিন্তা ছিল না, কোনও অপমান হত না। কিন্তু বংশী, একটা নুলো ভিখিরির হাতুয়া ... আমাদের দয়াতেই...

রুদ্ধ কান্নায় গলা আটকে গেল। চোখে জল।

বিভ্রান্তের মত বলল, কোথায় যে আবার চাকরি পাই ...ওসব খোঁজ তো রাখতাম না।

ঝুমা ধীরে ধীরে বললে, একটা কথা বলব?

ইতস্তত করল ঝুমা। তারপর বললে, যদি বংশীকে গিয়ে বলি, এই চাকরিটা যদি না

নেয়।

ঝুমার মুখের দিকে তাকাল সঞ্জয়। বিভ্রান্ত। অথচ ও বিচার করতে পারছে না। সেটা আরও অপমান কিনা।

না, সে তো শুধু একজনের কাছেই, একদিনের জন্যে।

আমি তো ভদ্রলোক, মধ্যবিত্ত মানুষ। কিন্তু বাকি জীবন তো সসম্মানে কাটিয়ে দিতে পারব। সসম্মানে।

সঞ্জয় অস্ফুটে বললে, অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

ওদের আমরা ভাল চাই। খেয়েপরে থাকুক, শিক্ষিত হয়ে মানুষ হয়ে উঠুক। যদি পারে সমান হয়েই থাকুক না। তা বলে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে! আমাদের ওপরে উঠে যাবে?

ক্ষোভের সঙ্গে বললে, তখন রসিকতা করে ব্যাটাকে অধিকারী বানিয়ে দিয়েই ভুল হয়েছিল। এখন মিস্টার বি ডি অধিকারী। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

ঝুমা দেরাজের কাগজপত্র ঘাঁটছিল। কি যেন খুঁজছিল।

হঠাৎ হতাশ ভাবে বললে, এই, বংশীর ঠিকানাটা আমরা কেউ রাখিনি।

ওর ঠিকানা রাখার কথা কারও কোনওদিন মনেই হয়নি।

সঞ্জয় কোনও কথা বলল না—

এখনও কয়েকটা দিন সময় আছে। মিস্টার বি ডি অধিকারী পরের মাসের পয়লা তারিখ থেকে জয়েন করবেন।

তবু রেজিগনেশনের চিঠিখানা বারবার লিখল আর ছিড়ল সঞ্জয়। শেষে একটা লাইনই শুধু লিখল।

পরের দিন অফিসে গিয়ে ফোন তুলতেই জি-এমের কণ্ঠস্বর। একবার আসুন।

আরও কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে। কিন্তু এখন ও একেবারে মরিয়া হয়ে উঠছে। রেজিগনেশন তো দেবই, অত ভাবনা কিসের। আবার একবার মনে হল, বংশীর বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিলে হয়। জি-এম তো জানেন নিশ্চয়।

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে জি-এমের ঘরে ঢুকল সঞ্জয়।

—বসুন।

বসল।

জি-এম চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। মিস্টার অধিকারী চিঠি লিখে জানিয়েছেন, হি ইজ নট কামিং। লিখেছেন উনি ওখানেই যথেষ্ট হ্যাপি।

তারপরই সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন এলেন না বলুন তো?

সঞ্জয় প্রথমে অবাক হল। তারপর ওর শরীর আর মনের ওপর থেকে সমস্ত ভার সরে গেল।

যেন একটা অসহ্য বন্ধনের মধ্যে ছিল ও, হঠাৎ মুক্তি পেয়েছে। শরীর মন হাল্কা হয়ে গেছে।

হাসতে হাসতে বললে, আসছেন না?

—না। এই দেখুন না...

চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলেন জি-এম।

সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে নিল, পড়ল। আসলে পড়ার ভান করল। কিছুই মাথায় ঢুকছে না তখন। মাথার মধ্যে শুধু একটা অবাক বিস্ময়ের ঘোর।

জি-এম বললেন, সব ঠিকঠাক, ম্যানেজিং ডিরেক্টরেব সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল, কাল এলেন, তখনও কিছু বললেন না...

সঞ্জয় তখনও চুপ করে আছে।
জি এম বললেন, আপনি কিছু বুঝতে পারছেন ?
সঞ্জয় মাথা নেড়ে বললে, না। কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাড়ি ফেরার সময় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এল সঞ্জয়। শরীর মন যেন পালকের মত হাল্কা। পালকের মত উড়তে উড়তে চলেছে।
মনে মনে বলল, বংশী, আমি জানি জানি। আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ।
আমি বরাবর বলেছি, তোর কোনও কৃতজ্ঞতা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই। আজ আমিই তোর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। তুই আমাকে অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচিয়েছিস, অপমান থেকে বাঁচিয়েছিস।
বাড়ি ফিরে ঝুমাকে সব বলল সঞ্জয়।
বলতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল। আমরা ওর ওপর অবিচার করেছি এতদিন।
বললে, এখন এত খারাপ লাগছে, হীরেনের কাছে ওর সম্পর্কে যা-তা বলে ফেললাম।
শুভা বোধহয় শুনেছে। শুনতে পেয়েছে।
ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে ?
সঞ্জয় সব কথা বলল। তারপর বললে, আমরা ওকে একটুও বুঝতে পারিনি। আমরা এতকাল ওর মধ্যে শুধু অহঙ্কারই খুঁজে বেড়িয়েছি!
শুভা শব্দ করে হেসে উঠল। —তুমি ওকে এখন বিনয়ের অবতার ভাবছ। নাকি মহাপুরুষ ?
হাসতে হাসতে বললে, আসলে ব্যাপারটা তুমি বুঝতেই পারোনি। ও কেন আসতে চায়নি তা জানো ?
সঞ্জয় আর ঝুমা প্রশ্ন করে বসল, কেন ? কেন ?
—তোমরাই বলো না, কেন ? শুভা কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করল।
সঞ্জয় বললে, কেন আবার, ও তো আমাকে ছোড়দা বলত, সম্মান করে কথা বলত। ওর নিজেরও খারাপ লেগেছে।
শুভা হাসল। বললে, তুমি কিচ্ছু বোঝোনি। আসলে ও তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আসলে ভাবেইনি, তুমি ওখানে আছ।
ঝুমা বুঝতে না পেরে বললে, ভয় ? ভয় কেন ?
শুভা বললে, ওর অতীতটা যে তুমি জানো। ও যে একটা নুলো ভিখিরির হাতুয়া ছিল, নেহাত আমাদের দয়ায়...
সঞ্জয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, না না।
—আমি ঠিকই বলছি, ও ভয় পেয়েছে সকলে জেনে যাবে। সেজন্যেই।
ঝুমা বলে উঠল, ঠিক ঠিক, তাই হবে।
শুভা আবার হেসে উঠে বললে, ও তো আমাদেরও ওর মতই ভাবে। আমরা যে ভদ্রলোক, অত নীচ হতে পারি না, তা ও জানবে কি করে।
কথাটা শুনল সঞ্জয়, চকিতে একবার ঝুমার মুখের দিকে তাকাল। মাথা নিচু করল।
ঝুমাও অন্য দিকে তাকাল। শুভার দিকে চোখ ফেরাতে পারল না।
কানে তখনও বাজছে কথাটা।
আমরা যে ভদ্রলোক, অত নীচ হতে পারি না, তা ও জানবে কি করে।

বলেই শুভা চলে গেল, সম্ভবত সুধাময়কে খবরটা দিতে। দয়াময়ীকে বলতে, তাঁর

পোষ্যপুত্রের কাণ্ড।

সঞ্জয় চুপচাপ বসেছিল। ঝুমাও। যেন কথা ফুরিয়ে গেছে ওদের।

আর তখনই কলিং বেল শুনতে পেল। কে কলিং বেল বাজাচ্ছে।

ভীরু-ভীরু হাতে কে যেন কলিং বেল বাজাচ্ছে। কলিং বেল বললে শুভা অবশ্য ধমক দেয়।

কিন্তু কে হতে পারে। এবার ঘন ঘন বাজাচ্ছে, একটানা। বেশ জোর জোরে শব্দ হচ্ছে।

সঞ্জয় বা শুভা, কেউই নড়ছে না। উঁকি দিয়ে দেখতে যাচ্ছে না, কে এসেছে। কে বা কারা।

সকলেই অপেক্ষা করছে। ভাবছে কেউ একজন যাবে। আর সত্যি সত্যি যদি কেউ না যায়...যতক্ষণ পারে বাজাক না, কিংবা ক্লান্ত হয়ে, কেউ সাড়া দিল না দেখে ফিরে যাক। অথবা অন্য কেউ গিয়ে গ্যেট খুলে দিয়ে আসুক।

সঞ্জয় আর শুভা নড়ল না, ঝুল বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে গেল না কে এসেছে। বেল্ বাজাচ্ছে। কে বা কারা আসতে চায়।

থেমে থেমে বেল বেজে চলবে। আমাদের সকলের দরজায়।



দাগ



আগে ছিল দাঁড়কাকের ডাক, ক্রারক্রার করে বেজে উঠত। বসার ঘরখানা বিশাল এবং ফাঁকা ফাঁকা বলেই আওয়াজটা হ'ত দাঁড়কাকের গলার মত কর্কশ। পাছে কলিংবেল্‌টা আবার বাজিয়ে বসে, তাই ছুটে আসতে হত। আওয়াজটা তখন সত্যি পিলে চমকে দিত।

এখন দেয় না।

শর্মিলা শুনল, কিন্তু গা করল না। বিপিন আছে তো!

ও যেমন শোফায় আধ-শোয়া হয়ে ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাছিল, তেমনি ওল্টাতে লাগল। কারণ, এখন আর কলিংবেল আতঙ্ক নয়, ক্রারক্রার করে না। এখন সুইচ টিপলে পিয়ানোর বোল ফোটে, মিষ্টি টুংটাং টুংটাং। একেবারে রীতিমত সারেগামা। তাই পিলে চমকে দেয় না, ছুটে যেতে হয় না।

সারেগামার রেশ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু আবার বাজল।

বিরক্তিতে শর্মিলার ভুরু কুঁচকে উঠল, আড়চোখে একবার দূরের দরজার দিকে তাকাল, আর তখনই মনে পড়ল, বিপিন নেই, তাকে সিনেমার টিকিট কাটতে পাঠানো হয়েছে।

খুব ধীরেসুস্থে নড়েচড়ে উঠে বসল শর্মিলা, দরজাটা ওকেই খুলতে হবে। অন্তত বিরক্তি এড়ানোর জন্যে।

আগে ধারণা ছিল বিরক্তিটা ওই ক্রারক্রার আওয়াজের জন্যে। ধারণা ছিল আওয়াজটা মিঠে হলে বিরক্তিটা কমবে, এবং এই হাল ফ্যাশনের ফ্ল্যাটের সঙ্গে মানাবেও।

এখন দেখছে যন্ত্রণা সমানই। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চলছে তো চলছেই। প্রথম প্রথম আজেবাজে লোকেরা উঠতে পেত না, নীচে গার্ড থাকত, ফালতু লোকদের খেদিয়ে দিত। এখন তারাও ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে, টিকি দেখা যায় না। ফলে একজন না একজন আসছেই: 'দিদি, বেকার ছেলে, ধূপকাঠি বেচে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি', কিংবা শর্মিলার মাকে দেখলে, 'মাসিমা, এই নতুন কাপড়কাচার সাবানটা···'। এর ওপর আবার এক-একদল মেয়ে হাতে ফর্ম নিয়ে সারা মহল্লাকে তাড়া করে বেড়ায় এক-একদিন। মার্কেট রিসার্চ। বসতে দিয়েছ কি দেড় ঘণ্টা। দেড়শো প্রশ্ন নিয়ে জাঁকিয়ে বসবে।

শর্মিলা একদিন কলিংবেল্‌-এর আওয়াজ শুনে দেড় বিঘত মাত্র দরজা খুলে যেই না অল্পবয়সী দুটি মেয়েকে দেখেছে, হাতে ফাইল, সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, কোয়েশ্চন্‌স্‌? আনসার দিতে হবে, এই তো? তা ঘণ্টায় কত করে ফি দেবে আপনাদের কোম্পানি?

ফি? মেয়ে দুটি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে। রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে।

আর শর্মিলা গম্ভীরভাবে বলেছে, বাঃ, আমার সময় নষ্ট করব, প্রশ্নের উত্তর দেব, আর কোম্পানি ফি দেবে না?

মেয়ে দুটি পালিয়েছিল।

সেই রকমই বিরক্তিকর হয়তো কেউ আবার এসেছে, ভাবল শর্মিলা। হয়তো ভুল করে পাশের ফ্ল্যাটের বদলে এ ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়েছে। মাঝে মাঝে ফ্লোর ভুল করে ওপর তলার কিংবা নীচের তলার অতিথিরাও চলে আসে অটোমেটিক লিফটে, ইংরেজি

নিয়ম আর আমেরিকান নিয়মে কোনটা কোন তলা গুলিয়ে ফেলে। তা ফেলুক, কিন্তু একপাশে যে কায়দা করে ওদের পদবীটা লেখা আছে সেটা লক্ষ করবে তো ! করে না।

বিরক্তিকর !

শর্মিলা ধীরেসুস্থে উঠল, সোজা হয়ে দাঁড়াল, পোশাক ঠিক করল, তারপর বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলতে গেল। মনের মধ্যে বেশ রাগ, দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। শুধু একবার মনে হল বিপিনও হতে পারে।

ধীরে ধীরে এসে দরজা খুলল শর্মিলা, ম্যাজিক আই দিয়ে মুখটা দেখা গেল না বলেই। লোকটা সরে দাঁড়িয়েছে। ক্যাবলা। সামনাসামনি দাঁড়াবি তো, তা না হলে মুখটা দেখা যাবে কি করে। ভর দুপুরবেলা হলে অবশ্য দরজা খুলত না মুখ না দেখে। এ-সময়ে ভয় পাবার কিছু নেই।

দরজা খুলল শর্মিলা, খুলেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

দেখেই বিরক্তি হয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভাব পাল্টে নিয়ে বললে, ও আপনি ? মুখে একটু হাসি আনল, আসুন, আসুন।

শম্ভু !

জিন্‌সের পা আসলের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা দেখায়। এই সিটিং-কাম-ডাইনিং-এর মতই। ফাঁকা আর লম্বা বলে অনেক বেশি লম্বা দেখায়। অবশ্য বড়ই, বারো চব্বিশ। জিন্‌সের লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল শর্মিলা, বাঁ হাতের তর্জনী ডিভান দেখাল।

—বসুন।

পিছন ফিরে ভাল করে তাকালেও না। আড়ালে, অন্য ঘরে চলে গেল। মাকে খবর দেবার জন্যে।

নীলিমা নিজেকে খুব একটা বদলাতে পারেননি। ভেতরটা এখনও নরম নরম। বড় মেয়ের জন্যে যে শাড়িটা কিনে এনেছেন, খাটের ধারে বসে সেটায় ফল্‌স্ টেঁকে দিচ্ছিলেন।

শর্মিলা ছোট মেয়ে, একটু বেয়াদপ টাইপের, বোধহয় অতিরিক্ত প্রশ্রয়।

এসেই ঘাড় নেড়ে ইশারায় বললে, যাও। এসেছে আবার।

বেল্ বাজার আওয়াজটা ঠিকই কানে এসেছিল, জিগ্যেস করলেন, কে ?

—কে আবার। রাহু।

কথাটা অপছন্দ হল নীলিমার, ভুরু কুঁচকে শর্মিলার দিকে তাকালেন।

অস্ফুটে স্বগতোক্তিতেই যেন বললেন, কথার ছিরি দেখ !

মা নিজেকে বদলাতে পারছে না বলে শর্মিলার একটু ক্ষোভ আছে। বিশেষ করে এই যে লোকটা, মা যে খুব একটা পছন্দ করে তাও নয়, কিন্তু ব্যবহারে কিছুতেই জানতে দেবে না।

রাহু নাম দিয়েছে শর্মিলার দাদা। অনীশ।

বাড়িটা এখন কিন্তু রীতিমত সুখী পরিবার। তেমন কোনও অশান্তি নেই, রোগবালাই নেই। রান্নার লোক, ভৃত্য বিপিন, ঠিকে ঝি সব ঠিক ঠিক আছে। কেউ ছেড়ে যায়নি, ছুটি নিয়ে দেশে যায়নি। সুতরাং সংসারে পূর্ণ শান্তি।

কিন্তু এরই ফাঁকে যেদিনই কলিংবেল্ বেজে ওঠে, আর বিপিন দরজা খুলে দিয়েই ভিতরে এসে খবর দেয়, শম্ভুবাবু এয়েচেন, সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটায় অস্বস্তির হাওয়া বয়ে যায়।

অনীশ ছিল সেদিন, শুনেই ভেঙচি দিয়ে বলে উঠেছিল, এয়েছেন তো ধন্য করেছেন। শম্ভুবাবু না, বল রাহুবাবু।

শর্মিলা দাদার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে উঠেছিল, এবং কথাটাও ওর খুব মনের মত লেগেছিল। তারপর থেকেই এ বাড়িতে আড়ালে এবং চাপাস্বরে শম্ভুর নাম হয়ে গেছে রাহু।

অথচ এই কিছুদিন আগেও এ পরিবারের মধ্যে শম্ভুর বেশ একটা খাতির ছিল।

তখন ত্রিদিবেশবাবুর সংসারে একটা দুঃস্বপ্নের দিন। দুঃখের।

একটু-আধটু শনি-রাহুর চর্চা, পলার আংটি এ-সব বোধহয় তখনই ঘরে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছিল। শনির মত রাহুও যে একটা ভয়ঙ্কর গ্রহ অনীশ কিংবা শর্মিলা বোধহয় তখনই জানতে পারে।

অনীশ কিংবা শর্মিলা কেউই ওসব জ্যোতিষ-টোতিশে বিশ্বাস করে না। কিন্তু পারিবারিক খাবার টেবিলে বাবার বিমর্ষ মুখে একসময় গ্রহবিগ্রহের কথা শুনে শুনে শর্মিলার বেশ একটা লাভ হয়েছে। একদিন রসিকতা করে অনীশকে বলছিল, দ্যাখ দাদা, জ্যোতিষ-টোতিশ মানি আর না মানি, শব্দগুলো, মানে গ্রহের নামগুলো কিন্তু দারুণ ফোর্সফুল। শনি-রাহু, এই ধর শম্ভুকে বোঝাতে রাহুর মত আরেকটা ওয়ার্ড তুই বল্।

অনীশ তো বটেই, ত্রিদিবেশবাবুও হেসে ফেলেছিলেন। তারপর নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলেন স্ত্রী আদৌ এই রসিকতা পছন্দ করছে না। এবং তখন ত্রিদিবেশবাবুর মনে হয়েছিল ওঁর হেসে ওঠা উচিত হয়নি। নিজেকে ছোট মনে হয়েছিল। কিন্তু, লোকটা কেন যে হঠাৎ হঠাৎ আসে। না এলেই বরং ওর সম্মান থাকত, খাতির থাকত। আর এতই বোকা যে বোঝেও না এ-বাড়িতে এখন ও আনওয়ান্টেড। কিংবা সবই বোঝে, ইচ্ছে করে যন্ত্রণা দিতে আসে।

ত্রিদিবেশবাবু সেদিনই বড় মেয়ে উর্মিলার মুখেও একটা চাপা হাসির আস্তরণ দেখেছিলেন। দেখে স্বস্তি। প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারতেন না। একটা লুকোনো ভয় ছিল। নীলিমারও।

নীলিমা এখন দোটানার মধ্যে।

শম্ভু এলে অস্বস্তি হয় ঠিকই, না এলেই যেন ভাল হত, কিন্তু এলেও ছেলেমেয়েদের মত 'রাহু' বলে উপহাস করতে পারেন না।

—যাও, মিষ্টিফিস্টি পুডিংটুডিং কি আছে সব দেবে যাও। মাকে রাগাবার জন্যেই যেন বললে শর্মিলা।

নীলিমা ছেলেমেয়েদের কাছে এমন কথা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তবু ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তা হলে আর মানুষ রইলাম কই।

শর্মিলা কানেই নিল না। বললে, দিদিকে আবার ডেকে নিয়ে যেয়ো না সেদিনের মত।

নীলিমা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। পারুলের মাকে চা করার কথা বলে বসার ঘরে এলেন। ছেলেমেয়েরা যে যাই বলুক, যা খুশি ঠাট্টাই করুক, 'ভদ্রতা' 'সৌজন্য' কথাগুলো তো আর উবে যায়নি।

সে-সব দিনের কথা ভাবলে তো নীলিমা এখনও শিউরে ওঠেন। এখন ছেলেমেয়েরা শম্ভুকে 'রাহু' বলছে। অবশ্য দোষও নেই। শম্ভু এলে, খুব কমই আসে, অনেকদিন পর পর, তবু কেমন একটা অস্বস্তি হয়। যেন না এলেই স্বস্তি। শম্ভু কি সে-কথা বুঝতে পারে না! এ বাড়ির কেউ যে চায় না ও আসুক, এটুকু বোঝার ক্ষমতা কি ওর নেই! এতই বোকা? না কি ধড়িবাজ, সবই বোঝে, জ্বালাবার জন্যেই আসে! এসে মজা পায়! কিছু একটা তালে ঘুরছে কিনা তাই বা কে জানে।

শাড়ির আঁচলটা ভাল করে গায়ে ঢাকা দিয়ে নিলেন, তারপর বসার ঘরে ঢোকার সঙ্গে

সঙ্গে একমুখ হাসি মাখিয়ে নিলেন মুখে। যেন শম্ভুকে দেখে বা শম্ভু আসায় খুব খুশি হয়েছেন।

শম্ভু লক্ষই করেনি, দেয়ালের ছবি দেখছিল, অন্যদিকে মুখ। ছবি দেখা ছাড়া কিই বা করবে। এই বিশাল লম্বা হলঘর, শম্ভুর চোখে কেমন খাঁ-খাঁ ফাঁকা, এক প্রান্তে শোফা কৌচ, দেয়াল ঘেঁসে ডিভান, এল্‌ হয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দিকে ডাইনিং টেব্‌ল প্রায় চোখের আড়ালে, পেতলের ভাস, ভাসে সবুজ গাছ, এ-সব দেখতে তো শম্ভু অভ্যস্ত নয়, কোনদিন ঢুকতে পাবে এ-সব বাড়িতে কল্পনাও করেনি। ঊর্মিলা কিংবা শর্মিলার মত ঝকঝকে পরীদের সঙ্গে কথা বলতে পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে পেয়েই যেন জীবন ধন্য। সেজন্যে অস্বস্তি তারও কম নয়।

এত বড় ঘরখানার এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতে হয় বলে সঙ্কোচ আরও বাড়ে।

চোখোচোখি হল, আর নীলিমাকে একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে শম্ভুর অস্বস্তি কেটে গেল। মনে হ'ল, ঠিক আগের মতই।

উঠে দাঁড়িয়ে শম্ভুও মুখে হাসি এনে বললে, এদিকে এসেছিলাম কাজে, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

—বাঃ, আসবে বই কি। ভালই করেছ, তাছাড়া ওঁরও তো ফেরার সময় হয়ে এল।

নীলিমা বসলেন, শম্ভুও বসল।

—তোমার আর কোনও কমপ্লেন নেই তো। নীলিমা একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে জিগ্যেস করলেন।

শম্ভু হেসে বললে, না না, ওসব আমি ভুলেই গেছি।

'ভুলেই গেছি'। কথাটা নীলিমার কানে খট্‌ করে লাগল। মনে মনে যেন বললেন, ভুলে যেতে দিচ্ছ কই? মনে রেখেই তো বারবার আসছ। বাড়িসুদ্ধ লোকদের বিরক্ত করছ। আমারও অস্বস্তি।

শম্ভু বোঝে না তা নয়, যে-কোনও লোকই বুঝতে পারত ঊর্মিলা বা শর্মিলা ওকে এড়িয়ে চলে। এই যে সারাক্ষণ একা একা বসে ছিল, শর্মিলা একটা কথাও বলেনি, এসে বসেনি এক সেকেন্ড, তা দেখেও কি ও বোঝে না?

বোঝে ঠিকই, পরোয়া করে না। নীলিমার অন্তত তাই ধারণা। আসলে ওঁর মনে হয় শম্ভুর মধ্যে একদিকে যেমন একটা হীনমন্যতা আছে, তেমনই আরেকদিকে একটা লুকোনো অহমিকা আছে। সেটা এতই চাপা কেউ দেখতে পায় না।

কিন্তু নীলিমা দেখতে পান। ওর ওই জড়তা, অস্বস্তির হাসি, এসবের পাশে এ-বাড়ি সম্পর্কে একটা চাপা তাচ্ছিল্য আছে। ঘৃণা কি? তাই বা কে জানে!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শম্ভু সম্পর্কেও তো এ বাড়ির সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য আছে, যেটা হাবেভাবে খুব স্পষ্ট হয়েই দেখা দেয়। বেদম ঘৃণাও বলা যেতে পারে।

নীলিমা সত্যি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যান এই পারস্পরিক ঘৃণার সম্পর্কটার কথা ভেবে। অথচ এমন হবে কোনদিনই কল্পনা করেননি।

মানুষ কত বদলে যায়। এই সেদিন শম্ভুকে মনে হয়েছে ভগবান।

তবু নীলিমা নিজেকে অতটা নীচে নামাতে পারেন না। স্বামী কিংবা ছেলেমেয়েরা যে যা ভাবুক, যে যতখানি তাচ্ছিল্য করে করুক, ওঁর মনের মধ্যে কোথায় একটা কৃতজ্ঞতার তার রিনরিন করে বাজে।

শম্ভু হঠাৎ একটু নার্ভাস হাসি হেসে উঠল।—আমি অসময়ে এসে, মাসিমা, আপনাদের অসুবিধে করলাম না তো!

ইস্, ওঁর ব্যবহারে সেটা কি ধরা পড়ে গেছে নাকি ! কি লজ্জা !

—না, না। কি যে বলো তুমি। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলের মত। নীলিমা হাসিটা আরও অন্তরঙ্গ করার চেষ্টা করলেন।

বললেন, বোসো, তোমার চা আনছি।

শম্ভু বাধা দিল না। বেশ বোঝা গেল ও একটু খাতির-যত্ন চায়। হয়তো তাতে ওর অহমিকা তৃপ্ত হয়। কিংবা এইমাত্র শর্মিলার ব্যবহারে ও যতখানি নিচু হয়ে গেছে, এই মাসিমার দেওয়া চা-মিষ্টি-পুডিং হয়তো ওকে তা থেকে একটু মাথা তুলতে দেয়।

যেতে যেতে নীলিমা ফিরে না তাকিয়ে বললেন, আসবে বই কি, তোমার আবার সময়-অসময় কি।

শম্ভু মুখ ফুটে কথাা বলতে পারছিল না। কেমন একটা সঙ্কোচ। লজ্জা লজ্জা করে, এরা না ভুল বুঝে বসে। কিছুটা যে ভুল বোঝে, তাও জানে।

একেবারে হঠাৎ এসে পড়ে না। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। হ্যাঁ, রীতিমত ধান্দাবাজই নিজেকে মনে হয়। ধান্দা নিয়েই আসে, মুখ ফুটে বলতে পারে না। পারে না বলে এক এক সময় ভেতরে ভেতরে ভীষণ রেগে থাকে। সব কথা খুলে বলতে হবে কেন। তোমরা কি বোঝো না।

কিন্তু একটা নরম দিকও আছে।

চায়ের কাপ নিজেই নিয়ে এলেন। মিষ্টি আর পুডিংয়ের প্লেট পারুলের মার হাতে।

বাইরের কেউ এলে সাজানো ট্রে দিয়ে যায় পারুলের মা। টি-পট থেকে চা ঢেলে দেন নীলিমা, দুধ চিনি, কিংবা সে কাজ বাড়ির মেয়েরা করে।

এতদিনে এ-সবে নীলিমা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ছেলেমেয়েদের চাপে পড়ে।

শম্ভুর বেলায় কিন্তু ও-সব বাহুল্য। বরং ওভাবে আনলে ছেলেমেয়েরা রেগে যায়।

হাত থেকে তর্জনী ছুঁড়ে দিয়ে অনীশ একদিন বলেছিল, স্রেফ এক কাপ চা পারুলের মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

নীলিমার আপত্তি হয়নি, সেটাই তো বেশি আন্তরিকতা। আত্মীয়স্বজন এলে তো তাই করেন। শুধু পারুলের মার বদলে নিজে নিয়ে আসেন। কখনও-কখনও পারুলের মা নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রেখে দেয়। উনি হাত ছুঁইয়ে একটু ঠেলে দেন। কেউ কিছু মনে করে না। ওঁর চোখের সামনেই টাকা হয়েছে। দিনে দিনে, দ্রুত। হাবভাব বদলেছে বাড়ির। 'এটিকেট' শব্দটা জানতেন, শুনতে পেতেন না। এখন শুনতে পান। ওরা জানে না, কিংবা বোঝে না, চায়ের ট্রে টি-পট দুধ চিনির পাত্র পৃথক পৃথক দেয়া মানে, মানুষটাকে পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া। অন্তত ওঁর মতে। ওদের হিসেবে, খাতির করা।

শম্ভু বলি বলি করছিল। কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছিল।

নীলিমা হাসিমুখে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতেই শম্ভু দুম্ করে বলে উঠল, হাসতে হাসতেই বলল, মাসিমা, উর্মিলা কি নেই নাকি ? না, খুব ব্যস্ত ?

ঠিক্ এটাই ভয় পাচ্ছিলেন।

মিথ্যে কথাটা মুখে এল না।

যদি বলে দেন, না, নেই, বেরিয়ে গেছে, আর তখনই ওদিকের ঘর থেকে উর্মিলা বিপিন কিংবা পারুলের মাকে চিৎকার করে ডেকে বসে, তা হলে ধরা পড়ে যাবেন। লজ্জার শেষ থাকবে না।

সে-কথা আসার আগে উর্মিলাকে বলে এলেও হত। কিন্তু খেয়াল হয়নি। আবার বলতেও পারেন না। উর্মিলাকে ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো বলে বসত, তাতে কি

হয়েছে। যাই না, একবার দেখা করেই আসি। আর তা হলেই স্বামী বা ছেলে অনীশ ফিরে এলে একটা হুলুস্থুল বেধে যাবে। যেন ঘোর অন্যায় ঘটে গেছে।

এটা তো পর্দানশিন বাড়ি নয়। মেয়েরা, বিশেষ করে ছোট মেয়ে শর্মিলা তো তীব্র আধুনিক। জিন্‌স, মিডি, চুড়িদার, কি নয়। উর্মিলাও যথেষ্ট আধুনিক। বসার ঘরে অনীশের বন্ধুরা কিংবা অচেনা কোনও পুরুষ এলেই ওপাশের দরজা বন্ধ হয় না। মেয়েরাও আসে, দু-চারটে কথা বলে, কখনও আড্ডাও জমিয়ে দেয়। তবে, এত আপত্তি কেন এই শম্ভুর বেলায়।

বরং এখানে তো অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আসলে ওই ঘনিষ্ঠতাকেই কি ভয় ?

নীলিমাকে বলতেই হল, না না, আছে। জানি না, হয়তো ঘুমোচ্ছে। দেখছি।

শম্ভু বললে, না না, আপনি বসুন। সে যাবার সময় না হয়…

শম্ভু না বললেও নীলিমা উঠতেন কিনা সন্দেহ।

নীলিমা এসেছিলেন মাঝারি গেরস্থ ঘর থেকে, যে বাড়িতে এসেছিলেন সেটাও ছিল মাঝারি গেরস্থ ঘর। এখন দিন পাল্টেছে, আলাদা সংসার হয়েছে। কিন্তু প্রথম জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট সয়ে এসেছেন। ননদ আর শাশুড়ির গঞ্জনাও। দুঃখ এবং কষ্ট পেলে মানুষকে মানুষ ভাবতে ইচ্ছে করে। স্মৃতি সে-সব দিন ভোলেনি বলেই তাঁর মধ্যে এই দোটানা।

—মেসোমশাই এসে পড়লে ভাল হত, ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।

মিষ্টি আর পুডিং চেটেপুটে শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শম্ভু বললে।

একটু থেমে বললে, আঃ, মেসোমশাইকে দেখে আজকাল এত ভাল লাগে। দিব্যি হাসিখুশি, আর তখন, মনে আছে আপনার ?

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। —কাকে বলছি মাসিমা, আপনি তো তখন একেবারে মরা মানুষ, মুখের দিকে তাকানো যেত না।

শম্ভুর হাসির পিঠে হাসি চাপানোর চেষ্টা করে বললেন, ওসব আর মনে পড়িয়ে দিয়ো না।

হাল্কা ভাবেই বললেন। কিন্তু, যেন সে-কথাটাই বলতে চাইলেন। ওসব কথা তুললে সকলেই বিরক্ত হয়। আসলে সকলে ভুলে গেছে এবং ভুলে যেতেই চায়। শম্ভু ও-কথা মনে পড়ালে আরও খারাপ লাগে। পরিবারের সকলে সেজন্যেই ওর ওপর আরও চটা।

নীলিমা বেশ বুঝতে পারেন, এই সব কথাগুলো শুনলেই অনীশরা ভেবে বসে, শম্ভু এ-বাড়ির সমকক্ষ হয়ে উঠতে চাইছে। সমান সমান। কিন্তু তা তো ও নয়।

সত্যিই তো, শম্ভু অনেক নীচের মানুষ। আবার তেমন নিচুতলারও নয়। হ'লে শর্মিলা ওর সঙ্গে দিব্যি দু-চারটে কথা বলত, উর্মিলা এসে কথা বললে কেউ কিছু মনে করত না।

—বসো, দেখি উর্মি উঠল কিনা।

নীলিমা ভাবলেন বরং উর্মিকে ডেকেই আনি, দু-চারটে কথা বলে ছেলেটাকে বিদেয় করে দিক। স্বামীর ফেরার সময় হল, ওকে দেখে আবার না রাগারাগি করে। যেন যত দোষ নীলিমার। যেন উনি ডেকে ডেকে নিয়ে আসেন।

উঠতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শম্ভুর উজ্জ্বল মুখটা দেখে পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন উর্মি এসে দাঁড়িয়েছে।

—আরে, আপনি কখন এলেন ? কেউ বলেনি তো।

নীলিমা পিছন ফিরে বললেন, আমি ভাবলাম তুই ঘুমোচ্ছিস।

—বাঃ রে, ঘুমোলাম কোথায়। আমি তো শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলাম।

শম্ভু বললে, বোসো।

'বসুন' নয়। এখন এটা কানে লাগে। শম্ভু এখন আবার 'আপনি' 'আজ্ঞেতে' ফিরে গেলে সবাই নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা আর হবার নয়। এক সময় ওরাই তো যেচে বলেছে, শম্ভুকে 'তুমি'তে নামিয়েছে।

হঠাৎ খুব জোরে গান শুরু হল ওদিকের ঘরে। একটু বেশি জোরে। নীলিমা বুঝতে পারলেন ওটা রাগ। নীলিমা শম্ভুর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছেন বলে, সঙ্গে সঙ্গে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেননি সেটাই দোষ, কিংবা এই এখন ঊর্মি চলে এল এবং বসে কথা বলছে বলে শর্মিলা রেগে গিয়ে একা-একা কি আর করবে, নব্‌টা জোরে ঘুরিয়ে দিয়েছে! ওটাই ওর প্রতিবাদ।

নীলিমা জানেন আজ আবার একচোট হবে। ফিরতে না ফিরতে শর্মিলা বাবার কাছে, দাদার কাছে শম্ভুর এই হঠাৎ চলে আসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে, আর ওরা ভাববে নীলিমাই যেন প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

ত্রিদিবেশ ফিরলেন। শর্মিলাকে আর কিছু বলতে হল না। নিজের চোখেই দেখলেন শম্ভু হো হো করে হাসছে, ঊর্মির কোনও একটা কথায়।

নীলিমাকে অবশ্য বসে থাকতে দেখেননি, কারণ সারেগামা সুরে বেল বাজতেই বিপিন সিনেমার টিকিট নিয়ে ফিরেছে মনে করে নীলিমাই দরজা খুলতে গিয়েছিলেন।

দেখলেন, বিপিন নয়। খোদ গৃহস্বামী।

পামশু মচমচ করে ত্রিদিবেশ ঢুকলেন, শম্ভুকে দেখে ঈষৎ অখুশি হলেন, মচমচ করে ভিতরের দিকে চলে যেতে যেতে না-থেমেই না-ফিরে তাকিয়ে শুধু দুটো গম্ভীর শব্দ পিছনে ফেলে গেলেন, কি খবর, ভাল তো! শম্ভু কি বলল না-বলল শোনার ধৈর্য নেই, ঘাড় কাত করল কিনা দেখার আগ্রহ নেই।

ভিতরে ঢুকে গিয়ে অর্থাৎ শম্ভুর চোখের আড়ালে চলে গিয়ে ডাকলেন, বিপিন!

ঊর্মি বসে বসেই চেঁচিয়ে বললে, বাপি, বিপিনকে সিনেমার টিকিট কাটতে পাঠিয়েছে।

ঊর্মিকে একা বসিয়ে রেখে যাবার ইচ্ছে ছিল না নীলিমার, তবু যেতেই হল।

লম্বা ভারিক্কি চেহারা ত্রিদিবেশের, গলার আওয়াজও আত্মবিশ্বাসে ভরাট। খদ্দরের ধুতি পরেন, গরদের পাঞ্জাবি, পায়ে কালো পামশু। ব্যবসাটা দেখতে ছোটখাটো, কিন্তু আয় যথেষ্ট। নিজের চেষ্টাতেই কপাল ফিরিয়েছেন। পরিবারের চেহারাও। কিন্তু নিজে খুব বেশি বদলাননি।

নীলিমা এসে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলেই বসে আছে।

অর্থাৎ ত্রিদিবেশ যদি চান এখনই গিয়ে ওকে বিদেয় করে দিয়ে আসতে পারেন। কেন বসে আছে তার একটা জবাবদিহিও হল।

—কেন? কি চায় কি?

—কি জানি! বোধহয় এমনি। এছাড়া নীলিমা আর কিই বা বলবেন।

—বসতে বলো।

ত্রিদিবেশ এখন স্নান করবেন, পোশাক বদলাবেন, সে অনেক সময়। তা হলে কি ততক্ষণ ঊর্মি ওর সঙ্গে বসে বসে গল্প করবে! উনিই বা কতক্ষণ বসে থাকবেন। পারুলের মাকে জলখাবার তৈরির সময় একটু দেখেশুনে দিতে হবে তো।

নীলিমা বললেন, তার চেয়ে তুমি গিয়ে দেখা করে...

ইশারায় হাতটা নাড়লেন নীলিমা বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে।

নীলিমার ভাবভঙ্গি দেখে ত্রিদিবেশ হেসে ফেললেন।

বললেন, ঠিক আছে, তাই।

এলেন। বাবাকে আসতে দেখে ঊর্মি উঠে দাঁড়াল, শম্ভুও।

ঊর্মির দিকে তাকিয়ে ত্রিদিবেশ বললেন, তুই যা।

ঊর্মি সৌজন্য দেখিয়ে হেসে, 'যাই' গোছের ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

ত্রিদিবেশ ভারী শরীরটা রবারের গদিতে ঢেলে দিলেন।

নড়েচড়ে ঠিক হয়ে নিয়ে বললেন, তারপর ? কি করছ এখন ?

শম্ভু একটু অপ্রতিভ হল। এটাই তো ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। হঠাৎ এক-একদিন আসতে ইচ্ছে হয়, কি যেন একটা টান আছে। কিন্তু সঙ্কোচও। আবার আড়ালে একটা স্বার্থের কথাও ভাবে।

এই একজন মানুষ, একজন সফল মানুষ। শম্ভুর কাছে কিছুটা কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই। সেই সুবাদে এই ত্রিদিবেশবাবু কিন্তু ইচ্ছে করলেই শম্ভুর জীবনটাকে বদলে দিতে পারেন। ইচ্ছে করলেই। অন্তত শম্ভুর তাই ধারণা। কিন্তু মজা এই, এদের ইচ্ছে হয় না।

আবার শম্ভুর মধ্যেও একটা চাপা অহমিকা আছে। ও মুখ ফুটে বলতে পারেনি। বলতে হবে কেন ! উনি কি বোঝেন না ?

—তেমন কিছুই করছি না। শম্ভু একটু ম্লান হাসল। আজকালকার দিনে কোথায়ই বা চাকরি পাওয়া যায়।

এর পরই তো ত্রিদিবেশবাবুর বলার কথা, চাকরি করবে তুমি ?

তার বদলে উনি ঈষৎ হাসলেন। —তা অবশ্য ঠিকই। যা দিনকাল পড়েছে...

পরক্ষণেই বিষয় বদলে ফেললেন। —বাড়ির সব ভাল তো ?

শম্ভু ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

এই সফল মানুষগুলোর কাছে এর চেয়ে বেশি কথা অপব্যয় মাত্র। মারাত্মক কিছু অসুখবিসুখ কারও হয়ে থাকলে এবং তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে অর্ধেক শুনেই থামিয়ে দিয়ে একজন বড় ডাক্তারের নাম করে বলবে, ওঁকে দেখাও। ব্যস্।

এ ছাড়া আর সব কিছুই ওদের কাছে ভাল থাকা। আর্থিক অসুবিধের কথা বললে হয়তো মনিব্যাগ খুলে দুটো একশো টাকার নোটও এগিয়ে দিতে পারে। কিংবা সেই পাঁচ

কিন্তু শম্ভুদের মত পরিবারে সবটাই তো খারাপ থাকা।

কত রকমের অভাব-অনটন, কত রকমের দুশ্চিন্তা। দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো আবার লুকিয়ে রাখতে হয়, গোপন করতে হয়। এদের কাছে অবশ্য সেগুলো গোপন করার প্রয়োজন নেই। গোপন তো করতে হয় আত্মীয়স্বজনের কাছে, পাড়াপড়শির কাছে। এসব উঁচুতলার লোকদের কাছে সে ধরনের চক্ষুলজ্জা নেই। বলে লাভ নেই বলেই বলে না। কমলার কথা যদি বা বলে, বড়জোর একটা ইস্। আঃ বা উঃ। ওসব অনেক দেখেছে ও।

ও জানে, এ-সব কথা ওদের ছোঁয় না।

বাড়ির সব ভাল তো ? যেন শম্ভুর বাড়ির কথা জানবার জন্যে ওঁর কতই আগ্রহ। জবাবে ঘাড় নেড়ে শুধু 'হ্যাঁ' জানানো ছাড়া আর কিই বা বলবে !

একটা চাকরির কথা বলার সুযোগ এসেছিল, যখন ত্রিদিবেশবাবু প্রশ্ন করলেন, এখন কি করছ ! তারপরই পাছে শম্ভু কিছু বলে বসে, চাকরি-বাকরির কথা কিছু বলে বসে, সেজন্যেই তাড়াতাড়ি বিষয় পাল্টালেন। সেটুকু বুঝতে শম্ভুর অসুবিধে হয়নি।

অথচ উনি ইচ্ছে করলে, চাকরি না হোক্ একটা ছোটখাটো ব্যবসার হদিস দিতে পারতেন।

এই যে শম্ভু মাঝে মাঝে আসে, কি মনে করে এরা ?

—আমার আবার একটু তাড়া আছে, বুঝলে শম্ভু। চানটান করে তৈরি হতে হবে, আজ এক জায়গায়...

শম্ভু অপ্রতিভ হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। বললে, না, এমনি এসেছিলাম, মাঝে মাঝে মনে পড়ে, চলে আসি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো আসবেই। ত্রিদিবেশবাবুও উঠে দাঁড়ালেন।

শম্ভু বললে , একটা সম্পর্ক তো হয়েই গিয়েছিল, আপনাদের খুব আপন মনে হয়। তাছাড়া, একটা উপকার তো করেছিলেন, ভুলব কি করে। বলে হাসল।

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ। কি যেন ভাবলেন ত্রিদিবেশবাবু। তাঁকে কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাল। হঠাৎ কেমন অপমানিত লাগল নিজেকে।

নীলিমা এগিয়ে এলেন। বললেন, আবার এসো।

শম্ভু বেরিয়ে যেতে একটুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

॥ ২ ॥

ওরা যে-রকম ব্যবহারই করুক না কেন, শম্ভু মোটেই অনুতপ্ত নয়। এক সময়ে ও যে উপকৃত হয়েছিল সে-কথা ভুলবে কি করে। তাছাড়া নিজের বাড়িতে যার ফিরতে ইচ্ছে করে না, সাদর আমন্ত্রণ না পেলে সে যদি অভিমানে কারও বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে, তাহলে সে কোথায় যাবে ? কোথায় সময় কাটাবে !

ও ভেবেছিল, নিজেদের বাড়িটার চেহারা বদলে দিতে পারবে। পারেনি।

ত্রিদিবেশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় নেমে, ভেবে ঠিক করতে পারল না কোথায় যাবে। যাই, আশুর চায়ের দোকানেই যাওয়া যাক। গুপী হয়ত এর মধ্যে এসে গেছে। নাকি গুপীর দোকানেই চলে যাবে। এখনও হয়তো বন্ধ হয়নি।

মনে মনে উচ্চারণ করল, শালা। কারও বিরুদ্ধে ? নাকি নিজেরই বিরুদ্ধে ?

সেই সব দিনগুলোর কথা ওর একটু একটু মনে পড়ছিল।

মা একদিন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেছিল, এই শুয়োরের খোঁয়াড়ে আমার আর একদিনও বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

শুনে শম্ভু হেসে ফেলেছিল, পর মুহূর্তেই মনে হয়েছিল, মা একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথাটাই বলেছে। শুয়োরের খোঁয়াড়।

সত্যি, লোকে কত ভাল ভাল বাড়িতে, ছিমছাম ফ্ল্যাটে বাস করে। নিজেদের এই মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুর দিকে তাকিয়ে খোঁয়াড় ছাড়া অন্যকিছু মনেই হয় না। আড্ডা দিয়ে রাত করে যখন বলে, আর না, বাড়ি চললাম, তখন বাড়ি কথাটাই যেন ওকে ঠাট্টা করে।

কবে কি ভাবে বাবা জুটিয়েছিল, মানে ভাড়া নিয়েছিল, শম্ভু কিছুই জানত না। ও ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। এখন অবশ্য সব ইতিহাস জানে, মার কাছে শুনেছে। মান্ধাতা আমলের বিশাল অথচ প্রায় ধসে পড়া এই বাড়িতে পাশাপাশি অনেকগুলো ভাড়াটে। একখানা মাত্র ঘর, নীচের তলায় আলো ঢোকে না, বাতাসের তো কথাই নেই, এক চিলতে বারান্দা ভিতরের দিকে, বৃষ্টির ছাট আটকানোর জন্য দরমার আড়াল, ভাঁড়ার ঘরটাকেও সরু তক্তপোশ ফেলে শোয়ার ঘর বানানো হয়েছে। কলঘরে কল আছে, চৌবাচ্চাও, কিন্তু ভর্তি হতে কখনও দেখেনি। সরু সুতোর মতো জল আসে, ভর্তি হবে কি করে। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল এনে অভাব মেটাতে হয়। তবু চলে যাচ্ছিল। যত কম মাইনেই হোক, বাবার চাকরিটা তখনও ছিল।

মাইনেটা কম, তাও আন্দাজে বুঝতে হয়েছে। কোনদিন জানতে পারেনি ঠিক কত। জানার আগ্রহও হয়নি।

শম্ভু কিন্তু প্রথম প্রথম স্বপ্ন দেখত। ভাবত বাড়ির চেহারাটা বদলে দেবে।

বি-এ পাশ করে সে কি আনন্দ! যেন পৃথিবীর সব ভাল জিনিসগুলো ওর হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এখন শুধু সিন্দুকের চাবিটার জন্যে কিছুদিন অপেক্ষা করা। খবর শুনে মার চোখ দুটোও চকচক করে উঠেছিল।

কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ করলেও ডিগ্রি তো। আর এমন একটা সস্তার কলেজে পড়ে এর চেয়ে ভাল রেজাল্ট হয় নাকি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করিয়ে এসেছিল শম্ভু। তখন কত উৎসাহ, কত আশা।

পাশের খবর জানাবার জন্যে একদিন ছোটকাকুর বাড়ি চলে গিয়েছিল। এমনিতে যেত না, কেমন নিজেদের হেয় মনে হত। কিন্তু বাবা বারবার বলেছিল বলেই যেতে হয়েছিল। হাজার হোক একটা সুখবর তো, বলে আসতে দোষ কি। মনে মনে একটা ক্ষীণ আশাও হয়তো ছিল, ছোটকাকু কিছু একটা জুটিয়ে দিতেও পারে।

ওদের তুলনায় ছোটকাকুদের অবস্থা বেশ ভাল। পার্কের কাছে একটা চারতলা বাড়ির দোতলায় থাকে ছোটকাকুরা। তিন ঘরের ছোট ফ্ল্যাট, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোটকাকিমা আবার সাজাতেও জানে। ঘর এবং নিজেকেও। ছেলেবেলায় এটাই শম্ভুর কাছে একটা বড় রহস্য ছিল। বোকার মত মাকে প্রশ্ন করে বসেছে, ছোটকাকুদের অবস্থা এত ভাল কেন? ওরা এত ভাল জায়গায় ভাল বাড়িতে থাকে কেন? মা কোনও উত্তর দিত না। তখন ওর প্রায়ই ছোটকাকুদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করত। যতক্ষণ থাকত কি ভাল যে লাগত। যেন নিজেদের এই ঘিঞ্জি মালপত্রে ঠাসা অন্ধকার এক চিলতে ঘর থেকে পালানো। বড় হয়ে এখন যেতে লজ্জা করে।

কিন্তু ছোটকাকুদের অবস্থা ভাল কেন? বাবার তো নিজেরই ভাই, অথচ দুজনের মধ্যে এত তফাত কেন হয়ে যায়, কিভাবে হয়ে যায় ভেবে পেত না। এখনও পায় না, শুধু ছোটকাকু নয়, আরও অনেকের দিকে তাকিয়ে।

মা বলে, ভাগ্য। হবে হয়তো।

শম্ভু চলে গিয়েছিল খবরটা জানাতে। ওর মনের মধ্যে তখনও সেই খুশিটুকু রিনরিন করে বাজছে। যেন সদ্য বিশ্ব জয় করে বসেছে।

ছোটকাকু দেখেই বললে, কি রে, কি খবর। সব ভাল তো?

যেন খারাপ খবর দিতে আসা ছাড়া আর কোনও কারণে আসতে নেই। এতদিন পরে এল, যতই হোক একেবারে আপনজন, বলতে গেলে ঘরের লোক, কিন্তু ছোটকাকুর মুখচোখে তেমন খুশির ভাব ফুটল না।

সেজন্যেই আসতে ইচ্ছে করে না।

সব ভাল তো?

যেখানেই যাও ওই এক প্রশ্ন।

শম্ভু বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ সব ভাল, সব দিব্যি ভাল।

কেন যে জিগ্যেস করে। শম্ভুদের কি ভাল থাকার কথা নাকি। ওরা তো সব সময়েই খারাপ থাকবে, সেটাই নিয়ম।

গলার আওয়াজ শুনেই হয়তো ছোট্‌কাকিমা রান্নাঘর থেকে এল। সরু বারান্দাটার ওপাশে রান্নাঘর। এসেই শম্ভুকে দেখে হাসি-হাসি মুখ করল। তুমি? হঠাৎ?

শম্ভুও হাসল। বললে, সুয্যি তো? পুবদিকেই উঠেছে আজ।

আগের বার যখন এসেছিল তখনকার কথাটা মনে করে এবার তার উত্তরটা দিল।

ছোট্‌কাকিমা হেসে ফেলে বললে, বিশ্বাস হচ্ছে না।

শম্ভু জুত করে গুছিয়ে একবার ছোটকাকুর দিকে একবার ছোট্‌কাকিমার দিকে তাকিয়ে বললে, আরেকটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে।

—কি ? কি ? ছোটকাকিমা উদ্‌গ্রীব।

শম্ভু উৎফুল্লভাবে বললে, পাস করেছি। বি-এ।

—বাঃ। খুব ভাল খবর।

ছোটকাকু বললে, তাই বুঝি।

আসলে ওদের কারও খেয়ালই ছিল না যে শম্ভু এবার পরীক্ষা দিয়েছে। খবরের কাগজে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর খবর ছিল, হয়তো চোখ বুলিয়েও গেছে, কিন্তু শম্ভুর কথা মনে পড়েনি।

ছোটকাকুর হয়তো মনে পড়ে গেল। অনার্স কিছু একটা নিলেই পারতিস।

অনার্স যে ছিল না, সে-কথাটা অন্তত মনে পড়েছে।

একটু থেমে বললে, অনার্সেরই তো আজকাল কোনও দাম নেই।

যদিও সত্যি, ও নিজেও জানে, তবু কথাটা ভাল লাগল না শম্ভুর।

ছোটকাকু কি জানে না, ওদের ঘরে একটা নির্জন কোনা নেই যেখানে বসে পড়াশুনা করা যায়। জানে না, শম্ভু কোন কলেজে পড়েছে।

শম্ভু ও-সব কথা গায়ে মাখল না।

কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সবুজ দরজার আড়ালে ওপাশের বারান্দায় এক ফালি ঝকঝকে সাদা মত কি দেখতে পেয়ে কৌতূহলে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, আরেব্বাবা, এটা আবার কবে এল ?

একটা সাদা ধবধবে রেফ্রিজারেটর।

ওর অবাক হওয়ার ধরন দেখে ছোটকাকুও হেসে ফেলেছিল। ছোট্‌কাকিমা খুব খুশি। ফ্রিজটা তো অবাক করার জন্যেই। অন্তত শম্ভুর তাই ধারণা।

বললে, কি কি আছে ভেতরে সব নিকালো, খাবো।

ছোট্‌কাকিমা শব্দ করে হেসে উঠল, এসে ফ্রিজের দরজাটা খুলে দেখাল।

বললে, কিছু নেই, স্রেফ ঝিঙে পটল, আর ডিপ ফ্রিজে কাঁচা মাছ।

ও হরি ! হতাশ হল শম্ভু। বললে, আমার তো ধারণা ছিল রেফ্রিজারেটর মানেই বিরিয়ানি-টিরিয়ানি...সন্দেশ-ফন্দেশও নেই ?

ছোট্‌কাকিমা হাসল। রাখলেই ইঁটের মত শক্ত হয়ে যায়।

শম্ভু বললে, তা হলে একটু ঠাণ্ডাপানিই দাও, খেয়ে যাই। মাকে গিয়ে বলতে পারব, মেশিনের জল খেয়ে এলাম।

ছোটকাকু বললে, বোস্‌ বোস্‌, মদনা মিষ্টি আনতে গেছে। গ্র্যাজুয়েট হলি, ছোট্‌কাকিমা তোকে মিষ্টি খাওয়াবে না।

ব্যস, শম্ভুর মন থেকে সব গ্লানি মুছে গিয়েছিল। অনার্সের কথায় যে ধাক্কা খেয়েছিল তখন আর তা মনে নেই।

কবে কিনলে ?

ছোটকাকু বললে, তুই বোধহয় গতবারে দেখিসনি, তখনই তো এসে গেছে।

আসলে তাই। ছোট্‌কাকিমার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, তবু বলতে পারেনি, দেখাতে পারেনি। শম্ভুদের দরিদ্র্য অবস্থার জন্যে ছোটকাকুরও লজ্জা। ছোট্‌কাকিমারও। দেখালে শম্ভুর খারাপ লাগবে, তাই দেখায়নি। শম্ভু গিয়ে বাড়িতে বললে তাদেরও শুনতে খারাপ লাগবে, সেজন্যেই বলেনি।

কিন্তু শম্ভুর একটুও হিংসে হল না, খারাপ লাগল না। বরং কেমন একটা গর্ব হল। গর্ব করে বলার মত।

আমারই তো ছোটকাকু। নিজের। জেঠতুতো খুড়তুতো নয়, স্রেফ নিজের। বন্ধুদের কাছে কোনও সুযোগে বলে নিতে পারলে শম্ভুর সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলে যাবে।

বাড়ি ফেরার সময় সেদিন শম্ভু একটু-আধটু স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছিল।

ফিরে এসেই ছোটবোন ইভাকে বলেছিল, জানিস ইভা, ছোটকাকুরা রেফ্রিজারেটর কিনেছে।

ও। ব্যস, ইভা আর কিছু বলেনি।

শম্ভু তখন ওর স্বপ্নটা একটু একটু করে মেলে ধরেছে ইভার সামনে।

একটা চাকরি, বুঝলি, মাইনে যা হোক, মাস গেলে একটা মাইনে। তারপর ধর একদিন মাইনে বাড়ল। খুব কাজ দেখালাম, বস খুশি, প্রোমোশন। তখন কি করব জানিস তো ? একটা কম ভাড়ার ভাল ফ্ল্যাট। দুখানা ঘর, টিন দিয়ে ঘেরা চৌবাচ্চা নয়, দিব্যি বাথরুম। ঘরে জানলা থাকবে, জানালায় রঙিন পর্দা দেব। দেয়ালে রং করাব। গ্যাসের উনোন, রেফ্রিজারেটর।

ইভা হেসে উঠে বলেছিল, ফ্রিজ বল। স্কুলে আমার বন্ধুরা বলতো ফ্রিজ।

—ওই হল। তারপর...

ইভা আবার হেসে উঠল। —তারপর তো একটাই, সুন্দর দেখে বউ।

শম্ভুও হেসে উঠেছিল, সে সব অনেক পরে, আগে তো সব গুছিয়ে নেব।

মা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখেনি। মা হঠাৎ বলেছে, সেই সবই তো ভাববি। তোদের কত স্বপ্ন, আমার কিন্তু একটাই। ইভার বিয়ে।

ইভা বলে উঠেছে, তুমি থামো তো।

শম্ভু হাসতে হাসতে বলেছে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তো বলো শুয়োরের খোঁয়াড়, এখান থেকে পরিত্রাণ পেলে ইভার বিয়ে আপনা থেকে হয়ে যাবে।

মা অভিমানের গলায় বললে, মেয়ের বিয়ে আপনা থেকে হয় না। অর্থাৎ চাইলেন ইভার বিয়ে সম্পর্কে শম্ভুও একটু ভাবুক। কিন্তু ও সাংসারিক দিকে একেবারে যেতে চায় না। দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চায়। একটাই স্বপ্ন, এই অন্ধকূপ নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। বাবা দেখে দেখে কেন যে এমন একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল বুঝতেই পারে না। ও তো শুনেছে আগেকার দিনে নামমাত্র ভাড়ায় কত ভাল ভাল বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যেত। তখন নেয়নি কেন ? তা হলে আর আজ কোনও চিন্তাই থাকত না। কারও সাধ্য ছিল না ওদের তুলে দেয়।

অথচ এখন একটা চাকরি পেলেও বাড়িবদলের স্বপ্নটা স্বপ্নই।

ক্লাস সিক্সের একটা ছেলেকে পড়িয়ে সামান্য কিছু টাকা পায়, সেটুকুই ওর হাতখরচ। দিনকয়েক আগে পেয়েছে।

দেয়ালের তাকে বইগুলো সার দিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে পড়ে আছে। একখানা বইয়ের ভেতর নোটগুলো রাখা থাকে। কেউ হাত দেয় না, কেউ চুরি করে না ! তবু মাঝে মাঝে বই পাল্টায়।

বইটা টেনে নিয়ে সকলের চোখের আড়ালে একটা এক টাকার নোট বের করে নিল।

যাই আশুর চায়ের দোকানে।

বইগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে মনে একটা হিসেব কষল। অ্যাসেট। অনেক কষ্টে একটা একটা করে কিনেছিল, অনেকদিন ধরে। কোনটা বাবার কাছে টাকা চেয়ে, কোনটা ট্যুইশনির রোজগারে। এবার একটা একটা করে বিক্রি করবে। কিন্তু

এখনই নয়, ইভার আবার কি কি লাগবে দেখে নিয়ে।

এক টাকার নোটখানা হিপ পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়ল।

শিবেন আর গুপী আগে থেকেই এসে বেঞ্চি দখল করে বসে আছে। ওরাও পাস করেছে।

গুপী তাকিয়ে দেখল ওকে, তারপর আবার খবরের কাগজটায় মন দিল।

শম্ভু ঠাট্টা করে বলল, কি রে কর্মখালি দেখছিস নাকি? এত মন দিয়ে আগে যদি পড়তিস নির্ঘাত অনার্স পেয়ে যেতিস।

গুপী হেসে তাকাল। বললে, এখন মনে হচ্ছে না ছাড়লেই হত।

পারবে না মনে করে শেষের দিকে ছেড়ে দিয়েছিল ও।

শিবেন বললে, বোস্ বোস্, তারপর? বাড়িতে মাংসটাংস এখন হচ্ছে? অর্থাৎ ওর পাস করার আনন্দে।

শম্ভু টেবিলে তবলা বাজিয়ে বললে, যেদিন খবর বেরোল তার পরের দিন হয়েছিল।

একেবারেই মিথ্যে কথা, তবু বানিয়ে বলতে হল। গতকালই শিবেনকে ডাকতে গিয়ে ওদের বাড়িতে একটু বেশি বেশি ফূর্তি দেখে এসেছে। শিবেনের মা ওকে বসিয়ে একটা প্লেটে গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা দিয়েছিলেন।

শিবেনদের অবস্থা একটু ভাল।

কাঁটা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ইলিশ মাছ খাচ্ছিল শম্ভু, শিবেনের বাবা এসে দাঁড়ালেন।

বোসো বোসো, শম্ভুকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন।

তারপর উপদেশ দিলেন, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে কার্ড করিয়ে এসো।

হেসে ফেলে বললেন, হবে না কিছুই, তবু কার্ড করাতে দোষ কি।

সেই কথাটা মনে পড়তেই কথা ঘোরাবার জন্যে শম্ভু বললে, চল্ তা হলে, একদিন কার্ড করিয়ে আসি।

বাড়িতে মাংস হওয়ার কথা বলে ফেলেছে বলেই একেবারে চাকরির লাইনে চলে গেল।

চায়ের দোকানের ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছিল, শিবেন বললে, তিনটে।

গুপী চমকে চোখ তুলে তাকাল।

এ সময় আশুর চায়ের দোকানে তেমন ভিড় থাকে না। উঠে যাওয়ার জন্যে আশু ওদের তাড়াও দেয় না। বরং ব্যস্ত না থাকলে গল্পগুজবও করে। তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চ আগলে থাকতেও খারাপ লাগে। হঠাৎ ভিড় হয়ে গেলে ওরা নিজেরাই উঠে যায়, একটু এদিক ওদিক ঘুরে এসে ফাঁকা পেলে আবার বসে। অন্য সময়ে দুটো চা নেয়, ছোকরাটা অভ্যস্ত, সে সঙ্গে একটা ফাঁকা কাপ দিয়ে যায়। এভাবে অনেকবার চা খাওয়া যায়। শেষে ভাগাভাগি করে দাম দেয়।

শিবেনের বলার ধরনে বোঝা গেল ও নিজেই পয়সা দেবে।

শম্ভু অন্যমনস্কভাবে হিপ পকেটে হাত ছোঁয়াল। আর হঠাৎ মনে হল, টাকা বড় অদ্ভুত জিনিস। টাকা বেঁচে গেলেও আনন্দ, খরচ করেও আনন্দ।

কল্পনা করতে ইচ্ছে হল, ও একটা চাকরি পেয়ে গেছে। বেশ ভাল মাইনে। তারপর একটা ভাল রেস্টুরেন্টে বসে শিবেন আর গুপীকে মোগলাই পরোটা আর ফাউল কারি খাওয়াচ্ছে, মনিব্যাগ থেকে টাকা বের করে নিজেই দাম দিচ্ছে।

হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়তে হাসি পেয়ে গেল। অনুশোচনাও হল।

ইভা দু-চার টাকা কখনও-কখনও চেয়ে বসলে ট্যুইশনির টাকা পেয়ে ও দিয়ে এসেছে। মা দু-একবার যখনই ধার চায়, দিয়ে দেয়। ইচ্ছে করেই অনেক সময় শোধ

চায় না, মাও ভুলে যাবার ভান করে।

একবার ট্যুইশনির টাকা পেয়ে যথারীতি একটা বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছিল। যেমন প্রতিদিন এক টাকা দু টাকা করে বের করে, কিংবা দশ টাকার নোট এনে ভাঙিয়ে নেয়, সে-ভাবেই চলছিল। দিন-তিনেক পরেই হঠাৎ মনে হল টাকা কম রয়েছে। কড়কড়ে একটা দশ টাকার নোট। কি হল টাকাটা ? মনে মনে হিসেব কষল। হ্যাঁ, একটা দশ টাকার নোট।

মুহূর্তে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। নির্ঘাত মা কিংবা ইভা নিয়েছে।

সটান চলে এসে মাকে বললে, দশটা টাকা আমার নিয়েছ ?

মা তো অবাক। —টাকা নিয়েছি ? কোথায় রাখিস তাই তো জানি না।

রেগে গিয়ে বললে, সব জানো। বলো নিয়েছ কিনা ?

এই ইভা ? রেগে গিয়ে ইভাকে ডাকল। বললে, দশটা টাকা নিয়েছিস আমার ?

আমি ? তোমার টাকা ? আকাশ থেকে পড়ল ইভা।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, বলতে পারলে ? আমি তোমার টাকা চুরি করেছি !

হ্যাঁ, তোরাই কেউ নিয়েছিস। তারপর একটু শান্ত হয়ে বললে, চাইলেই তো পারতিস। চাইলে দিই না ?

ইভা ওর হাত ধরে বললে, দাদা বিশ্বাস করো, সত্যি নিইনি। আমি জানিও না কোথায় টাকা রাখ।

তবু রাগ পড়েনি শম্ভুর। ও জামাটা মাথায় গলিয়ে সব টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। একেবারে এই আশুর চায়ের দোকানে।

তারপর চা খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল। আরে কি আশ্চর্য, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম ! পাড়ার হোসিয়ারির দোকানে একটা গেঞ্জি কিনেছিল ধারে। ট্যুইশনির টাকা পেয়েই ধার শোধ করে এসেছিল। বারবার হিসেব করার সময় সে টাকার কথা মনেই পড়েনি।

তখন ভীষণ লজ্জা আর অনুশোচনা।

কিন্তু বাড়ি ফিরে সে কথা কাউকে বলতে পারেনি। না মাকে, না ইভাকে। এমন ভাব করেছে যেন সত্যিই টাকাটা হারিয়েছে। টাকার কথাই তোলেনি আর।

দিন-দুই পরে অনুতাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে দুটো ফিশরোল কিনে নিয়ে ফিরেছিল।

ইভা, আয় চটপট, এখনও গরম আছে।

বেশ খুশি খুশি ভাব করে ইভাকে দিতে গিয়েছিল।

ইভা নেয়নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, যাও, যাও, তোমার টাকায় ওসব খেয়ে আমার কাজ নেই। তুমি তো আমাকে চোর ভাবো।

অনেক সাধাসাধি করে তবে খাওয়াতে পেরেছিল।

বিয়ের পর ইভা যখন চলে গেল তখন এই ঘটনাটা শম্ভুর মনে পড়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হয়েছিল।

অনেক অফুরন্ত টাকা থাকলে মানুষের মধ্যে এই ক্ষুদ্রতাগুলো হয়তো দেখা দেয় না। শম্ভু অন্তত তাই ভাবত। একটাই বাসনা ছিল ওর, একটাই স্বপ্ন। অনেক টাকা হবে ওর, অনেক টাকা। কিভাবে আসবে সে টাকা জানত না, ভাবতেও পারত না। শুধু ইচ্ছে হত জীবনের সব ইচ্ছেগুলো কেনার মত টাকা। মনিব্যাগ খুলে একশো টাকার নোটগুলো যেন ফরফর করে উড়িয়ে দিচ্ছে, তবু মনিব্যাগ যেমনকার তেমনি, কিছুতেই শেষ হচ্ছে

না। যা দেখছে এবং ভাল লাগছে তাই কিনে ফেলছে। ওই সুন্দর বাড়িটা, সামনে চৌকো বাগান, গাড়ি-বারান্দার নীচে দু-দু-খানা ঝকঝকে নতুন গাড়ি। দামি দামি পোশাক, ফ্রিজ, টিভি, গ্যাসের স্টোভ, আর্দালি ঝি-চাকর বাবুর্চি, বড়লোকদের আর কি কি থাকে রে গুপী ? এত টাকা ওরা কি ভাবে খরচ করে, কিসে খরচ করে ? ধর এ-সবই কিনে ফেললাম, তারপরও অনেক টাকা, কি করব তখন ? কিসে খরচ করব ?

বড়লোক তো দূরের কথা, তখনও কোনও হাফ-বড়লোক শম্ভু দেখেনি। বড়লোক বলতে ঠিক কি বোঝায় তাও জানত না। শুধু বড়লোক হতে ইচ্ছে করত। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত কিভাবে যেন বড়লোক হয়ে গেছে।

দু-একবার লটারির টিকিট কেটেছে। টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে একটা রঙিন আশা পুষে রেখেছে। তারপর একদিন টিকিটের নম্বর মিলিয়ে হেসে উঠেছে, এবার পাইনি রে! টিকিটটা ছিড়ে ফেলে দিয়ে মনে হয়েছে টাকাটাই বরবাদ, না কিনলেই ভাল ছিল।

তবু ওর মনে হত, সত্যি সত্যি একদিন বড়লোক হয়ে যাবে। ব্যবসা করে নাকি খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যায়। গুপী আর শিবেনের সঙ্গে আশুর চায়ের দোকানে বসে কত রকমের ব্যবসার জল্পনা করতে করতে কতবার ও দিব্যি বড়লোক হয়ে গেছে। কখনও চাকরিতে ঝটপট উন্নতি করতে করতে এত উঁচুতে উঠে গেছে, হাজার হাজার টাকা নিয়ে লুটোপুটি খেয়েছে। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজেছে, একটা সামান্য মাইনের সামান্য চাকরি। তা হলেই ও আপাতত খুশি। একটা চাকরি একবার পেয়েও ছিল। এখন আর সে কথাগুলো ভাবতেও ইচ্ছে করে না। দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই বাঁচে।

তারপরই সেই ঘটনাটা ঘটে গেল। সেই প্রথম বড়লোক দেখল।

মা ছুটে এসে বলল, শম্ভু, দেখ তো কে যেন তোর নাম বলল, গাড়ি করে এসেছে।

গাড়ি করে ? শম্ভু অবাক হয়ে গেল। ভয়ও পেল। পুলিশের গাড়ি নয় তো ?

না। কিন্তু তা হলে কে হতে পারে ? মা হয়ত ভুল শুনেছে। শম্ভু নয়, অন্য কারও খোঁজ করছে। দুখানা ঘর পরেই একজন মেকানিক থাকে, নানারকম যন্ত্রপাতি সারায়, অনেকে তার খোঁজে আসে মাঝে মাঝে।

বাইরে বেরিয়ে এল শম্ভু।

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল গুপী ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে আসছে।

শম্ভু এগিয়ে যেতেই গুপী বললে, ত্রিদিবেশবাবু। আর ওঁর স্ত্রী।

শুনেই বিব্রত বোধ করেছিল ও। রেগেও গিয়েছিল।

তোর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, এখানে নিয়ে এসেছিস ?

শম্ভু তাকিয়ে দেখল, ত্রিদিবেশবাবু গাড়ি থেকে নামছেন, আর উদ্‌গ্রীবভাবে ওঁর স্ত্রী শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনিও বোধহয় নামতে যাচ্ছিলেন।

শম্ভু গুপীকে বললে, তোরা একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়া, আমি আসছি।

গেঞ্জি পরেই বেরিয়ে গিয়েছিল, ছুটতে ছুটতে এসে জামাটা পরছে, মা এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করল, কে রে ওরা ? কেন এসেছে ?

দেখে মনে হল মা ভয় পেয়েছে ।

শম্ভু এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে, কেউ না, কেউ না. গুপীর ব্যাপার।

বলেই বেরিয়ে গেল।

এসে দেখল গাড়িটা দু-চারখানা ঘর পার হয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলাও নেমে পড়েছেন, তাকিয়ে আছেন ওরই দিকে।

গুপী এগিয়ে এসেছিল। শম্ভু রেগে গিয়ে বললে, তুই একটা স্টুপিড। ওদের কখনও

এখানে নিয়ে আসে ?

গুপী গালাগালিটা গায়ে মাখল না।

বললে, আরে ওঁরা তো কিছুতেই শুনলেন না, আমি বলেছিলাম সঙ্গে করে নিয়ে আসব। কিংবা চিঠি দিন ওকে।

শম্ভু বললে, তুই বলে দিবি বাড়ির কেউ যেন জানতে না পারে !

গুপী হাসল। —তুই আমাকে এত বোকা ভাবছিস কেন ? আমি কি বলতাম নাকি ?

শম্ভুকে কাছে আসতে দেখে ত্রিদিবেশবাবু আর ত্রিদিবেশবাবুর স্ত্রীও দুপা এগিয়ে এলেন।

শম্ভু নমস্কার করতে ভুলে গেল, বিব্রতভাবে শুধু বললে, এখানে নয়, আমি বরং পরে গুপীর সঙ্গে যাব।

না বাবা, তুমি এখনি চল আমাদের সঙ্গে।

নীলিমা বললেন।

শম্ভু দেখল তাঁর মুখেচোখে বিভ্রান্ত ভাব। যেন দুশ্চিন্তায় মুমূর্ষু।

ভদ্রলোক তো সাদাসিধে, ভারিক্কি চেহারা, ধুতির কোঁচাটা আধভাঁজ করে কোমরে গোঁজা। কিন্তু ভদ্রমহিলা সাজগোজে আধুনিক। তবু 'না বাবা, তুমি এখনি চলো আমাদের সঙ্গে' কথাটার ভিতর থেকে আন্তরিকতা ফুটে উঠল। যেন ভিতরের মানুষটা সত্যিকারের মা।

ত্রিদিবেশবাবু গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বললেন, আসুন আসুন।

শম্ভু উপায়ান্তর না দেখে উঠে পড়ল। ভদ্রমহিলাও উঠলেন, তারপর ত্রিদিবেশবাবু। গুপী আগের মতই ড্রাইভারের সামনে গিয়ে বসল।

চলুন তা হলে আমার ওখানে গিয়েই কথাবার্তা হবে।

শম্ভু অকারণেই বললে, আমার একটু কাজ ছিল।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যাব। কতক্ষণ আর !

সেই প্রথম বড়লোক সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল শম্ভুর।

ও আর পৃথিবীর কতটুকু কি দেখেছে ! রাস্তা দিয়ে একখানা বিশাল গাড়ি হুস্ করে চলে গেলে, কিংবা ড্রাইভারের সিটে ইউনিফর্ম পরা শোফার, পিছনের গদিতে গা এলিয়ে বসা কোনও মোটাসোটা ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাকে দেখলে ভেবেছে হিন্দি সিনেমার ক্রোড়পতি, একটা বিরাট বাড়ি, সামনে গাড়িবারান্দা বা লন দেখলে ভেবেছে দারুণ বড়লোক। জানালার পর্দার ভেতরে কি আছে কোনদিন দেখতে পায়নি। যেটুকু ধারণা সে তো সিনেমায় দেখে। শুনেছে সে-সবই বানানো, সত্যি নয়।

ওর মনের মধ্যে তখন প্রচণ্ড আগ্রহ ত্রিদিবেশবাবুর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে, এত দুশ্চিন্তার মধ্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে, কথা বলার জন্যে, কিন্তু উনি নিজেই এ-ভাবে হঠাৎ চলে আসায় বিব্রত হয়ে পড়েছিল। বিব্রত এবং বিচলিত।

এখন ওঁর সঙ্গে যেতে যেতে কেমন একটা নাভার্স লাগছিল। ভয়-ভয়। যেন না যেতে হলেই বেঁচে যেত। অথচ উপায়ও নেই। এখন ত্রিদিবেশবাবুই ওর মুশকিল-আসান।

গুপী সামনের সিট থেকে ফিরে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমার ওপর কেন রেগে যাচ্ছিস, আমি তো বলেছিলাম ওঁদের, একদিন নিয়ে আসব। মাসিমাকে জিগ্যেস কর, উনি জোর করেই নিয়ে এলেন...

মাসিমা ! এর মধ্যে বাড়ির লোক হয়ে গেছিস ! মনে মনে হাসল শম্ভু। একটা ক্ষীণ সন্দেহ দেখা দিল। ও মাঝ থেকে কিছু দালালি মারছে কিনা কে জানে ! নাঃ, তা হয়তো

নয়। রেগে গেছে বলেই ও মিথ্যে সন্দেহ করছে।

—আমার দুর্ভাবনা তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। ওর কাছে তোমার কথা শুনে আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম। ভদ্রমহিলা বললেন।

একটু থেমে বললেন, হয়তো এভাবে চলে আসা অন্যায় হয়েছে, তুমি কিছু মনে করো না বাবা।

শম্ভু বলে উঠল, না না মাসিমা, কিছু মনে করিনি।

ও নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল যে ওর মুখ থেকেও 'মাসিমা' কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

শম্ভু বেশ জড়সড় হয়ে বসে ছিল, মাসিমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাল লাগা। নরম গদির এইরকম একখানা বড় গাড়িতে এর আগে ও কখনও বসেনি, তাও পিছনের আসনে। প্রথমেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মাসিমা ওর পাশে বসলেন দেখে। মনে মনে বেশ বুঝতে পারছে এঁরা খুবই বড়লোক। একেবারে অন্য জগতের মানুষ। যে জগতে ও কোনদিন উঁকি দিতে পারেনি। আজ কিনা তাদের সঙ্গেই পাশাপাশি বসে কথা বলছে। 'তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।' কি অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছেন। শম্ভু মুগ্ধ হয়ে গেল।

মোহিত হয়ে গেল ওঁদের ফ্ল্যাটে এসে।

বিশাল গাড়িখানা পিচের রাস্তা ধরে যেন নিঃশব্দে সাঁতার কেটে চলে এল একেবারে মধ্য কলকাতার এই অভিজাত এলাকায়। আগে এটাকে, শুনেছে, সাহেবপাড়া বলত। ইংরেজ আমলে বাগানওয়ালা বড় বড় বাড়িগুলোয় সাহেব ব্যবসাদার কিংবা উঁচুতলার সাহেব চাকুরেরা থাকত। সেগুলো ভেঙেই এখন নতুন নতুন ফ্ল্যাট-বাড়ি উঠেছে।

একটা খুব সুন্দর দেখতে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ড্রাইভার নেমে এসে ত্রিদিবেশবাবুর পাশের দরজাটা খুলে দাঁড়াল। ত্রিদিবেশবাবু নামলেন, মাসিমা। ইতিমধ্যে ত্রিদিবেশবাবু এদিকে ঘুরে এসে শম্ভুর দিকের দরজাটা খুলে বললেন, নামুন। এসে গেছি।

সমস্ত শরীর-মনে একটা শিহরন খেলে গেল শম্ভুর। ওঁদের ভদ্রতায় বিনয়ে ও মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল ওর জীবনটাই রাতারাতি বদলে গেছে। এ-রকম খতির, এমন আন্তরিকতা যে ওঁদের মত মানুষের কাছ থেকে কোনদিন পেতে পারে, কল্পনাও করেনি।

ওর কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। এই ধরনের অন্তরঙ্গ ব্যবহারের পর ও কি করে আসল কথাগুলো বলবে। ওই সব কথা বললে ওঁদের কাছে ও কি ছোট হয়ে যাবে না! কি ভাববেন ওঁরা ?

শম্ভুর বুকের ভিতরটা দুরদুর করতে শুরু করেছে।

গুপী কি সব কথা বলেছে ওঁদের ? নিশ্চয়ই বলেছে। তবু ওকেও তো আবার বলতে হবে। আর সে-সব কথা বলতে হবে ভেবে ওর রীতিমত আত্মসম্মানে লাগছিল।

ত্রিদিবেশবাবুর পিছনে পিছনে এসে লিফটের সামনে দাঁড়াল। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে ওর লজ্জা করছিল। যে দুচারজন লোক আসা-যাওয়া করছিল, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা অন্য এক জগতের মানুষ। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঁটাচলার ভঙ্গি বলে দিচ্ছিল তারা অন্য জগতের মানুষ।

লিফটম্যান দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করল। দরজা বন্ধ হল।

সোঁ করে ওপরে উঠে এল ওরা।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল কাঁধে তোয়ালে একজন বেয়ারা গোছের লোক। আর ছবির মত সাজানো বড় ঘরখানা দেখে, মেঝের ওপর পাতা মোলায়েম রঙের পুরু কার্পেটে জুতোসুদ্ধ পা রেখেই সঙ্কোচে থেমে পড়ল। এর ওপর দিয়ে নিশ্চয় হেঁটে যাওয়া যায়

না। জুতোটা কোথায় খুলবে, খুলে রাখবে, ঠিক করতে পারছিল না। ও জুতো খোলার জন্যে ঝুঁকেছিল।

মাসিমা বলে বসলেন, কি হল ? চলে এসো, জুতো পরেই চলে এসো।

এত সুন্দর এত নরম দামি কার্পেটের ওপর দিয়ে নোংরা জুতো পরে হেঁটে এগিয়ে যেতে যেতে শম্ভু যেন মরমে মরে গেল। এর আগে নিজেকে কোনদিন এত ছোট মনে হয়নি, এত ক্ষুদ্র।

ত্রিদিবেশবাবু শোফা দেখিয়ে বললেন, বসুন।

মাসিমা বললেন, বোসো। ভিতরে চলে গেলেন।

শম্ভু অনভ্যস্তভাবে ধপাস করে বসে পড়ল। রবারের গদিটার তলায় কি স্প্রিং নাকি। দুলে উঠল গদিটা। শম্ভু আরও অস্বস্তি বোধ করল।

ত্রিদিবেশবাবুও বসলেন, আর তখনই ওপাশের দরজায় চোখ গেল শম্ভুর।

অপলক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, আমার ছোট মেয়ে, শর্মিলা।

ভারী পর্দা সরিয়ে শর্মিলা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই শম্ভুকে দেখে এগিয়ে এল, মৃদু হেসে নমস্কার করল।

শম্ভুর হাত দুটো একটু উঠল শুধু, ও নমস্কার করতে ভুলে গেল।

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হল, একটা পরী দাঁড়িয়ে আছে।

সতেরো-আঠারো বছরের একটি দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মেয়ে। বেশবাসে একেবারে আধুনিকা। ত্রিদিবেশবাবু বললেন, বিপিনকে চা দিতে বল্।

—আনছে। শর্মিলা গিয়ে অদূরে ডিভানটায় বসল। পায়ের ওপর পা তুলে।

শম্ভুর আরেকবার তাকিয়ে দেখার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারল না।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, এই আমার ছোট মেয়ে। এরই দিদি। ঊর্মিলা।

শম্ভুর বুকের ভিতরটা তখন যেন গলে গলে পড়ছে। সমবেদনায় দুঃখে বুকের ভিতর থেকে যেন বলে উঠতে ইচ্ছে করল, আহা।

গুপী বলে উঠল, তোর বিপদের কথাটাও ওঁদের বলেছি।

শম্ভু ফিরে তাকাল গুপীর দিকে, ইশারায় কথাটা চাপা দিতে চাইল। এমন অপরূপ একটি মেয়ের সামনে ওসব কথা তুলতে ওর লজ্জা করছিল।

শম্ভু বলতে গেল, আমি যদি আপনাদের কোনও কাজে ল গে...

এইসময় বিপিন চলে এল, হাতে একটা বড় ট্রে নিয়ে। খাবার, সন্দেশ...

শম্ভু না না করে উঠল।

ইতিমধ্যে মাসিমাও এসে গেছেন। —না না, ওটুকু খেতে হবেই।

তারপর বসলেন। —এখন বাবা তুমিই আমাদের শেষ ভরসা।

ত্রিদিবেশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই ভগবানের হাত !

গুপী ইতিমধ্যে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

শম্ভু বললে, আমি শুধু চা।

শর্মিলা হেসে বললে, আসছে আসছে। কিন্তু আপনাকে সব খেতে হবে।

শর্মিলার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে শম্ভু খাবারের প্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

॥ ৩ ॥

ইভার বিয়েটা যে এত সহজে হয়ে যাবে কেউ ভাবতেই পারেনি।

শিবপ্রসাদ তো ওর বিয়ের কথা ভাবতেনই না। কি করে বিয়ে দেবেন! রিটায়ারমেন্ট নাগালের মধ্যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটিতে যে-কটা টাকা পাবেন, তা যদি মেয়ের বিয়েতেই খরচ করে দেন, তা হলে বাকি জীবনটা খাবেন কি? চালাবেন কিসে?

একটাই ভরসা, বি.এ. পাশ করা ছেলেটা। শম্ভু। যদি একটা চাকরি পেয়ে যায়। কিন্তু, তার তো শুধু ঘোরাফেরাই সার। মাঝে মাঝে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে টুঁ মেরে আসে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যায়। একটু ভাল চাকরি করে এমন চেনাজানা যে যেখানে ছিল তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, কোথাও কোথাও নিজেই নিয়ে গেছেন। কেউ ইউনিয়নের দোহাই পেড়েছে, কেউ আঁতকে উঠেছে, চাকরি? যেন এ-রকম একটা অসম্ভব অবাস্তব অনুরোধ জানিয়ে শিবপ্রসাদ সে-ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক করে দিতে চাইছেন। আর এক ধরনের ধড়িবাজ লোক অতি সজ্জনের মত ব্যবহার দেখিয়ে বলেছে, ঠিক আছে, দেখছি খোঁজখবর করে, কোথাও সুযোগ পেলেই ঢুকিয়ে দেব। যেন হপ্তা কয়েক, কিংবা দু'চার মাসের কথা। শেষে সব আশা ভরসা ছেড়ে দিলেন। আশা ভরসা ছেড়ে দিলে একটাই আশা থাকে, ভাগ্য। তখন মনে হয়, ভাগ্যে থাকলে একদিন আপনা থেকেই চাকরি হয়ে যাবে, কেউ যেচে এসে দিয়ে যাবে।

শম্ভু অবশ্য ট্যুইশনি ছাড়েনি। কিন্তু সে-টাকায় আর কি হয়। একেবারে নীচের ক্লাশের ছাত্র, গরিব, তাছাড়া শম্ভু তো স্কুল-টিচার নয়। তারা তবু বেশি পায়।

শম্ভু আর গুপী আশুর চায়ের দোকানে বসে বসে নানা রকম ব্যবসা ভাঁজত। ফাঁকতালে কিছু টাকা রোজগার হয়ে যেত পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে। মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক।

ব্যানার্জির দোকানে রেজাল্টের ছাপা বই আসত বিক্রির জন্যে, তাও সংখ্যায় খুবই কম।

অনেকদিনের চেনা, গুপী আর শম্ভু গিয়ে ধরেছিল, ব্যানার্জিদা, বেকার ভাই দুটোর জন্যে একটা কিছু করুন।

ব্যানার্জিদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ব্রাদার, বেকার না হলে তোমার এই ব্যানার্জিদা কি বইয়ের দোকান খুলত?

বলেছিলেন, বেকার থাকা আর বইয়ের দোকান করা একই জিনিস।

কথাটা মিথ্যে নয়, শম্ভু গুপীও জানত।

যা-কিছু বিক্রিবাটা সে তো বছরের শুরুতে, স্কুলের বই, কিছু নোট বই, তাও স্কুল আবার তার পেটোয়া দোকানের নাম বলে দেয়: তারপর সারা বছর চুপচাপ বসে থাকা। বিয়ের উপহারের জন্যে দু-দশখানা বই এনে রাখে, তার কিছু ধুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যায়। এ-পাড়ায় তিনটে দোকান ছিল, দুটো উঠে গেছে। আজকাল তো বইয়ের দোকান চোখেই পড়ে না।

শম্ভু বললে, তা হলেও উপায় হয়, ব্যানার্জিদা আপনি যদি সাহায্য করেন।

—কি উপায়? আমি তো ভাই নিজেই কর্মচারী।

শম্ভু হাসল। বললে, মাধ্যমিকের, উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বই একখানা যদি আসার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন, রাস্তায় বসে কিছু রোজগার করে নিতে পারি।

সারা শহর জুড়ে এ-কাজ তো অনেকেই করত। রেজাল্টের বই কেউই কিনতে পেত না, আসতে না আসতে ফুরিয়ে যেত।

রেডিওয় কিংবা কাগজে খবর বের করে দিয়েই কর্তারা খালাস। তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিড় ভেঙে পড়ত পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকদের।

কোনও কোনও দোকানে তো লম্বা লাইন লেগে যেত। একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে শেষ অবধি অভিভাবকরা শুনত ফুরিয়ে গেছে।

তখন এই ছোকরারাই ভরসা।

নিজেদের অভিজ্ঞতা তো ছিলই, লাইনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়েও শম্ভুদের মায়া হত। এ একটা ইনহিউম্যান টর্চার, তাই না ? বলুন ব্যানার্জিদা ? বুক ধুকধুক করছে, এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে বেচারি, কি শুনবে সেই ভরসায়...

ব্যানার্জিদা হেসে ফেললেন। বললেন, ঠিক আছে দেব একখানা, তোমাদের অত জনকল্যাণের কথা ভাবতে হবে না, দু পয়সা কামিয়ে নিয়ো।

ব্যস্।

একবছর খুব লাভ হয়েছিল। ফার্স্ট ডিভিশন হলে দশ টাকা, সেকেন্ড ডিভিশন পাঁচ টাকা, পি পেলে এক টাকা। আর সমবেদনা জানাবার জন্যে ফেলের খবর, কম্পার্টমেন্টাল ফ্রি। পয়সা লাগবে না।

বেশ কিছু টাকা হয়েছিল সে-বার। পরের বার ব্যানার্জিদা আরও দুজনকে দিয়ে দিল। তখন আর তেমন হত না।

প্রথমবার টাকা পেয়েই দুজনে দারুণ খুশি। দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

তারপর একমুখ উল্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। হাতে একটা খুচরো টাকাপয়সার থলি। ভিতরের বুক পকেটে, পিছনের হিপ পকেটে একতাড়া নোট।

এসেই ইভাকে বলল, কি নিবি বল্, কি শাড়ি।

ফরফর করে কয়েকটা দশ বিশ টাকার নোট এগিয়ে দিল। —নে, যা খুশি তুই কিনে নিবি।

মাকে বললে, তোমার কি চাই বলো। একটা গরদের শাড়িও কিনে ফেলতে পার, আমি এখন বড়লোক !

সবাই অবাক। ইভা তো চোখের সামনে টাকাগুলো দেখেও বিশ্বাসই করে না।

বললে, কি রে ডাকাতি-ফাকাতি করে এলি নাকি ? না, ছিনতাই !

মা আতঙ্কের মুখ করে বললে, কোথায় পেলি বল।

শম্ভু তখন শুধুই হাসছে, শুধুই হাসছে।

টাকাগুলো ভাল করে আলমারিতে তুলে রাখতে বলে ও চলে গেল মাংস কিনতে।

শালা শিবেন। মাংস নিয়ে বড় খোঁচা দিয়েছিল। পাস করলে ওদের বাড়িতে মাংস হয়, ইলিশ মাছ হয়। এখন এসে দেখে যাক্।

কিন্তু শিবেনটা সত্যি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। একটা চাকরি তো পেয়ে গেল। ওর মেসোমশাই করে দিয়েছেন। রাঁচিতে।

শম্ভুর মনে পড়ে, শিবেন যেদিন খবরটা দিতে এল।

আশুর দোকানে ও আর গুপী বসে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল।

গুপী বলছিল, আমরা তিনজনই মাইরি আনলাকি।

ওরা দুজনে ছোটখাটো একটা ব্যবসার প্ল্যান ভাঁজছিল।

শম্ভু বললে, আমরা তিনজনে চেষ্টা করলে নির্ঘাত দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারব।

গুপী বললে, ক'পয়সা আর লাভ হবে ? আবার তিনজন কেন ?

শম্ভুর মনঃপূত হল না কথাটা। —ও বেচারিকে বাদ দিবি ? যাঃ, তাই কখনও হয়।

একসঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, এতকালের বন্ধু।

ঠিক তখনই শিবেন এল।

ওকে দেখেই শম্ভু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।—আয়, একটা দারুণ ব্যবসার প্ল্যান ভেঁজেছি। আমরা তিনজনে...

শিবেন দুম্ করে বলে বসল, আমি চাকরি পেয়ে গেছি।

—চাকরি? পেয়ে গেছিস্। শম্ভু অবিশ্বাসের সুরে বললে।

—হ্যাঁ। রাঁচিতে।

কথাটা শুনতে শম্ভুর ভীষণ খারাপ লাগল। কেমন যেন হতাশ আর বিষণ্ণ। ওরা তিনজনই বেকার ছিল বলে বুকে কেমন যেন জোর ছিল।

শম্ভু মনের মধ্যে অস্ফুটে বললে, ট্রেটর। তুই আমাদের বিট্রে করলি।

মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে বললে, কি করে পেলি রে? তুই তো ইন্টারভিউ দিতেও যাসনি!

শিবেন ওদের মনের কথা কিছু বুঝতেই পারল না। যেন ওর সুখবরটা গুপী শম্ভুরও সুখবর, এমন ভাবেই হাসতে হাসতে বললে, মেসোমশাই।

শম্ভুর আভাসে মনে পড়ল, শিবেনের মেসোমশাই রাঁচিতে কোথায় যেন বড় চাকরি করেন। বড় অফিসার। আগে ভেবেছিল বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

সেদিন ওদের আড্ডা জমেনি। বুকের ভিতর শুধু জ্বালা। একেই বোধহয় হিংসে বলে।

শিবেন চলে যাবার পর গুপী বললে, কি লাকি মাইরি।

—হুঁ। শম্ভু চুপ করে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, মামা মেসো না থাকলে কিছুই হবার নয়।

শিবেনের ওপর ওর তখন প্রচণ্ড রাগ। ওদের ব্যবসার প্ল্যান সেদিনই ভেসে গিয়েছিল।

এখন আর রাগ নেই, কিন্তু খোঁচাটা মনে পড়ল। ইচ্ছে করেই মাংস খাওয়ার খোঁচাটা দিয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানে না।

জীবনে প্রথম অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে দেখতে পেয়ে তাই মাংস কিনতে বেরিয়ে গেল।

মনটা খুবই খুশি খুশি। শুধু টাকার জন্যেই নয়, মানুষকে সুখবর দিয়ে টাকা রোজগার। এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে। ছেলেমেয়েগুলোর মুখ ভাসা-ভাসা মনে পড়ে যাচ্ছিল। যারা ভাল রেজাল্ট করেছে তাদের উজ্জ্বল মুখ। দশটা কি পাঁচটা টাকা তাদের কাছে যেন কিছুই নয়। যারা ফেল করেছে তাদের মুখগুলো অবশ্য ওকে বিমর্ষ করে দিচ্ছিল। একটা মেয়ে তো হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। খুব খারাপ লেগেছিল শম্ভুর।

মনে মনে বললে, তোরা তো কিছুই করবি না, চাকরিবাকরি দিতে পারবি না। তবে ফেল করিয়ে কি লাভ, দে না পাস করিয়ে। তারপর তো সে নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে!

ভেবেছিল, বাবাকেও কিছু কিনে দেওয়া যায় কিনা।

শিবপ্রসাদবাবু সন্ধের সময় এসে শুনলেন।

শম্ভু ভেবেছিল বাবা রেগে যাবে। এইভাবে টাকা রোজগার করাকে বলবে, উঞ্ছবৃত্তি।

শিবপ্রসাদবাবু কিছুই বললেন না। খুশি হয়েছেন কিনা তাও বোঝা গেল না।

শুধু বললেন, টাকাগুলো উড়িয়ে ফেলিস না, কিছু একটা বিজনেস করতে পারিস কিনা

দেখ।

শম্ভু হেসে ফেলেছিল। এই কটা টাকায় ব্যবসা। আশুর চায়ের দোকানে বসে বসে যে-সব ব্যবসা ফাঁদত, সেইরকম কিছু একটা বড়জোর হতে পারে। তাকে ঠিক বিজনেস বলা যায় না।

কিন্তু শেষ অবধি সে-রকমই একটা ব্যবস্থা ফেঁদে বসল দুজনে।

লটারির টিকিটের ব্যবসা। আশুর চায়ের দোকানের দেয়ালে।

কোথায় টিকিট পাওয়া যায়, কি ভাবে আনাতে হয় কিছুই জানত না। তাই দুজনে একদিন গিয়ে হাজির হল এক নামকরা এজেন্টের কাছে, খবরের কাগজে তাদের বিজ্ঞাপন দেখে।

বড় অফিস, অনেক কর্মচারী, সকলেই ব্যস্ত। লোকের ভিড়ও তেমনি। আসছে, টিকিট কাটছে, চলে যাচ্ছে। তা হলে নিশ্চয় ওদের কাছ থেকেও বিক্রি হবে।

—টিকিটের জন্যে ভিড় দেখেছিস? শম্ভু হাসল।

গুপী বললে, দুদিনে বড়লোক হয়ে যাব রে।

অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষে ম্যানেজারের দেখা পেল।

—স্যার, বেকার ছেলে আমরা।

নগদ-টাকা দিয়ে নিয়ে গেলে আপত্তি নেই, কম কম নিয়ে যান। যেমন বিক্রি বাড়বে তেমনি বেশি টিকিট নেবেন। যত বিক্রি তত কমিশন।

আশুর চায়ের দোকানের বাইরের দেয়ালে তিন থাক টিকিট ঝুলিয়ে দিল দড়ি টাঙিয়ে, ক্লিপ এঁটে।

গুপী বললে, এক কাজ কর শম্ভু, একটা বড় পোস্টার লিখে টাঙিয়ে দে। সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছে যে-নম্বর, সেই নম্বরটা লিখে তার নীচে 'এ-টিকিট আমাদের এখান থেকে বিক্রি হয়েছিল।' ব্যস, দেখবি সবাই ভাববে এখান থেকে কিনলেই প্রাইজ পাবে।

শম্ভু হেসে উঠল, কিন্তু বুদ্ধিটার তারিফ করল।

সত্যি সত্যি সে-ভাবেই একটা পোস্টার টাঙিয়ে দিয়েছিল।

কাছেই একটা পাঁচিল ঘেরা ফ্যান কারখানা। বিকেলের ছুটির সময় কারখানার লোকরা অনেকে এসে আশুর চায়ের দোকানে চা খেয়ে যেত। আশুর চায়ের দোকান চলত ওদের কৃপাতেই।

যাবার সময় ওরা মাঝে মাঝে টিকিট কিনত।

এভাবেই চলছিল।

আশু মাঝে মাঝে জিগ্যেস করত, কি শম্ভুবাবু, চলছে কেমন?

শম্ভু হেসে জবাব দিত, ভালই।

আশু বলত, তা হলে আমাকেও দিন একখানা, দেখি যদি লাখপতি হওয়া যায়।

শম্ভু একখানা টিকিট এগিয়ে দিয়ে বলত, ও আর দাম দিতে হবে না। চা খেয়ে গায়ে গায়ে শোধ করে নেব।

একটাই কাজ হপ্তায় হপ্তায় সেই এজেন্টের অফিসে গিয়ে টিকিট নিয়ে আসা, পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া। তার ফলে ম্যানেজারের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল। কোন টিকিট কতগুলো নিলে লোকসান হবে না ম্যানেজার উপদেশ দিতেন।

ওদের অফিসে গেলেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করত ওরা। লম্বা কাউন্টার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। সারি সারি লোক বসে আছে কাউন্টারে, কয়েকটি কমবয়সী মেয়েও। দ্রুত হাত চলছে। খদ্দেরের ভিড়। খদ্দের অধিকাংশই ওর মতই কিংবা ওর চেয়েও দুঃস্থ।

তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবাক লাগত শম্ভুর। একটু দুঃখও হত তাদের

জন্যে। কেউ কেউ তো একসঙ্গে চার পাঁচখানা টিকিট কিনত।

—এও এক ধরনের জুয়া মাইরি। শম্ভু দুঃখ করে বলেছিল গুপীকে।

বলেছিল, বাচ্চার দুধের টাকা খরচ করে টিকিট কিনছে, স্বপ্ন দেখছে লাখপতি হবে। বলে হেসে উঠেছিল শম্ভু।

গুপী বলেছিল, শালা খদ্দেরের দুঃখ ভাবলে ব্যবসা হয় না রে! ওসব ফালতু ভাবনা ছেড়ে দে।

ম্যানেজারের অফিসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল গুপীর সঙ্গে, আর কাউন্টারের ভিড় দেখছিল। সেদিন ভিড় একটু বেশি, বোধহয় একটা কাউন্টারে লোক ছিল না বলে।

হঠাৎ ম্যানেজার ডাকলেন, এই যে শম্ভুবাবু, এদিকে আসেন একবার।

যেতেই হেসে হেসে বললেন, ওই কাউন্টারে একবার বসে যান না, লোক আসেনি আজ। ঘণ্টা দুয়েক বসে যান।

তারপর হাসতে হাসতে আবার বললেন, কাজ তো নেই, বসেন, বসেন ওখেনে। কিছু রোজগার করে নেন।

অর্থাৎ ঘণ্টা দুয়েক বসে টিকিট বেচলে কিছু পাওয়া যাবে।

শম্ভু খুশি হয়ে বসেই গিয়েছিল। টিকিটের বান্ডিল প্যাকট্যাক করে গুপীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। —তুই যা, কাজ সেরে আমিও চলে যাব।

ম্যানেজার ভদ্রলোক শম্ভুকে বেশ পছন্দ করছিলেন।

যখনই যেত, বসিয়ে চা খাওয়াতেন।

তারপর হঠাৎ একদিন দুম করে বলে বসলেন, আরে শম্ভুবাবু, আপনারে একটা কথা কইবার আছে। চাকরি করবেন?

শম্ভু কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

বললে, কি চাকরি?

ম্যানেজার হাসলেন। —ওই কাউন্টারে বসার।

সেদিন গুপী সঙ্গে আসেনি, ও একাই এসেছিল।

কথাটা শুনে শম্ভু দারুণ খুশি। শুধু একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। গুপী কি ভাববে।

ম্যানেজার বললে, এই চাকরিতে সিকিউরিটি লাগে, আপনার লাগবে না। স্যারকে কয়ে রেখেছি, আমি আপনারে পসন্দো করি কিনা তাই।

শম্ভু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিল। এভাবে একটা চাকরি পেয়ে যাবে ও ভাবতেই পারেনি।

ফেরার পথে শুধু বারবার একটা কথা মনে পড়ছিল। একজনকে।

শিবেন।

শিবেন যেদিন আশুর চায়ের দোকানে এসে তার চাকরি হওয়ার কথা বলেছিল, শম্ভু ভিতরে ভিতরে রেগে গিয়েছিল, হতাশায় দুঃখে চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছিল। তিনজন বেকার একসঙ্গে, তিন বন্ধুই বেকার থাকলে মনের মধ্যে একটা জোর থাকে। মনে মনে বলেছিল, শিবেন তুই একটা ট্রেটর। তুই আমাদের বিট্রে করলি। তখন মনে হয়েছিল স্বার্থপরের মত নিজে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়া ঘোর অন্যায়। যেন শিবেন ইচ্ছে করলেই ওর মেসোমশাইকে বলে ওদের জন্যেও চাকরির ব্যবস্থা করতে পারত।

এখন ও কি করে গুপীকে বলবে কথাটা।

একবার মনে হয়েছিল, গুপীর কথাটাও ম্যানেজারকে বলে। কিন্তু ভয় হয়েছিল। ম্যানেজার তো বলে বসতেন, আপনার কথাই কয়ে রেখেছি। গুপীবাবুর কথাটাও স্যারকে কয়ে দেখি।

স্যার অর্থাৎ খোদ মালিক।

শম্ভুর ভয় হয়েছিল দুজনের কথা বলতে গেলে শেষে ওর চাকরিটাও না ভেস্তে যায়।

দুরুদুরু বুকে আশুর চায়ের দোকানে এসে হাজির হল শম্ভু। বুকের মধ্যে তখন অফুরন্ত আনন্দ। শুধু একটা সঙ্কোচ, গুপীকে কিভাবে বলবে।

দু'কাপ চা নিয়ে বসল দুজনে। —কথা আছে গুপী।

—বল্।

শম্ভু বললে, দ্যাখ গুপী, এই টিকিট বেচা কমিশনে দুজনের ঠিক চলে না। বল্ তুই ঠিক কিনা।

গুপী বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শম্ভু বললে, বলছিলাম কি, এটা তুই একাই দেখাশোনা কর।

—আর তুই? তোর চলবে কি করে?

শম্ভু ইতস্তত করল। তারপর বললে, আমি একটা চাকরি পেয়ে যাচ্ছি, ওদের অফিসেই।

—অ্যাঁ, চাকরি? সত্যি বলছিস? মানে মাস গেলে মাইনে পাবি?

এক মুহূর্ত থমকে থেকে বললে, এ তো দারুণ খবর রে! আরেব্বাস, আমি তো ভাবতেই পারছি না।

গুপীর সমস্ত মুখ হেসে উঠল।

বাড়ি ফেরার পথে শম্ভু মনে মনে বললে, গুপী শালা গ্রেট, রিয়েলি গ্রেট। ও ব্যাটার একটুও হিংসে নেই।

এখন মনে হয় চাকরিটা না হলেই ভাল ছিল। চাকরিটাই ওর শনি, শনি। সমস্ত জীবনটা বরবাদ করে দিয়ে গেল।

তবু মাঝে মাঝে ভাল লাগে। এত হতাশার মধ্যেও কোথায় যেন একটা সার্থকতার সুর বুকের মধ্যে রিনরিন করে বাজে। কিংবা পিয়ানোর টুং টাং টুং টাং। ত্রিদিবেশবাবুদের বাড়ির কলিং বেল্-এর সুইচ টিপলে যেমন আওয়াজ হয়। মিষ্টি একটা আওয়াজ।

মানুষ কত বদলে যায়। কেন যে যায়, বোঝা যায় না।

তবু না গিয়ে পারে না ও।

উর্মিলার মুখের হাসিটা যেন শম্ভু এখনও দেখতে পাচ্ছে।

পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ও। অবাক চোখে ওকে দেখেই বলে উঠেছে, আরে, আপনি কখন এলেন?

সঙ্গে সঙ্গে সব তাচ্ছিল্য, সমস্ত গ্লানি মুহূর্তে মুছে গেল। উর্মিলার মুখের ওই হাসিটুকুই যেন পরম তৃপ্তি।

ত্রিদিবেশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরল শম্ভু। দোকানের শো-কেস দেখল। তারপর ভাবল, যাই আশুর চায়ের দোকানে, গুপীকে হয়তো পাওয়া যাবে।

ওর মনে পড়ল একদিন ত্রিদিবেশবাবু, তাঁর সেই বড় গাড়িখানা নিয়ে সটান ওদের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। সঙ্গে মাসিমাও। দুজনেরই মুখে কি দুশ্চিন্তা। যেন ভেঙে পড়া দুটি মানুষ। মাসিমার পাশে বসিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কত আদর-আপ্যায়ন। কত আন্তরিকতা। গুপী সামনে বসেছিল, ড্রাইভারের পাশে।

ফিরে এসে বলেছিল, তোর কি খাতির শম্ভু। অত বড়লোক, তবু একটুও অহঙ্কার নেই।

শম্ভুরও তাই মনে হয়েছিল। ফেরার সময় লিফটে ত্রিদিবেশবাবুও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলেন।

নীচে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রিদিবেশবাবু ড্রাইভারকে ডাকলেন। বললেন, যাও, বাবুকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শম্ভু লজ্জায় পড়ে গেল। বললে, না না, কিচ্ছু দরকার নেই। আমরা এমনি চলে যাব, বাস তো আছে।

ত্রিদিবেশবাবু কিছুতেই শুনলেন না। —কি যে বলেন, আপনি তো এখন আমাদের ঘরের লোক।

গাড়ির পিছনের দরজাটা ত্রিদিবেশবাবু নিজেই খুলে ধরে রইলেন।

—উঠুন, উঠুন।

ওরা দুজনেই সেই বিশাল গাড়ির পিছনে বসেছিল। সামনে ঝুঁকে। যেন ও গাড়ির নরম গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসার ওদের কোনও অধিকার নেই।

ত্রিদিবেশবাবু চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর গুপী ওকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারল।

ও তাকাতেই গুপী গদির ওপর দুলে নিয়ে পিছনে গা এলিয়ে দিল।

অর্থাৎ তুইও এইভাবেই বোস্।

শম্ভু বসতে পারল না। ওর মনের মধ্যে তখনও দারুণ উদ্বেগ। একটা আতঙ্ক যেন ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে।

পর পর কয়েকটা দিন ও রাত্রে ঘুমোতে পারেনি। এখন একটুকরো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকাটা পাবে কি না জানে না। ও ত্রিদিবেশবাবুর কাজে লাগতে পারবে কি না তাও জানে না। এখন শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই।

এখন ত্রিদিবেশবাবুই একমাত্র ভরসা। হয়তো এবার আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

বড় রাস্তা থেকে ওদের গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই ও চিৎকার করে উঠল, রোখো রোখো।

ড্রাইভার কিছুতেই রাজি নয়। —সাহেব আমার ওপর রেগে যাবেন। চলুন স্যার, আপনাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিই।

না, তা হয় না। বাড়ি অবধি গাড়ি নিয়ে গেলে আবার মার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

জবাবদিহি করারই কথা। কারণ কি একটা নাকি। গরিব আর সাধারণ আর নিম্ন আয়ের মধ্যবিত্ত হওয়ার জ্বালা অনেক। বিশেষ করে শম্ভুরা যে ধরনের বাড়িতে থাকে, এ সব গলিতে গাড়ি এসে থামলেই হৈচৈ পড়ে যায়। এখানকার বাসিন্দারা বউ-ঝিদের ব্যথা উঠলে তাকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কালেভদ্রে অটোরিকশা কিংবা ট্যাকসিতে। গাড়ি ঢোকে না।

একবার পর পর কয়েকদিন সন্ধের সময় একটা ট্যাক্সি এসে গলির মোড়ের বাড়িটার সামনে দাঁড়াত, দু-একদিন অনেক রাতেও ট্যাক্সি দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গিয়েছিল। তা নিয়ে পাড়াপড়শি মেয়েদের মধ্যে কত ফিসফাস, কত আলোচনা। অপরের নামে কুৎসা রটিয়ে হাসাহাসি করতেও ভুলে গিয়েছিল সবাই।

একদিন শুনেছে মা বাবাকে চাপা গলায় বলছে, শেষে পাড়াটারই না দুর্নাম হয়ে যায়।

আমার ভয় বেশি, আমার ঘরে আইবুড়ো মেয়ে আছে।

সত্যি। কি ভয় নিয়ে মানুষকে বাস করতে হয়। কি, না এই গরিব পাড়ায় ট্যাক্সি এসে থামে কেন।

শম্ভুর অবশ্য এ-সব কথা কোনদিন মনেও হয়নি। ত্রিদিবেশবাবু যখন গাড়ি নিয়ে একেবারে ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন. তখনও এ ধরনের কথা ওর মাথায় আসেনি। ওর ভয় হয়েছিল মার কাছে ধরা পড়ে যাবে, সব জানাজানি হয়ে যাবে।

ফিরে আসার সময়েও সেই ভয়। মার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তখন কোনরকমে এড়িয়ে গেছে, ফেরার সময় গাড়ি থেকে নামতে দেখলে আবার প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। তাছাড়া পাড়ার লোকরা কে কি ভাববে কে জানে।

এমনিতেই ও ভয়ে ভয়ে আছে। মা-বাবা যদি কোনরকমে জানতে পারে ওর ঘাড়ে একটা দুর্নাম ঝুলছে। পাড়ার লোক যদি কোনরকমে শুনে ফেলে টাকা চুরির অপবাদে যে-কোনদিন ওর হাতে হাতকড়া পড়তে পারে, তা হলে আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্যে আত্মহত্যা ছাড়া ওর আর কোনও গতি নেই।

এখন ত্রিদিবেশবাবুই ওর কাছে স্বয়ং ভগবান।

ড্রাইভার ওর কথায় থেমে পড়েছিল, কিন্তু অনুনয় করল, চলুন স্যার, বাড়ি অবধি পৌঁছে দিই। হাসতে হাসতে বলল, সাহেব এমনিতে সাদাসিধে ভাল মানুষ, দয়ার শরীর, আমার মেয়ের বিয়েতে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলেন, মনিব হিসেবে তুলনা হয় না। কিন্তু, সাহেবের যা রাগ, পান থেকে চুন খসলে একেবারে আগুন। বলে পান খাওয়া দাঁতে হাসল ড্রাইভার।

বললে, রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়েছি শুনলে চাকরি খতম।

বি.এ. পাস করার পর শম্ভু যখন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত তখন এমন স্বপ্ন কোনদিন দেখেনি। গলি রাস্তা পুরোটাই জুড়ে যায় এমন বিশাল একখানা গাড়ি এসে থামছে ওদের দরজায়, সকলেই হকচকিয়ে যাচ্ছে, সেই গাড়িই আবার শম্ভুকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এমন অবাক-করা দৃশ্য তো ও নিজেও কখনও কল্পনা করতে পারেনি। কোথায় অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে কলার তুলে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে বাড়ি ঢুকবে, তার বদলে ভয়ে হিমসিম খাচ্ছে। চোরের মত বড় রাস্তা থেকেই গাড়ি ছেড়ে দিতে চাইছে।

উল্টে অনুনয় করতে হল, বাড়ির সামনে ভাই গাড়ি গেলে আমার একটু অসুবিধে আছে।

একটাই রক্ষে, ইভা নেই। বিয়ের পর থেকে সে শ্বশুরবাড়িতে। তাকে নিয়েও বাবা-মা'র ঘোর দুশ্চিন্তা।

ইভা এখানে থাকলে, ওই যে একবার গাড়ি এসে থেমেছিল, তার জন্যেই নাজেহাল হয়ে যেত। যে অজুহাতই দিক না কেন, মা শম্ভুকে ছেড়ে কথা বলত না। ইভাও লজ্জায় মরে যেত।

এই সব পাড়ায় গাড়ি মানেই লাম্পট্য। এরকম বিশাল গাড়ি যাদের, সবারই ধারণা তাদের পিঠে 'দুশ্চরিত্র' কিম্বা 'লম্পট' কথাটা ছাপ দেওয়া আছে।

শম্ভু যখন গাড়ি দেখে বেরিয়ে এল, গুপীর সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন আশপাশ থেকে অনেকেই ওদের লক্ষ করেছে। অস্বস্তিও লেগেছিল। একে বাড়িতে মার সন্দেহ, ফিরলেই তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু হবে, তার ওপর পাড়ার লোকদের উঁকিঝুঁকি। দেখা হলে হয়তো জিগ্যেস করবে, কার গাড়ি, কেন এসেছিল।

কোথাও নিশ্চিন্তে বাস করার উপায় নেই, কারণ তুমি তো গরিব!

গুপী বলে উঠল, গোলি মারো তোমার সাহেবকে, বাড়ি অবধি গেলে, বুঝতে পারছ না

ব্রাদার, সব ভেস্তে যাবে। ক্ষতি তোমার সাহেবেরই।

ইস, গুপীটা কি। ওকে তুমি তুমি বলছে। শেষে রেগে গিয়ে ত্রিদিবেশবাবুর কাছে কি চুকলি কাটবে, টাকাটা না হাতছাড়া হয়ে যায়। টাকা হাতছাড়া মানে হাতে হাতকড়ি।

—না না, আপনি ভুল বুঝবেন না। আপনি বরং বাঁদিক দিয়ে চলুন, একটু এগিয়ে। ওখানে কাজ আছে।

অর্থাৎ আশুর চায়ের দোকান। ও ছাড়া আর বসার জায়গা কোথায়। কারও বাড়িতে তো এতটুকু জায়গা নেই। লোকজন, আত্মীয়স্বজন এলে খাটের ওপর বসে। আর কেই বা আসে।

শম্ভু বললে, আমরা বরং বলব বাড়িতেই পৌঁছে দিয়েছেন আপনি।

ড্রাইভার কি বুঝল কে জানে, শেষ অবধি রাজি হল।

কিন্তু শম্ভুর তো আবার বিকেলে যাবার কথা। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন ত্রিদিবেশবাবু। তখন গাড়িটা কোথায় এসে দাঁড়াবে।

শম্ভু বলেছিল, কিচ্ছু দরকার নেই। গাড়ি পাঠাবেন না, আমি ঠিক চারটের সময় চলে আসব।

মাসিমা হেসে ফেলেছেন, তা কি হয় নাকি। বলেছেন, আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে।

এমন কি শর্মিলা, অমন চৌকশ আধুনিকা, শালোয়ার কামিজের নরম রঙে, বুকের আধো-ঢাকা দোপাট্টায় একেবারে পরীর মত হেসে বলেছে, বাসে-ট্রামে আসবেন কেন! আপনার জীবনের এখন অনেক দাম!

শম্ভুও ওর কথা বলার ঢঙে হেসে ফেলেছে।

শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হয়েছে গাড়ি আসবে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা সঙ্কোচ। একে তো পাড়ার অবস্থা, বাড়ির অবস্থা ত্রিদিবেশবাবু আর মাসিমা দেখে ফেলেছেন। তার ফলে ওঁদের কাছে শম্ভুর জীবনের দাম কমে গেছে কি না কে জানে। তার ওপর ভয়, যখন গাড়ি আসবে তখন যদি শর্মিলাও চলে আসে—কি লজ্জা কি লজ্জা!

এমনিতেই ওর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে কি ভেবেছে কে জানে। তার ওপর এইসব পাড়া, ওদের বাড়িটা। মানে অন্ধকূপ ঘরখানা দেখে ফেললে কি ভাববে কে জানে। তখন আর ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারবে না।

ড্রাইভারকে বললে, আপনি এই চায়ের দোকানটার সামনে আসবেন। ঠিক তিনটের সময় আমি এখানে থাকব।

ড্রাইভার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বললে, আচ্ছা স্যার।

ড্রাইভার চলে যেতেই শম্ভু বললে, গুপী, পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা মাইরি। দ্যাখ, ও ব্যাটার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক ভাল, কিন্তু মনিবের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কথা বলতে দেখেছে, ব্যস, আমিও স্যার হয়ে গেছি।

গুপী হেসে উঠল। গুপী বললে, কিন্তু বাড়িতে কি বলবি?

কি বলবে। সে-কথাই তো ও ভাবছিল। বিশেষ করে শর্মিলাও যদি তখন চলে আসে, ড্রাইভারের কথা না শুনে বাড়িতে চলে যায়!

ট্যুইশনি তো একসময় করত, চাকরিটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত।

মা জিগ্যেস করলে বলে দেবে, প্রকাণ্ড বড়লোকের মেয়েকে পড়ানোর কাজ পেয়েছি, প্রাইভেট ট্যুইশনি। শর্মিলাকে ছাত্রী বানিয়ে দেবে।

কথাটা গুপীর খুব মনঃপূত হল।

শম্ভু বললে, তোর কি মনে হয়, মা বিশ্বাস করবে ?

—কেন করবে না ? এরকমও তো হয়। গুপী উত্তর দিল।

শম্ভুর বুকের ওপর থেকে একটা ভার নেমে গেল।

ওরা এসে আশুর চায়ের দোকানে বসল।

কোনও কিছুই বুঝি আশুর চোখ এড়ায় না। হাসতে হাসতে বললে, কি ব্যাপার গুপীবাবু ? ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেছেন নাকি ? গাড়ি কিনে ফেললেন ? তাও এই রকম পেল্লায় গাড়ি ?

আশু দেখতে পাবে বলেই একটু আগে নেমেছে। দোকানটা দূর থেকেই ড্রাইভারকে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চোখ বটে, ঠিক দেখতে পেয়েছে।

আশু শম্ভুকে কদিন পরে দেখছে। বলে উঠল, শম্ভুবাবুর কি অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি ? শরীরটা খুব খারাপ দেখছি।

নাঃ। তেমন কিছু নয়। শম্ভু হাসার চেষ্টা করল।

শম্ভুর মনে পড়ল, মা ওকে এই কথাটা এ কদিনে কয়েকবারই বলেছে।

জিগ্যেস করেছে, কি এত ভাবিস দিনরাত ?

শম্ভু বলতে পারেনি। বলেছে, কি আবার ভাবব ? কিন্তু ওর চোখ ঠেলে জল এসে গেছে।

ও বলতে পারেনি, ওর সামনে এখন ঘোর বিপদ। আত্মসম্মানের। হয়তো জেলে যেতেও হতে পারে। সেই দুর্ভাবনাতেই ওর ঘুম নেই। হাসি নেই। কথা বলতে ভাল লাগে না। মনে হয় যেন কঠিন অসুখ হয়েছে।

আশু জিগ্যেস করল, গাড়িটা কার ? ড্রাইভার কি বন্ধুটন্ধু ? নামিয়ে দিয়ে গেল।

আশুর কি দোষ। এছাড়া আর কি ভাববে। ওই গাড়ির মালিককে তো আর বন্ধু ভাবতে পারে না।

ছোকরাটা চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ তৃপ্তি পেল। —এই রকম চা না হলে জুত হয়, কি বল্ গুপী ?

গুপী বললে, ঠিক বলেছিস। চা বলে জলের মত কি যে পানসে পানসে দিল, খেতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু খাবারটা, আঃ কিসব খায় ওরা।

শম্ভু মৃদু হাসল।

গুপী বললে, কি রে ভয় পাচ্ছিস নাকি ? কেমন নার্ভাস নার্ভাস লাগছে তোকে।

—ভয় ? নাঃ, ভয় কিসের।

বলল বটে, কিন্তু ভয় সত্যিই পাচ্ছিল।

ত্রিদিবেশবাবু বুঝিয়েছেন, ভয়ের কিছু নেই। তবু শর্মিলা যখন বলল, আপনার জীবনের এখন অনেক দাম, তখন 'জীবন' কথাটা ওকে নাড়া দিয়েছিল। মরে যাবে নাকি ? মরে যেতে পারে ? কখনও না। ওর বাঁচার খুব সাধ। বেঁচে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। এখন বাঁচতে চায়।

শম্ভু ধীরে ধীরে বললে, টাকার কথা তো কিচ্ছু হল না। সমস্ত টাকাটাই পাওয়া যাবে তো ?

॥ ৪ ॥

এমনিতেই শম্ভু রাত করে বাড়ি ফেরে। যতক্ষণ গুপী কিংবা অন্য কেউ সঙ্গে থাকে দুর্ভাবনা আর ভয় কিছুটা দূরে সরে যায়। গল্পগুজবে ভুলে থাকতে পারে।

সেদিন ইচ্ছে করে আরও দেরিতে ফিরেছিল। ভেবেছিল বাবা ঘুমিয়ে পড়বে। মাকে তবু কিছু একটা বলে বোঝানো যায়। তেমন তেমন বেকাদায় পড়লে রাগ দেখিয়ে কিংবা বিরক্তি দেখিয়ে মার কথার জবাব না দিলেও চলে। কিন্তু ভয় বাবাকে।

অভাবে অনটনে এমনিতেই শিবপ্রসাদের মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে থাকে। সংসারের খবরাখবর বড় একটা নিতে চান না, জানেন সংসারের খবর নিতে গেলেই ঘুরে ফিরে টাকার প্রশ্ন এসে যাবে। তার চেয়ে নির্বিকার থাকাই ভাল। ছেলে ফিরেছে কি ফেরেনি সে-খোঁজেও রাখেন না। কিন্তু খোঁজ রাখলেই ঝামেলা।

শম্ভু জানে বাবার জেরার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। বানানো মিথ্যে কথাগুলোও কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সেজন্যেই ও রাত করে বাড়ি ফিরল।

ভেবেছিল বাবা-মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমচোখে এসে মা হয়তো কপাট খুলে দিয়ে বলবে, ভাত ঢাকা আছে। তারপর গিয়ে আবার শুয়ে পড়বে। এরকম তো কতদিনই হয়েছে। আর মা জেগে থাকলেও হয়তো সকালের কথা ভুলে গেছে।

তবু ভয়-ভয় করছিল, মা হয়তো জিগ্যেস করবে আবার। কার গাড়ি, কেন এসেছিল। প্রশ্ন করবারই কথা, ওই গাড়িটার সঙ্গে তো শম্ভুকে কিছুতেই মানিয়ে নেওয়া যায় না। চায়ের দোকানের আশুর কথাটা মনে পড়তে হাসিও পেয়েছিল। ড্রাইভার কি বন্ধু নাকি ? নামিয়ে দিয়ে গেল ? অর্থাৎ ওর সম্পর্ক বড়জোর ওই ড্রাইভারের সঙ্গেই হতে পারে, গাড়ির মালিকের সঙ্গে নয়।

একটু খুশি-খুশি ছিল শম্ভু, বেশ একটু আত্মমর্যাদা বোধ করছিল। শুধু সকালের ঘটনার জন্যে নয়। ওইরকম বাড়িতে সকালে আদর-আপ্যায়ন পাওয়ার জন্যে নয়। নার্সিংহোম থেকে ফেরার পরে সন্ধেবেলাতেও ত্রিদিবেশবাবু বলেছেন, রাতের খাওয়াটা আজ আমাদের ওখানেই হোক না, শম্ভুবাবু।

অনেক কষ্টে কাটিয়ে এসেছে ও।

কড়া নাড়ার আগে কপাটটা ঈষৎ ঠেলে দেখতে গেল বন্ধ আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

ঘরে পাখা নেই, কিন্তু আলো আছে। পঁচিশ পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলে। আজকাল সব জায়গাতেই ঝকঝকে আলো, সেজন্যে কম পাওয়ারের আলোয় বাড়ির ভিতরটা আবছা অন্ধকারের মতই দেখায়। শম্ভু চাকরি পেয়ে একবার বেশ কিছু খরচ করে ফেলেছিল। ঘরে টিউবলাইট লাগিয়েছিল। আলো বেশি হয়, কিন্তু ইলেকট্রিকের বিল নাকি বাড়ে না। কিন্তু মুশকিল হল, হঠাৎ হঠাৎ টিউব খারাপ হয়, আর তখন নতুন টিউব কিনতে অনেকগুলো টাকা লাগে। সে-মাসের সব হিসেব গরমিল হয়ে যায়। তাই দু-চারবার টিউব বদলানোর পর আবার ওই পঁচিশ পাওয়ার বাল্‌বে ফিরে গেছে। খারাপ হলে কম খরচে হয়ে যায়।

ঘরে ঢুকতেই পা থেমে গেল।

আবছা আলোতেই দেখল ঘরের পরিবেশ কেমন থমথমে।

বাবা-মা দুজনেই জেগে বসে আছে।

তক্তপোশের ওপাশে ড্যাম্পধরা দেয়ালে বালিশে ঠেস দিয়ে বাবা বসে আছে, এপাশে তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মা।

রোজ একবার করে অফিসে যায় শম্ভু, ম্যানেজারের সঙ্গে কিংবা খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে আসে, আর দুটো দিন সময় দিন।

ঠিক করে রেখেছিল কোনও উপায় না পেলে শেষ পর্যন্ত পালাবে। তারপর যা হয় হোক্।

হুলিয়া বের করবে ? করুক না। এত বড় দেশটায় কি আর লুকোবার জায়গা পাবে না ? কিন্তু ভয় নিজেকে নিয়ে যত না, তার চেয়ে বেশি বাবা-মাকে নিয়ে। বোকার মত তখন যদি বাড়ির ঠিকানাটা না দিয়ে বসত। তার ওপর আবার ম্যানেজার যেই ওদের বাড়ি আসতে চাইল, খুশি হয়ে নিয়ে এসেছিল। তখন ভিতরে ভিতরে একটা লোভ ছিল, ওদের অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখলে ম্যানেজার হয়তো মালিককে বলে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারে।

এখন বুঝতে পারে ম্যানেজার কেন বাড়িটা দেখে গেছে। বাবার সঙ্গে আলাপ করার অছিলায় বাবার আপিসের খবরাখবরও জেনে নিয়ে গেছে।

ভয় সেজন্যেই। ও যদি বা পালায়, বাবা-মাকে কোন বিপদে ফেলবে কে জানে। সব কথা শুনলে বাবা হয়তো হার্ট ফেল করে মারাই যাবে।

থমথমে মুখে বাবা-মাকে বসে থাকতে দেখে শম্ভুর সারা শরীর কেঁপে উঠল। ওকে নিয়েই ওঁদের দুশ্চিন্তা নাকি !

হয়তো আজ ও যায়নি বলে ম্যানেজার খোঁজ নিতে এসেছিল, হয়তো সব কথা বাবাকে বলে গেছে।

ওর পায়ের শব্দ পেয়ে দুজনেই তাকাল ওর দিকে। কোনও কথা বলল না।

আরও ভয় পেয়ে গেল শম্ভু।

এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। কেউ কিছু বললে, ও তবু উত্তর দিতে পারত, বোঝাবার চেষ্টা করত। ওর হঠাৎ মনে হল, তা হলে কি বাবা-মা ম্যানেজারের কথাই বিশ্বাস করে বসেছে ? চোখ জ্বালা করে উঠল। কান্না এল। নিজের বাবা-মা যদি ওকে নির্দোষ ভাবতে না পারে তা হ'লে আর ম্যানেজারের কি দোষ। সে তো বিশ্বাস করবেই না।

তবু তো ম্যানেজার ভদ্রলোক দয়া দেখিয়েছেন। ওকে সময় দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে তো ওকে সঙ্গে সঙ্গে হাজতবাস করিয়ে দিতে পারতেন। এতদিনে হয়ত জেলও হয়ে যেতে পারত।

অল্পক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শম্ভু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, কি হয়েছে কি, তোমরা কেউ কিছু বলছ না কেন ?

বাবা-মা দুজনেই চোখ তুলে তাকাল।

মা তক্তপোশে হাত রেখে কেমন শুকনো গলায় বললে, বোস।

শম্ভু বসল না। শুধু বললে, কি হয়েছে বলো না।

অর্থাৎ ওরা ম্যানেজারের কথা তুললেই ও নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারবে, ভয়ের কিছু নেই। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ত্রিদিবেশবাবু সত্যিই ওকে আশা দিয়েছেন।

মা ওর মুখের দিকের তাকিয়ে একটা চিঠি এগিয়ে দিল।

বললে, তোকে একবার রিষড়ে যেতে হবে।

যাক্, তা হলে ওর ব্যাপার নয়। আতঙ্কটা শরীর থেকে নেমে গেল।

জিগ্যেস করল,—ইভা ? ইভার কি হয়েছে ?

বাবার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল। মাথা না তুলেই বললে, চিঠিটা পড়ে দেখ।

চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল শম্ভু।

ইভার চিঠি নয়।

অনেক রাত অবধি ঘুম এল না শম্ভুর। এখন কি ওর পক্ষে রিষড়া যাওয়া সম্ভব। কি করবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারল না। অথচ চিঠিটা পড়েই ওর ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল।

মা বললে, কাল ভোরের ট্রেনেই তুই চলে যা।

একটু চুপ করে থেকে শম্ভু বলেছে, কাল তো আমার অনেক কাজ, সকালেই। সারা দিনই ব্যস্ত থাকব। তাছাড়া আপিসে...

ও যে এখন আর অফিস, মানে ওই লটারির টিকিটের দোকানে যায় না, যেতে পায় না, তা বাড়ির কেউ জানে না।

ম্যানেজার বলেছিল, আগে সব মিটমাট করে নিন, তারপর আবার যেমন কাজ করছিলেন করবেন।

ও গিয়ে আর কাউন্টারে বসতে পায়নি।

কিন্তু সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসে। মা জানে ওর চাকরি আছে এখনও।

শম্ভু বললে, মা, সত্যি বলছি কাল আমার ভীষণ কাজ। কাল বরং বাবা, তুমি যাও।

বাবা অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে।

মা রেগে গেল। —তোর দ্বারা কি সংসারের একটা কাজও হবে না।

বাবা চোখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, আমি পারলে কি আর তোর জন্যে অপেক্ষা করতাম, সন্ধেবেলাই চলে যেতাম।

মা বললে, তোর বাবার কি আর সেই অবস্থা আছে, দেখে বুঝতে পারিস না। চিঠি পেয়েই তোর বাবা আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল।

বাবা ধীরে ধীরে বললে, আমার আর শরীরে কিচ্ছু নেই রে, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারছি না। গলার স্বরটা কান্না হয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে বললে, কি ভুল করে ফেলেছি। তখন যদি বুঝতাম। দোষ তো আমারই, না ভেবেচিন্তে...

মা বললে, থাক, ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়, দোষ কপালের।

তারপর শম্ভুকে বললে, ওর মনের এই অবস্থা, রাস্তায় শেষে গাড়ি চাপা পড়বে? ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে...

বাবা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। —আমি পারব না রে, পারব না। ওরা যদি আমাকে হাঁকিয়ে দেয়, কি করব তখন?

মা বললে, তুই বরং দুজন বন্ধুটন্ধু নিয়ে যা, জোর করে নিয়ে চলে আসবি। তবু জানব মেয়ে আমার বেঁচে আছে। সুখের মুখে ছাই, এখানে এলে ও তবু স্বস্তিতে থাকবে।

অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল শম্ভু। চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার।

অথচ এই সেদিনই গর্ব করে গুপীর কাছে কত কি বলেছে, ইভার কথা। ভাব দেখিয়েছে ইভা খুব সুখী।

একদিন ছোটকাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই। যদি কোনরকমে টাকার কথাটা পাড়তে পারে। সঙ্কোচ হচ্ছিল, ছোটকাকার কাছে কি ভাবেই বা বলবে। সে এক অসীম লজ্জা।

ছোটকাকা অত টাকা নিশ্চয়ই ওকে ধার দেবে না। তবু বিপদের কথাটা সব খুলে বললে হয়তো কিছু একটা হদিস দিতে পারে। কোথাও থেকে ধার পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। শুধু বললেই হবে, বাবা-মাকে জানিও না। আমি মাইনে পেয়ে মাসে মাসে

দিয়ে যাব।

কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছিল না।

ছোটকাকাকে তো জানে, কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে না। স্বামী-স্ত্রী দুজন আর বছর চারেকের বিল্টুকে নিয়ে ওরা যেন সকলের থেকে আলাদা। কোনও যোগাযোগ রাখতে চায় না। বিশেষ করে শম্ভুদের সঙ্গে তো নয়ই। ওদের দরিদ্র অবস্থাটা, কিংবা এই অন্ধকূপ ঘরখানায় ওরা থাকে বলেই হয়তো কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না। এটা বোধহয় তার কাছে একটা গ্লানি। কিংবা ওরা হয়তো একটু স্বার্থপর স্বভাবের মানুষ।

আজকাল তো সকলেই এইরকম।

ওর চাকরি হওয়ার খবরটা একবার দিতে এসেছিল। একটা চাপা অভিমান তো ওর ছিলই, তা থেকে রাগ। তাই মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে এসেছিল নিজের চেষ্টায় চাকরি পেয়েছি। অর্থাৎ তুমি চেষ্টা করে একটা চাকরি জুটিয়ে না দিলেও না খেয়ে মরব না। চাকরি পেয়েছি, চাকরি পেয়েছি। নিজের চেষ্টায়। মনে মনে অবশ্য জানত, চেষ্টায় নয়, ভাগ্যে। লটারিতে।

গুপীকে বলেছিল, জানিস গুপী, যে দেশটা তালেগোলে চলে যাচ্ছে, কোথাও কোনও ব্যবস্থা নেই, সিস্টেম নেই, সেখানে সবই লটারি। তাকেই ভাগ্য বলে।

হেসে বলেছিল, দশজন লোকের জন্যে দশটা চেয়ার রেখে দে, তখন আর ভাগ্য নেই। কিন্তু দশজনের জন্যে তিনটে চেয়ার রাখ, দেখবি সে তিনজন ভাগ্যে বিশ্বাস করবে, বাকি সাতজন ভাববে ভাগ্যে ছিল না।

বিপদে পড়ে গিয়ে মনে হয়েছিল, হয়তো ভাগ্য বলেও কিছু আছে।

চাকরির খবরটা শুনে ছোটকাকা ভাব দেখাল খুব খুশি হয়েছে।

পরক্ষণেই বলেছিল, এবার একটা ভাল দেখে ফ্ল্যাটে উঠে যাও।

চাকরি পাওয়ার সমস্ত গর্ব মুহূর্তে চুপসে গিয়েছিল।

'ভাল ফ্ল্যাটে উঠে যাও'। যেন ইচ্ছে থাকলেই সেটা সম্ভব।

মনে মনে বলেছিল, তুমিও যাও না আরও ভাল একটা ফ্ল্যাটে। যাচ্ছ না কেন!

তখন ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যেত, ভাড়া কম ছিল। মোটামুটি একটা ভাল চাকরি পেয়েই বিয়ের পরই ছোটকাকা দাদুকে ছেড়ে এই ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। তখন শম্ভুদের আরও দুখানা ঘর ছিল। দাদু মারা যাবার পর, কিছুটা বাড়িওয়ালার দাপটে, কিছুটা সংসারের অনটনে আর কম ভাড়ার লোভে ঘর দুখানা বাবাকে ছেড়ে দিতে হয়। সে-ঘরে এখন অন্য ভাড়াটে। মার কাছে সবই শুনেছে শম্ভু।

সেজন্যেই ও জানত এই বিপদের সময়ে ছোটকাকার কাছে এসে কোনও লাভ নেই। তবু বিপদের সময়ে মানুষ তো আত্মীয়স্বজনের কাছেই যায়।

আশা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু টাকার কথাটা তুলতে পারছিল না লজ্জায়। মুখের ওপর হয়তো বলবে, টাকা? টাকা কোথায় পাব।

সব কথা বললে হয়তো উল্টো বিপত্তি হবে, গিয়ে বাবা-মাকে বলে দেবে। বলে দিয়ে বাবা-মার শান্তি কেড়ে নেবে। বাবা যা ভীতু। জীবনে কিছুই করতে পারেনি বলেই বোধহয় সব ব্যাপারে এত ভয়। আর এটা তো সত্যিই ভয় পাবার মত কথা। ভিতরে ভিতরে শম্ভু নিজেই তো ভয় পাচ্ছে।

ছোটকাকিমা পাশের ঘরে বিল্টুকে পড়াচ্ছিল। এক ফাঁকে উঠে এল।

অবাক চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলল শম্ভু। মুখ ফুটে বলে উঠল, আরেব্বাস।

ছোটকাকিমা হাউসকোট না কি বলে তাই পরে এসে দাঁড়িয়েছে।

—হাসছ কেন ? পরতে নেই ? কত সুবিধে তা জানো। ছোটকাকিমা বললে।

তারপরই জিগ্যেস করলে, ইভা কেমন আছে ?

—ভাল।

শম্ভু শুধু 'ভাল' বলেই থেমে গিয়েছিল। তখনই কিন্তু একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল। ইভার চিঠি এলেই বাবা-মার মুখে কেমন একটা আতঙ্ক। দু-চারদিন মা সবসময় কি যেন ভাবত। দু-একটা অস্পষ্ট অভিযোগও শুনেছে মার কাছে। কার বিরুদ্ধে আর অভিযোগ করবে। সেই ভাগ্যের বিরুদ্ধে।

ছোটকাকিমা বলেছে, সত্যি, ইভার বিয়ের কথা যাকে বলি সেই আশ্চর্য হয়ে যায়। ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল আমাদের ইভা। বলে খুশি-খুশি ভাব দেখিয়েছে।

কাঁটার মত বিঁধেছে কথাগুলো। তবু মুখে হাসি এনে শম্ভু এমন ভাব দেখিয়েছে যেন ইভা সত্যিই খুব সুখী।

কতটা অসুখী তখন অবশ্য জানত না।

ছোটকাকিমা জিগ্যেস করেছে, ইভার বাচ্চাটাচ্চা হবে, কিছু খবর পেয়েছ ?

—না। জানি না।

বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত টাকার কথাটা সেদিন আর ছোটকাকাকে বলতে পারেনি। হয়তো লজ্জা এসে বাধা দিয়েছে। হয়তো হাবভাব দেখে মনে হয়েছে, বলে কোনও লাভ নেই।

শম্ভু শেষ পর্যন্ত উঠে পড়েছিল।

ছোটকাকিমা দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলেছিল, ইভা এলে একবার আসতে বলো। কতদিন দেখিনি। না হয় ভাল বিয়েই হয়েছে, তা বোলে আমাদের একেবারে যেন ভুলে না যায়।

শম্ভু বলেছে, বলব বলব।

ওরা জানে ইভা খুব সুখী। গুপীর কাছেও গল্প করে ইভা সম্পর্কে কত কি বলেছে একসময়। সেও জানে ইভা খুব সুখী।

এখন মা বলছে, দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যা, যদি আসতে না দেয়, জোর করে নিয়ে আসবি।

ইভার পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা চিঠিটা লিখেছেন। হয়তো ইভাকে চিঠি দিতে দেয় না, তাই লুকিয়ে কোনরকমে তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে। ভয়ে নিজে লিখতে পারেনি।

অথচ এই তো সেদিন। কত হাসি, কত আনন্দ।

হঠাৎ এ-ভাবে যে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি।

ইভাকে কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে বাবার একটু দোমনা ভাব ছিল। ইচ্ছে ছিল ষোল আনা, কিন্তু খরচখরচা চালাতে পারবে কিনা সেই ভয়। কাছাকাছি কোনও কলেজ তো নেই, সবচেয়ে কাছে যেটা, নামেই কলেজ, পড়াশুনো বিশেষ কিছু হয় না, তবু কলেজ তো। সেখানে যেতে আসতেও বাসের ভাড়া কম করে একটা টাকা। তার ওপর চা-টোস্ট কিছু একটা টিফিন তো খেতে হবে, সেও এক টাকার মত। তাছাড়া কলেজের মাইনে।

বাবা সেজন্যেই বলেছিল, প্রাইভেটে দিলে হয় না ?

মা রেগে গিয়ে বলেছিল, না হয় না।

বাবা অভাবে-অভাবে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল, সব ব্যাপারে টাকাপয়সার হিসেব দেখত। না দেখে উপায়ও ছিল না।

মা দেখত মেয়ের বয়েসের হিসেব।

বলেছিল, এই বয়েসের একটা মেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বসে থাকবে, তা কি হয় নাকি। কলেজে ঢুকলে দুটো বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে অন্তত সময়টা কেটে যাবে।

তারপর একটু রাগত ভাবে বলেছিল, বিয়ে-থা যদি নাই দিতে পার, ওকে তো কিছু একটা করে খেতে হবে।

শম্ভুকে ওর মা প্রায়ই বলত, তোর বাবার দ্বারা কিছু হবে না, তুই একটু ওর বিয়ের চেষ্টা করে দেখ। এর পর শরীর ভেঙে গেলে কি আর বিয়ে দেয়া যাবে!

তখন ইভা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। ওই উঠতি বয়েসে বোধহয় সবাই হয়। তাছাড়া ইভা দেখতেও ভাল ছিল।

নিজেরা অত লক্ষ করেনি।

বিজয়ার পর যেমন প্রতিবার পিসেমশাইয়ের বাড়ি যায়, সেবারও ও গিয়েছিল। মা আর ইভাও।

পিসিমাই প্রথম বলে। ইভার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলেছিল, ও মা, ইভা, তুই কত সুন্দর দেখতে হয়েছিস রে।

তারপর মাকে বলেছিল, মেয়ের তোমার বেশ একটা আলগা শ্রী, এখন দেখতেও ভাল হয়েছে। এই সময়ে বিয়ে দিয়ে দাও।

যেন বিয়ে দিয়ে দাও বললেই বিয়ে দেয়া যায়।

তবু পিসিমার কথায় মা বিচলিত হয়ে উঠল। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলে। একটা পাত্র দেখে দাও না, তবে দেওয়া-থোয়া তেমন পারব না।

সকলেই এড়িয়ে যেত, হয়তো আড়ালে হাসত। কেউ কেউ বলত দেখব, খোঁজ নেব।

সে-সব দিকে কোনও আশা নেই দেখে মা ওকে কলেজে ভর্তি করার কথা ভেবেছিল।

বাবাকে টাকা-পয়সার হিসেব কষতে দেখে শম্ভু বলে বসেছিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওর পড়ার খরচ আমি যেমন করে পারি দেব।

নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিল।

চুপচাপ ঘরে বসে থাকত ইভা, পাড়াপড়শি দু-একটা মেয়ের সঙ্গে খুব কমই মিশত। মুখে হাসি নেই। কলেজে ভর্তি হয়ে কিন্তু ও যেন রাতারাতি বদলে গেল।

শম্ভুর মনে হয়েছিল, কলেজটা মেয়েদের কাছে যেন একটা ছুটে বেড়ানোর খোলা মাঠ, উড়ে বেড়ানোর খোলা আকাশ।

এক একদিন এসে অনর্গল কথা বলত, কলেজের বন্ধুরা কে কি বলেছে, কোথায় কি হাস্যকর ঘটনা ঘটেছে।

—দেখেছ মা, ইভা কত ফ্রি হয়ে গেছে। কেমন জড়সড় হয়ে থাকত, এখন ওর হাঁটাচলাও বদলে গেছে।

মা হেসেছে ওর কথা শুনে। বেশ বুঝতে পারে মা ওর কথা শুনে রীতিমত তৃপ্তি পেয়েছে। বলেছে, তোর জন্যেই কলেজের মুখ দেখতে পেল মেয়েটা।

মনে মনে ভেবেছে, আমার জন্যে নয়, টাকার জন্যে। মাসে মাসে কিছু টাকা মানুষের জীবনে কত কি পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। মা ভাবত, শম্ভুর দ্বারা আর কিছু হবার নয়, টাকা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ধারণাটাও বদলে যাচ্ছে। ইভা যদি ঘরবন্দী হয়ে থেমে থাকত তা হলে মনে হত ইভার দ্বারা কিছু হবার নয়, একটা জড়পদার্থ, ঘরসংসার করার জন্যেই তার জন্ম। অথচ তফাত শুধু টাকার। একজন অল্প-আয়ের মানুষ, এই শম্ভু, যদি আরেকজনের জীবন বদলে দিতে পারে, তা হ'লে এই দেশটাকেও তো বদলে দেয়া যায়।

যারা পারে তাদের কেন যে ইচ্ছে হয় না।

দিব্যি কলেজে যাওয়া-আসা করে, সবসময় ফুর্তি-ফুর্তি ভাব, এই দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও ইভাকে দেখলে মনে হত জীবনটা কত সুখের।

বোধহয় বছরখানেক পরেই ঘটনাটা ঘটল।

বাবার অফিসের এক বন্ধু এক রবিবার দুপুরে এসে হাজির।

আসবেন, বাবা জানত।

বসার আর জায়গা কোথায়, এই তক্তপোশে এনে বসালেন বাবা।

ইভাকে ডাকলেন। শম্ভুকে ডাকলেন। —এই আমার ছেলে, আর এই মেয়ে।

ভদ্রলোক গল্প জুড়ে দিলেন ইভার সঙ্গে।

শম্ভু দেখল ইভার মধ্যে এতটুকু জড়তা নেই।

একটা কথা শুনে কানে লাগল। —এ তো দিব্যি ভাল মেয়ে শিবপ্রসাদ, এর আবার বিয়ের ভাবনা। নির্ঘাতি পছন্দ হবে তাদের।

শম্ভুর একটুও ইচ্ছে ছিল না। ও বাধা দিতে গিয়েছিল। —ওর পড়াটা শেষ হোক, তারপর বিয়ের কথা ভেবো।

মা শুনল না। —মেয়ের বিয়ে কি জিনিস তুই তো জানিস না, তাই ওসব বলছিস। সুযোগ বারবার আসে না। তাছাড়া দেওয়া-থোয়া তেমন কিছু করতে হবে না।

শেষ অবধি বিয়েটা হয়ে গেল।

এ বাড়িতে তখন সুখ উপছে পড়ছে! ভাল চাকরি, ভাল মাইনে। কোয়ার্টার্র পাবে। আর এই কাছেই, রিষড়ায়। তাকেই তো ভাল পাত্র বলে।

শেষ অবধি শম্ভুও খুব খুশি হয়েছিল। শুধু গুপী নয়, অন্য বন্ধুদের কাছেও গর্ব করে

মার যা কিছু গয়নাগাটি ছিল সেগুলোই ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে দিল।

বাবাও বোধহয় কিছু ধারদেনা করেছিল।

শম্ভু বলেছিল, তোমার সব চলে গেল মা।

মা হাসতে হাসতে বললে, ইভার জন্যেই তো সব আগলে আগলে রেখেছিলাম রে। আমি কি আর পরতাম নাকি, ও পরলেই এখন আমার পরা। ওর সুখই আমার সুখ।

শম্ভু হাসতে হাসতে বলেছে, এখন আর কে পরে, সব তো লকারে রাখে। এখন গয়না দেখাতে হ'লে গলায় শুধু লকারের চাবিটা ঝুলিয়ে রাখলেই চলে।

ইভাও হেসে উঠেছে।

ইভাও তখন কত খুশি।

কিন্তু তারপর একটু একটু করে সমস্ত সুখ উবে যেতে লাগল।

মা সব কথা বলত না, চেপে যেত। দুবার মাত্র এসেছে ইভা, আসতে পেরেছে। কি কথা হয়েছে ও কিছুই জানত না। কিন্তু একটু একটু করে বুঝতে পারছিল।

শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে, ভাবতেই পারেনি।

চিঠিটা পড়ে ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

মা বললে, ইভা দু-একবার যা চিঠি দিয়েছে, কখনও এমন সব কথা তো লেখেনি। বিয়ের পর পর এসেও যা বলেছে, এতটা বুঝতেই পারিনি। ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে।

শম্ভু রেগে গিয়ে বলেছে, ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে, তোমরা কি যে আশা কর। ও নির্ঘাতি তোমরা কষ্ট পাবে বলে কিচ্ছু জানাত না।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বড্ড চাপা মেয়ে!

কথাগুলো শম্ভুর মাথার মধ্যে ঘুরছিল। অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়েছিল ও, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ও জানে আজ আর ঘুম আসবে না।

সকালে একবার ত্রিদিবেশবাবুর বাড়ি যাবার কথা। সেখান থেকে নার্সিংহোমে। যদি রিপোর্টগুলো এসে গিয়ে থাকে ডাক্তারের সঙ্গে বসে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

তারপর আসল কথা। ত্রিদিবেশবাবুর সঙ্গে।

একটা খাঁড়া ঝুলছে ওর মাথার ওপর। এখন ত্রিদিবেশবাবুই ওকে রক্ষা করতে পারেন।

কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ এখন ওর সামনে। ইভাকে বাঁচাতে হবে। হয়তো দেরি হয়ে গেলে আর বাঁচানো যাবে না। ভদ্রমহিলা চিঠিতে লিখেছেন, ইভা যে কোনদিন আত্মহত্যা করে বসতে পারে!

নিজের বিপদের কথায় আচ্ছন্ন ছিল বলেই ইভার কথাটা তখন এ-ভাবে ভাবতে পারেনি।

বলে বসেছে, সকালে আমার অনেক কাজ, বরং বাবাকে যেতে বল।

ও মনে মনে স্থির করে ফেলল, সকালে উঠেই গুপীকে সঙ্গে নিয়ে রিষড়া চলে যাবে। জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ইভাকে।

বিয়েটাই মেয়েদের জীবনের শেষ কথা নয়। ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। এ-কথা কতবার কত জায়গায় শুনেছে। ঠিক হয়ে যায় না। শুধু সহ্য করে ওরা, সহ্য করে করে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তারই নাম সুখ।

এখন তো আরেকটা দায়িত্ব বাড়ছে। ইভা। ওকে আবার কলেজে ভর্তি করবে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শম্ভুর হঠাৎ মনে হল, আরও বেশি টাকা চাই। অনেক টাকা। এত অল্প টাকায় নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া যায় না।

ও এতদিন ত্রিদিবেশবাবুর মুখাপেক্ষী ছিল। কেমন ভয়-ভয়, উনি সব টাকাটা দিতে চাইবেন তো!

যেন দায় শুধু ওর নিজেরই। নিজের বিপদের কথাটা বড় করে দেখছিল বলেই ত্রিদিবেশবাবুর দিকটা ভেবে দেখেনি।

সেই বিশাল গাড়ি করেই ওকে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নীলিমা, যাঁকে গুপীর দেখাদেখি শম্ভুও মাসিমা বলতে শুরু করেছে।

গাড়িতে বসে বসেই মাসিমা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছিলেন, আপনার ওপরই এখন আমার উর্মির জীবন নির্ভর করছে। আপনি ইচ্ছে করলেই একটা জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

শুনে কেমন একটা অদ্ভুত গর্ব অনুভব করেছে শম্ভু। যেন ও হাতের মুঠোয় একটা প্রাণ ধরে আছে, ইচ্ছে করলেই একজনকে স্থির মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, আপনাকে আমি খুশি করে দেব, কিছু ভাববেন না। যদি রিপোর্ট মিলে যায়...

ত্রিদিবেশবাবু কি-সব বলছিলেন, ওর মাথায় ভাল করে ঢোকেওনি। ব্লাড গ্রুপ, এইচ এল, এ, ক্রশ ম্যাচিং, আরও কত কি।

ও যত শুনছিল ততই ভয় পাচ্ছিল। যেন পদে পদে বাধা। যেন চোখের সামনে একটা আশার আলো যে-কোনও মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। শম্ভুর মনে হচ্ছিল ও যেন একটা হার্ড্‌লস রেস দৌড়চ্ছে। এক একটা বাধা লাফ দিয়ে দিয়ে পার হতে হবে।

একটা লোভ উঁকি দিচ্ছিল থেকে থেকে। একটা টাকার বাণ্ডিল।

সেই টাকার বাণ্ডিলটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে একটা রসিদ নিতে পারলেই নিষ্কৃতি। জেল থেকে, অপবাদ থেকে। চাকরিটাও থাকবে, ম্যানেজার আশ্বাস দিয়েছে।

নার্সিংহোমের নামটাই শুনেছিল, কখনও আসেনি, ভিতরে ঢোকেনি কোনদিন। শুধু জানত বড়লোকরাই অসুস্থ হলে এখানে আসে।

গাড়িটা ভিতরে ঢুকতেই ও অবাক হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে যেতে যেতে। ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর নিস্তব্ধ। কোথাও কোনও ভিড় নেই।

ডাক্তার মাথুরের সঙ্গে বোধহয় আগেই ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন ত্রিদিবেশবাবু।

উনি শম্ভুকে প্রথমে তাঁর কাছেই নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার মাথুর পরিষ্কার বাংলা বলেন। —আসুন আসুন।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, এই ইনি। আপনাকে যাঁর কথা বলেছিলাম।

ডাক্তার মাথুর উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন শম্ভুর দিকে, হ্যান্ডশেক করলেন।

শম্ভুর খুব ভাল লাগল। জীবনে এই প্রথম যেন ও সকলের কাছ থেকে সম্মান পাচ্ছে।

ডাক্তার মাথুর বললেন, ইটস আ গ্রেট কজ। দেখবেন সারা জীবন আপনার গর্ব হবে কিছু করেছি, আই হ্যাভ ডান সামথিং।

তারপর বললেন, চলুন, আগে আপনি পেশেন্টকে দেখে আসবেন।

ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌টে উঠে গেল শম্ভু।

ও তখন একেবারে মোহাচ্ছন্ন। ডাক্তার মাথুরের কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে। ইট্‌স্ আ গ্রেট কজ। সারা জীবন আপনার গর্ব হবে একটা কিছু করেছি। আই হ্যাভ ডান সামথিং।

জুতো খুলে রেখে নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকল শম্ভু। ওঁদের পিছনে পিছনে।

সাদা পোশাকে দুজন নার্স দুপাশে। মাঝখানে সাদা ধবধবে চাদরের বেড়্-এ পেশেন্ট শুয়ে আছে। অজ্ঞান কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন।

অসহায় রোগশীর্ণ একটি সুন্দর মুখ। বিশীর্ণ শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। চারপাশে নানা রকমের নল, যন্ত্রপাতি। কোনটার কি কাজ ও কিছুই জানে না।

ওর চোখের সামনে শুধুই একটি সুন্দর ফর্সা রোগমলিন মুখ।

মেয়েটির জন্যে কেমন একটা সমবেদনা বোধ করল শম্ভু।

ডাক্তার মাথুরকে একটা রিপোর্ট এগিয়ে দিল একজন সিস্টার।

উনি দেখলেন, ফেরত দিলেন, তারপর শম্ভুর কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, ইউ আর স্ট্যান্ডিং বিটুইন হার লাইফ অ্যান্ড ডেথ।

ত্রিদিবেশবাবু দুহাত উপুড় করে হতাশ গলায় বললেন, সবই ভগবানের হাত।

মাসিমা বললেন, এখন তুমিই আমাদের ভগবান। চোখ মুছলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সেই ডাক্তার মাথুরের ঘরে।

শম্ভুর তখন মনে হচ্ছে, আমি অত্যন্ত নীচ, অত্যন্ত নীচ। আমার মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব নেই।

এমন একটা সচ্ছল সুখী পরিবার। ভগবান ওদের সব দিয়েছেন। তবু তারা আজ কত অসহায়। এই একটি মেয়ের জীবন হঠাৎ নিভে গেলে সমস্ত পরিবার অসুখী হয়ে যাবে। ওদের চেয়ে দুঃখী যেন আর কেউ নেই। আর ওই মেয়েটি, কি ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখ,

জীবনের কিছুই দেখা হল না, হঠাৎ বিদায় নিয়ে যদি চলে যেতে হয় !

সমবেদনায় চোখে জল এসে গেল শম্ভুর।

এদের কাছে ও কি করে টাকার কথা বলবে।

ওর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে বসে, আমার কিচ্ছু চাই না মাসিমা, আমি শুধু ওকে বাঁচাতে চাই।

ডাক্তার মাথুর বললেন, আপনার যা উদ্বৃত্ত সেটুকুই শুধু দান করবেন, তা হ'লেই একজনকে জীবন দিতে পারবেন। ভয়ের কিচ্ছু নেই, ইটস সো সিম্প্‌ল্‌।

উনি বোঝালেন, আমাদের সকলেরই দুটো কিডনি, বাট ওয়ান ইজ সাফিসিয়েন্ট। পেশেন্টের দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে, ডায়ালিসিস দিয়ে দিয়ে আর রাখা যাচ্ছে না। সি নিডস ওয়ান।

শম্ভু বললে, আমি রাজি।

ওর হঠাৎ মনে হল জীবনে যেন একটা মহৎ কাজ করতে চলেছে।

স্বপ্ন দেখছে মেয়েটি বেঁচে উঠবে। সুস্থ হয়ে উঠবে। হাসবে, শম্ভুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসবে। ওর চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি বলবে, আপনার শরীরের অংশ নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

তার চেয়ে সুখ আর কিছুই নেই।

ডাক্তার মাথুর বললেন, তার আগে কয়েকটা পরীক্ষা দরকার। ব্লাড গ্রুপ, ক্রশ ম্যাচিং, এইচ এল এ টাইপিং, এমনি ধারা কিসব যেন বলে গেলেন।

একটা ঘরে নিয়ে গেলেন ওকে। রক্ত নিলেন, আরও কি কি।

ফেরার সময় ত্রিদিবেশবাবু বললেন, কাল সকালে একবার চলে আসুন। রিপোর্ট এসে যাবে হয়তো, তাছাড়া টাকাপয়সার ব্যাপারটা—বসে কথাবার্তা বলা যাবে।

শম্ভু শুনল। শুনতে ভীষণ খারাপ লাগল।

ত্রিদিবেশবাবুর রাশভারী গলায় বলা 'টাকাপয়সার ব্যাপারটা' শম্ভুর মোহাচ্ছন্ন স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাবনার গালে যেন একটা জোর থাপ্পড় মারল।

ও টাকার লোভে এসেছে ঠিকই, ওর টাকা চাই। তা না হলে কোনদিনই হয়তো আসত না। কিন্তু এই নার্সিংহোমে এসে ও যেন ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ডাক্তার মাথুরের কথাগুলো যেন ওকে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। ওর মধ্যে একটা গর্ব ঢুকিয়ে দিয়েছে। এর আগে কেউ তো ওকে কোনদিন এ-ভাবে বলেনি, বললেও কি ওকে এ-ভাবে নাড়া দিতে পারত।

'আপনার যা উদ্বৃত্ত সেটুকুই শুধু দান করবেন, তা হলেই একজনকে জীবন দিতে পারবেন।' কত সহজ কথা, কত সাধারণ কথা। অথচ এটুকু যদি সকলে মনে রাখত তা হলে পৃথিবীটা আরও কত সুন্দর হয়ে উঠত।

ত্রিদিবেশবাবুও তো সে-ভাবেই ভাবতে পারতেন।

তার বদলে বলে বসলেন, 'টাকাপয়সার ব্যাপারটা।'

গাড়িতে নার্সিংহোমের দিকে আসতে আসতে বলেছিলেন, খুশি করে দেব।

তখনও কানে লেগেছিল খট্‌ করে। যেন বলছেন, কাজটা হয়ে গেলে ভাল বখশিশ দেব।

অথচ এখন এই মুহূর্তে শম্ভু ও-সব কথা ভুলে থাকতে চাইছিল: ডাক্তার মাথুরের কথাগুলো এখন যেন ওকে অন্য মানুষ করে দিতে চাইছে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঊর্মির রোগপাণ্ডুর অসহায় আর ক্লান্ত মুখখানা।

শরীর কাটাছেঁড়া করার একটা চাপা ভয় ওর মধ্যে ছিলই। আরও বড় ভয় থেকে

পরিত্রাণ পাবার জন্যেই এগিয়ে এসেছিল। 'ইট্‌স্ সো সিম্পল'। ডাক্তার মাথুরের কথায় খানিকটা নির্ভয় হয়ে গিয়েছিল। সাদা চাদরে ঢাকা উর্মির সাদা চাদরের মত মুখখানা দেখে এখন আরও নির্ভয়।

'ইট্‌স্ আ গ্রেট কজ', ডাক্তার মাথুর বলেছিলেন। 'দেখবেন সারা জীবন আপনার গর্ব হবে।' শুনে সত্যিই গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল, কোনদিন আমি কি নিজের কাছে গর্ব করতে পারব। সারাজীবন তো কাঁটার মত বিঁধবে একটাই যন্ত্রণা। আমি প্রয়োজনে টাকা নিয়েছিলাম, নিজেকে বিক্রি করেছিলাম ক্ষুদ্রতার কাছে। এ তো নিজেকে বিক্রি করে দেওয়া। শুধু শরীরের অংশ নয়, নিজের অহঙ্কার, নিজের আত্মসম্মান।

আঃ, ওর যদি এখন টাকার প্রয়োজন না থাকত। ও গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বলতে পারত, আমার কিচ্ছু চাই না। আমি শুধু আমার যা উদ্বৃত্ত তা দিয়ে একটি জীবন বাঁচাতে চাই। উর্মির জীবন।

কিন্তু রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে ওর মধ্যে সব ওলোটপালট হয়ে গেল।

শুধু একটা চিঠি। ইভা।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সেই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বাবা বসে আছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। মা তক্তপোশের একধারে নির্বাক বসে আছে বিমর্ষ মুখে। চিঠিখানা এগিয়ে দিচ্ছে, পড়ে দেখ।

রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হয়েছে ওর মাথায়। এখন উর্মির নয়, ইভাকে বাঁচাতে হবে। সেই হাসিখুশি ফুর্তিফুর্তি মুখ, এখন কল্পনায় শুধুই বিষণ্ণতা।

ইভাকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিতে হবে, ওর আরেক ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে হবে। টাকা চাই, টাকা।

এত দিন ওর আশঙ্কা ছিল, সব টাকাটা উনি দেবেন কিনা। হয়তো দিতে চাইবেন না। নিজেকে বিক্রি করে দেওয়ার মত লোক কি কম আছে নাকি, নিজের শরীরের অংশ।

কিন্তু শম্ভু বুঝে গেছে ত্রিদিবেশবাবু কত অসহায়। মাসিমা বলেছেন, এখন তুমিই আমার ভগবান।

না, কোনও অন্যায় হবে না। উনি তো ওঁর যা উদ্বৃত্ত তা থেকে দেবেন। ডাক্তার মাথুরের কথা তো উনিও শুনেছেন।

আরও কিছু বেশি টাকা চাইবে শম্ভু। ইভার জন্যেও দরকার। যদি সম্ভব হয় সংসারটা গুছিয়ে নেবে। ম্যানেজারের মুখের ওপর টাকার বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে দেবে।

—এই নিন। গুনে গুনে দেখে নিন।

হেসে ফেলল শম্ভু। না, তা পারবে না। খুব বিনয়ের সঙ্গে ওকে টাকাটা দিতে হবে। বিনয়ের সঙ্গে বলবে, এবার চাকরিটা ফিরিয়ে দিন।

ম্যানেজার কথা দিয়েছে, চাকরিটা থাকবে।

॥ ৫ ॥

কি করে যে কি ঘটে গেল শম্ভু বুঝতে পারে না, সমস্ত ব্যাপারটা আজও ওর কাছে রহস্য।

চাকরিটা পাওয়ার পর ওর মনে হয়েছিল পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেয়েছে। দিব্যি

মাস গেলে মাইনে। সারাটা দিন কাজের মধ্যে কেটে যায়। আগের মত আর সময় কাটানোর চিন্তায় সময় কাটাতে হয় না। আশুর চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা। গুপীর সঙ্গে আড্ডা। শিবেন চলে যাওয়ার পর যেন আরও ফাঁকা ফাঁকা লাগত।

লটারির টিকিট বিক্রির ব্যবসায় যে এমন রমরমা, আগে জানতই না।

চাকরিটা পাওয়ার পর চোখের সামনে দেখতে পেল। অফিস বন্ধ হওয়ার পর চলে আসত আশুর চায়ের দোকানে। দোকানের দেয়ালে সার দিয়ে টাঙানো টিকিটগুলো তুলে স্যুটকেশে বন্ধ করে গুপী অপেক্ষা করত।

—কি রে কেমন বিক্রি হল আজ ? গুপীকে জিগ্যেস করত।

গুপী দোকানের ছোকরাটাকে অমলেটের অর্ডার দিত। অর্থাৎ বিক্রি ভালই।

শম্ভু বলত, লেগে থাক, লেগে থাক। দেখবি একদিন না একদিন ব্যবসা জমে উঠবে।

সকাল নটার মধ্যে এসে অফিসের কাউন্টারে বসতে হত। বাসের ভিড়, এইটুকুই যা অসুবিধে।

এসে পৌঁছনোর পর সারা অফিস গমগম করত। লোকের ভিড়ে। লম্বা টানা কাউন্টারের সারি। প্রত্যেকটির সামনে ওরা এক একজন বসত। দু-তিনটি মেয়েও টিকিট বিক্রির কাউন্টারে। তাদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতাও চলত।

অনর্গল লোক আসছে, টিকিট কিনছে, চলে যাচ্ছে।

ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট টেবিল, টেবিলে ক্যাশবাক্স। পাশের প্যাসেজ দিয়ে এসে ওখানে সাব-এজেন্টরা তাড়া তাড়া টিকিট নিয়ে যেত। হাজার হাজার টাকার লেনদেন চলত। গুপীও আসত মাঝে মাঝে।

ম্যানেজার তাকে খাতির করে বসিয়ে গল্প করতেন। —ব্যবসা কেমন চলছে গুপীবাবু, আরেকটু বাড়ান।

কখনও বলত, একটা দোকানঘরের চেষ্টা করুন, দেখবেন বিক্রি বেড়ে যাবে।

ম্যানেজার কোন-কোনদিন গুপীকে চা খাওয়াত।

ওই সময়টুকু যা খারাপ লাগত শম্ভুর।

ও কাউন্টার ছেড়ে আসতে পারত না। এমনকি ওখানে বসে বসেও গুপীর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারত না।

খাটনি বেশি, তা হোক। ও বেশ খুশিই ছিল।

একটু খিচখিচ করে লাগত। তাই গুপী আর ও হাসাহাসি করত আশুর দোকানে বসে। —কি খাতির তোর। আমাকে তো স্রেফ চাকর ভাবে।

তা অবশ্য নয়, নয় বলেই বলতে পারত।

যন্ত্রের মত কাজ করে যেত ওরা পাশাপাশি দশটা লোক। টাকা নিচ্ছে, টিকিট দিচ্ছে, কাউকে বলছে, উইশ ইউ গুড লাক, কাউকে বলছে, এবার নির্ঘাত পাবেন।

ম্যানেজার বলে দিয়েছিলেন, শুধু টিকিট বিক্রি করলেই ভাল সেলসম্যান হয় না। খদ্দেরকে কথায় খুশি করতে হয়।

আবার সতর্কও থাকতে হয়, কাউকে না দশ বিশ টাকার নোটের ফিরতি টাকা বেশি দিয়ে ফেলে।

প্রত্যেকের সামনে একটা করে ড্রয়ার, ড্রয়ারে টাকা গুছিয়ে রাখো। একশো টাকার বাণ্ডিলে একশো টাকা, পঞ্চাশ টাকার বাণ্ডিলে পঞ্চাশ।

দুপুরে যখন খুচরো খদ্দেরদের ভিড় একটু হাল্কা থাকে, তখন একবার হিসেব মিটিয়ে দিতে হয় ম্যানেজারকে। খাতায় সই করে ম্যানেজার টাকার অঙ্ক লিখে টাকাগুলো নিয়ে

নেন। আবার সেই সন্ধের সময় আরেকবার। হিসেব মিটিয়ে দিতে হয় তখন।

একটাই চাপা অভিযোগ সকলের, আট ঘণ্টার জায়গায় দশ ঘণ্টা খাটিয়ে নেয়। কোন-কোনদিন বারো ঘণ্টা।

দুর্ভাগ্য শম্ভুর, সেদিন ম্যানেজার হঠাৎ বলে বসলেন, আরে মুশকিল, জীবেনবাবু তো আজও আসলেন না। আসেন শম্ভুবাবু, আজ এই টেবিলটা সামলান। একটা কাউন্টার আজ বন্ধ থাক।

শম্ভু দেরাজের মধ্যে টিকিটের বাণ্ডিল ঢুকিয়ে রেখে দেরাজে চাবি লাগিয়ে চলে এল।

ম্যানেজার ওকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন, ক্যাশবাক্সের চাবি দিলেন।

পুরনো লোকদেরই শুধু এ-কাজ দেয়া হয়, শম্ভু দেখে আসছে। ওদের মাইনেও বেশি।

ছোট্ট টেবিলটার সামনে এসে বসল শম্ভু।

খাতায় সই করে টিকিটের নম্বর মিলিয়ে নিয়ে বাণ্ডিলগুলো দেরাজে রাখল।

এখানে শুধু সাব-এজেন্টরা টিকিট নেয়। তাড়া তাড়া টিকিট, আর তাড়া তাড়া নোটের বাণ্ডিল। টাকা হিসেব করে নিয়ে ক্যাশবাক্সে চাবি দিয়ে রাখা।

দায়িত্ব বেশি, কিন্তু ভিড় কম। এক একজন আসে, কোন লটারির কত টিকিট চাই জানায়, টিকিট নিয়ে টাকা দিয়ে চলে যায়।

নতুন কাজ বলেই বেশ মন দিয়ে কাজ করছিল শম্ভু। এখানে হাজার হাজার টাকার লেনদেন।

সকালের দিকটাতেই খুব ভিড় ছিল। একজন যাচ্ছে তো একজন আসছে।

শম্ভুর বেশ মজা লাগছিল। খুচরো খদ্দেরের কাউন্টারে বসে এত টাকা ও কোনদিন ছুঁয়েও দেখেনি।

একসময় একটু ফাঁকা হয়ে এল।

কেউ ছিল না বলেই, ও অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। রাস্তার লোকজন দেখছিল।

বড় রাস্তার ওপরেই দোকান।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে শম্ভুর হঠাৎ মনে হল সামনের ফুটপাথ দিয়ে শিবেন যেন হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

শিবেন। হঠাৎ শিবেন কবে এল!

ও-ছুটে গিয়ে শিবেনকে ডাকবে বলে ম্যানেজারকে বললে, ম্যানেজারবাবু আমি আসছি, এক মিনিট।

বলেই ছুটে গেল রাস্তায়, দেরি হলে হয়তো ভিড়ে মিলিয়ে যাবে।

দেখতে পেল না, সামনে পথচারীর ভিড়। তবু ছুটে এগিয়ে গেল খানিকটা, যদি লাল শার্টের লোকটাকে দেখতে পায়। ওর মনে হল ও স্পষ্ট দেখেছে, ঠিক শিবেন।

দেখতে না পেয়েও দু-চারবার শিবেন শিবেন বলে চেঁচাল।

না, কোথাও নেই। লাল শার্টকে দেখতে পেল না আর।

হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল।

মনে মনে ঠিক করে রাখল রাত্তিরে গুপীকে নিয়ে শিবেনদের বাড়ি যাবে। নিশ্চয় ফিরে এসেছে।

একটু অভিমানও হল। এর আগে তো দু-দুবার ছুটিতে এসে দেখা করে গেছে। এবার দেখা করেনি কেন! কে জানে, হয়তো আজই এসেছে।

ফিরে এসে পাশের লোককে বললে, ঠিক মনে হল আমার বন্ধু শিবেন। তাই ছুটে

গিয়েছিলাম। পেলাম না। হেসে বললে, কোথায় যে উবে গেল।

তারপরই জিগ্যেস করলে, ম্যানেজারবাবু কোথায় গেলেন?

ম্যানেজারের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

পাশের টেবিলের লোক বললে, স্যার ডেকেছেন। স্যারের ঘরে।

অর্থাৎ ভিতরের দিকে মালিক যেখানে বসেন সেখানেই।

একটু পরেই ম্যানেজার ফিরে এলেন।

আর একজন টিকিট নিতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

তখনই ব্যাপারটা চোখে পড়ল।

ক্যাশবাক্স খুলে টাকা রাখতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে হল, যাবার সময় চাবি দিয়ে যায়নি নাকি। উঠে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখল। একটা বেশ মোটা একশো টাকার বাণ্ডিল রেখেছিল, কোথায়?

কাঁদো কাঁদো গলায় শম্ভু আর্তনাদ করে উঠল, আমার টাকা!

ফিরে তাকিয়ে বললে, ম্যানেজারবাবু, আমার টাকা?

ওর চিৎকারে সারা অফিসে হুলুস্থুল পড়ে গেল।

কে যেন বলে উঠল, টাকা চুরি গেছে, টাকা চুরি গেছে।

অনেকে ছুটে এল।

শম্ভু তখনও তন্ন তন্ন করে ক্যাশবাক্স খুঁজছে। কখনও দেরাজ খুলে দেখছে সেখানে রেখেছে কিনা।

যাকে চোখের সামনে দেখছে তাকেই বিভ্রান্তের মত জিগ্যেস করছে। ও পরমেশবাবু, কাউকে ক্যাশবাক্স খুলতে দেখেছেন? রীতেনবাবু, এখানে কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল?

অনবরত লোক আসছে যাচ্ছে, সকলেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে আর সেভাবে লক্ষ রেখেছে।

সকলেই দোষ দিতে শুরু করল শম্ভুকে। বাক্সে এত টাকা, আপনি কিনা চাবি না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন!

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে স্যার অর্থাৎ স্বয়ং মালিক তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি এমন দৃষ্টিতে শম্ভুর দিকে তাকালেন যেন শম্ভুকে একটুও বিশ্বাস করছেন না। যেন এ-ধরনের অভিনয় উনি অনেক দেখেছেন।

বেশ রূঢ় গলায় বললেন, কত টাকা? দেখুন হিসেব করে।

ভয়ে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে শম্ভুর। বারবার হিসেব করতে গিয়ে ভুল হচ্ছিল। কেবল বলছে, একটা একশো টাকার বাণ্ডিল।

শেষ অবধি হিসেব পাওয়া গেল, দশ হাজার টাকা। একশো টাকার একশোখানা নোট, এর আগের খদ্দের দিয়ে গেছেন। একজন সাব-এজেন্ট।

বৃদ্ধ পরমেশবাবু পান-খাওয়া দাঁতে দেশলাইয়ের কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, আগের লোকের কাছে ঠিক হিসেব করে টাকা নিয়েছিলে? মনে আছে?

হ্যাঁ, শম্ভুর স্পষ্ট মনে আছে। উনি এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছেন, শম্ভু দশ হাজারের বাণ্ডিল করে গার্টার দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।

স্যার আবার রূঢ় গলায় প্রশ্ন করলেন, ক্যাশবাক্সে চাবি দেননি কেন? ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

আর্ত গলায় শম্ভু বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যাপারটা কারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। একজন তো হেসেই উঠল। বললে, হাজার হাজার টাকা নিয়ে কারবার, আপনি বন্ধু দেখে অমনি ছুটলেন।

শম্ভু তখন কিছুই বুঝতে পারছে না, সমস্ত ব্যাপারটা যেন রহস্য। কে নিতে পারে টাকা ? এত লোকের সামনে ক্যাশবাক্স খুলে টাকা নেয়া কি সহজ ? ম্যানেজার নিজেই নিয়ে ওকে বিপদে ফেলছেন কি ? তা হলেও তো পাশের লোক দেখতে পেত। সে কি ভয়ে বলছে না ? নাকি যোগসাজস আছে ম্যানেজারের সঙ্গে। শম্ভুর একবার সন্দেহ হল, তাহলে কি ও সত্যিই আগের খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা নেয়নি। কিন্তু হিসেব মত বাড়তি দেড় হাজার টাকা তো মিলছে। তাহলে কি অন্যমনস্কভাবে ও দশ হাজার টাকার বান্ডিলটা টেবিলে নামিয়ে রেখেছিল, আর টিকিটের বান্ডিলগুলো সে তার চামড়ার ব্যাগে ভরবার সময় টাকাও তুলে নিয়েছে।

বিভ্রান্তের মত ও একবার স্যারের মুখের দিকে, একবার ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

স্যার কঠোর গলায় বললেন, ওসব অ্যাকটিং রাখো, টাকাটা কোথায় রেখেছ বের করে দাও, তা না হলে থানায় ডাইরি করব...

শম্ভু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। —আমি নিইনি স্যার। বিশ্বাস করুন আমি নিইনি।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়, দায়িত্বের কথা।

ম্যানেজার বললেন, ঠিক আছে, আমি সকলের দেরাজ ক্যাশবাক্স মিলিয়ে দেখছি, চান তো পকেটও সার্চ করব সকলের।

নিজের থেকেই সকলে রাজি হল, পকেট উল্টে দেখাল কেউ কেউ।

না, টাকা পাওয়া গেল না।

স্যার বললেন, আমি জানতাম পাওয়া যাবে না। তাহলে কি করবে বলো, থানায় যাব ?

থানা-পুলিস ? আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেল শম্ভুর। ও এতটুকু ভরসা পাবার আশায় সজল চোখ দুটো মেলে সকলের মুখের দিকে অসহায়ের মত চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে গেল।

কে একজন বললে, তার চেয়ে ভালয় ভালয় দিয়েই দিন। হাজতে দুদিন থাকলে, পুলিসের ধোলাই খেলে সেই তো দিয়ে দিতেই হবে।

একজন বললে, মাঝ থেকে আমাদের যত হুজ্জোত।

খালি চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল শম্ভু। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ও তখন একটা ভেঙে পড়া মানুষ।

ম্যানেজার ফিসফিস করে বললেন, কাকে দিয়ে এলেন টাকাটা ? সেই বন্ধুকে কি ? তা হলে চলুন ফিরে নিয়ে আসবেন।

শম্ভু হতাশ গলায় বললে, আমি নিইনি, সত্যি নিইনি।

স্যার চলে গিয়েছিলেন তাঁর ঘরটিতে। ফিরে এলেন।

ম্যানেজারকে বললেন, একটা এফ আই আর করে দিন থানায়।

ম্যানেজার শম্ভুর ওপর সদয় হবার ভাব দেখালেন। তার চেয়ে স্যার আমি ওঁর কাছ থেকে লিখিয়ে নিচ্ছি টাকাটা উনি নিয়েছেন, ফেরত দিয়ে দেবেন।

স্যার চলে যেতেই শম্ভু বললে, আমরা কিরকম গরিব আপনি তো দেখেছেন, গিয়েছিলেন তো একদিন। কোত্থেকে দেব বলুন।

একটু থেমে বললে, আমার মাইনে থেকে যদি মাসে মাসে কেটে নেন...

ম্যানেজার হেসে উঠলেন। মাসে মাসে ? কি বলছেন আপনি ? স্যার কি আর আপনাকে বসতে দেবে নাকি এখানে ?

একটু থেমে বললেন, সই করে দিয়ে যেখান থেকে পারেন জোগাড় করে আনুন, যদি সত্যি না নিয়ে থাকেন...

—সত্যি নিইনি।

—সাত দিন সময় দিচ্ছি। টাকাটা ফেরত দিলে স্যারকে বলে আবার যাতে চাকরি থাকে ব্যবস্থা করব। কিন্তু টাকাটা ফেরত চাই আগে।

উপায় ছিল না, তাই সই করে দিতে হয়েছিল।

কত কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল শম্ভু, একটা দিনের ঘটনায় সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

✓ একটা বাঁকা মেরুদণ্ডের মানুষ কাঁধে দশ হাজার টাকার দুঃসহ ভার নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এল ।

কোথায় আর আসবে, কার কাছে ?

ওর চোখের সামনে তখন থানার হাজত, কোর্টকাছারি, জেলখানা।

এফ আই আর করে এলেন ম্যানেজার। পুলিস এল। জিজ্ঞাসাবাদ।

ম্যানেজার সান্ত্বনা দিলেন, ভয় পাবেন না, টাকাটা ফেরত দিয়ে দিন। যদি অ্যারেস্ট করেও, আমি জামিন দিয়ে দেব। তাছাড়া চাকরিটাও থাকবে।

বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। কি করে মুখ দেখাবে, বাবা-মা দেখলেই তো ধরে ফেলবে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।

আত্মসম্মানের প্রশ্ন। যদি সত্যি জানাজানি হয়ে যায়। পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না। শুধু ও নিজে নয়, বাবা-মাও। যদি ইভার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও জেনে যায়! শম্ভু ভাবতেই পারছিল না।

মুহূর্তের জন্যে একবার ওর মনে হল, পালিয়ে যাই। যেখানে হোক পালিয়ে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল সেভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। ম্যানেজার তো বাড়িতে ছুটে যাবে, ওর নামে হুলিয়া বের করবে।

—গুপী, আমি মরে গেছি রে, আমার আর বাঁচার কোনও উপায় নেই।

গুপীকে আশুর দোকান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা বলল শম্ভু। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

গুপী সব শুনল।

সব শুনে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললে, শালা হারামি।

একটু থেমে বললে, ও শালা ম্যানেজার সরিয়েছে, পাশের লোকটার সঙ্গে যোগসাজসে।

বললে, আমি আর ও শালাদের দোকান থেকে টিকিট কিনব না।

শম্ভু ঘাবড়ে গেল। —না গুপী, ওসব করিস না, তাহলে আরও রেগে যাবে। রেগে গিয়ে হয়তো অ্যারেস্ট করিয়ে দেবে।

গুপী চিন্তা করে বললে, তা ঠিক। তোর এটা মিটে যাক, তারপর অন্য এজেন্টের কাছে চলে যাব। ...কিন্তু এত টাকা কোথায় পাই বল তো!

ওরা দুজনে ভেবে কোনও কূলকিনারা পেল না।

আশুর দোকানে ফিরে এল। ছোকরাটাকে ডেকে দুটো চায়ের অর্ডার দিল।

তারপর হঠাৎ গুপী আশুকে বললে, পুরনো খবরের কাগজগুলো আছে এই তিন চার দিনের ?

আশু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এক কোণে জমা করা আছে।

গুপী উঠে গেল সেদিকে। শম্ভু লক্ষই করল না। ওর মাথার মধ্যে তখন রাজ্যের ।

চায়ের কাপটা পড়েই ছিল. চুমুক দিতে ভুলে গেল শম্ভু।

গুপী পুরনো খবরের কাগজের পাতাগুলো উল্টে উল্টে কি যেন খুঁজছিল। শম্ভুর খুব খারাপ লাগল। ওর এখন টাকার জন্যে দুর্ভাবনা। আর গুপী বোধহয় অন্য কোনও এজেন্টের নাম-ঠিকানা খুঁজছে। যেন এজেন্ট বদলে ফেললেই ওদের সাঙ্ঘাতিক কিছু ক্ষতি হবে। গুপী কি জানে না, ওদের লাখ লাখ টাকার কারবার। গুপীর মত ছোটখাটো সাব-এজেন্টকে ওরা পরোয়াই করে না।

আড়চোখে তাকিয়ে শম্ভু দেখল, আলপিন দিয়ে গুপী খবরের কাগজের একটা জায়গা কেটে টুকরোটা পকেটে ভরে রাখল।

দু-তিনটে দিন শুধু চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে শম্ভু। রাত করে বাড়ি ফিরেছে, আর সকাল হতেই বেরিয়ে পড়েছে। বাবা যেন টের না পায়, মা যেন সন্দেহ না করে। মুখোমুখি হলেই তো সন্দেহ করবে, কিছু একটা ঘটেছে।

একবার করে গিয়ে দেখা করে এসেছে ম্যানেজারের সঙ্গে, স্যারের সঙ্গে। মিথ্যে স্তোক দিয়ে এসেছে, চেষ্টা করছি। আর কিছু সময় দিন।

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। বাড়িতে থাকতেও ভয়। আশুর দোকানে গিয়ে গুপীর দেখা পায়নি।

আশু বলেছে, কি হল গুপীবাবুর ? ওঁর তো টিকি দেখতে পাচ্ছি না।

গুপীর ওপর রাগ হয়েছে শম্ভুর। ও থাকলে তবু শম্ভুর সময় কেটে যায়। একার দুর্ভাবনা দুজনের হয়ে যায়। শম্ভুর সন্দেহ হয়েছে গুপীর বোধহয় কোনও দুর্ভাবনাই নেই। কেনই বা থাকবে। বিপদ তো গুপীর নয়, একা শম্ভুর।

দুটো দিন গুপীর সঙ্গে একেবারে দেখাই হয়নি।

তারপর হঠাৎ দেখল গুপী আসছে।

আশুর দোকান থেকে উঠে এগিয়ে গেল ও। খুব রাগের মাথায় কিছু একটা গালাগাল দেবে ভেবেছিল।

কিন্তু সামনে এগিয়ে যেতেই গুপী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ভারী গলায় বললে, হল না মাইরি, হল না। শালা আশা দিয়েছিল।

শম্ভু অবাক চোখে তাকাল। বললে, কিসের আশা ?

—তোর টাকা। একজন দেবে বলেছিল। কিন্তু হল না।

ওরা এসে আবার আশুর দোকানে বসল।

শম্ভুর অনুশোচনা হল গুপীর ওপর রেগে গিয়েছিল বলে। ভাবতেই পারেনি ওর জন্যে টাকা ধার নেবার চেষ্টা করতে পারে গুপী। ও তো ভেবেছিল, স্বার্থপর, স্বার্থপর। শুধু নিজের চিন্তাতেই ঘুরছে, শম্ভুর বিপদের কথাটা ভুলে গেছে একেবারে।

গুপী হঠাৎ বললে, দু'দিন ধরে ফালতু ছোটাছুটি করলাম, শালার ব্লাড গ্রুপ না কি যেন বলে, মিলল না, একদম মিলল না।

কথাটা দুর্বোধ্য ঠেকল শম্ভুর। সে আবার কি ? ব্লাড গ্রুপ কেন ?

ফ্যাকাসে হাসি হাসল গুপী, পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে দিল। বললে, বিজ্ঞাপনে সে-সব কথা তো লিখবি। কিচ্ছু লেখেনি।

শম্ভু ততক্ষণে ছোট্ট টুকরো কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। অবাক হয়ে বললে, কিডনি ? তুই কিডনি বেচতে গিয়েছিলি ?

গুপী বোকা-বোকা হাসল। —ভাবলাম যদি পাওয়া যায় টাকাটা।

গুপীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শম্ভু।

ওর বুকের মধ্যে যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা গুমরে উঠতে চাইছে। এই নাকি গুপী ? তাকেও ও ভুল বুঝতে চেয়েছে ! আশ্চর্য !

সেদিন এই বিজ্ঞাপনটাই গুপী আলপিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুরনো খবরের কাগজ থেকে কেটে বের করেছিল। তখন ধরতে পারেনি, ভেবেছিল অন্য কোনও এজেন্টের নাম-ঠিকানা জোগাড় করছে।

গুপীর একটা হাত ক্লান্তভাবে টেবিলের ওপর পড়েছিল, শম্ভু হাত বাড়িয়ে ওর মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল গুপীর হাতটা। দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল শম্ভুর চোখ থেকে।

কেউ কোনও কথা বলল না, শুধু গুপী একবার ফিরে তাকাল শম্ভুর দিকে।

একটু চুপ করে থেকে শম্ভু বললে, তোর মেলেনি, আমার ব্লাড গ্রুপ তো মিলে যেতে পারে। গুপী তুই আমাকে এঁদের কাছে নিয়ে চল।

—তুই ? তুই কি করে যাবি ? তোর বাবা-মাকে না জানিয়ে...

শম্ভু হেসে উঠল। কোনও কথা বলল না।

গুপী বললে, আজ আর ওঁদের পাওয়া যাবে না। আমি বরং সক্কাল বেলায় গিয়ে আগে বলে রাখি।

শম্ভু তখন অধৈর্য। একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে, যেন দেরি হলে হারিয়ে যেতে পারে। অন্য কাউকে জোগাড় করে ফেলতে পারে।

তারপর সকালবেলাতেই একখানা বিশাল গাড়ি এসে থেমেছিল ওদের বাড়ির সামনে। ত্রিদিবেশবাবুর গাড়ি। ত্রিদিবেশবাবু আর মাসিমা। সঙ্গে গুপী।

মার কথা শুনে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। এখানে না, এখানে না। তোরা এগিয়ে যা, মা বুঝতে পারবে, সন্দেহ করবে।

তারপর ত্রিদিবেশবাবুর সঙ্গে চলে এসেছিল ওঁদের ফ্ল্যাটে।

আজ বিকেলেই নার্সিংহোম থেকে ফিরেছে। একটা আশা।

ব্লাড গ্রুপ, ক্রশ ম্যাচিং, এইচ এল এ টাইপিং। ডাক্তার মাথুরের কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

কাল সকালেই একবার যেতে বলেছেন ত্রিদিবেশবাবু। রিপোর্ট হয়তো বিকেলের আগে পাওয়া যাবে না। কিন্তু টাকা-পয়সার কথাগুলো সেরে ফেলতে হবে।

এদিকে ইভাকে নিয়ে আরেক দুশ্চিন্তা।

অন্ধকার ঘরের তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিল শম্ভু। ক্ষণে ক্ষণে উর্মির রোগজীর্ণ ফ্যাকাসে মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর তারপরই ইভার মুখ।

উর্মির জন্যে মায়া হচ্ছিল।

ত্রিদিবেশবাবু বলছেন, ডায়ালিসিস দিয়ে দিয়ে আর তো রাখা যাচ্ছে না শম্ভুবাবু। একটা কিডনি যদি না পাওয়া যায় ওকে বাঁচাতে পারব না।

ডাক্তার মাথুর বলছেন, দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে ইউ উইল বি ফিট। ভয় পাবার মত কিছু নয়।

সেই মুহূর্তে শম্ভুর মনে হয়েছিল, আমি টাকা চাই না, আমি ওই অসহায় মেয়েটিকে বাঁচাতে চাই।

নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল। টাকার জন্যে একটা কিডনি বেচে দিচ্ছি, আমি কি মানুষ ! টাকার জন্যেইতো মানুষ সর্বক্ষেত্রে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে। আদর্শ, আত্মসম্মান, সবকিছু। এখন শরীরটাকেও টুকরো-টুকরো করে মাংসের দোকানের মত ঝুলিয়ে রাখতে চাইছে। কেন, না এই সমাজে প্রতিনিয়ত টাকার দরকার। বাঁচার জন্যে। একটা মিথ্যে সম্মান বাঁচানোর জন্যে। হঠাৎ মানুষ হয়ে উঠে নিঃস্বার্থভাবে আরেকজন মানুষকে বাঁচানোর উপায় নেই।

কিন্তু এখন আর ওর মধ্যে ওই-সব মহত্ত্বের এতটুকুও অবশিষ্ট নেই।

এখন ত্রিদিবেশবাবু শুধু একজন বড়লোক, ওর দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ধনী।

—আমি তো ফতুর হয়ে গেলাম শম্ভুবাবু, তবু যদি ওকে বাঁচাতে পারি। ত্রিদিবেশবাবু বলেছিলেন।

কথাটা এখন আর ওকে স্পর্শও করছে না। এখন সম্পর্ক শুধু কেনাবেচার, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা উবে গেছে।

ইভাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে, তার ভবিষ্যৎ। একজন বড়লোক, সে তার মেয়েকে বাঁচাতে চায়। শম্ভু বুঝতে পারছে, ত্রিদিবেশবাবুরা কত অসহায়। একমাত্র শম্ভুই এখন তাদের শেষ ভরসা। ও যা ভয় পেয়েছিল তা নয়। কিডনি বেচে দেবার জন্যে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে না। তাহলে এত সস্তায় নিজেকে বেচে দেবে কেন ? একজন বড়লোককে চাপ দিয়ে আরও বেশি টাকা চাইলে দোষ কি। শম্ভুর মনে হল কোনও অন্যায় নেই।

মাসিমা বলছেন, আমরা বাবা বড়লোক ছিলাম না। সারাজীবন অনেক কষ্ট করে, ওই মানুষটা তো শেষ হয়ে গেছে। এতদিনে একটু টাকার মুখ দেখলাম, তাও ভগবান সব শান্তি কেড়ে নিলেন—

সত্যি একই মানুষ, শুধু একজনের টাকা হয়ে গেছে, আরেকজন টাকার জন্যে হন্যে হয়ে মরছে, সঙ্গে সঙ্গে দুজন বেড়ার দুদিকে। এখন আর ত্রিদিবেশবাবুকে আমাদেরই একজন মনে হয় না।

এখন পরস্পরের শত্রু। শম্ভু চাইবে চাপ দিয়ে আরও বেশি কিছু টাকা। ত্রিদিবেশবাবু ব্যবসাদার লোক, নিশ্চয় উনি চেষ্টা করবেন কত কম টাকায় পাওয়া যায়। অথচ উনি তো ইচ্ছে করলেই একটা গোটা সংসারকে বদলে দিতে পারেন। শুধু উদ্বৃত্তটুকু দিয়ে। সকলেই যদি তাদের উদ্বৃত্তটুকু দিয়ে দিত।

না, ত্রিদিবেশবাবু অপেক্ষা করুন। ওঁকে একটু দুর্ভাবনায় ফেলে রাখাই ভাল।

ইভার পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা লিখেছেন, বেশি দেরি করবেন না। ইভাকে নিয়ে যেতে বেশি দেরি করলে হয়তো ওকে চিরকালের জন্যে হারাবেন।

অন্ধকারের মধ্যেই তক্তপোশের ওপর উঠে বসল শম্ভু। অধৈর্য লাগছে নিজেকে।

না, ত্রিদিবেশবাবুর বাড়ি নয়। ভোর হলেই রিষড়া যেতে হবে ওকে। ইভাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

মা আর বাবা নিশ্চয় ঘুমোয়নি। জেগে বসে আছে। শম্ভু জানে।

ওর ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে, মা, ভেব না তুমি। যত কাজই থাক, আমি কাল সকালেই চলে যাব। ইভার কাছে। তোমরা ঘুমোও।

॥ ৬ ॥

পরের দিন সকালেই টেলিফোন বেজে উঠল। ত্রিদিবেশবাবু যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন নিজে রিসিভার তোলেন না। ফোন ধরে শর্মিলা, কিংবা অন্য কেউ। কখনও কখনও বিপিন কিংবা পারুলের মা। তারপর যার ফোন তাকে ডেকে দেয়।

ত্রিদিবেশবাবু কোনও ফোন আসবে ভাবেনওনি।

ওর বন্ধুরা কেউ হবে মনে করে শর্মিলাই ছুটে গেল। তারপরই তড়িঘড়ি চিৎকার করে ডাকল, বাপি, বাপি, ডাক্তার মাথুরের ফোন।

যে যেখানে ছিল সারা বাড়ি ছুটে এল উৎকণ্ঠার মুখ নিয়ে। ত্রিদিবেশবাবুর ভারী শরীরটা দপদপ করে পা ফেলে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এল। পিছনে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে নীলিমা। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে। অনীশ আর শর্মিলাও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ত্রিদিবেশবাবু কথা বলছেন, হুঁ হ্যাঁ করছেন, আর সকলেই বিব্রত, বিভ্রান্ত।

এ সময়ে কোনও ফোন আসার কথা ছিল না। বরং আরও আধ ঘণ্টা পরে নার্সিংহোমে ফোন করে উর্মি কেমন আছে খবর নেবার কথা। প্রতিদিন নেন।

ডাক্তার মাথুরের ফোন শুনেই বিচলিত হয়ে উঠলেন নীলিমা। নিশ্চয় কোনও খারাপ খবর, তা না হলে এত সকালে ফোন করবেন কেন।

—কি হয়েছে বলবে তো। চাপা গলায় নীলিমা বললেন।

ত্রিদিবেশববুর কানেও গেল না কথাটা, উনি কথা বলছেন তো বলছেনই। তারপর ওঁর মুখে একটু হাসি দেখা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক সরে গেল নীলিমার মুখ থেকে। যাক, তাহলে খুব একটা খারাপ খবর কিছু নয়।

ত্রিদিবেশবাবু থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তারপর বললেন, ব্লাড গ্রুপ তো মিলে গিয়েছিলই, ক্রশ ম্যাচিংও হয়ে গেছে। এখন শুধু এইচ-এল-এ টাইপিং। ডাক্তার মাথুর বলছেন, দেখবেন ছেলেটি যেন বেঁকে না দাঁড়ায়।

এদিকটা কেউই ভাবেনি। সকলের চিন্তা ছিল রিপোর্ট নিয়ে। ক্রশ ম্যাচিং মিলবে কিনা। অনীশ তৈরি হচ্ছিল রিপোর্ট আনতে যাবে বলে।

যাক, এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত।

নীলিমা বললেন, বেঁকে বসবে বলে তো মনে হয় না, শম্ভু ছেলেটি বেশ ভাল, আমার তো বেশ ভালই লেগেছে।

অনীশ হেসে উঠল। ভাল-মন্দর কি আছে, ও টাকা চায়, টাকার জন্যেই তো এসেছে।

নীলিমা বললেন, ওকথা বলিস না, টাকা তো অনেকেই চায়, অভাব তো অনেকেরই, কেউ এল কি ?

অনীশ বললে, কিন্তু টাকার কথাটা তোমরা আগে সেরে রাখলে ভাল করতে। ও কত আশা করছে আমরা তো কিছুই জানি না।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, আমরা আর কি বলব। এর তো আর বাজারে কোনও দাম লিখে বেচাকেনা হয় না, কত চাইবে কে জানে।

নীলিমা ছলছল চোখে বললেন, ও আমাদের উর্মির প্রাণ বাঁচাবে, তার কি টাকা-পয়সায় কোনও দাম হয় নাকি।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, দেখে তো মনে হয় খুবই গরিব, কোথায় থাকে তাও দেখে এসেছি, খুব বেশি কিছু চাইবে বলে তো মনে হয় না।

একটু থেমে বললেন, ডায়ালিসিস দিতে দিতে জলের মত টাকা বেরিয়ে গেছে, ব্যবসাপত্তরের অবস্থাও এ-সময়টা খারাপ থাকে।

সকলে চুপ করে গেল। সত্যিই তো এখন শুধু বাঁচানোটাই সমস্যা। তবু টাকাপয়সার কথা এসে যাচ্ছে।

মৌলালিতে দুটো লেদ মেশিনের ব্যবসা। বড় বড় কারখানা থেকে কিছু অর্ডার এনে ফরমাশ মত মেশিন পার্টস তৈরি করে দেওয়া। সারাজীবন একটা ছেড়ে

একটা ধরে নানারকম ব্যবসা করতে করতে শেষে এই লেদ মেশিনে থিতি হওয়া। রোজগারপাতি ভালই হত, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, এই ফ্ল্যাট, এই গাড়ি, তারপর হঠাৎ কোত্থেকে কি যে হল, ঊর্মির এই অসুখটা। বাতের যন্ত্রণা, বাতের যন্ত্রণা, শেষে রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস। কড়া কড়া ওষুধ খাওয়ার জন্যে, নাকি অন্য কারণে কে জানে। রোগটা সারল কিন্তু তারপরই ডাক্তার বলে বসল দুটো কিডনিই গেছে।

একটা কিডনি যদি কেউ দেয় তবেই বাঁচানো যাবে।

অনীশ বললে, প্রথমে তো এসেছিল ওর সেই বন্ধুটা, গুপী।

শর্মিলা হেসে ফেলল। —কি নাম বাবা, গুপী।

নীলিমা রাগত চোখে তাকালেন মেয়ের দিকে। এখন ওদের নিয়ে কোনও হাসিঠাট্টা উনি বরদাস্ত করতে পারছেন না।

অনীশ বললে, গুপী যখন এসেছিল প্রথমে টাকার কথা কিছু বলেছিল ? কত টাকা ?

—নাঃ, তেমন স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।

—সে না বলুক, তুমি তো বলে নেবে।

ত্রিদিবেশবাবু ছেলের কথার কোনও জবাব দিলেন না। জীবনের সবক্ষেত্রে এমন ব্যবসা-ব্যবসা ভাল লাগে না। ব্যবসা করেন ঠিকই, অর্ডার বাগাবার জন্যে ঘুসও দেন, ট্যাক্স ফাঁকি না দিলে বড়লোকও হওয়া যায় না এত চটপট, কিন্তু তা বলে ছেলেমেয়েরা চাইবে প্রতি পদক্ষেপে ওঁর ব্যবসাদার চরিত্রটাই বড় হয়ে উঠবে, সেই বা কেমন। ওটাই তো উনি ভুলে থাকতে চান। সুখী সংসারী মানুষ হতে চান, হতে চেয়েছিলেন বলেই তো ব্যবসা।

গুপীর কথাটা মনে পড়ল। আভাসে বলেছিল, আপনি তো একটা কিডনি চান, আমি দেব। আমি রেডি হয়েই এসেছি।

এমন ভাবে বলছিল, যেন একজন ফেরিওয়ালা এসেছে মাল বিক্রি করতে, বললেই ঝোলা থেকে বের করে দেবে।

ত্রিদিবেশবাবুর বিশ্বাসই হচ্ছিল না, এমনকি সন্দেহ হচ্ছিল পাড়ার কোনও চ্যাংড়া ছেলে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে এসেছে।

—আপনি তো বিজ্ঞাপনে লিখেছেন প্রয়োজনে সাহায্য করবেন। আপনি তো একজন রিচ ম্যান, দেখেই বুঝতে পারছি...

সিটিং রুমের আসবাবপত্র চারপাশ দেখল, তারপর হেসে বললে, যা চাইব তা আপনার কাছে হাতের ময়লা। তবে আগেই দিয়ে দিতে হবে, ভীষণ বিপদে পড়েছি তাই...

তখন তো ত্রিদিবেশবাবু শুধু একজন ডোনার খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বিজ্ঞাপন দিয়েও কেউ আসেনি, অথচ একটা কিডনি তাঁর তাড়াতাড়ি চাই।

বলেছিলেন, দেব দেব। তাই দেব।

কিন্তু শেষ অবধি ব্লাড গ্রুপ মিলল না। তখন গুপীই নিয়ে এল এই শম্ভুকে। ত্রিদিবেশবাবুর মনে আছে ব্লাড গ্রুপ মিলল না ডাক্তার মাথুরের মুখ থেকে সে-কথা শুনে গুপী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ত্রিদিবেশবাবুর মুখের দিকে, তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

—হবে না ? এইটুকু কাজও আমাকে দিয়ে হবে না ? কি হতাশা তার মুখে।

ত্রিদিবেশবাবুর সেদিন অনুশোচনা হয়েছিল, ছেলেটিকে সন্দেহ করছিলেন বলে। নার্শিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলেন গুপীকে, ডাক্তার মাথুরের কাছে। পরীক্ষা-টরিক্ষা করাতে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা ভয় ছিলই। টাকাটা আগাম দিয়ে দিতে হবে।

সন্দেহ হচ্ছিল, হয়তো সবটাই অভিনয়। আজকালকার দিনে কাউকেই বিশ্বাস করা

চলে না। শেষে টাকাটা নিয়ে না ভেগে পড়ে। সকলকে বোকা বানিয়ে।

'আপনার কাছে সে তো হাতের ময়লা।' এর বেশি আর কিছু জানেন না।

তারপর তো সে-ই শম্ভুর খবর আনল। অপেক্ষা করতেও রাজি হননি। গুপীকে সঙ্গে নিয়েই চলে গিয়েছিলেন।

শম্ভু ওঁকে দেখেই কেন বিরক্ত হয়েছিল এখন বুঝতে পারছেন।

কাল যাবার সময় বলে গেছে, আমি নিজেই আসব, আপনারা যাবেন না। বাবা-মা জানতে পারলে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে।

বুঝতে পারছেন একটা ঘোর অন্যায় করছেন, কিন্তু এছাড়া ওঁর তো উপায় নেই। তার বাবা-মার কাছে সেও একটি সন্তান। অথচ তাদের না জানিয়ে...।

একটাই সান্ত্বনা ডাক্তার মাথুর বলেছেন ভয়ের কিছুই নেই, আজকাল আকছার হচ্ছে। ইটস্ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ এনিথিং। দুজনই সুস্থ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে।

ডাক্তার মাথুর লোকটি কিন্তু রীতিমত দায়িত্বশীল মানুষ। ওঁদের চেয়েও তাঁর উৎকণ্ঠা যেন আরও বেশি। সকালবেলাতেই ফোন করে রিপোর্ট জেনে নিয়েছেন এবং নিজেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন।

ওঁর ফোন পাওয়ার পর থেকেই ত্রিদিবেশবাবুকে উৎফুল্ল লাগছিল। সারা বাড়িতেই যেন নিশ্চিন্ত ভাব।

শর্মিলা ওঘরে গিয়ে জোরে রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছে।

ত্রিদিবেশবাবুর মনে হল অনেকদিন পরে যেন ওঁর ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর শোনা যাচ্ছে। গান। এ বাড়িতে অনেককাল রেকর্ড বাজেনি। সারা বাড়িটা যেন কবরখানার মত থমথম করত। কারও মুখে কোনও আনন্দ নেই, হাসি নেই।

আজ আবার গানের সুর শোনা যাচ্ছে। বুকের ওপর থেকে ভারী পাথরটা অনেকখানি সরে গেছে, একটা আশা দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু শম্ভু আসছে না কেন! ওর তো সকালেই চলে আসার কথা।

শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে না তো। একেবারে অসম্ভব টাকার অঙ্ক কি বলে বসতে পারে!

মনে মনে একটা অঙ্ক কষতে শুরু করলেন ত্রিদিবেশবাবু।

এর মধ্যেই তো লাখখানেক টাকা কি তারও বেশি খরচ হয়ে গেছে। কিডনি পাওয়াই তো সব নয়। আরও এক লাখ, দেড় লাখ, কত লাগবে কে জানে। অপারেশনের খরচ।

শুধু ঊর্মির জীবন নয়, এই সংসারটাও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই ব্যবসা, এই ফ্ল্যাট, এই গাড়ি। কোনটাই তো ছেড়ে দিতে পারবেন না। একদিন তাঁর কিছুই ছিল না, আজ তাঁর সবই চাই, ঊর্মিকেও।

—কই শম্ভু তো এল না। ওর তো সকালেই আসার কথা ছিল।

নীলিমা বললেন।

অনীশ বিরক্তভাবে বললে, এই লোকগুলোকে কোনও বিশ্বাস নেই।

রাগত স্বরে শর্মিলা বললে, দেখবে যাও কোথায় আড্ডা মারছে। এদের কোনও দায়িত্বজ্ঞান আছে নাকি।

ত্রিদিবেশবাবু কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, আমার তো হাত-পা বেঁধে রেখে গেছে, একবার গিয়ে যে খবর নেব তারও উপায় নেই। যেতে বারণ করে গেছে, গেলে হয়তো উল্টে রেগে যাবে, সব ভেস্তে যাবে।

নীলিমা বললেন, এত অধৈর্য হচ্ছ কেন, যখন বলে গেছে তখন ঠিকই আসবে।

আমার মন বলছে ও আসবে।

সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, তবু শম্ভুর কোনও খবর নেই। এক টুকরো আশা পেয়ে সারা বাড়িতে যে উৎফুল্ল ভাব ফুটে উঠেছিল ক্রমশ সেটা উবে গেল।

তা হলে কি ছেলেটা আসবে না নাকি? মত বদলে ফেলেছে?

যখন একেবারেই কোনও আশা ছিল না তখন এতখানি বিভ্রান্ত হননি ত্রিদিবেশবাবু। আশা পেয়ে নিরাশ হওয়া আরও কষ্টের।

কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। এমন সময় অনীশ ফিরে এল রিপোর্ট নিয়ে।

ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার মাথুরের কাছে।

এইচ এল এ টাইপিংয়ের রিপোর্ট।

অনীশ এসেই জিগ্যেস করল, শম্ভু এসেছিল?

—না।

রিপোর্ট নিয়েই ত্রিদিবেশবাবুর উদ্বেগ ছিল, নীলিমারও। যদিও ডাক্তার মাথুর ভরসা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস ফেবারেব্‌ল। কথাটার কি মানে উনি বুঝতে পারেননি।শুধু বুঝেছিলেন নিরাশ হবার কিছু নেই।

কিন্তু নিরাশ তো শম্ভুই করে তুলছে।

অনীশ এসে দেখল সকলের মুখেই কালো ছায়া। সকালে বাড়িটা অনেক দিন পরে কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, মরা-মরা দুঃখী-দুঃখী ভাব কেটে গিয়ে গলার স্বরও বদলে গিয়েছিল। রেকর্ডে গান বাজাতে শুরু করেছিল শর্মিলা।

ত্রিদিবেশবাবুর ভালই লাগছিল গানের সুরটা। কিন্তু শম্ভুর জন্যে অপেক্ষা করে করে যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, সন্দেহ জেগেছে শম্ভু আসবে কিনা, হঠাৎ একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন, আঃ, গানটান বন্ধ কর, ভাল লাগছে না।

শর্মিলা বাপির কাছে আদরই পেয়ে এসেছে, ধমক খেয়েছে কমই।

ছুটে গিয়ে রেকর্ড চালানো বন্ধ করে দিল। ও অতশত বোঝেনি, ভেবেছে দেরি করুক আর যাই করুক আসবে। এতগুলো টাকার লোভ কি সামলাতে পারবে নাকি।

অভিমানে ও আর এদিকে এলই না।

অনীশ এসেই দেখলে সকলের মুখেই কালো ছায়া।

বিরস গলায় বললে, রিপোর্ট তো ডাক্তার মাথুর বললেন ও কে। এখন সব ব্যবস্থা করে ফেলুন।

একটু থেমে বললে, কিন্তু শম্ভুই যদি না আসে...

—আমি তা হলে একবার ওদের বাড়িই যাই কি বলো?

নীলিমার দিকে তাকালেন। নীলিমা কি জবাব দেবেন ঠিক করতে পারলেন না।

কাল সন্ধে থেকেই মনে মনে অনেকগুলো দৃশ্য পর পর সাজিয়ে ফেলেছিলেন। ডাক্তার মাথুরের কাছে চিঠি নিয়ে ভেলোর চলে যাবেন। আগে থেকেই সেখানে জানানো আছে। ও টিতে পাশাপাশি দুটো টেবিল। একটায় শম্ভু একটায় উর্মি। একজনের শরীরের অংশ আরেকজনের শরীরে চলে যাবে।

কল্পনায় দেখেছেন উর্মি সুস্থ হয়ে বেডের ওপর উঠে বসেছে, মুখে মৃদু হাসি।

মনে মনে ভেবে রেখেছেন শম্ভুকেও পুরো সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত যা কিছু করার এতটুকু অবহেলা করবেন না। ডাক্তার মাথুর তো বলেছেন, আকছার এরকম হয় আজকাল, জীবনের কোনও ভয় নেই।

তবু ঈষৎ ভয় যে হচ্ছে না তা নয়। যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায় ওঁর দায়দায়িত্ব কতখানি তাও জানেন না। তার চেয়েও বড় কথা নিজের কাছে কি জবাবদিহি করবেন।

এসব অবশ্য গোপন রেখেছেন নিজের বুকের মধ্যে। নীলিমাকেও জানতে দেননি, ছেলে-মেয়েদেরও নয়। ওরা শুধু ঊর্মির কথাই ভাবছে।

শম্ভুর কাছে উনি ভাব দেখিয়েছেন ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার মাথুরের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলেছেন এ তো খুব সাদামাটা ব্যাপার। দু-সপ্তাহ পরেই আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।

এখন সন্দেহ হচ্ছে শম্ভু হয়তো শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

তোয়াজ করার জন্যেই 'শম্ভুবাবু' বলেছেন, 'আপনি'। ছেলের বয়েসী, তাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করার কথা নয়। ওঁর তা স্বভাবও নয়। তবু করেছেন শুধু ঊর্মির মুখ চেয়ে।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে।

দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললেন, এভাবে শুধু শুধু বসে থেকে কি লাভ।

ঠিক সেই সময়েই কলিং বেল বেজে উঠল। পিয়ানোর মত টুংটাং আওয়াজ করে। ত্রিদিবেশবাবু দ্রুত এগিয়ে গেলেন দরজা খুলতে। উনি নিজে কখনও দরজা খুলতে যান না, তবু গেলেন।

কাজটা বিপিনের। ও না থাকলে পারুলের মা। কিংবা অন্য কেউ।

দরজা খুললেন, খুলেই শম্ভু আর গুপীকে দেখতে পেয়ে মুখের ওপর থেকে কাল ছায়াটা সরে গেল মুহূর্তের মধ্যে। আরেকটু হলেই আনন্দ চাপা দিতে না পেরে প্রায় বলে ফেলেছিলেন, এসেছেন! বাঁচিয়েছেন!

কিন্তু ভিতরের ব্যবসাদার মানুষটা সতর্ক হয়ে গেল। রাশভারী ধীর গলায় বললেন, আসুন।

যেন এতক্ষণ ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছিল না।

শম্ভুই বরং উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল, রিপোর্ট এসেছে?

—সব ও কে।

শম্ভু আর গুপীও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঊর্মির ব্লাড গ্রুপ গতকালই জেনে গিয়েছিল, মিলবে তা জানত। অনেকদিন আগে একবার রক্ত দিয়েছিল। তবু শেষ অবধি কি হয় বিশ্বাস ছিল না।

—আপনার তো সকালে একবার আসার কথা ছিল। অনীশ বললে।

—হ্যাঁ। বড় ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম।

সব পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে।

ইশারায় অনীশকে উঠে যেতে বললেন ত্রিদিবেশবাবু। অনীশ চলে গেল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

ছেলেটার কোন জ্ঞানগম্যি নেই। বলে বসল, আপনার তো সকালে একবার আসার কথা ছিল। যেন আমরা সেজন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলাম, হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

প্রথমদিকে যখন খড়কুটো ধরার জন্যে ব্যগ্র, তখন একরকম। এখন আর তেমন ব্যগ্রতা দেখানো উচিত নয়।

কেনাবেচার ব্যাপার। কিডনি। শরীরের একটা অংশ। তা হোক, ওটা শম্ভুর শরীরে উদ্বৃত্ত। একটা থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু উদ্বৃত্ত হলেই তো কেউ বিলিয়ে দেয় না। ত্রিদিবেশবাবু নিজেই কি পারেন! এই যে টাকাপয়সা কতটুকু প্রয়োজন আর কতটা উদ্বৃত্ত কেউ কি বুঝতে পারে। মনে তো হয় সবটাই দরকার, আরও আরও আরও দরকার। কারও কাছে উদ্বৃত্ত বলে কিছু নেই।

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল।

—দুহপ্তা কি বড় জোর তিন হপ্তার ছুটি নিতে হবে। তারপরই আপনি ফিট হয়ে ফিরে

আসবেন, কাজে জয়েন করতে পারবেন।

শম্ভু মনে মনে হাসল। ছুটি! ওর যে চাকরিটাই নেই সে-কথা কি করে বলবে। বলার প্রয়োজনও নেই।

ভেবে রেখেছে বাড়িতে বলবে বাইরে যাচ্ছি আপিসের কাজে। টাকাটা পেয়ে গেলেই তো ও মুক্ত পুরুষ। এখন মাথার ওপর একটা খাঁড়া ঝুলছে। চুরি যাওয়া টাকাটা ফেরত দিতে হবে।

শম্ভু মনের মধ্যে জোর পাচ্ছিল না। কাল সারা রাত না ঘুমিয়ে ভেবে রেখেছে দশ হাজার নয়, কুড়ি হাজার টাকা চাইবে।

এখানে আসার পথে গুপীকে বলেছে, কাল মেয়েটাকে দেখার পর নিজেকে ছোট লাগছিল। ঊর্মি, না কি নাম যেন?

—হ্যাঁ, ঊর্মিলা।

—শালা গরিব হলে মাইরি একটা ভাল কাজও করা যায় না। বিনা পয়সায় তো একটা মেয়েকে বাঁচাতে পারতাম। অথচ উপায় নেই।

গুপী হেসে উঠল।—রাখ তোর ভালমানুষি। পৃথিবীটা শুধু টাকা চেনে, আর কিচ্ছু চেনে না। ইভার কথাটা ভাব না। শালা দেখে পছন্দ করেছিল। আমি তো ওকে দেখে চমকে উঠেছিলাম।

শম্ভু তো আরও বেশি অবাক হয়েছিল।

সকালে উঠে মাকে বললে, মা তুমি রাগ করছ, না?

মা বিমর্ষ ভাবে বললে, আমি আবার কার ওপর রাগ করব, আমার কি রাগ করার কেউ আছে। রাগ তো শুধু নিজের কপালের ওপর।

মাথা নিচু করে বললে, বাবাকে বলো যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

—যাবি? মা খুশি হয়ে উঠল।

তারপর বেশ কঠিন গলায় বললে, কারও কোনও কথা শুনবি না, জোর করে নিয়ে আসবি।

শম্ভু ঘাড় নেড়েছে। হ্যাঁ, আমাদের যদি চলে যায় ওরও চলে যাবে।

বেরিয়ে এসে একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেছে। অনেকদিন আগে একবার ইভা এসেছিল।

হঠাৎ ফিরে এসে দেখে মা কাঁদতে কাঁদতে সান্ত্বনা দিচ্ছে ইভাকে। কি আর করবি মা, একটু মানিয়ে চল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর ইভার দুচোখ জলে ভরা। আমি আর যাব না মা, যাব না।

একটু একটু করে প্রশ্ন করে জেনেছিল, বিয়ের সময় তেমন কোনও চাহিদা না থাকলেও ওরা নাকি আশা করেছিল আরও অনেক কিছু পাবে।

এখন সেজন্যেই পদে পদে কষ্ট দেয়। ইভার চেহারা দেখেও সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

শম্ভু রেগে গিয়ে বলেছিল, তোকে যেতে হবে না, এখানেই থাক। কলেজে ভর্তি করে দেব।

মা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, তা কি হয় রে।

বুঝিয়ে-সুজিয়ে ইভাকে আবার বাবা-মা সেখানেই দিয়ে এসেছিল।

—লোকে বলবে কি! আত্মীয়স্বজনের কাছে কি বলব। মা যুক্তি দেখিয়েছিল।

আর শম্ভুর মনে হয়েছিল সমাজকে এত ভয় পাবার কি আছে? একটা জীবনের চেয়ে আত্মসম্মান কি বড় নাকি! আমাদের আবার সমাজ।

নিজে বিপদে পড়ে গিয়ে সেই আত্মসম্মানই বাঁচাতে চাইছে। জীবন দিয়েও। কে বলতে পারে কিডনি দিতে গিয়ে শেষে মরে যাবে কিনা।

মার কথা শুনে তাই আশ্চর্য হয়ে গেল শম্ভু। খুশি হল।

বিয়ে আর স্বামীর সংসারই শেষ কথা নয়, মেয়েরাও বুঝতে শিখছে। কে কি বলবে, মুখ দেখাব কি করে এ-সব ছেঁদো কথা যত তাড়াতাড়ি ওরা ভুলতে পারে ততই ভাল।

মা বুঝতে পারছে মাও বদলে গেছে।

তবু ভোরবেলায় বেরিয়ে এসে গুপীকে ডেকেও কথাটা বলতে পারছিল না।

শুধু বললে, চল এখুনি রিষড়ে যেতে হবে। একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়েছে।

ট্রেনে যেতে যেতে শেষ অবধি বলতে হল।

গুপী গুম হয়ে চুপচাপ বসে রইল, ট্রেনের জানালায় হেলান দিয়ে।

আর হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে, শালার হারামিকে খুন করে দিই চল।

পাশের লোকটা চমকে ফিরে তাকাল।

শম্ভু কোনও কথা বলেনি।

ওর আশ্চর্য লাগছিল গুপীর রাগ দেখে। এই ধরনের ঘটনা তো প্রায়ই শোনে, কাগজেও বেরোয়। কলেজে চায়ের দোকানে ছেলেরাও আলোচনা করে। রেগে যায়, যেন পারলেই ক্রিমিনালগুলোকে খুন করে দেয়। একজনও তো এই ক্রিমিনালগুলোর পক্ষ নিয়ে কথা বলে না। তাহলে ক্রিমিনাল কারা? কারা এইসব নির্যাতন চালায়? আমরাই তো? আমাদের মধ্যেই তো তারা আছে, শুধু বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রিষড়া স্টেশনে নেমে ইভাদের বাড়ির পথ ধরে যতই এগিয়েছে কেমন ভয়-ভয় করতে শুরু করেছে শম্ভুর।

—জোর করে নিয়ে আসবি, কারও কথা শুনবি না।

কিন্তু যতই বাড়ির কাছাকাছি এগিয়েছে, ততই নিজেকে অসহায় লেগেছে। মনে হয়েছে পাড়াপাড়শি সকলেই যেন শত্রুপক্ষ। ওরা যদি বাধা দেয়?

এই তো প্রতিবেশী একজন তবু সাহস করে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ তো জানাতে পারেনি। সব দেখেছে, সব জানে, তবু চুপ করে থেকেছে।

শম্ভুর হঠাৎ মনে হল আসল ক্রিমিনাল এরাই। এরা যদি সচেতন হয়ে ওঠে, সমাজটা রাতারাতি বদলে যাবে। অথচ মেয়েটার পক্ষ নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। একটা বাড়ির বউ কেঁদে উঠল, কিংবা চিৎকার করছে, করুক। আমাদের কিছু করার নেই। ওটা ওদের সম্পত্তি। কিন্তু একটা বাচ্চা চাকরকে ঠ্যাঙালে তখন তো ঠিকই ছুটে আসে, থানা-পুলিশ করে। এর নাম নাকি সমাজ!

রিকশায় যেতে যেতেই চিঠিটা বের করে ঠিকানটা দেখে নিল।

—গুপী, আগে বরং এঁদের বাড়িতেই যাই।

আসলে বাড়ির লোকদের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিল শম্ভু। হয়তো ইভার সঙ্গে দেখা করতেই দেবে না। নিয়ে আসা তো দূরের কথা।

তারপর যদি সকলে চেঁচামেচি করে একটা সিন ক্রিয়েট করে। করুক না, তাহলে তো ভালই, সকলকে বলতে পারবে, কি অমানুষ এরা।

তবু ঠিকানা দেখে পাশের বাড়িতেই গেল। প্রায় লুকিয়ে লুকিয়ে। ইভাদের বাড়ির কেউ না দেখতে পায়।

ভদ্রমহিলা এলেন, তারপর যেন স্বস্তি পেলেন শম্ভুর পরিচয় পেয়ে।

বললেন, বসুন, আমি দেখি ওকে ডেকে আনতে পারি কিনা। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

শম্ভু ভয় পাচ্ছিল। ওর ইচ্ছে ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে এখান থেকেই নিয়ে চলে যাবে, পালিয়ে যাবে।

গুপী বেঁকে দাঁড়াল। —কেন ? জোর করে নিয়ে যাব, দরকার হয় দু-একটা খুন করে দেব।

শুনে শম্ভু একটা জোর পেল। সত্যি তো। এভাবে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

ভদ্রমহিলা বললেন, তবে আপনারাই যান, আমাকে আর এর মধ্যে টানবেন না।

সেই গা-বাঁচানো ব্যাপার। তবু তো চিঠি লিখে জানিয়েছেন উনি, সেজন্যে শম্ভু কৃতজ্ঞ বোধ করল।

গিয়ে কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে কপাট খুলে দিল। চিনতে পেরেই হাসল, হেসে ছুটে গেল। বোধহয় খবর দিতে।

ইভার শাশুড়ি হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। —এসো এসো।

একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন বারান্দায়। —কেমন আছ সব ? তোমার বাবা-মা ?

কে বিশ্বাস করবে এই বাড়িতে একটি মেয়েকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করা হয়।

শম্ভু বসল না, কোনও কথার উত্তর দিল না। বললে, ইভা কোথায় ?

—আসবে আসবে। এসেছ যখন বোনকে না দেখে কি চলে যাবে ! হাসলেন।

শম্ভু গম্ভীর ভাবে বললে, আমি ইভাকে নিতে এসেছি।

—নিতে এসেছ ?

—হ্যাঁ।

আবার হাসলেন তিনি। এভাবে কি নিয়ে যাওয়া যায় নাকি। বাড়ির বউ, চিঠি দেবে, আমাদেরও তো সুবিধে-অসুবিধে আছে।

শম্ভু চিৎকার করে ডাকল, ইভা ! এদিকে আয়।

ইভা বেরিয়ে এসে দরজার পাশে দাঁড়াল।

শম্ভু বললে, চল। এক্ষুনি।

ইভা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকেই অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল। —চল।

—কিন্তু এই শেষ যাওয়া মনে রেখ। সেই হাসি-হাসি মুখটা নৃশংস হয়ে উঠল।

শম্ভু বললে, আজ থেকে ও আর আপনাদের বাড়ির বউ নয়।

শম্ভুর সঙ্গে সঙ্গে ইভাও বেরিয়ে এল।

শম্ভু বেশ টের পাচ্ছিল ওদের পিছনে কয়েক জোড়া অবাক দৃষ্টি ওর পিঠের ওপর, ইভার পিঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে।

ব্যস, তারপর মুক্তি।

ইভাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল শম্ভু।

সারা রাস্তা চুপচাপ, সারা ট্রেন একটাও কথা বলেনি ইভা। চোখে এতটুকু জল ছিল না। একটা পাথরের মূর্তি যেন।

বাড়ি ফিরেই ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল ইভা। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মাও তখন কাঁদছে।

শম্ভু বলে উঠল, কাঁদছ কেন তোমরা, এখন তো হাসবে।

মা সত্যি হাসার চেষ্টা করল। কান্না-মেশানো হাসি।

এখন তো মুক্তি। নতুন করে জীবন গড়ে তুলবে ইভা। শম্ভু ভাবল আমি ইভার জীবনকে নতুন করে গড়ে দেব। শুধু কিছু টাকার দরকার, টাকা পেলেই জীবন অন্য ভাবে গড়া যায়। ইচ্ছে থাকলেই।

মনে মনে ভাবল, গুপী কি ত্রিদিবেশবাবুকে কোনও সময় বলে ফেলেছে কত টাকা ওর

দরকার। তখন তো শুধু ওই চুরি যাওয়া টাকার অঙ্কটাই ভেবেছে। কিন্তু শম্ভুর মনে লোভ জেগে উঠছে। আরও, আরও টাকা। এই সংসারের অভাব মেটাতে, ইভার জন্যে।

ত্রিদিবেশবাবু তো বড়লোক, ওঁর কাছে দশ হাজার আর বিশ হাজারে কোনও তফাত আছে নাকি? তা ছাড়া উনি তো এখন শম্ভুর হাতের মুঠোয়, চাপ দিলেই বেরিয়ে আসবে। কিংবা তার প্রয়োজনও হবে না, চাওয়ামাত্র বিশ হাজার টাকাই দিয়ে দেবেন। ওঁর তো এখন শুধু মেয়ের জীবন চাই। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে পারলেই সুখী।

গুপী যদি কোনও সময় দশ হাজার টাকা বলে ফেলে থাকে, তা হলেও ওঁকে বিশ হাজারেও রাজি হতে হবে। বড় জোর শম্ভুকে ছোট ভাববেন। ভাববেন, সুযোগ বুঝে চাপ দিয়ে আদায় করে নিচ্ছে। তা ভাবুন, কিছু যায় আসে না।

—হ্যাঁ রে, গয়নাগুলো কি সব কেড়ে নিয়েছে? মা জিগ্যেস করল ইভাকে।

ইভার মুখে বিষণ্ন হাসি দেখা দিল। —নিয়েছিল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, ভেবেছিলাম পালিয়ে আসব। তাই নিজের গয়না নিজেই চুরি করেছিলাম কাল রাত্তিরে।

হাসল, কেমন একটা বিকৃত হাসি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কোত্থেকে যেন একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি বের করে মা'র হাতে দিল। বললে, সবই তো গেছে, এটুকু অন্তত বাঁচিয়ে এনেছি।

মা পুঁটলিটা নিয়ে গিয়ে তক্তপোশের ওপর রাখল। খুলে দেখল,সব ঠিক ঠিক আছে কিনা। সব আছে।

—যাক্ তবু এটুকু তো বাঁচল।

মা যেন স্বস্তি পেল। এত দুঃখের মধ্যেও। কিংবা এখন আর দুঃখ নয়। এখন মুক্তি।

কি বলবে, কি ভাবে বলবে শম্ভু ঠিক করতে পারছিল না। সঙ্কোচ হচ্ছিল।

তারপর দুম্ করে বলে বসল, আমার কিন্তু কুড়ি হাজার টাকা চাই।

ভেলোর যাবার কথাবার্তা পাকা হয়ে যাওয়ার পর ত্রিদিবেশবাবু আর টাকার কথাটা তুলছিলেন না। সেজন্যে ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছিল শম্ভু। দুম্ করে বলে দিল।

—কুড়ি হাজার! অবাক চোখে তাকালেন ত্রিদিবেশবাবু।

এত টাকা হয়তো ভাবেননি। এরা তো গরিব, কত আর চাইতে পারে।

ত্রিদিবেশবাবুর ভিতর থেকে ব্যবসাদার মানুষটা বেরিয়ে এল। গলায় হতাশার স্বর আনার চেষ্টা করে বললেন, আমি কিন্তু এমনিতেই ফতুর হয়ে এসেছি। কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্টেশন, তার খরচও প্রচুর।

বললেন, আমি তো এত টাকা ভাবিনি।

একটু থেমে বললেন, পনেরো হাজার। শম্ভুবাবু আপনি পনেরো হাজারে রাজি হয়ে যান। আর্ত গলায় বললেন, একটা মেয়ের জীবন নির্ভর করছে আপনার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুর বলে উঠতে ইচ্ছে হল, আরেকটি মেয়ের জীবন নির্ভর করছে আপনার ওপর ত্রিদিবেশবাবু।

কিন্তু বলতে পারল না। তার আগেই নার্সিংহোমের বেডের ওপর শায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

মাথা নিচু করে শম্ভু বললে, তাই দেবেন।

ও তো সারাজীবন গর্ব করার মত একটা কাজ এতদিনে করতে চলেছে। তা নিয়ে

দর-কষাকষি ভাল লাগল না।

গুপী বললে, আমি কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম, টাকাটা আগেই দিয়ে দিতে হবে।

শম্ভু বললে, হ্যাঁ, যাবার আগেই চাই। টাকাটা এক জায়গায় আমাকে মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

ত্রিদিবেশবাবু একটু উসখুস করলেন। —এখন যদি হাজার পাঁচেক দিই, কাজটা হয়ে গেলে...

শম্ভুর হাসি পেল, রাগও হল। বেশ বুঝতে পারল ত্রিদিবেশবাবু ভয় পাচ্ছেন। হয়তো বিশ্বাস করতে পারছেন না। টাকাটা নিয়ে যদি শম্ভু কেটে পড়ে। আর না আসে। অথচ, ভাবছ না কেন, আমিও তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারি। বড়লোক বলেই তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে!

কিন্তু টাকাটা যে সত্যি দরকার শম্ভুর। যাবার আগেই।

ম্যানেজার তো মাত্র সাতদিন সময় দিয়েছেন।

শম্ভু কঠিন স্বরে বললে, সব টাকা আমার আজই চাই। কিংবা কাল।

ত্রিদিবেশবাবু উঠে গেলেন। শম্ভু ভাবল, হয়তো ছেলে অনীশের সঙ্গে পরামর্শ করতে। আর উনি উঠে যেতেই নীলিমা খপ্ করে শম্ভুর হাত দুটো ধরলেন। বললেন, ও পাঁচ হাজারও আমিই দেব বাবা, তুমি কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার মেয়েকে বাঁচাও।

চাপা গলায় বললেন, ওকে বোলো না, আমি তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিয়ে দেব। বলতে বলতে হাতের কঙ্কন আর চুড়িতে হাত দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল শম্ভু। নিজের কাছে নিজেই যেন ছোট হয়ে গেল।

বলে উঠল, না না মাসিমা, চাই না চাই না।

ত্রিদিবেশবাবু ফিরে এলেন, হাতে টাকার বান্ডিল।

বললেন, সাবধানে নিয়ে যাবেন।

টাকার বান্ডিলটা হাত বাড়িয়ে নিল শম্ভু। বুকের মধ্যে একটা উন্মাদ উল্লাস। জীবন ফিরে পাচ্ছে যেন। আত্মসম্মান, মর্যাদা। বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার অস্ত্র। নিজেকে বাঁচানোর।

চাকরিটা ফিরে পাবে, ম্যানেজার আশা দিয়েছেন।

॥ ৭ ॥

ট্রেনের কামরায় ওরা চারজন।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছে যাবে। সব দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে। এখন ওরা সবাই সুখী। এত সুখ যেন আর কখনও পাননি ত্রিদিবেশবাবু।

মাসিমা হাসছেন, অনর্গল কথা বলছেন।

—তুমি বাবা আগের জন্মে আমার ছেলে ছিলে।

মাসিমার কথাটা মনে পড়ল শম্ভুর। সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন ওর বেডের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন। সেই মমতায় সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছিল শম্ভুর।

টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করে শম্ভুকে দিয়েছেন, খাও, খাও। লজ্জা কোরো

না, তুমি তো এখন আমাদের ঘরের লোক।

ঘরের লোক! কি ভাল লেগেছিল শম্ভুর।

ও তাকিয়ে দেখল উর্মিকে। জানালায় মুখ রেখে আকাশে ওড়া শঙ্খচিল দেখছে, কিংবা সবুজ। কিংবা আকাশ। নতুন জীবন পেয়ে যেন নতুন করে জেগে উঠেছে।

উর্মি ফিরে তাকাল। শম্ভুর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঈষৎ হাসল। আবার জানালায় মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকাল।

এত সুখের মধ্যেও একটা ব্যথার তার রিন রিন করে বাজছিল শম্ভুর বুকের মধ্যে।

ঘরের লোক। কিন্তু এখনই ওরা পৌঁছে যাবে। গুপীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ও। হয়তো আসবে। নিশ্চয় আসবে।

তারপরই শম্ভু চলে যাবে অন্য পথে। আবার সেই পুরনো জীবনে।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, গাড়ি আনতে বলে দিয়েছি অনীশকে। ফোনে পেয়ে গিয়েছিলাম।

মাসিমা হাসতে হাসতে বললেন, তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া করে তবে বাড়ি যাবে।

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, বাঃ, তা তো যেতেই হবে। তুমি কি স্টেশন থেকেই পালাবে ভাবছ নাকি।

এখন আর শম্ভুবাবু বলেন না। এখন শম্ভু নাকি ঘরের লোক হয়ে গেছে।

পাশাপাশি দুটো বেডে ক'টা দিন কেটেছে ওদের। শম্ভু আর উর্মি।

ফিরে আসার কথা সেদিনই শুনেছে।

বিষণ্ন মুখে উর্মি বলেছে, ফিরে গেলেই তো আপনি চলে যাবেন। জানেন, ভাবতেও খারাপ লাগছে।

শম্ভুর নিজেরও খারাপ লাগছিল। এ কটা দিন যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে ওর।

একটা অদ্ভুত সুখ। গর্ব।

হেসে বলেছে, তোমার মধ্যেই তো আমি আছি। দূরে চলে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে থাকব, সারা জীবন।

উর্মি হেসে উঠেছে। তারপর চুপ করে থেকে হঠাৎ বলেছে, আপনি খারাপ, খুব খারাপ।

—কেন?

উর্মি হেসেছে। একটা ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলেন, যে ঋণ কোনদিন শোধ দেওয়া যায় না।

চুপ করে গেছে শম্ভু, কোনও উত্তর দেয়নি।

মনে মনে ভেবেছে, কত সুন্দর একটা সম্পর্ক হতে পারত। কিন্তু মাঝখানে একটা কেনাবেচার সম্পর্ক, একটা টাকার অঙ্ক কাঁটার মত বিঁধছে।

উর্মিলা কি জানে? নিশ্চয়ই জানে না। জানলে কখনওই ঋণের কথাটা বলত না। একদিন তো জানবে, তখন হয়তো উর্মির চোখে ও ছোট হয়ে যাবে।

একটা সুন্দর ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর, বড় বড় জানালা দুপাশে। আলোয় আলো হয়ে আছে চতুর্দিক। বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসলে ছাদের পর ছাদ, গাছের ভিড়ে সবুজের পর সবুজের ঢেউ, খোলা আকাশ। এটা হাসপাতালের কোন ফ্লোর জানে না শম্ভু। শুধু মনে হয় সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা পাশাপাশি দুটি দুধ-সাদা শয্যায় একটা দ্বীপের মধ্যে বাস করছে। শম্ভু আর উর্মি।

তখনও পুরো সুস্থ হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে একটা চাপা যন্ত্রণা। কিন্তু উর্মির দিকে তাকিয়ে সব ভুলে যেত শম্ভু। সব জ্বালা-যন্ত্রণা।

পাশের বেডের ওই মেয়েটিকে আমি জীবন দিয়েছি। কি গর্ব! কি সুখ। কিন্তু উর্মি জানে না।

ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখখানা দিনে দিনে ওর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

ডাক্তার মাথুর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ইট উইল বি এ লাইফস্ এক্সপিরিয়েন্স। সো থ্রিলিং। আপনি আর উর্মিলা পাশাপাশি দুটো অপারেশন টেবিলে। আপনারা কেউ জানতে পারবেন না, আপনার শরীরের একটা অংশ উর্মিলার শরীরের মধ্যে চলে যাবে। আপনি একটি মেয়েকে, যে কিনা জীবনের কিছুই দেখেনি, উপভোগ করেনি, তাকে জীবন দান করবেন।

উর্মিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। হাউ থ্রিলিং।

সত্যি তাই। ওর মতই উর্মিও উঠে বসল। চোখেমুখে একটা জীবন্ত হাসি নিয়ে।

ত্রিদিবেশবাবু আর মাসিমা যথারীতি দেখা করতে এসে একদিন খবরটা দিলেন উর্মিলাকে। উনি কে জানিস? শম্ভুকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে ত্রিদিবেশবাবু বললেন।

—কে বাপি?

ত্রিদিবেশবাবু বললেন, কেউ যা দিতে পারে না উনি তোকে তাই দিয়েছেন।

মাসিমা হাসি-হাসি মুখে বললেন, জীবন।

শম্ভু তখন হাসছে, খুশি। তাকিয়ে দেখল উর্মি অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ওর দু-চোখে বিস্ময়। দু-চোখের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে।

ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল দুজনেই।

খুটখুট খুটখুট পায়ে শ্বেতপদ্মের মত শান্ত উজ্জ্বল সিস্টার এসে দাঁড়াল। দুজনের মাঝখানে। মৃদু হাসি। বললে, এবার আপনাদের দুজনেরই ছুটি। দুটি দীর্ঘ জীবন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, অ্যান্ড এ ব্রাইট ফিউচার।

ছুটি। বাবা-মা, ইভা, সকলের কথা মনে পড়ল শম্ভুর। ফিরে যেতে হবে। তাদের কাছে ফিরে যাবার জন্যে ও উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তারা তো ভাবছে আপিসের কাজে বাইরে গিয়েছে শম্ভু।

কিন্তু ছুটি কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বোধ করল শম্ভু। ছুটি মানেই দূরে সরে যাওয়া।

উর্মির দিকে তাকিয়ে রইল শম্ভু। জানলা দিয়ে একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে মেঝের ওপর। আর সেই আলোয় উর্মিকেও একটা শ্বেতপদ্মের মত মনে হচ্ছে।

—আমি তো আপনার সঙ্গেই রইলাম, সারা জীবন। আমার সঙ্গে কে রইল?

স্থির চোখে তাকাল উর্মি, চোখে-মুখে একটা বেদনার আভাস।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, স্মৃতি। আমাদের দুজনের সঙ্গেই।

ট্রেন এগিয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছে যাবে ওরা। তারপরই শম্ভুকে চলে যেতে হবে। আবার সেই পুরনো জীবনে।

জানলায় মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে উর্মি। কিছু কি ভাবছে!

মাসিমা হঠাৎ বললেন, আমাদের দরজা কিন্তু তোমার জন্যে সব সময় খোলা। কথা দাও আসবে মাঝে মাঝে।

শম্ভু হাসল।—আসবই তো। আপনারা তো আমাকে ঘরের লোক বানিয়ে দিয়েছেন।

ত্রিদিবেশবাবুও হাসলেন।—তুমি তো ঘরের লোকই। ঘরের লোকও এতখানি করে

না।

শুনতে ভাল লাগল শম্ভুর। এখন সেই কেনাবেচার সম্পর্কটা তাহলে ভুলে গেছেন উনি। সেই টাকার অঙ্কটা, যেটা বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে কাঁটার মত বিঁধছে।

ট্রেন থামল।

অনীশ আর শর্মিলা এসেছে। ড্রাইভার, বিপিন।

—আরে গুপী, তুই ? তুইও এসেছিস ?

গুপী হাসছে।

বড় গাড়িটা নিয়ে এসেছে ওরা।

মাসিমা বললেন, না না, তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

জোর করে নিয়ে গেলেন।

তারপর সেই বিদায়ের মুহূর্তে দরজা অবধি এগিয়ে এসেছিলেন মাসিমা।—এসো বাবা, আবার এসো কিন্তু।

অনীশ বলছে, নিশ্চয়ই আসবেন।

শর্মিলা কোনও কথা বলল না, হাসতে হাসতে শম্ভুর হাতখানা ধরল।

বললে, বাড়ি গিয়েই আমাদের সব ভুলে যাবেন না।

শম্ভু হাসছে।—ভুলতে চাইলেও কি ভুলতে পারব।

এর নাম সুখ, শম্ভুর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল।

যাবার আগে ফিরে তাকাল শম্ভু। দেখল দরজার পাশে হাত রেখে উর্মি দাঁড়িয়ে আছে। চোখ স্থির নিষ্পলক। মুখে হাসি নেই, কথা নেই। চোখের দৃষ্টিতে কি আছে শম্ভু জানে না।

উর্মি একটিও কথা বলল না। 'আবার আসবেন', সেটুকুও নয়।

লিফ্টে ত্রিদিবেশবাবুও নেমে এলেন।

ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে এস।

শম্ভু না-না করে উঠল, কিন্তু শুনলেন না।

তারপর পকেট থেকে একটা টাকার বান্ডিল বের করলেন।

—তুমি তো কুড়ি হাজারই চেয়েছিলে। এই নাও বাকিটা।

একটা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল শম্ভু। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল। টাকা। এই টাকার কথাটাই তো ও ভুলে যেতে চাইছে। ত্রিদিবেশবাবু যেন আবার মনে পড়িয়ে দিলেন।

—না না। তা হয় না। ছুটে বেরিয়ে এল শম্ভু।

সেই বিশাল গাড়িতে উঠেও আরামে শরীরটাকে এলিয়ে দিতে পারল না শম্ভু। কেমন একটা সঙ্কোচ। এই গাড়িটায় ওঠার যেন কোনও অধিকারই নেই ওর।

—কি ভাবছিস ? গুপী হাসতে হাসতে বললে, খবর জানিস ?

—কিসের ?

গুপী উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে বললে, একটা ছোট্ট দোকানঘর ভাড়া করেছি। দোকান রে, লটারির টিকিটের। দারুণ বিক্রি। ওসব দেয়ালফেয়ালে লোকে বিশ্বাস করে না, বুঝলি। দোকান চাই। পেয়েছি।

শম্ভু ধীরে ধীরে বললে, এবার চাকরিটা ফিরে পেলে হয়।

গুপী চুপ করে গেল, কোনও কথা বলল না।

ত্রিদিবেশবাবুর কাছ থেকে টাকাটা নিয়েই ম্যানেজারের কাছে চলে গিয়েছিল শম্ভু। গুনে গুনে টাকাটা দিয়েছে।

গুপী সঙ্গে ছিল, ও খুব সতর্ক। বলেছে, সই করা সেই কাগজখানা ফেরত দিন। লিখে দিন টাকাটা ফেরত পেলেন।

তারপর কাগজটা ফেরত নিয়ে শম্ভু অসহায়ভাবে বলেছে, চাকরিটা থাকবে তো ম্যানেজারবাবু ! আমার যে চাকরিটা ভীষণ দরকার।

—হবে হবে। সান্ত্বনা দিয়েছেন ম্যানেজার। —এখন তো স্যার খুব রেগে আছেন, আপনি মাসখানেক পরে আসুন। আমি ওঁকে বুঝিয়ে নরম করি আগে।

বলে হেসেছেন।

ম্যানেজারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শম্ভু।

হিসেবের খাতা দেখছিলেন ম্যানেজার। একমনে অঙ্ক মেলাচ্ছিলেন। মাথা তুলেও দেখলেন না।

—ম্যানেজারবাবু !

শম্ভু ধীর গলায় ডাকল। চাকরিটা যে খুবই দরকার, সেজন্যেই বোধহয় গলাটা কেঁপে গেল।

ম্যানেজার চোখ তুলে তাকালেন। ওকে দেখে যেন একটু বিব্রত হলেন।

তারপরই রূঢ় গলায় বলে উঠলেন, না মশাই না, চাকরি-বাকরির আশা ছাড়ুন। আমি বলে দেখেছি। স্যারের রাগ পড়ছে না, বলছেন যে একবার চুরি করতে পারে...

বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল শম্ভু। ওর চোখে জল এসে গেল। ও যে অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। চাকরিটা ওর চাই।

বললে, আমি তো চুরি করিনি ম্যানেজারবাবু। তবু দিয়েছি টাকাটা। আপনি ভাবতে পারবেন না, কিভাবে জোগাড় করেছি।

ম্যানেজার বিরক্ত হলেন। —যান যান, ওসব হবে না। আপনার ভাগ্য ভাল, টাকাটা ফেরত দিয়ে রেহাই পেয়ে গেছেন। স্যার চাইলে আপনাকে জেল খাটাতে পারতেন।

আশপাশের দু-একজন হেসে উঠল।

লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল শম্ভুর। ওর পায়ের তলায় তখন আর মাটি নেই। সমস্ত বুক জুড়ে শুধু হতাশা।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

কোথায় আর যাবে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ অবধি সেই গুপীর দোকানে।

দোকানটা সেদিনই চিনিয়ে দিয়েছিল গুপী।

এসেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল।

গুপী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি রে, কি হল ?

—চাকরিটা দিলে না মাইরি। বললে, আমি টাকা চুরি করেছিলাম, আমাকে কোনও বিশ্বাস নেই।

গুপী বললে, আমি জানতাম। শালা হারামি। আমি তো সেজন্যেই ওদের কাছ থেকে আর টিকিট নিই না। অন্য এজেন্ট ধরেছি।

চুপ করে রইল শম্ভু। হতাশায় ভেঙে পড়া একটা শরীর।

গুপী হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। —রাখ তোর চাকরি, এত ভাবছিস কেন। আরে এটা তো তোরও দোকান, মনে নেই তোর, আমরা তো দুজনেই শুরু করেছিলাম।

একটু থেমে বললে, ভেবে দেখ, দুজনে মিলে যদি দোকানটা চালাই...দারুণ বিক্রি রে, দারুণ। হাসতে হাসতে বললে, কোনও কিছুতেই তো এখন আর মানুষের বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস শুধু একটা জিনিসেই—লটারিতে। ভাগ্য, বুঝলি, মানুষ এখন আর ভাগ্য ছাড়া

কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

কথাগুলো কানেও গেল না শম্ভুর। ওর মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাজছে একটাই কথা। আরে এটা তো তোরও দোকান, মনে নেই তোর, আমরা তো দুজনেই শুরু করেছিলাম।

অবাক হয়ে গেছে ও। গুপী ওকে বার বার অবাক করে দিচ্ছে। অথচ চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও শুধু নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছিল।—টিকিট বিক্রির ব্যবসা তুই চালা গুপী। দরাজ বুকে বিলিয়ে দিয়েছিল, কারণ তখন তেমন কিছু লাভই হত না।

কি করবে কিছুই ভেবে পেল না ও।

একটাই ভরসা, ত্রিদিবেশবাবু। উনি তো ব্যবসাদার মানুষ, কত লোকের সঙ্গে আলাপ, একটা কিছু জুটিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু তাঁকে বলতে সঙ্কোচ। উনি বাকি টাকাটা দিতে গিয়েছিলেন, মেয়েকে বাঁচিয়ে ফিরে নিয়ে এসেছেন, হয়তো সেই আনন্দে। কিন্তু শম্ভু নেয়নি।

এখন যদি চাকরির কথা বলে ও, ত্রিদিবেশবাবু নিশ্চয় ভাববেন, ওটা ওর চালাকি, টাকা না নিতে চেয়ে ভালমানুষ সেজেছে।

নিজেরই অজান্তে অপারেশনের জায়গায় কাটা দাগটার ওপর হাত বোলাল। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, একেবারে সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। কিন্তু দাগটা রয়ে গেছে। ওটা সারা জীবন থাকবে। ওটা লুকিয়ে রাখতে হবে ইভার কাছ থেকে, বাবা-মার কাছ থেকে। সবচেয়ে বড় কষ্ট, লুকিয়ে রাখতে হবে নিজের কাছ থেকে।

ত্রিদিবেশবাবুদের বাড়িতে গিয়ে ও সেজন্যে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না।

মাঝে মাঝেই চলে যেত। কিন্তু চাকরির কথাটা বলতে পারত না।

নীলিমা আপ্যায়ন করে বসাতেন। গল্প করতেন।

চেঁচিয়ে ডাকলেন, ঊর্মি, আয় দেখে যা কে এসেছে।

শর্মিলাও ছুটে এল। অনুযোগ করল, আপনি তো আসেনই না।

ত্রিদিবেশবাবু অনীশ সবাই মিলে একদিন কতক্ষণ কতক্ষণ গল্প হাসি, হাসপাতালের দিনগুলোর টুকরো-টুকরো স্মৃতি তুলে আনছিল ওরা। ত্রিদিবেশবাবু, মাসিমা, ঊর্মি।

তখন সেরে উঠেছে দুজনেই। ডাক্তার বললেন, সিস্টারের সঙ্গে হাসপাতালের বাগানে সকালে একটু একটু করে হাঁটুন। একেবারে সেরে না উঠলে আমি ছুটি দেব না।

ঊর্মি আর শম্ভু পাশাপাশি হাঁটত, গল্প করত। হাসি, আনন্দ।

সিস্টার বাইরের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে থাকত। দেখত ওদের।

সিস্টার তো কিছুই বুঝত না, ওদের ভাষাও নয়।

একদিন হাসতে হাসতে শম্ভুকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করেছিল, আপনার গার্ল ফ্রেন্ড, তাই না?

শম্ভু কোনও জবাব দিতে পারেনি। অস্বস্তি লেগেছে।

সিস্টার হেসে উঠে বলেছে, লজ্জা পাচ্ছেন কেন!

তারপর একটু থেমে বলেছে, প্রেমের জন্যেও এতখানি কেউ করে না।

কাঁটা কাঁটা। বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা।

সিস্টার তো জানে না, শম্ভু টাকার জন্যে নিজেকে বিক্রি করেছে। অনেক নীচে নেমে গেছে ও। সেখান থেকে উঠে আসার কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

হাসপাতালের বাগানে ভোরের হাওয়া মেখে বেড়াতে বেড়াতে ঊর্মি একদিন বলে উঠেছে, আমার কেমন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলেছি।

আর শম্ভুর মনে হয়েছে, স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন।

ওই কাটা দাগটার ওপর হাত বোলালেই মনে পড়ে একটা দুঃস্বপ্নের দিন পার হয়ে

এসেছে ও। কিন্তু দুঃস্বপ্নের স্মৃতিটা ওকে কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছে না।
একদিন তো ঊর্মি জানতে পারবে। তখন তো ওর চোখে কৃতজ্ঞতাটুকুও থাকবে না।
প্রথম যেদিন ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হল, মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল। ঊর্মি হয়তো জেনে গেছে।
কিন্তু না। ওঁদের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল শম্ভু। কি আন্তরিকতা।
জোর করে খাইয়ে ছেড়েছিলেন নীলিমা।
খাওয়ার টেবিলে ওরা পাশাপাশি। হাসি, গল্প। ঊর্মি ওর পাশেই বসেছিল।
ও চলে আসছে, বেশ রাত হয়েছে তখন, ত্রিদিবেশবাবু বললেন, যেতে অসুবিধে হবে না তো? দেখ, যদি বলো গাড়িটা...
—না না, এইটুকু তো পথ।
হাসতে হাসতে চলে এসেছিল লিফ্‌টে নেমে।
শুধু একটু খিচখিচ করে লেগেছিল বুকের মধ্যে। লিফ্‌টে নীচে অবধি কেউ নেমে এল না কেন? জোর করে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন না কেন ত্রিদিবেশবাবু।
মনে পড়ল অনীশ আর শর্মিলাও ছিল না ওর চলে আসার সময়ে।
তা হলে কি সবটাই ভদ্রতা। শুধু সৌজন্য!
তবু কি এক দুর্বোধ্য টানে ও মাঝে মাঝেই গিয়ে হাজির হয়েছে।
আর প্রতিবারই মনে হয়েছে ওরা ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।
এক একদিন ঊর্মিকে আর ডাকেই না। ও শুধু অপেক্ষা করে। যদি আসে। জোরে জোরে কথা বলে, যদি শুনতে পায়।
—ঊর্মি কই? ওকে তো গতবারে এসেও দেখিনি।
শেষ অবধি মুখ ফুটে বলেই ফেলেছে।
ঊর্মিকে ডেকেছেন নীলিমা। সে এসে বসেছে, কথা বলেছে।
—আপনার কোনও কমপ্লেন নেই তো? অনীশ জিগ্যেস করেছে।
তারপর ঊর্মিকে বলেছে, তুই এবার যা, রেস্ট নিবি।
ঊর্মি চলে গেছে, এক-টুকরো মৃদু হাসি পুরস্কার দিয়ে।
শম্ভু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, ওদের কাছ থেকে ও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ওদের কাছে আর ওর কোনও দাম নেই। যা আছে তা শুধু ভদ্রতা। শুধু সৌজন্য।
এর পর সেটুকুও হয়তো থাকবে না। স্মৃতি হয়ে থাকবে শুধু একটা কাটা দাগ। ওটা কোনদিন মিলিয়ে যাবে না।
এই তাচ্ছিল্য, এই বিরক্তি, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল শম্ভু। তাই কলিং বেল-এর সুইচটা টিপতে গিয়েও অস্বস্তি হচ্ছিল।
এতখানি পথ কোনও দুর্বোধ্য টানে এসে পৌঁছেও একবার ভাবল ফিরে যাবে কিনা। হাতটা কেঁপে গেল। তবু শেষ অবধি সুইচ টিপল ও।
পিয়ানোর টুংটাং ধ্বনি করে বেলটা বেজে উঠল দরজার ওপারে।
বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল শম্ভু। না, কেউই এসে দরজা খুলল না।
শম্ভু এক মুহূর্ত ভাবল ফিরে চলে যাবে কিনা। এ বড় অস্বস্তি। ও বেশ বুঝতে পারছে এ-বাড়িতে ওর আর কোনও গুরুত্ব নেই। তবু কি একটা দুর্বোধ্য টানে বার বার চলে আসে।
ঊর্মিলা কি? শম্ভু ঠিক বুঝতে পারে না। ও তো নিজের মনকে বোঝায় ত্রিদিবেশবাবুর কাছে চাকরির কথাটা পাড়বে বলেই আসে, সঙ্কোচ হয় বলে বলতে পারে না। কখনও মনে হয় মাসিমার আন্তরিকতার টানেই চলে আসে।

কলিং বেল-এর সুইচটা টিপল।

ঠিক মনে পড়ল না, প্রথম যেদিন এই ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল-এর সুইচ টিপেছিল, সেদিন আওয়াজটা কি এমনি পিয়ানোর মত বেজে উঠেছিল! কেমন যেন মনে হচ্ছে তখন ক্রার ক্রার ধ্বনি তুলে সারা বাড়িতে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিত কলিং বেলটা।

বেল বাজতে না বাজতে ত্রিদিবেশবাবু নিজেই এসে দরজা খুলেছিলেন। হয়তো সেদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। অনীশ যেন সে-রকম কি একটা কথা বলেছিল। কিন্তু এখন আর ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করে না। করে না বলেই আসতে দ্বিধা হয়। তবু আসে।

দ্বিতীয়বার বেল্ বাজানোর অল্পক্ষণ পরে দরজা খুলল। শর্মিলা। মুখে হাসি এনে তার দিকে তাকাতেই হাসিটা থমকে থেমে গেল। শর্মিলার ভুরুতে স্পষ্ট বিরক্তি দেখতে পেল।

তারপরই মুখের ভাব পাল্টে নিয়ে বলল, ও, আপনি? মুখে একটু হাসি আনার চেষ্টা করে বলল, আসুন।

শর্মিলার পিছনে পিছনে শম্ভু দামি কার্পেট মাড়িয়ে শোফা কৌচগুলোর দিকে যাচ্ছিল, শর্মিলা স্মার্ট ভঙ্গিতে জিনসের লম্বা লম্বা পা ফেলে যেতে যেতে বাঁ হাতের তর্জনীতে ডিভান দেখিয়ে দিয়ে বললে, বসুন।

পিছন ফিরে ভাল করে তাকালও না, মাকে খবর দিতে চলে গেল।

শর্মিলা ওকে যে রীতিমত অগ্রাহ্য করছে কিংবা তাচ্ছিল্য, ইদানীং তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। শুধু শর্মিলা নয়, বোধহয় সকলেই।

ওদের ভাবেভঙ্গিতে ফুটে ওঠে, এ লোকটা আবার আসছে কেন? পাওনাগণ্ডা সবই তো চুকিয়ে দিয়েছি, তবে আর কি চায়।

টাকা-পয়সা। বুকের মধ্যে কাঁটাটা খিচখিচ করে উঠল। কেমন মনে হল, এরা এখন সকলেই শম্ভুকে ছোট ভাবছে। ওর মনের ভুল কিনা কে জানে। কিন্তু কথাটা তো সত্যি। ও তো অনেক নীচে তলিয়ে গেছে। ডাক্তার মাথুরের কথামত ওর এখন সত্যিই সারা জীবন গর্ব করার মত কিছু নেই। আছে শুধু ওই কাটা দাগটা, যেটা সব সময় মনে পড়িয়ে দেয় ও টাকার বিনিময়ে একটা কিডনি বিক্রি করেছিল।

মাসিমা একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে আসতেই শম্ভুর অস্বস্তি কেটে গেল।

—এদিকে এসেছিলাম কাজে, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

মুখে হাসি এনে শম্ভু বললে।

আসলে ও যে কয়েকদিন ধরেই ভাবছে একবার আসবে, ভিতর থেকে ওকে এই ফ্ল্যাট, এই মানুষগুলো, ঊর্মি অপ্রতিরোধ্যভাবে টানছিল, ভেবেচিন্তেই এসেছে, সে-কথা বলতে পারল না।

কথাগুলো নিজের কানেই কেমন অজুহাতের মত শোনাল।

—বাঃ আসবে বই কি। ভালই করেছ, তাছাড়া ওঁরও তো ফেরার সময় হয়ে এল। অর্থাৎ ত্রিদিবেশবাবু।

যেন ত্রিদিবেশবাবুর সঙ্গেই দেখা করতে ও এসেছে।

শম্ভুর একবার মনে হল মাসিমাও এড়িয়ে যেতে চাইছেন। শম্ভু আসাতে খুশি নন, স্বামী ফিরে এলেই তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে রেহাই পেতে চান।

—তোমার আর কোনও কমপ্লেন নেই তো!

শম্ভু হেসে বললে, না না, ওসব আমি ভুলেই গেছি।

ওর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ও এলে এরা হয়তো কিছুটা উদ্দেশ্য আছে মনে করে।

সত্যি কি উদ্দেশ্য আছে ? তা হলে চাকরির কথাটা একবারও বলতে পারল না কেন। একটা কথা মনে পড়তে হাসি পেল। ভাবে না তো, সেই বাকি পাঁচ হাজার টাকা না নেয়ার জন্যে অনুতাপ হয়, সেটাই ফিরিয়ে নিতে আসে, লজ্জায় বলতে পারে না !

ত্রিদিবেশবাবু যখন টাকাটা দিতে এসেছিলেন ও নিতে চায়নি। তখন উনি বলেছিলেন, নিচ্ছ না ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাছে জমা রইল, যখনই দরকার পড়বে নিয়ে যাবে।

সত্যি কি ওরা ভাবতে পারে, ওই টাকাটা ও ফেরত চায়।

এই কেনাবেচা ব্যাপারটার জন্যেই তো ও ভেতরে ভেতরে মরে আছে। এদের কাছে ও ছোট হয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, একটা পারস্পরিক ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য এনে দিয়েছে। ভিতরে ভিতরে ওরা টাকা-পয়সার সম্পর্কটা দেখছে বলেই তো শম্ভুও ওদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে। একটা চাপা রাগ থেকে থেকে ওকে বিষিয়ে তোলে।

ও ভাবছিল ঊর্মি একবার আসবে। দেখতে পাবে, দুটো কথা বলবে। কিন্তু মাসিমা ঊর্মিকে ডাকলেন না। আজকাল কেউই ডাকে না। ঊর্মি নিজেও তো চলে আসতে পারে, আসে না কেন। সেও কি টাকা-পয়সার কথাটা জেনে গেছে বলেই ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করে ?

এমন আধুনিকতার হাওয়া লাগা বাড়িতে নিশ্চয়ই এসে বসে কারও সঙ্গে গল্প করা বেমানান কিছু নয়। শম্ভুর সঙ্গে গল্প করা তো নয়ই। তবে।

—আমি অসময়ে এসে, মাসিমা, আপনাদের কোনও অসুবিধে করলাম না তো ?

মাসিমা হেসে বললেন, না না, কি যে বলো তুমি।

বললেন, বোসো, তোমার চা আনছি।

চা-খাবার এল। অকারণ অনেক সময় কেটে গেল। ভিতরে ভিতরে শম্ভু অধৈর্য হয়ে উঠছে।

শেষে বলেই ফেলল, মাসিমা, ঊর্মি কি নেই নাকি ? না খুবই ব্যস্ত ?

মাসিমা বললেন, না না, আছে। জানি না হয়তো ঘুমোচ্ছে। দেখছি।

তারপরেও বসে রইলেন, হয়তো শম্ভু 'না না আপনি বসুন' বলায়।

হঠাৎ এক সময় শম্ভু দেখল পর্দা সরিয়ে ঊর্মি এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখোচোখি হল, আর ঊর্মি বলে উঠল, আরে আপনি ! কখন এলেন ? কেউ বলেনি তো।

'কেউ বলেনি' কথাটা খট করে কানে লাগল। অর্থাৎ শর্মিলা গিয়ে খবরটা দেয়নি। কেন দেয়নি ? মাসিমাও তো এখান থেকেই ওকে ডাকতে পারতেন !

আসলে ও বুঝতে পারছে ওর আসাটা আর কেউ পছন্দ করছে না। কারণ, ও তো একেবারে নিচুতলার একটা মানুষ, যে কিনা টাকার লোভে একটা কিডনি বিক্রি করতে পারে।

একটু আগেও শম্ভু যখন বলেছে, অসময়ে এসে অসুবিধে করলাম না তো, মাসিমা বলে উঠেছেন, না না, কি যে বলো তুমি, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলের মত।

'ঘরের ছেলে' কথাটা এখন ঠাট্টা মনে হয়।

মানুষ যখন মানুষের জন্যে কিছু করে, শম্ভু তার শরীরের একটা অংশ, একটা কিডনি দিয়েছিল বিপদের ঝুঁকি নিয়েও, মৃত্যুও হতে পারত, তখন শম্ভুও মানুষ হিসেবে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিল। ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিল। এখন টাকা-পয়সার সম্পর্কটাই ওদের চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই শম্ভু নীচের তলায় আবার নেমে গেছে। এখন ওরা দুটো পৃথক শ্রেণী।

শম্ভুর নিজেরও মনে হয় ও অনেক নীচে নেমে গেছে।

কলিংবেল আবার বেজে উঠল।

ত্রিদিবেশবাবু এলেন, পাম্‌শু মচমচিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন শম্ভুকে দেখেও।

একটু পরেই এলেন. ভাবে-ভঙ্গিতে ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাব, এসেই উর্মিকে বললেন, তুই যা।

হেসে 'যাই' গোছের ঘাড় নেড়ে উর্মি চলে গেল।

—আমার আবার একটু তাড়া আছে, বুঝলে শম্ভু।

ত্রিদিবেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

শম্ভুও বিদায় নিয়ে চলে এল। চলে আসার সময় অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, এমনিই এসেছিলাম, মাঝে মাঝে মনে পড়ে, চলে আসি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো আসবেই।

শম্ভু বললে, তা ছাড়া একটা উপকার তো করছিলেন, ভুলব কি করে।

বলে হাসল।

নীলিমা এগিয়ে এলেন, বললেন, আবার এসো।

বেরিয়ে এসে শম্ভু লিফটের জন্যে অপেক্ষা না করে সিঁড়ির দিকেই এগিয়ে গেল আর কেমন মনে হল দরজাটা বড় তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

একসময় শম্ভু স্বপ্ন দেখত ওদের এই অন্ধকূপ ঘর-বারান্দা দরমার আড়াল ক্যানেস্তারা দিয়ে বানানো পিছল পিছল কলঘর নিয়ে যেটাকে ওরা বাড়ি বলে, যেটাকে আশ্রয় বলে জেনে এসেছে, তা থেকে মুক্তি পাবে। ও স্বপ্ন দেখত সংসারটার চেহারা বদলে দেবে, মানুষের মত বাঁচবে।

মানুষের মত বাঁচার নাম কি টাকা ? অনেক অনেক টাকা ? যা দিয়ে ছোটকাকার মত কিংবা তার চেয়েও ভাল ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়া যায়। টাকা দিয়ে যা কিছু কিনতে পারা যায়, ভোগের সামগ্রী, তা কিনতে পারলেই কি মানুষের মত বাঁচা যায় !

শম্ভু ভেবে ঠিক করতে পারে না। এখন আর ও কোনও স্বপ্ন দেখে না, কিংবা অন্য রকমের স্বপ্ন দেখে।

ত্রিদিবেশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে হল ওর সর্বাঙ্গে যেন গ্লানি মেখে আছে। যেন বৃষ্টিধোয়া রাস্তা দিয়ে এইমাত্র একটা গাড়ি স্পিডে বেরিয়ে গেল ওর সারা শরীরে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে।

চোখ ফেটে জল আসছিল ওর। এতখানি অপমান, এত তাচ্ছিল্য পাবে আশঙ্কা করেনি কোনদিন। ও হেসে হেসে ওদের এই ব্যবহার গায়ে না মাখার চেষ্টা করেছে, ভাব দেখিয়েছে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। যেন তাতে আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখা যায়।

মুখে যতই ঘরের লোক বলুক, আসলে ওকে যে ওরা বাইরের লোক করে দিতে চায়, তা দিনে দিনে টের পাচ্ছিল। আজ ওর পিছনে দরজাটা বন্ধ করতে একটুও সময় নিলেন না মাসিমা। 'মাসিমা', শম্ভুর হাসি পেল। দুঃখের হাসি।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কোনদিন যাবে না এই তাচ্ছিল্য সহ্য করতে।

উর্মির জন্যেই যাওয়া। কি একটা দুর্বোধ্য টানে বারবার গিয়ে হাজির হয়েছে। প্রেম-ভালবাসার কথা ও ভাবতেই পারে না। ওরা তো এখন আবার অনেক ওপরে উঠে গেছে, আর শম্ভু যেখানে ছিল, নীচেই, তা থেকে নীচে নেমে গেছে। অন্তত ওর নিজের

তাই মনে হয়।

তবু উর্মি কাছে এসে বসলে, কথা বললে, ভাল লাগত। নিজেকে দামি মনে হত। বুকের মধ্যে কেমন একটা গর্ব। এই মেয়েটিকে তো আমিই বাঁচিয়েছি। জীবন দিয়েছি। নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে।

সেই ধারণাটাও বদলে যাচ্ছে।

ত্রিদিবেশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও মনে মনে উচ্চারণ করল, শালা। কারও বিরুদ্ধে ? নাকি নিজেরই বিরুদ্ধে ?

ভেবে ঠিক করতে পারল না কোথায় যাবে। একবার ভাবল আশুর চায়ের দোকানেই চলে যাই। হয়তো গুপী এতক্ষণে ওখানেই গিয়ে বসেছে। তারপরই মনে হল, না, গুপীর দোকান হয়তো এখনও বন্ধ হয়নি। সেখানেই যাওয়া যাক।

ঝপ্ করে একটা ভিড়ের বাসে উঠে পড়ল। এসে নামল গুপীর দোকানের সামনে।

গুপী বসে বসে হিসেব মেলাচ্ছিল। ওকে দেখে বলল, আয়।

আঙুল দিয়ে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে হিসেবের খাতায় টিক্ মারতে লাগল। অন্যমনস্ক হলে ভুল হয়ে যাবে বলেই কথা বলল না।

শম্ভু চেয়ারটায় বসল। তারপর হঠাৎ বললে, ওদের কাছে এখন আর আমার কোনও দাম নেই। ওর গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

গুপী চোখ তুলে তাকাল ওর মুখের দিকে। —কাদের কাছে ?

—ত্রিদিবেশবাবু। আজ গিয়েছিলাম।

—কেন যাস।

শম্ভু হাসল, বিষণ্ণ হাসি। বললে, এরপর গেলে হয়তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।

গুপী হেসে বললে, না রে। পয়সাওলা লোকরা ওসব করে না। ওরা শুধু হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়। তুই তো একটা ইডিয়েট, তাই এখনও যাস।

শম্ভু কোনও কথা বলল না। গুপী ঠিকই বলছে। ও একটা ইডিয়েট। বুঝেও বুঝতে চায়নি।

ওদের চোখে শম্ভু তো একজন ফেরিওয়ালা, যে একদিন ওর নিজের শরীর থেকে একটা কিডনি উপড়ে ঝোলার মধ্যে নিয়ে হাজির হয়েছিল। ওদের পছন্দ হয়েছিল, প্রয়োজন ছিল তাই কিনেছে। অথচ সেই ফেরিওয়ালাটা বলতে চাইছে সে খুব বড়একটা কাজ করেছে, একটা মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে।

ডাক্তার মাথুরের কথাগুলো এখন উপহাসের মত মনে হয়।

ও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ডাক্তার মাথুর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, শম্ভুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন।

জীবনে সেই প্রথম ও সকলের কাছ থেকে সম্মান পাচ্ছে।

পৃথিবীতে তার কোথাও কোনও প্রয়োজন নেই, কারও কাছ থেকে কোনও সম্মান যার প্রাপ্য নয়, সেই শম্ভু তখন যেন নিজেকে একটা অন্য ভূমিকায় আবিষ্কার করছে। ডাক্তার মাথুর বলছেন, ইটস্ আ গ্রেট কজ। দেখবেন সারা জীবন আপনার গর্ব হবে কিছু করেছি, আই হ্যাভ ডান সামথিং।

শম্ভু বিশ্বাস করেছিল।

শম্ভু দেখতে পাচ্ছে ও জুতো খুলে রেখে পেশেন্টের ঘরে ঢুকছে ডাক্তার মাথুরের পিছনে পিছনে।

সাদা পোশাকে দুজন নার্স দুপাশে। মাঝখানে সাদা ধবধবে চাদরের বেড়-এ অসহায়

রোগশীর্ণ একটি সুন্দর মুখ !

তাকে দেখিয়ে ডাক্তার মাথুর বলছেন, ইউ আর স্ট্যান্ডিং বিটুইন হার লাইফ অ্যান্ড ডেথ।

ত্রিদিবেশবাবু দুহাতের তালু মেলে দিয়ে হতাশ গলায় বলছেন, সবই ভগবানের হাত।

আর মাসিমা শম্ভুকে বলে উঠছেন, এখন তুমিই আমাদের ভগবান।

শম্ভু মনে মনে বললে, এখন সেই ভগবানের স্বর্গ থেকে পতন ঘটেছে। কারণ, তুমি বিপদে পড়ে কিছু টাকা নিয়েছিলে। তুমি একটা কিডনি দান করে ত্রিদিবেশবাবুদের চেয়ে আরও অনেক ওপরে উঠে যেতে পারতে। অন্তত নিজের কাছে। তার বদলে তুমি একটা কিডনি বেচে দিয়ে নীচে নেমে গেছ, একেবারে নীচে।

মনে মনে ভাবল, আমি আর মানুষ হয়ে বাঁচতে পাব না, তবু যদি মানুষ হয়ে মরতে পারতাম। এমন হয় না, ঊর্মির মত আবার কোনও মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্যে একটা কিডনি দরকার ? আর আমি আমার অবশিষ্ট কিডনিটা দান করে তাকে বাঁচিয়ে তুললাম। তা হলে তো এই গ্লানি থেকে আমিও বেঁচে যাব !

পরক্ষণেই হাসি পেল শম্ভুর। সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষোভ ফিরে এল।

চাপা রাগের গলায় বললে, ওই ত্রিদিবেশবাবুটা, জানিস গুপী, জিগ্যেস করল কি করছি। বললাম কিছুই না। তবু একটা চাকরির কথা বলল না।

হেসে বললে, ও দিতে চাইলেও আমি নিতাম না। তবু সান্ত্বনা পেতাম লোকটা ভুলে যায়নি, ওরাও আমার কাছে ঋণী।

গুপী হিসেবের খাতাটা বন্ধ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুই ওঠ তো। ওঠ ওখান থেকে।

গুপীর গলায় এমন একটা আদেশের ভাব ছিল, বুঝতে না পেরে শম্ভু উঠে দাঁড়াল।

গুপী বললে, এদিকে আয়। বোস এই চেয়ারে।

ওকে জোর করে বসিয়ে দিল গুপী। বললে, কাল থেকে তুই এখানে বসবি।

রেগে গিয়ে বললে, শালার কেবল চাকরি আর চাকরি। জানিস এ-দোকানটা আমার একার নয়, তোরও।

তারপর হেসে উঠে বললে, দুজনে মিলে যদি লেগে পড়ি, দেখবি দেখবি।

চাবির থোকাটা ওর সামনে ফেলে দিল গুপী।

শম্ভু অবাক হয়ে বললে, তুই সত্যি বলছিস ?

দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে এল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে আশুর চায়ের দোকানের দিকে এগোল। এখনও চায়ের দোকানটা খোলা পাওয়া যাবে। দুজনে বসে বসে স্বপ্ন দেখবে।

স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই বাড়ি ফিরল শম্ভু। সেই ঘিঞ্জি গলি পার হয়ে অন্ধকূপ ঘরের দরজা। মা রাগে বিরক্তিতে বলছে, এই শুয়োরের খোঁয়াড়ে মানুষ থাকে না। এতটুকু আলো নেই, বাতাস নেই। শোবার জায়গা নেই। ভেবেছিলাম ছেলেটার চাকরিবাকরি হলে সুখের মুখ দেখব...

—জানিস ইভা, আমি আর গুপী দুজনে মিলে একটা ব্যবসা করছি। লটারির টিকিট বিক্রির ব্যবসা।

ইভা বিষণ্ণ মুখে বলছে, জীবনটা তো লটারিই।

শম্ভু হেসে উঠল।—শোন ইভা, ওই দুঃখী দুঃখী ভাবটা ঝেড়ে ফেল। একবার টিকিট কেটে লটারি না উঠলেই কোনদিনই পাব না ভাবিস কেন। একদিন তো উঠতেও

পারে।

—মা জানো, আমরা একটা ব্যবসা করছি। অনেক টাকা হবে, অনেক।

তারপর, শম্ভু স্বপ্ন দেখে, এই বাড়িটা, এই অন্ধকার ঘর ছেড়ে ওরা একটা সুন্দর ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। ছোটকাকার মত ফ্ল্যাট, ছিমছাম। কিংবা তার চেয়েও ভাল। মা, তুমি একবার বলেছিলে না, একসময় তোমার একটা কড়িয়াল শাড়ি কেনার ইচ্ছে ছিল, পুজোর সময় পরে বিজয়ার দিনে সিঁদুর খেলবে, কাকে যেন পরতে দেখেছিলে ? চলো আজই কিনে দেব, তোমার পছন্দমত। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এখন অনেক টাকা। আমি আর গুপী, দেখো তুমি, কিছুদিনের মধ্যেই বড়লোক হয়ে যাব।

ইভা বললে, দাদা, তোরা তো ব্যবসা করবি। এই নে সেই পাঁচ হাজার টাকা। তুই যাবার আগে দিয়ে গিয়েছিলি, সেই যে মনে আছে তোর, বাইরে গেলি, তোর তো কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই, একটা মাস খবর নেই। এই নে সেই পাঁচ হাজার, একটা পয়সাও খরচ করিনি।

শম্ভু স্বপ্ন দেখছে। বলছে, ইভা, তোর কলেজে যেতে আসতে বড় কষ্ট হয়, না রে ! এই নে, রাখ টাকাটা, তুই আর প্রাইভেট বাসে যাস না, মিনিবাসে তবু একটু ভিড় কম। আর, দুপুরে টিফিন খাবি, শরীরটা সবার আগে, শরীর থাকলে তবে তো লেখাপড়া।

ইভা বলছে, তোর টাকা আমি ছোঁব না, ছোঁব না। মনে আছে তোর, তুই বইয়ের ফাঁকে টাকা রাখতিস, নিজেই হিসেব ভুল করেছিলি, আর বলেছিলি আমি নাকি তোর টাকা চুরি করেছি। আমি সেদিন সারা রাত কেঁদেছিলাম, তুই জানিস ? আমি জানতাম কোথায় লুকিয়ে রাখিস, তবু কোনদিন নিইনি।

শম্ভু বলছে, দূর বোকা মেয়ে, আমি আবার কবে তোকে চোর বলেছি। সে তো অন্য লোক, তার নাম দারিদ্র্য। অভাবে পড়লে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

শম্ভু বলছে, তুই জানিস না, অভাবে না পড়লে আমি আজ বড়লোক না হয়ে বড় মানুষ হতে পারতাম। এই যে কাটা দাগটা...

শম্ভু ওর কাটা দাগটার ওপর হাত বোলাল। মনে মনে বললে, এই কাটা দাগটায় যখনই হাত পড়ে যায়, আমার নিজেকে এত ছোট লাগে ! অথচ জানিস, হবার কথা ঠিক উল্টো। দাগটায় হাত পড়লেই আমার বুক গর্বে ফুলে ওঠার কথা। তোদের কাছ থেকে তো দাগটা লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারিনি। কোনদিন লুকিয়ে রাখতে পারব না।

শম্ভু স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মতই তো মনে হয়।

হাসপাতালের বাগানে পাশাপাশি হাঁটছে শম্ভু আর উর্মি। সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে গোল করে সাজানো ফুলের বেড পার হয়ে যাবার সময় একটা ফুল তুলে নিল শম্ভু।

কিন্তু উর্মিকে দিতে সাহস পেল না।

উর্মি শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

তারপর হঠাৎ বললে, বাঃ রে, দেবেন তো ফুলটা।

হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আপনি তো এক্ষুনি এটা ছিঁড়ে নষ্ট করতেন।

বলে ফুলটা নিজের চুলে গুঁজল।

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছে, আচ্ছা, আপনার একটুও ভয় করেনি ? কি করে পারলেন ?

শম্ভু হাসছে।

হাসতে হাসতে বললে, ওই যে বারান্দায় বেতের চেয়ারে সিস্টার বসে আছে ও কি ভেবেছে জানো ?

—ও তো আমাদের ওপর চোখ রাখছে, ভাবছে আমরা এখনও সেরে উঠিনি।

শম্ভু বললে, হুঁ।

আর কোনও কথা না বলে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল ওরা।

মাঝে মাঝে ফুলের বেড, গাছে ফুল। ঊর্মি তার ওপর দিয়ে হাতটা বুলিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ, কই বললেন না তো। কি ভেবেছে সিস্টার ?

অস্বস্তি কাটানোর জন্যে শব্দ করে হাসল শম্ভু। বললে, ভেবেছে আমরা দুজন নাকি প্রেমিক-প্রেমিকা।

শম্ভু আবার হেসে উঠল।

—কি বললেন ওকে ? মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ঊর্মি প্রশ্ন করল।

শম্ভু কোনও উত্তর দিল না।

এখন ওসব স্বপ্ন হয়ে গেছে। একটা দুঃস্বপ্ন। এখন আর ঊর্মি কোনও কথাই জানতে চাইবে না। ও জেনে গেছে শম্ভু কোনও আশ্চর্য মানুষ নয়। কারণ শম্ভু তো শুধুই টাকার বিনিময়ে একটা কিডনি বিক্রি করেছে।

গুপী, আমরা যদি এই দোকানটা আরও আগে করতাম। আমি সেদিন স্বার্থপরের মত তোকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। অথচ তুই দিব্যি বলতে পারলি, এটা তো তোরও দোকান।

শম্ভু স্বপ্ন দেখছে। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য স্বপ্ন।

গুপী বলছে, তুই তো আমাকে অবাক করে দিলি শম্ভু। আমি তো এতসব জানতামও না, কোন টিকিট কত বিক্রি হয়, কি ভাবে বিক্রি করতে হয়।

গুপী বলছে, তুই এত ছোটাছুটি করিস, এত খাটুনি তোর শরীরে পোসাবে ? আমরা বরং আরেকটু ধীরে ধীরে বড়লোক হব। এত তাড়াহুড়োর কি আছে, সমস্ত জীবন তো রয়েছে সামনে।

গুপী হিসেবের খাতা থেকে মাথা তুলে হাসতে হাসতে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর খাতাটা এগিয়ে দিল শম্ভুর দিকে। —দ্যাখ দ্যাখ, কত লাভ হয়েছে আমাদের।

শম্ভু বলছে, কত ?

গুপী হাসছে আর বলছে, আমাদের এক-একজনের ভাগে দশ হাজার। দশ হাজার টাকা। কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম এত টাকা আমাদের হবে !

—সত্যি বলছিস ? শম্ভু জিগ্যেস করছে, সত্যি দশ হাজার ? আমরা কি ওই টাকাটা নিতে পারব ?

গুপী বলছে, আলবত পারবি। ওটা তো আমাদের লাভ। কবে চাস তুই বল না ? এই তো চেক বই, তুই নিজেও সই করে নিয়ে নিতে পারিস। ব্যাঙ্কে দু'জনের সই-ই তো আছে। আমরা তো পার্টনার দুজনেই।

গুপী নিজেই চেকটা সই করছে। —এই নে।

শম্ভু দেখল সত্যি দশ হাজার টাকার একটা চেক ওর নামে।

গুপী বললে, কালই ভাঙিয়ে নিস। বেয়ারার চেক, কোনও অসুবিধে হবে না।

চেকটা পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল শম্ভু। আঃ, কি আনন্দ, কি আনন্দ, এত টাকা। শম্ভু কোনদিন কল্পনাও করেনি। এখন তো ও বড়লোক হতে চলেছে, একটু একটু করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে গেছে।

এবার ওর সামনে অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব।

ইভা, তোর কাছে আমি পাঁচ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলাম। যদি দরকার হয়। যদি ঝুঁকি নিতে গিয়ে মরেই যাই, তবু তো কিছুটা সুরাহা হবে। জানিস ইভা, এই বাড়তি টাকাটা ত্রিদিবেশবাবুকে চাপ দিয়ে আদায় করতে গিয়ে আমি নিজের কাছে আরও ছোট হয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, ত্রিদিবেশবাবুর কোনও উপায় নেই, আমি যা চাইব তাই ও দিতে বাধ্য। কারণ তখন দাঁড়িপাল্লার একদিকে আমার একটা কিডনি, অন্যদিকে তার মেয়ের জীবন। ঊর্মির।

জানিস ইভা, তখন ঊর্মি শুধুই একটা বড়লোকের মেয়ে। আদরের দুলালি। কোনদিন মনে হয়নি ওরাও আমাদেরই মত মানুষ। মনে হয়নি ঊর্মি একটা অসহায় মেয়ে, যার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে যৌবনের স্বাদ পাওয়ার আগেই, অথচ যার দুরন্ত ইচ্ছে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার।

হাসপাতালের বেড্-এ পিঠে বালিশ দিয়ে ওকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শম্ভু ওর চেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে তখন।

—আমি কি সত্যি ভাল হয়ে উঠব ? নাকি মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছে সকলে ? ঊর্মি বিষণ্ণ হেসে জিগ্যেস করছে।

শম্ভু বলেছে, তুমি তো ভাল হয়ে গেছ।

ঊর্মি হাসছে।—জানেন আমার একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করত না, এত কষ্ট। এখন আমার সত্যি ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে। আপনি না থাকলে কে বাঁচাত আমায় ?

শুনতে ভাল লেগেছিল শম্ভুর, কিন্তু সেই অদৃশ্য কাঁটাটা খিচখিচ বিঁধছিল ওর বুকে।

শম্ভু স্বপ্ন দেখছে।

ইভা, ওই পাঁচ হাজার টাকা কোথায় রেখেছিস দে আমাকে। টাকা জমিয়ে জমিয়ে আমিও বড়লোক হয়ে যাব। বড়লোক হওয়ার বড় সুখ রে।

মা নিজের ওপর ঘেন্না থেকে, এই দারিদ্র্যের ওপর ঘেন্না থেকে আমাদের এই অন্ধকূপ ঘরকে বলে শুয়োরের খোঁয়াড়। এখান থেকে আমি মুক্তি চাই। গুপী আজ আমাকে দশ হাজার টাকার একটা চেক দিয়েছে, আর তোর কাছে রাখা এই পাঁচ হাজার। আরও আরও টাকা চাই।

—মা, আমি একটা খুব সুন্দর ফ্ল্যাট দেখে এসেছি। ছোটকাকুর মত ছিমছাম ছোট ফ্ল্যাট। ছোট, তা হোক্, তুমি আর বাবা, ইভা আর আমি, দিব্যি চলে যাবে। মাত্র পাঁচশো টাকা ভাড়া। এখন তো মাসে মাসে একটা বাঁধা রোজগার আমার আর গুপীর।

—বাবা, তুমি নাকি সামনের মাসে রিটায়ার করবে ? তার জন্যে নাকি তুমি রাত্রে ঘুমোতে পারো না, দিনরাত ভাবো। কেন এত ভাবছ, আমি তো এখন দিব্যি রোজগার করছি। তুমি দেখো, এই সংসারটা আমি এবার একেবারে বদলে দেব, সুন্দর করে গড়ে তুলব। তুমি পারোনি সেটা তো তোমার দোষ নয়। তুমি বাঁচিয়ে রেখেছিলে সেটুকুই যথেষ্ট, দেখে নিয়ো এবার আমি পারব। বিশ্বাস করছ না ? এই দেখ, নগদ পনেরো হাজার টাকা আমার হাতে। আজই চেক ভাঙিয়ে এনেছি, আর ইভার কাছে রেখে যাওয়া সেই পাঁচ হাজার।

—ইভা, তুই তো আবার কলেজে ভর্তি হয়েছিস। ভাবিস না, আর কেউ না থাক আমি আছি। বিশ্বাস রাখ, তুই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি, নিজের জীবন নিজে গড়ে নিতে পারবি। খেলার পুতুল হয়ে রাসকেলটার কাছে যেন ফিরে যাস না। সমাজে কে কি বলল তা নিয়ে মাথা ঘামাস না, সমাজ তো আমরাই তৈরি করি। বদলাতেও পারি। তুই বদলে দিস।

সব, সব বদলে যাবে। এই ঘর, এই দারিদ্রের জীবন, বাবার দুর্ভাবনা, ইভার ভবিষ্যৎ।

কিন্তু একটা জিনিস কি কোনদিন বদলাতে পারবে শম্ভু? নিজেকে। ওর মনের মধ্যে একটা গ্লানি রয়ে গেছে। ডাক্তার মাথুর বলেছিলেন, ইট্‌স আ গ্রেট কজ। সারাজীবন একটা গর্ব ওর সঙ্গী হয়ে থাকবে। মনে হবে আই হ্যাভ ডান সামথিং।

ও তো মানুষ হিসেবে অনেক ওপরে উঠে যেতে পারত। তার বদলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে গেছে।

ও বেশ বুঝতে পারে ত্রিদিবেশবাবুদের কাছে ওর আর কোনও দাম নেই। কারণ ও তো উর্মির জীবন বাঁচায়নি, শুধু টাকার বিনিময়ে একটা কিডনি বিক্রি করেছে।

উর্মি। সেই সুন্দর ক্লান্ত অসহায় মুখ এখন জীবন্ত হাসি নিয়ে বারবার হাতছানি দেয়। বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

জানে ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য অপেক্ষা করছে সেখানে। দাম ফুরিয়ে যাওয়া অবহেলা। তবু দুর্বোধ্য একটা টান, যা উপেক্ষা করা যায় না।

শম্ভু প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কোনদিন যাবে না। স্বপ্ন দেখছে শম্ভু, শুধু স্বপ্ন।

যেন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, যাব। একবার। এই শেষ বারের মত।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শম্ভু।

আজ আর তার জন্যে সেই বিশাল গাড়িখানা অপেক্ষা করে নেই। 'তুমি এখানে বোসো, এখানে বোসো' বলে মাসিমা পাশে বসাবেন না।

তবু আজ আর বাসে ঝুলতে ঝুলতে যেতে ইচ্ছে হল না। একটা ট্যাক্সি ডেকে বসল শম্ভু।

তারপর সেই ত্রিদিবেশবাবুর ফ্ল্যাট।

লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে আত্মবিশ্বাসের পা ফেলে ফেলে গটগট করে শম্ভু এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। আজ আর ওর কোনও অস্বস্তি নেই। কলিং বেল্-এর সুইচে হাত দিতে কোনও দ্বিধা হল না। সুইচ্ টিপল আর সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ বাজল।

বড় অধৈর্য লাগল শম্ভুর। ও আশা করেছিল সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেবে কেউ।

আবার বাজাল।

একটু পরেই কাঁধে ঝাড়ন বিপিন এসে দরজা খুলে দিয়েই শম্ভুকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, ও আপনি!

যেন বলতে চাইল শম্ভু বেল্ বাজাচ্ছে জানলে এত তাড়াহুড়ো করত না।

—বসেন।

এ বাড়িতে শম্ভু যে খাতির পাবার মত লোক নয়, তা বিপিনও জেনে গেছে।

ওরা ঠিক বুঝতে পারে, বাড়ির লোকদের হাবেভাবে। কিংবা কথাবার্তাও হয়তো শুনেছে। শম্ভু তো টাকা নিয়ে সামান্য একটা উপকার করেছিল এক সময়। উপকার আবার কি। বিক্রি করেছিল।

—বড়বাবু তো কাগজপত্তর নিয়ে কি-সব কাজ করছেন। আপনি অন্য সময় আসলে ভাল করতেন। বড়বাবু এখন বড্ড বিজি।

শম্ভু হেসে বললে, কিন্তু বড়বাবুকেই তো আমার চাই।

শম্ভু দেখছে, শুধুই স্বপ্ন।

নিজেকে ভীষণ অস্থির লাগছিল শম্ভুর, বিপিন ভিতরে খবর দিতে গেল, কিন্তু শম্ভু বসতে পারল না। দামি কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে লাগল।

অনীশ এল, একটুও অবাক হল না। অর্থাৎ বিপিন নামটা ঠিকই জানিয়ে দিয়েছে।

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন' এ-কথাটাও বলল না। বেশ বোঝা গেল বিরক্ত হয়েছে, হয়তো অসময়ে এসেছে বলে। শম্ভু তো বহুকাল আসেনি, হয়তো ভেবে নিয়েছিল আর আসবে না। অপমান বোঝার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে।

উল্টে শম্ভুই বললে, বসুন। বলে নিজেও বসল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনীশকে বসতে হল। জিগ্যেস করল, কিছু বলবেন ?

বোধহয় ভাবছে অভাবে পড়ে এতদিন পরে সেই বাকি পাঁচ হাজার টাকা চাইতে এসেছে। এ রকমই তো হয়। তখন নিতে চায়নি, আমাদের চোখে নিজেকে বড় করে দেখানোর জন্যে। পরে হয়তো অনুতাপ হয়েছে।

শম্ভু বললে, অনেকদিন আসিনি, আজকাল আর সময়ই পাই না।

অনীশের ভুরুতে বিরক্তি ফুটে উঠল। বললে, বাবা তো খুব ব্যস্ত।

—তা হোক্। শম্ভু হাসল। বললে, আমি অপেক্ষা করতে পারব।

তারপর জিগ্যেস করলে, মাসিমা আছেন তো ?

অনীশ ঘাড় নাড়তেই চিৎকার করে ডাকল, মাসিমা, ও মাসিমা।

মাসিমা এলেন একটু পরেই। —ও তুমি। অনেকদিন আসোনি।

শম্ভু অনীশের ভুরুতে বিরক্তি দেখতে পেল। মনে মনে হাসল।

যেন মনে মনে বলতে চাইল, আজ আমি তোমাদের বিরক্ত করতেই এসেছি।

স্বপ্নের কি কোনও সীমা আছে ?

মাসিমা ভদ্রতা করেই জিগ্যেস করলেন, ভাল আছ তো ?

উত্তর না দিয়ে শম্ভু উল্টে প্রশ্ন করল, ঊর্মির আর কোনও কমপ্লেন নেই তো ? একটু সেরেছে ? কই ডাকুন, একবার দেখি।

আঃ, স্বপ্নগুলো যদি সব সত্যি হয়ে যেত।

বিপিন এসে দাঁড়াল চুপচাপ।

মাসিমা বললেন, হ্যাঁ, চা করে আন।

শম্ভু নিজেই বিপিনকে বলে বসল, ঊর্মিকে একবার আসতে বলো। কতদিন দেখিনি।

তারপর মাসিমার দিকে তাকিয়ে বললে, ও সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে দেখলে, জানেন মাসিমা, বড় ভাল লাগে।

মাসিমা বিপিনকে বললেন, একবার আসতে বল।

ঊর্মি নয়, এল শর্মিলা। মুখে বেশ একটা রাগ এবং শম্ভুর ওপর একটা তাচ্ছিল্য।

—তোমরা দিদিকে ডেকে পাঠিয়েছ ? ও এখন পড়ছে, সামনে পরীক্ষা। অনেকগুলো বছর তো ওর নষ্ট হয়ে গেছে, ওকে ডিস্টার্ব করার কি দরকার।

শম্ভু বলে উঠল, বাঃ বাঃ, আবার পড়াশোনা করছে। শুনে সত্যি ভাল লাগছে।

একটু থেমে বললে, আর তুমি ?

শর্মিলা কোনও উত্তরই দিল না।

বোধহয় চলে যেত, তার আগেই শম্ভু বললে, আরে বোসো বোসো। এতদিন পরে, তোমাদের সকলকে দেখতে ইচ্ছে হল বলেই তো এলাম। আর কখনও আসা হবে কিনা কে জানে।

শর্মিলা চলে যেতে গিয়েও থেমে পড়ল। যাক্, লোকটা তা হলে আর আসবে না।

—বোসো না। আরে আমি তো আর বাইরের কেউ নই। ঘরের লোক, কি বলেন মসিমা। বলে হাসল।

মাসিমা অনুচ্চ গলায় বললেন, আমি কি বলেছি বাইরের লোক !

অনীশ এতক্ষণে জিগ্যেস করল, কি করছেন এখন ?

শম্ভু হেসে উঠল। —কিছু করার জন্যে তো আমরা জন্মাই না।

ঠিক এই সময়েই ত্রিদিবেশবাবু ঘরে ঢুকলেন। শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বললেন, গলার আওয়াজেই বুঝেছি। ব্যাটা বিপিন, বলবি তো আমাকে, ভয়ে বলতেই পারেনি। জিগ্যেস করলাম, তখন বললে।

এসে ভারী শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিলেন। —আমি আবার আজ খুব ব্যস্ত। বলো, কিছু বলবে কি ? দেখো, লজ্জা কোরো না, যদি কিছু চাইবার থাকে...

শম্ভু বলে উঠল, না না। আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমার তো কিছু চাওয়ার নেইও। বরং দরকারের সময় উপকার করেছিলেন...

ত্রিদিবেশবাবু রাশভারী গলায় বললেন, ওসব কথা থাক, ওসব কথা থাক।

যেন একসময় উপকার করেছিলেন সে-কথা মনে পড়িয়ে দেওয়াতে লজ্জা পাচ্ছেন।

শম্ভু হেসে বললে, কিন্তু সেজন্যেই তো আসা।

বলে ব্যাগের ভিতর থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বের করল।

বললে, আপনার সেই পনেরো হাজার টাকা। এই নিন।

ত্রিদিবেশবাবু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

মাসিমা বলে উঠলেন, ও কি করছ, ও কি করছ !

'এটা তো রীতিমত অপমান', বলে শর্মিলা ছুটে চলে গেল।

অনীশ একটা কথাও বলল না।

শম্ভু তখন বলছে, না না, সে কি কথা। আমি ঋণমুক্ত হতে চাই, ঋণমুক্ত হলাম টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে। এখন সারা জীবন গর্ব করতে পারব।

একটু থেমে বললে, আমি তো কিছুই করিনি, শুধু আমার যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল, সেটুকুই দিয়ে দিয়েছিলাম। সামান্য একটা কিডনি।

বলে হাসল, উঠে দাঁড়াল। চলে যাবার জন্যে পিছন ফিরতেই দেখল ঊর্মি একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।

—দাঁড়ান। প্রায় আদেশের গলা।

ঊর্মি বলে উঠল, আপনি তো আপনার ঋণ শোধ করলেন। কিন্তু আমি ? আপনি তো সারাজীবন গর্ব করার মত কিছু পেলেন। কিন্তু আমি ? আমি কি নিয়ে গর্ব করব ?

শম্ভু তাকিয়ে দেখল, ঊর্মির দুচোখ জলে ভাসছে।



আশ্রয়



ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পৌঁছে বুকে এরকম একটা ধাক্কা খেতে হবে হিরণ্ময় কোনও দিন ভাবেনি। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সে-আশঙ্কা প্রথম দিন থেকেই ছিল। কিন্তু মনের মধ্যে কোনও সুপ্ত আশঙ্কা থাকা, আর সত্যি সত্যি তা ঘটে যাওয়া এক নয়। ভাসা-ভাসা ভয় আসলে ভেসে যাওয়া টুকরো মেঘের মত। বৃষ্টি হবেই কেউ ভাবে না, শুধু একটা সন্দেহ থাকে, বৃষ্টি হবে না তো!

তাছাড়া বয়েস বেড়েছে বলেই হয়তো নিজের ওপর আস্থা কমছে, সব ব্যাপারেই কেমন সন্দেহ। বয়েস তাকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষকে বড় ভিতু করে দেয়। তাই গোড়া থেকেই হিরন্ময়ের কোনও সায় ছিল না। বরং পাকেপ্রকারে ও শুভাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল।

শুভা ওর কথায় কান দেয়নি। কোন্ কথাতেই বা কান দেয়। ছিটকে বলে উঠেছে, থামো তো, আমার সমস্যা আমাকে ভাবতে দাও।

পাছে হিরণ্ময় আবার কিছু বলে বসে, হাতের ঝাড়নটা নিয়ে সপাং সপাং করে আলমারিটার গায়ে চড়চাপড়ের ভঙ্গিতে ধুলো ঝেড়েছে শুভা, ব্যস্ততা দেখিয়ে আসবাবপত্তরের ধুলো মুছতে শুরু করেছে।

কিন্তু তারই ফাঁকে অস্পষ্টভাবে বলা, 'সংসারে কোন কাজটাই বা তুমি দেখো', হিরণ্ময়ের কান এড়িয়ে যায়নি। দুম্ করে বিনা নোটিসে 'কাজের লোক' চলে যাওয়ার মত অঘটন যখনই ঘটেছে তখনই সংসারে এইরকম একটা অশান্তি বোধহয় সর্বজনীন।

আজকাল এত ডিভোর্স বাড়ছে কেন তা নিয়ে একদিন আপিসে আলোচনা হচ্ছিল। উমেশ, পাশের টেবিলের উমেশ, বলে বসল, কাজের লোক। বলে দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁত খুঁটতে শুরু করল।

ওরা তো অবাক। বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে কাজের লোকের কি সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। খুঁজে পেল না বলেই অবাক বিস্ময়ে উমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

উমেশের মুখে তখন চার-আনা মাপের কৌতুকের হাসি।

দাঁতের ফাঁক থেকে লুকোনো পদার্থটি কাঠির ডগায় বের করে এনে ঈষৎ পর্যবেক্ষণ করে কাঠিটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে উমেশ বললে, ঠিকে ঝি বেটি একদিন না এলে আমার বউয়ের যে কি রণচণ্ডি মূর্তি হয় তা তো দেখোনি।

সবাই হেসে উঠল। সুধাকান্তর বয়েস কম, সে শুধু গম্ভীর মুখে বললে, 'ঠিকে ঝি বেটি' আবার কি কথা। আনপার্লামেণ্টারি।

উমেশ হাসল। বললে, ভায়া, আমরা এখন পার্লামেন্টে বসে নেই।

তারপর হিরন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমাদের সময়ে, ইন আওয়ার ইয়াং ডেজ, একটা চাকর গেলে ঝটপট আরেকটা জুটে যেত, পনেরো কি কুড়ি টাকায়। সেজন্যে একই বউ নিয়ে তিরিশ চল্লিশ বছর কেটে যেত। তারপর সুধাকান্তর দিকে তাকিয়ে বজ্জাতি হাসি হেসে বলেছিল, তোমরা ভাই কি লাকি, ঝি-চাকর পালাল কি রাস্তা পরিষ্কার, বউ রেগে গিয়ে ডিভোর্স করে দিল, তুমিও নতুন বউ এনে ঘর-সংসার করতে শুরু করলে।

তারপর মুখে বেশ একটা গাম্ভীর্য এনে বলেছিল, এখন তো আর নতুন জুটবে না

আমাদের, শান্তি যদি রাখতে চাও সংসারে, আমাদের সুধাকান্তর ভাষায় 'কাজের লোক'— একটা পালালেই আরেকটার খোঁজে বেরিয়ে পড়ো।

একটু থেমে বলেছিল, আর যেটা আসবে সে দশ টাকা বেশি চাইবে, তা দিয়ে দিয়ো। পুরোনো বউটাকে তো ধরে রাখতে হবে।

তখন হিরণ্ময়ও সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠেছিল। কিন্তু ওর আপত্তি শুনে শুভা যে-ভাবে শব্দ করে আসবাবের গায়ে ঝাড়নের চড়চাপড় মারতে শুরু করেছিল, যেন চাপা রাগের অদৃশ্য চড়গুলো হিরণ্ময়ের উদ্দেশেই। আর উমেশের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল।

সংসারের আর পাঁচটা ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে— এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থাৎ ফুৎকারে উড়ে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের মৃদু আপত্তিটুকু।

সন্ধেবেলায় তবু কথা ফুটেছিল শুভার মুখে, বেশ রাগত স্বর, তোমার আর কি, বলে দিয়েই খালাস। একটা জুটিয়ে আনতে তো পারো না।

হিরণ্ময় তাই অনিচ্ছার সঙ্গেই বলেছে, তবে রাখো।

শুভারও তো বয়েস কম হ'ল না, কিন্তু সব ব্যাপারেই হিরন্ময়ের এই ভয়-ভয় ভাবটা তার মধ্যে একেবারে নেই। কেন নেই ও বুঝতে পারে না।

হিরণ্ময়ের আপত্তি এবং আশঙ্কা যেন নেহাতই ছেলেমানুষি, এমনভাবে হেসে উঠেছিল শুভা।

এখন ওর রেগে গিয়ে শুভার মুখের ওপর বলারও উপায় নেই, কি, হল তো!

বিপদের মুখোমুখি না পড়লে কারও আপত্তি উপদেশ সাবধানবাণীকে মানুষ দাম দেয় না। নিজের স্ত্রীও না।

শুধু মুহূর্তের জন্যে হিরণ্ময়ের মনের ভেতর সেই সব পুরনো স্মৃতি ঝিলিক দিয়ে গেল। কিন্তু রেগে গিয়ে তখন আর বলা যায় না, আমি তো আগেই বলেছিলাম।

ছাপ্পান্ন বছরের হিরণ্ময়ের চোখের সামনে তখন একটা ভয়ঙ্কর বিপদ। ও শুভার থমথমে মুখ দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারও কিছু হল নাকি?

অনেকদিন পরে ও বেশ খুশি-খুশি মনে আপিস থেকে ফিরছিল। এমন একটা দুঃসংবাদ যে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে জানবে কি করে।

আজকাল হিরণ্ময় বড় চুপচাপ হয়ে গেছে, মুখে সবসময়েই কেমন গম্ভীর ছাপ। উমেশ কিংবা সুধাকান্তরও তা চোখ এড়িয়ে যায়নি। কেন তা ওরা সকলেই অনুমান করতে পারে। মুখ ফুটে তাই কেউ কিছু বলে না. যেটুকু বলার ও নিজেই তো তা আভাসে ইঙ্গিতে টুকরো টুকরো কথায় জানিয়ে দিয়েছে।

এই বয়সে পৌঁছে এখন বুঝতে পারছে সমস্ত জীবনটাই হিসেবের গরমিলে বোঝাই হয়ে আছে। সবই নাগালের বাইরে চলে গেছে, শুধরে নেবারও উপায় নেই।

আর দুটো বছর, তার পরই তো রিটায়ারমেন্ট। চাকরি থেকে অবসর। অবসর শব্দটা কি সুন্দর আর মোলায়েম। আগেকার দিনে বোধহয় সত্যিই তাই ছিল। সারাজীবন খাটাখাটুনির পর অফুরন্ত ছুটি। দুপুরে ঘুমোও, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াও, জমানো টাকার সুদে দিব্যি সুখে সংসার চালাও। হিরণ্ময়ও একদিন এইরকম একটা স্বপ্ন দেখত।

কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে দিনকাল কেমন পাল্টে গেল। এখন অবসর মানে একটা বিভীষিকা। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই হয়তো হিরণ্ময় এমন চুপচাপ হয়ে গেছে। ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না।

তবু তারই মধ্যে সেদিন মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল।

খবরটা এনেছিল উমেশ। আপিসের নানা ডিপার্টমেন্টের গূঢ়-গোপন খবরগুলো ও

আগেভাগেই জেনে ফেলতে পারে। কখনও কখনও সেগুলো অবশ্য গুজব হয়েই উবে যায়, আবার কোনটা কোনটা সত্যিও হয়।

উমেশ এসে বললে, একটা সুখবর আছে।

কোনও সুখবরেই এখন আর হিরণ্ময় বিচলিত হয় না। ও তো চোখের সামনে পূর্ণচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছে। একটা মোটা দাগের দাঁড়ি। তাই নিরাশ এবং নীরস গলায় বললে, এখন আর আমার কাছে কিছুই সুখবর নয়, ওসব তোমাদের জন্যে।

উমেশ ধীরে ধীরে বললে, না, আপনারও।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে গতবছর আমরা ক'জন ওপরের গ্রেডের জন্যে আপিল করেছিলাম, ডিরেক্টর পাশ করে দিয়েছেন। একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর।

তারপর খুব খুশি-খুশি মুখে বললে, রেট্রসপেকটিভ।

উমেশের উল্লাস হিরণ্ময় বুঝতে পারে। ওর এখনও পাঁচ-ছ বছর চাকরি আছে, একটা প্রোমোশনের সম্ভাবনাও।

হিরণ্ময়ের মুখে কোনও উল্লাস দেখা গেল না।

কিন্তু উমেশ দমে যাবার পাত্র নয়। এমন একটা দারুণ খবর নিয়ে এল, অথচ হিরণ্ময় তার কোন মূল্যই দিতে চাইছে না ? লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি ? নাকি বৈরাগ্য।

ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, কি বলছেন ? মাসে চারশো টাকা করে বাড়বে, তাছাড়া রেট্রসপেকটিভ।

হিরণ্ময় এবার নড়েচড়ে বসল। সত্যি বলছ ?

উমেশ কি বলল না বলল সেদিকে আর কান দিল না। ও তখন মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করে দিয়েছে। মাসে চারশো মানে বছরে চার হাজার আটশো। প্রায় পাঁচ হাজার। দুবছর এখনও চাকরি আছে, তা হ'লে হল গিয়ে প্রায় দশ হাজার। রেট্রসপকেটিভও আরও পাঁচ। পনেরো হাজারই বলা যায়। এ টাকাটা আর খরচ করছে না, জমাবে। আজকাল কাগজে তো কত কি বিজ্ঞাপন দেয় বড় বড় কোম্পানি। ডিবেঞ্চার, বন্ড। পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেয়। পনেরো হাজার তা হ'লে দাঁড়ায় সাড়ে বাইশশো। রিটায়ারমেন্টের পর ইলেকট্রিকের বিলটা এর থেকেই মিটে যাবে, আরও অন্য ছোটখাটো কোনও খরচ।

এতসব হিসেব করার পরই হতাশ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল প্রায়ই হয়। সামান্য কিছু কিছু জমাতে পেরেছে, কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ড তো এমন কিছু হবে না। জীবনের বেশির ভাগটাই তো কম মাইনেয় কেটে গেছে, তাই পি এফের অঙ্ক বাড়েনি। জমানো টাকা সুদে-আসলে ডবল হয়েই বা কি লাভ, জিনিসপত্রের দাম তো কুড়িগুণ। তাছাড়া ওই পি এফের টাকা পেয়ে ব্যাঙ্কেই রাখো ডিবেঞ্চারই কেনো, তার ওপর ট্যাক্স দিতে হবে। কেটেকুটে কত আসবে তাও হিসেব করে দেখেছে। সংসার চলবে না। শালার গরমেন্ট। ফুর্তি করবে, বিলেত বেড়াবে, আর একটা লোক সারাজীবন কাজ করে শেষে মানুষের মত বাঁচতে পাবে না।

তাই এই সামান্য টাকাটাও লোভনীয় মনে হল। উমেশের এতখানি উল্লাস বোধহয় সে-জন্যেই।

খবরটা পেয়ে থেকে উমেশের সত্যিই খুব উল্লাস। হবারই কথা, ওর তো এখনও পাঁচ-ছ বছর চাকরি আছে। কিন্তু ও কি এখনই রিটায়ারমেন্টের পরের দিনগুলোর কথা ভাবছে ? মনে হয় না। হিরণ্ময়ও তো ভাবত না। নিত্যদিনের অভাব অনটনে ওসব দিনের কথা সবাই ভুলে থাকতে চায়।

পাঁচটা বাজতে না বাজতে উমেশ এসে হাজির হয়েছিল। সামনের খোলা ফাইলটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, চলুন হিরণ্ময়দা, আজ একটু চাইনিজ খাব, এত বড় একটা সুখবর।

হেসে উঠে বললে, খাওয়াব, খাওয়াব।

অর্থাৎ হিরণ্ময়কে নিশ্চিন্ত করে দিল, টাকাটা তার পকেট থেকে যাবে না। ও নিজেও জানে ইদানীং ওকে অনেকে কৃপণ ভাবছে। অথচ বাজে খরচ এ ক'বছর কিছুটা কমিয়েও তো ভবিষ্যৎ গড়তে পারেনি। ভবিষ্যৎ এখন ওর কাছে একটা আতঙ্ক। অথচ স্ত্রী বোঝে না, ছেলেমেয়েরা বোঝে না।

উমেশ প্রায় হাত ধরে টেনে তুলল হিরণ্ময়কে।

চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময়ে নিজেকে বেশ হাল্কা লাগল। ক্ষিদেও পেয়েছিল, বাড়ি ফিরে সেই তো দুখানা রুটি আর একটু তরকারি, কিংবা নিছক দুপিস সেঁকা পাঁউরুটি, চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাও। খাওয়ার ইচ্ছেটাও যেন চলে গেছে আজকাল। বোধহয় বয়েস।

বেশ বোঝা গেল, উমেশ খবরটাকে নিছক গুজব ভাবেনি, পাকা খবর বলেই বিশ্বাস করেছে।

এতক্ষণে হাসতে পারল হিরণ্ময়। কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসল দুজনে, চিনে-রান্নার গন্ধ মাখা আমেজে এল অনেকদিন পরে। আর চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, তুমি তো টাকাটা হাতে পাবার আগেই সব খরচ করে বসবে দেখছি।

উমেশও হাসল। বললে, অজুহাত হিরণ্ময়দা, অজুহাত। এ-সব তো আজকাল ভুলেই গেছি, একটু আনন্দ করার অজুহাতে বাড়ির লোকেদের ফাঁকি দিয়ে...

হিরণ্ময় শব্দ করে হেসে উঠল।

উমেশও হাসল। বললে, মাইনে বাড়া মানে তো একটা মাস আনন্দ। জীবনে কতবারই তো পেলেন কিন্তু ওই এক মাস, তারপর কোথায় যে সব ঢুকে যায় ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও খুঁজে পাই না।

হিরণ্ময় বিষণ্ণভাবে বলল, এখন ভাই বুঝতে পারছি এই মাইনে বাড়া, ইনক্রিমেন্ট এ-সবই কাল হয়েছে। খরচের হাত বেড়ে যায়, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হে, রিটায়ারমেন্টের পর কত কমাবে ?

একটু থেমে হাসবার চেষ্টা করল। বানানো হাসি মুখে এনে বললে, পি এফ যেটুকু বাড়ে, পাওয়ার সময় ইনফ্লেশন সব গিলে খেয়ে নেয়।

উমেশ বললে, ও সব ছাড়ুন তো, এখন ফুর্তি করে খেয়ে নিই।

বলে অর্ডার দিল।

বেশ আনন্দ করে খেতে খেতে উমেশ শুধু একবার বলেছিল, নাঃ। সে আগের দিনের মত প্রিপারেশন আর নেই।

হিরণ্ময়েরও তাই মনে হচ্ছিল। আগের দিন। প্রায় ভুলেই গেছে। এক সময় যে ওরও যুবক বয়েস ছিল, এখন আর মনেই পড়ে না। অথচ কি আশ্চর্য, ও যে আর যুবক নয় তাও মনে থাকে না। পাশের টেবিলে বসা একটা পুরো পরিবারের মধ্যে বেশ ছিপছিপে সুন্দর চেহারার তরুণী মেয়েটির দিকে বার কয়েক তাকিয়ে নিয়েছে হিরণ্ময়। ভি-গলা ব্লাউজের ঢল অবধি। মুখখানাও বেশ সুন্দর।

সুস্মিতার কথা মনে পড়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে। এখন সুস্মিতা কোথায় কে জানে। জানার ইচ্ছে হয়নি। নিশ্চয় বুড়িয়ে গেছে, হয়তো স্থূলাঙ্গী। নাতি-নাতনি নিয়ে কোথাও সংসার করছে। হাসি এসে গিয়েছিল, সেটা চাপা দিল। মনে মনে হিসেব কষে দেখল হিরণ্ময় তখন সাতাশ-আটাশ।

খাওয়া শেষ হতেই উমেশ বিল মেটাচ্ছে, হিরণ্ময় নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, কত নিয়ে বেরিয়েছিল আজ মনে মনে ভাবল, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এখন আর শুধু নিজে খেয়েই তৃপ্তি হয় না। টাকা থাকলে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জন্যে প্যাকেট করে কিছু নিয়েও যেত। আর সে-জন্য উমেশের কাছে ধার চাইতেও বাধো বাধো ঠেকল।

আজকাল একা ভাল খেয়ে তৃপ্তি হয় না, কোথাও একা-একা বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয় না, ভাল কিছু দেখলে—নাটক কিংবা একজিবিশন, মনে হয় বাড়ির সকলে মিলে না দেখলে আনন্দ নেই। এরই নাম বোধহয় বার্ধক্য। একটা সময় থাকে, যখন বাড়িটা শুধু ফেরার জন্যে, বাইরে বাইরেই জীবনটা কেটে যায়। আর বয়েস হলে মনে হয় সকলকে নিয়ে আনন্দটুকু ভাগাভাগি করে নিই। সেজন্যে এখন আর একা-একা ওসব কিছুই ভাল লাগে না।

রাস্তায় নেমে কোণের দোকান থেকে একটা পান কিনে খেল উমেশ। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মিনিবাস এসে পড়তেই হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ছুটে গিয়ে ধরল।

হিরণ্ময় বাস পেল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে। মিনিবাস, কিন্তু কি ভাগ্য, ও যেখানটায় দাঁড়াল, সিট ছেড়ে একজন নেমে গেল। বসতে পেল হিরণ্ময়। এমন তো হয় না, মনটা বেদম খুশি হয়ে উঠল।

খুশি-খুশি মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। বরাদ্দ রুটি দুখানা কি অজুহাতে খাবে না খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। চিনে খাবার খেয়ে এসেছে এ-কথাটা চেপে যাওয়াই ভাল। শুভার সব সময়ে ভয় এ বয়সে বাইরের খাবার খেলেই শরীর খারাপ হবে। বয়েস, বয়েস। শুভা কিছুতেই ভুলতে দেয় না।

নাঃ, বলেই ফেলবে।

মুখে তখনও খুশির ভাবটা লেগে আছে। কে জানত একটা ভয়ঙ্কর বিপদ বাড়িতে অপেক্ষা করছে। একটা আতঙ্ক, যা মুহূর্তে সারা পরিবারের সুখ কেড়ে নেবে।

সুখ অবশ্য এখন আর নেই।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক পি ডব্লু ডি-তে চাকরি করতেন। কি চাকরি কখনও বলেননি। কিন্তু কিভাবে যে এই পেল্লায় বাড়িখানা তুলেছেন সে এক রহস্য। পাড়ার সীতানাথবাবু অবশ্য নানা কথা বলেন, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে বোঝা দায়।

এ পাড়ার সকলেই সকলের সঙ্গে বেশ হাসিমুখে কথাবার্তা বলে। বাজারের থলি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে যখন গল্প জুড়ে দেয়, মনে হয় যেন কত অন্তরঙ্গ। কিন্তু তারপরই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পরস্পর পরস্পরের হাঁড়ির খবর টেনে বের করে আনে। দু-একজনের তো এভাবেই বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেছে।

তবে হিরণ্ময়ের সঙ্গে এরা সকলেই বেশ ভাল ব্যবহারই করে। যদিও ভেতরে ভেতরে কি বলে কে জানে। বলুক, ওসব গায়ে মাখলে চলে না, মেনে নিতে হয়। ওসব তো বাঙালি মধ্যবিত্তের দস্তুর।

সীতনাথবাবুরও নিজের বাড়ি, তবে ছোটখাটো। নিজেই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এই যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছেন, এটা আরও ছোট ছিল। একতলা। ছিলাম ভাড়াটে, শরিকি বিবাদ চলছিল তিন ভাইয়ের, আমার কাছে বেচে দিয়ে টাকা ভাগাভাগি করে নিল। দিনরাত ঝগড়া, দিনরাত মারামারি।

বলে হাসলেন আবার। বললেন, বাড়ি বেচে দিল বললে ভুল হবে, আমি তো বলি শান্তি কিনল।

একটু থেমে বলেছিলেন, দোতলাটা আমিই বানিয়েছি।

কানে কানে বলার মত করে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভাড়াটে হতে হলে এই রকম বাড়ির ভাড়াটে হবেন। কিংবা ধরুন বিধবার সম্পত্তি, দেখাশোনা করার কেউ নেই, কোর্টকাছারির নাম শুনলে ভিরমি খায়...

হিরণ্ময় তখন নতুন এসেছে এ-পাড়ায়, এই বাড়িতে।

মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, না না, বীরেশ্বরবাবু লোক ভালই। ওঁর ছেলেমেয়েরা তো আমাদের বাড়ির লোক মনে করে।

সীতানাথবাবু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলেছিলেন, লোক খারাপ আমিই বা কখন বললাম। কি বিপদ।

একটু থেমে বলেছিলেন, ঘুস নিলেই কি আর লোক খারাপ হয়ে যায় ?

—ঘুস ? অবাক হয়েছিল হিরণ্ময় নিজেই।

আর সীতানাথবাবু হেসেছিলেন। —ঘুস নয় মশাই, ঘুস নয়, পুকুরচুরি। তা না হলে পি ডবলু ডির সামান্য চাকরি করে এই রকম চারতলা একটা বাড়ি করা যায় ?

পি ডবলু ডিব চাকরির কথাটা হিরণ্ময় জানত না। কিন্তু স্রেফ ঘুস নিয়ে এই বিরাট বাড়িটা বানিয়েছেন বীরেশ্বরবাবু, সে-কথাটাও বিশ্বাস হয়নি। মনে মনে বলেছে, জেলাসি। নিছক ঈর্ষা। নিজে একটা ছোটখাটো দোতলা বাড়ি করেও মানুষের শান্তি নেই, পাশে কেউ চারতলা হাঁকালেই বুক জ্বলে যায়।

হাসতে হাসতে শুভাকে সে-কথা বলেছিল।

এখন সীতনাথবাবুর কথাগুলোই বিশ্বাস করে। রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে পড়ে যেচে গল্প করে। নিজেই বলে, ছোটলোক মশাই, ছোটলোক। বাড়িটাই বড় করছে, নিজে যে ছোট হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল নেই।

সত্যি, মাঝে মাঝে হিরণ্ময়ের বড় আশ্চর্য লাগে। মানুষ কি করে যে এতখানি বদলে যায় বুঝতে পারে না।

প্রথম প্রথম কত অন্তরঙ্গ, কত আন্তরিকতা।

বাড়ির দালালের সঙ্গে বাড়িটা দেখতে এসেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন নতুন রঙ করেছে, দরজা জানলায় নতুন রঙ পড়েছে। চারতলা বাড়ির প্রত্যেক ফ্লোরে দুখানা করে ফ্ল্যাট, প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সামনে গোল বারান্দা।

শুভাও সঙ্গে এসেছিল।

দালাল ছেলেটি আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, চারতলার ওই ফ্ল্যাটটা। পুব দিক একেবারে খোলা, শীতকালে দিব্যি রোদ্দুর পাবেন।

হিরণ্ময় তখন হন্যে হয়ে ফ্ল্যাট খুঁজছে। উকিলের দোষে না নিজের দোষে আজও জানে না, মামলায় হেরে গিয়ে উচ্ছেদের নোটিস পেয়েছে।

নিত্যদিন ছোটাছুটি, দালালের হাতে ধরা, পায়ে প্রণামি, ফ্ল্যাট পছন্দ হয় তো ভাড়া নাগালের বাইরে। ভাড়া পছন্দ হলে ফ্ল্যাট দেখে পালাতে ইচ্ছে করে।

শেষে এই ফ্ল্যাট। বাইরে থেকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। আসলে তখন হাতে আর সময়ও নেই। সে কি নিরাশ্রয় দুভার্বনার দিন যে গেছে। ভাবলেও আতঙ্ক।

শুভার পছন্দ হয়ে গেল গোল বারান্দাটা। রাস্তা থেকেই দেখে বলে উঠল, মানি প্ল্যান্ট লাগাব।

দালাল ছোকরাটাও হেসে ফেলেছিল।

হিরণ্ময় অবশ্য প্রথম প্রথম খুঁজেছিল এমন বাড়ি, যে বাড়িতে বাড়িওয়ালা থাকে না। তেমন তেমন বাড়িও তো কলকাতায় অনেক আছে, শুধুই ভাড়াটে, বাড়ির মালিক অন্যত্র থাকে, লোক পাঠিয়ে ভাড়া আদায় করে।

পায়নি। ওসব কি সকলের ভাগ্যে জোটে। তার জন্যে তেমন তেমন কুষ্ঠি-ঠিকুজি নিয়ে জন্মাতে হয়।

গ্যেটের বাইরে থেমে পড়ে বাড়িটা ভাল করে দেখল হিরণ্ময়। জিগ্যেস করল। ল্যান্ডলর্ড কোন তলায় থাকেন ?

দালাল ছোকরাটি হেসে বললে, তিনতলায়, পুরো ফ্লোরটাই ওঁর। আপনার স্যার ভাবনা কিসের, আপনি তো তাঁর মাথার ওপর থাকছেন। আপনাকে ডিঙিয়ে তবে তো জলের ট্যাঙ্কের চাবি।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলেছিল, টেনেন্টদের জিগ্যেস করে দেখুন, এ বাড়িতে জলের অভাব নেই।

একটু রসিকতা করেছিল, জলের ট্যাঙ্ক নয় স্যার, নায়গ্রা ফল্‌স্।

শুভা তো হেসে কুটিকুটি।

সামনের গ্যারেজ ঘর থেকে ডানদিক বাঁদিক করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছিল ওরা। অত ভাল করে হিসেব করে দেখেনি, কোন্‌টা কোন্ দিক ভাল বুঝতেও পারেনি। দালাল ছোকরাটি নির্বিবাদে পশ্চিম দিকের জানলা দুটো খুলে দিয়ে বলেছিল, সাউথ। হুহু হাওয়া পাবেন।

ফ্ল্যাটে উঠে এসে দুদিন বাদে বুঝতে পেরেছিল ছোকরাটি ওদের কত বোকা বানিয়েছে।

পরে অবশ্য আক্ষেপও ছিল না। কলকাতায় কজনই বা সাউথ পায়। দিব্যি মানিয়ে নিয়ে দেখতে দেখতে দশটা বছর তো কেটে গেল। বার দুই ভাড়া বাড়াতে হয়েছে এই যা। শান্তি কেনার জন্যে সব ভাড়াটেরাই রাজিও হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে হিরণ্ময়ও।

তবে ইদানীং একটু দুর্ভাবনাও হচ্ছে। আর তো দুটো বছর। রিটায়ারমেন্টের পর এই ভাড়াটাও বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে ফ্ল্যাটের দাম যে-রকম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, কিনতে পারবে বলে ভরসা নেই।

শুভা মাঝে মাঝে ধমক দেয়, এরাও যদি মামলা করে উঠিয়ে দেয়, তখন যাবে কোথায় ? মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় তো চাই।

চাই তো সব কিছুই। মেয়ের বিয়ে, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাটের মেনটেনেন্স, কর্পোরেশনের ট্যাক্স, জমানো আর পি এফের টাকার সুদ থেকে মাসে মাসে সংসার চালানোর টাকা। সে টাকার ওপর যা ইনটারেস্ট পাবে তার ওপরও ইনকাম ট্যাক্স।

শুভা এ-সব কথা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। ওর একটাই বায়না, ফ্ল্যাট।

ইদানীং বাড়িওয়ালার সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই বলেই দুশ্চিন্তাটা হিরণ্ময়েরও।

চিনে রেস্টুরেন্টে পেট ভরে খেয়ে মিনিবাসে একটা বসার সিট পেয়েছিল বলে মনটা বেশ খুশি খুশি ছিল। বুকের কোণে একটাই শুধু খিচ খিচ। ছেলেমেয়েদের জন্যে, শুভার জন্যে কিছু আনতে পারল না।

হিরণ্ময় তখনও জানে না কি সাঙ্ঘাতিক বিপদ ফ্ল্যাটের দরজার ওপারে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

এই তল্লাটটা নতুন গড়ে উঠেছে। বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে একটা সরু রাস্তা। কর্পোরেশন এখনও নেয়নি। নিলে, ফুটপাত বানালে রাস্তাটা আরও সরু হয়ে যাবে। সেজন্যেই বীরেশ্বরবাবুকে বেশ খানিকটা জমি ছেড়ে দিয়ে চারতলা তুলতে হয়েছে। সীতানাথবাবু অবশ্য বলেন, চারতলাটা উনি বে-আইনি ভাবে তুলেছেন।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে অসদ্ভাবের সূত্রপাত বাড়ি নিয়ে নয়, রাস্তা নিয়ে।

রাস্তার দুধারে ছোট ছোট বাড়ি, অথচ অনেকেরই গাড়ি আছে। তাছাড়া গাড়িওয়ালা

লোকের যাতায়াতও একটু বেশি এ-সব বাড়িতে। হয়তো রাস্তাটা সরু বলেই বেশি মনে হয়।

উপায় তো নেই, গাড়ি রাখতে হলে কারও না কারও দরজায়, সে বেচারার বেরোনোর রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফুটপাত তো নেই, তাই দরজা ঘেঁসেই গাড়ি রাখে সকলে।

এ নিয়ে চেঁচামিচি একটু মাঝে মাঝেই হয়। এ বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির। যারা বাইরে থেকে দেখা করতে আসে তারা অতশত বোঝে না, ফাঁক পেলেই পার্ক করে দেয়। তখন দোষ তার, যার বাড়িতে ভদ্রলোক এসেছেন।

হিরণ্ময়ের এক বন্ধু বিকাশ, ছেলেবেলার বন্ধু, হঠাৎ একদিন আপিসে গিয়ে হাজির।

বললে, অনেকদিন দেখা হয় না, ভাবলাম দেখে আসি বেঁচে আছিস কিনা।

হিরণ্ময় খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে তোড়জোড় করে দেখা করা হয়ে ওঠে না বটে, কিন্তু কেউ এলে দারুণ ভাল লাগে। যারা জীবনে সাকশেসফুল হয়েছে, সে বন্ধুদের তো আরও ভালো লাগে।

গাড়ি আছে বিকাশের, নিজেই চালায়। হিরণ্ময়কে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে অন্ধকারের গড়ের মাঠ। রাস্তা ছেড়ে ঘাস বিছোনো মাঠের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে দুজনে বসে বসে কত গল্প।

তারপর রাত একটু বাড়তেই বিকাশ বললে, চল তোকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

হিরণ্ময় না-না করেছিল, শোনেনি।

ওই সরু গলিটায় গাড়ি ঢোকাতে বের করতে অসুবিধে হবে বলে হিরণ্ময় বড় রাস্তাতেই নেমে যেতে চেয়েছিল। বিকাশ শুনল না।

বললে, চল না। বাড়ির দরজাতেই নামিয়ে দিচ্ছি।

নাছোড়বান্দা। বললে, বাড়িটাও চিনে যাই। তুই তো একবারও যেতে বলিসনি।

গলিটা সরু, গাড়ি ঢোকাতে অসুবিধে হবে, এসবই আসল কারণ নয়।

বছর দশেক আগে হিরণ্ময়রা যে বাড়িতে ছিল সেটা বেশ বড় রাস্তায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়িটাও বড় ছিল। তখন নিয়মিত আনাগোনাও ছিল। এত দূরে চলে আসার জন্যেই হয়তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদিও বাইরে বাইরে দু-চারবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ঠিকই তো, হিরণ্ময়ই বোধহয় কোনদিন ওকে টেনে আনতে চায়নি। এই ছোট ফ্ল্যাটটা বন্ধুদের দেখাতেও কুণ্ঠা, এই খোয়া ছড়ানো সরু গলি, আর সিঁড়ি ভেঙে ওঠা চারতলা—সব মিলিয়ে হিরণ্ময়ের নিজেকে বড় ছোট মনে হত। ও তাই বিকাশদের সুন্দর বাড়িটার কথা ভেবে এড়িয়ে এড়িয়ে চালিয়েছে।

কিন্তু আর উপায় নেই, নিয়ে যেতেই হল।

হিরণ্ময়ের তখন রীতিমত সঙ্কোচ, কেমন নার্ভাস লাগছে, সেজন্যেই খেয়াল করেনি। ছোট্ট ফ্ল্যাটখানা দেখে না জানি কি ভেবে বসবে।

তবু বলতেই হল, এলি যখন, চল একটু চা খেয়ে যাবি। শুভার সঙ্গেও দেখা হবে।

—চল তবে। বিকাশও রাজি।

গাড়ি রাখার জায়গা না পেয়ে গ্যেটের সামনেই রেখে দিল বিকাশ।

আর বললে, আগের বাড়িটা ছাড়লি কেন?

সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে হিরণ্ময় উত্তর দিল, তুই তো জানিস, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে, মানে ওর বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না...

উকিলের দোষেই হোক বা নিজের ভুলেই হোক ওকে যে বাড়িওয়ালা মামলা করে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, সে কথা বলতে পারল না। আসলে ওই খবরটা ও সকলের কাছ থেকেই গোপন রেখেছে। এই বাড়িওয়ালার কাছ থেকেও। জানলে কি আর ভাড়া

দিত। ন্যায় হোক অন্যায় হোক, যে কোনও কারণে একবার যে ভাড়াটেকে মামলা করে তুলে দিয়েছে, তাকে আর কেউ ভাড়া দিতে চায় না।

দালাল ছোকরাটি তাই হিরণ্ময়কে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, দেখবেন স্যার, ঘুণাক্ষরেও যেন ল্যান্ডলর্ড জানতে না পারে। বলবেন, ভাইদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই।

একটু থেমে বলেছিল, দেখবেন বিশ্বাস করবে। বাঙালির ঘরে এ তো হামেশাই হচ্ছে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

হিরণ্ময় সেই দালাল ছোকরাটির কথাই চালিয়ে দিয়েছিল।

ওরা ততক্ষণে তে-তলার সিঁড়িতে পৌঁছেছে।

বিকাশ বলল, কোন্ তলায় রে?

সঙ্কোচটা ঢাকা দেবার জন্যে হিরণ্ময় হেসে উঠল। বললে, চারতলা।

—চা-র তলা? বিকাশের গলায় বিস্ময় ফুটল। বললে, রোজ হেঁটে উঠিস, হেঁটে নামিস? লিফ্‌ট্ নেই?

কিছু না ভেবেই বিকাশ বলেছিল। কিন্তু হিরণ্ময়ের শুনতে খারাপ লাগল।

হেসে বললে, আকাশের কাছাকাছি থাকা আর কি। মুক্ত বায়ু সেবন।

মনে মনে ভাবল, হেসে হাল্কা রসিকতা ছাড়া দৈন্য ঢাকবার আর কিই বা উপায়। অথচ হিরণ্ময়ের কোনও দৈন্য আছে কে বিশ্বাস করবে। আপিসে তো সকলে শেষ জীবনের মাইনেটাই দেখে।

বিকাশকে দেখে শুভা তো অবাক। —মেয়ের বিয়ে নাকি? প্রশ্ন করল।

নিজেই উত্তর দিল, তাছাড়া তো আপনার এ বাড়িতে আসার কথা নয়।

হো হো করে হেসে উঠল বিকাশ। বললে, আমার তো মেয়ে নেই, দুটোই ছেলে। হিরণ্ময় কিছু বলল না। ও যে নিজেই এড়িয়ে গেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে, বিকাশকে কোনদিন আসতে বলেনি, তা চেপে গেল।

বিকাশ ততক্ষণে বসার ঘরে ঢুকেছে, বসেছে। আর শুভা হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ও খুব খুশি হয়েছে।

বিকাশ হেসে বললে, কিন্তু মশাই, রহস্যটা কি বলুন তো? বয়েসটা সেই একই জায়গায় আটকে রেখেছেন কি করে?

হিরণ্ময় হো হো করে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে, বার তিনেক চা খেয়ে বিকাশ উঠল।

এতদিন পরে এসেছে, দরজা থেকে তো বিদায় দেওয়া যায় না, হিরণ্ময়ও সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল।

বিকাশ গাড়িতে উঠেছে, হিরণ্ময় তখনও দাঁড়িয়ে গল্প করছে, বাড়িওয়ালার বদমেজাজি ছেলেটা ছুটে এল।

ছোটলোকের মত হিরণ্ময়কে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলেন?

হিরণ্ময় জোর ধাক্কা খেল। অবাক হবার মতও মনের অবস্থা তখন নয়। ও ভাবতেই পারেনি বিশ-বাইশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে ওকে এভাবে অপমান করতে পারে।

ব্যাপারটি কি হিরণ্ময় বা বিকাশ কেউই তখনও বুঝতে পারছে না। বিকাশ শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। গালে চিবুকে আধ-ইঞ্চি মাপের দাড়ি নিয়ে রাগে মাখামাখি ছেলেটাকে দেখাচ্ছে তখন অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর।

হিরণ্ময় কোনক্রমে বললে, কি হয়েছে কি?

—কানে শুনতে পান না ? ছেলেটা গর্জে উঠল আবার।

ওর ব্যবহারে হিরণ্ময় তখন এতটুকু হয়ে গেছে। এমনিতেই বিকাশের কাছে ওর সঙ্কোচ এই গলি, এই ছোট ফ্ল্যাট, সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় ওঠার দৈন্য মনে করে। তার পরও বাড়িওয়ালার ছেলের এই ব্যবহার একজন বয়স্ক লোকের প্রতি। হোক্ না ভাড়াটে।

হিরণ্ময় বিকাশের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না।

বিকাশই বাঁচাল। ও হেসে ফেলে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে ভাই বলবে তো ?

বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুকে বাইরে থেকে দেখলে তো সজ্জন বলেই মনে হয়, বেশ ভদ্র ব্যবহার। তাঁর এই জোয়ান ছেলে সোমনাথও কখনও এমন ভাবে হিরণ্ময়ের সঙ্গে কথা বলেনি।

বিকাশের হাসি দেখে, বিকাশের কথায় সোমনাথের গলার স্বর রাগের কাঁপুনি একটু নামল। বললে, গাড়িটা রেখেছেন তো গ্যেট আগলে, তখন থেকে হর্ন দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছেন না ?

কথাগুলো বিকাশকে উদ্দেশ করে, কিন্তু বলল হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে।

সোমনাথ আরও একটু নরম হল ; আঙুল দেখাল গ্যারেজের দিকে।

বললে, আধঘন্টা ধরে হর্ন দিচ্ছি, গাড়ি বের করার রাস্তা তো রাখবেন ?

বিকাশ এবার লজ্জিত হয়ে পড়ল। হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করল। বললে, এত রাত্তিরে গাড়ি বের করবে, ভাবিনি ভাই। হর্ন শুনতেও পাইনি।

দরজা খুলল। দরজা বন্ধ করল। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল বিকাশ।

হিরণ্ময় সম্পর্কে কি ভাবল কে জানে।

হয়তো চুকেবুকেই যেত। কিন্তু স্টার্ট দিয়ে তখনও বিশেষ এগোয়নি, সোমনাথ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, গাড়ি থাকলেই ভদ্রলোক হয় না।

চিড়িক করে রাগ উঠে গেল হিরণ্ময়ের মাথায়। একটু অপেক্ষা করল, বিকাশ খানিকটা চলে যেতেই সোমনাথকে বলল, তোমার কথাগুলো কিন্তু ভদ্রলোকের মত ছিল না।

সোমনাথ রেগে গেল, হ্যাঁ ছোটলোক, তা হলে ছোটলোকের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আছেন কেন, ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁচো হয়ে গেছে হিরণ্ময়। ওঝার এই একটা মন্ত্রের সামনে বিষাক্ত সাপকেও নেতিয়ে পড়তে হয়। ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

রাগে গজগজ করতে করতে সোমনাথ চলে গেল। বলতে বলতে গেল, এত রাত্তিরে গাড়ি বের করবে ভাবিনি, তুমিই বা এত রাত্তিরে এসেছিলে কেন হে !

কথাটায় কোনও খোঁচা বা ইঙ্গিত আছে কিনা হিরণ্ময় ভাবেনি। তবু শুনতে খারাপ লেগেছিল।

বিকাশ যখন এসেছে তখন বোধহয় রাত নটা। গ্যারেজে গাড়ি আছে, বেরোবে তা ভাববে কি করে। আর চারতলার ওপাশের বসার ঘরে বসে শুনতে পাবেই বা কি করে। এ গলিতে তো সবসময়েই হর্ন বাজছে। বাড়ির চেয়ে গাড়ির আনাগোনা বেশি। কে কাকে গাড়ি সরানোর জন্যে হর্ন দিচ্ছে বুঝবে কি করে।

তারপর থেকেই একটু একটু করে অসদ্ভাব শুরু হয়।

সে-সব দিনের কথা ভাবলে এখন হিরণ্ময়ের হাসি পায়। প্রথম প্রথম বীরেশ্বরবাবুর কি ভদ্র ব্যবহার, বিনয়ী কথাবার্তা। তাঁর ছোট ছোট মেয়ে দুটির তো নিত্য শুভার কাছে আনাগোনা। বীরেশ্বরবাবুর স্ত্রীও আসতেন। শুভাও কখনও কখনও যেত। হিরণ্ময়ের ছেলে বিল্টু আর মেয়ে রুমির মুখে তো সব সময় ওঁদের গল্প। রান্না করে মুড়িঘন্ট পাঠিয়ে

দিতেন বীরেশ্বরবাবুর স্ত্রী, মোচার চপ বানিয়ে শুভাও পাঠিয়েছে।

তারপর শোনা গেল সোমনাথকে হিরণ্ময় নাকি ছোটলোক বলেছে।

বীরেশ্বরবাবু একদিন বললেন, হাসতে হাসতেই বললেন, রাত্তিরে চোরছ্যাঁচোড় ঢুকে পড়ছে, লছমনকে বলেছি নটা বাজলেই গ্যেটে তালা দিয়ে দেবে।

হিরণ্ময় বিস্ময়ের চোখ তুলতেই সান্ত্বনার স্বরে বলেছিলেন, কেউ এলে গেলে লছমনকে বলবেন, ও খুলে দেবে।

তারও বেশ কিছুদিন পরে টিউবওয়েলেও চাবি পড়ল। দু-বাড়ির আনাগোনা আগেই বন্ধ হয়েছিল, দেখা হ'লেও আর কথাবার্তা হত না।

সব ভাড়াটেরা তখন একজোট হয়ে গেছে, কিন্তু অক্ষম। শুধু উত্তেজনাই বাড়ছে। উপায়ও নেই অন্য কোথাও উঠে যাবে। বাড়িতে ঢোকার সময়, বেরোনোর সময় প্রেসার বেড়ে যেত হিরণ্ময়ের। কারণ বাড়িওয়ালার তেতলার দরজা পার হয়ে ওকে চারতলায় যেতে হয়। চারতলা থেকে নামতে হয়।

সব সময় আতঙ্ক, কখন কি বলে বসে। কিছু একটা বলা মানেই সেদিনের জন্যে মেজাজ খারাপ।

মনটা বেশ ফুর্তি ফুর্তি ছিল। আপিস থেকে উমেশের সঙ্গে বেরিয়ে চিনে রেস্টুরেন্টে দিব্যি পেট ভরে খেয়েছে। আঃ, কতদিন পর চিনে খাবার খেল। প্যাকেট বেঁধে বাড়ির সকলের জন্যে আনতে পারল না বলে একটু যা মনের মধ্যে খিচখিচ। ভাবল, একদিন সবাইকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনবে।

মিনিবাস থেকে ভিড় ঠেলে নেমে পড়তেই সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। ভ্যাপসা গরম আর ঘামের গন্ধে এতক্ষণ বোঝাই যায়নি বাইরে এমন শরীর জুড়োনো ঠাণ্ডা, এমন স্নিগ্ধ বাতাস।

পিচে মোড়া চওড়া রাস্তা ধরে হাওয়া খেতে খেতে হেঁটে এসে বাঁদিকে বাঁক নিতেই গলিটা। খোয়া ছড়ানো উঁচু নিচু। এখানে এসেই মন কুঁকড়ে যায়। দুপাশে তো এত নতুন নতুন বাড়ি, সবাই মিলে রাস্তাটাকে তো ভালো বানাতে পারত। অন্তত দুরমুজ পিটিয়ে টুকরো রাবিশ ঢালা রাস্তাটাকে হাঁটাচলার উপযোগী করা যেত। কিন্তু কেউ করবে না। সকলেই বসে আছে। কবে কর্পোরেশন করে দেবে। কর্পোরেশনও তেমনি, দুটো বাল্ব জ্বালিয়ে, দুটো জলের পাইপ দিয়ে দায় সারছে, ট্যাক্স নিচ্ছে। বাল্ব জ্বলে না, জল আসে না।

যাক, গ্যেটটা এখনও খোলা, যদিও নটা বেজে গেছে।

গ্যেট বন্ধ করার একটা কারসাজি আছে, সেটা বাড়িওয়ালা লছমনকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। এসময় পুরনো ভাড়াটেদের কারও অতিথি এলে, কিংবা বাড়ির লোক বাইরে থাকলে তবেই তালা পড়ে। অতিথির বেরোনোর সময়, কি বাড়ির লোকের ঢোকার সময় লছমনকে ডেকে ডেকে হয়রান হতে হয়, তখন আর তার পাত্তা পাওয়া যায় না। যিনি বেড়াতে এসেছিলেন, কি নেমন্তন্নর কার্ড দিতে, তাঁর সামনে অপদস্থ হও।

এমনিতেই মনটা খুশি খুশি ছিল, গ্যেট খোলা পেয়ে আরও ভালো লাগল। শুধু ক্লান্তি লাগে, আবার সেই চারতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে ভেবে। আর বাড়িওয়ালার তেতলার দরজা পার হতে হবে।

নাঃ, দরজাটা বন্ধই।

চারতলায় উঠে এসে কলিং বেল-এ আঙুল টিপল। ক্রুর-র আওয়াজ শুনতে পেল। কিন্তু অপেক্ষা করেও কেউ এল না।

আবার বাজাল।

এবার খুট্ করে খিল্ খোলার আওয়াজ।

কপাটে ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকল হিরণ্ময়। শুভাই দরজা খুলেছে। খুলে এক মুহূর্ত হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর শুভার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল।

থমথমে মুখ শুভার। যেন কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। চোখ স্থির। কিন্তু একটু নেড়ে দিলেই যেন চোখ থেকে জল ঝরে পড়বে।

হিরণ্ময়ের দিকে যেন তাকাতেই পারল না শুভা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে তখন তোলপাড়। কি হয়েছে? কিছু কি হয়েছে? প্রশ্ন করতেও পারল না ও, তার আগেই শুভা চোখের সামনে থেকে সরে গেছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে ওই কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেটুকু দেখেছে, মনে হল সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। কোনও সমূহ বিপদ।

॥ ২ ॥

খুশি-খুশি ভাবটা কোথায় উবে গেছে। একটা অদম্য উৎকণ্ঠা নিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল হিরণ্ময়। বুকের মধ্যে একদিকে উৎকণ্ঠা, আরেকদিকে চাপা বিরক্তি।

অদ্ভুত চাপা স্বভাব শুভার, এত বছর পরেও বদলাতে পারল না। অসুখবিসুখ হলে কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা সহ্য করবে, তবু মুখ ফুটে বলবে না। জানতে চাইলেও এড়িয়ে যাবে। বাড়িতে কিছু ঘটলে তখন তখনই জানাবে না। স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের কোনও খারাপ রিপোর্ট এলে নিজেই গিয়ে ব্যবস্থা করে আসবে।

হিরণ্ময় আপিসের পোশাক ছেড়ে পাজামায় পা গলিয়ে কলঘরে গিয়ে ঢুকল। হাতমুখ ধুয়ে এসে খাটের ওপর বসল। তার পরই লক্ষ করল টিভি চলছে না। এ সময় তো শুভা বসে বসে টিভি দেখে। আজ আর চালায়নি নাকি!

উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। একটু রাগও হল শুভার ওপর। কি হয়েছে বলবে তো।

চুপচাপ বসে রইল, শেষে নিজেই উঠে গিয়ে টিভিটা চালিয়ে দিল। সাউণ্ড কমাল। পাশের ঘরে বিল্টু আর রুমি হয়তো পড়ছে, ওদের পড়ায় মন বসবে না। বিল্টু এবারই পার্ট ওয়ান দেবে, রুমি পার্ট টু।

হিরণ্ময় একটু বেশি বয়েসেই বিয়ে করেছিল, ছেলেমেয়ে এসেছে আরও দেরিতে। সেজন্যেই রিটায়ারমেন্টে এত দুর্ভাবনা। চাকরি থাকতে থাকতে ওরাও যদি মানুষ হয়ে যেত, মেয়ের যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু শুভা আসছে না কেন?

একবার ভাবল গলার স্বর উঁচিয়ে বলে দেবে, খেয়ে এসেছি। শুধু চা দিস রে যমুনা।

কিন্তু শুভার থমথমে মুখটা তখনও চোখের ওপর ভাসছে, তাই বলতে পারল না।

মনে মনে খুঁজে বের করতে চাইল কি ঘটতে পারে। বাড়িওয়ালাকে নিয়ে আবার কিছু ঘটল নাকি?

কই, যমুনা তো চা নিয়ে এল না।

তাড়াতাড়ি রান্না সেরে নিয়ে এ সময় যমুনাও এসে মেঝেতে বসে টিভি দেখে। টিভি দেখার সময় ওকে নড়ানো যায় না। শুভা কোনও ফাইফরমাশ করলে গ্রাহ্যই করে না। অবশ্য মেয়েটা কাজের। ওর রান্নার হাতও ভাল। সারাদিন হাসিমুখে খাটাখাটুনি করে।

কোন বিরক্তি নেই।

কিন্তু হিরণ্ময় ফিরে এলেই টিভি দেখা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চা আর খাবার করে নিয়ে আসে।

যমুনার ওপর এখন মায়া পড়ে গেছে হিরণ্ময়ের। শুভার তো আরও বেশি।

অথচ প্রথমে হিরণ্ময় আপত্তি করেছিল।

তখনও যমুনাকে চোখে দেখেনি। দেখলে হয়তো কিছুতেই রাজি হত না।

এই ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর কাজের লোক কতবার যে বদল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই বাড়ির ছ ছটা ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরাই নয়, পাড়ার লোকরাও যেন ওত পেতে থাকে কাজের লোক ভাঙিয়ে নেবার জন্যে। যে-কোনও একটা বাড়ির কাজের লোক ছেড়ে গেলেই, কিংবা দুমাস ছুটি নিয়ে দেশে গেলেই সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে। পাঁচ দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে কে যে কাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

প্রথমে মাধব বলে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল।

সে একদিন কাজ করতে করতে শুভাকে বললে, পালবাবুদের বাড়ি হপ্তায় দু'দিন মাংস হয়। শুভা খুব চটে গিয়েছিল। ও বুঝতেই পারেনি ছেলেটা কি বলতে চায়। রেগে গিয়ে বলেছিল, খবর্দারি অন্যের বাড়ির কথা বলবি না। আমি ওসব একদম পছন্দ করি না। কারও হাঁড়ির খবর জানার আমার দরকার নেই।

শুনে হিরণ্ময়ের নিজেরও খারাপ লেগেছিল। ওর মনে হয়েছিল মাধব বলতে চাইছে, এ বাড়িতে ও ভাল খেতে পায় না। কিংবা পালবাবুরা অনেক বড়লোক, ওদের বাড়ির চাকরটা খুব মাছ-মাংস খেতে পায়।

শুভা রেগে গিয়ে বলেছিল, কোন বাড়িতে রোজ মাছ খেতে দেয় রে।

কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা গেল দিনকয়েক পরেই। মাধব মাইনে নিয়ে শার্টটা কাঁধে ফেলে চলে গেল। —আমি আর কাজ করবনি।

পরে জানা গেল দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে পালবাবু তাকে ভাঙিয়ে নিয়েছেন। নিজের বাড়ির জন্যে নয়। সল্টলেকে তাঁর মেয়ের বাড়ির জন্যে।

তখন অনুশোচনা, মাধবের ওপর রাগও।—মাইনে বেশি দিচ্ছে বললেই তো পারতিস। আমরাও বাড়িয়ে দিতাম।

হিরণ্ময় হেসে বলেছিল, তা দিতে না। বললে, বিশ্বাসই করতে না।

শুভা রেগে গিয়েছিল, আমার দিতে আপত্তি হবে কেন, তুমি দিতে পারলেই হল। তখন তো বলতে, চাকরের জন্যে এত লাগছে এত লাগছে।

এই এক জায়গায় হিরণ্ময় চুপ।

তারপর যতদিন নতুন লোক না পাওয়া গেছে, সে কি অশান্তি। হিরণ্ময়কেও খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছে, আপিসের পিওনকে বলেছে, দুধ আনতে গিয়ে রাস্তায় অচেনা কোনও কাজের মেয়েকে ধরে বসেছে, একটা লোক দিতে পারো ?

—ঠিকে ?

হিরণ্ময় বলেছে, না না, ঠিকের লোক আছে। চব্বিশ ঘন্টার, বাড়িতে থাকবে। রান্না না জানলেও হবে, শিখিয়ে নেব।

সে হাত নেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সেও ঠিকের কাজ করে। বলেছে, আমার মেয়েই তো আছে, কিন্তু ঠিকের কাজ করবে। বাড়িতে কে থাকবে বাবু, ভোর পাঁচটায় ডেকে তুলে দেবে, আর রাত বারোটায় ঘুমোতে যাবে। পাঁচ বাড়িতে কাজ করলে আড়াইশো টাকা।

শুভা তো সর্বক্ষণ চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কাজের লোক দেখলেই মিষ্টি হেসে

তাকে ডাকছে। হেসে হেসে বলছে, একটা লোক আছে তোমার খোঁজে ? কিংবা একটা কাজের লোক দেখে দাও না গো। যেন অচেনা সেই ঠিকে ঝি-টা কতদিনের চেনা। কথা বলতে বলতে জিগ্যেস করে, চা খাবে ?

আপিসের উমেশ রসিকতা করে বললে কি হবে, পরম সত্যবাক্যই উচ্চারণ করেছিল। সব ডিভোর্সের মূলে নাকি কাজের লোক, ঝি-চাকর থাকলে তবেই সংসারে শান্তি বজায় থাকে।

শুভার মেজাজ তখন সব সময়ে সপ্তমে চড়ে আছে। হিরণ্ময় কিছু জিগ্যেস করলে সাড়াও দেয় না। বড় জোর 'হ্যাঁ' বা 'না'।

সারাটা জীবন তো এভাবেই চলে এসেছে, অন্তত বিবাহিত-জীবনের এতগুলো বছর। একটা গেছে। আরেকটা এসেছে। মাঝখানের দিনগুলো কি অশান্তি। কি অশান্তি। অথচ শুভা তো পায়ে পা দিয়ে খাটের ওপর বসে থাকে না। সেও সমানে খাটছে। সংসারে এত কি খাটাখাটুনির আছে হিরণ্ময় বুঝতেই পারে না।

শেষ অবধি একটা কাজের মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল।

শুভা বলেছিল, বাচ্চা চাকরে আমার কাজ নেই। চোরছ্যাঁচোড় হয়, কথা মানে না, তার ওপর অন্য বাড়ির চাকরদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কোথায় দুটাকা মাইনে বেশি পাবে খোঁজ করে।

সেই প্রথম মেয়ে ঢুকল। একটা বাচ্চা মেয়ে, ভালো করে ইজেরে গিঁট দিতে পারে না। সেও বোধহয় বছর দুই ছিল। তারপর একটা গেছে, আরেকটা এসেছে। কেউ কেউ তিন চার বছরও টিকে গেছে। রুমি যখন বাচ্চা ছিল তখন দিব্যি বন্ধু হয়ে যেত, একসঙ্গে গল্প করা, লুডো খেলা, হাসাহাসি, দৌড়ঝাঁপ। হিরণ্ময়ের মনে হত রুমির মায়াতেই টিকে থাকছে।

কিন্তু রুমি বড় হয়ে যাওয়ার পর আর মেলামেশা করত না। বরং দাপটে রাখত, হুকুম করত।

এতকাল কম বয়েসী কাজের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল। পার্বতীর তখন কতই বা বয়েস, বারো কি তেরো, রোগা রোগা চেহারার জন্যে আরও কম মনে হত। ওর বাবা এসে নিয়ে চলে গেল, মেয়ের বিয়ে দেবে। মাস কয়েক আগে দেশে গিয়েছিল দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে। ফিরে এসে কিচ্ছু বলেনি।

দুম্ করে একদিন ওর বাবা এসে হাসতে হাসতে বললে, পার্বতীকে নিয়ে যাবো মা, এই অঘ্রানে ওর বিয়ে।

এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা যেন আর নেই।

শুভার তখন মাথায় বজ্রাঘাত।

হিরণ্ময় বোঝাবার চেষ্টা করল, এত কম বয়েসে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আইন আছে, ধরা পড়লে জেল হয়ে যাবে।

পার্বতীর বাবা লাল ছোপ লাগা আঁকাবাঁকা দাঁত বের করে হাসল। বললে, গাঁয়ে কি আর আইন আছে বাবু, ওসব আপনাদের নেগে।

হাসতে হাসতে বললে, গাঁয়ে পাড়াপড়শিরাই আইন।

শেষ অবধি ছেড়ে দিতেই হল। আর পার্বতী চলে যাওয়ার পর একেবারে অন্ধকার। লোক আর পাওয়া যায় না।

শুভা একজনকে ধরেছিল, জোগাড় করে দেবার জন্যে। সে মুখের ওপর বলে দিয়ে গেল, কোথায় পাব, আপনাদের তো হাজার রকম ফরমাশ।

শুভা বললে, ফরমাশ আবার কিসের ?

সে ঝাঁ ঝাঁ করে বললে, বেশি বয়েস হবে না, বাচ্চা চাই, নোংরা হবে না, আবার হিটিং ফিটিং চলবে না। চটপটে...

কাজের মেয়ে রাখা সত্যি বড় ঝামেলার ব্যাপার, অথচ না থাকলে মধ্যবিত্তের সংসার অচল।

হিরণ্ময়ের নিজেরও কোনও হিসেব ছিল না। শুভা একদিন হঠাৎ বললে, দু-মাস হয়ে গেল তার খেয়াল আছে?

একটু থেমে বললে, দু-মাস ধরে রান্না করছি।

হিরণ্ময় প্রথমটা বুঝতে পারেনি, বুঝতে পেরেই রসিকতা করে বললে, সেজন্যেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে, ক্ষিদেও বেড়েছে।

শুভা হাসল না, শুধু বললে, কাল থেকে হোটেলে ব্যবস্থা করো।

আসলে রান্নাটা শুভা একেবারেই নাকি পছন্দ করে না। বিয়ের পর থেকেই শুনে আসছে হিরণ্ময়। কাজের লোক থাকলে তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়। কিন্তু হিরণ্ময় দেখেছে শুভা সর্বক্ষণ রান্নাঘরেই। ঠিক মত পারছে না ভেবে, প্রায়ই তাকে বলে, সর সর, আমিই করে নিচ্ছি।

কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে খাবার জল আনা।

আগের বাড়িতে কাজের লোককে দিয়ে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে কলসী করে জল আনাত। এই ফ্ল্যাটে উঠে এসে একটা সুবিধে হয়েছিল। বীরেশ্বরবাবু হয়তো নিজের পানীয় জলের প্রয়োজনে একটা টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন গ্যারেজের পাশে। শুধু এ-বাড়ির ভাড়াটেরাই নয়, পাড়া-পড়শিরাও অনেকে ওই টিউবওয়েল থেকে জল নিত। সকালের দিকে তো সারাক্ষণই হটাং হটাং চলত।

কিন্তু চারতলায় কলসী-ভর্তি জল তোলা সে এক সমস্যা। কাজের লোক না থাকলে অসুবিধের একশেষ।

হিরণ্ময় বলেছিল, একটা ওয়াটার-ফিলটার কিনে নিই, কি বলো।

শুভা বলে উঠেছিল, পাগল হলে তুমি? ওই পাম্পের জল মুখে তোলা যাবে নাকি? মুখ ধোবার সময় দেখো না, কি নোনা কি নোনা।

হিরণ্ময় আপত্তি শোনেনি, বলেছে, বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে সকলে ওই জলই ফিলটার করে খায়।

শুভা বলেছে, হ্যাঁ সেও খেয়েছি দিদির বাড়িতে গিয়ে, সেও মুখে তোলা যায় না। তাছাড়া ওদের তো ডিপ টিউবওয়েলের জল।

কোন্‌টা ডিপ আর কোন্‌টা নয় সে তত্ত্ব অবশ্য হিরণ্ময়ের জানা ছিল না।

বেশ বুঝতে পারল শুভা এতদিনের অভ্যাসটা বদলাতে রাজি নয়।

শুভা নিজেই আপত্তিটা কেন তা বুঝিয়ে দিল। —দুপুরবেলা রোদগরমে গিয়েছি দিদির ফ্ল্যাটে, জল চাইলাম, ফ্রিজের জল মিশিয়ে দিল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, এক ঢোঁক খেয়ে জল আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। বিস্বাদ!

'বিস্বাদ' কথাটা এমন মুখ বিকার করে বলল, যেন পৃথিবীতে ওর চেয়ে খারাপ জিনিস আর কিছু নেই।

ফলে কেবল এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের কাজের লোকদের পাকড়াও করে, আর অমায়িক হেসে হেসে বলে, এক কলসী জল এনে দেবে ভাই, নীচের টিউবওয়েল থেকে।

অমায়িক হাসি আর অন্তরঙ্গ ভাবটাই যথেষ্ট নয় জেনে সঙ্গে সঙ্গে বলে, একটা টাকা দেব।

এভাবেই চলছিল, একদিন হিরণ্ময় সদ্য আপিস থেকে ফিরেছে, শুভা চা আর রুটি

তরকারি নিয়ে এসে বেশ হাসি-হাসি মুখে বসল খাটের অন্য প্রান্তে। ফুর্তি ফুর্তি ভাব। অনেকদিন এ-রকম দেখেনি হিরণ্ময়।

তারপর শুভা খুশি খুশি মুখে বললে, সুখবর আছে। একটা জুটেছে, কাল আসতে বলেছি।

একটু থেমে বললে, কিন্তু পার্বতীকে যা দিতাম তার চেয়ে কুড়ি টাকা বেশি লাগছে। তার কমে কিছুতেই ওর বাবা রাজি হল না। লোকটা খুব ঘোড়েল।

একটু থেমে আবার বললে, ওরা সব পাড়ার ঝিগুলোর সঙ্গে মিটিং করে মাইনে ঠিক করে আসে, বুঝলে না ? কমে পাবে কি করে !

তখন আর মাইনেটা বড় কথা নয়, লোক পাওয়াই যথেষ্ট।

বাড়ছে, বাড়ছে, বাড়ছে। সব দিকেই খরচ বাড়ছে। জিনিসের দাম বাড়ছে। অথচ মানুষকে সৎ থাকতে হবে। এই রোজগারেই চালাতে হবে। সেজন্যেই রিটায়ামেন্টের কথা ভাবলে হিরণ্ময় বিভ্রান্ত বোধ করে।

উপায় নেই দেখে বললে, তাই দাও, আর কি করবে। পরের মাস থেকে তো ইলেকট্রিকের বিলও বাড়বে। লোডশেডিংও বাড়ছে, বিলও বাড়ছে।

'তাই দাও'। এই একটা কথাতেই শুভা দারুণ খুশি। ও ওসব ভবিষ্যৎ ভাবে না, বর্তমান নিয়েই মশগুল।

উঠে গিয়ে কি একটা কাজ সেরে এল শুভা। ফিরে এসে বললে, বাচ্চা মেয়ে কিন্তু পাওয়া গেল না, এর বয়েস একটু বেশি। বোধহয় ষোল সতেরো, তবে বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে তো মনে হল খুব চটপটে।

—ষোল সতেরো ! খটকা লাগল হিরণ্ময়ের।

এতক্ষণ হিরণ্ময়ও খুশি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বয়েসটা শুনেই আপত্তির ভঙ্গিতে বললে, এ-সব বয়েসের মেয়ে না রাখাই ভাল, দায়িত্ব বেড়ে যায়।

তা শুনে শুভার প্রচণ্ড রাগ। বললে, তা হলে এভাবেই চলবে নাকি ? না পেলে কি করব।

—তবে রাখো। এ ছাড়া আর কি বলবে হিরণ্ময়।

জিগ্যেস করল, বিয়ে হয়নি ?

আপত্তি করেছে বলেই শুভা তখনও বিরক্ত, কিংবা আপত্তিটা ওর নিজেরও ছিল, চাপা দিয়ে রেখেছিল, হিরণ্ময় মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলেই বিরক্তির স্বরে বললে, কি করে জানব ? সিঁদুর তো দেখলাম না, জিগ্যেসও করিনি।

একটু পরে বললে, হয়তো স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের তো ওইরকমই হয়।

হিরণ্ময়ের একটু রসিকতা করে ব্যাপারটা হাল্কা করার ইচ্ছে হল, বললে, হ্যাঁ, ওদের ওইরকমই হয়, আমাদের হলে তাড়ায় না, পুড়িয়ে মেরে দেয়।

পরের দিন আপিস থেকে ফিরে হকচকিয়ে গেল।

রান্নাঘরের সামনে একফালি বারান্দা আছে। পাশেই কলঘর।

সেদিন প্রচণ্ড গরম। বাসের ভিড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে ঘেমে নেয়ে ফিরেছে। তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে তোয়ালে নিয়ে স্নান করার জন্যে কলঘরে ঢুকতে যাবে, থমকে থেমে পড়ল।

সিমেন্টের মেঝের ওপর খড়ি দিয়ে বাঘবন্দি খেলার ছক আঁকা, কি একটা ঘুঁটি নিয়ে নিজে নিজেই লোফালুফি করছে, চাল দিচ্ছে একটা মেয়ে। বছর ষোল-সতেরো হবে, কি আরও বেশি।

সরল গ্রাম্য মেয়ে। পলিমাটির মত গায়ের রং, বড় বড় নির্বোধ চোখ মেলে অবাক

হয়ে হিরণ্ময়ের দিকে তাকাল। তারপর কি মনে হতে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনে হাত লুকোল। অর্থাৎ ঘুঁটিটা লুকিয়ে ফেলল। যেন কত বড় অন্যায় হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে ভয়। তাকাতেও পারল না, মাথা নিচু করল।

কলঘরে ঢুকে গেল হিরণ্ময়, কপাটে খিল দিয়ে শাওয়ারের চাবি ঘোরাল। কিন্তু ছবিটা তখনও চোখে লেগে রয়েছে। একটা আধ-ময়লা ছাপা শাড়ি, হাতে বোধহয় কাচের কিংবা প্লাস্টিকের চুড়ি কয়েক গাছা। কোমর অবধি চুলের ঢল নেমেছে। একেবারে গ্রাম্য সরল, একটা আলগা শ্রী আছে চোখেমুখে, শরীরে।

তখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেনি হিরণ্ময়। স্নান সেরে তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেশ হাসি-হাসি মুখে শুভা বলল, এসে গেছে।

—হুঁ। একটু থেমে হিরণ্ময় বললে, কি নাম কি ?

—যমুনা।

হিরণ্ময় আবার বললে, হুঁ।

তারপর ধীরে ধীরে আপত্তি জানাল, কাজটা বোধহয় ভাল করলে না।

—তোমার তো সবেতেই আপত্তি। লোকে এই বয়েসের মেয়ে কি রাখছে না ? না রাখলে ওরাই বা যাবে কোথায় ?

হিরণ্ময় এর আগে শুধু বয়েস শুনেই অসম্মতি জানিয়েছিল। এখন সে আপত্তি আরও বেশি মেয়েটার দিব্যি সুশ্রী চেহারা দেখে। ওই ময়লা শাড়ি আর কাচের চুড়ি বিদেয় দিয়ে রুমির পুরনো শাড়ি পরলে ওকে কাজের মেয়ে বলে বিশ্বাসই হবে না।

শুভাই সে-কথা বলল।—জানো, ওদের অবস্থা নাকি ভালই ছিল, পরের বাড়িতে ঝি-গিরি কখনও কেউ করেনি। বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, ভারা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেছে।

বেশ বোঝা গেল মেয়েটার ওপর ইতিমধ্যেই মায়া পড়ে গেছে শুভার। হিরণ্ময়েরও এখন আর তাড়াতে ইচ্ছে করছে না।

হিরণ্ময় বলতেও পারল না, তার আপত্তি শুধু বয়েসের জন্যে নয়, মেয়েটা বড় বেশি সুশ্রী। একটা আলগা শ্রী আছে।

এই বয়েসের একটা মেয়েকে, বিশেষ করে কাজের মেয়েকে হিরণ্ময়ের চোখে সুন্দর লেগেছে এমন কথা শুনতেও হয়তো খারাপ লাগবে শুভার। কিছু একটা বলে বসবে কি না কে জানে। তাড়াতে তো পারবে না বুঝতেই পারছে, ওসব বললে উল্টে হয়তো সন্দেহ করে বসবে। ছাপ্পান্ন বছর বয়েসের হিরণ্ময়ের তো ওর চেহারার দিকে, মুখের দিকে তাকাবার কথা নয়। তাকালেও তাকে সুশ্রী লাগবে কেন ?

শুভা আবার বললে, দেশেগাঁয়ে ওদের জমিও ছিল। বাবার রোজগারও ছিল। মাও এসেছিল ওর, কি কাঁদছিল কি বলব। ওর বাবা আর ভারায় উঠতে পারে না বলে কাজ পায় না, বসে বসে খেয়েছে এতদিন, তাই জমিগুলোও সবই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে।

শুনে হিরণ্ময়ের মনেও একটু সমবেদনা জাগল।

ক্ষোভের স্বরে বলল, আমাদের দেশে এ-ছাড়া আর কি হবে। বীরেশ্বরবাবুরা কলকাতা জুড়ে একটার পর একটা প্যালেস বানাবে, তেরতলা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে, আর যারা বানায় তাদের বাড়ির এই বয়েসের মেয়েরা শেষে ঝি-গিরি করতে আসবে। শালার ডেমোক্রেসি !

রাগটা সমাজের বিরুদ্ধে না বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে, হিরণ্ময় নিজেও বুঝতে পারল না। নাকি আসলে যমুনা না কি নাম, ওই সুশ্রী মেয়েটার ওপর সমবেদনা।

পরক্ষণেই হেসে ফেলে বললে, ভাগ্যিস ভারা থেকে পড়ে গিয়ে ওদের ঠ্যাং ভাঙে, তা

না হলে তো কাজের মেয়ে পেতে না।

চাপা গলাতেই বলল, তবু শুভা বলে উঠল, আঃ, আস্তে। শুনতে পাবে।

সেই সময়েই যমুনা ঢুকল মাথা নিচু করে, হিরণ্ময়ের জন্যে রুটি নিয়ে।

শুভা বলে উঠল, বাঃ রে যমুনা, তুই তো খুব কাজের মেয়ে, ঠিক মনে রেখেছিস।

হিরণ্ময়কে বললে, দেখেছো, সেই সকালে বলেছি বাবু এসে রুটি খায়, ঠিক মনে রেখেছে। স্টোভ জ্বালতে শিখে গেছে, সিলিন্ডার বন্ধ করতেও।

শুভা বললে, চল, চা বানানো শিখিয়ে দিই।

যমুনা মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল, চলে গেল।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল, কুড়ি টাকা বেশি চাইছে বলে শুভা বলেছিল, বাবাটা ঘোড়েল, কিছুতেই কমে রাজি হল না। অথচ এখন মেয়েটার গুণগানে পঞ্চমুখ। এখন আর কোনও ক্ষোভ নেই, যমুনার বাবার জন্যে এখন সহানুভূতি। কারণ মেয়েটা কাজের।

বীরেশ্বরবাবুরা প্যালেস বানায় আর রাজমিস্ত্রির মেয়েকে ঝি-গিরি করতে হয়। নিজের কথাটাই আবার মনে পড়ে যেতে হিরণ্ময়ের হাসি পেল। আপিসের উমেশ এখনও পুরোপুরি বুর্জোয়া। কিন্তু সুধাকান্তর কথা শুনে শুনে ও নিজেও কি বদলে যাচ্ছে নাকি? সুধাকান্ত একটু ইউনিয়ন টিউনিয়ন করে, গরম গরম কথা বলে. তার বয়েস কম। কিন্তু রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে বলে হিরণ্ময়ও বোধহয় ওর মত হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে কোথায় কোন রাজমিস্ত্রির পা ভেঙেছে তার সঙ্গে বীরেশ্বরবাবুর কি সম্পর্ক!

বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে রাগটা বাড়ছে কেন তা হিরণ্ময় বোঝে। আসলে গত মাসে বীরেশ্বরবাবু সব ভাড়াটেদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রীতিমত মিটিং। জমিদারবাবু যেন প্রজাদের ডেকেছেন। কর্পোরেশনের বিলগুলো সামনে মেলে ধরে বললেন, ট্যাক্স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, আপনাদের এ-মাস থেকে একশো টাকা করে ভাড়া বাড়াতে হবে।

দু-একজন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

যারা রাজি হল না তাদের দলে হিরণ্ময়। বীরেশ্বরবাবুর কথায় যুক্তি ছিল ঠিকই, হিরণ্ময় দিতে পারত না তাও নয়। ওর ভয় অন্যত্র। এখন চাকরি আছে, একটু টানাটানি হলেও দিতে পারবে। কিন্তু রিটায়ারমেন্টের পর? তখন তো এই ভাড়াটা গুনতেই কষ্ট হবে। এর ওপর আবার বাড়তি ভাড়া? দোতলার ব্যানার্জিবাবু তো বলেই বসলেন, আইন কি বলে আগে দেখি, তারপর। যার যেদিকে সুযোগ আছে তার সদ্ব্যবহার করতে কেউ ছাড়ে না।

ফল হল এই, টিউবওয়েলে চাবি পড়ল।

ব্যানার্জিবাবুই আপত্তি করতে গিয়েছিলেন।—জল দেবেন না মানে? জানেন, ওটা ক্রিমিনাল অফেন্স?

উনি কেবল আইনের রাস্তায় যান।

আইন না দেখিয়ে কাচুমাচু মুখে বললেই তো হত, আপনি বড়লোক, আপনার আর এ টাকায় কি হবে। আমাদের কোনও রকমে সংসার চলে, দয়া করে...

দয়া করত কি না করত কে জানে, তবে আত্মসম্মানে লাগত বৈকি। প্রজা যেন জোড়হাত করে বলছে, জমিদারবাবু, এ বছরটা খাজনা মকুব করে দিন।

আত্মসম্মান! আত্মসম্মান বজায় রেখে বাঁচার উপায় আছে? চুরিজোচ্চুরি করে, ঘুস নিয়ে, ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে তবেই মানুষ এ-যুগে বাঁচতে পারে।

আইনের কথা শুনেই বীরেশ্বরবাবু বললেন, জল বন্ধ করব কেন? পাম্পের জল তো আপনারা পাচ্ছেন। টিউবওয়েলের জল দেওয়ার তো কথা নয়, ওটা তো আমার নিজের জন্যে।

তারপর হেসে বললেন, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। ভাড়া বাড়াননি বলে টাইট দিচ্ছি না।

কথাটা কানে অশ্লীল শোনাল। অভদ্রোচিত।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, এতদিন তো দেখেছেন, পাড়াপড়শিকেও জল দিয়েছি। জল দেয়ার মত পুণ্যকাজ আর নেই।

একটু থেমে বললেন, কিন্তু সারাদিন ধরে কানের কাছে হটাং-হটাং আওয়াজ, সারাক্ষণ উঠোনে জল সপ্‌সপ্‌, লোকে জল ফেলতে ফেলতে যায়, বেশ তো, আপনাদের জন্যে নটা থেকে দশটা, এক ঘন্টা খোলা থাকবে।

সকলে খুশি হয়ে ফিরে এসেছিল।

যার হাতে যেটুকু পুঁজি, সে সেটুকুই মূলধন করে কাজে লাগায়।

নটা থেকে দশটা। এক ঘন্টা হিসেব করে জল আনা সহজ নয়।

কিন্তু ব্যাটা লছমন....

বিহারি ছোকরা লছমন বীরেশ্বরবাবুর পেয়ারের চাকর না দারোয়ান বোঝা দায়। সর্বক্ষণ বগলে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও, উচ্চৈঃস্বরে হিন্দি গান বাজছে। ছোপছাপ জামা পরে, কায়দা করে টেরি কাটে হিন্দি সিনেমার নায়কের অনুকরণে। হয়তো ভেতরে ভেতরে ফিল্মি স্টার হবার বাসনাও আছে। চেহারাটাও খারাপ নয়।

ছোকরার ভাবভঙ্গি এমন যেন সেই বাড়িওয়ালা। ঘড়ি ধরে নটার সময় টিউবওয়েলের চাবি খুলে দেয়, দশটার সময় বন্ধ। কেউ না থাকলে দশটার আগেই চাবি লাগিয়ে দিত। তা নিয়ে নিত্যদিন কাজের লোকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। হট্টগোল। শেষ অবধি তার বাবুকে ডেকে আনত সে। কিন্তু তাঁকেও যে ও সমীহ করত তা নয়।

তার ফলে মিষ্টি হেসে মিষ্টি কথায় লছমনকে হাত করার চেষ্টা করত সকলেই। হিরণ্ময় আর শুভাও।

তোষামোদে কে না ভেজে। বাড়িওয়ালার সম্মতি থাক বা না থাক, লছমন মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে, কি সন্ধের পর কিছুক্ষণ চাবি খুলে দিত।

আসলে রাস্তার টিউবওয়েল থেকেও আনা যায়। কিন্তু সেটা অনেক দূরে, কাজের লোকরা অত দূর থেকে কলসী-ভর্তি জল আনতে চাইত না। তারা বিগড়ে গেলে তো সমূহ বিপদ। তার ওপর রাস্তার টিউবওয়েলে ভারিদের ভিড়, সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। সেখানে পাঠালে সারা বেলা কাবার করে ফিরবে। হয়তো আড্ডা দিয়ে।

আড্ডাকে বড় ভয় শুভার।

একদিন দোকান থেকে কি একটা আনতে পাঠিয়েছিল, দেরি করে ফিরেছে যমুনা। শুভার সে কি বকুনি।—কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলি ?

মুখ কাচুমাচু করে যমুনা দাঁড়িয়ে। বললে, দোকানে কত ভিড়, আমাকে দিচ্ছিলই না, যত বলছি, শুধু বলছে, দাঁড়াও দাঁড়াও।

শুভা বললে, হ্যাঁ সবাইকে দিয়ে দেয়, শুধু তোকেই দাঁড় করিয়ে রাখে।

অর্থাৎ ওর কথাটা বিশ্বাস করেনি।

হিরণ্ময়ের খারাপ লাগছিল যমুনার অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে।

মেয়েটার কথাবার্তা ইতিমধ্যে বদলে গেছে, গ্রাম্য টান আর তেমন নেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা চেহারাটাই বদলে গেছে।

একটা রঙ চটে যাওয়া ছাপা আধময়লা শাড়ি পরে এসেছিল। নোংরা ব্লাউজ আর সায়া শুকোতে দিয়েছিল একদিন, ওদিকের বারান্দায়। দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল হিরণ্ময়ের।

বলেছিল, কাপড়চোপড় তো কিছুই আনেনি, ওকে পুরনো শাড়িটাড়ি থাকে তো...

শুভা বলে উঠেছিল, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। দিয়েছি একটা। একটু থেমে বলেছিল, আগে দেখি টেঁকে কি না।

তারপর একদিন হঠাৎ যমুনাকে দেখে চমকে উঠেছিল।

রুমির ফেলে দেওয়া কিংবা ছিঁড়ে যাওয়া একটা ম্যাক্সি যমুনার গায়ে। মেয়েটা যেন রাতারাতি বদলে গেছে। কে বলবে গ্রাম থেকে আসা একটা কাজের মেয়ে।

হিরণ্ময় ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল।

হিরণ্ময়কে হাসতে দেখে শুভাও।

যমুনা সরে যেতেই শুভা হাসতে হাসতে বললে, রুমি কিছুতেই দিতে দিচ্ছিল না। বলছিল, ওটা দিয়ে তুমি বাসন কিনো।

—কেন ?

শুভা বললে, রুমি হাসতে হাসতে বলছিল, ওটা পরলে ওকেই বাড়ির মেয়ে ভাববে, আমাকে না ঝি মনে করে!

হেসে গড়িয়ে পড়ছিল শুভা।

যমুনার ম্যাক্সি পরা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সে-কথাগুলোই মনে পড়ল। সত্যি, ওকে দোকানে পাঠানোও এক ঝামেলা। ইচ্ছে করেই হয়তো ওকে দাঁড় করিয়ে রাখে, ফস্টিনস্টির কথা কিছু বলে কি না কে জানে।

এই সবের জন্যেই এই বয়েসটাকে হিরণ্ময়ের ভয়। এই সব ভয়ের জন্যেই ও প্রথমে আপত্তি করেছিল। এই বয়েসের একটা মেয়েকে রাখা, এ কি কম দায়িত্বের কথা!

অথচ অকারণে মেয়েটা বকুনি খায়।

ওকে দোকানে পাঠিয়ো না এ-কথাও বলতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ দরকার পড়লে না পাঠিয়েও তো উপায় নেই। বিল্টুকে দিয়ে তো কোনও কাজই হবে না, ও বাড়িতে থাকে কতক্ষণ।

তা হলে তো হিরণ্ময়কেই যেতে হয়। কিন্তু ওরও আপিস থেকে ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে যায়। যাবে কখন।

দু-একদিন বাড়ি ফিরে খেয়াল হয়েছে সিগারেট কিনে আনেনি।

পোশাক ছাড়তে গিয়ে পকেটে হাত দিয়েই বলে উঠেছে, এই যাঃ, সিগারেট আনতে ভুলে গেছি।

এর চেয়ে বিরক্তিকর কাজ আর নেই। বাসে ঝুলতে ঝুলতে এসে এতখানি হাঁটা, তারপর চারতলায় ওঠা, উঠে আবার নেমে হেঁটে গিয়ে সিগারেট কিনে আনা, চারতলায় আবার ওঠা....

ওর মুখে বোধহয় ক্লান্তি আর বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

যমুনা হেসে হাত পাতল ; দিন না, আমি ছুট্টে গিয়ে এনে দিচ্ছি।

শুভার বোধহয় মায়া হল হিরণ্ময়ের ওপর। লোকটা আপিসে খাটাখাটুনি করে এসেছে, বাসে ঝুলতে ঝুলতে, তারপর চারতলায় ওঠা।

কোনও আপত্তি করল না সন্ধে হয়ে গেছে বলে।

যমুনা ছুটে চলে গেল, একটু পরেই এনে দিয়েছিল।

মেয়েটার এই এক গুণ। কাজে কোনও বিরক্তি নেই। রাগ নেই। মুখের ওপর কথা বলে না। সব সময়ে হাসিমুখে কাজ করে। নেশার মধ্যে টিভি দেখা। তাও চটপট রান্না সেরে নেয় আগেই।

সে যদি দোকানে গিয়ে দেরি করে ফিরে থাকে, তার কথাটা অবিশ্বাস করার কি

আছে।

মুখে এসে গিয়েছিল, তবু হিরণ্ময়ের বলতে বাধল। ও তো নিত্যদিন বাজারে যায়। দেখেছে, এই বয়েসের কাজের মেয়েদের কোন কোন ছোকরা দোকানি কোন্ দৃষ্টিতে দেখে। দশ বিশ পয়সা ছেড়েও দেয়। বুঝতে অসবিধে হয় না হিরন্ময়ের। দু-একটা রসিকতাও করে। যে বয়েসের যা ধর্ম।

কিন্তু এ-সব শুভার না জানাই ভাল। জানলেই ওকে আর পাঠাবে না। তখন হিরণ্ময়ের ঘাড়েই পড়বে। ও নিজেই তখন কাজের লোক হয়ে যাবে। কিংবা সেই ভয়েই হয়তো শুভা ওকে দেরি করলেই বকুনি দেয়। দায়িত্ব তো ওরও।

যমুনা বকুনি খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় চোখে জল এসে গিয়েছিল ওর।

—তুই বলতে পারিস না আমার কাজ আছে, তাড়াতাড়ি দাও। প্রায় ধমকের সুরে শুভা বলল।

মাথা নিচু করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল যমুনা।

আর হিরণ্ময় হাসতে হাসতে বললে, একটু আধটু আড্ডা তো দেবেই। একটা লোক সারাদিন মুখ বুজে কাজ করতে পারে! ওরও তো বন্ধু চাই, ওরও তো কথা বলতে ইচ্ছে হয়।

শুভা ঝাঁ ঝাঁ চোখে তাকাল। চাপা গলায় বললে, সেটাই তো চাই না। ওদের কথা বলা মানে তো কে কত বেশি মাইনে পায়, পুজোয় ভাল শাড়ি দেয়, কাদের বাড়ি কালার টিভি আছে....

একটু থেমে বললে, শুধু ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার তাল। আর এরাও তো তেমনি বোকা, সব বিশ্বাস করে বসে...

হিরণ্ময়ের প্রথমটা আশ্চর্য লেগেছিল।

ও কোথায় দায়িত্বের কথা ভাবছিল। একটা ষোল সতেরো বছরের মেয়েকে বাড়িতে রাখার দায়দায়িত্বের কথা। আর শুভা কি না তাকে কারও সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না, পাছে কেউ ভাঙিয়ে নিয়ে যায়।

পরক্ষণেই মনে হল, কিছু ভুল করেনি। পাড়ার কাজের মেয়েগুলোকে তো দেখেছে রাস্তার মোড়ে ঘোঁট পাকায়। যেতে আসতে দু-চারটে কথাও কানে আসে। কোন বাড়িতে ভোর পাঁচটায় ঠেলে তুলে দেয়, কোন বাড়িতে টিভি দেখার সময় যত ফাই ফরমাশ।

হিরণ্ময়ের নিজেরই অবাক লাগল। সত্যি বড় অদ্ভুত মন আমাদের। একটা সরল গ্রাম্য মেয়ে, দিব্যি হাসিখুশি, চটপটে হাতে কাজ করে, বিরক্তি নেই, তার জন্যে মেয়েটার ওপর সকলেই খুশি। মায়াও হয়। আহা, বেচারি কারও সঙ্গে কথা বলতে পায় না, মিশতে পায় না।

শুভার কথাগুলো মনে পড়ল, জানো, ওদের অবস্থা নাকি ভালই ছিল, পরের বাড়িতে ঝি-গিরি কখনও কেউ করেনি। বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, ভারা থেকে পড়ে গিয়ে....

কিন্তু সব মায়ামমতা চাপা পড়ে যায় নিজেদের স্বার্থের কাছে। পাড়ার কোনও কাজের মেয়ে না ওর বন্ধু হয় যায়। তা হলেই ওকে চালাক চতুর বানিয়ে দেবে। হয়তো নতুন জামাকাপড় চেয়ে বসবে, কিংবা মাইনে বাড়াতে বলবে। কাজে ফাঁকি দিতে শিখবে। এও তো এক ধরনের বন্দিদশা।

হিরণ্ময়ের মনের ভেতরটা বলে উঠল, অন্যায়, অন্যায়।

কিন্তু শুভার কথা শুনে নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। সায় দিয়ে বললে,

তা ঠিক্, কারও সঙ্গে মিশতে না দেওয়াই ভাল।

আপিসে উমেশকে হাসতে হাসতে সে-কথাই বলেছিল। বেশ রসিকতা করে বলছিল, শুভার কত দূরদৃষ্টি, সাবধানী, পাছে কাজের মেয়েটা ছিটকে কোথাও চলে যায়....

সুধাকান্ত শুনছিল। শুনে চটে গেল।—আপনারা তো রীতিমত ক্রিমিনাল। এও তো এক ধরনের ক্রীতদাস। একটা ফ্যামিলি অভাব-অনটনের মধ্যে পড়েছে, তার সুযোগ নিয়ে তাকে ক্রীতদাস করে রাখতে চাইছেন।

উমেশ শব্দ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, ভায়া তুমিও একদিন উন্নতি করবে, একটা কাজের লোক রাখতে চাইবে, আর তখন....

সুধাকান্ত রেগে গিয়েছিল। রাগের স্বরেই বলেছিল, নিজেরা চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা তো করেন, অন্য কোম্পানিতে বেশি মাইনে পাওয়া যায় কি না খোঁজখবর করেন, আর ওরা দুটাকা বেশি পেয়ে যদি বাড়ি চেঞ্জ করে...

মিথ্যে নয়, উমেশ যেদিন মাইনে বাড়ার খবরটা এনেছিল, সেদিন উমেশকে তো খুবই খুশি-খুশি লাগছিল।

এসে বলল, একটা সুখবর আছে।

হিরণ্ময়ের কাছে তখন আর কোনও খবরই সুখবর নয়। ভেতরে ভেতরে ও তখন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। যত ভাবে ততই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ও তো চোখের সামনে পূর্ণচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছে, একটা মোটা দাগের দাঁড়ি। পি এফ আর গ্র্যাচুইটির টাকায় বাকি জীবনটা কি করে কাটবে ভেবে থৈ পাচ্ছে না। তাই কোনও কৌতূহলও বোধ করল না।

নীরস মুখে বললে, এখন আর আমার কাছে কোনও খবরই সুখবর নয়, ওসব তোমাদের জন্যে।

উমেশ অতশত বুঝল না। হিরণ্ময়ের মনের ভেতরে তখন কি চলছে বুঝবে কি করে।

ও টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে গতবছর আমরা ক'জন ওপরের গ্রেডের জন্যে আপিল করেছিলাম, ডিরেক্টর পাশ করে দিয়েছেন।

মাসে চারশো টাকা মাইনে বাড়ছে, সেই খবরে উমেশের মুখে উল্লাস।

ভেতরের চাপা বিরক্তি আর বুকের মধ্যিখানের হতাশা যেন বলে উঠতে চাইল, স্টুপিড স্টুপিড। উমেশের এখনও পাঁচ-ছ বছর চাকরি বাকি, সেজন্যেই ও এখনও স্বপ্ন দেখছে।

একদিন হিরণ্ময়ও দেখত। এ-সব খবরে একদিন ওরও মনের মধ্যে উল্লাস জাগত। এখন আর জাগে না। জেনে গেছে, পি এফের সুদের হার ইনফ্লেশনের হারের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। ওর চোখের সামনে তো এখন একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

তা হোক উমেশের আনন্দটা মাটি করে দিতে ইচ্ছে হল না হিরণ্ময়ের।

আর দু-বছর পরেই যে ওর রিটায়ারমেন্ট, সে-কথা উমেশও জানে। শুধু জানে না ভবিষ্যৎ ভেবে এখন থেকেই হিরণ্ময় বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওর ভেতরের দুশ্চিন্তাটা আপিসের সকলের কাছ থেকে সযত্নে চেপে রেখেছে। একদিন বেশ ফুর্তি-ফুর্তি ভাব করে বলেছিল, আর তো দু-বছর, তারপর ভাই এই গোলামি থেকে মুক্তি পাবো। তোমরা মনটন দিয়ে কাজ করো, এসে দেখে যাবো মাঝে মাঝে, আর দিব্যি নিশ্চিন্তে দুপুরে ঘুমোবো। এতকাল চাকরি করে জীবনের শেষে ওটুকু সুখ যদি উপভোগ না করলাম তা হলে তো জীবনই বৃথা।

এমন ভাবে হাসতে হাসতে বলেছিল, যেন রিটায়ারমেন্টে কত সুখ, আর ও সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

ভেতরের দুশ্চিন্তাটা কাউকে জানতে দেয়নি। জানালে আত্মসম্মান থাকে না।

উমেশ অতশত বোঝেনি। চারশো টাকা মাইনে বাড়বে এই গুজবে বিশ্বাস করে ও তখন রীতিমত খুশি। বলে বসল, চলুন হিরণ্ময়দা, আজ একটু চাইনিজ খাবো, এত বড় একটা সুখবর।

উমেশ বুঝতেই পারেনি, হিরণ্ময়ের কাছে এখন আর এটা কোনও সুখবর নয়। আরও দুটো বছর হয়তো আরও একটু সচ্ছলভাবে থাকা যাবে, কিংবা মিতব্যয়ী হয়ে সামান্য কয়েক হাজার টাকা বাঁচানো যাবে। কিন্তু কি লাভ, কতটুকু লাভ!

উমেশেরই বা কি দোষ। হিরণ্ময় নিজেও তো একসময় এই সব তুচ্ছ ছোট ছোট সুখকে অনেক বড় করে দেখেছে।

ও রাজি হয়ে গিয়েছিল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই একটা মিনিবাস, মিনিবাসে বসতে পাওয়া। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও বেশ খুশি-খুশি মনে ফিরেছিল হিরণ্ময়।

দরজার সামনে এসে বেল্‌ বাজাল।

অন্যান্য দিন দু-মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় না। যমুনা কিংবা শুভা, কখনও রুমি প্রায় ছুটে আসে। ওর বেল্‌ বাজানোর মধ্যে হয়তো কোনও বিশেষত্ব আছে, শুনলেই বুঝতে পারে হিরণ্ময় এসেছে।

ছুটে এসে কেউ না কেউ দরজা খুলে দেয়।

কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও কেউই এল না।

আবার বেল্‌ বাজাল হিরণ্ময়।

এবারও একটু যেন সময় লাগল, তারপর খুট্‌ করে খিল খোলার শব্দ। হিরণ্ময় বোধহয় কপাটটা ঠেলে খুলল।

শুভা। মুহূর্তের জন্যে চোখোচোখি হল।

একটা থমথমে মুখ। পলকের জন্যে চোখোচোখি হতেই মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে হিরণ্ময়ের চোখের আড়ালে চলে গেল শুভা।

হিরণ্ময়ের হঠাৎ মনে হল শুভার এই মুখ ও কখনও দেখেনি।

অবাক বিস্ময়ে ও শুভার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে শোবার ঘরটিতে এসে ঢুকল। মনের মধ্যে তখন অদম্য কৌতূহল।

কি ঘটে গেছে? কিছু কি ঘটেছে!

নিজেকে বিভ্রান্ত লাগল হিরণ্ময়ের। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কি কোনও নতুন অশান্তি এনে দিয়েছেন? নাকি যমুনা মেয়েটা পার্বতীর মতই বিনা নোটিসে ছেড়ে চলে গেছে?

কিন্তু তা মনে হল না। শুভার থমথমে মুখেও কেমন একটা বিভ্রান্তির ছাপ যেন দেখতে পেয়েছে ও। বিভ্রান্তি না ভয়? নাকি চোখের আড়ালে থমকে থাকা কোনও চাপা কান্না।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল হিরণ্ময়।

নিত্যদিনের মত যমুনা চা আর খাবার নিয়ে এল না।

হিরণ্ময় মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে এসেছিল। শুধু চা দিস্‌ রে যমুনা, আজ আর কিছু খাব না।

তারপরই শুভার উদ্দেশে বলবে, উমেশ জোর করে ধরে নিয়ে গেল, আমাদের নাকি মাইনে বাড়বে, তাই...

এ-সব কিছুই বলতে পারল না হিরণ্ময়।

পোশাক বদলে কলঘর থেকে এসে চুপচাপ খাটের এক কোনায় বসে রইল ও। কেউ

একজন আসবে এই আশায়।

শুভা, শুভাই হয়তো আসবে। এসে বলবে, কি ঘটে গেছে। কিংবা কিছু ঘটেছে কি না।

কেউ আসছে না দেখে রুমিকে ডাকতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু মনে পড়ে গেল এ-সময় ও একটা টিউটোরিয়ালে পড়তে যায়।

আরও কিছুক্ষণ পরে শুভা সেই থমথমে মুখখানা নিয়ে এল। খাটের বাজুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

অদম্য কৌতূহলের চোখে তাকাল হিরণ্ময়।

শুভার গলা থেকে একটা ভয়মাখা স্বর কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল।—কি করব আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা চাপা কান্নার সুর যেন তাতে মাখানো ছিল।

—কি হয়েছে কি ? ভয়ের সংস্পর্শে হিরণ্ময়ও যেন ভয় পেয়ে গেল, উৎকণ্ঠার স্বরে প্রশ্ন করল ও।

শুভা যেন দাঁড়াতে পারছে না।

ধপ্ করে বসে পড়ল ও খাটের এক প্রান্তে।

হঠাৎ বলে উঠল, ছি ছি ছি, আমাদের বাড়িতে যে এমন একটা শনি এসে ঢুকবে আমি ভাবতেই পারিনি।

হিরণ্ময় যেন আরও ঘাবড়ে গেল। বললে, কি হয়েছে ? বলো স্পষ্ট করে।

শুভা গলার স্বর নামাল। চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে, যমুনা। যমুনা একটা কেলেঙ্কারি করে বসে আছে।

হিরণ্ময় তখনও বুঝতে পারছে না। ওই সরল গ্রাম্য মেয়েটার নিষ্পাপ মুখ তখনও ওর চোখের সামনে ভাসছে।

জিগ্যেস করল, কি করেছে ও ?

অবাক চোখ মেলে শুভা হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকাল। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না হিরণ্ময় !

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল বিন্টু কিংবা রুমি আছে কি না।

তারপর ফিসফিস করে বললে, বলছি তো, যমুনা, ভাল ভাল বলতাম, খুব সরল মনে করতাম, লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসে আছে। শুভার চোখের কোনায় যেন এক বিন্দু জল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত বলল, ওকে নিয়ে কি যে করব আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

হিরণ্ময় তখন একটা ধসে পড়া মানুষ।

কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে, বুকের মধ্যে ভয়। চুতুর্দিক থেকে যেন অনেকগুলো অপবাদের নখ ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

একটা স্ক্যান্ডাল। ওরই বাড়িতে।

শুভা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মেয়েটা শুধু কাঁদছে, কিছুতেই বলছে না, কে ওর এই সর্বনাশ করল।

শুভার গলার স্বরেও কান্না। বলে উঠল, ওকে নিয়ে আমি কি করি বলো তা ?

একটুক্ষণ গুম্ হয়ে রইল হিরণ্ময়। তারপর কঠিন কর্কশ গলায় বললে, তাড়িয়ে দাও, এখনই তাড়িয়ে দাও।

॥ ৩ ॥

আপিসে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিল না হিরণ্ময়। ও সারাক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। আপিসে আসার সময়ে একটা স্টপ পার হয়ে চলে গিয়েছিল।

উমেশ একবার এসে কি সব বলে গেল, ওর কানেও গেল না।

তন্ময়তা ঘুচে গেল হাতের স্পর্শে।—শরীর খারাপ নাকি হিরণ্ময়দা ? হুঁ না কিছুই যে বলছেন না !

সুধাকান্ত এসে হঠাৎ বললে, কি ভাবছেন এত ?

সুকুমার ওর পাশের টেবিলেই বসে, বারকয়েক আড়চোখে লক্ষ করেছে।

সটান উঠে এসে বলল, আপনাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে হিরণ্ময়বাবু। আপনি বরং বাড়ি চলে যান।

হিরণ্ময় তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, অসুস্থ ? কই না তো !

আসলে ভেতরের আতঙ্কটা ও কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না।

একবার ভেবেছিল উমেশকে বলবে।

পরক্ষণেই শুভার সাবধানবাণী মনে পড়ে গিয়েছিল।—দেখো, কাউকে যেন কিছু বলে বোসো না। ও যতক্ষণ না বিদেয় হচ্ছে...

এখন আর যমুনা মেয়েটার জন্যে একটুও মায়ামমতা নেই।

এখন শুধু দুশ্চিন্তা। রিটায়ারমেন্টের দুর্ভাবনা এখন তুচ্ছ হয়ে গেছে এই বিপদের কাছে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলেই যেন শান্তি, সুখ।

ভাবতে ভাবতে একসময়ে ও ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে উঠছিল শুভার ওপর। শুভা কেন নির্মম হয়ে উঠতে পারছে না, নির্দয় হতে পারছে না।

ওর কাছে যমুনা এখন একটা আতঙ্ক।

এই মেয়েটাকে নাকি ও একদিন সরল আর নিষ্পাপ ভেবেছিল। সেই ছবিটা এখনও ওর মনের মধ্যে গাঁথা আছে।

সিমেন্টের মেঝেতে খড়ি দিয়ে একটা ছক কেটেছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটা ঘুঁটি নিয়ে একা একাই বাঘবন্দি না কি যেন খেলছে।

হিরণ্ময়কে দেখে অবাক চোখে তাকাল। কি সরল গ্রাম্য নিষ্পাপ মুখ। হঠাৎ কি মনে হতে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, লজ্জায় আর ভয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, পিছনে হাত লুকিয়ে হাতের ঘুঁটিটা লুকোতে চাইল। যেন কত বড় অন্যায় করে ফেলেছে।

সেদিন ওকে দেখে মায়া হয়েছিল। পলিমাটির মত গায়ের রং, পলিমাটির মতই মোলায়েম, বড় বড় নির্বোধ চোখে কুণ্ঠা আর ভয়।

এখন ভয় হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে। যেন হঠাৎ খুন করে ফেলা একটা মানুষের শবদেহ ওকে গোপনে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে।

শুভা বলেছিল, তোমার তো সবেতেই আপত্তি, সবেতেই ভয়। এই বয়সের কাজের মেয়ে যেন কেউ আর রাখছে না।

ভেতরের চাপা রাগ থেকে ওর বলে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কি, হল তো !

কিন্তু বলতে পারেনি। এখন আর শুভার ওপর রেগে যেতেও পারছে না। এখন শুধু মনের মধ্যে একটাই চিন্তা, কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

—তাড়িয়ে দাও ওকে। এক্ষুনি তাড়িয়ে দাও। কঠিন-কর্কশ গলায় বলেছিল।

তাড়ানো যে খুব সহজ হবে না সে আশঙ্কা বোধহয় ছিল। তাই পরের দিন সকালে আপিসে বেরোনোর সময় বলেছিল, ওর যা মাইনেপত্তর হিসেব মিটিয়ে আরও একশো টাকা বরং দিয়ে দিয়ো।

আরও একশো টাকা! ওটা ঘুস না বিবেকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, হিরণ্ময় ঠিক জানে না। অথচ দু-দিন আগে ও দশটা টাকাও বেশি দিতে রাজি হত না।

স্নিগ্ধ সরল সেই মেয়েটার চেহারা রাতারাতি যেন বদলে গেছে হিরণ্ময়ের দৃষ্টিতে, ও এখন একটা ভয়ঙ্কর মানুষ।

—কি বিপদ বলো তো, কিছুতেই বলছে না কে ওর এই সর্বনাশ করল। শুভার ক্লান্ত আর হতাশার কণ্ঠস্বর যেন কানে বাজছে।

আর সেজন্যেই যেন ভয়টা আরও বেশি। ওই মেয়েটার সামান্য একটা কথা তো যে কোনও বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে। হিরণ্ময় কিংবা বিল্টুর।

মুহূর্তের জন্যে একটা সন্দেহ দেখা দিল, পরক্ষণেই মন বলে উঠল, অসম্ভব অসম্ভব। কিন্তু শুভা কি নিমেষের জন্যেও হিরণ্ময়কে সন্দেহ করতে পারে!

শুভা কিংবা হিরণ্ময় কি ভাবছে সেটা বড় কথা নয়। এই গোপন খবরটা কোনক্রমে জানাজানি হয়ে গেলে আশপাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা কি ভেবে বসবে কে জানে। কিংবা বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবু। উনি তো সুযোগ পাবেন। আর পাড়া-প্রতিবেশী হয়তো আজেবাজে রটনা করে বসবে।

বাড়ি ফেরার সময় হলেই হিরণ্ময় আশা করছিল, ফিরে এসে দেখবে শুভা দুপুরেই একশোটা টাকা বেশি দিয়ে ওকে বিদেয় করে দিয়েছে। তা হলেই মুক্তি।

তা হলেই একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে ও।

একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর বাবা আর মা দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। যমুনার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

বাবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক পা এগিয়ে এল। মুখে হাসি।

বাবা বলছে, মেয়ে আমার কি বলতেছে শোনেন বাবু। বলতেছে মেয়ের মতন ভালবাসেন আপনেরা, কুথাও এ বাড়ি ছেড়ে যাবেনি ও।

মাও হাসছে। বলছে, আপনেদের হাতে দিলাম বাবু, মারেন ধরেন যা করেন ও আপনেদের মেয়ে। আমার মেয়ে বড় ভাল বাবু।

শুভা বলছে, হ্যাঁ সত্যি তো, ও আমার মেয়ের মতই। তোমরা কিছু ভেবো না।

কথাগুলো এখন যেন নিজের কানেই ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে।

—তাড়িয়ে দাও, ওকে এক্ষুনি তাড়িয়ে দাও। হিরণ্ময় বলেছিল। যেন এ বাড়ি থেকে চলে গেলেই ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারে। এখন আর মায়া-মমতার একটুও যেন অবশিষ্ট নেই। নেই কি? তা হলে বারবার যমুনার মুখটা মনে পড়ছে কেন? ভারা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়া মানুষটার, যমুনার বাবার, অসহায় মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেন?

যমুনার বাবা সেই প্রথম দেখা করতে এসেছিল। বাবাকে মাকে দেখে যমুনার চোখ ছলছল। শুভা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এখানে মন টিকছে না নাকি যমুনার? দেশে ফিরে যেতে চাইবে না তো। একটু রাগও হয়েছিল। এত আদর যত্ন, জামাকাপড় দিয়েছে, কাজ ভুল করলে হাসিমুখে আবার বুঝিয়ে দিয়েছে। একটা দিনও বকাঝকা করেনি, তার এই প্রতিদান?

পাছে ওর বাবা-মা ভুল বোঝে তাই শুভা হেসে হেসে বলেছে, ও কি রে যমুনা, কাঁদো-কাঁদো মুখ কেন, আমি কি তোকে মারি না বকি?

ওর মা বলে উঠেছে, না না মা, বকাঝকার কথা তো ও বলছেনি। বাপটার ওপর বড় মায়া মা, তাই কাঁদতিছে। দেশগাঁ ছেড়ে এই পেত্থম কলকেতায় পরের ঘরে এল....

হিরণ্ময় বলেছে, পরের ঘর বলছ কেন. ও তো আমাদের বাড়িরই হয়ে গেছে। মেয়ের মত।

মা সান্ত্বনা দিয়েছে, গঙ্গাও তো এই কাছপানেই রয়েছে, আসবেনি মাঝেমাঝে।

শুভার দিকে তাকিয়ে বলেছে, আমার বড় বেটিও কসবায় কাজ করে মা, ছুটি পেলে আসবে।

সান্ত্বনা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গিয়েছিল।

গঙ্গা ঠিক ওর উল্টো। এসেছে মাঝেসাঝে। যেমন চালাকচতুর, তেমনি ঝনঝনে। কালোকুলো দেখতে, শুধু নাকটাই টিকলো।

এখন তাকেও ভয়।

তাড়িয়ে দাও তাড়িয়ে দাও বলছে বটে হিরণ্ময়, কিন্তু মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তাও রয়েছে। ওর বাবা-মা এসে হাজির হলে তখন কি বলবে। কিংবা ওর ঝনঝনে দিদিটা, গঙ্গা যদি এসে বলে, আমার বুনটা কই ? টাকাকড়ি নিয়ে চলে গেলেও কি যমুনা দিদির কাছে যাবে ? কিংবা দেশে বাবা-মা'র কাছে ?

আপিস থেকে ফিরল হিরণ্ময়, মনের ভেতর একটা প্রবল উৎকণ্ঠা চেপে রেখে। উমেশ কিংবা সুধাকান্ত কাউকেই বলতে পারেনি। কি জানি ওরা কি ভেবে বসবে। কম বয়েসে কত ভুল ধারণা ছিল হিরণ্ময়ের। কিন্তু এই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পৌঁছে দেখছে, চুলেই পাক ধরেছে, শরীর থেকে যৌবন চলে যায়নি। সব শুনলে, উমেশ হয়তো ওকেই সন্দেহ করে বসবে। তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক কথা, হিরণ্ময়ের ভাবতেও ভয়, হয়তো বিল্টুকে সন্দেহ করবে।

এখন সমস্ত মানসম্মান ঝুলছে যমুনা মেয়েটার একটা কথার ওপর। ও কি বলে বসবে কে জানে।

ও তো কিছুতেই বলছে না, কারও নাম করছে না. কি জ্বালা দেখ দিকি। শুভা প্রায় কান্নার স্বরে বলেছিল।

স্কাউন্ড্রেলটা কে কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারছে না ওরা, কল্পনাও করতে পারছে না কে হতে পারে।

আপিসে সারাক্ষণ ওকে অন্যমনস্ক দেখে, কথার উত্তর না পেয়ে উমেশ বলেছিল, শরীর খারাপ নাকি হিরণ্ময়দা ?

সুধাকান্ত এসে হঠাৎ বলেছে, কি ভাবছেন এত ?

পাশের টেবিল থেকে উঠে এসে সুকুমার বলেছে, আপনাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে হিরণ্ময়দা, আপনি বরং বাড়ি চলে যান।

যত শুনেছে ততই ভয় পেয়ে গেছে হিরণ্ময়। এরা না সন্দেহ করে বসে বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে। কি ভয়ঙ্কর ঘটনা। যেন হঠাৎ খুন করে ফেলে একটা মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছে বাড়ির মধ্যে। কিছুতেই সেটা সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

একটা ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে ছিল। হয়তো শুভা বুঝিয়ে সুজিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে শেষ অবধি যমুনাকে বিদেয় করতে পেরেছে।

দরজার বেল্‌টা টিপতেও ভয়-ভয় করছিল।

বেল্ টিপতেই আধ-মিনিটের মধ্যে শুভা এসে দরজা খুলে দিল। যেন ও এতক্ষণ অপেক্ষাই করছিল।

হিরণ্ময় ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করল, গেছে ?

শুভার মুখে তখনও দুশ্চিন্তার ছাপ। মাথা নেড়ে শুধু ইঙ্গিতে জানাল, না।

সেই ক্ষীণ আশাটুকুও উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

পোশাক বদলানোর কথাই ভুলে গেল হিরণ্ময়। চুপচাপ নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে এসে বসল।

শুভাও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল।

ফিসফিস করে হিরণ্ময় প্রশ্ন করল, ও কোথায় ?

চাপা গলাতেই উত্তর দিল শুভা, ওই তো ওখানে, রান্নাঘরের সামনে। সারাদিন শুধু কাঁদছে, দেখে এত মায়া হয়....

মায়া ! সারা শরীর যেন চিড়বিড়িয়ে উঠল হিরণ্ময়ের। কিন্তু একবার যেন যমুনাকে দেখতেও ইচ্ছে হল। আহা, অসহায় একটা মেয়ে। সরল গ্রাম্য। তার কি দোষ। এই ক্লেদাক্ত শহরটাকে চিনবে কি করে।

পরক্ষণেই মনে হ'ল দোষ তো যমুনারই। শুভা তো কত সাবধানী ছিল, দোকানে গিয়ে একটু দেরি করলেই বকুনি দিত। কারও সঙ্গে কথা বলতে, মিশতে বারণ করত। সে কি শুধু স্বার্থের জন্যে। হিরণ্ময় চাপা গলায় জিগ্যেস করল, বিণ্টু রুমি ওরা কিছু জানে না তো ?

—না।

এই এক মুশকিল। শুভার সঙ্গে যে আলোচনা করবে, তাও ফিসফিসিয়ে। যমুনা না শুনতে পায়, বিণ্টু রুমি কিছু না জানতে পারে।

হিরণ্ময় ভাবল, ও নিজেই গিয়ে যমুনাকে চলে যেতে বলবে। যেখানে খুশি ও চলে যাক, যা খুশি করুক। আমার কি দায়। অন্যায় করেছে, তার ফল ভোগ করুক না ও। ওর কান্না দেখে ওই শুভার তো মায়া হচ্ছে, হয়তো বলতে পারছে না। মেয়েদের জন্যে মেয়েদের বড় বেশি মমতা, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না ওদের। নির্মম হতে পারে না।

কিন্তু হিরণ্ময় কি পারবে ? একবার উঠে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াবে ভেবেছিল। কিন্তু সাহস হ'ল না। মেয়েটা হাউহাউ করে কেঁদে উঠে যদি ওর পা জড়িয়ে ধরে ! তখন কি করবে।

শুভা ধীরে ধীরে বললে, ওকে আজ ওর দিদির কাছে পাঠিয়েছিলাম।

চমকে উঠল হিরণ্ময়। ক্ষণিকের জন্যে রেগে গেল। হতাশার গলায় বললে, দিদির কাছে ? কেন ?

শুভা চাপা গলায় বললে, তাকে গিয়ে বলুক, যা করার সে করবে।

—তুমি কি বোকা। হিরণ্ময় বললে, সে তো আমাদের এখন প্যাঁচে ফেলতে পারে। হয়তো বলবে, আমাদের বাড়িতে দিয়ে গেছে, আমাদেরই দায়িত্ব।

হিরণ্ময়ের মনের ভেতরেও সেই কথাটাই গুমরে উঠছিল। আমাদেরই দায়িত্ব, আমাদেরই দায়িত্ব। ওর বাবা-মা তো আমাদের ভরসাতেই দিয়ে গেছে।

হিরণ্ময় বিরক্তির স্বরে বললে, তুমি শেষে ওকে ওর দিদির কাছে পাঠালে ?

একটু থেমে বললে, কি বলেছে ওর দিদি ?

শুভা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, দেখা হয়নি।

একটু থেমে বললে, তোমার জন্যেই তো হল।

হিরণ্ময় একটা জোর ধাক্কা খেল।—আমার জন্যে ? কি বলছো তুমি ? ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে গেল হিরণ্ময়। কি বলবে কিছু ভেবে পেল না।

রাগটা বুঝতে পারল শুভা। সঙ্গে সঙ্গে সেও রেগে গেল।—হ্যাঁ, তোমার জন্যেই। তুমি তো প্রায়ই সিগারেট কিনে আনতে ভুলে যেতে। সন্ধের পর আমি ওকে বাইরে

যেতে দিতাম না। তুমিই তো পাঠাতে ওকে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল হিরণ্ময়ের। যাক্, ও যা ভেবেছিল তা নয়। শুভা যদি ওকেই সন্দেহ করে বসত তা হলে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারত না। না, এ রকম একটা নোংরা সন্দেহ শুভা করতে পারে না। করলে এতদিনের সম্পর্কটা ভেঙে খানখান হয়ে যেত, তখন আর জোড়া লাগত না।

কিন্তু মাথা নিচু হয়ে গেল হিরণ্ময়ের।

সত্যিই তো। ভেবে দেখেনি।

তখন নিজের ক্লান্তিটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এতখানি হেঁটে এসে চারতলায় উঠে কার আর ইচ্ছা হয় আবার নেমে গিয়ে বড় রাস্তার মোড় অবধি হাঁটা। কাছে-পিঠে একটা পান-সিগারেটের দোকানও নেই।

তাই মাঝে মাঝে বলেছে, যা তো যমুনা, সিগারেট আনতে ভুলে গেছি।

যমুনার সব সময় হাসিমুখ। হাত পেতে টাকা নিয়েছে, নিয়েই ছুট্।

হিরণ্ময় কিছু ফাইফরমাশ করলে যমুনা যেন ভীষণ খুশি হত। কিংবা হিরণ্ময়কে খুশি করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল, যখনই ওর রান্নার প্রশংসা করেছে, যমুনার সারা মুখে যেন তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন মনে হচ্ছে ওর দোষেই মেয়েটার আজ এই অবস্থা।

—লোকটা কে তা বলেছে? হিরণ্ময় প্রশ্ন করল।

শুভা চাপা গলায় বললে, ওই সব দোকান-বাজারের লোকটোক হবে হয়তো, কিছু তো বলছে না। শুধু কাঁদছে।

কার দোষ? কার আবার। একটা রাজমিস্ত্রি, সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার চালায়। সে ভারা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া আর অকর্মণ্য হয়ে যায়। তখন তার এই বয়েসের মেয়েকে পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে যেতে হয় কেন? আমরা একটা কাজের মেয়ের জন্যে হন্যে হয়ে উঠি কেন? একটা গ্রাম্য সরল মেয়েকে এই পঙ্কিল শহরের মধ্যে তার বাবা কেন ছেড়ে দেয়? কেন তাকে বড় রাস্তার মোড় থেকে সন্ধের পর সিগারেট কিনে আনতে পাঠাই?

হিরণ্ময় দোষস্খালনের চেষ্টায় বললে, তুমিও তো ওকে বাজারে পাঠাতে।

শুভা রেগে গিয়ে বললে, সে তো দিনের বেলায়। দেরি করলেই বকুনি দিতাম। তখন তোমার কত দরদ, দোকানিরা নাকি সত্যিই কাজের লোকদের দাঁড় করিয়ে রেখে বাবু-বিবিদের আগে দেয়।

হিরণ্ময় চুপ করে গেল। কি আর বলবে। এদের ধারণা, যা কিছু পাপ, যা কিছু অনাচার সবই শুধু রাতের অন্ধকারে ঘটে।

কার দোষ? হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল হিরণ্ময়ের। চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। মনে মনে বললে, দোষ তো ওর ওই শরীরটার। ওর ওই বয়েসটার। আর কারও নয়।

শুভা ততক্ষণে শান্ত হয়েছে। বললে, ও তো রাস্তাঘাট চেনে না, পাড়ার একটা কাজের মেয়ে ওর বন্ধু, তাকে নিয়ে দিদির কাছে গিয়েছিল।

—সর্বনাশ। অবাক হয়ে তাকাল হিরণ্ময়। জিগ্যেস করল, তাকে সব বলেছে নাকি?

শুভা উত্তর দিল, কি করে জানবো। গিয়েছিল, দিদি নাকি দেশে গেছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই।

কথাগুলো কানে গেল, অন্যমনস্কভাবে বললে, দেশে গেছে? দেশে গেল অথচ

যমুনার সঙ্গে দেখা করে গেল না ?

বলল বটে, কিন্তু হিরণ্ময়ের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। পাড়ার একটা কাজের মেয়ে ওর বন্ধু, তাকে নিয়ে দিদির কাছে গিয়েছিল যমুনা। কিন্তু তার কাছে সব কথা বলে ফেলেনি তো ? একজনকে বললেই তো সকলে জানবে, তাদের কাছ থেকে পাড়ার সব বাড়ির গিন্নিরা। কাজের মেয়েদের কাছ থেকেই তো এ বাড়ি ও বাড়ির খবর জোগাড় করে ওরা।

হিরণ্ময়ের মনে হল কাজটা ভাল করেনি শুভা। ওকে কি দিদির কাছে যাওয়ার পরামর্শ শুভাই দিয়েছে।

ওর দিদি গঙ্গাকে দু-চারবার দেখেছে হিরণ্ময়, দুবার বোধহয় বাবা-মা আসতে পারবে না বলে গঙ্গাই ওর মাইনেটা নিয়ে গেছে।

পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে খুব ওস্তাদ। শেষবার টাকাটা নিতে নিতে বলেছিল, এ মাইনেতে আজকাল আর কেউ কাজ করে না।

অর্থাৎ মাইনে বাড়াও।

শুভা কোনও উত্তর দেয়নি।

দিদিটা বলেছে, এ মাস থেকে দশটা টাকা বাড়িয়ে দেবেন্‌।

শুভা বিরক্তির স্বরে বলেছে, সে তোমার বাবার সঙ্গে কথা হবে, তুমি টাকা নিতে এসেছো নিয়ে যাও।

সেই ঝনঝনে বুদ্ধির মেয়েটার কাছে কিনা যমুনাকে পাঠিয়েছিল শুভা!

গঙ্গাকে কোনও বিশ্বাস আছে নাকি। ও তো সুযোগ বুঝে ওদের ঝামেলোয় ফেলতে পারে। মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস দেখা হয়নি।

—ওকে দিদির কাছে পাঠিয়ে কাজটা ভাল করনি। হিরণ্ময় বলল।

শুভা ওর মুখের দিকে তাকাল। বললে, আমি কি পাঠিয়েছি নাকি ? ও নিজেই যেতে চাইল।

একটু থেমে বললে, ও কি চুপচাপ বসে বসে কাঁদবে! ওকেও তো কিছু একটা করতে হবে।

কিছু একটা করতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। কি করবে হিরণ্ময় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু তাড়িয়ে দিতে পারলেই যেন নিস্তার পেয়ে যেত।

আমাদের কি দোষ। তুই অন্যায় করেছিস, শাস্তি তোকেই পেতে হবে।

পাপ করেছে, অন্যায় করেছে। হিরণ্ময়ের হঠাৎ মনে হল পাপপুণ্যের বিচার করার আমি কে। পাপপুণ্যের বিচার কি এত সহজে হয় ?

এই বয়েস একদিন হিরণ্ময়ের নিজেরও ছিল। সেদিন নিজের শরীরকে নিজেই চিনত না। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল বিল্টুরও তো সেই বয়েস। আঠারো পেরিয়েছে।

না, যমুনার সঙ্গে বিল্টু কথাবার্তা বিশেষ বলত না। যমুনাও কাছ ঘেঁসতে চাইত না। কেমন লজ্জা লজ্জা ভাব করত খেতে দেবার সময়।

সরাসরি প্রশ্নও করত না, শুভাকেই দরজা থেকে প্রশ্ন করত, দাদা কিছু নেবে মা ?

শুভা চুপচাপ বসে ছিল খাটের এক কোণে।

হঠাৎ বললে, কি একগুঁয়ে মেয়ে বাবা, কিছুতেই বলছে না কে।

আবার একটু চুপচাপ।

—অনেক করে জিগ্যেস করতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আজ। শেষে বললে, এই বাড়িরই লোক। শুনে তো আমার হাত-পা কাঁপছিল।

হিরণ্ময়েরও হাত-পা কেঁপে উঠল। —কি বলছ ?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। —কে যে হতে পারে আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

হিরণ্ময় কোনও কথা বলল না, ওর শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে।

এই বাড়িরই লোক? কি বলতে চায় যমুনা? নাকি সব মিথ্যে কথা, দিদিটার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে-ই এ-সব বলতে শিখিয়ে দিয়েছে।

হিরণ্ময়ের সম্বন্ধেও কি কোনও সন্দেহ দেখা দিয়েছে শুভার মনে? কথাবার্তায় তো কই বোঝা গেল না।

তা হলে কি...

হিরণ্ময় হঠাৎ বললে, বিল্টু কোথায়!

—ও তো পড়ছে।

হিরণ্ময় কি মনে হতে হঠাৎ সেদিকেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল।

শুভা দ্রুত এগিয়ে এসে ওর হাতখানা ধরল। বললে, তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল? ছি ছি ছি, তুমি বিল্টুর কথা ভাবতে পারলে?

শুভা ওর চোখে চোখ রেখে তাকাল। বলল, আমি জিগ্যেস করেছি যমুনাকে। আমাদের বাড়ির কথা বলছে না ও, এই বাড়িটার কথা বলছে।

হিরণ্ময় নিশ্চিন্ত হল। বললে, বিল্টুর কথা আমি ভাবিনি।

তবু তার ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল।

এ ঘরে একটা ডাইনিং টেবল। সেটাই ওদের পড়ার টেবিল। দেখল, এক প্রান্তে বিল্টু বই খুলে পড়ছে। অন্য প্রান্তে রুমি খাতায় খসখস করে লিখে চলেছে, হয়তো নোট তুলছে।

হিরণ্ময় গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বললে, পড়াশোনা ঠিক ঠিক করছিস তো। তোর তো পরীক্ষা এসে গেল।

মুখ তুলে বিল্টু হাসল। ঘাড় নাড়ল।

বিল্টুর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল হিরণ্ময়। না, এ মুখে কোনও অন্যায় লুকিয়ে নেই।

যমুনাকে দেখেও কি কোনদিন মনে হয়েছিল।

শরীর বড় অবিশ্বাসী। এদের এই বয়েসটাও।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। একটা দৃশ্য।

অনিমেষের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

অনিমেষ ওর কলেজের বন্ধু। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেও বেকার জীবনে ওদের আড্ডার ছেদ পড়েনি। একে একে সকলেই দূরে সরে গেল। অনিমেষ আর হিরণ্ময় দুজনেই চাকরি পেল। কিন্তু দু'জন দুপ্রান্তে। তারপরও ওদের নিয়মিত দেখা হত, আড্ডা জমত। সব মনে হয় এই সেদিন।

কি করে যে বছরগুলো দ্রুত পার হয়ে গেছে কে জানে।

অনিমেষ দু-দুটো মেয়ে আর একটা ছেলেকে নিয়ে তখন ঘোর সংসারী। আসা-যাওয়া আগের মত আর ছিল না, তবু বিপদে-আপদে পরস্পর পরস্পরের কাছে ছুটে আসত। কোথাও ছেদ পড়েছে মনে হত না। তিন মাস কি ছ'মাস পরে দেখা হলেও মনে হত এই যেন গতকাল চায়ের দোকানে বসে গল্পগুজব করে গেছে।

খুব গাঢ় বন্ধুত্ব দুজনের।

অনিমেষের বড় মেয়ে মীনার তখন এই রকমই বয়েস। ষোল কি সতেরো। শরীর সবে পাপড়ি খুলেছে, পবিত্র নিষ্পাপ শ্বেতপদ্মের মত মনে হত মীনাকে।

অনিমেষের ছোট ছেলেটি তখন আট কি দশ। যে দেখত সেই ভালবেসে ফেলত।

মীনাও ওকে খুবই ভালবাসত।

হিরণ্ময় একদিন হঠাৎ গিয়েছে। মীনা ওকে দেখেই এক মুখ হেসে চিৎকার করে ডাকল, ভাইয়া, ভাইয়া, দেখে যা কে এসেছে।

মীনা যখন 'ভাইয়া' বলে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করত দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত।

কি সুখী সংসার ছিল অনিমেষের। তার জীবনে যে এমন একটা অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে হিরণ্ময় কোনদিন ভাবেনি।

হঠাৎ একদিন আপিসে তার একটা ফোন এল। অনিমেষের ফোন। —হিরণ, এক্ষুনি একবার আসতে পারবি আমার বাড়িতে? ছেলেটার ভীষণ অসুখ, কি করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

হিরণ্ময় চলে গিয়েছিল।

দেখে অসহ্য লেগেছিল। কি একটা দুর্বোধ্য রোগ। ছেলেটা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই বলেছে, মাথায় যন্ত্রণা। দেখতে দেখতে ওর সারা শরীর নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি।

বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ে যান।

কে যেন হিরণ্ময়কে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীত সেদিন।

অনিমেষ আর অনিমেষের স্ত্রী হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে আছে। রুগীর ঘরে যেতে পায়নি। অপেক্ষা করে আছে, ডাক্তারের কাছ থেকে এতটুকু ভরসা যদি পায়।

অনেক রাত অবধি বসে থেকে কিছু মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে চলে এসেছিল হিরণ্ময়। মিথ্যেই তো।

আসার সময় অনিমেষের প্রতিবেশী ভদ্রলোক যিনি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর হাতে পাশের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে এসেছিল।

ভদ্রলোকই চেয়েছিলেন।

ফিরে এসে ও সবে খেতে বসেছে, শুভার কাছে বলছে, অনিমেষের ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, রোগ ধরতে পারছে না কেউ...

ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ি থেকে কে যেন হিরণ্ময়ের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। জানালায় গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, আপনার ফোন, আপনার ফোন। বলেছেন, খুব জরুরি।

হিরণ্ময়ের শরীরটা বোধহয় সেদিন ভাল ছিল না, সকাল থেকেই কেমন জ্বর-জ্বর। তারপর হাসপাতালের বাইরে হাড় কাঁপানো শীতে ঘন্টা-দুই কি তারও বেশি থাকতে হয়েছে।

তবু একটা চাদর গায়ে দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গেল।

অনিমেষের প্রতিবেশী সেই ভদ্রলোক। বললেন, শিগগির আসুন একবার, আসুন।

হিরণ্ময় উৎকণ্ঠার স্বরে বললে, কেন কেন? কি হয়েছে?

—ভাইয়া এই মাত্র মারা গেল।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। একটু পরেই ফোন কেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল হিরণ্ময়।

শোকে পাগল অনিমেষের চেহারাটা, অনিমেষের স্ত্রীর চেহারাটা যেন কল্পনায় দেখতে পেল হিরণ্ময়। মীনার শোকস্তব্ধ মুখ। যেন 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে চিৎকার করছে, কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে তার শরীরের ওপর।

বাড়ি ফিরে এসে ঘড়ি দেখল হিরণ্ময়। রাত বারোটা।

পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের ওপর কৃতজ্ঞতাবোধ করল। এই এত রাত্রেও উনি উঠে ফোন ধরেছেন, ডেকে দিয়েছেন। ভাবল কাল সকালেই ধন্যবাদ দিতে হবে। কথাটা ওর সে-সময় মনেই হয়নি।

কিন্তু এত রাত্রে এত দূর পথ ও যাবে কি করে। বাস পাবে কি? কিংবা ট্যাক্সি। তাছাড়া এই কনকনে শীত, অসুস্থ শরীর, অসুস্থ আর ক্লান্ত।

ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে পড়ল হিরণ্ময়। ভাবল, এখন গিয়ে কি লাভ, এখন কি কোনও সান্ত্বনা আছে।

শরীর বড় অবিশ্বাসী।

শুভাকে বললে, কাল ভোরবেলাই চলে যাব।

গিয়েছিল।

প্রতিবেশীর দল, আত্মীয়-স্বজন তখন ভিড় করে আছে।

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল হিরণ্ময়ের। এত দিনের এত গাঢ় বন্ধুত্ব, অথচ শুধু শরীর ভাল ছিল না বলে হাড়-কাঁপানো শীতের ভয়ে ও আসেনি।

মানুষের শরীর বড় বিশ্বাসঘাতক।

ঘরের ভিতরে ঢুকল ও। কে যেন বললে, ডেড-বডি আনতে গেছে।

হিরণ্ময় দেখল, অনিমেষ নিশ্চুপ বসে আছে। অনিমেষের স্ত্রী যেন বসে থাকতে পারছে না, দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে, চোখে অর্থহীন উদাস দৃষ্টি। যেন পৃথিবী ওদের কাছে শূন্য হয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ও চুপচাপ বসে ছিল।

কে একজন এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে গেল হিরণ্ময়ের সামনে, আরও যারা ছিল তাদের সামনে।

অনিমেষের স্ত্রীর সামনেও এক কাপ চা দিয়ে গেল কে।

যন্ত্রের মত কিছু না বুঝেই উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চায়ের কাপটা তুলে নিল অনিমেষের স্ত্রী, চায়ে চুমুক দিল।

হিরণ্ময়ের হঠাৎ মনে হল শরীর বড় বিশ্বাসঘাতক।

অনেকক্ষণ বসে থেকে হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে এসে এর ওর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনল। ডাক্তাররা কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। জলজ্যান্ত একটা ছেলে, স্কুল থেকে ফিরল মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে, সারা শরীর নীল হয়ে গেল, সময় দিল না, মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল।

ভাইয়া, ভাইয়া। মীনার ডাকটা যেন কানে লেগে আছে। বহুকাল আগে শোনা। বেচারি মীনা।

কি মনে হতে আবার ভিতরে ঢুকল হিরণ্ময়। এঘর ওঘর করে মীনাকে খুঁজল। ওকে একটু সান্ত্বনা দেবে। আর তো কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না।

অনিমেষকে নয়, অনিমেষের স্ত্রীকে নয়।

হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে পড়ে মীনাকে দেখতে পেল। পবিত্র নিষ্পাপ শ্বেতপদ্মের পাপড়ি খোলা সেই ষোল-সতেরো বছরের মীনাকে।

কি আশ্চর্য। একটা অচেনা যুবক ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মীনা। রসিকতা করছে তার সঙ্গে। চোখে রং, মনে নেশা।

মীনাকে দেখে মনে হল ওর দুটো চোখ, সেই পবিত্র নিষ্পাপ চোখ প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে আছে। হাসছে।

যেন পৃথিবীতে কোথাও কিচ্ছু ঘটেনি।

সদ্য মৃত তার আদরের ভাইয়ার শবদেহ তখনও হাসপাতালে। মীনা হাসছে, প্রেমিকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

সেই ঘটনা, সেই দৃশ্যটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। হিরণ্ময় মনে মনে বললে, শরীর বড় অবিশ্বাসী। তোর কোনও দোষ নেই যমুনা, শরীরের মত বিশ্বাসঘাতক আর কেউ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় সতর্ক হয়ে গেল। ও কি শুভার মতই যমুনার ওপর মায়া-মমতায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ?

যমুনাকে এত সরলভাবে বিশ্বাস করার কি আছে। সেই ক্রিমিনালটাকে ও এত আড়াল করতে চাইছে কেন। এই নির্মল সারল্যের পলিমাটিতে গড়া মূর্তিটাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে, কে সেই স্কাউন্ড্রেল। জানতে পারলে, তাকে হাতে কাছে পেলে এখনই যেন খুন করবে হিরণ্ময়।

এই সব আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দেদের মুখের ওপর দিয়ে কল্পনায় হিরণ্ময় চোখ বুলিয়ে গেল। কে হতে পারে, কে। না না, এরা কেউ নয়।

নিজের ঘরটিতে আবার ফিরে এল হিরণ্ময়। কি করবে কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না।

শুভা বললে, ওর বাবার ঠিকানাটা তো রাখা হয়েছিল, তাকেই বরং চিঠি দাও। এসে নিয়ে যাক তার মেয়েকে। ...তার গুণের মেয়েকে।

এ-কথাটা হিরণ্ময়েরও একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

ওর বাবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে যখন দরজার সামনে দাঁড়াবে তখন তার দিকে মুখোমুখি তাকাতেই পারবে না হিরণ্ময়। কি বলবে ও ?

একটা ভয়ও আছে। সব জানার পর হয়তো চেঁচামিচি শুরু করবে, হিরণ্ময়দেরই ঘাড়ে দোষ চাপাবে। আমরা তো আপনাদের ওপরই বিশ্বাস করে রেখে গিয়েছিলাম। বলেছিলেন মেয়ের মত। আপনারাই তো কাচের বাসনের মত সাবধানে রাখবেন।

যমুনার মার কথাটা মনে পড়ে গেল।

একবার দেখা করতে এসেছিল, যমুনার বাবার সঙ্গে।

মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, ভাল ভাবে থাকবি, যা বলবেন ওনারা শুনবি।

যমুনা লাজুক হাসি হাসছিল সে-সব কথা শুনে।

যমুনার মা শুভার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনেদের কাছে দিয়ে গ্যালাম মা, ওর ভালটি মন্দটি এখন আপনেদের হাতে।

যাবার সময় বলেছিল, একটু সাবধানে রাখবেন মা, আপনেকে আর কি কইবো, মেয়েছেলে কাচের বাসন, ঠুক করলেই দশখান।

ওরা যখনই আসত, কিংবা ওর বাবা মাইনে নিয়ে যেত, শুভা খুব আদর-অ্যাপ্যায়ন করত ওদের। বলত, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসে বোসো।

ভেতরে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসত ওরা।

রুমি তা দেখে একবার বুঝি বলে উঠেছিল, দেয়ালে পিঠ দিয়ো না, দেয়ালে পিঠ দিয়ো না।

শুভা যে শুভা, সেও বলে উঠেছে, থাক্ থাক্।

অথচ কে কোথায় দেয়ালে ঠেস দিয়েছে সেদিকে শুভারই বেশি চোখ থাকে।

ঠিকের মেয়েটা বাসন মাজতে এসে একদিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের পাতা দেয়ালে লাগিয়েছে, শুভা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল।

যমুনাকে প্রথম প্রথম সাবধান করত।

আসলে দেয়ালে দাগ লাগে, ময়লা হয় বলেই এত সাবধানতা।

কিন্তু যমুনার বাবা-মার বেলায় আপত্তি করেনি। বোধহয় ভয়, যদি অসন্তুষ্ট হয়, যদি নিয়ে গিয়ে অন্য বাড়িতে লাগিয়ে দেয়। সবাই তো হন্যে হয়ে আছে, কাজের লোক পাচ্ছি না, কাজের লোক পাচ্ছি না। যমুনাকেও রাস্তায় দু-এক বাড়ির গিন্নি নাকি ধরেছিল, একটা কাজের মেয়ে আছে রে তোর খোঁজে? একজন তো জিগ্যেস করেছিল, কত পাস? যমুনা কিচ্ছু বলেনি, বললেই হয়তো দশটাকা বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙিয়ে নিতে চাইত।

পাড়ার লোকরা সব অদ্ভুত। সব পাড়াতেই হয়তো এই রকম। বেশি মাইনেতে লোক রাখলে রাস্তায় দেখা হলেই বলবে, আপনাদের আছে দিচ্ছেন, কিন্তু এভাবে বাড়িয়ে গেলে তো আর লোক রাখাই যাবে না। পাড়ার সবাই যদি এক মাইনে না দেন....

অথচ কম দিলে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে। কিংবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, কি হাড়কঞ্জুস লোক মশাই, এত খাটায়, আর মাইনে দেয়...

আজকাল আবার আরেক ঝামেলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে, আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। বাচ্চা রাখার জন্যে, রান্নাবান্না করার জন্যে কাজের মেয়ে রাখে। সারাক্ষণের লোক। বেশি মাইনে দিতে তো ওদের গায়ে লাগে না, দুজনের রোজগার।

দায়ে পড়েই যমুনার বাবা-মাকে এত আদর-আপ্যায়ন।

ভেতরের প্যাসেজটায় বসিয়ে চা-জলখাবার দিত, বাড়িতে মিষ্টি থাকলে দু-একটা মিষ্টিও।

একবার তো ডাইনিং টেবলের চেয়ারটাতে বসতে দিয়েছিল, এখানে বোসো, এখানে বোসো। সেটা দেয়ালে ঠেস দেবে এই ভয়ে, না একটু বেশি আদর-আপ্যায়ন দেখানোর জন্যে, তা অবশ্য বোঝা যায়নি।

রুমি একটু চটে গিয়েছিল। ও এসব আদিখ্যেতা পছন্দ করে না। কাজের লোকের বাবা-মাও তো কাজের লোক। ও চায় ওরা একটু নিচু হয়েই থাকুক।

বলেছিল, মা, তুমি ওদের কিন্তু মাথায় তুলছ।

শুভা রেগে গিয়ে বলেছিল, তুই তো এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে পারিস না। আমার কথা আমাকে ভাবতে দে।

এখন আর মাথায় তোলার প্রশ্নই ওঠে না। মাথার ওপরেই যেন ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনাকে যত না ভয়, যমুনার বাবা-মাকে তার চেয়ে বেশি।

না জানি এসে সব খবর শুনলে কি করে বসবে। হয়তো চিৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলবে। তারপর কি হবে হিরণ্ময় ভাবতেও পারে না। সকলে তো বলবে ওরই দোষ, বাপ-মা বিশ্বাস করে রেখে গেল, আপনারা তো তাকে সাবধানে রাখবেন।

মেয়েছেলে কাচের বাসন, ঠুক করলেই দশখান। যমুনার মার কথাটা মনে পড়ল।

তবু ওর বাবার দেওয়া ঠিকানাটা আছে কি না দেখার জন্যে হিরণ্ময় উঠে গেল। কপাটের আড়ালে রাখা তারের ফাইলটায় রাজ্যের কাগজপত্র গাঁথা থাকে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল হিরণ্ময়, পেল না। না পেয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি।

শুভা হঠাৎ বললে, শোনো, হৃষি তো তোমার খুব বন্ধু, ও তো ডাক্তার।

সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ের মনে হল, ও যেন একটা মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছে। কি আশ্চর্য, হৃষির কথা ওর একদম মনে পড়েনি। হয়তো অনেককাল দেখা নেই বলেই।

শুভা বললে, কালই চলে যাও। আর গড়িমসি কোরো না, সময় চলে যাচ্ছে।

॥ ৪ ॥

যমুনাকে ও এ কদিন দেখেনি, কিংবা দেখতে পায়নি। দেখার চেষ্টাও করেনি।

এক একবার ইচ্ছে হয়েছে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রশ্ন করে। যা জানবার জেনে নেয়।

শুভাকেই যখন বলেনি, তখন হিরণ্ময়ের কাছে কি মুখ খুলতে পারবে ? ও তো আরও লজ্জা পাবে। তবে ধমকধামক দিলে হয়তো কথা বেরোতে পারে। একটাই ভয়, নিজেকে। ক্ষণে ক্ষণেই তো মেয়েটার ওপর প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছে। কখনও-কখনও শুভার ওপরেও।

ধমক দিলেও ও যদি টুঁ শব্দটি না করে, হিরণ্ময় না রেগে গিয়ে চড়চাপড় দিয়ে বসে। এত বড় একটা মেয়ের গায়ে হাত তোলা, সে তো আরও ভয়ঙ্কর। আরেকটা ভয়, যমুনা না হাউ হাউ করে কেঁদে ওর পা জড়িয়ে ধরে বলে বসে, আমাকে বাঁচান বাবু, আমাকে বাঁচান। তখন আর হিরণ্ময় এত কঠোর থাকতে পারবে না।

যমুনা এ ক'দিন ধারেকাছেও আসেনি। লুকিয়ে লুকিয়ে আছে। কিংবা শুভাই হয়তো ওকে ধারেকাছে আসতে দিচ্ছে না।

আপিস থেকে ফেরার পর প্রতিদিনের বরাদ্দ চা আর রুটি তরকারি, কোনদিন দুখানা লুচি আলুর দম, একদিন মাছের কিংবা মোচার চপ, এ সবই বানাত যমুনা, নিয়ে এসে দিত সে-ই। শুভা ধৈর্য ধরে দিনে দিনে ওকে শিখিয়েছিল।

বাঃ, মাছের চপটা দারুণ হয়েছে। তুই করেছিস ?

লাজুক লাজুক মুখে হাসি, ঘাড় কাত করে 'হ্যাঁ' বলেই লাফাতে লাফাতে ছুটে পালাত। গিয়ে শুভাকে বলত, বাবু বলছে খুব ভাল হয়েছে। কি খুশি !

সেই যমুনা এখন আর কাছেই আসে না। আসে না, সেও এক স্বস্তি।

শুভাই এনে দেয়। রান্নাবান্না অবশ্য যমুনাই করছে, আন্দাজে বুঝতে পারে। একটা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা কিংবা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েটা ম্লান হয়ে গেছে বলেই যে কাজ থেকে রেহাই পাবে তা তো নয়।

—আমার কিন্তু আগে থেকেই কেমন সন্দেহ সন্দেহ ঠেকছিল। দুঃসংবাদটা দেওয়ার পর শুভা একদিন বলেছিল।

—কই বলোনি তো কোনদিন। তা হলে তো আগেই তাড়ানো যেত।

—নিশ্চিন্ত না হয়ে পরের মেয়ে সম্পর্কে যা-খুশি বলা যায়! শুভা থমথমে মুখে বলেছিল, কিছুদিন থেকেই দেখছি ওকে কেমন যেন আলসেমিতে পেয়ে বসেছে। কাজ ভুল করছে, ফাঁকি দিচ্ছে। এ কদিন তো দেখছিলাম, যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ছে।

হিরণ্ময় ধরে নিয়েছিল সেজন্যেই হয়তো শুভা চা-জলখাবার নিয়ে এল।

সদ্য সদ্য দুঃসংবাদটা শুনেছে শুভার কাছ থেকে। তখন হিরণ্ময় একেবারে ধসে পড়া মানুষ। বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না।

'তাড়িয়ে দাও, ওকে এখনই তাড়িয়ে দাও', রাগের মাথায় বলেছে। কিন্তু তাড়ানো যে সহজে যাবে না তাও জানত।

চুপচাপ বসে কাটিয়েছে রাত দশটা পর্যন্ত।

এমনিতেই চাইনিজ খেয়ে এসেছিল উমেশের জেদাজেদিতে। শুভার কাছে সে-কথা বলার সুযোগও ঘটেনি। খিদেও ছিল না।

রাতের খাবার দিয়ে শুভা ডাকল, খাবে এসো। চিৎকার করে বললে, বিণ্টু রুমি খাবি আয়।

মেয়েরা কেমন যেন যন্ত্রের মত। এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, কিন্তু কাজকর্মগুলো শুভা ঠিক ঠিক করে যাচ্ছিল।

হিরণ্ময় উঠে গিয়ে ডাইনিং টেবলে বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। খাব না, খিদে নেই, বলতে পারল না।

রুমি এ-সময় রোজই ঘুমিয়ে পড়ে, ওকে ডেকে ডেকে তুলতে হয়।

শুভা আরও দুবার হাঁক দিতেই বিল্টু আর রুমি এসে বসল। রুমি তখন চোখ রগড়াচ্ছে।

শুভা থালা নামাল।

বিল্টু বলে উঠল, ও কি, তুমি দিচ্ছ কেন মা, যমুনা কি ভাগলবা নাকি ?

বিল্টুর কথাবার্তা ওই রকমই।

শুভা রেগে গেল, কেন আমি দিলে কি তোদের মুখে রুচবে না ?

ভাতে হাত না দিয়ে পটল ভাজাটা চিবোতে চিবোতে বিল্টু বললে, আঃ লাভলি। রুচবে না মানে, তোমার রান্নার হাত যদি গ্র্যান্ড ওবেরয় জানত, তা হলে তো তোমাকে ওর হেড-কুক বানিয়ে দিত।

অন্যান্য দিন বিল্টুর এ ধরনের কথায় হিরণ্ময়ও মজা পেত। বিশেষ করে ও যখন ওর মাকে খ্যাপাবার চেষ্টা করত।

কিন্তু হিরণ্ময়ের অসহ্য লাগছিল। ওর বুকের মধ্যে তখন একটা ধক্‌ধক্ আওয়াজ।

রেগে গিয়ে বললে, নে নে জ্যাঠামি করতে হবে না, খেয়ে নে।

বিল্টু তো জানে না কি ঘটে গেছে। তাছাড়া বাবাকে ওরা ভয়ও পায় না। দিব্যি প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে বলেই।

হিরণ্ময়ের ধমক শুনে মাকে ছেড়ে আধো ঘুমন্ত রুমির দিকে মন দিল। বললে, রুমি, সাইলেন্টলি খেয়ে নে, বাপি আজ আউট অফ মুড।

বলেই ওর পাতের মাছটা তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে রুমি ঝগড়ার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, দেখলে মা, আমার মাছটা...

—ও, তুই বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দেখতে পাস ?

বলে মাছটা ফেরত দিয়ে দিল।

হিরণ্ময়ের ভাল লাগছিল না। অথচ এ-সব ও বেশ উপভোগই করে। এই ভাই-বোনের ঝগড়াঝাটি, বিল্টুর মজার মজার কথা।

বিল্টু আবার বললে, তোমার সেই জমিদার-কন্যা কি ছেড়ে চলে গেছে ?

শুভা তার কথার উত্তর দিল না।

জমিদার-কন্যা মানে যমুনা। ওরা দু-ভাইবোনে কাজের লোকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, এমনভাবে হুকুম চালায় যেন সে কাজের লোক ছাড়া কিছু নয়। জল চাইলে, দু-মিনিট দেরি হলে হম্বিতম্বি। সে যে রান্নাঘরে কড়াইয়ে কিছু চাপিয়েছে, সে হিসেব রাখে না।

যমুনা তখন সদ্য এসেছে। দু-দুটো মাস নাজেহাল হয়ে গিয়ে শেষ অবধি কাজের মেয়ে একটা জুটেছে।

রুমি কি জন্যে যেন ওর ওপর হুকুম চালাচ্ছিল ধমকের ভঙ্গিতে।

শুভার ভয়, ওদের জন্যে শেষে না এ মেয়েটাও পালায়। তাই বলেছিল, ওভাবে কথা বলিস না। ওরা কখনো পরের বাড়িতে কাজ করেনি, দেশে গাঁয়ে জমিজমা ছিল, ওর বাবাও ভাল রোজগার করত। ভারা থেকে পড়ে গিয়ে...

সেই শুরু। মাঝেসাঝেই তাই বিল্টু ঠাট্টা করে বলত, যমুনা তো কাজের লোক নয়,

মায়ের গ্রামের জমিদারের মেয়ে।

'জমিদার-কন্যা' কথাটা শুনে শুভা মুহূর্তের জন্যে রেগে গিয়েছিল। তবু সামলে নিয়ে বললে, ওর শরীর খারাপ।

—ওঃ, তাই বলো। তোমার তো কাজের লোক দু'মাসের বেশি টেঁকে না, তাই ভাবলাম ভাগলবা বুঝি।

শুভা বললে, টেঁকে না তোদের জন্যেই।

ব'লে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

হিরণ্ময়ের খিদে ছিল না, ও উঠে পড়ল। বেশ বুঝতে পারল, যমুনা ওদের সামনে আসতে পারছে না। লজ্জায়, ভয়ে।

আড়ালে আড়ালে থাকছিল।

সেজন্যেই হিরণ্ময় এ কদিন যমুনাকে দেখেনি। দেখার চেষ্টাও করেনি।

শুধু একবার এক ঝলকের জন্যে চোখে পড়েছিল।

হিরণ্ময় স্নান করে মাথায় তোয়ালে ঘসতে ঘসতে কলঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, রান্নাঘরের দিকে চোখ গেল। রান্নাঘরের বাইরের বারান্দায় বসে আছে, দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে। কান্না চেপে, নাকি ওর দরজার ছিটকিনি খোলার আওয়াজ শুনে মুখ লুকোবার জন্যে, তা অবশ্য বুঝতে পারেনি।

ও মুখ তুলতেই চোখোচোখি হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে হিরণ্ময় দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে এসেছিল।

সেই যমুনার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি, সিঁড়িতে।

অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছিল। আগের দিন রাত থেকেই ভেবে রেখেছিল দেরি করে আপিসে যাবে। আর তো দুবছর, তারপরই রিটায়ারমেন্ট। দরকার হয় ক্যাজুয়েল নিয়ে নেবে। পুরো দিনই ছুটি নিয়ে নেবে।

হিরণ্ময়ের নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল। দুদিন আগেও ওর বুকে চেপে বসেছিল একটাই দুশ্চিন্তা। রিটায়ারমেন্ট। বারবার হিসেব কষেছে ওর সামান্য যা জমানো টাকা আছে, এবং পি এফ-গ্র্যাচুইটির টাকা তুলে নিয়ে বাকি জীবনটা কিভাবে কাটাবে। সংসার চলবে কিনা। এক সময়ে একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট কেনারও বাসনা জেগেছিল, সম্ভব নয় বুঝে গেছে বলেই এখন আর চিন্তাও করে না। এখন মনে মনে শুধু হিসেব করে রিটায়ারমেন্টের পর কোন্ কোন্ খরচ কমানো যাবে। যাবে কি!

হিরণ্ময়ের নিজেরই আশ্চর্য লাগল, ভবিষ্যৎ ভেবে যে নিরাপত্তার অভাবে ও ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছিল, হঠাৎ এই বিপদের মুখে পড়ে সেই ভয়টা কোথায় উবে গেছে। এখন আর রিটায়ারমেন্ট ওর কাছে কোনও ভয়ই নয়। টাকাপয়সা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে।

এখন ভয় একটাই। আত্মসম্মান বাঁচানো।

আত্মসম্মান! কে কি ভেবে বসবে, কে কি বলে বসবে। পাড়ায় যদি জানাজানি হয়ে যায়।

ভয় যমুনার বাবা-মাকেও। ওর দিদিটা যদি এসে হাজির হয়, কি জানি কি বলে বসবে।

হিরণ্ময় একবার ভাবার চেষ্টা করল ওর বাবা-মা ধূর্তামি করে ওকে কোনও প্যাঁচে ফেলতে পারে কিনা। এ নিয়ে কি কোনও মামলা-মোকদ্দমা করতে পারে। আইন তো ভালমত জানে না ও।

সিকিউরিটি। নিরাপত্তা। এই সব নিয়েই এতদিন ভেবেছে। এখন সেটা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে, কারণ চোখের সামনে এখন আত্মসম্মান বজায় রাখার প্রশ্ন। বিপদ থেকে

উদ্ধার পাওয়াই এখন বড় সমস্যা।

মধ্যবিত্ত মানুষ নাকি নিরাপত্তার অভাব নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। সব সময় ভয়, চাকরিটা থাকবে তো! চাকরি থাকলেও মনে ভয় এই চেয়ারটা থাকবে তো! চাকরি থেকে অবসর নিয়েও ভয় পিছু ছাড়ে না। সংসার চলবে তো! যাদের প্রচুর আছে তাদের বোধহয় এ-সব ভয় থাকে না। যাদের নেই, তাদের কিছু হারাবার ভয়ও থাকে না।

ভয় থাকে না ঠিকই। তবে জমিজিরেত চলে গেলে, কিংবা ভারা থেকে পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া হলে তাদের বাড়ির নিষ্পাপ সরল গ্রাম্য মেয়েটাকে পরের বাড়িতে এই পাঁকে ডোবা শহরে এসে ঝি-গিরি করতে হয়। আর মনিবের ফরমাশ খাটতে খাটতে কখন পিছলে পড়ে গিয়ে দুহাঁটুর ফাঁকে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয়।

হিরণ্ময়ের কাছে নিরাপত্তার চেয়ে আত্মসম্মানই বড় হয়ে উঠেছে। সারাজীবন বোধহয় মধ্যবিত্ত মানুষকে, নিরাপত্তার অভাব নয়, আত্মসম্মানই তাড়া করে বেড়ায়। আপিসে, পাড়াপড়শির কাছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সামনে তোষামোদে কাজ হয়, কিন্তু ওপরওয়ালাকে তোষামোদ করতেও ভয়, কলিগরা বলবে, লোকটার কোনও সেল্‌ফ্-রেসপেক্ট জ্ঞান নেই, পাড়া-পড়শির কাছে গিয়ে বলা যাবে না, মশাই, কাজের মেয়েটা একটা কাণ্ড করে বসেছে, কি করা যায় বলুন তো! ভয়, সব জেনে গিয়ে পাঁচকান করবে, কি না কি বলে বসবে। আত্মীয়স্বজন মানেই তো গুপ্তশত্রু, লুকিয়ে হাসাহাসি করবে, ঘরে একটা জোয়ান ছেলে, চটকদার একটা কাজের মেয়ে রেখেছে, লজ্জাও করে না!

রাজ্যের দুশ্চিন্তা আর ভয় নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ছিল হিরণ্ময়।

—শোনো, হৃষি তো তোমার খুব বন্ধু, ও তো ডাক্তার।

শুভা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল ও যেন একটা মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছে। আশ্চর্য, হৃষির কথা ওর একদম মনে পড়েনি, হয়তো অনেককাল দেখা নেই বলেই।

একসময় খুব বন্ধু ছিল, তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

একে অনেক দূরে থাকে, তার ওপর মাঝখানে কয়েক বছর আপিসের কাজের চাপে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। বিকাশের সঙ্গে আড্ডায় ছেদ পড়েছিল সেই কারণেই।

বিকাশের এখন গাড়ি-বাড়ি। এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতেই সেদিন লজ্জার একশেষ।

কি অপমানটাই না করেছিল বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুর মস্তান ছেলেটা। ব্যাটা লছমন, ওই বিহারি চাকরটা, সে তো আরেক কাঠি আগে যায়।

হারামজাদা। নটা থেকে দশটা, এক ঘন্টা টিউবওয়েল খুলে রাখার কথা, ব্যাটা সাড়ে নটায় কোন-কোনদিন চেন লাগিয়ে তালা দিয়ে দিত। কি না, বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিংবা, কেউ জল নিতে আসেনি, ভাবলাম সবাই নিয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম কি ঝামেলাই না করত।

ইদানীং আর তেমন অসুবিধে ঘটাত না। এক-একদিন সন্ধের পরও চাবি খুলে দিত। যমুনা গিয়ে জল নিয়ে এসেছে। গরমের দিনে সকালে এক কলসী জল আনলেই তো রাত অবধি চলে না।

শুভা একদিন যমুনাকে বলেছিল, তুই গিয়ে একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে বল না, দেখ চাবি খুলে দেয় কিনা।

দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই দিত।

এক কলসী খাবার জলের জন্য বাড়িওয়ালার চাকরটাকে তোষামোদ করতে হয় দেখলে বিকাশের কাছে আর আত্মসম্মান থাকত না।

সেদিন বাড়িওয়ালার মস্তান ছেলেটা তো রীতিমত অপমান করেছিল, বিকাশ গ্যেটের সামনে গাড়ি রেখেছিল বলে। সেটা তো বিকাশকে অপমান নয়, বিকাশের সামনে হিরণ্ময়কে অপমান।

তার আপিসে কিংবা বাড়িতে সময় পেলেই যেতে বলে গিয়েছিল বিকাশ। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও হিরণ্ময় যেতে পারেনি, ওই অপমানটার জন্যেই।

হৃষির সঙ্গে দেখা করবে বলেই তাড়াতাড়ি বের হচ্ছিল। বিকাশের কথাও মনে পড়ে গেল। বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি, ভাবল ওকে বললে হয় না ? ও হয়তো কোনও উপায় বাতলে দিতে পারে।

বাড়িতেই চেম্বার হৃষির। হয়তো রুগির ভিড় থাকবে।

মনে মনে ভাবল, কতদিন তো দেখা নেই, সেও বোধহয় এখন জোর প্র্যাকটিস চালিয়েছে। বাড়ি-গাড়ি করে ফেলেছে। সময় দিতে পারবে কিনা কে জানে। অন্য রুগির সামনে তো আর বলা যাবে না।

হিরণ্ময় হৃষির সঙ্গে দেখা করবে বলেই বের হচ্ছিল।

সিঁড়ির বাঁকে যমুনার সঙ্গে মুখোমুখি।

হিরণ্ময় নামছিল, আর যমুনা এক কলসী জল নিয়ে ওপরে উঠছিল।

সামনাসামনি হতেই যমুনা ঝট্ করে মাথা নামিয়ে নিল।

সঙ্কোচ হিরণ্ময়েরও। এতকাল দেখেছে, সামনাসামনি কথা বলেছে। কিন্তু হিরণ্ময় ওকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল, পাশে সরে দাঁড়াল। আর যমুনা তরতর করে উঠে গেল।

যমুনা আসার পর এই একটা সমস্যা মিটে গিয়েছিল। ঠিকের লোক একটা আছে, সকালে এসে বাসন মেজে দেয়, ঘর মুছে দেয়। কিন্তু তার আনা জল শুভা খেতে পারে না। বলে, কি নোংরা, কি নোংরা, ওর আনা জল খাওয়া যায় নাকি।

আরেকটা সমস্যা ছিল। র‍্যাশন আনা।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল, র‍্যাশন আনতে গেলেই অনেক দেরি করে ফিরত যমুনা। শুভা বকাবকি করলে হেসে বলত, লাইনটা গিয়ে দেখুন না, শিবমন্দির অবধি চলে গিয়েছিল।

কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। কথাটা তো মিথ্যে নয়। র‍্যাশন আনা মানেই একটি ঘন্টা। কিন্তু এখন হিরণ্ময়ের সন্দেহ হচ্ছে, ওই র‍্যাশন দোকানেরই কেউ নয় তো।

শুভা একদিন বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল, এ এক ফালতু ঝামেলা, এই র‍্যাশন। কার্ডগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেই হয়।

—না-না না। বাধা দিয়েছে হিরণ্ময়।

র‍্যাশন দোকান থেকে কিছুই নেয়া হয় না। ওদের চাল তো মুখে দেওয়া যাবে না, তেলটেলে বিশ্বাসও করে না কেউ। কদাচিৎ গম নিয়েছে। কিন্তু কার্ডগুলো তো চালু রাখতে হবে, কি জানি কখন কি কাজে লেগে যায়। শুনেছে তো অনেক কথা। জমি রেজিস্ট্রি করতে গেলে কোনও কোনও রেজিস্ট্রার নাকি চেয়ে বসে। পাশপোর্ট চাইতে গেলে। না থাকলে কখন কি বিপদে পড়বে কে জানে। সেজন্যেই এ ঝঞ্ঝাট। মাথা-পিছু একশো চিনি পাওয়া যায়, ধুলোর মত, চায়ে দিলে এক মুঠো দিতে হয়। তবু নিতে হবে, কার্ড চালু রাখতে। না দিলেই কার্ড বরবাদ। যে কার্ড কোনও কাজে দেয় না, তার জন্যে হপ্তায় দেড় দু-ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কাজের লোককে। যাদের কাজের লোক নেই, তাদের তো নিজেদেরই দাঁড়াতে হয় লাইনে। তাদের এক ঘন্টা সময়ের দাম কি কম ?

র‍্যাশন দোকানের যে লোকটা বসে বসে বিল্ কাটে, মধ্যবয়স্ক, তাকেই সন্দেহ হল।

কপালে তিলক কাটা, বাঙালি। ওই মালিক কিনা কে জানে।

একবার হিরণ্ময় গিয়েছিল খোঁজখবর নিতে।—আচ্ছা, মাসে শুধু একবারই র‍্যাশন তুললে হয় না, কার্ড চালু রাখার জন্যে ?

লোকটা তখন একটা বছর তিরিশ বয়েসের কাজের মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে। মেয়েটাও বেশ অঙ্গভঙ্গি করে গল্প করছিল। হেসে হেসে কথা বলছিল।

তিলক-কাটা শেষে বললে, দিয়ে দিচ্ছি, টাকাটা পরের হপ্তাতেই দিয়ে দিস।

বেশ বোঝা গেল, মেয়েটার র‍্যাশন তোলার টাকা নেই। ধার চাইছে।

র‍্যাশন দোকানের লোক এত দয়ালু হয় জানা ছিল না। ওরাও ধার দেয় ? কেন দিল তা বোঝাই গেল।

তিলক-কাটা রসিকতায় এতই মেতে ছিল যে হিরণ্ময় দাঁড়িয়ে আছে একটা কথা বলবে বলে, গ্রাহ্যই করল না।

এদিকে লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলো চেঁচাচ্ছে। লাইনে দাঁড়ান, লাইনে দাঁড়ান। যেন হিরণ্ময় র‍্যাশন তুলতে এসেছে।

মেয়েটা চলে যেতেই হিরণ্ময় আবার বললে, মাসে একবার র‍্যাশন তুললে হয় না, কার্ড চালু রাখার জন্যে ?

—না স্যার।

তিলক-কাটার মুখে এতক্ষণ মাখন মাখানো রসগোল্লার রসে ভেজানো কথা গলে গলে পড়ছিল অনর্গল। মেয়েটা চলে যেতেই গলার স্বরও বদলে গেল। ধারে র‍্যাশন দিতেও যাকে অকৃপণ হতে দেখেছে এই মাত্র, হিরণ্ময়ের বেলায় কথা খরচ করতেও সে লোকটার কার্পণ্য।

সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে এই আশা করেই হিরণ্ময় এসেছিল, হতাশ হতে হ'ল বলে বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললে, কি যে আপনাদের সিস্টেম !

লোকটার কানে গেল। মাথা না তুলেই ক্যাশ মেমো লিখতে লিখতে বললে, গরমেন্টকে বলবেন যান।

চলে আসতে আসতে ও বললে, গরমেন্টের কি ব্রেন বলে কিছু আছে।

এক ভদ্রলোক, লাইনেই ছিলেন, বললেন, ব্রেন ঠিকই আছে দাদা। খাটছে অন্যদিকে। আমরা তো লাইনে দাঁড়িয়ে কার্ড চালু রাখছি, কিন্তু আমাদের নামে মাল ঠিকই চলে যাচ্ছে ব্ল্যাকে।

হিরণ্ময় হাসতে হাসতে চলে এসেছিল।

এতকাল মনে পড়েনি। এখন মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই শিউরে উঠল।

ওই শালা তিলক-কাটা নয় তো !

যমুনা তো সব সময়েই বলত, কি লম্বা লাইন।

ফিরত এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পরে। কেউ কিছু সন্দেহ করত না। শুভা যদিবা কখনও খনও জিগ্যেস করেছে, এত দেরি হল কেন, তাও অন্য সন্দেহ থেকে। ভেবেছে হয়তো জের মেয়েদের জটলায় আড্ডা দিয়েছে, আর তারা মাথায় দুর্বুদ্ধি ঢোকাচ্ছে। মাইনে ড়াতে হয় কি করে, শেখাচ্ছে। আর নয়তো লোভ দেখাচ্ছে, ছেড়ে আয়, ভাল বাড়ি খ দোব।

বাসে উঠে মনে মনে ভাবল, শুভাকে বলতে হবে। জিগ্যেস করে দেখুক, র‍্যাশন োকানের লোকটা কিনা। ধরা পড়ে গেছে বুঝলে হয়তো স্বীকার করবে।

ও তো বলেছে এই বাড়িরই লোক, অথচ নাম বলেনি। নির্ঘাত ওটা মিথ্যে কথা। চাপে পড়ে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। এই বাড়িরই লোক। তাহলে নামটা বলছে না

কেন ?

কেন যে বলছে না তাও এক রহস্য। কোনও একটা নাম বলে দিলে এত ভয় থাকত না। কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। দু-পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে হামলা করাও যেত।

তবে লাভ কিছু হত না। মেয়েটাকে তো এখন বাঁচতে হবে।

ওদের সমাজ-টমাজ কেমন ঠিক জানে না। আমাদের মতই হবে হয়তো। ভাবল হিরণ্ময়। তবে ঠিকের লোকগুলো যারাই এসেছে, মাঝেমাঝেই তো বদল হয়, সব এক গল্প। কোলে বাচ্চা নিয়ে কেউ নিজেই চলে এসেছে স্বামীর কাছে মারধোর খেয়ে, কাউকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন ঠিকে-ঝি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দু-একজন অবশ্য নিজেরা রোজগার করে অক্ষম কিংবা মাতাল স্বামীকে খাওয়ায়।

উমেশ আর সুধাকান্তর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে করতে একদিন উমেশকে সুধাকান্ত বলেছিল, আমরা তো শুধু আমাদের কথাই বলি, মধ্যবিত্তের কথা, এদের কথা তো বলেন না দাদা।

উমেশ রসিকতা করে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমদের সিস্টেমটাই ভাল সুধাকান্ত। এই সিস্টেম না থাকলে ভাবো তো দশ বিশ লক্ষ ঠিকে-ঝি আমরা কোথায় পেতাম ? কে সাপ্লাই দিত ?

একটু থেমে বলেছিল, কলকাতায় নিত্যদিন সকালে কতগুলো ঠিকে-ঝিয়ের স্পেশাল ট্রেন আসে জানো ? তার ওপর বস্তিগুলো।

এলোপাথাড়ি এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন পৌঁছে গেছে খেয়ালই করেনি হিরণ্ময়।

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভিড় ঠেলে, কারও পা মাড়িয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। পিছনের রাগী উত্তেজিত হুল্-ফোটানো অশালীন কথাগুলো শুনেও শুনল না।

হৃষিই এখন ওর সামনে স্রোতের মুখে খড়কুটো। ওদের সংসারে তো এখন একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। সারাক্ষণ ভয়-ভয়, কেউ না কিছু জেনে যায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, একটা আতঙ্ক। এই না যমুনার বাবা-মা এসে দাঁড়ায়। কিংবা ঝনঝনে দিদিটা।

ভূত দেখার মত ভয় নিয়ে তাকাতে হবে।

কাউকে যে-কথা বলতে পারেনি, হৃষিকে অনায়াসে বলতে পারে। ও হয়তো একটা উপায় করে দিতে পারবে। তাছাড়া এখানে-ওখানে বলে বেড়াবে না। হৃষি অনেককালের বন্ধু। কিন্তু এতকাল দেখা নেই, হঠাৎ গিয়ে হাজির হতেও সঙ্কোচ। হয়তো ভাববে; কাজ পড়েছে তাই এসেছে।

নীচের তলায় চেম্বার।

ঢুকেই মনটা মুষড়ে পড়ল।

চেম্বারের সামনে ছোট বসার ঘরখানা এককালে, প্রাকটিস শুরু করার সময়, খুব ভাল করে সাজিয়েছিল হৃষি। হিরণ্ময় এসে দেখে গিয়েছিল।

একটা দেয়ালে দেয়াল-জোড়া ওয়াল পেপার, সুন্দর ডিজাইন, শিলিং অবধি একখানা সুন্দর ছবির ঝকঝকে প্রিন্ট। ফোমের গদি আঁটা শোফা-কুশন, মডার্ন ডিজাইনের। না, ফোম নয়, তখন বোধহয় ডানলোপিলো ছিল।

চিনতে অসুবিধে হল। সে ঘরখানাই নয় যেন। ভুলে অন্য কোথাও ঢুকে পড়েনি তো।

না। সেটাই।

ধুলো পড়ে পড়ে দেয়ালের ওয়াল পেপার আর ছবি অজন্তা গুহাচিত্রের মত বিবর্ণ,

লুপ্ত। খুঁজে বের করতে হয়। শোফা-কুশনের নোংরা চেহারা দেখে বসতে ভয় হবে রুগিদের, এখান থেকেই না কিছু ইনফেকশন নিয়ে যেতে হয়। মেঝের কার্পেটে পানের পিক, ধুলো, শুকিয়ে যাওয়া জুতোর কাদা, আরও কত কি।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই চেম্বারের ভিতরটা দেখতে পেল।

সুইং ডোরের আধখানা নেই, বাকি আধখানা কব্জা ভেঙে ঝুলছে।

হৃষি বসে আছে। সামনের টেবিলে স্তূপীকৃত কি-সব কাগজপত্র। ওষুধ কোম্পানির বিজ্ঞাপনের।

হিরণ্ময়কে দেখেই তিড়িং করে উঠে দাঁড়াল হৃষি।—আরে হিরণ, তুই! কি মনে করে। আয় আয়।

হিরণ্ময় হাসি হাসি মুখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হৃষির মুখের দিকে।

বললে, আমিও খুব বুড়িয়ে গেছি, না রে!

—বোস্। বোস্।

হৃষি নিজেও বসল। তারপর হাসতে হাসতে বললে, ইট্স এ ক্লেভার ওয়ে অফ সেয়িং হোয়াট ইউ মিন। মানে বলতে চাইছিস আমি বুড়িয়ে গিয়েছি, এই তো?

হিরণ্ময় বললে, না।

ও তখনও হৃষিকে দেখছে। হাসতে হাসতে বললে, জানিস হৃষি, আয়নাও মিথ্যে কথা বলে। নিজেকে রোজ দেখছি, কিন্তু ধরতে পারিনি আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তোকে দেখে বুঝতে পারলাম।

বছর তিনেক আগে, পাঁচও হতে পারে, শেষ দেখা নিউ মার্কেটে। এখন দেখল, হৃষির মুখে বার্ধক্যের রেখা পড়েছে, মাথার মাঝখানটা চুল উঠে গিয়ে টাক বড় হয়েছে। বিস্তৃত টাক ঘিরে যা চুল আছে তার সবই প্রায় সাদা। মাত্র এই কটা বছরে।

—যাঃ কি যে বলিস, ইউ আর কোয়াইট ইয়াং। মানে আমার তুলনায়।

হিরণ্ময় হাসল। বললে, ছাপ্পান্ন। দু-বছর পরেই বেকার হয়ে যাচ্ছি।

—রিটায়ার করছিস?

—হ্যাঁ।

হৃষি কেমন আনমনা হল। বললে, আমি তো জন্ম-বেকার। কাকে কি শোনাচ্ছিস।

হিরণ্ময় বুঝতে পারলে না হৃষি কি বলতে চায়। ও ভাবল হৃষি তো কোনদিন চাকরি করেনি, হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, সে কথাই বলছে।

ও ততক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরখানা দেখছে, টেবিল চেয়ার, খোলা দরজা দিয়ে রুগিদের বসার ঘরখানা যতখানি দেখা যায়।

খুব খারাপ লাগছিল। বলেও ফেলল, কি করে রেখেছিস। ধুলোয় ঢেকে আছে যে সব। ঝাড়পোঁছ করাতে পারিস না। কি সুন্দর চেম্বার ছিল তোর। ও ঘরে ওয়ালপেপার, ছবি।

বিষণ্ণ হাসল হৃষি। —ওই কুশন-টুশন? দু-একজন রুগি এলে তারাই জামাকাপড়ে ধুলোগুলো নিয়ে যায়।

তখনও হিরণ্ময় ভাল বুঝতে পারছে না। বললে, আমি তো ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে কথা বলতেই পাব না, পেশেন্টে গিজগিজ করছে ঘর।

অট্টহাস করে হেসে উঠল হৃষি।

—খুব টাকা করছি তাও নিশ্চয় ভেবেছিস?

—হ্যাঁ। করারই তো কথা। আজকাল ডাক্তারদের তো পোয়াবারো। পাঁচ সাত বছরে বিরাট বড় লোক হয়ে যায়। বাড়ি করে, গাড়ি করে। ছেলেমেয়েকে আমেরিকা

পাঠায়।

হৃষি কলমটা নিয়ে টেবিলের ওপর পাতা কাচটায় ঠুকল।

বললে, সবই সত্যি। তবে শুধু ফর লাকি ফিউ। ভাগ্য কয়েকজনকে বড়লোক করে দেয়, আর কয়েকজন হয় যোগ্যতায়। কিন্তু আসলে প্রাকটিস জমাতে হ'লে চাই হাসপাতাল।

একটু কি যেন চিন্তা করল, তারপর বললে, ওটাই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। বলে হাসল। বললে, কত ডাক্তারকে তো জিনিয়াস মনে হত, কি রমরমা প্রাকটিস, কিন্তু যেই রিটায়ার করল, দুবছর পরে দেখি আর রুগি আসে না। আমার এমনিতেও আসত না। এখনও আসে না।

হিরণ্ময় ভাবল একটু বেশি বিনয় দেখাচ্ছে। বললে, রুগি আসে না যদি তো ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছো কেন বাবা।

হৃষি হেসে উঠল। বললে, আসে। দু-একটা আসে, এই আশপাশের। তবে বেশির ভাগই পাড়ার চেনা লোক, ফি দেয় না।

হিরণ্ময় কিছু বলতে পারল না। রুগিদের ধুলো-পড়া বসার ঘরখানা দেখে বিশ্বাসও হল।

বিষণ্ণ গলায় বললে, দ্যাখ হৃষি, আমরা কিন্তু চিরকাল ডাক্তারদের গালাগাল দিয়ে এসেছি, টাকার কুমির বলেছি। জানতাম না তোর মতও আছে।

হৃষি হেসে উঠল। বললে, আমার মতই বেশি।... তোর মনে আছে ডাক্তারি পাশ করে কি আনন্দ ? তোদের খাইয়েছিলাম, যেন বিশ্ব জয় করেছি। তারপর বাবার কাছে টাকা নিয়ে চেম্বার সাজালাম।

বিষণ্ণ গলায় বললে, দুটো জিনিস চাই, বুঝলি। এক হাসপতাল, আর দু'নম্বার হ'ল চেহারা। আমার এই রোগাসোগা বেঁটে চেহারা, লোকের বিশ্বাসই হয় না। টু বি এ গুড ডক্টর, ইউ নিড টু হ্যাভ এ গুড ফিজিক।

হিরণ্ময় হাসল। বললে, তা নয় রে, প্রাকটিস বাড়াতে হলে ভিড় বাড়াতে হয়।

হৃষি বুঝতে না পেরে বললে, মানে ?

হিরণ্ময়ের মনে পড়ে গেল।

বছর কয়েক আগের কথা, বীরেশ্বরবাবু তখন নানারকম ঝামেলা করছেন। কখনও কর্পোরেশন ট্যাক্স বেড়েছে, দিন টাকা, কখনও টিউবওয়েলে চাবি, কখনও জল আনতে গিয়ে সিঁড়িতে জল ফেলছে বলে কথা শোনাচ্ছে!

তাই বিরক্ত হতে হতে হিরণ্ময় ভেবেছিল পি এফ থেকে টাকা তুলে একটা ফ্ল্যাট কিনেই ফেলবে। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ঘোরাঘুরিও করেছে। যেখানেই যায়, প্রোমোটারের কাছে, সেখানেই ভিড়। আর ঘন্টা দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। কারণ, এক একজনের সঙ্গে আধঘন্টা ধরে তিনি কথা বলেন।

একদিন দেখে কি, পাঁচ ছজন লোক, বসে আছে। স্লিপ দেয়ার পর তারাই যাচ্ছে আর আসছে। হিরণ্ময় গিয়ে কথাবার্তা বলে ফিরে এল, তখনও তারা বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কানে যেতেই বুঝল, এরা সব প্রোমোটারেরই লোক। ভিড় বাড়াচ্ছে।

ফিরে এসে বলেছিল শুভাকে। —এও এক কাটা পোনার দোকান।

হৃষিকেও সে-কথা বলল। হাসতে হাসতে বলল, প্রফেশনই বল, ব্যবসাই বল, সিক্রেট হল ওই ভিড়। সিনেমায় দেখিস না ভিড় দেখলে তবেই ভিড় হয়। বাজারে যার কাছে কাটা পোনা কিনি, সে মাছের আঁশ ছাড়িয়ে পিস করে দেয় যত্ন করে। ওই বাড়তি খাটনি

কেন জানিস ? অন্যদের দাঁড় করিয়ে ভিড় বাড়াবার জন্যে।

হৃষি হো হো করে অট্টহাসে হেসে উঠল। বললে, ইট্‌স টু ল্যেট, আগে জানলে ভাড়াটে রুগি বসিয়ে রাখতাম।

হিরণ্ময় সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, নিজেও একটা ধরাল।

একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ধরাল হৃষি, ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর বলল, কি ব্যাপার বল। বৌটা ভাল আছে তো ? ছেলেমেয়েরা ?

ঘাড় নেড়ে হিরণ্ময় চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, বলছি।

আসলে এতক্ষণ ধরে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। সুযোগ খুঁজছিল কখন বলা যায়, কি ভাবে বলা যায়। ওর বাইরেটাই এতক্ষণ কথা বলছিল, হাসছিল, রসিকতা করছিল, বুকের ভেতরটা ছিল উদ্‌ভ্রান্ত।

একে একে সব বলে গেল হিরণ্ময়। বলতে বলতে ওর মুখেও ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল, গলা কেঁপে গেল।

অনুনয়ের স্বরে বললে, হৃষি, একটা উপায় বাতলে দে। আমরা কেউ রাতে ঘুমোতে পারছি না।

হৃষি চুপ করে রইল। ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কি যেন ভাবছে, কি যেন ভাবছে।

হিরণ্ময় অপেক্ষা করল। —কি রে কি এত ভাবছিস ? একটা কিছু বল।

তন্ময়তা ভেঙে যেতেই হৃষি বলল, নাঃ, কিছু না।

একটু থেমে বললে, হিরণ, আমি তো শুধুই জি পি, আমি কি করব ?

তারপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে একটা নাম আর ঠিকনা লিখে দিল। —গিয়ে দেখা কর, দ্যাখ কি করতে পারে।

—তুই একটা চিঠি দিবি না ?

—হৃষি বললে, যা না, আমি ফোন করে দেব।

একটু চুপ করে থেকে বললে, আজকাল তো অনেক সরকারি ক্লিনিকও হয়েছে। ইট্‌স্ নাথিং ইল্লিগ্যাল, সোজা চলে গেলেও তো পারিস।

ঠিকানাটা দেখিয়ে হিরণ্ময় বললে, ইনি কি গায়নোকলজিস্ট ?

—হুঁ।

তারপর ম্লান হেসে বললে, আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না হিরণ। ভুল বুঝিস না আমাকে। আয়াম ভেরি আনলাকি।

একটু চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ বললে, তখন জিগ্যেস করলি কি এত ভাবছি ? সত্যি ভাবছিলাম।

একে একে বলে গেল হৃষি।

ফেরার পথে সেই কথাগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। ও যেন প্রতিটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। দেখতে দেখতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল হিরণ্ময়। ভীষণ, ভীষণ ভয়।

বেচারা হৃষি। কত আশা নিয়ে শুরু করেছিল জীবন। কিছুই হল না।

চেম্বারে শুধু বসে থাকা, যদি কোনও রুগি এসে পড়ে, যেন ফিরে না যায়। শোফায় কুশনে শুধু ধুলো, কার্পেটে পানের পিক, ওয়ালপেপার মলিন। ঘরখানাই যেন একটা ব্যর্থ বিষণ্ণ মানুষের প্রতিচ্ছবি। অথচ এত এত টাকা খরচ করে ডাক্তারি পড়া। কি অপরিসীম পরিশ্রম, কি ধৈর্য। সব ব্যর্থ।

নাকি এই ঘটনাগুলোই ওকে ভেঙে দিয়েছে।

হ্যাঁ, আরেকটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে গেল। হৃষিই বলেছিল একদিন। তখন

মাঝে মাঝে দেখা হত।

বিকাশ, হৃষি, হিরণ্ময় তিনজনই বিভিন্ন দিকে ছিটকে গেছে। বিয়ে-থা করে সবাই সংসারী। ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই নাস্তানাবুদ।

কিন্তু রবিবারের আড্ডাটা ঠিকই ছিল। সকলেই দূরে দূরে, তখন অবশ্য দূর মনে হত না। বাসে ট্রামে সে-সময় এমন ভিড়ভাট্টা ছিল না, সময় পাই না এমন অজুহাতও দিতে হত না, কারণ পুরনো দিনের বন্ধুত্বের টান তখনও সজাগ। আড্ডা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যেত।

রবিবারের সকালটা ছিল নিয়মের অঙ্কে বাঁধা।

সিনেমা হলের সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে ওরা তিনবন্ধু কলেজের দিন থেকে আড্ডা দিয়ে আসছে। মালিক চাটগাঁয়ের লোক, ওদের খাতির করত খুব, মাঝে মাঝে গল্প জুড়ে দিত তার নিজস্ব ভাষায়।

সপ্তাহে একদিন, রবিবার সকালে, ওখানে আসা চাইই। নিত্যদিনের আড্ডা তখন সপ্তাহে একদিনে এসে ঠেকেছে। বাকি সময় নিয়ে নিয়েছে কারও চাকরি, কারও প্রফেশন, কারও বা ব্যবসা। উদ্বৃত্ত সময়টুকু সংসারের।

হিরণ্ময়ের ধারণা ছিল হৃষির প্রাকটিস খুব জমছে। বিকাশের ব্যবসাকেই বরং গণ্য করত না।

ঠাট্টা করে বলত, তোর আর কি হৃষি, পাঁচ বছরে যা পিটিয়ে নিবি সারা জীবন বসে খেতে পাবি।

হিরণ্ময়ের চাকরিটা ছিল খুবই ছোট দরের। হৃষি তো ছাত্র ভাল ছিল, ডাক্তারি পাসও করে গেল। একদিকে ঈষৎ হীনমন্যতা। অন্যদিকে গর্বও, হৃষির জন্যে।

বড় রাস্তার ধারে চায়ের দোকান। বসে গল্প করছিল, আরও কম বয়সে কম বয়েসি মেয়েদের নিয়ে প্রেমে পড়া প্রেমে পড়া খেলা। পরস্পরের ছেলেমানুষির কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে হাসছিল। আড্ডা জমে উঠেছিল।

হঠাৎ চেয়ার ঠেলে দিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল হৃষি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চলমান কারও দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল। হয়তো কোনও চেনা লোক।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বসল। চুপচাপ।

বিকাশ ঠাট্টা করে বলল, কি রে কোনও প্রাক্তন প্রেমিকা? মানে যার পিছনে ছোটাছুটি করেছিলি?

হিরণ্ময় হেসে বলল, নাকি নতুন? এখনও ছুটিস?

বিকাশ আর হিরণ্ময় দুজনই নিজেদের রসিকতায় হাসল।

হৃষি চুপচাপ। কি যেন ভাবছে।

তারপর বললে, একটা ছেলে চলে গেল, বাচ্চা ছেলে। বছর বারো।

ওর গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল।—বেঁচে থাকলে জানিস, ছেলেটা ঠিক ওর বয়েসি হত। ওই রকমই দেখতে।

হিরণ্ময় বুঝতে না পেরে বলল, কোন ছেলেটা? কার কথা বলছিস?

হৃষি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। —পাঁচ-ছ বছরের একটা বাচ্চা। পেটে ব্যথা, তার মা নিয়ে এসেছিল। ট্যাবলেট দিয়েছিলাম।

পরের দিন এসে বললে, অ্যালার্জি হচ্ছে। আরেক কোম্পানির একই ওষুধ লিখে দিলাম।

হৃষি চুপ করে রইল।

—পরের দিন হন্তদন্ত হয়ে ডাকতে এল। গেলাম। মাইরি বাচ্চাটা মরে গেল।

বিষণ্ণ হাসি হাসল হৃষি।

বললে, এখনও দেখতে পাই। মা-টা হাউ হাউ করে কাঁদছে, আর বাবা বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কান্নায় ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠল, ইউ আর এ মার্ডারার।

একটু থেমে বললে, এখনও কানে শুনতে পাই।

এ-সব অনেককাল আগেকার কথা। মনে ছিল না, মনে পড়ে গেল।

হৃষির ধুলো জমা চেম্বার থেকে যখন বেরিয়ে আসছে হিরণ্ময়, হৃষি বললে, ওপরে যাবি না ?

—না রে, তাড়া আছে।

হিরণ্ময়ের পকেটে তখন হৃষির দেয়া গায়নোকলজিস্টের ঠিকানা, বুকে ভীত বিভ্রান্ত দুশ্চিন্তা। মেয়েটাকে নিয়ে কি করা যায়, যমুনাকে নিয়ে।

হৃষি আরও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে ওর জীবনের আরেকটা ঘটনার কথা বলে।

দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এল হৃষি।

বললে, কিছু মনে করিস না। আয়াম ভেরি আনলাকি। বললাম তো তোকে সব। তাই এসবের মধ্যে থাকতে চাই না।

ওখান থেকে সটান আপিসে চলে গেল হিরণ্ময়। সইটা করে দিয়ে যদি সুযোগ পায় একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে।

আপিসে বসে থাকতে থাকতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

উমেশ এসে বললে, কি এত ভাবছেন কাল থেকে ? বাড়িওয়ালাকে নিয়ে সেই পুরনো প্রবলেম ?

হিরণ্ময় বিষণ্ণ হেসে বললে, না কিছু না।

সুধাকান্ত এক সময় এসে বলল, আপনি দিনকয়েক ছুটি নিয়ে নিন হিরণ্ময়দা।

হিরণ্ময় বিষণ্ণ হেসে বললে, হুঁ।

পাশের টেবিলের সুকুমার উঠে এসে বললে, দিন পনেরো বাইরে কোথাও ঘুরে আসুন তো। আপনার কি যেন হয়েছে।

হিরণ্ময় বিষণ্ণ হেসে বললে, না না, আমি ঠিকই আছি।

আসলে হৃষি ওর মনের মধ্যে একটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

হৃষি যখন বলছিল, শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল নাগালের মধ্যে সমাধান পেয়ে যাচ্ছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

এখন বুকে ভয়, আর দৃশ্যটা যেন পর পর দেখতে পাচ্ছে।

হৃষি তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, স্যারের প্রিয় পাত্র। গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে সগর্বে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায়।

এক স্কুলের বন্ধু এসে হাজির।

বললে, তোর সঙ্গে কথা আছে, খুব কনফিডেনসিয়াল। রাস্তায় চল।

দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছে হিরণ্ময়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটা বলছে, তুই একটা কিছু কর, তোর তো এত চেনাজানা। তা না হলে মেয়েটা সুইসাইড করতে বাধ্য হবে।

হৃষি হাসতে হাসতে বলছে অপরের ঘাড়ে কেন দোষ চড়াচ্ছিস ? দায়ী তো তুই নিজে। স্বীকার কর, তাহলে চেষ্টা করে দেখব। তোর জন্যে চেষ্টা করতে পারি, অপরের দায়ের সঙ্গে কেন নিজেকে জড়াতে যাব ?

হিরণ্ময় দেখতে পাচ্ছে, ছেলেটা চুপ করে রয়েছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। যেন দাঁড়াতে

পারছে না, পড়ে যাবে।

মাথা নিচু করে বললে, হ্যাঁ। তারপর দুচোখে জল নিয়ে দুহাত জড়িয়ে ধরছে ছেলেটা। কতই বা বয়েস। —একটা কিছু কর হৃষি, তা না হলে আমাকেও সুইসাইড করতে হবে।

হৃষি হেসে বললে, বিয়ে করে ফেল, তাহলেই তো সমস্যা চুকে যায়।

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলছে, হয় না।

হৃষি বুঝতে না পেরে বললে, কেন হবে না ? করলেই তো হয়।

ছেলেটা বলছে, আমারই প্রায় সমবয়েসি কিন্তু, সম্পর্কটা...

একটু থেমে বললে, বুঝতে পারছিস না, হয় আমাদের সুইসাইড করতে হবে, বিয়ে করলে আমাদের বাবা-মারা সুইসাইড করবে।

সেই ঘটনার কথা বলতে বলতে হৃষি বলেছিল, জানিস হিরণ্ময়, মেয়েটাকে আমি দেখিওনি, তবু তার চেহারা যেন দেখতে পেলাম। কেমন মনে হল এই লজ্জা থেকে ওকে বাঁচাতেই হবে। তখন তো এত ক্লিনিক হয়নি, আইন বদলায়নি...দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করে ভাল মুড়ে স্যারকে একদিন ধরলাম। সব খুলে বললাম।

স্যার এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। —না না, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

—কি বললাম জানিস হিরণ্ময় ? বললাম, স্যার, সায়োনাইড জোগাড় করে ফেলেছে। কালই সকালে হয়তো কাগজে দেখবেন...

হৃষি চলে আসছিল। স্যার ডাকলেন, শোনো, শোনো।

সেই ঘটনার কথা বলতে বলতে হৃষি একেবারে চুপ করে গিয়েছিল।

হিরণ্ময় তখনও আশা দেখতে পাচ্ছে। স্কুলের বন্ধুর জন্যে যদি ও এতখানি করতে পারে, কলেজের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্যে এটুকু করবে না ? তাছাড়া, এখন তো এত ক্লিনিক হয়েছে, আইনে নিষিদ্ধ নয়।

হৃষি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, উনি শেষ অবধি একজনকে বলে দিলেন। বললেন যাও, গিয়ে ভর্তি করে দাও।

হৃষি বিষণ্ণ হেসে বললে, জানিস হিরণ্ময়, খুশি হয়ে চলে আসছি, হয়তো একটু বেশি খুশি হয়েছিলাম, স্যার টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে কি লিখতে লিখতে গম্ভীর গলায় বললেন, হোপ ইউ আর নট দ্য কালপ্রিট। কি লজ্জা, কি লজ্জা।

তখনও হিরণ্ময়ের মনে আশা, হৃষি কিছু একটা ব্যবস্থা করবেই।

কিন্তু ওর পর যে এই রকম একটা দৃশ্য আছে হিরণ্ময় বুঝতেই পারেনি।

এখনও দেখতে পাচ্ছে।

গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে হৃষি করিডোর ধরে যাচ্ছে। বেড নম্বর জানা।

ভর্তি করে দিয়ে এসে স্কুলের বন্ধুটা আর দেখাই করেনি। সেজন্যে খানিকটা রাগ, তার ওপর। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। আবার মনের গোপনে একটা অদম্য কৌতূহল মেয়েটিকে দেখার জন্যে। ভর্তি করার সময় ভাল করে দেখেওনি তাকে। ও ব্যস্ত ছিল, মনের মধ্যে উদ্বেগও। তখনও কানে বাজছে, হোপ ইউ আর নট দ্য কালপ্রিট। সেজন্যেই নিজেকে আড়ালে রেখে স্কুলের বন্ধুটিকেই এগিয়ে দিয়েছিল।

সিস্টার বেড নম্বর বলে কেমন একটা ঠোঁটের কোণে রহস্যের হাসি এঁকে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

তারপর আর যায়নি হৃষি। যেতে, খোঁজ নিতে কেমন যেন লজ্জা করছিল। হিসেব করে দেখল, আজই, কিংবা কাল মেয়েটি চলে যাবে। এর পর আর মেয়েটিকে হয়তো কোনদিন দেখতেও পাবে না।

এক ঝলক যা দেখেছে, মনে হয়েছে বেশ সুশ্রী। হয়তো সুন্দরী।

মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখার ভীষণ ইচ্ছে হল হৃষির।

ওই তো যাচ্ছে, গলায় স্টেথোস্কোপ। ঘাড় উঁচিয়ে ঘরের নম্বর দেখছে। বেড নম্বর তো জানা।

ভেতরে ঢুকে গেল হৃষি।

বেড ফাঁকা। নম্বর ভুল দেখছে না তো? না, মিলিয়ে দেখল ঠিকই।

তা হলে হয়তো সুস্থ হয়ে গেছে। অন্য কোথাও উঠে গেছে। চলে যায়নি তো?

এদিক ওদিক খানিকটা পায়চারি করল। সময় কাটিয়ে আবার এল।

বেডের কাছাকাছি একজন সিস্টার চার্ট লিখছিল।

হৃষি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করছে, আচ্ছা এই বেডের পেশেন্ট?

সিস্টার কেমন অবাক চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। যেন বুঝতেই পারছে না।

হৃষি নাম বলল।

সিস্টার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, সে তো মারা গেছে। কালই।

বলেই কেমন অবাক দৃষ্টিতে কিংবা সন্দেহের দৃষ্টিতে হৃষির দিকে তাকাল। হৃষির মনে হল কেমন একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

সিস্টার বলছে, আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিন।

হৃষির কানে কোনও কথাই যাচ্ছে না। ও দ্রুত পায়ে এমনভাবে চলে এল, যেন অফিসের দিকেই যাচ্ছে।

আসলে হৃষি পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। নিজের কাছ থেকে।

বলতে বলতে হৃষি টেবিলে ছড়ানো দু-হাতের ওপর মাথা রেখেছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন মাথা তুলল, হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল, ওর দু-চোখে জল।

বলেছিল, আমি খুব আনলাকি রে।

কিন্তু হিরণ্ময়ের এখন মনে পড়ে যাচ্ছে হৃষির কাছে শোনা সেই কথাটা। সেই বাচ্চা ছেলেটার বাবা কান্নায় ফেটে পড়ে বলছে, ইউ আর এ মার্ডারার।

এই মৃত্যুটার জন্যেও কি ও নিজেকেই দায়ী করছে নাকি।

কিন্তু মৃত্যুও হয়, এ-কথাটা হিরণ্ময়ের মনে একবারও আসেনি। সেই মুহূর্তে তো নয়ই।

শুধু জিগ্যেস করেছিল, তোর স্কুলের বন্ধু, সেই ছেলেটা আর এসেছিল?

হৃষি হেসে বলেছিল, কোনদিন না।

আপিসে এসে সেই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে হিরণ্ময় ভাবছিল, মৃত্যুও হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা বড় ভয়ঙ্কর মনে হল।

হিরণ্ময় ভাবল, হৃষিও কি আমাকেই সন্দেহ করেছে? ওই ছেলেটাকে তো করেছিল। কেন অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস, বল না তুই নিজেই দায়ী। হৃষির স্যার বলছেন, হোপ ইউ আর নট দ্য কালপ্রিট।

হিরণ্ময় কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। হৃষির দেওয়া নাম-ঠিকানাটা বুকের মধ্যে খচখচ করছে।

হৃষি কোনও চিঠি দেয়নি। হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল এড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা সরকারি ক্লিনিকের নাম, একজন ডাক্তারের নাম, একটা ঠিকানা। ওটুকুই এখন শেষ ভরসা। কিন্তু ভয়ও।

সিস্টারের কথাটা হিরণ্ময়ও যেন শুনতে পাচ্ছে। সে তো মারা গেছে, কালই।

মারা গেছে! ওই একটা কথাই ওকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

মারা যায়, মারা যেতে পারে, ভাবেইনি হিরণ্ময়। এত সব বিজ্ঞাপন দেখে, আশেপাশে এত সব কথা শোনে, আজকের দিনে এরকম অঘটন ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি। হৃষি অবশ্য বলেছে অনেককাল আগেকার কথা, তখন ও গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো ছাত্র। এখন তো দিনকাল পাল্টে গেছে, কত ওষুধপত্তর হয়েছে, কত উন্নতি হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের।

তবু কেমন একটা সন্দেহ জাগছিল। মারা তো যেতেও পারে।

ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠছিল হিরণ্ময়।

মৃত্যু। তা হলে তো ঘোর বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। সে আরও ভয়ঙ্কর। থানা-পুলিস, মামলা-মোকদ্দমা। হাতে হাতকড়া পড়বে নাকি।

কালো রঙের পুলিস ভ্যানটার ভেতরে বসে হিরণ্ময় যেন জাল-জানালায় নাকমুখ চেপে বাইরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চাইছে।

হৃষি বলেছিল, গিয়ে দেখা কর, আমি ফোন করে দেব।

এখনও, আজকের দিনেও, মৃত্যু হতে পারে কিনা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর। জিগ্যেস করতে পারেনি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে মনে ঠিক করল, ও নিজে যাবে না। এ-সব ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকাই ভাল। হৃষির নাম লিখে দেবে, ঠিকানাটার উল্টো দিকে।

যমুনাকে দিয়ে দেবে। বলবে, যা গিয়ে দেখা কর, ডাক্তারবাবু কি বলেন দেখ।

যদি দরকার হয়, বলবে, পাড়ার ওই যে কে তোর বন্ধু আছে তাকে নিয়ে চলে যা।

অর্থাৎ যাকে নিয়ে সেই দিদির খোঁজে গিয়েছিল।

যদি মৃত্যু হয়, তখন আর কেউ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। ওকেই কালপ্রিট ভাববে। কিংবা কে জানে, হয়তো বিল্টুকে। সে তো আরও সাংঘাতিক। তার চেয়ে নিজেকে আড়ালে রাখাই ভাল।

কিন্তু এত সব কথা কি ও যমুনার মুখোমুখি হয়ে বলতে পারবে।

লজ্জায় আত্মগ্লানিতে যমুনা তো ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। চোখের আড়ালে আড়ালে থাকছে। হিরণ্ময়ও চায় না ওর সামনে যেতে। ও এখন আর যেন মানুষ নয়, একটা নোংরা ক্লেদাক্ত পিণ্ড।

বেরোনোর সময় সিঁড়ির বাঁকে সামনাসামনি পড়ে যেতেই কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি। একটা কথা বলতেও এখন আর ইচ্ছে হয় না। যমুনার সমস্ত শরীরটা যেন অশুচি হয়ে গেছে।

এসে বেল্ টিপল।

দরজা খুলে দিল শুভাই। এখন আর যমুনা ছুটে এসে দরজা খোলে না।

ওর পিছনে পিছনে শুভাও এল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে।

হিরণ্ময় শুভার দিকে তাকাল। ওর দিদি কিংবা বাবা-মা এসেছিল এমন কোনও খবর আছে কিনা জানবার আতঙ্ক চেপে।

আর শুভা সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলল, বলেছে।

একটু থেমে বলল, সেই বললি, কিন্তু এত দেরি করে। বোকা, বোকা।

হিরণ্ময় তখনও পোশাক ছাড়েনি।

ও বুঝতেই পারল না। সপ্রশ্ন চোখে তাকাল শুভার মুখের দিকে।

শুভা আবার চাপা গলায় বলল, লছমন।

॥ ৫ ॥

দপ্‌ করে জ্বলে উঠল হিরণ্ময়।

অদৃশ্য একটা শত্রুকে যেন এতদিন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। যদিও জানত না শত্রুটা কে, তা জানতে পারলেও কি করার আছে।

খানিকটা স্বস্তিও পেল। সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনাও হল। কারণ একটা ক্ষীণ সন্দেহও তো হয়েছিল একবার, বিন্টু সম্পর্কে। নিজের কাছেই যেন ছোট হয়ে গেল ও। নিজের ছেলের ওপরেও কি ওর এইটুকু বিশ্বাস নেই। ছি ছি।

আচ্ছা, শুভার মনেও কি হিরণ্ময় সম্পর্কে এ-রকম কোনও কুৎসিত সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল? হিরণ্ময় তা জানে না। কিন্তু প্রথম দিন, না কি পরের দিন, ওর মনে হয়েছিল শুভা ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। হয়তো নিজেরই মনের ভুল। কিন্তু মনে তো হয়েছিল, আর তার জন্যে ভেতরে ভেতরে ও প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি এই যা।

আসলে কেউই বোধহয় কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। জীবন যখন স্বাভাবিক ভাবে চলে তখন মানুষ নিজেকেও চিনতে পারে না। একটা কিছু ঘটে গেলেই, কোনও বিপদের সামনে পড়ে গেলেই ভেতরের মানুষটা নখ আর দাঁত নিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে।

শুভার কথায় ও তো বিন্টু সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়েছিল।

—জানো, সেদিন যমুনা যখন বললে এই বাড়িরই কেউ, আমার বুক ধড়ফড় করে উঠেছিল, মাথা ঘুরছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার।

শুভার কথাগুলো মনে পড়ল।

শুভা বলেছিল, আমি আর ওকে কিছু জিগ্যেস করতে সাহস পাইনি। কি নাম বলে বসবে সেই ভয়ে।

তারপর হাসার চেষ্টা করে বলেছিল, অনেক পরে মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে জিগ্যেস করলাম। বললাম, কি বলছিস যমুনা, আমাদের বাড়ির কেউ? আমাদের বাড়ির?

ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, হয়তো আমি কি ভেবেছি তা বুঝতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে, না না মা, আমাদের বাড়ির কেউ নয়। তারপর বললে, নাম জিগ্যেস কোরো না, আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই বাড়ির

মেয়েটা কি বোকা। এই বাড়ি বললে যে কেউ বীরেশ্বরবাবুর বাড়ির কথা ভাববে না, বাকি ফ্ল্যাটগুলোর কথা কেউ ভাববে না সে ধারণাও নেই।

কিন্তু শুভার কথাগুলো মনে পড়তেই হিরণ্ময়ের মনে হল শুভা ওকেও সন্দেহ করেছিল। নাকি শুধুই বিন্টুকে? জানার উপায় নেই। যদি করেও থাকে অন্যায় করেনি। হিরণ্ময় শুভার কথায় আশ্বস্ত হয়েছিল, না না, ও বলেছে, আমাদের ফ্ল্যাটের কেউ নয়। তা সত্ত্বেও ও উঠে গিয়ে পাশের ঘরে, যেখানে ডাইনিং টেবলে বসে বিন্টু আর রুমি পড়ছে, সেখানে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল কেন। কেন বিন্টুর সঙ্গে অকারণ কথা বলার অজুহাতে বার বার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

নিজের ছেলের ওপরই যেখানে আস্থা ছিল না, যে বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে নিজের স্বামীর ওপরই আস্থা রাখা যায় না, সেখানে হিরণ্ময় কি করে যমুনার ওপর বিশ্বাস রাখবে।

সেই সরল গ্রাম্য মুখ, পলিমাটি দিয়ে গড়া একটা নিষ্পাপ মেয়ে, মুখে লাজুক লাজুক ভাব, চোখে অবাক অবাক দৃষ্টি, সেই যমুনার চেহারাটা রাতারাতি বদলে গিয়েছিল। তার

ওপর সামান্য মায়া-মমতাও ছিল না। সে শুধু একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি হয়ে গিয়েছিল, যে যে-কোনও মুহূর্তে একটা গোটা পরিবারকে পাঁকের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে।

ওর দিদি গঙ্গা যেন একটা বিভীষিকা।

সত্যি তার সঙ্গে যমুনার দেখা হয়নি, খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে, বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, সেই ঝনঝনে চালাক-চতুর মেয়েটা শিখিয়ে পড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছে যমুনাকে। হয়তো বলেছে, এই তো সুযোগ, বাবুদের ভয় দেখিয়ে বাবুদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নিয়ে আয়।

কিংবা বলেছে, দশটা টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিলাম, রাজি হয়নি। দাঁড়া, খুব যে ভদ্রলোক হয়ে আছে, আমাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে আমাদের চাকর বানিয়ে রেখেছে, দেখি কি করে পাড়াপড়শির সামনে ইজ্জত নিয়ে থাকে।

তখন চোখের সামনে একটা আতঙ্ক। তাই হিরণ্ময় মনে মনে একটা প্রতিবাদের পথ ভেবে রেখেছিল।

যমুনার মা একবার দেখা করতে এসেছিল, বড় মেয়ে গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে।

বলেছিল, মা, কিছু মনে করোনি, মেয়ে সম্বচ্ছর মুখ বুজে খাটতিছে, কোথাও তো যাবার নাই। রথের দিন গঙ্গা উকে মেলা দেখায় আনবে।

শুভা রাজি হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল।

হিরণ্ময় বলেছিল, সত্যিই তো, কোথাও তো বেড়াতে যেতে পায় না, ওকে একটা দিন ছুটি দিয়ে দিয়ো।

খাওয়া-দাওয়ার পর গঙ্গা এসে ওকে নিয়ে গিয়েছিল।

শুভা যমুনার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছিল। বলেছিল, যদি কাচের চুড়িটুড়ি কিনতে ইচ্ছে হয় কিনিস, কিছু খেতে ইচ্ছে হলে খাবি।

টাকাটা নিতেও কি অস্বস্তি যমুনার। কিছুতেই নিচ্ছিল না।

গঙ্গা হেসে বললে, নে না, বাবুরা দিচ্ছেন নিতে হয়।

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় বলেছিল, ঘুস ?

শুভা রেগে গিয়েছিল, ঘুস আবার কিসের, রথের মেলায় যাবে...

হিরণ্ময় হেসে উঠে বলেছিল, দিতে তো আপত্তি করছি না, কিন্তু যতই ঘুস দাও, যখন যাবার তখন ঠিকই চলে যাবে, এ-সব কিছুই মনে রাখবে না।

যমুনা বলে গিয়েছিল, সন্ধের আগেই ফিরে আসবে, রাতের রান্না ও-ই করে দেবে।

কিন্তু সন্ধে হয়ে যেতেও যমুনা ফিরছিল না।

শুভা বার বার ঘড়ি দেখছিল। আর ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। যমুনা ফিরছে না কেন, যমুনা ফিরছে না কেন !

শেষে এক সময় মুখ ফুটে বলেই ফেলল, আমার মনে হচ্ছে যমুনা বোধহয় ফিরবে না।

সে-রকম একটা আশঙ্কা তখন হিরণ্ময়েরও।

বললে, ওকে না ছেড়ে দিলেই হত। দিদিটা তো কম ধূর্ত নয়। এ-মাসের মাইনে তো ওর মা নিয়ে গেছে, রথের মেলায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে হয়তো ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

শুভা বললে, দশটা টাকা বাড়িয়ে দিলেই হত।

যখন ওরা প্রায় নিঃসন্দেহ যে যমুনা আর ফিরবে না, চালাকি করে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, সেই সময় হাসতে হাসতে ফিরল যমুনা।

ওরা তখন কি খুশি, কি খুশি।

খুশি যমুনাও। দুহাতে কাচের চুড়ি, কানে দুটো নকল রুপোর ঝুমকো, কাগজে মোড়া

কি-সব টুকিটাকি। আনন্দ চেপে রাখতে না পেরেও শুভাকে দেখাচ্ছিল।

শুভা আদরের ভঙ্গিতে শুধু বললে, হ্যাঁ রে, এত রাত করে!

যমুনার মুখ থেকে আনন্দ উবে গেল। শুধু বললে, দিদিকে তো কতবার বললাম, শুনল না।

তারপর হেসে বললে, ভয়ে তো দিদি এলই না ওপর অবধি, ফটকের কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

সেদিনের কথাটা হিরণ্ময়ের স্পষ্ট মনে ছিল। আর ওটাকেই ভেবেছিল বাঁচবার উপায়।

যদি ওই তুখোড় মেয়েটা, গঙ্গা এসে হঠাৎ হাজির হয়, জবাবদিহি চায়, তা হলে সেই দিনটাকেই টেনে আনবে।

বলবে তুমিই তো ওকে নিয়ে গিয়েছিলে রথের দিন, অনেক রাত্রে ও ফিরে এল, একা-একা। আমরা কি করে জানব ও কোথায় গেছে, কি করেছে।

কিংবা গঙ্গাকে দায়ী করবে।—তুমি তো নিয়ে গিয়েছিলে, কি করেছে না করেছে তুমিই জানো। এখন ভালমানুষ সাজছ।

এই সব ভেবে রেখেছিল হিরণ্ময়। কিন্তু মনের ভয়-ভয় ভাবটা ঘোচাতে পারেনি। ওর নিজের ওপরই কোনও আস্থা নেই।

গঙ্গা ওর কাছে এখন একটা আতঙ্ক। এসে হাজির হলে কোনও কথাই বলতে পারবে না।

ওর বাবা-মা যদি আসে তা হলেই বা কি বলবে।

কিন্তু ও বাড়ি ফিরতেই শুভা বলে বসল, বলেছে।

একটু থেমে বললে, সেই বললি, কিন্তু এত দেরি করে। বোকা, বোকা।

ও বুঝতেই পারল না, সপ্রশ্ন চোখে তাকাল শুভার মুখের দিকে।

শুভা আবার চাপা গলায় বলল, লছমন।

বীরেশ্বরবাবুর পেয়ারের সেই ছোকরা চাকরটা।

দপ্ করে জ্বলে উঠল হিরণ্ময়। মুহূর্তের জন্যে মনে হল ও একটা বিরাট অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিল্টুকে নিয়েও আর কোনও দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিহারি চাকরটার ওপর প্রচণ্ড রেগে গেল।

এর চেয়ে বড় অপমান যেন নেই। সেই সরল নিষ্পাপ মেয়েটা, যার ওপর এত মায়া এত মমতা জন্মে গিয়েছিল, সে নিজে বিপদে পড়ে সারা পরিবারটাকে বিপদে ফেলেছে বলে রাতারাতি একটা বাইরের অচেনা মেয়ে হয়ে গিয়েছিল।

'তাড়িয়ে দাও, ওকে এখনই তাড়িয়ে দাও', হিরণ্ময় বলেছিল।

কিন্তু লছমনের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ের মনে হল বিহারি চাকরটা যেন ওকেই অপমান করেছে, ওদের সকলকে।

যমুনা তো ওদেরই কাজের মেয়ে। মেয়ের মত।

হিরণ্ময় আপিসের পোশাক ছাড়ল না।

বলল, আসছি।

শুভা উদ্বেগের স্বরে বললে, কোথায় যাচ্ছ আবার?

—আসছি। বলে বেরিয়ে গেল।

রাগ শুধু লছমনের বিরুদ্ধে নয়। বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধেও।

গেট্যের সামনে বিকাশ গাড়ি রেখেছিল বলে বীরেশ্বরবাবুর মস্তান ছেলেটা অভদ্রভাবে অপমান করেছিল। সে-কথা ভুলতে পারেনি হিরণ্ময়। লছমন হারামজাদাও ফোড়ন

কেটেছিল। চাকর চাকরের মত থাকবি, তা নয় সেও বাড়িওয়ালা হয়ে গিয়েছিল। আর বীরেশ্বরবাবু লোকটাও মোটেই সুবিধের নন। পাকেপ্রকারে সব সময় বুঝিয়ে দিতে চান উনি বাড়িওয়ালা। যেন ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা বিনা ভাড়ায় থাকে।

পাড়ায় এগারো নম্বর বাড়ির সীতানাথবাবু ঠিকই বলেছিলেন, ছোটলোক, ছোটলোক। পি ডবলু ডির সামান্য চাকরি করে পেল্লায় বাড়িখানা তুলেছে।

হিরণ্ময় তখন নতুন এসেছে, বীরেশ্বরবাবুর মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে ভেবেছে রীতিমত ভদ্রলোক, ভালমানুষ। সীতানাথবাবুকেই ভেবেছে খারাপ, খারাপ।

লোক চিনতে ভুল হয়েছিল। এখন তো দেখা যাচ্ছে সব দিক থেকে অসুবিধে সৃষ্টি করে তুলে দিতে চাইছে। তুলে দিতে পারলেই বেশি ভাড়ার নতুন ভাড়াটে নিয়ে আসবে।

এতকাল টিউবওয়েলটা সারাদিনই খোলা থাকত, তালাচাবির কোনও প্রশ্নই ছিল না। পাড়ার সকলেই জল নিত।

সীতানাথবাবু হেসে বলেছিলেন, তা নয় হিরণ্ময়বাবু, তা নয়। ও যে কি সালসা লোক আপনি জানেন না। ময়লা জল উঠত, জলে বালি, মিস্ত্রিরা বলে গিয়েছিল যত জল উঠবে ততই পরে ভাল জল আসবে। সেজন্যেই ডেকে ডেকে সবাইকে জল নিতে বলত। এখন ভাল জল আসছে তাই তালাচাবি।

হিরণ্ময় সায় দিয়ে বলেছে, ভাড়াটেদের জব্দ করছে।

সীতানাথবাবু ভরসা দিয়ে বলেছেন, আপনি ভাববেন না, আমরা পাড়ার সকলে চেষ্টা করছি, কর্পোরেশন যাতে এ-রাস্তায় একটা টিউবওয়েল করে দেয় তার জন্যে পিটিশন করেছি।

সাত নম্বরের যুগলবাবু যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে। বোধহয় কথাটা কানে যেতেই থেমে পড়লেন। আমাদের পিটিশনে কি হবে মশাই, ওই বস্তির লোকদের দিয়ে পিটিশন করান, দেখবেন রাতারাতি হয়ে যাবে। এখন তো ওদেরই দিনকাল।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে যুগলববাবুর আলাপ নেই, শুধু মুখচেনা। যমুনার আগে যে ছিল, পার্বতী, সে বলত সাত নম্বরের বাবু, সাত নম্বরের গিন্নি। ওদের কাছে সকলেই এক-একটা নম্বর। বাড়ির নম্বরটাই পরিচয়। তিন নম্বরের দোতালার বাবু কিংবা ন নম্বরের তেতলার গিন্নি।

বড় বড় আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাট বাড়িগুলোয় তো ভদ্রলোকেরাও এভাবে কথা বলে।

হিরণ্ময় একবার এক উকিলের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। নাম বলতে কেউই চিনতে পারল না। সকলেই বলে কত নম্বর।

আর যেই নম্বর বলা অমনি এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আসুন আসুন, আমার সামনের ফ্ল্যাটেই থাকেন।

ফেরার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সেও ফ্ল্যাট কিনেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, আর সেই সময়, খুব খোলামেলা, সাজপোশাকে ঘটা, দেখতে বেশ সুন্দরী বলা চলে, এক তরুণী নামল গাড়ি থেকে।

হিরণ্ময় হেসে বললে, কি রে সিনেমা স্টার নাকি ?

বন্ধুটি হেসে বললে, দূর, ও তো ডি-সেভেন্টিনের মেয়ে।

হিরণ্ময় হেসে ফেলে বলেছিল, জেলখানাতেই তো শুনেছি কয়েদিদের পরিচয় এক একটা নম্বর। এই সব বড়লোকদেরও তাই নাকি ?

বন্ধুটি এই রকম একটা পশ ফ্ল্যাট করে ফেলেছে, তার জন্যে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে গর্বিত। সুতরাং এখন বিনয় দেখানোয় কোনও অসুবিধে নেই। তাই অসন্তোষের ভঙ্গিতে

বললে, এও তো একরকম জেলখানা। পোলট্রির মুরগিদের ঘর দেখিসনি। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসেছিল।

হিরণ্ময় হাসতে পারেনি। বন্ধুটির সৌভাগ্যে ওর তখন রীতিমত ঈর্ষা। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছে, ও এখনও একজন নিছক ভাড়াটে।

নিজেকে যখনই ভাড়াটে ভাবে, তখন টিউবওয়েলের তালাচাবির কথা মনে পড়ে যায়।

সীতানাথবাবু রাস্তায় একটা নতুন টিউবওয়েল হওয়ার সম্ভাবনা জানাতেই মনটা খুশি হয়ে উঠেছিল। সাত নম্বরের যুগলবাবু সে স্বপ্নটুকুও ভেঙে দিলেন। বস্তির ওরা পিটিশন না করলে নাকি হবে না, ওদেরই এখন দিনকাল।

সীতনাথবাবু হেসে বললেন, বস্তিতে কতগুলো ভোট বলুন। ওরা তো শুধু দেখে কোথায় কত ভোট।

সামান্য একটা টিউবওয়েল, ছ'খানা ফ্ল্যাটের লোক এক কলসী কি দু-কলসী জল নেবে, তাতে কি এমন অসুবিধে। স্রেফ অসুবিধে সৃষ্টি করা। কারণ, কর্পোরেশনের টিউবওয়েল সেই বড় রাস্তায়। এতখানি দূর থেকে এক কলসী জল বয়ে আনতে রাজি হয় না কাজের লোকরা। শুধু বয়ে আনা তো নয়, সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় তুলতে হবে।

সেজন্যেই ভেতরে ভেতরে বীরেশ্বরবাবুর ওপর, তার পেয়ারের চাকর লছমনের ওপর এত রাগ। এখন তো আরও। ওই চারকটারই নাম বলেছে যমুনা।

পারলে ওকে যেন খুন করত হিরণ্ময়।

'আসছি' বলে বেরিয়ে এল ও।

তিনতলায় নেমে এসে বীরেশ্বরবাবুর দরজায় বেল বাজাল।

পাছে বীরেশ্বরবাবুকে বাড়িওয়ালা না ভেবে কেউ ভাড়াটে ভেবে বসে, সেজন্যে ওঁর দরজাটা অন্যরকম। সিজনড টিক, আর তার ওপর জোর পালিশ। পিতলের ঝকঝকে নক্সা বসানো। ভাড়াটেদের দরজার বাজে কাঠ ঢাকা দেওয়ার জন্যে সবুজ রং। দরজা জানালাতেও। ওঁর দরজা জানালায় সব ঝকঝকে পালিশ।

বেল বাজাতেই ওঁর ছোট মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

—বাবা আছে?

মেয়ে বলল, ওই তো ব্যালকনিতে। চলে যান।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাকল, বাবা।

বীরেশ্বরবাবু মুখ তুলে তাকাতেই হিরণ্ময়কে দেখতে পেলেন।

মেয়ে চলে গেল।

ব্যালকনিটা শুধু তেতলায়। অর্থাৎ সবটাই প্রায় কাচের জানালা। খোলা ছিল বলে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। হিরণ্ময়ের ঘরে এতটুকু হাওয়া ঢোকে না, ওর তো দক্ষিণ চাপা।

বীরেশ্বরবাবু একটা নীল লুঙি পরে খালি গায়ে বসেছিলেন বেতের চেয়ারে।

দেখে হাসলেন। আসুন। খালি বেতের চেয়ারের দিকে আঙুল দেখালেন।

হিরণ্ময় তখন রাগে কাঁপছে।

আসার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে লছমনকে খুঁজেছে। দেখতে পায়নি। হয়তো বাজার-টাজারে গেছে। দেখতে পেলে কি হত কে জানে। হয়তো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চড়-ঘুসি-লাথি মারতে শুরু করে দিত।

ভেতরে ভেতরে তখনও রাগে ফুঁসছে। ওঁরই তো চাকর। উনিই তো দায়ী। ভাড়াটে জব্দ করার জন্যে এতকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন।

রাগে ফেটে পড়ল হিরণ্ময়। বললে, আপনাদের ওই চাকরটা, লছমন, জানেন ও কি

করেছে ?

বেশ যেন মজা পেয়েছেন বীরেশ্বরবাবু, এইভাবে হাসলেন।

সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠল হিরণ্ময়ের।

বীরেশ্বরবাবু দুহাতে লুঙিটা একটু টেনে তুলে এগিয়ে আনলেন মুখটা। বললেন, সব কানে আসে হিরণ্ময়বাবু, সব কানে আসে।

অবাক হয়ে তাকাল হিরণ্ময়। আশ্চর্য, ও ভেবেছিল গোপন রাখবে খবরটা। পাশাপাশি কোনও ফ্ল্যাটের লোক যেন জানতে না পারে। বিশেষ করে বীরেশ্বরবাবু। উনি তো ভাড়াটে তুলে দিতে চান, পারলে হিরণ্ময়কে উচ্ছেদ করে দেবেন। সেজন্যেই ভয় ছিল ব্যাপারটা জানতে পারলে না জানি কি প্যাঁচ কষবেন।

যমুনার দিদি কিংবা বাবা এলে হয়তো হিরণ্ময়ের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করবেন। কিংবা থানাপুলিস, মামলা-মোকদ্দমা, কি হতে পারে তা তো জানা নেই। বস্তির লোকদের ডেকে এনে হল্লা। ভাবতেও আতঙ্ক।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা সব জানে। জেনেও চুপ করে আছে।

বীরেশ্বরবাবুই আবার বললেন, সব শুনেছি। আমার ড্রাইভারটার কাছে সব বলেছে।

হিরণ্ময় বললে, আর আপনি চুপ করে আছেন ?

বীরেশ্বরবাবু হাসলেন।—আরে সে আর আছে নাকি, আমাদের কিছু না বলে সে ব্যাটা দেশে পালিয়েছে।

পালিয়েছে। চমকে উঠল হিরণ্ময়।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, থাকলেই বা কি হত, আমাদের তো চুপ করেই থাকতে হত। আরে মশাই, এ সব ঝি-চাকরের নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমরা ভদ্রলোকেরা কেন মাথা গলাতে যাই। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক।

একটু থেমে বললেন, তাড়িয়ে দিন মশাই, তাড়িয়ে দিন।

হিরণ্ময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। প্রথম শুনেই ও রেগে গিয়ে, ভয়ে আতঙ্কে যে-কথাটা শুভাকে বলেছিল, বীরেশ্বরবাবুও ঠিক সে-কথাটাই বলছেন। তাড়িয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত।

হিরণ্ময় কিছু বলছে না দেখে বীরেশ্বরবাবু বললেন, দোষ তো মশাই ওই মেয়েটারই। আপনাদের কাজের মেয়ের।

—কি বলছেন ? হিরণ্ময় বুঝতে পারল না।

বীরেশ্বরবাবু হাসলেন।—টিউবওয়েল তো আমি নটা থেকে দশটা খোলাই রাখতাম। আপনাদের ওই যমুনা না কি নাম, এসে নাকি এক-একদিন ইনিয়ে-বিনিয়ে চাবি খুলে দিতে বলত। কাজ করতে করতে নাকি ভুলে গিয়েছিল।

হিরণ্ময় উত্তেজিত হয়ে বললে, তা কেন হবে, ও ব্যাটা কোন-কোনদিন সাড়ে নটায় বন্ধ করে দিত।

—তা জানি না, আমি যা শুনেছি তাই বলছি।

একটু থেমে বললেন, ও তো বিকেলে, সন্ধের পরও চাবি খুলিয়েছে।

হিরণ্ময় চুপ করে রইল। রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করতে এসে এখন এ কি নতুন ঝামেলা। লোকটা তো এখন হিরণ্ময়দেরই দায়ী করছে। যেন টিউবওয়েলে জল আনতে পাঠানোটাই দোষ।

বীরেশ্বরবাবু আবার হাসলেন, লছমনকে আমি তো একদিন ধরেছিলাম, রাত আটটার সময় হটাং হটাং শব্দ। লছমন বললে, আপনাদের যমুনা কান্নাকাটি করছিল, জল ফুরিয়ে গেছে, আপনারা নাকি বকাবকি করবেন।

হিরণ্ময়ের তখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। উনি যা বলছেন সেগুলো সত্যি না মিথ্যে তাও জানে না হিরণ্ময়। শুভা হয়তো বলতে পারবে।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, আরে মশাই এ তো বিশ্বনীতি। সব জায়গায় এই এক নিয়ম। যার যা পুঁজি সে তা ভাঙাবেই। মাড়োয়ারিদের হাতে টাকা আছে, ওরা টাকা দিয়ে কেনে, চাকরিতে যার হাতে পাওয়ার...কত কনেস্টবল ফুটপাথ থেকে ভিখিরি মেয়ে তুলে নিয়ে যায়, লছমনের হাতে টিউবওয়েলের চাবি ছিল, সেই বা কম যাবে কেন।

হাসতে হাসতে বললেন, যার যা পুঁজি। আপনার ওই যমুনা মেয়েটারও ছিল, তা নইলে টিউবওয়েলের চাবি খোলাত কি করে। বাড়ির মালিক বলে দিয়েছে, তবু তার কথা না মেনে...

হিরণ্ময় কোনও কথাই বলতে পারল না। এ লোকটাকে কি বলবে। যমুনা, একটা সরল গ্রাম্য মেয়ে, বড় বড় অবাক চোখ, লাজুক লাজুক মুখ, পলিমাটির মত গায়ের রং, পলিমাটি দিয়ে গড়া একটা নিষ্পাপ মূর্তি। তার জন্যে এতটুকু মায়া মমতা নেই। হাসছে। কি আশ্চর্য।

হিরণ্ময় উঠতে যাচ্ছিল। আর বসে থাকার কোনও অর্থ নেই।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, বসুন, চা খাবেন।

—না।

বীরেশ্বরবাবু হাতের ইশারায় বসতে বললেন।

কণ্ঠস্বর চাপা।—আপনি ভদ্রলোক, আমিও ভদ্রলোক। কার চাকর, কার ঝি ওসব ভেবে লাভ নেই, বুঝলেন। আপনার বদনাম হলে আমার গায়েও ছিটে লাগবে, আমার বদনাম হলে আপনারও। বস্তির লোকরা, কাজের মেয়েরা এ বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে ওই ভদ্রলোকরা...

একটু থেমে বললেন, তাড়িয়ে দিন ও বেটিকে, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তাড়িয়ে দিন। ওর বিপদ ও বুঝুক।

একটু থেমে বললেন, যদি বলেন, আমিও দু-একশো দিয়ে দিচ্ছি।

হিরণ্ময় উঠে চলে এল।

মাথার মধ্যে তখনও কথাগুলো ঘুরছে। বীরেশ্বরবাবু মানুষটাকে তত খারাপ তো মনে হচ্ছে না। উনি তো কই বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা ভাব করলেন না। এতদিন তো ভেবে এসেছে বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে দুটো পৃথক শ্রেণী, একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনও মিল নেই। একজনের সঙ্গে আরেকজনের স্বার্থের ঝাগড়া। কিন্তু বীরেশ্বরবাবু তো অন্য কথা বলছেন। দুজনের স্বার্থই এক। আমরা দুজনই ভদ্রলোক। ওই মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

ফিরে চলে এল হিরণ্ময়।

সঙ্গে সঙ্গে শুভা বলে উঠল, তুমি আমাকে কিছু না বলে ওই লোকটার কাছে গিয়েছিলে ?

কথার জবাব না দিয়ে হিরণ্ময় ধসে পড়া মানুষের গলায় বললে, লছমন তো পালিয়েছে। দেশে চলে গেছে।

শুভা ঝাঁঝের স্বরে বললে, সে তো আমি জানি।

—জানতে ?

—তুমি তো বলতেও দিলে না, কিছু না শুনে চলে গেলে।

হিরণ্ময় পোশাক বদলাচ্ছে তখন। আপিস থেকে ফিরে অত সব শোনার সময় ছিল না, মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল রাগে। সেজন্যেই পোশাক না ছেড়েই চলে গিয়েছিল।

শুভা বললে, আমি তো ভাবলাম তুমি সিগারেট আনতে ভুলে গেছ, তাই বেরিয়ে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ও ফ্ল্যাটের মিনু ফিরল তখনই, ও বললে, তুমি নাকি বাড়িওয়ালার সঙ্গে গল্প করছ ব্যালকনিতে বসে।

হিরণ্ময় চুপ করেই রইল। বীরেশ্বরবাবুর কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে।

শুভা দাঁড়িয়ে রইল। শেষে বসল খাটের এক পাশে। বললে, সেই বললি, কিন্তু এত দেরি করে, বোকা বোকা।

হিরণ্ময় চটে গিয়ে বলল, ওই মূর্খ মেয়েটা লছমনের নামটা বলছিল না কেন? চেপে রেখেছিল কেন?

শুভা হাসার চেষ্টা করল। —সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি না শুনেই চলে গেলে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, বোকা আর কাকে বলে। লছমন এক নম্বরের ধূর্ত, কাউকে বলতে বারণ করেছিল, বলেছিল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ও তাই বিশ্বাস করেছে।

—তারপর? হিরণ্ময়ের চোখে তখন প্রশ্ন।

শুভা বললে, আজ সকালে টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গিয়ে জেনেছে লছমন নেই। ওদের ড্রাইভারটা নাকি বলেছে, সে দেশে পালিয়েছে।

হিরণ্ময় বললে, হ্যাঁ, বীরেশ্বরবাবুও বললেন। উনি তো সবই জানেন, সবই শুনেছেন ড্রাইভারটার কাছে।

শুভা বলে উঠল, শুনলে আর তুমি ওকে বিশ্বাস করলে? বুঝতে পারছ না, ঝামেলার ভয়ে বাড়িওয়ালাই ওকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভা আবার বললে, তুমি ওই লোকটার কাছে গেলে কেন! পাজি, পাজি, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

ঝামেলার ভয়ে বাড়িওয়ালাই ওকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে!

এদিকটা একবারও মনে হয়নি হিরণ্ময়ের। বীরেশ্বরবাবু যা বলেছেন বিশ্বাস করেছে। ভাবতেই পারেনি উনি লছমনকে সরিয়ে দিয়েছেন। এখন শুভার কথাটাই বিশ্বাস হচ্ছে।

হিরণ্ময় হতাশার গলায় বললে, যমুনাই বা ওকে বিশ্বাস করল কেন। আগে বললে তো...

আগে বললে কি লাভ হত কিছুই জানে না হিরণ্ময়, তবু মনে হল কিছু একটা উপায় হ'ত।

শুভা চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, বিশ্বাস আর করেছে কোথায়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলে রোজ ঘোরাচ্ছিল, সেজন্যেই তো শেষে আমার কাছে কেঁদে পড়েছিল। দিদির খোঁজে গিয়েছিল। বিশ্বাস করেনি বলেই তো।

তবু লছমনকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে যমুনা। কিছুতেই তার নামটা বলেনি। হয়তো ক্ষীণ আশা ছিল লছমন কিছু একটা উপায় করে দেবে। কিংবা লজ্জায় ওর নামটা বলতে পারেনি।

শুভা বললে, তবু ভাল যে বিয়ে করবে বলে নিয়ে ভেগে যায়নি।

হিরণ্ময় বললে, তা হ'লেও তো একটা সুরাহা হত।

একটু গলা নামিয়ে বললে, আমাদের বাড়ি থেকে তো বিদেয় হ'ত।

শুভার গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে গেল। —তুমি শুধু ওকে বিদেয় করার কথাটাই ভাবছ। ওর কথাটা একবারও ভাবছ না। ...ওর সঙ্গে চলে গেলে কি হত, শেষ অব্দি ওর তো আরও সর্বনাশ করে ছেড়ে দিত, সারাটা জীবন। কোন পাড়ায় গিয়ে উঠতে হত কে জানে।

হিরণ্ময় রুক্ষ গলায় বললে, ওর পাপের ফল ও ভোগ করত। এখন তো আমাদের ভোগাচ্ছে।

আসলে যমুনার ওপর শুভার এই দরদ হিরণ্ময় কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মুখের কথায় মায়া-মমতা দেখানোও যেন অন্যায়।

হিরণ্ময় এখন নিজে বাঁচতে চাইছে, নিজেদের বাঁচাতে চাইছে। এখন আর অন্যের কথা ভাবার সময় নেই। ও এখন বিভ্রান্ত। কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভেবেছিল, হৃষির দেয়া ঠিকানাটা একটা পরিত্রাণের উপায়। কিন্তু হৃষি তো ওকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। মারাও যায়। কি ভয়ঙ্কর কথা।

সেই দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছে হিরণ্ময়। 'সে তো মারা গেছে।' বলেই সিস্টার ক্রুদ্ধ চোখে তাকাচ্ছে হৃষির দিকে, যেন মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে হৃষিই দায়ী।

হৃষি কেমন বিমর্ষভাবে বলছিল, নার্সটা মাইরি আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল, যেন মেয়েটার ওই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। সে চাউনিটা আমি, বিশ্বাস কর হিরণ্ময়, চোখ বুজলেই আজও দেখতে পাই।

বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিল, অথচ মেয়েটাকে আমি ভাল করে দেখিইনি।

তারপর স্বগোক্তির মত যেন নিজের মনকেই বোঝাচ্ছিল —আমি তো মেয়েটাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতেই চেয়েছিলাম।

হিরণ্ময়ও তো যমুনাকে বাঁচাতে চেয়েছে বলেই হৃষির কাছে ছুটে গিয়েছিল। পকেটে একটা ঠিকানা আর বুকের মধ্যে আতঙ্ক নিয়ে ফিরে এসেছে।

এদিকে বীরেশ্বরবাবুও সব জেনে গেছেন। এমন ভাবে কথাগুলো বললেন, যেন হিরণ্ময়ই দায়ী। যেন টিউবওয়েল থেকে এক কলসী জল পাবার লোভে ওরাই মেয়েটাকে এগিয়ে দিয়েছে, মেয়েটার সর্বনাশ করেছে।

শালা ! চাপা ক্রোধে মুখ থেকে কথাটা ছিট্‌কে বেরিয়ে এল। বীরেশ্বরবাবুর উদ্দেশে। একবারও লোকটার মনে হচ্ছে না, শেকল দিয়ে বাঁধা টিউবওয়েলের চাবিটা লছমনের হাতে তুলে না দিলে মেয়েটার আজ এই দশা হত না। কি দরকার ছিল টিউবওয়েলে চাবি লাগানোর। প্রচুর আছে, তবু অভাব সৃষ্টি করো। অন্যদের কষ্ট দাও, তবেই তো সুখ। সর্বক্ষেত্রেই তাই। যাদের আছে তারা বোধ হয় এইরকমই ভাবে। অভাব ছড়িয়ে দাও, অভাব অনটন, সমজাটাকে দুমড়ে মুচড়ে ছারখার করে দাও। সবাই যমুনা হয়ে যাক। ভারা থেকে পড়ে যাওয়া একটা খোঁড়া বাপের শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নাও। একটা কোনরকমে টিকে থাকা সংসারকেও নষ্ট করে দাও।

একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছটফট করছে হিরণ্ময়। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এর মধ্যে আবার শুভা যমুনার ওপর দরদ দেখাচ্ছে।

—এ কদিন ও মুখে কিচ্ছু তোলেনি। ওর দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না, শুধু যন্ত্রের মত মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। আর কাঁদছে।

শুভা বললে।

—কি বলছিল জানো ? শুভার চোখ যেন ছলছল করে উঠল। —পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, মা, আমাকে বিষ দিলেও যে আমি মরতে পারব না। আমি মরে গেলে আমার খোঁড়া বাপটাও না খেয়ে মরবে।

কথাটা শুনে হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে যেন একটা মোচড় দিল। অবাক হয়ে গেল ও কথাটা শুনে। ভাবতেই পারেনি। এই রকম একটা বিপদের সময়েও যমুনা কিনা তার নিজের বিপদের কথাই ভাবছে না। দুঃখ পাচ্ছে তার বাবা-মার জন্যে। তার খোঁড়া বাপটার জন্যে।

ওর বাবার কথাটা মনে পড়ল। দরজার কছে লেংচে দাঁড়িয়ে বলছে, আপনাদের কাছে দিয়ে গেলাম গো বাবু, বাকি এখন আমার কপাল। বেটা তো নেই, দুই বেটি, গঙ্গা আর যমুনা, ওরাই একজন এখন আমার পান্তা ভাত, একজন নুন-লঙ্কা। ফোটানো ভাত তো আর ভগবান দিলে না।

সে-সব কথা ভাবলে হিরণ্ময়েরও বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। দয়া দেখাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সাবধান হয়ে যায়। এই সব মিথ্যে মায়া মমতার জন্যে এতখানি ঝুঁকি নেওয়া চলে না। বীরেশ্বরবাবু ঠিকই বলেছেন। আপনি আমি ভদ্রলোক। সত্যি তো, ওদের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা আমাদের শোভা পায় না। ওদের সমস্যা ওরা বুঝুক। আমরা ভদ্রলোকেরা কেন ওর মধ্যে নাক ঢোকাতে যাই।

হৃষি বলছিল, স্যার কিন্তু কোনদিন আমাকে কিচ্ছু জিগ্যেস করেননি। কি ভয়ে ভয়ে থাকতাম। মৃত্যুর খবরটা শুনেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু না, একদিনও কিছু বলেননি। অথচ আমার কানে বাজত। হোপ ইউ আর নট দ্য কালপ্রিট।

না, যমুনাকে নিয়ে যেতে পারবে না হিরণ্ময়। শুভাকেও যেতে দেবে না যমুনার সঙ্গে।

শুভাকে বোঝাতে গিয়েছিল, শুভা বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়নি।

বলেছিল, ওকে ডেকে দিচ্ছি, তুমিই বুঝিয়ে দাও।

পরের দিন সকালে, শুভা গিয়ে ডাকল। —আয় যমুনা, বাবু ডাকছে।

হিরণ্ময়ের তখন ভীষণ অস্বস্তি। ওর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে হবে বলে। এতদিন যমুনাও সামনে আসেনি। এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে, হিরণ্ময়ও ওর দিকে তাকাতে পারেনি। আভাসে যখনই বুঝেছে যমুনা কোথাও বসে আছে দু-হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে, কিংবা সংসারের কোনও কাজ করে চলেছে যন্ত্রের মত, প্রয়োজন থাকলেও তখন আর হিরণ্ময় সেদিকে যায়নি। যেন লজ্জা যমুনার নয়, লজ্জা হিরণ্ময়েরই।

শুভা যমুনাকে ডাক দিতেই হিরণ্ময়ের অস্বস্তি হল।

যমুনা এল না।

দু-তিনবার ডাকার পরও সে এল না দেখে শুভা রেগে গিয়ে ডেকে আনতে গেল।

নিজের ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও শুনতে পেল শুভা বলছে, চল্ চল্ ওঠ, একজন ডাক্তারের ঠিকানা দেবে তুই সেখানে চলে যা।

হিরণ্ময় স্পষ্ট বুঝতে পারল যমুনা উঠছে না। বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে, কিংবা ভয়। ছবিটা যেন দেখতে পেল। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, চোখে সঙ্কোচ লজ্জা ভয়।

শুভা হঠাৎ এটা ধমক দিয়ে উঠল। —ওঠ বলছি, যেখানে যেতে বলছে, যা।

মনে হল হাত ধরে টেনে তুলল যমুনাকে।

একটু পরে ধীর স্থির পায়ে এগিয়ে এল, শুভার পিছনে পিছনে নিজের শরীর আড়াল করে, মুখ চোখ আড়াল করে। এক লহমায় যেটুকু দেখতে পেল, মাথা নিচু করে আছে।

হিরণ্ময়ও চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারছিল না।

অস্বস্তি। ভয়ও। ওই সরল গ্রাম্য মেয়েটার সঙ্গে চোখোচোখি হলেই হয়তো হিরণ্ময়ের মায়া হবে। ও নিজেকে যত ভেতরে ভেতরে নির্মম আর কঠোর করে রেখেছে, মুহূর্তের মধ্যে সেই ছদ্মবেশ থেকে নরম সহৃদয় কোমল মানুষটা বেরিয়ে পড়বে। তখন হয়তো ও নিজেই যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে। একটা অকারণ ঝুঁকি নিয়ে বসবে। একটা প্রকাণ্ড ভুল করবে।

শুভার পিছনে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল যমুনা। এক লহমায় দেখা, তবু মনে হ'ল ওর

ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে, সারা শরীর।

শুভা হঠাৎ সরে গেল। —শোন। বাবু কি বলছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ কান্নায় মিলে মিশে বেরিয়ে এল। —বাবু!

আর কিছু বলতে পারল না। দুটো হাত ওর হাঁটুর দিকে বাড়াল, মুখ তুলে জলে ভাসা দুটো চোখ তুলে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে...

হিরণ্ময়ের ভয় হল ওর চোখেও না জল এসে যায়।

ও এতদিন যমুনার দিকে তাকাতে ভয় পেয়েছে, ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কি আশ্চর্য, এই মেয়েটাকে সন্দেহ করেছিল, দিদির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হয়তো ওদের বিপদে ফেলতে চায়।

ওর 'বাবু' আর্তনাদ, ওর কান্না দেখে মনে হল এখনই পড়ে যাবে. অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

দুহাত বাড়িয়ে ওর হাত দুটো ধরল হিরণ্ময়। —ওঠ্, কোনও ভয় নেই।

শুভা বললে, ঠিকানাটা দাও ওকে।

দিল।

হিরণ্ময় বললে, এই যে উল্টো দিকে নামটা, বলবি ওঁর কাছ থেকে আসছি।

অর্থাৎ হৃষির নাম।

তারপর বললে, এ পিঠে ডাক্তারের ঠিকানা।

শুভা বললে, তুই তো রাস্তাঘাট ভাল চিনিস না, পাড়ার সেই বন্ধুটাকে নিয়েই যাস। ডাক্তারকে সব খুলে বলবি, কিছু লুকোস না।

হাত পেতে কাগজখানা নিল যমুনা। মাথা নিচু করে চলে গেল।

শুভা পিছন পিছন বলতে বলতে যাচ্ছে, আমি কিছু টাকা দিয়ে দেব নিয়ে যাস যদি লাগে।

আর হিরণ্ময় নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল। মনে মনে বললে, আমি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই, রাজি নই।

॥ ৬ ॥

একটা জীবন, একটাই তো জীবন। দুঃখ এই, জীবনটাকে আর নতুন করে গড়ে তোলা যায় না।

যে কোনও একটা ভুল যেন নদীর একটা বাঁক, তাকে আর আগের পথে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই ভুলগুলো, হিসেবের এই গরমিল, মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

যমুনা একটা ভুল করে বসেছে। কিন্তু হিরণ্ময়ের নিজের জীবনটাও ভুলে ভরা। হয়তো অন্যরকমের, কিন্তু ভুলই তো।

ঠিকানা লেখা কাগজখানা যমুনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ও অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করল।

শুনতে পেল শুভা যমুনাকে বোঝাচ্ছে। গলার স্বর এখন আর চাপা নয়, কারণ বিল্টু আর রুমি কেউই বাড়িতে নেই। বিল্টুর কলেজ কখন কে জানে, ও কিন্তু বেরিয়ে যায় অনেক আগেই। হিরণ্ময় হাসে, আপত্তি করে না। ও জানে এ বয়েসটা শুধু বন্ধুদের জন্যে। আড্ডার নেশা জীবনের আর সব নেশাকে ছাপিয়ে যায়। এমনকি প্রেমও তুচ্ছ এর কাছে।

হিরণ্ময়েরও এমন একটা বয়েস ছিল। ও জানে।

শুভা একদিন রাগারাগি করে বলেছিল, বাড়িতে তোর টিকিই দেখা যায় না। সকালে বেরিয়ে যাস, রাত করে বাড়ি ফিরিস। কাল থেকে টিফিন কেরিয়ারে সকাল বেলাতেই তোর ভাত দিয়ে দেব। নিয়ে বেরিয়ে যাস।

রাগের স্বরে বলেছিল, ভাতটা তো আর বন্ধুরা বিনা পয়সায় দেবে না!

মার রাগ দেখে বিল্টু হাসছিল। রুমির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, মা আজ এত ফায়ার কেন রে!

হিরণ্ময়ও হেসে উঠেছিল।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ে গিয়েছিল, এ-বয়েস ওরও একদিন ছিল।

বড় রাস্তার ধারে চায়ের দোকানটায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেছে। ও, বিকাশ, হৃষি। আরও কেউ কেউ।

তখন ওরা কত স্বপ্নই না দেখত। এই পৃথিবীটা বদলে যাবে, এই দেশটা বদলে যাবে। একটা সুখের ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। সব মানুষ সুখী হয়ে গেছে। কোথাও কোনও দুঃখ নেই।

এখন দেখতে পাচ্ছে কিছুই বদলায়নি।

বদলায়নি বলেই তো শুধু একটা টিউবওয়েলের চাবি হাতে নিয়ে লছমন ছোকরাটাও একটা গ্রাম্য মেয়েকে লোভ দেখাতে পারে।

সত্যি কি তাই? না, তাও নয়। আসলে শরীর বড় অবিশ্বাসী। আর যমুনার এই বয়েস হয়তো পৃথিবীটাকে বড় বেশি রঙিন দেখে। বড় বেশি বিশ্বাস করে।

হিরণ্ময় শুনতে পেল শুভা বলছে, এখানে কান্নাকাটি করে কি হবে, ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদবি।

রুমির আজ ছুটি, কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। তাই শুভার গলার স্বর চাপা নয়।

হিরণ্ময় আপিস বেরোল বেশ নিশ্চিন্তভাবে। বুকের ওপর যে ভারী পাথরটা চাপা ছিল, সেটা সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। সেটা এখন তুলে দিয়েছে যমুনার কাঁধে।

হৃষি নিশ্চয় ফোন করে দিয়েছে, নামটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

বেশ হাল্কা লাগছিল নিজেকে।

উমেশ এসে বললে, বাঃ, আপনাকে আজ তো বেশ ফ্রেশ লাগছে।

সুধাকান্ত একসময় এসে বললে, অসুখবিসুখ নয় তা হলে, আপনি তো আমাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলেন হিরণ্ময়দা।

হিরণ্ময় হাসছিল। ও যেন মুক্তি পেয়ে গেছে। খুব খুশি-খুশি। সেই কলেজে পড়ার দিনগুলোর মত জমিয়ে আড্ডা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে!

একবার ভাবল, আপিস থেকে সোজা চলে যাবে বিকাশের কাছে। ওর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে তো বিকাশ আরও খুশি হবে।

হিরণ্ময়ের সেই ছেলেবেলার দিনগুলো মনে পড়ছে। তখন এই সব ঝামেলা ছিল না, দুশ্চিন্তা ছিল না। বয়েস শুধুই দূরের দিকে তাকাতে বাধ্য করে, পদে পদে ভয় দেখায়। কম বয়েসে শুধু কাছের জিনিসটাই চোখে পড়ে।

বড় রাস্তার ওই চায়ের দোকানটায় বসে আড্ডা দিতে দিতে হৃষি একদিন বলেছিল, পরীক্ষাটা পাস করে গেলেই ব্যস মুক্তি। আর কোনও দুর্ভাবনা থাকবে না।

বিকাশ হেসে হেসে বলছিল, আমি? পরীক্ষার পরই একটা সুন্দর দেখে বউ জোগাড় করে নিয়ে ব্যবসায় বসে যাব।

ওর বাবার বেশ বড় ব্যবসা ছিল।

হিরণ্ময় বলেছিল, নিজে কিছু করবি না? বাবার ব্যবসায়?

তখন তো সামনে সব বড় বড় আদর্শ। নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো। যেন পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করাটাও পাপ। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে নেব এই সব স্বপ্ন। সেজন্যেই বিকাশের কথাটা হিরণ্ময়ের খারাপ লেগেছিল।

বিকাশ হাসল। বললে, হ্যাঁ বাবার ব্যবসায়, কিন্তু বাবার মত ব্যবসায় নয়। আমি দেখিস একেবারে ভোল পাল্টে দেব। একেবারে মডার্ন বিজনেস যাকে বলে। হাসতে হাসতে বলেছিল, বাবার সঙ্গে ফাইট তো তখনই জমবে। আমি একটা কিছু করে দেখাতে চাই, বুঝলি!

করে দেখাতে চাই!

হিরণ্ময় ওসব কিছুই ভাবেনি। ও শুধু ভেবেছিল পরীক্ষাটা ভাল করে পাস করতে পারলে একটা চাকরির চেষ্টা করবে। মনোমত একটা চাকরি পেয়ে গেলে নিশ্চিন্ত, আর তো জীবনের মত কোনও চিন্তা নেই।

ভুল ভেবেছিল। যতই বয়েস বেড়েছে ততই দূরের দিকে তাকাতে শুরু করেছে, ততই ভয়। একটা নিরাপত্তার অভাব।

হিরণ্ময়ের এখনও নিজেকে প্রৌঢ় মনে হয় না, বৃদ্ধ তো নয়ই। যেন সেই যৌবন বয়েসেই আছে। শুধু মিনিবাসের কন্ডাক্টর হঠাৎ 'দাদু' সম্বোধন করে মন বিষিয়ে দেয় কখনও কখনও। এখন আর গায়ে মাখে না, সহ্য হয়ে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ করে দিয়েছিল ওই একটাই চিন্তা, রিটায়ারমেন্ট। অথচ আগেকার কালে লোকে এই দিনটার স্বপ্ন দেখত, হাসতে হাসতে ভাবত, আঃ, এরপর অফুরন্ত ছায়া, গায়ে আর একটুও রোদ্দুর লাগবে না। সেকালে তো এমন হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ত না, স্বপ্নগুলো উড়ন্ত পায়রার মত নাগালের বাইরে চলে যেত না।

হিরণ্ময়ের এখনও অনেক কাজ বাকি, বেঁচে থাকা দরকার। বেঁচে থাকবেও ও, কই ধারেকাছে মৃত্যুর সামান্য ইশারাও তো দেখতে পাচ্ছে না। আর এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু এগিয়ে এলে ওর চলবেই বা কি করে!

চারতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হয়, গরমের দিনে তো অসহ্য গরম, ওপরে আরেক তলা তুলবেন বলে বীরেশ্বরবাবু জলছাদও করেননি। তাই এত গরম। তা হোক, তবু তো আশ্রয়। কিন্তু প্রতি মাসেই একটা আশঙ্কা, বাড়িওয়ালা না ভাড়া নিতে অস্বীকার করেন। একজন ভাড়াটের সঙ্গে ঝগড়া হবার পর তো ভাড়া নিচ্ছেন না। সে বেচারি ছুটে বেড়াচ্ছে রেন্ট কন্ট্রোলে। ভয়, কবে মামলা করে বসেন উচ্ছেদের।

নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়। অথচ মধ্যবিত্তের সেই অহঙ্কারটুকু ঠিকই আছে। ভাড়া দিতে যাওয়ার সময় কি অস্বস্তি। যেন লোকটার কাছে হিরণ্ময় ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর হাতে হাতে রসিদটাও দেয় না। দিনের পর দিন তাগাদা দাও।

শেষ অবধি যমুনার হাত দিয়েই টাকাটা পাঠাত।

শুভা বলেছিল, ও খুব বিশ্বাসী। বাজারে কিছু আনতে দিলে একটা পয়সাও বেশি বলে না। আর খাওয়ার কোনও লোভ নেই। মিটসেফে তো কত কি থাকে, ফ্রিজে, আমি লক্ষ করে দেখেছি, অন্য কাজের মেয়েগুলোর মত কিচ্ছু চুরি করে খায় না।

সেজন্যেই ওকে দিয়ে টাকাটা পাঠানো হত। অস্বস্তি থেকে বাঁচবার জন্যে।

বীরেশ্বরবাবু একদিন নাকি ওকে বলেছিলেন, কেন রে, তোর বাবু আসতে পারল না?

শুনে চটে গিয়েছিল হিরণ্ময়। ও লোকটাও তো আমাদের মতই ছিল, বাড়ি করে একটু ওপরে উঠে গেছে। সেজন্যেই হয়তো অহঙ্কারে সুরসুড়ি লাগে ভাড়াটে নিজে এসে

ভাড়ার টাকাটা হাতে তুলে দিলে।

আমাদের, মধ্যবিত্তদের কিচ্ছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে, অহঙ্কার। যে নীচে পড়ে আছে তারও, যে একটু ওপরে উঠে গেছে তারও। আর ওই 'অহঙ্কার' শব্দটাকে আমরা বোধহয় বদলে নিয়ে বলি 'আত্মসম্মান'। আর সেই আত্মসম্মান বজায় রাখতে সব সময়ে তটস্থ।

বাসের কন্ডাকটর কিংবা ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিছু একটা বললেই সম্মানে লাগে। প্যাসেঞ্জার কিছু বললে তারও। আপিসে ওপরওয়ালা কিছু বললে নীচের লোকের, নীচের লোক কিছু বাঁকা কথা বললে ওপরওয়ালার।

পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে আমরা শুধু আত্মসম্মান বজায় রাখতেই ব্যস্ত। কোনও দুর্নাম না হয়, কোনও অপবাদ না শুনতে হয়। সমাজ বোধহয় এভাবেই মানুষকে শাসন করে। তা না হলে যমুনাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে পারল না কেন হিরণ্ময়!

হৃষি তো তাকে ফোন করে দিয়েছে।

যমুনা কাগজের উল্টোপিঠে লেখা হৃষির নামটা দেখালেই ডাক্তার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। যমুনা নিজেও তো বলবে সব।

শুভা বলে দিয়েছে, কিচ্ছু লুকোস না।

ধমক দিয়ে বলেছিল, এখানে কেঁদে কি হবে, ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদবি।

যমুনা নিশ্চয় তার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদবে। বলবে, আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। ও সব কি আর শেখাতে হয় নাকি।

গ্রাম্য সরল একটা মেয়ে, দেখতেও সুশ্রী, বড় বড় চোখ, পলিমাটির মত রং, পলিমাটি দিয়েই যেন গড়া একটা নিষ্পাপ মূর্তি। ওকে দেখে ডাক্তারের নিশ্চয় মায়া হবে।

কিন্তু হিরণ্ময়ের কেন ওর জন্যে এখন আর কোনও মায়া-মমতা নেই?

আত্মসম্মান? দুর্নামের ভয়? নাকি আরও বড় একটা ভয় ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যুও হতে পারে!

হৃষি বলেছিল।

বিষণ্ণ স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে মাথা নিচু করে বলেছিল, গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে চলে গেলাম। ওর বেড নম্বর জানতাম। ভীষণ লোভ হচ্ছিল মেয়েটিকে একবার দেখি। ভর্তি করতে যখন নিয়ে গেল, তখন ভাল করে দেখিনি, বন্ধুর সামনে তাকে তাকিয়ে দেখতে লজ্জা করছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল হৃষি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, নার্সকে বললাম, এই বেডের পেশেন্ট? নাম বললাম। নার্স বললে, সে তো মারা গেছে। বলেই কেমন অবাক হয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। আমি তার সেই চোখের চাউনি সহ্য করতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম।

যমুনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হিরণ্ময়ের তো পালিয়ে আসারও পথ থাকবে না।

মৃত্যুও হতে পারে! না, আজকাল বোধহয় হয় না। এখন তো চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া আইনও শিথিল। অত ভয় পাবার বোধহয় কিছু নেই।

মেয়ের মত। মেয়ের মতই এ-বাড়িতে থাকবে। শুভা সান্ত্বনা দিয়েছিল ওর বাবা-মাকে। ভারা থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে যাওয়া পা টেনে টেনে আসত মানুষটা। মাইনে নিয়ে যেত।

রুমি যখন চার বছরের, সদ্য একটা কেজি স্কুলে ঢুকেছে, শুভার তখন কতই বা বয়েস। হিরণ্ময়ও বলতে গেলে যুবক।

শুভা রুমিকে স্কুলে নিয়ে যেত, নিয়ে আসত।

একদিন বললে, জানো, রুমির পাশে যে মেয়েটা বসে, তার মা আমার খুব বন্ধু হয়ে গেছে।

হিরণ্ময় হেসে বলেছিল, তাই নাকি ? এখন তো তোমার অনেক বন্ধু, আমি তো দেখেছি স্কুলের সামনে রকে বসে সব খুব আড্ডা দাও।

—আড্ডা দিই ? একদিন গিয়ে বসে থাকো না অতক্ষণ। দেখব কত ধৈর্য থাকে।

হিরণ্ময় রসিকতা করে বলেছে, ওই যুবতী-যুবতী বউগুলোর পাশে বসে অপেক্ষা করা ? খুব পারব, তুমিই সহ্য করতে পারবে না।

রাগতে গিয়েও হেসে ফেলেছে শুভা।

আর হিরণ্ময় বলেছে, ওরা তো দিব্যি আড্ডা দেয় দেখেছি।

তারপর হাসতে হাসতে বলেছে, আসলে স্কুলটা তো ওদের ফাঁকিবাজির জায়গা। শাশুড়ির ঘাড়ে সব কাজ চাপিয়ে দিয়ে বসে বসে আড্ডা মারে।

শুভা রেগে গেছে।—তুমি তো শোনোনি তাই বলছ। কি সব দজ্জাল শাশুড়ি আর ননদ আছে, ওদের সব গল্প না শুনলে জানতে পারবে না। শুনে শিউরে উঠতে হয়।

—তুমি কি ভাগ্যবতী, দুটোকে আগেই পার করে দিয়ে এসেছ। বলে হেসে উঠেছে হিরণ্ময়।

তারপর বলেছে, ওটা তা হলে আসলে তোমাদের পরচর্চা ক্লাব।

—আহা তা কেন। একটা কাউকে তো ওরা দুঃখের কথা বলবে, তা না হলে তো মরে যাবে।

একটু থেমে।—অনেক কিছু শেখাও যায়।

হিরণ্ময় আর কিছু বলেনি। কি শেখা যায় কে জানে।

শুভাই বলেছে, এই জানো, রুমির বন্ধুর মা বলল, একটু একটু করে সোনার গয়না করিয়ে রাখতে। সেও নাকি করিয়ে রাখছে একটু একটু।

হিরণ্ময় অবাক হয়ে তাকাল শুভার দিকে।

শুভা বলে উঠল, আহা, আমার জন্যে নয়। সে তুমি কত দেবে আমি জানি। আমি বলছি, রুমির বিয়ের জন্যে।

এতদিন পরে সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।

তখন কি সব আইন টাইন হয়েছে। সোনার দোকানে বাইশ ক্যারেটের গয়না গড়ানোই যায় না। গেলেও লুকিয়ে চুরিয়ে।

হিরণ্ময় হতাশ ভাবে বলেছিল, সংসারই চলে না, গয়না গড়িয়ে রাখবে।

শুভা বলেছে, আহা, চেষ্টা করেই দেখ না। মাসে মাসে কিছু বাঁচিয়ে, মাঝে মাঝে যদি করি এখন থেকে, রুমির বিয়ের সময় ভাবতে হবে না।

একটু থেমে বলেছে, বিয়ে তো আর উঠে যাবে না, গয়নাটয়নাও দিতে হবে। যারা আইন করে তারা তো মানুষের কথা ভাবে না, বড় বড় মুখে শুধু দেশের কথা বলে। যেন মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ।

হিরণ্ময়ের মনে হয়েছে কথাগুলো মিথ্যে নয়। আমি আছি বলেই আমার সংসার। সংসার আছে বলেই সমাজ। সমাজ আছে বলেই দেশ। আইন সকলের কথা ভাবতে গিয়ে কারও কথাই ভাবে না।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ছে, ওদের সেই আগের বাড়ির গলিতে একটা ছোট্ট অন্ধকার কুঠরিতে একজন স্যাকরা বসত। দিনরাত একটা তোলা উনোনে অ্যালুমিনিয়মের বাটি বসানো। তাতে নীল নীল, কখনও হলুদ হলুদ, অবিরত জ্বলছে। অত ভাল করে

দেখেনি কোনদিন। অবিনাশ নাম বোধহয়।

পাড়ার সবাই ওর কাছে গয়না গড়াত। বাইশ ক্যারেটেই করে দিত।

রুমির বিয়ের জন্যে সেই চার বছর বয়েস থেকে একটু একটু করে গয়না গড়িয়ে এসেছে শুভা, ওই অবিনাশ স্যাকরার কাছেই।

অভাব অনটন তো ছিলই। তবু সংসারের খরচ কমিয়ে বছরের পর বছর রুমির বিয়ের জন্যে তৈরি হয়েছে। মনে হয় যা করাতে পেরেছে তাতেই চলে যাবে।

তবে শুভা একদিন বলেছিল, প্যাটার্নগুলো সব পুরনো, বিয়ের সময় নতুন করে গড়াতে হবে।

হিরণ্ময় চমকে উঠেছে, সে তো অনেক খরচ।

হেসেছে শুভা। —যখন করিয়েছ তখন তো সোনার দামই ছিল না। এখন হ'লে আর পারতে। এই একটা উপকার রুমির সেই কেজি স্কুলের বন্ধুর মা করেছিল, ভাগ্যিস শিখিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলেছে, তার নামটাও ভুলে গেছি!

রুমির জন্যে সেই চার বছর বয়েস থেকে কত চিন্তা। —তুমি কিছু ভেবো না, ও তো আমার মেয়ের মত। আমার মেয়ের মতই থাকবে।

লেংচে লেংচে এসে দাঁড়ানো অক্ষম বাপটাকে শুভা বলেছিল।

এখন সেই কথাটা ঠাট্টার মত লাগছে। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাক্তাররের কাছে যাওয়ার ঝুঁকিটুকুও নিতে চায়নি হিরণ্ময়।

পাড়ায় একটা কাজের মেয়ে ওর বন্ধু। তার সঙ্গেই দিদির খোঁজে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট তো চেনে না, সেজন্যেই শুভা বলেছিল তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কসবায় না কোথায় যেন। ঠিকানাটা লেখা ছিল শুভার কাছে।

শুভা বলে দিয়েছিল, মেয়েটাকে যেন কিছু বলিস না।

দিদি গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয়নি। যে বাড়িতে কাজ করে দিদি, সে বাড়ির গিন্নিমা বলেছেন, সে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। ফিরে এসে বলেছে যমুনা।

আর শুভা জিগ্যেস করেছে, তোর বন্ধুকে কিছু বলিসনি তো?

মাথা নেড়ে যমুনা জানিয়েছে, না।

ওর সারা মুখ তখন বিভ্রান্ত, চোখে কান্না।

হিরণ্ময় আর শুভা বিশ্বাস করেছিল ওর কথা। এখন বুঝতে পারছে, সবই বলেছে ও মেয়েটাকে। বলা স্বাভাবিক। কিন্তু সে নিশ্চয়ই গোপন রাখবে। না রাখলেও তেমন ভয় নেই। বীরেশ্বরবাবু তো জেনে গেছেন। মেয়েটাকে নিশ্চয় লছমনের নাম বলেছে।

লছমনের নাম বলার পরই তো অনেকখানি স্বস্তি।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার দায়িত্বটা যমুনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত লাগছিল হিরণ্ময়ের। যা টাকা লাগে দিয়ে দেবে। যমুনার হাতে তো কিছু টাকা দিয়েও দিয়েছে শুভা।

বেশ হাল্কা লাগছিল। ভেবেছিল ছুটির পর বিকাশের কাছে চলে যাবে। অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু আপিস থেকে বেরিয়ে বিকাশের কাছে যেতে ইচ্ছে হল না। আবার যেন দুর্ভাবনাটা চেপে বসল। কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছে না। যমুনা কি ওর সেই বন্ধুটাকে নিয়ে যেতে পেরেছে? খুঁজে পেয়েছে ক্লিনিকটা? ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কি বললেন তিনি? হাজারো প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আর তার উত্তর জানার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠল হিরণ্ময়।

বিকাশের কাছে যাওয়া হল না।

বাড়ি ফিরে এসেই প্রথম প্রশ্ন, গিয়েছিল ?

শুভার মুখ আবার থমথমে।

বিব্রত বোধ করল হিরণ্ময়। উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কি হল ? দেখা পেয়েছে ?

শুভা কোনরকমে বলল, হুঁ। কিন্তু...

বলেই থেমে গেল।

—কি বলেছে বলবে তো ?

শুভা ধীরে ধীরে বললে, তোমাকেও যেতে বলেছে। যমুনা বললে, ডাক্তারবাবু বলেছেন বাবুকেও সঙ্গে নিয়ে আসবি। তোমাকেও নাকি দরকার।

বিব্রত বোধ করল হিরণ্ময়। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। বললে, সে কি ! আমাকে আবার কেন ? আমি এ-সবের মধ্যে যাব কেন।

যমুনার ওপর প্রচণ্ড রেগে গেল হিরণ্ময়। ওকে এর মধ্যে টানা কেন। যমুনাকে এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠানো হল, কান্নাকাটি করে ও তো ডাক্তারকে রাজি করাতে পারত। জিগ্যেস করতে পারত কত টাকা লাগবে।

ক্লিনিকটা বোধহয় সরকারি। টাকাই লাগবে না। লাগলেও যৎসামান্য। ও তো বলতে পারত, বাবুকে এর মধ্যে আনবেন না। কিংবা, কত টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দেব।

শুভা বললে, আমি তো জিগ্যেস করলাম। ও বললে, ডাক্তারবাবু নাকি বলেছেন কি সব সই করতে হবে তোমাকে।

সই করতে হবে ! বুকের ভেতরটা দুরদুর করে উঠল।

বললে, কি সই করতে হবে ?

বুকের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক। বেশ হাল্কা লাগছিল যমুনার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে। এখন মনে হচ্ছে যেন আরও গভীরে জড়িয়ে পড়েছে।

—সে তো মারা গেছে ! হাসপাতালের সেই নার্স বলছে, বলেই হৃষির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছে।

—জানিস হিরণ্ময়, নার্সটা এমন ভাবে তাকাল আমার দিকে, তাকিয়ে রইল কটমট করে, যেন আমিই দায়ী। তার চোখে রাগ আর সন্দেহ।

মৃত্যুও হতে পারে। মৃত্যুও হয়। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল হিরণ্ময়ের।

হঠাৎ কি মনে পড়তে শুভা বললে, দাঁড়াও, ওকে কি যেন লিখে দিয়েছে। নিয়ে আসছি।

একটু পরেই ফিরে এল শুভা। কাগজটা এগিয়ে দিল।

হিরণ্ময় হাতে নিয়ে পড়ল। পড়েই চটে গেল যমুনার ওপর।

বিব্রতভাবে বলল, মেয়েটাকে নিয়ে কি করি বলো তো ! গলার স্বরে একটা কান্নার রেশ ফুটে উঠল। —একটা সামান্য মিথ্যে কথাও বলতে পারলি না।

শুভা বললে, ওকে তো তুমি শিখিয়ে দাওনি।

শুভার ওপরেও যেন চটে গেল হিরণ্ময়। —নিজের সর্বনাশ করার সময় তো কাউকে শিখিয়ে দিতে হয়নি।

স্বগতভাবে বললে, কি করি এখন।

শুভা বোধহয় কাগজের লেখাটা পড়েও দেখেনি।

হিররণ্ময় হতাশায় ভেঙে পড়া গলায় বললে, আমারও সর্বনাশ না করে ও ছাড়বে না।

—কেন, কেন, কি লিখেছে ? উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করল শুভা।

আর হিরণ্ময় ধীরে ধীরে বললে, বয়েসটাও একটুও বাড়িয়ে বলতে পারেনি ! তা হলেও

হয়তো এত সব লাগত না।

একটু থেমে বললে, ও তো অ্যাডাল্ট নয়, সেজন্যে কনসেন্ট চাই। সই করে দিয়ে আসতে হবে।

হিরণ্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ বললে, না না, সই-টই আমি করতে পারব না। অসম্ভব। ওকে বলো, ও নিজে গিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারে করুক। তা না হলে...

অসহ্য একটা যন্ত্রণা বুকে চেপে বললে, তাড়িয়ে দাও, ওকে তাড়িয়েই দাও। ও যা খুশি করুক, আমি এর মধ্যে নেই।

শুভাও আশ্চর্য হয়ে গেছে। —বাঃ রে, আমরা কেন সই করতে যাব! ওর বাবা তো তখন আমাদেরই দায়ী করবে। ওই ঝনঝনে দিদিটা...

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা আতঙ্ক ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়াল।

হিরণ্ময় ফিসফিস করে বললে, মারাও তো যেতে পারে। তখন...

কি ভীষণ একটা দ্বন্দ্ব। কোনদিকে যাবে ও। এ কটা দিন প্রতি মুহূর্তে একটা ভয় নিয়ে কেটেছে। ওর বাবা-মা না এসে হাজির হয়। কিংবা ওর সেই চালাকচতুর দিদিটা। গঙ্গা। কি বলবে তখন? ওরা তো বলবে, আপনাদের ওপর ভরসা করে রেখে গিয়েছিলাম। দায়িত্ব তো আপনাদেরই।

পাড়ার লোক জানবে। হইচই, চিৎকার।

হিরণ্ময় ভাবতেও পারছে না। আত্মসম্মান। মধ্যবিত্ত মানুষের এটুকুই তো সম্পদ। তাও যদি চলে যায়, পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না।

বাড়িওয়ালা বীরেশ্বরবাবু তো দিব্যি বিহারি চাকরটাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে এখন ঝাড়া হাত-পা। বলবেন, আমি কি জানি। সে তো দেশে চলে গেছে। হয়তো বলবেন, যমুনাই যে সত্যি কথা বলছে তার ঠিক কি। ওরা সব পারে।

অসহ্য এক দোটানার মধ্যে হিরণ্ময় তখন ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

বীরেশ্বরবাবুর কথাগুলো মনের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। হয়তো ওর বাবা-মাকেও বলে বসবেন, ওই বয়েসের একটা মেয়েকে দোকান-বাজারে পাঠাত। টিউবওয়েল থেকে জল নিতে পাঠাত সন্ধের পর।

কথাগুলো মনে পড়তেই হিরণ্ময়ের মনে হল, আমিই দায়ী। আমরাই দায়ী। কিন্তু এই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। উপায় নেই।

পরের দিন সকালে আপিস যাবার আগে হিরণ্ময় বললে, শোনো, ওসব মায়াদয়া করে লাভ নেই। বিল্টু আর রুমি বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলা তুমি ওকে তাড়িয়েই দাও। যেমন করে পারো তাড়াও।

একটু থেমে বললে, দু-তিনশো টাকা বেশি দিয়ে দিয়ো। দু-তিনশো টাকা। যেন ওই টাকাটা দিয়ে অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে চাইছে হিরণ্ময়।

ঘোর দুশ্চিন্তা নিয়ে সন্ধের পর বাড়ি ফিরল হিরণ্ময়। বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠা। আর ভয়। দরজার বেল্‌টা বাজাতে গিয়েও হাত কেঁপে গেল।

পায়ের শব্দে বুঝতে পারল শুভা ছুটে আসছে। দরজায় বেল্‌-এর সুইচ টিপলেই শুভা বুঝতে পারে। প্রত্যেকটা বেল্‌-এর আওয়াজ ওর চেনা হয়ে গেছে। ওই বিল্টু এল! যমুনা, রুমি এসেছে দরজা খুলে দে। কিংবা, দ্যাখ, বাবু এসেছে।

হিরণ্ময় চেনে শুধু শুভার পায়ের শব্দ।

শুভা একটু বেশি শব্দ করে যেন দরজাটা খুলে দিল।

হিরণ্ময় শুভার মুখে হাসি দেখতে পেল। এ-রকম হাসি ও শুভার মুখে অনেককাল

দেখেনি। সারা মুখে যেন আনন্দ উপচে পড়ছে।
হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বললে, গেছে।
—চলে গেছে ? হিরণ্ময়ের মুখেও হাসি ফুটল।
যেন এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কিছু নেই। আর কিছু হতে পারে না।
হিরণ্ময়ে মনে হ'ল, আঃ কি আরাম। মুক্তি, মুক্তি। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে।
খুশি উপচে পড়ছে তখন হিরণ্ময়ের মুখেও।
নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল।
আর হাসি-হাসি মুখে শুভা বললে, কি করে যে তাড়িয়েছি তুমি ভাবতে পারবে না। যেতে কি চায়!
হাসতে হাসতে বললে, মেয়েটা বড় বোকা, বোকা আর সরল।
একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভা বলল, ও যদি না যেতে চাইত, কি করতাম বলো। কিছুই তো করার ছিল না।
হিরণ্ময় বললে, যাক, বাঁচা গেছে।
বুকের ওপর চেপে বসে থাকা ভারী পাথরটা সরে গেছে। সমস্ত শরীর-মন হাল্কা হয়ে গেছে হিরণ্ময়ের। জীবনে এমন আনন্দ যেন কখনও পায়নি।
হিরণ্ময় আপিসের পোশাক ছাড়ছিল। শুভা পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল। তারপর হাসি হাসি মুখে হেলানো চেয়ারটায় গিয়ে বসল।
যেন নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করছে এমনভাবে গদগদ হয়ে বললে, স্রেফ বলে দিলাম, ডাক্তারের কাছে আমরা কেউ যেতে পারব না। ...ধমক দিয়ে বললাম, এখানে এত কান্নাকাটি করতে পারছিস, আর ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে বলতে পারলি না।
শুভা আবার বললে, ধন্যি মেয়ে, উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।
হিরণ্ময় যেন একটা গল্প শুনছে, আর কোনও উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। পোশাক বদলে এসে খাটের এক প্রান্তে বসল, হেলানো চেয়ারটার দিকে তাকাল, শুভার মুখের দিকে। যেন কাহিনী শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু উপসংহারটুকু। এখন উৎকণ্ঠা নেই, শুধু কৌতূহল।
শুভা বললে, খুব কড়া হয়ে বললাম, তুই যা করেছিস তারপর যে এ কদিন রেখেছি তোকে সেই তোর ভাগ্য।
হঠাৎ বলে উঠল, মেয়েটা খুব বিশ্বাসী ছিল কিন্তু। ওকে তো অত টাকা দিয়েছিলাম, শুধু বাস ভাড়া খরচ করেছে, বাকি টাকা এসেই ফেরত দিল।
হিরণ্ময় জিগ্যেস করল, চলে যেতে বললে, আর চলে গেল ?
শুভা হেসে উঠল। —তাই কখনও যায়!
—তবে!
শুভা ধীরে ধীরে বললে, চুপচাপ ওখানটায় বসে ছিল থম মেরে। একটা কথাও বলছিল না। আমি টাকা এনে ওকে বাকি মাইনে বুঝিয়ে দিলাম। ও বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।
হিরণ্ময় খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে ছিল, সোজা হয়ে বসল। —নিল ?
শুভা হাসল। বললে, নিতে কি চায়, হাতই বাড়ায় না। শেষে নোটগুলো গুঁজে দিলাম ওর হাতে। নিচ্ছিল না, আবার দিতেই কেমন কামড়ে ধরল যেন।
হিরণ্ময় ভেতরে ভেতরে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল ? কিংবা অপরাধবোধে ?
ও হঠাৎ প্রশ্ন করল, ব্যস, কিছু দিলে না ?

শুভা বলে উঠল, বাঃ রে, তা কেন। বরং বেশিই দিয়েছি। চার-চারটে একশো টাকার নোট। তুমি তো দু-তিনশো বলেছিলে।

—নিল ?

শুভা আবার হাসল। বললে, আসলে কি জানো, মেয়েটা কেমন যেন ভ্যাবলা মত হয়ে গিয়েছিল। নোটগুলো ওর হাতে গুঁজে দিলাম, কেমন হাতের মুঠোয় কামড়ে ধরল।

একটু থেমে বললে, ওর জামা-কাপড় থলিটায় সব ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, নে, যা।

শুভা তখন হাসছে। কিন্তু হাসিটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না।

ও অবাক হয়ে বললে, চলে গেল ?

শুভা তাকাল হিরণ্ময়ের দিকে।—এত সোজা ! তুমি তো বলে দিয়েই খালাস, তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও। যদি থাকতে তা হলে বুঝতে।

হিরণ্ময় একটু দমে গেল। শুধু শুভার কাছে শুনেই যে ছবিটা ফুটে উঠছে সেটাই তো অসহ্য। বুকের ভেতর মোচড় দিচ্ছে মেয়েটার দুঃখে, একটা চাপা ভয়ও। এই নিশ্চিন্ত হওয়ার পরেও।

শুভা আর হাসল না। বললে, ও তো কিছু বুঝতেই পারছিল না। আমি যে ওকে একেবারে চলে যেতে বলছি, কানেই ঢোকেনি।

একটু থামল শুভা। তারপর হাসতে গেল কি যেন বলার জন্যে। ওর গলার স্বর জড়িয়ে গেল, হিরণ্ময় দেখল শুভার চোখ ঠেলে জল এসে গেছে।

ওর নিজেরও ভীষণ খারাপ লাগছিল।

চাপা কান্নায় শুভার গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল।—কিছুতেই ওঠে না, শেষে আমি যেই রেগে গিয়ে...

কথা বলতে পারছিল না শুভা। আঁচলে চোখ মুছল। একটু বোধহয় নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল। তারপর বললে, আমি যেই রেগে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে তুললাম, ডুকরে কেঁদে উঠে এমন ভাবে রান্নাঘরের জানলার গরাদটা ধরে রইল...

হিরণ্ময় বলে উঠল, বোলো না, বোলো না। অসহ্য।

যেন ছবিটা যাতে দেখতে না হয় সেজন্যেই হিরণ্ময় চোখ বুজে ফেলল।

আর শুভা বেশ ক্ষোভের স্বরে বললে, তবেই বোঝো, কাজটা আমাকেই করতে হয়েছে। তুমি তো দিব্যি বলে দিয়ে চলে গেলে।

একটু থেমে বললে, যখন বুঝল কিছুতেই ছাড়ব না, হঠাৎ কি মনে হল ওর, গরাদ ছেড়ে দিল। থলেটা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল।

বিষণ্ণ হাসি শুভার মুখে।—আমি তো বুঝতে পারিনি, পা জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদবে ভেবে পা সরিয়ে নিয়েছি। ও এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সারা মুখ তখন ওর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। আমি দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখলাম। গ্যেট পার হয়ে যেতে তবে শান্তি।

বলে হেসে উঠল শুভা। ওটা হাসি না কান্না বোঝা গেল না।

হিরণ্ময় কেমন বিভ্রান্ত ভাবে বলল, চলে গেল !

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ, কারও মুখেই যেন কোনও কথা নেই। কেউ কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কিংবা দুজনেই বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে, একটা বিপর্যয় থেকে। এখন মেয়েটার জন্যে দুঃখ করা যায়।

কিন্তু কেউই যেন অপরাধবোধ সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

শুভা স্বগোতোক্তির মত বললে, আমি ওই ডাক্তারের কাছেই ওকে যেতে বলেছি বার

বার। যবে কিনা কে জানে, ওর কানে তো কোনও কথাই ঢুকছিল না।

একটু থেমে বললে, রুমির যে-সব হাউসকোট ম্যাক্সি শাড়ি দিয়েছিলাম, রেখে যেতে চাইছিল, আমি কিচ্ছু ফিরিয়ে নিইনি।

হিরণ্ময় মনে মনে হাসল। কিছু বলতে পারল না। আমি কিচ্ছু ফিরিয়ে নিইনি! সত্যি কি তাই? আমরা বরং ফিরিয়েই নিয়েছি, হিরণ্ময় মনে মনে বলল। আত্মসম্মান। একটা ভুয়ো কথা, একটা ভুয়ো জিনিস। আমাদের তো ওইটুকুই সম্বল। অহঙ্কার নয়, আগে ভেবেছিল অহঙ্কারেরই আরেক নাম। আসলে শুধু ভয়, পাড়াপড়শিকে, আইনকে, দুর্নামকে।

হিরণ্ময় ভাবল, আসলে আমরা কিছুই ওকে ফিরিয়ে দিইনি। ভারা থেকে পড়ে যাওয়া ওর খোঁড়া বাপকে। 'মেয়ের মতই রাখবেন মা', ওর মা বলেছিল গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে। ওর সেই ঝনঝনে দিদি বলছে, টাকা পাঁচটা নে না, রথের মেলায় কত কি কিনবি। এদের কাউকেই হিরণ্ময় কিছু ফিরিয়ে দিল না।

রিটায়ারমেন্টের কাছে এগিয়ে এসে হিরণ্ময়ের আজকাল প্রায়ই মনে হয় জীবনটা কেমন যেন ফুড়ুত করে ফুরিয়ে গেল। অথচ কত কাজ বাকি। কিছুই করা হল না। এখন আর চাকরিতে অবসর নেয়ার দিনগুলো স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। কতই বা মাইনে পেত, খুব ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে হেঁটে ওকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়েছে। কতটুকুই বা উঠতে পেরেছে। এখন সব আপিসেই লিফ্‌ট। লিফটে চড়ে অনেকেই সোঁ সোঁ করে ওপরে উঠে যায়। সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। ওর চেয়ে কমবয়েসি অনেকে চোখের সামনে ঝটপট ওর চেয়ে ওপরে উঠে গেল। সে জন্যে ওর ক্ষোভও নেই। ওর এখন একটাই চিন্তা, বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটবে তো।

এ ক'দিন ওই সব চিন্তা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। এগুলো যেন কোনও চিন্তাই নয়। রিটায়ারমেন্ট, টাকাপয়সা, একটা নিজস্ব ফ্ল্যাটবাড়ি, বিল্টুর লেখাপড়া, তার একটা চাকরি, রুমির বিয়ে। কত কি দুশ্চিন্তা, কত কি কাজ বাকি।

কিন্তু সব উবে গিয়েছিল মন থেকে। সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

এখন আবার একটু একটু করে ফিরে আসছে। মাঝখানে কয়েকটা দিন যেন একটা

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর যেমন একটা প্রচণ্ড স্বস্তি হয়, তা হ'লে দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, সত্যি নয়। আঃ, কি আনন্দ। ঠিক তেমনিই মনে হচ্ছে হিরণ্ময়ের। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।

শুভার কিন্তু ভয় যায়নি। —দুপুরে ঘুমোতে পারি না।

হিরণ্ময় হাসার চেষ্টা করে। বলে, যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে ছিল ততক্ষণই বিপদ। এখন আর ভয় পাবার কি আছে।

বলে, কিন্তু কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়।

শুভা বলে ওঠে, তুমি তো থাকো না, তাই নিশ্চিন্ত। দরজায় বেল্ বাজলেই আমি শিউরে উঠি। ওই বুঝি ওর খোঁড়া বাপটা মাইনে নিতে এল। কিংবা ওর দিদিটা।

আস্‌লে সে ভয়টা হিরণ্ময়েরও। কি বলবে সবই ঠিক করা আছে। তবু নিজেকেই ভয়, ঠিক ঠিক বলতে পারবে তো। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাবে না তো।

কবে আসবে, কখন আসবে, কিছুই জানা নেই। প্রতি মাসে তো আর আসত না। দু'তিন মাস ওর মাইনের টাকা জমা থাকত।

খোঁড়া বাপটা হেসে বলেছিল, আসা-যাওয়া কত খরচ মা, ট্রেনের ভাড়া তো বাড়তে

বাড়তে লগি তুললেও ছোঁয়া যায় না।

হেসে ফেলেছিল হিরণ্ময়।

আর যমুনার বাবা বলেছিল, ও আপনার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও তাই। যখন আসব নিয়ে যাব। কি আমার গঙ্গা যদি দেশে যায়, নিয়ে যাবে।

গঙ্গা দেশে গেছে, শুনে এসেছিল যমুনা।

কিন্তু ওর পাওনা মাইনেটা নিতে আসেনি।

হিরণ্ময়ের হঠাৎ মনে হ'ল, গঙ্গা তো কই মাইনে নিতে আসেনি।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার ছলে ভাবল, হয়তো দেশ থেকে ফিরেছে, যমুনা তার কাছেই গেছে। বলেছে সব। সেজন্যেই আর আসেনি। কোন্ মুখে আসবে। বোন এমন একটা কাণ্ড করে বসেছে জেনে সে তো নিজেই লজ্জায় মুখ লুকোবে।

তবু, যমুনার কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

হয়তো শুভারও।

ও হঠাৎ একদিন বলে বসল, মেয়েটা শেষ অবধি কি যে করল, কোথায় গেল, ভেবে ভেবে এত মন খারাপ হয়ে যায়।

হিরণ্ময় চুপ করে রইল, কোনও কথা বলল না।

ওর বুকের মধ্যে তো একটা ঝড়।

নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আমরা কত নির্মম হতে পারি।

নিজেকে বাঁচানো, না আত্মসম্মান বাঁচানো। একে আত্মসম্মান বলে না। নিজের কাছেই তো নিজের আর কোনও আত্মসম্মান নেই। এখন হিরণ্ময় অনেক ছোট হয়ে গেছে।

সমাজের কাছে, চারপাশের লোকের কাছে যাতে মাথা নিচু করতে না হয়, সেজন্যে নিজের কাছেই নিজেকে চিরদিনের জন্যে মাথা নিচু করে থাকতে হবে।

আত্মধিক্কারে শুভা একদিন হঠাৎ বলে উঠেছিল, কি করে যে পারলাম, ওকে ওভাবে তাড়িয়ে দিতে। ওর কান্নাটা আমি এখনও দেখতে পাই।

ব'লে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

হিরণ্ময় বলতে পারেনি। একটা ঘটনা।

—রোখকে, রোখকে। উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠেছিল ও। একটা চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ার জন্যে ও হুড়মুড় করে ভিড় ঠেলে চলে এসেছিল।

আশপাশের লোক গালাগালি দিচ্ছিল। ওর কানেও যায়নি।

অনেকখানি দূরে এসে বাসটা থামল।

দ্রুত নেমে পড়েছিল হিরণ্ময়।

তারপর দৌড়তে দৌড়তে আগের স্টপে ফিরে এসেছিল।

পাগলের মত ও ভিড়ের মধ্যে খুঁজছিল, খুঁজছিল। একটা মুখ। বাসের জানলা থেকে দেখে মনে হল সেই মুখ। গ্রাম্য আর সরল, বড় বড় চোখ, অবাক দৃষ্টি তার চোখে। পলিমাটির মত গায়ের রং, পলিমাটি দিয়ে গড়া একটা নিষ্পাপ মূর্তি।

হ্যাঁ, নিষ্পাপ। হিরণ্ময় জানে শরীর বড় অবিশ্বাসী।

সেই ছবিটা মনে পড়ে গিয়েছিল। এই রকম বয়েসেরই একটা মেয়ে। ভাই মারা গেছে আগের রাত্রে, তখনও হাসপাতাল থেকে ডেডবডি এসে পৌঁছয়নি।

শোকগ্রস্ত বিহ্বল, তার সামনেও এক এক কাপ চা রেখে গেল। আর শূন্যবক্ষ সেই মা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। শরীর বোধহয় শোকের চেয়েও বড়।

তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল হিরণ্ময় মেয়েটিকে দেখে।

সারা বাড়ি নিশ্চুপ, শোকসন্তপ্ত আত্মীয়পরিজন। আর মেয়েটির চোখে রঙিন প্রেম, ছেলেটির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। চোখে মুগ্ধতা। কে বিশ্বাস করবে হাসপাতাল থেকে এখনও ভাইয়ের ডেডবডি এসে পৌঁছয়নি।

যমুনা, তুই কোনও দোষ করিসনি, কোনও দোষ করিসনি। শরীর বড় অবিশ্বাসী রে!

হিরণ্ময় তন্ন তন্ন করে খুঁজল ভিড়ের মধ্যে, সেই মুখ, যমুনার মুখ।

আহা, যদি পাওয়া যায়।

নিজের কাছে চিরকালের জন্যে ছোট হয়ে থাকতে পারবে না হিরণ্ময়।

মিথ্যে দুর্নাম, মিথ্যে অপবাদের ভয়টাও মিথ্যে। আত্মসম্মান? একটা ভুয়ো শব্দ, অর্থহীন। আরেকজনের জীবনের চেয়ে বড় নয়।

আত্মগ্লানিতে চোখে জল এসে গেল হিরণ্ময়ের। তুচ্ছ একটা আত্মসম্মান বাঁচাতে গিয়ে একটা সুন্দর জীবনকে ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

—দুই মেয়ে আমার। ওর বাবা বলছে, একটা ডান হাত, একটা বাঁ হাত।

ভিড়ের মধ্যে যমুনাকে ছোটাছুটি করে খুঁজে বেড়াল হিরণ্ময়। বাসের জানালা থেকে দেখে মনে হয়েছিল যেন যমুনাই।

পেল না। না, কোথাও নেই। হয়তো ভুল দেখেছে। অন্য কেউ।

হিরণ্ময়ের মনে হল একবার যদি দেখতে পাই, সব বিপদ তুচ্ছ করে, সব দুর্নামের ভয় তুচ্ছ করে বলবে, চল যমুনা, আমি সই করে দেব। তোকে বাঁচাব।

আমরা তো দায়ী, আমারই দায়ী।

পায়নি। যেখানেই চোখ যায়, ও ভিড়ের মধ্যে, রাস্তার ধারে, সর্বত্র একটা মুখই খোঁজে। যমুনার মুখ।

শুভাকে সে কথাটা ও বলতে পারল না। ব্যথা পাবে, দুঃখ পাবে। হিরণ্ময় জানে শুভার নিজের দুঃখ আরও বেশি। শুভাও নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছে। নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেছে।

বেল্ বেজে উঠল। দরজার বেল্।

শুভা বলে উঠল, দেখো তো কে। বোধহয় কাগজওয়ালা।

হিরণ্ময় উঠে গেল, গিয়ে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত আতঙ্কে শিউরে উঠল হিরণ্ময়। সেই ঝনঝনে চালাকচতুর কালো মেয়েটা। কি তীব্র চোখ। যমুনার দিদি। গঙ্গা।

সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে হিরণ্ময়ের। কি বলবে?

মেয়েটা হেসে উঠে বলল, যমুনাকে একটু ডেকে দিন।

বাঃ, হিরণ্ময় তো খুব ভাল অভিনয় জানে।

—যমুনা? সে তো চলে গেছে।

—চলে গেছে? ভুরু কুঁচকে উঠল মেয়েটার। —কোথায়?

—তা তো জানি না। হিরণ্ময় বলল।

শুভা হয়তো শুনতে পেয়েছে। ও এগিয়ে এল।

বলল, যমুনা তো কবেই চলে গেছে, মাইনেপত্তর মিটিয়ে নিয়ে।

মেয়েটা অবাক চোখে তাকাচ্ছে।

শুভা বললে, সে তো কিছুতেই থাকতে চাইল না, আমরা কি বেঁধে রাখব। কোথাও আরও ভাল কাজ পেয়েছে হয়তো, আমরা কি করে জানব।

হিরণ্ময় বললে, তাকে তো আমরা পাঠিয়েছিলাম তোমাকে ডেকে আনতে। তুমি তো ছিলে না, দেশে গিয়েছিলে।

মেয়েটা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

তারপর নিজের মনেই বললে, কোথায় যে গেল!

শুভা বললে, আমরা তো ভেবেছিলাম তোমার কাছেই গেছে।

মেয়েটা আবার বললে, কোথায় যে গেল!

শুকনো মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল সে। তুখোড় মেয়েটাকে এতখানি অসহায় কখনও দেখেনি ওরা।

হিরণ্ময় দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিঃশব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে শুভাও বলে উঠল, কোথায় যে গেল!

যেন হিরণ্ময়েরও মনের কথা। এখন আর কোনও ভয় নেই, আশঙ্কা নেই। এখন শুধু অনুশোচনা। এখন তীব্র অপরাধবোধ যেন হিরণ্ময়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। শুভাকেও।

একজনের আত্মসম্মান বড়, না আরেকজনের জীবন। হিরণ্ময় মনে মনে বললে, ওকে আত্মসম্মান বলে না, ওটা একটা নিছক অহঙ্কার। কোনও মিথ্যে দুর্নাম, মিথ্যে অপবাদ যেন আমাকে স্পর্শও না করে। এখন মনে হচ্ছে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

মাঝে মাঝেই ওই অপরাধবোধটা ওদের কুরে কুরে খায়। যখনই মনে পড়ে।

বেঁচে আছে তো? কোনও হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পৌঁছয়নি তো? এক এক সময় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, চোখ ঠেলে জল আসতে চায়।

হিরণ্ময় জানে সারা জীবন একটা প্রশ্ন ওদের তাড়া করে বেড়াবে, তাড়া করে বেড়াবে। কোথায় যে গেল!

চোখের সামনে যেন দেখতে পায় হিরণ্ময়, জামাকাপড়ের পুঁটলিটা নিতান্ত অবহেলায় বগলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যমুনা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে।

কে নেমে গেল? হিরণ্ময়ের ভেতরটা বলে উঠল, আমরাই।

বনপলাশির পদাবলী

প্রথম প্রকাশ : দেশ সাপ্তাহিকে ৭ অক্টোবর ১৯৬১ থেকে ৩০ জুন ১৯৬২ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৬২, প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত। উৎসর্গ : 'বনপলাশির মানুষদের উদ্দেশে।'

আমি গ্রাম দেখিনি। আমার জন্ম বেশ বড়সড় একটি রেলশহরে। শৈশব থেকে যৌবনসন্ধির কাল অবধি কেটেছে সেই শহরেই। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি সেখানকার রেলওয়ে ইংলিশ হাই স্কুল থেকে। এখনও স্মৃতি হাতড়ালে চারপাশ ফুলবাগানে ঘেরা ছিমছাম সুন্দর একটা দোতলা বাংলো মায়াজড়ানো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কোনও ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রাম নয়। গ্রাম দেখিনি, জীবনের কোনও অংশই আমার গ্রামে কাটেনি। সেকালে বেসরকারি এই রেলের মালিক ছিল খোদ ইংরেজ কোম্পানি, কোম্পানি চালাত লন্ডনের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স, এবং ভারতীয় মানেই অযোগ্য এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে উচ্চপদগুলির জন্যে আই এস আই ছাপ মারা খাঁটি ইংরেজ পাঠিয়ে দিতেন তাঁরা। বাবা ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, ১৯১১ সালের এম এস সি, এবং সেই সুবাদেই হয়তো উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর কথা অবশ্যই এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু একটি কারণে প্রাসঙ্গিকও। চাকরিটা তাঁর রেলের বলেই সারা ভারত ভ্রমণের অশেষ সুযোগ ছিল সেকালে, অন্যদিকে দেশভ্রমণে তাঁর নেশা এবং অত্যুৎসাহ কখনও কখনও আমাদের ক্লান্ত করে দিত। ফলে সারা ভারত আমি দেখে ফেলেছিলাম যৌবনে পা দেওয়ার আগেই। অথচ গ্রাম দেখিনি। ভারতবর্ষকে অবশ্য দেখতে পেতাম ওই শহরেই, এমন কি বিশ্বদর্শনও ঘটত। গুজরাতি, মরাঠি, পঞ্জাবি, তেলেগু, তামিল মালয়ালি···প্রায় প্রতিটি ভাষার কর্মচারীদের এক একটি পাড়া ছিল। ইহুদি এবং পার্সি পরিবারও। বিহার এবং ছত্রিশগড়ের মানুষ মানুষীরাও। আর ছিল অগণিত ইংরেজ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং দিশি খ্রিস্টানও, যাদের কেন জানি না তিনপটিয়া বলা হত।

এই বিচিত্র জগতেই কিন্তু আমি প্রথম গ্রাম দেখি।

লাখ দুয়েক অধিবাসীর এই রেলশহরে একটা বড় বাজার ছিল—গোলবাজার। আর, তার সংলগ্ন একটা বিরাট মাঠে প্রায় প্রতিদিনই হাট বসত, রবিবারে জমজমাট। চারপাশের গ্রাম থেকে দরিদ্র চাষি মেয়েপুরুষ শাকসব্জি থেকে গুগখাদ্য অশথ পাতা অবধি নানাবিধ পসরা নিয়ে এসে বসত। ওরা তো গ্রামেরই মানুষ। কিন্তু গ্রাম দেখার আগেই ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ওখানেই। নিজেকেও গ্রামের মানুষদেরই একজন মনে হয়েছিল, যেন গ্রামের মর্যাদা আমারও মর্যাদা, গ্রামের অপমান আমারও অপমান।

সজনে ডাঁটা অথবা রাঙা আলু, কি খুঁজছিলাম আজ আর মনে নেই, একজন বললে, হাটে চলে যাও, জংলিদের কাছে পাবে। 'জংলিলোগ'! বুকের মধ্যে ধক করে লাগল, কারণ হাটে যারা সজি নিয়ে আসত তারা সকলেই ছিল চারপাশের গ্রামের বাঙালি চাষি। হয়তো কেউ কেউ তুলনায় সম্পন্ন। কারণ, যে বলল, যারা বলত, তারা ছিল রেলের আঠারো বিশ টাকা মাইনের কুলিখালাসি, অবশ্যই অবাঙালি; এবং শিক্ষাদীক্ষা বা রুচির সঙ্গে যাদের কোনও দিন কোনও সম্পর্ক ঘটেছে বলে সন্দেহ করাও সম্ভব ছিল না। রেগে গিয়েছিলাম।

ওদের 'জংলি' বললে তখন রেগে যেতাম, একালের কলকাতায় বাঙালিরাই তো বলে, শুধু 'জংলি' শব্দটা উচ্চারণ করে না।

কিন্তু, আমি গ্রাম সত্যি আজও দেখিনি। পিকনিক করার মতো মন নিয়ে নানা জেলার নানা গ্রামে গিয়েছি পরবর্তী জীবনে। আমাদের নিজেদেরও একটি গ্রাম ছিল,

থাকারই কথা, কারণ কলকাতা শহরটাই তো এই সেদিনের। গ্রাম থেকে আসা মানুষগুলোই এ শহরে এসে শহুরে হয়েছে। তফাত এই, সে-কথাটাই তারা ভুলে গেছে।

"কয়দিন আগে পর্যন্তও শহুরে বাঙালি পরিবার এমন খুব কমই ছিলেন ; যাঁদের অন্তত দু'এক একর, নিদেনপক্ষে কয়েক শতাংশ চাষজমিও আদি বসত গ্রামে ভাগে বিলি করা ছিল না। এবং যার থেকে বৎসরান্তে অন্তত দুটি টাকা বা দু' পালি ফসল অথবা ফলমূলটা না আসত।"

আমাদের অবশ্য ফলমূলটাও আসত না, কিন্তু গ্রামটা তো ছিল।

আমাদের সেই বিস্মৃত গ্রামে জীবনে আমি মাত্র তিনবার গিয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি গ্রামে বেকারজীবনে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল। অন্তত পাঁচটি জেলার ডজন পাঁচেক গ্রামে। সেই সব অভিজ্ঞতা মিলেমিশে আমার মনে একটাই গ্রাম গড়ে উঠেছে। সেই গ্রামটির নাম বনপলাশি।

কিন্তু গ্রাম নিয়ে উপন্যাস লিখব এমন কোনও পরিকল্পনা আমার কোনও দিনই ছিল না।

পাকেচক্রে লিখতে বাধ্য হলাম। উনচল্লিশ বছর বয়েসে। তার আগে কোনও পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে কোনও উপন্যাস লিখিনি। ('লালবাঈ' বই আকারে ছাপা হয়ে যাওয়ার পর মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল।) তাই প্রতি সপ্তাহে এক এক কিস্তি লিখে যাওয়া সম্পর্কে আতঙ্ক ছিল। উপরন্তু প্রস্তুতির জন্যে একটা সপ্তাহ সময়ও পাইনি।

সে যুগে আনন্দবাজারের পূজা-সংখ্যা সম্পাদনা মনে হত এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। সবে শেষ ফর্মা প্রেসে পাঠিয়ে ক্লান্ত মুহ্যমান, সঙ্গে সঙ্গে দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের টেলিফোন : একবার আসবেন।

বিশ্বজয়ের আনন্দ মুখে আনার চেষ্টা করে পাশের ঘরটিতে যেতেই গম্ভীর মুখ বলে উঠল : উপন্যাসের নাম একটা লিখে দিন। এই সংখ্যাতেই অ্যানাউন্সমেন্ট যাবে, এখনই চাই।

বিয়ের ইচ্ছা আছে কিনা, মেয়ে পছন্দ কিনা, সে-সব যেন ধর্তব্যই নয়। হুকুম এল পিঁড়িতে বসে পড়ো।

তারপর কাচুমাচু মুখে সাগরবাবু যা জানালেন, তা কানেও গেল না। আমি তখন একেবারেই বিভ্রান্ত। ভীত বললেও কম বলা হয়।

উনি জানালেন, যাঁর উপন্যাস আরও কিছুদিন চলার কথা ছিল, তিনি বিনা নোটিসে হঠাৎ শেষ করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাকেই পরের সপ্তাহ থেকে লিখতে হবে।

সে-বয়েসে তাও হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু কি নিয়ে লিখব সেটাই যখন ভাবিনি, সেই মুহূর্তে উপন্যাসের নাম দেওয়া কি সম্ভব ? উপরন্তু তিনি জানিয়ে দিলেন, অন্তত বছরখানেক চালাতে হবে।

উপায়ান্তর না দেখে নামকরণ নিয়ে চিন্তা করছি, হঠাৎ মনে হল গ্রাম নিয়ে লিখলে তো বেশ শাখাপ্রশাখা ছড়ানো যায়, একটা বছর দিব্যি টেনে নিয়ে যেতে পারব। সুতরাং গ্রাম ; যা কখনও দেখিনি।

নাম দিলাম 'পলাশবনির পদাবলী', কিন্তু বাড়ি ফিরে অনুপ্রাসটা ভাল লাগল না, পরের দিন সকালে গিয়েই তৎকালিক লাইনোর মেক-আপ পেজেই বদলে দিলাম নামটা : এবার 'বনপলাশির পদাবলী'।

একটি বিষয়ে লিখতে শুরু করার আগেই স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলাম, সংলাপের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করব না। আমাদের বড় বড় ঔপন্যাসিকরাও দেখেছি, গ্রামের সম্পন্ন মানুষদের মুখে শহরচলতি মার্জিত ভাষার সংলাপ বসিয়ে দেন, এবং নিম্নশ্রেণীর মুখে দেন জেলা ভিত্তিক উপ- ভাষা। আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। গ্রামের মানুষ, উচ্চবিত্তই হোক বা উচ্চবর্ণই হোক, গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে। আমি সেই ভাষাই

দিয়েছি তাদের মুখে। লক্ষ করেছি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের বড় বড় ঔপন্যাসিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসেও এক ধরনের বর্ণাশ্রম প্রয়োগ করে এসেছেন। যেটুকু অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাতে দেখেছি, গ্রামের ভদ্রশ্রেণীর লোক, এমনকি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং যজমানি যাদের পেশা তেমন গ্রাম্য গুরু-পুরোহিতরাও আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন, এমনকি স্বয়ং তারাশঙ্করের মুখের ভাষাতেও যে রাঢ়ীয় শব্দ ব্যবহৃত হত এবং তা 'রেঢ়ো' টানে উচ্চারিত হত সে-কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ঔপন্যাসিকরা ভদ্রশ্রেণীর মুখে যে-সব সংলাপ বসিয়ে এসেছেন তা অনেকটা ধোপদুরস্ত চলিত বাংলা। আমি উপন্যাসের সংলাপে সে-ধরনের মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে চাইনি। 'বনপলাশি' লেখার অনেক পরে অশোক মিত্র (প্রাক্তন আই সি এস) একটি রচনায় পূর্বতন লেখকদের এক বৈশিষ্ট্যের কথা লিখেছিলেন। "তারাশঙ্করের লেখার সঙ্গে যিনি মোটামুটি পরিচিত, এবং তাঁর যদি বীরভূম মোটামুটি ঘোরা এবং জানা থাকে, তিনি বিনা দ্বিধায় বলবেন তারাশঙ্করের উপন্যাসে গল্পে যে উপভাষা আমরা পাই···তা মূলত বীরভূমের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মনগড়া কল্পিত ভাষা।"

গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন মানুষদের মুখের ভাষা কিন্তু গত পঁচিশ বছরে সাহিত্য-সংবাদপত্রের প্রভাব, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ও সিনেমা টি ভি-র কল্যাণে অনেক বদলে গেছে এবং শহুরচলতি ভাষার অনুরূপ হয়ে আসছে।

যাই হোক, দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে লিখতে শুরু করে দিলাম পরের সপ্তাহ থেকেই। আমার তো ধারণা ছিল আমি গ্রাম দেখিনি, গ্রামের মানুষদের চিনি না, কোনও গ্রামেই কখনও তেরাত্রি কাটাইনি, কিন্তু চেনা মানুষগুলোই কেমন করে যেন একে একে উঠে এল, সমগ্র বনপলাশি গ্রামটাই। অটামা, মোহনপুরের বউ, গিরীন, উদাস, পদ্ম— কে অচেনা? এদের সকলকেই তো আমি সত্যি দেখেছি, হয়তো টুকরো টুকরো করে। আমি অক্লেশে বনপলাশির দিঘিতে ডুব দিলাম।

একটি কি দুটি কিস্তি বেরিয়েছে, এ সময়েই ঘটল একটা বিপর্যয়: একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। চার বছর বয়েসের প্রথমা কন্যাকে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন নিয়ে যেতে হল পি জি হাসপাতালে, একটি মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত দিনগুলিতে এই উপন্যাসটি আমাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক করে দিত। গর্ব এই, এই দুর্যোগের মধ্যেও লেখায় ছেদ পড়েনি একটি বারও। লিখতে লিখতে কল্পনায় গড়া গ্রামটির মানুষগুলোর মধ্যে কি ভাবে যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন মনে হয় আমি বনপলাশি গ্রামটিকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নিইনি, বনপলাশি গ্রামই যেন আমাকে তার লেখক হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

মজার কথা হল, এই উপন্যাসটির পাশাপাশি যে অতীব জনপ্রিয় উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় বের হচ্ছিল, তার প্রভূত প্রশংসা কানে আসত, কিন্তু 'বনপলাশি'র কোনও পাঠক আছে কিনা তাও জানতে পারিনি। যদিও সম্পাদকের উৎসাহে কমতি ছিল না। বারবার বলে গেছেন, যতদিন খুশি চালিয়ে যান, কারও মতামতে কান দেবেন না। বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, উনি আমার কাছে জনপ্রিয়তা আশা করেননি। 'বনপলাশির পদাবলী' যতদিন ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, একজন পাঠকের প্রশংসাও পাইনি, শেষ হওয়ার পর পেয়েছি একটি মাত্র চিঠি। একজন সপ্তদশী অত্যাধুনিকা পাঠিকার।

বই হয়ে বের হওয়ার পর, বলতে গেলে একরকম হতাশায় ভুগছি, হঠাৎ একদিন কবিশেখর কালিদাস রায় আমাদের অমৃত ব্যানার্জি রোডের বাড়িতে সশরীরে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন এবং জানিয়ে গেলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বইটির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও অবাক হবার মত একটি ঘটনা ঘটল।

এ উপন্যাসে আমি শুধু গ্রামজীবনকে উপস্থিত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের গ্রামজীবনের পরিবর্তিত ছবিকে পুরনো দিনের পটভূমির

ওপর গড়ে তুলতে। অট্টামা সেই প্রাচীনতার, পরাধীনতার, কুসংস্কারের প্রতীক ; গিরিজাপ্রসাদ তথাকথিত সাফল্যের ও স্বাধীনতার ব্যর্থতায় মোড়া একটি জীবন, স্বার্থ ক্ষুদ্রতা ও অকৃতজ্ঞতার ভিতর থেকে উঠে আসা গ্রামের প্রাণস্পন্দন মোহনপুরের বউ, বহির্বিশ্বের হাতছানি উদাসের মধ্যে। উপন্যাসের চিত্রকাল প্রায় ষাট-সত্তর বছর, যদিও ঘটনাকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

অবাক করা ঘটনাটি এবার বলি। বই হয়ে বের হওয়ার পর দু'একটি সপ্রশংস উক্তি শুনতে শুরু করেছিলাম সাধারণ পাঠকদের কাছেও। এমন সময়ে বীরভূমের কুড়ামিঠা গ্রামের এক অধিবাসীর কাছ থেকে একখানি দীর্ঘ চিঠি এল। তিনি চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন অবশ্য নবদ্বীপের রাজপুরোহিতের বাড়ি থেকে। ৮ই ভাদ্র ১৩৬৯। সেই পত্রলেখক ছিলেন পদাবলী সাহিত্যে অবিসংবাদিত পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন। চিঠিটি পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম, বিশেষ করে প্রথম ছত্রটি পড়েই। তিনি আজীবন গ্রামবাসী, তাই ভয় ছিল না-জানি কি ভুলত্রুটি করে বসে আছি।

পুরো চিঠিটাই উদ্ধৃত করছি :

স্নেহভাজনেষু

তোমার "বনপলাশির পদাবলী" পড়িলাম। ভাবিও না যে পদাবলী ভালবাসি বলিয়াই মোহে পড়িয়া বইখানি হাতে করিয়াছিলাম। বিশ্বাস কর, সজ্ঞানে উপন্যাস বলিয়াই বইখানি পড়িয়াছি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বইখানির প্রধান গুণ থামিতে দেয় না, একটানা পড়িয়া যাইতে হয়। প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসেই পড়িতে হয়, একেবারে শেষে গিয়া ছেদ টানিতে হয়।

গ্রামগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যে কারণেই হৌক পল্লীর সেই শান্ত রসাস্পদ জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, জীবন অশান্ত, তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা কারণ,—বোধহয় সহরের হাতছানি তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। পল্লী রাখাল আর বাঁশের বাঁশিতে ফুঁক দিয়া তৃপ্তি পায় না। মোটর-বাস-এর হর্ণ তাহাকে ডাক দিয়াছে। পাঁচন বাড়িতে তাহার হাত উঠে না, স্টিয়ারীং ধরিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে। ধানের জমিতে গৃহস্থের দিন চলে না, তাহাকে হাস্‌কিন্ মেসিনের জন্য টাকা জোগাড় করিতে হয়। এমনি দিনে পশ্চিমের কেনা চশ্‌মা চোখে দিয়া ব্লক অফিসার তাহার জীপ লইয়া উপস্থিত হন। গ্রামের উন্নতির নূতন পরিকল্পনা শোনান। গ্রামকে নূতন আসরে কথা শুনাইয়া প্রায় ঢালিয়া সাজিতে চান। এই যুগসন্ধিক্ষণের একটা জীবন্ত ছবি তোমার বনপলাশির পদাবলী। সারা বাঙ্গালার একটা পটপরিবর্তনের প্রতীক। ছবিটা আঁকিয়াছ ভারি সুন্দর, চমৎকৃত হইয়াছি।

বনপলাশির অট্টামাকে আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি। সাহিত্যে এই নূতন দেখিলাম। নিজের ব্যর্থ জীবনের স্মৃতির রোমন্থন করে, অনুশোচনা আছে, কিন্তু গ্লানি নাই। স্বেচ্ছাবৃত ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মহিমায় সমুজ্জ্বল। কথায় কথায় ছড়া কাটে, পরকে লইয়া ভুলিয়া থাকিতে চায়, পরের সুখ দুঃখের ভাগ বহিয়া বেড়ায়, সমগ্র-পুস্তকখানির পশ্চাৎপট। মোহনপুরের বৌকেও দেখিয়াছি। এই বৌটীও তোমার নূতন সৃষ্টি, কিন্তু কাল্পনিক নয়। ঈর্ষা আছে, হিংসা আছে, স্বার্থপরতাও আছে সাময়িক। কিন্তু মহানুভবতা আছে সকলকে ছাপাইয়া। অনেক দিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর বৌকে পল্লীতে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পল্লীর প্রাণময়ী প্রতিমা তোমার মোহনপুরের বৌ। দরদে ভরা অন্তর, ভালবাসিবার জন্য আকুল। কর্তব্যে স্থিরনিশ্চয় হইলেই আপন অধিষ্ঠানভূমিতে অটলা, সংকল্পে অবিচলা। ঘোমটার ভিতর হইতেও এই শান্তশিষ্ট মেয়েটীর মুখের ঔজ্জ্বল্য বনপলাশির পদাবলীকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

তোমার বিমলা ও প্রভাকর, উদাস ও পদ্ম, তোমর টিয়া, রাঙা বৌ, রেণু, দামু পাল কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব ? ইহাদের চলা ফেরায়, কথা বার্তায়, ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্তে অমোঘ নিয়তি নিয়মে পরিচালিত সুনির্দিষ্ট পরিণামে, কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখিলাম না। ক্যানভাসার দামুকেও যেমন ভুলিব না, তেমনই রাঙা বৌকেও ভুলিতে পারিব না। লক্ষ্মীমণি তোমার আর একটী সৃষ্টি। দুঃখ হয় অবিনাশ ডাক্তারের জন্য। বেচারী নিজের পা হারাইয়া নির্জন পরিবেশে হয়ত অবাধ চলাফেরার সুযোগের আশায়,—নিজের বুকের অনির্বাণ আগুন নিভানোর জন্য না হউক, অন্ততঃ লুকাইবার প্রত্যাশাতেই বনপলাশিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। মনে বোধ হয় তাহার এ ভরসাও ছিল যে নিজের পা না থাকিলেও প্রাণের প্রেরণায় প্রায় থামিয়া যাওয়া পল্লীজীবনের অপর একটা দিককে সে চলমান করিয়া তুলিবে। চেষ্টার তো তাহার ত্রুটি দেখিলাম না। কিন্তু মনে হইল এই স্পষ্টভাষী মানুষটি বনপলাশির সঙ্গে নিজেকে খাপ্ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে না। পদ্ম উদাসকে লইয়া বেশ কিছুদিন কাটাইয়া হঠাৎ গ্রাম ছাড়িয়াছিল। কিন্তু উদাসের উপর তাহার রক্তমাংসের টানের কিছুমাত্র ঘাট্‌তি ঘটে নাই। এদিকে উদাসও তাহার জন্য পাগল। আবার অবিনাশ ডাক্তারের উপর পদ্ম যেটুকু সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, তাহারও দাম বড় কম নয়। তাই পদ্ম যখন পুনরায় উদাসের সঙ্গে পলাইয়া গেল, তখন সেই সঙ্গে সে যে ডাক্তারকে উদাসের ছুরিকাঘাতের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিয়া গেল, ইহাতেই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। যাক, মানুষটা তো আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

কীর্তনীয়া বংশীধর অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াই সমস্ত বিষয়েরই একটা উল্টা দিক, একটা কু দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহাকে আমি দোষ দিতে পারি না।

অতি সামান্য একটা তুলির আঁচড়ে তুমি নলে বাউরীর বৌ-এর যে ছবিটা আঁকিয়াছ ভীড়ের ভিতর সেটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কিনা জানি না। আমি পল্লীগ্রামের মানুষ, আমি হামেশাই নলেকে এবং তার বৌ ও পরাণকে দেখিতে পাই। পল্লীগ্রামে শুধু এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ইতরদের মধ্যেই নয়, মধ্যবিত্তদের ঘরেও এই এক মুঠো ভাত যে অঘটন ঘটায় আমি তাহার একজন নিরুপায় দর্শক।

বহু আশা লইয়া গিরিজাপ্রসাদ গ্রামে আসিয়াছিল। গ্রামে সে থাকিতে পারিল না। গোপেন মড়লদের সঙ্গে তাহার বনিল না। গোরুর রাখালীতে যাহার মন বসে নাই, লক্ষ্মীমণির দৌলতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে, আবার সেই লক্ষ্মীমণি যাহার জন্য বিষ খাইয়াছে, যে উদাস নিজে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, সেই উদাসই তাহাকে গ্রাম হইতে পলাইবার সাহায্য করিল। বনপলাশির ভবিষ্যৎ কি বলিতে পার ?

কিছু মনে করিও না। আমি সমালোচক নই, একজন সাধারণ পাঠক হিসাবেই তোমাকে আমার অভিমত জানাইলাম। সেই সঙ্গে জানাইলাম—অন্তরের অভিনন্দন। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার এমনই সার্থক রচনার আরো সংখ্যা বাড়ুক। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

হতাশা কেটে গিয়েছিল। ধারাবাহিক প্রকাশের সময় কোনও পাঠকেরই প্রশংসা পাইনি, ব্যতিক্রম একটিই। কিন্তু এও এক বিস্ময়কর ঘটনা, যা আমাদের সাহিত্যপাঠকদের সম্পর্কে আস্থা ফিরিয়ে আনে। প্রথম প্রকাশে অনাদৃত এই

উপন্যাসের ধীরে ধীরে পনেরোটি সংস্করণও হয়েছিল। সমাদরও জুটেছিল। পরবর্তী কালে শহুরে অতি-আধুনিক তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকেও পেয়েছি অগণিত চিঠি। অবাক হইনি, কারণ শহুরে মানুষদের মধ্যেও একটা চিরন্তন গ্রাম সুপ্ত হয়ে আছে। সাজে পোশাকে, মুখের ভাষায় আচরণে ব্যবহারবিধিতে যে যতই শিকড়হীন হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক বঙ্গভাষী অকৃত্রিম গ্রামবাসী। শহরের অলিগলি ঘুরে সে শুধু সেই গ্রামকেই খুঁজে বেড়ায়, গ্রামকেই খুঁজে পেতে চায়। যেমনটা চেয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

অধ্যাপক ও খ্যাতিমান সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিপুলায়তন 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে এ উপন্যাস সম্পর্কে যে সপ্রশংস উক্তি করেছেন তার উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন :

> রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী'তে (জুন, ১৯৬২)—সাম্প্রতিক পল্লীজীবনের একটি নূতন রূপরেখা ও অন্তরস্পন্দন মনকে দোলা দেয়। ইহা নিছক বস্তুবর্ণনা বা ঘটনাবিবৃতি নয়, বা আদর্শায়িত ভাবচিত্রও নয়, অথচ উভয় উপাদানেরই সংমিশ্রণে গঠিত। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এ পল্লীর যে হীন কৃতঘ্নতা, স্বার্থপরতা, দলাদলির প্রাদুর্ভাব ও সামাজিক উৎপীড়নের মসীময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সাম্প্রতিক কালে তাহার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। এখন গ্রামাঞ্চলের প্রধান প্রবণতা হইল নিরুৎসাহ, ঔদাসীন্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করার ঝোঁক। সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা হয়ত নূতন নূতন জনকল্যাণপ্রতিষ্ঠানের প্রেরণা যোগাইতেছে, কিন্তু গ্রামবাসীর নিষ্প্রাণ রিক্ততার মধ্যে কোন নূতন শুভ সংকল্পের বীজ বপন করে নাই। দীর্ঘকাল প্রবাসযাপনের পর কোন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়া গ্রামে ফিরিলে সে গ্রামের সহিত কোন আত্মীয়তাবোধ অনুভব করে না, গ্রামের জীবনপ্রবাহের সহিত সে মিশিয়া যাইতে পারে না। ইহারই মধ্যে গ্রাম নিজ ক্ষুদ্র কাজ, নিজ তুচ্ছ কলহ-বিবাদ, নিজ স্বল্পধূমায়িত ক্ষোভ-অসন্তোষ লইয়া নিরানন্দভাবে আপন অভ্যস্ত গতিপথে চলিতে থাকে। গ্রাম-সমাজের অন্তরের আগুন নিবিয়া গিয়া অঙ্গাররাশি যেন স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে।
>
> এই বৈচিত্র্যহীন জীবনাবর্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু স্ফুলিঙ্গ দীপ্ত হয়, একটু বিরলবর্ণ রোমান্সের লীলা অভিনীত হয়, কোথাও বা একটু অখ্যাত, অ-নাটকীয় ত্যাগমহিমা নীরবে এই ধূসর পরিবেশকে কল্পলোকের বর্ণবৈভবে রঙীন করিয়া তোলে। এই ক্ষণিক আলোকরেখা ইতিহাসের পাতায় বা গ্রামবাসীর মূঢ় চেতনায় কোন চিহ্ন না রাখিয়াই অন্ধকারের বুকে মুখ লুকায়। কিন্তু এই ক্ষণদীপ্তির মধ্যেই অতীত গৌরবের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা পুনর্বার ঝলকিত হইয়া উঠে ও গ্রাম্য জীবনের রূঢ় প্রয়াসের কর্কশ কোলাহল অকস্মাৎ পদাবলীসঙ্গীতের মাধুর্যে ও সুরময়তায় আবেগের উর্ধ্বসীমা স্পর্শ করে। তাই বনপলাশির অন্তর হইতে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গীতমূর্ছনা পদাবলী-সাহিত্যের দিব্য সঙ্গীতের ঐকতানে সুর মিলাইয়াছে।
>
> বনপলাশির সবই রুক্ষ, শ্রীহীন, গদ্যময়, প্রাত্যহিকতার কাঁটাঝোপকণ্টকিত। গ্রামের লোকগুলির মধ্যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত বা স্বভাব-মহান কোন পর্যায়ের মানুষই নাই। সবাই অর্থকৌলীন্যের নিকট বদ্ধাঞ্জলি ও দরিদ্রের প্রতি উদাসীন। গ্রামে সৎ প্রতিষ্ঠান সকলেই চাহে, তবে তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে কেহই প্রস্তুত নয়। এই ধূসর মধ্যবিত্ততার মধ্যে যে কয়েকটি ব্যতিক্রমস্থানীয় চরিত্র আছে, তাহারাই বনপলাশির জীবনে স্বাতন্ত্র্য আনিয়াছে ও উহার ইতিহাস-রচনার প্রেরণা দিয়াছে! ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধা অট্টামা। সে গ্রামের পূর্ব গৌরবের স্মৃতিবাহিনী ও নিজেও অতীতের

শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তাহার অনুভূতিতে বনপলাশির প্রাচীন গৌরব-গাথার অস্তমিত মহিমার অন্তিম কনককিরণ চিরসঞ্চিত আছে। সে প্রথম যৌবনে ধর্মের জন্য, কুলমর্যাদার জন্য তাহার দাম্পত্য জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়াছে। সময় সময় তাহার মনে হয় যে, একটা মিথ্যা সম্ভ্রমেয় সে অত্যধিক মূল্য দিয়াছে ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী স্বামীর জন্য তাহার চিত্ত মাঝে মধ্যে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু আদর্শকে আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিলে তাহার ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী সান্ত্বনা ও চিত্তপ্রসন্নতা জীবনকে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি, অভাব-অপচয় বোধের উর্ধ্বে একটি অক্ষয় আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই আনন্দবিন্দু অট্টামার প্রতিটি দন্তহীন হাসি, শতজীর্ণ কন্থা ও দারিদ্র্যের সর্বাঙ্গব্যাপী আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া অবিরল ধারায় ক্ষরিত হইয়াছে। সে অপরের আনন্দে নিজে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, জীবন-বঞ্চনা তাহার মনে কোন তিক্ততার স্বাদ রাখিয়া যায় নাই ও সে গ্রামজীবনের সমস্ত হাসি-কান্না, সমস্ত বৈষম্য-অসঙ্গতির সহিত এক আশ্চর্য একাত্মতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার সমস্ত সংলাপের মধ্যে যে প্রবাদ-বাক্যের অবিরল ও সুসঙ্গত প্রাচুর্য স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় বহিয়া গিয়াছে তাহাই তাহার অতীত গ্রাম-সমাজের আনন্দরসশোষণের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এই প্রবাদবাক্যগুলি যেন জীবন-অভিজ্ঞতার ইক্ষুদণ্ডচর্বণের গাঢ় রসনির্যাস, জীবন-তাৎপর্যের অর্থগূঢ় ভাষ্য। অট্টামা একটি স্মরণীয় প্রতীকধর্মী চরিত্র।

বংশী ও গোঁসাইদিদি বৈষ্ণবভাবাদর্শের প্রভাব পল্লীজীবনে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া মানুষের আচার-আচরণ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত। স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত ও জাতিভেদপ্রথার দ্বারা কঠোরভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে বৈষ্ণবধর্ম যে মুক্তি ও আনন্দময় জীবন-উপলব্ধির প্রেরণা জাগাইয়াছিল ইহাদের চরিত্রে তাহাই উদাহৃত হইয়াছে। বংশীর কীর্তনানুরাগ ও গানরচনার শক্তি আধুনিক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনীতি-যুদ্ধের নব মাদকতায় শ্লেষের তীক্ষ্ণতা অর্জন করিয়াছে। আর গোঁসাইদিদি ক্রমশঃ যুগের আনুকূল্য-বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে নীরব বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

অবিনাশ ডাক্তার তিক্ত অভিজ্ঞতায় জীবনের সুস্থ স্বাদ হারাইয়াছে। যুদ্ধে তাহার পায়ের সঙ্গে তাহার মানস ভারসাম্যও কাটা পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে কিছুটা আশাবাদ ও গঠনমূলক সংকল্প সজীব আছে। নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন গ্রাম্য সমাজে সে এখনও ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা পোষণ করে। কিন্তু সে বাহির হইতে আগন্তুক ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের বলিয়া বনপলাশির সমাজে তাহার কোন নেতৃত্বপ্রভাব নাই। পদ্মর সহিত তাহার সম্পর্কও ভাবাত্মক নয়, অভাবাত্মক, গ্রামসমাজের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত প্রতিবাদ, নিজ অন্তরের অনুরাগ-প্রসূত নয়।

উদাস ও পদ্ম খানিকটা গ্রামজীবনের অনুবর্তী, খানিকটা বিদ্রোহী। পদ্মর বিশেষ কোন ব্যক্তিত্ব নাই। তবে উদাস তাহার অভিনয়নিপুণতায়, তাহার যান্ত্রিক বৃত্তি অবলম্বনের আগ্রহে, উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে তাহার অনুচ্চারিত ক্ষোভে ও শেষ পর্যন্ত নিজ প্রবল ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে পদ্মর বিমুখতা-জয়ে সে পল্লীজীবনের নির্দিষ্ট মাপকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। মোটরচালকরূপে সে যে গিরিজাপ্রসাদকে কিঞ্চিৎ বিশেষ সুবিধা দিয়া তাহার পূর্বকৃত ঋণশোধ কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে ইহা তাহার চারিত্রিক মনস্তত্ত্বের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্যনির্দেশ।

কিন্তু মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম দীপ জ্বলিয়াছে সর্বাপেক্ষা অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যহীন একটি অন্তঃপুরিকার অন্তর-লোকে। মোহনপুরের বৌ-এর নাম

পর্যন্ত উপন্যাসে অনুক্ত— গৃহিণীপরিচয়ে তাহার ব্যক্তিপরিচয় সম্পূর্ণভাবে আবৃত। সাধারণ গৃহিণীর একঘেয়ে কর্তব্য পালনে তাহার জীবন গুরুভারগ্রস্ত— মনে হইয়াছিল যেন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এখানে সম্ভব হইবে না। তাহার ভাসুর জা-এর সহিত সম্পর্কে, তাহার মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধের বিষয়ে সতর্ক গোপনীয়তায় ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে সে যেন আমাদের সহস্র সহস্র গৃহলক্ষ্মীর বিশেষত্বহীন প্রতিনিধি। তাহারই মৃৎপ্রদীপে হঠাৎ দিব্য আরতির শিখা জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাসুরঝি বিমলার সহিত প্রভাকরের পূর্বরাগ নারীচিত্তের সহজ, অথচ অভ্রান্ত সংস্কারবশে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিস্ময়কর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সে অসাধ্য সাধন করিল, টিয়ার জন্য নির্বাচিত পাত্রটি, সমস্ত অলঙ্কার ও পণের টাকার সহিত, বিমলার হাতে তুলিয়া দিল। হয়ত মেয়ে যে এ বিবাহে সুখী হইবে না এই অশুভ পূর্বজ্ঞান তাহার এই সংকল্পের মূলে কাজ করিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতেও তাহার কাজের প্রায় অমানুষিক দীপ্তি বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না। আর এই চরম আত্মবিসর্জনের মধ্যে কোন নাটকীয় অত্যুক্তি বা ভাববিলাস নাই—সংসারের আর পাঁচটা কাজের মত এই কাজও কোন আত্মঘোষণা বিনা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাই ঔপন্যাসিকের চরম কৃতিত্ব—এই অসাধারণ আত্মোৎসর্গের সঙ্গীত আধুনিক সমাজপ্রতিবেশে বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত সুরসাম্যে মিলিত হইয়াছে।

গিরিজাপ্রসাদের গ্রামত্যাগের বর্ণনার মধ্যে এক বিষাদের সুরে, এক ভাবগত অসামঞ্জস্যের বেদনায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রবাসী সন্তানের সম্পর্কের অনিশ্চয়তা পাঠকের চিত্তকে প্রশ্নমথিত করিয়া রাখে।

[মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-এর সৌজন্যে]

প্রথম প্রকাশের সময় যত অনাদৃতই থাক, এর চেয়ে বড় সাফল্য কি আছে, সান্ত্বনা কি থাকতে পারে। কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই তো এ উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম, এবং লিখেছিলাম গ্রামজীবনের উপন্যাস। অথচ গ্রাম আমি দেখিনি, গ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল না বললেই চলে। তা হলে লিখলাম কি করে, কে লেখাল। ১৯৮৪ সালে 'আজকাল' দৈনিকে একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল আমার। যিনি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন রচনাটির শিরোনাম দিয়েছিলেন তিনি : 'শুধু জীবন, জীবনযাপন, তন্ময়তা শুধু।' আমার নিজের বক্তব্যই কিছুটা তুলে দিচ্ছি সেখান থেকে :

"আমার লেখার অন্দরে একটা মানসিক প্রস্তুতি সারা জীবন ধরেই চলেছে। কোনও একটি গল্প বা উপন্যাসের জন্য পৃথক কোনও প্রস্তুতি থাকে না। চিন্তাভাবনা, বই পড়া, অভিজ্ঞতা, নিজের চোখে দেখা, শোনা, আরও নানান রকমের টুকিটাকি প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে জমা হয়ে তৈরি করছে অভিজ্ঞতা। নিজের জীবনে সত্যি সত্যি কোনও কিছু ঘটাকেই কেবল অভিজ্ঞতা বলে, তা নয়। এগুলো যখন যেমন দরকার টেনে নিয়ে এসে গেঁথে দিলেই সেটা মালা হয়ে যায়। মালা বানাবার জন্যে ফুলের বাগান করতে হয় না, সার কিনে এনে ফুল গাছের চাষ করতে হয় না। হাতের কাছে যে-ফুল পাওয়া যায় সেটা গেঁথে নিলেই চলে।

"সমালোচকরা নিশ্চয়ই পর্ব ভাগ করতে পারেন একজনের রচনার। শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব, বয়েসের সীমা দিয়ে ভাগ করা যায়। কিন্তু মজার কথা হল, সেই লোকটি কিন্তু জানতে পারে না কোন দিনটিতে সে এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে পৌঁছে গেল। লেখার বেলাতেও তাই।... বিষয়টা আমার কাছে কোনও বিশেষ ব্যাপারই নয়, যেমন নয় বিশেষ স্মৃতি বলে কিছু, অথবা বিশেষ মানুষ বা বিশেষ নিসর্গশোভা। সবই অবিশেষ। লিখতে বসলেই সব কিছু বিশেষ হয়ে দেখা দেয়।"

আমার অন্য অনেক রচনার মতোই 'বনপলাশির পদাবলী'কেও বহু পাঠক মনে

করেন আমার জীবনেরই নিজস্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী। একজন লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কি আছে!

"He is least prone to gimmick or outlandish freak. He never mystifies his reader for the sake of 'effect', he maintains the essential poise of an artist of the first order. His crystal prose is undisturbed by unnecessary flashes or ornaments; it shines with a rare clarity of diction and is democratic to the backbone. The honesty of his story-telling disallows loudness, petty aberration or borrowed tricks...He is an explorer of the 'moment' and pays all his attention to what happens at a particular moment. What is momentary to others becomes significant to his observant eye and he handles it with the clinical care of a scientist and anxiety of an explorer or the concern of a mother engaged in child care."

বলা বাহুল্য, সমালোচকের এই উক্তিটি মদীয় রচনা সম্পর্কেই। তবে এই গুণাবলী সম্পর্কে আমি নিজে কোনও দিনই সচেতন ছিলাম না, এখনও নই।

এই নির্ভেজাল আত্মপ্রচারের অন্য একটি উদ্দেশ্যও আছে। অন্তত তরুণ লেখকরা এই দৃষ্টান্ত থেকে নিজের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তাৎক্ষণিক সমাদর না পেলেও উপেক্ষিত রচনা কালক্রমে সমাদৃত হতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁদের হবে।

'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে দেওয়ার আদৌ কোনও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ অবধি পরাস্ত হতে হয়েছিল সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অতি বিনয়ী, অতি ভদ্র এবং অতি সজ্জন সেই কিংবদন্তীতুল্য মানুষটির কাছে, যাঁর নাম উত্তমকুমার। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তিনি আমার মত পাল্টানোর চেষ্টায় অক্লান্ত ছিলেন। সে কৌতুককর কাহিনী প্রসঙ্গান্তরে বলা যাবে। লভ্যাংশ দুঃস্থ শিল্পীদের সেবায় নিয়োজিত করার সদিচ্ছা জানিয়ে তিনি নিজেই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেই প্রথম। ছবিটিকে তিনি দুরন্ত জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন এবং তা পেরেছিলেন। তাঁর মুখে সাফল্যের সেই উজ্জ্বল আনন্দ দেখে বিন্দুমাত্র অনুযোগ করতে ইচ্ছে হয়নি। একটি ভাল ছবি করার জন্য তাঁর নিষ্ঠার কোনও অভাব ছিল না। উপন্যাসটি লেখার পিছনে আমারই কি কোনও নিষ্ঠার অভাব ছিল! কিন্তু সাধ এবং সাধ্যের মেলবন্ধন তো সব সময় ঘটে না। সে জন্যেই বইটির ভূমিকায় লিখেছি: 'বনপলাশি তাই শাস্ত্রীয় উপন্যাস না হয়ে...বনপলাশির পদাবলীই রয়ে গেল।'

কারণ যত প্রশংসাই জুটে থাক এ উপন্যাসের কপালে, আমি জানি আমি যা চেয়েছিলাম, আমি তা পারিনি।

শেষ অবধি 'বনপলাশি' আমার কাছে অনধিকারচর্চাই রয়ে গেছে।